পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প
সম্পাদনা করেছেন
সুবী রায়চৌধুরী
১৯০১ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রকাশিত
সাতান্নটি ছোট-বড়ো প্রেমের গল্পের সংকলন
নতুন সাহিত্য ভবন
কলিকাতা-২০

মুখবন্ধ

প্রেম সম্পর্কে ফরাসী মনীষী লা রশফুকো স্মরণীয় উক্তি করেছেন, 'প্রেম বিষয়ে এত শোনা না গেলে খুব কম মানুষই প্রেমে পড়তো।' মন্তব্যটির ঈষৎ পরিহাসের মধ্যে এ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন যে মানুষের অন্যান্য মূল্যবোধ এবং অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র করে এর প্রভাবকে আমরা অতিরঞ্জিত করেছি—মানুষের সাহিত্যসৃষ্টিতে, তার শিল্পকর্মে প্রেমের প্রচণ্ড মহিমার নিদর্শন পেয়ে জীবনে অনুভূত হবার আগেই আমরা যেন এর প্রবল প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছি। এমন কি ধর্ম-সাধনায়ও 'মধুর ভাব'কে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রেমের বেদনা ও ব্যর্থতা, বঞ্চনা ও অতৃপ্তি সত্ত্বেও মানুষে একে পরম অভিজ্ঞতা বলে মেনে নিয়েছে। বৈষ্ণব কবির অভিজ্ঞতা 'হরি হরি পিরিতি ন জনি করি কোই'-এর সঙ্গে কয়েক শতকের ব্যবধান সত্ত্বেও আধুনিক কবির 'প্রেমে পতন ছাড়া আর কিছু নেই'—এই উপলব্ধির বিশেষ পার্থক্য নেই, তবু সে-যুগের মতো এ-যুগের মানুষও প্রেমে পড়ে, অবশ্য প্রেম সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যচেতনা এবং প্রকরণের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রেমকে প্লেটোর মতো 'স্বর্গীয় উন্মাদনা' আখ্যা দিক অথবা এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে উপাসনা করুক, তবু মানুষ এর মোহময় প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। সবচেয়ে বড়ো কথা মানুষ তার এ আত্মত্যাগকে মনে করেছে ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ, এর জন্য সব দুঃখকেই সে সহ্য করেছে, সব নিগ্রহকেই তুচ্ছ করেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রেমের বিবর্তনের ঐতিহাসিক রুজমঁ স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন, 'সুখী, পরিতৃপ্ত প্রেমের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত ইওরোপীয় সাহিত্যে। বিরহের বেদনাই প্রেম।' এ মত সর্বাংশে গ্রহণীয় কিনা সে অন্য প্রশ্ন। তবে এ কথা ঠিক যে মানুষ স্বভাবে সুখ-সন্ধানী হয়েও প্রেমের জন্য যতখানি আত্মত্যাগ করে তা বিস্ময়কর। শুধু শিল্পী বা কবিরা একে অতিরঞ্জিত করেননি, সাধারণ মানুষেরাও একে অতি-মূল্য দিয়েছে।

এখানে আমাদের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ অপেক্ষা তার ঐতিহাসিক ধারাবিবর্তন সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ। দেশ-বিদেশের অসংখ্য কবি-মনীষীর অজস্র উক্তি

উদ্ধৃত করে প্রেমের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা আপাতত নিরর্থক। কেননা প্রেমের অনুভূতি হয়তো সব দেশে এবং কালে সমান, কিন্তু প্রেমিককে দেশ ও কাল উভয়েরই বন্ধন মানতে হয়। ক্ষাত্রযুগের কোনো প্রেমগাথা হয়তো আজো আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠ করি, কিন্তু সে যুগের প্রেমের আদর্শ আজ নিশ্চয়ই অনুসৃত হবে না। তাই একই প্রেম হলেও বাঙালী মেয়ের সঙ্গে ফরাসী মেয়ের পার্থক্য থাকে। উনিশ শতকে কথাসাহিত্যের মাধ্যমে যে প্রেমের কাহিনীর সূত্রপাত তা প্রধানত পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এর আগে বাংলা সাহিত্যে প্রেমের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। তবে সাধারণ জীবনে এর সামাজিক স্বীকৃতি বা অস্তিত্ব যে বিরল ছিল তা নিঃসন্দেহ। সামাজিক পরিবেশই তো প্রতিকূল। পুত্রার্থে ভার্যাগ্রহণ এবং দ্বাদশ বর্ষে গৌরী-দান করেই আমরা এমন নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতাম যে, মনে হয় রশফুকোর অবিস্মরণীয় উক্তি অন্তত বঙ্গদেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে সমাজ এবং সময় কখনো স্থির থাকে না—আমাদের জীবনেও পরিবর্তন এল। সে পালা-বদলের ইতিহাস শুরু করবার আগে আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রেমের চিত্রণ ও দেশ-কাল সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রেমের চিত্রণ বলতে সর্বাগ্রে বৈষ্ণব কাব্য এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র কথা মনে হয়। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির রক্ষণশীলতার প্রভাবমুক্ত এই প্রেমগাথাগুলিতে বাল্যপ্রেম বা দাম্পত্যপ্রেম নয়, পরিণত মনের পূর্বরাগ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। তিনি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' এবং অন্যান্য কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন, এখানে স্বাধীন প্রেমের যে পরিচয় রয়েছে অন্যত্র তা দুর্লভ। কৃত্তিবাসের সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনে সক্রন্দনে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, নিতান্ত শৈশবেও তিনি ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেননি। ডক্টর দীনেশচন্দ্রের মতে, 'এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল।' অনেকে মনে করেন, ট্রিস্টান কাহিনী এবং ক্রবাদুরদের cortezia-র গাথা থেকে যে-রকম পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে প্রেমের ইতিহাস শুরু, তেমনি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'গুলিও বাংলা সাহিত্যে লৌকিক প্রেমের প্রথম সার্থক রূপায়ণ। অবশ্য এই গীতিকার রচয়িতাগণ যতই সাধারণ মানুষ হোন এবং এর আখ্যায়িকাগুলি যতই লৌকিক হোক না কেন, সেযুগের সমাজে এরকম অবাধ প্রেমের সুযোগ ছিল এমন মনে করা ভুল হবে। বিশেষভাবে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে প্রেম বা পূর্বরাগ অজ্ঞাত

না হলেও দুর্লভ ছিল। অবশ্য ত্রুবাদুরদের গাথায় যে প্রেমের চিত্রণ রয়েছে তার সঙ্গেও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের বিশেষ মিল নেই। এসব গাথার নায়ক-নায়িকা কেউ সাধারণ নাগরিক নয়—হয় মুক্তদাস না হয় ভিন দেশী যোদ্ধা বা রাজা। বস্তুত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী যেখানে দাসীতুল্যা, সেখানে প্রেমের এত অবাধ স্বাধীনতা অসম্ভব। রুজমঁ প্রমুখেরা স্বীকার করেছেন যে, এ জাতীয় কাব্যে প্রেমের যে আদর্শ চিত্রিত তার সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশের ব্যবধান মেরুপ্রমাণ। ত্রুবাদুরেরা তাদের কাহিনী অন্যত্র সংগ্রহ করেছিল। আসলে পশ্চিমী ত্রুবাদুরেরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত নৈতিকতা এবং প্রচলিত বিবাহ-বন্ধন দুয়েরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এদের রচিত গাথার মূল উপজীব্য হল প্রেম, কিন্তু তা বিরহের, পারস্পরিক এবং পরকীয়া। দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কে এদের বিশেষ আগ্রহ নেই। এবং এখানেই পূর্ববঙ্গ গীতিকার সঙ্গে তাদের প্রধান পার্থক্য। এখানে যতই পূর্বরাগ এবং বিরহের বর্ণনা থাক, অবৈধ প্রেমের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়নি। মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি কাব্যকাহিনীতে সতীত্বের নিষ্ঠা, দাম্পত্য প্রেমের মহিমাই ঘোষণা করা হয়েছে।

অবশ্য পরকীয়া প্রেমের রূপায়ণ বৈষ্ণবকাব্যে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব পদ-কর্তাদের সঙ্গে উক্ত চারণকবিদের তুলনা অর্থহীন। ত্রুবাদুরদের প্রধান উপজীব্য ছিল নাইটদের প্রণয়গাথা এবং তাদের ওপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব সবচেয়ে শিথিল ছিল। অন্যদিকে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সমাজের বিদগ্ধশ্রেণীর শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন, ধর্মের প্রভাব তাঁদের জীবনে সবচেয়ে গভীর ছিল এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেম তাঁদের কাছে দৈবলীলারই পার্থিবরূপ। সুতরাং ত্রুবাদুরদের সঙ্গে তাঁদের প্রধান ব্যবধান ধর্ম ও প্রেম সম্পর্কে তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গিতে। একজনের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ সুস্পষ্ট, অন্যজনের ধর্মানুগত্য অনতিক্রমণীয়। দ্বিতীয়ত, বৈষ্ণবকাব্যে 'বিরহ' বিস্তৃত অংশ জুড়ে থাকলেও একমাত্র পর্যায় নয়। তবে একথা ঠিকই যে বৈষ্ণব পদকর্তাদের আত্যন্তিক ধর্মচেতনা সত্ত্বেও তাঁদের কাব্যে প্রেম ধর্মনিরপেক্ষভাবেও উপভোগ্য এবং রাধা-পুরাণ তো লোক-সাহিত্য থেকে গৃহীত।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার কথা ছেড়ে দিলেও বেহুলা, ফুল্লরা প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের নায়িকারাও সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বরাবরই আমাদের সাহিত্যে সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন খুব দৃঢ় ছিল। এবং তৎকালীন পরিবেশে এ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করাও অচিন্তনীয়।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সে-যুগে "সর্বত্রই মানবচরিত্র কি মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না?...একদিকে শাসনও কড়া, অন্যদিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম, তাই কখনো শাসন জেতে, কখনো প্রকৃতি।" বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে শুধু শাসনেরই পরিচয় রয়েছে, প্রকৃতির অস্তিত্ব বিরল। বঙ্কিমচন্দ্রে এসেই প্রথম হাওয়া-বদল ঘটল। বস্তুত আমাদের কথাসাহিত্যের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমেরও অভিষেক হল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িকদের রচনায় 'শাসন এবং প্রকৃতি'র দ্বন্দ্বে প্রকৃতি জয়ী হয়েছে কিনা সে অন্য কথা। তবে এই দুয়ের সংঘাত তাঁরা অস্বীকার করেননি। তাঁদের পূর্বসূরীরা তো এ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে এরকম নিরুপদ্রবে থাকা সম্ভব ছিল না। ধূর্জটিপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন, 'বাংলাদেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্তাদের বারণ কেউ মানল না। তারপর এলেন রবিবাবু। তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি—গুরুজন ও গুরুদাসবাবুর বাধা সত্ত্বেও।' বঙ্কিমচন্দ্রে এ পদসঞ্চার স্বভাবতই ভীরু, কুণ্ঠিত। তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণে 'উপন্যাস' নামে যে নতুন সাহিত্যরূপ আমাদের ভাষায় প্রচলিত করলেন, সেখানে ধর্মকাহিনী অচল। জনসনের সংজ্ঞা অনুযায়ী উপন্যাস হল মুখ্যত প্রেম-কাহিনী। সুতরাং প্রথমে ঐতিহাসিক কাহিনীতে এবং পরে আমাদের জীবনেই তিনি প্রেমের উপকরণ খুঁজতে শুরু করলেন। এই আর্দ্র বাংলাদেশে প্রেম শুধু বিরল নয়, নিষিদ্ধ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেমের সমস্যা বলতে প্রধানত বোঝায় সামাজিক পরিবেশের প্রতিকূলতা—সামাজিক বাধা, গুরুজনদের অনুশাসন এবং সেজন্যই বোধহয় যুক্তিহীন আত্মগ্লানি। কিন্তু এ ছাড়াও প্রেমের যে ব্যক্তিগত দিক সেখানে অখণ্ড মনোযোগ দেবার অবকাশ তিনি পাননি। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধি দিয়ে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করলেও সংস্কারবশে অনেক সময় বিরোধিতা করেছেন। এই সংশয় আর দ্বিধার একটি সার্থক উদাহরণ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শেষ স্তবক, যেখানে মৃত্যুর পর প্রতাপ সেই নিরাপদ, পুণ্যস্থানে গমন করল 'যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই,' আবার 'প্রণয়ে পাপ নাই'। 'যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত,' আবার 'লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালোবাসিতে চাহিবে না।' অবশ্য এ অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁকে দায়ী করা বৃথা। একজন লেখকের

পক্ষে পুরোপুরি দেশ ও কালের বন্ধন অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁকে অভিযুক্ত করবার আগে তৎকালীন পরিবেশও একবার স্মরণ করা দরকার। নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ কোথায় হওয়া সম্ভব এ চিন্তা থেকে শুরু করে প্রেমের বিকাশ পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর কাছে বিরাট সমস্যা ছিল।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে দেব-মন্দিরে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রথম দেখাও দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনেকে তখন অভিযোগ করেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন চার্চে বহুক্ষেত্রে প্রেমের উন্মেষ হয়ে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরই অক্ষম অনুকরণ করে আমাদের ঐতিহ্যের অবমাননা করেছেন। দেব-মন্দির প্রেমের দ্বারা কলুষিত হয়েছে। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যেই অনুরূপ দৃষ্টান্ত মেলে, যেমন 'নাগানন্দে' জীমূতবাহন-মলয়বতীর প্রথম সাক্ষাৎকার। রামগতি ন্যায়রত্ন আরো অভিযোগ করেছিলেন যে, নায়ক-নায়িকা কুল-শীলের পরিচয় না নিয়ে কী করে পরস্পরের অনুরক্ত হল। সুতরাং এই পারিপার্শ্বিকে বঙ্কিমচন্দ্র যেটুকু পেরেছেন সেটুকুই বিস্ময়কর। প্রেমের কাহিনী শুরু করবার আগে সম্ভাব্য পটভূমির জন্য তাঁকে কত ভাবতে হয়েছে, নায়িকার' চিত্ত-চাঞ্চল্যের অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করাতে হয়েছে, বিধবা-বিবাহের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের শরণ নিতে হয়েছে। যে সমাজে বাল্যবিবাহ এবং বৈধব্যের পর ব্রহ্মচর্য, যেখানে অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের মিলিত হবার সুযোগ নেই, সেদেশে প্রেমের কাহিনীর অবতারণা যে কত বড়ো প্রচণ্ড সমস্যা তা সহজেই অনুমেয়। এদেশে একমাত্র উপায় ছিল বাল্যপ্রেম, কিন্তু চোদ্দ বছরের নায়িকা নিয়ে আনা কারেনিনা সৃষ্টি করা চলে না, ফলে বড়ো জোর কুন্দনন্দিনী। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এক বিকল্পের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বহুক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ বা প্রেমকে অবলম্বন করলেও ঘটনা-চক্রে পাঠক এবং নায়কের অন্তরালে তারা দেহ-মনে পরিণত হয়ে নায়িকার মর্যাদালাভ করেছে, যেমন শ্রী, প্রফুল্ল, শান্তি। 'যুগলাঙ্গুরীয়'তেও পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর শৈশবপ্রেমের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে পরে যখন তাদের গোপন মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন তখন 'যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর'। 'রাধারানী'তেও তাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হলে তাঁর প্রেমের চিত্রণে আত্যন্তিক সরলীকরণের অভিযোগ সহজেই আনা যায়। বিধবার প্রেমকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু সমর্থন করেননি। দাম্পত্য প্রেম ছাড়া অন্য প্রেমের পরিণাম কদাচ শুভ নয়, একথা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ না করলেও তাঁর

নায়ক-নায়িকাদের পরিণতিতে সে ইঙ্গিত সহজেই বোঝা যায়। দাম্পত্য-প্রেমের সম্পর্কও তাঁর কাছে কত সহজ!—সতিনপ্রথা যে দাম্পত্যজীবনে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে একথা তাঁর মনে হয়নি। অমন যে বিদ্রোহিণী দেবী চৌধুরানী তারও এ-বিষয়ে কোনো অভিযোগ নেই। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনী, অবশ্য 'বিষবৃক্ষ' তিনি রচনা করেছিলেন ঘরে ঘরে অমৃতবৃক্ষ ফলাবার আশায়। রবীন্দ্রনাথই এ-বিষয়ে আলোকপাত করলেন তাঁর 'দৃষ্টিদান', 'মধ্যবর্তিনী' ইত্যাদি গল্পে। "স্বামীকে ভালোবাসি বলেই সতিনকে ভালোবাসতে পারি" এ দম্ভ যে কত মিথ্যা তা তাদের জীবন দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী লেখকদের রচনায় বিধবা-প্রেমের সমস্যা কিন্তু সহজ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অভিযোক্তা স্বয়ং শরৎচন্দ্র একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই।'

বিধবার প্রেম সম্ভব, কিন্তু আমাদের খুব কম লেখকই একে স্বাভাবিক করে আঁকতে পেরেছিলেন। 'চোখের বালি'র কথা স্মরণ রেখেই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী বিষবৃক্ষের উত্তরাধিকারী না হয়ে পারেননি।' অবশ্য 'চোখের বালি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন যে, উপন্যাসটি "বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।"

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের দু-একটি উপন্যাসে হয়তো প্রেমের সামাজিক সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে' এবং পরবর্তী উপন্যাসগুলিকে সামাজিক সমস্যা থাকলেও তাঁর পাত্র-পাত্রীরা অনায়াসে এই সাময়িকতাকে অতিক্রম করে গেছে। এই মন্তব্য তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র পটভূমি সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখানে বাল্যপ্রেম, বিধবার প্রেম, দাম্পত্য প্রেম, অসবর্ণ এবং অসামাজিক প্রেম প্রভৃতি সবরকম প্রেমেরই চিত্রণ রয়েছে, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীরা কোনো সমাজগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী চলা-ফেরা করে না, আপনার ধর্মেই জীবনধারণ করে। স্তাঁদাল নির্দেশিত চতুর্বিধ প্রেম Passion love, Gallant love, Sensual love, Vanity love ইত্যাদি কোনো প্রেমেরই নিদর্শন হয়তো এগুলি নয়, কিন্তু 'উত্তরে টেরাই, দক্ষিণে

সুন্দরবন' দিয়ে ঘেরা ভূখণ্ডের অধিবাসীরা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় যাকে প্রেম বলে জানে তার পরিচয় মিলবে এই গল্পগুলিতে। 'ভালবাসা' কথাটিই তো বহু গল্পে অনুচ্চারিত, কিন্তু ছয় ঋতুর নিরন্তর লীলার মতো এর নিবিড় সান্নিধ্য মনকে অভিভূত করে রাখে। 'একরাত্রি', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি গল্পে প্রচলিত অর্থে কোনো প্রেমের সংলাপ নেই অথচ শেষ করবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে-কথা বিস্মৃত হতে হয়। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সে-যুগের নায়িকাদের ব্যবধান বিস্তর, আজকের প্রেম অনেক জটিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সহজ মাধুর্য আমাদের মনকে স্পর্শ করে। আমার তো মনে হয় 'গল্পগুচ্ছ' থেকে 'তিন সঙ্গী' পর্যন্ত আলোচনা করলে বাংলা সাহিত্যে প্রেমের পরিণতির ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সুরবালা থেকে বিভা, মৃণ্ময়ী থেকে অচিরা—নায়িকার নামকরণ, পটভূমির পরিবর্তন এবং সেই পুরাতন প্রেম হলেও তার স্বরূপভেদে এর পরিচয় মিলবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ 'গল্পগুচ্ছে' পরিচিত পরিবেশকে কোথাও অতিক্রম করেননি একথা সত্যি, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন। দেবর-ভ্রাতৃজায়া অথবা স্ত্রীর ভগ্নীকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের সৃষ্টি সেযুগে নিশ্চয়ই দারুণ দুঃসাহসিক ছিল। ১৯০১ সালে 'নষ্টনীড়' প্রকাশিত হয়। এর অসাধারণ সাহিত্যমূল্য ছেড়ে দিলেও এর সামাজিক তাৎপর্য অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে পারিবারিক সম্পর্কের অবমাননা করেছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই অভিযোগ আজ হয়তো ভিত্তিহীন, কিন্তু সে-যুগে তার দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। আমাদের জীবনেও প্রেমের অজস্র উপকরণ রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' তার প্রমাণ। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর ব্যবধান। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ('প্রেমের কথা' দ্রষ্টব্য) তাঁদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল আমাদের সমাজে প্রেম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাস্তব অনুকরণ মাত্র—আমাদের জীবনে তার অস্তিত্ব নেই। আর দাম্পত্য প্রেম তো রক্তের সম্পর্কের মতোই অচ্ছেদ্য, এখানে ঔচিত্যবোধের প্রশ্নই ওঠে না। মায়ের সন্তানস্নেহ, এর যেমন কোনো ব্যতিক্রম নেই—পতি-পত্নীর আনুগত্যও ঠিক তাই। পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে প্রেম (১৩০৩)' প্রবন্ধে এ মতবাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, "জনক-জননী যেমন সন্তান-সন্ততির দোষ-গুণের নিরপেক্ষ, প্রকৃত সতীর প্রেম তেমনি পতির দোষগুণ নিরাকাঙ্ক্ষ।...সতীর প্রেম বিনিময় ও ব্যবসা নহে। সতী বলিবে না, আগে তুমি ভালোবাসো, তবে আমি ভালোবাসিব—আগে দাও,

তবে গ্রহণ করিব।···সেই দৃষ্টান্তে নিধুবাবু গাইয়া গিয়াছেন, 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে··· ·।' -বাৎসল্য প্রেম যেমন নিরাকাঙ্ক্ষ, দাম্পত্য প্রেম তেমনি হওয়া চাই।" সে যুগের একাধিক গল্পে এর সমর্থন রয়েছে।

আমাদের পূর্ব আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সামগ্রিকভাবে প্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তাঁর ভাষা। রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রীদের বাগ্ বৈদগ্ধ্য বস্তুতই স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। পূর্ববর্তী লেখকদের রচনার সঙ্গে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের সংলাপের তুলনা করলেই ধূর্জটিপ্রসাদের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

বলা বাহুল্য প্রেমের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আরো গভীর এবং দূর-প্রসারী। আমাদের সংকীর্ণ পরিবেশে প্রেমের যতখানি ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য সম্ভব, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সন্ধান মেলে। তবে প্রেমের একটি দিক সম্পর্কে তিনি উদাসীন বলে তাঁর উত্তরসূরীরা অভিযোগ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর মতে, 'ভালোবাসার ভাবের দিকটাকে এমন প্রাণময় করে তিনি প্রকাশ করেছেন যে তার অফুরন্ত পুনরুক্তিতেও আমরা ক্লান্ত হই না। কিন্তু যেখানে সেই পদ্মের মূল, যেখানে অন্ধকার, কর্দম আর ধমনীর অন্ধ উচ্ছ্বাস, সে-দিকটাকে বর্ণনার যোগ্য বলে তাঁর মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু এই একটা বিষয়ে অদ্ভুত সংকোচ ছিল তাঁর, যে-সংকোচ তাঁর মতো প্রতিভাবানের পক্ষে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় আমাদের।" এর ব্যতিক্রম শুধু 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের একটি মতাদর্শ পরবর্তীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে হল "মেয়েরা প্রধানত দুই জাতের।···এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।" শরৎচন্দ্রের নায়িকারা এই দুইরূপের সংশ্লেষণ।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক লেখকেরা আমাদের জীবনে প্রেম নেই জেনে কেউ একে পরিহাস করেছেন, আবার কয়েকজন বিদেশী পটভূমিকার আশ্রয় নিয়েছেন। শেষোক্ত লেখকদের মধ্যে সবাই যে প্রমথ চৌধুরীর মতো পুরোপুরি বিদেশে কাহিনীর অবতারণা করেছেন তা নয়, স্বদেশে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ অথবা ব্রাহ্ম পরিবারের মাধ্যমে বিদেশী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে প্রেমকে অস্বীকার করবার চেষ্টাই প্রবল। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহে প্রথম আট-দশটি গল্প লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশক্ষেত্রে প্রেমকে পরিহাস করা হয়েছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কটাক্ষ, 'বাঙালী মেয়ের পূর্বরাগ সে তো

বঙ্কিমবাবুর গাঁজাখুরি' সত্ত্বেও অবশ্য প্রেমের গল্প লেখার প্রচেষ্টার বিরাম ঘটেনি। বরং শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর সে ধারা আরো প্রশস্ত হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্রেরও প্রেমের সমস্যা প্রধানত সামাজিক। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা আদর্শবাদ এবং নীতিবোধের কাছে যেমন অসহায়, শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রীরা তেমন নয়। তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে পারে যে তাদের ব্যর্থতার জন্য সমাজ-ব্যবস্থাই দায়ী এবং প্রেম সম্পর্কে তারা অনেক বেশি সচেতন। তবে শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকারা সাধারণত সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়েই এর প্রতিবাদ করেছে। তাদের বঞ্চনা ও নিগ্রহ হয়তো কোনো সমাজ-সংস্কারককে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু তারা একে মেনে না নিলেও মানিয়ে নিয়েছে।

তবে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি নায়িকা এর স্পষ্ট ব্যতিক্রম—অভয়া, কমল, কিরণময়ী। এদের মধ্যে অভয়ার ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে দৃঢ় এবং ভাবালুতাবর্জিত। কিন্তু অন্য দুজনের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ না বলে 'বিদ্রোহের অনুশীলন' বলাই ভালো। কেননা বহুক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কে তাদের অভিযোগ অস্পষ্ট আবেগে পরিসমাপ্ত হয়েছে। সে যাই হোক, কমল-কিরণময়ীর অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রেমের নতুন মূল্যায়নে শরৎচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য।

শরৎচন্দ্রের বৈপ্লবিক কৃতিত্ব বোধহয় পতিতার প্রেমকে মর্যাদাদানে। অবশ্য পতিতাকে নিয়ে প্রথম গল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ ('বিচারক' দ্রষ্টব্য), শরৎচন্দ্র নন, তাহলেও অসামাজিক প্রেমের নৈতিক মহিমা তাঁর গল্পেই প্রথম প্রচারিত। তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—তিনি বাল্যপ্রেমকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎচন্দ্রের একটি মতাদর্শও পরবর্তীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটা হল যে কোনো নারীর ব্যক্তিত্বে মাতৃরূপই প্রধান—পুরুষের আত্মভোলারূপ, পরনির্ভরতাই তার প্রেমকে উদ্দীপিত করে। সেজন্যই বোধহয় শরৎচন্দ্রের নায়কেরা যতখানি আত্মসচেতন তার চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক। এই তত্ত্ব এককালে আমাদের সাধারণ জীবনেও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমরা প্রেমের যে চিত্রণ পাই তার প্রধান সমস্যা ছিল সামাজিক। প্লেটোর মতো প্রেমকে এঁরা 'স্বর্গীয় উন্মাদনা' মনে না করলেও প্রেমের ক্ষেত্রে এঁরা যৌনপ্রসঙ্গকে পরিহার করতেন। কিন্তু 'কল্লোলে' এসে

হাওয়া-বদল ঘটল। প্রেমের কতটুকু দৈব এবং কতখানি জৈব সে-বিষয়ে আমরা নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম। এই পর্বের লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয় অন্নদাশঙ্করের নিম্নোক্ত পত্রাংশে মিলবে, "মানুষের গভীরতম প্রকৃতি বহু শত বছরের কৃত্রিমতার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে পুনরুদ্ধারের দিন এল। অনেকখানি আবর্জনা না সরালে পুনরুদ্ধার হয় না। অথচ আবর্জনা সরানো কাজটা বড়ো অরুচিকর। Sex সম্বন্ধে ঘাটাঘাঁটি সেইজন্যে বড়ো বীভৎস বোধ হচ্ছে। কিছুকাল পরে এই বীভৎসতা—এই বিশ্রী কৌতূহল—এই আধেক ঢেকে আধেক দেখানো—এসব বাসি হয়ে যাবে। Sexকে আমরা বিস্ময় সহকারে প্রণাম করব, আদিম মানব যেমন করে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতো।"

এ ভাবনার সূত্রপাত প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পর থেকেই ঘটেছে। নরেশচন্দ্র প্রবন্ধ এবং উপন্যাসে যৌনচেতনার স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ-হিতৈষীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিলেন। 'কল্লোল (১৯২৩)' প্রতিষ্ঠার পর কেউই যৌনপ্রসঙ্গকে পরিহার করলেন না। এঁদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ভিন্ন, যেমন অচিন্ত্যকুমার (সে-যুগে অন্তত)-বুদ্ধদেব প্রধানত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী চিত্রিত করেছেন, যুবনাশ্ব-জগদীশের আনাগোনা আরো নিচের তলায় এবং প্রেমেন্দ্র তখন থেকেই বহুপথসঞ্চারী। কিন্তু এঁরা কেউই প্রেমের দেহগত দিক সম্পর্কে উদাসীন নন। তারাশঙ্কর এবং অন্যান্য অনেকের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই এই দুঃসাহস দিয়েছিল, তেমনি বহু লেখকের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রেম ছিল পুতুল নিয়ে খেলা, এতদিনে তার প্রাণসঞ্চার হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্নদাশঙ্করের আবির্ভাবের পর এঁদের প্রভাব নিশ্চয়ই আরো দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছিল।

'কল্লোল যুগে' অচিন্ত্যকুমার সে-যুগের নীতি-দুর্নীতির তর্কযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। যে-কোনো চিন্তাধারার শুরুতে সংশয় থাকে, প্রতিবাদ ওঠে, কিন্তু সে-সব অতিক্রমেই তার স্থায়িত্ব।

একথা মনে রাখা দরকার তিরিশের সাহিত্যধারায় কল্লোল প্রবলস্বর হলেও একমাত্র নয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে সহজেই মনে হয়। প্রথমোক্ত লেখকের সিঁদুরচরণ, মৌরীফুল প্রভৃতি গল্পে গল্পগুচ্ছের গ্রামজীবনকে যেন নতুনভাবে ফিরে পেলাম।

'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্পে মানব-প্রেম এবং প্রকৃতি-প্রেম যেমন একাকার হয়ে গেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও প্রেম তেমনি বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র কোনো মূল্যবোধ নয়, তা বৃহত্তম জীবনোপলব্ধির অঙ্গীভূত। সেজন্য তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রকে তার অব্যবহিত প্রাকৃতিক পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ।

'কল্লোলে'র বিদ্রোহ অচলায়তনে প্রবেশাধিকার দিয়েছিল, কিন্তু চল্লিশের কথা-সাহিত্যে নিষিদ্ধ ফলের সন্ধানে আরো দুর্গম পথযাত্রীর সাক্ষাৎ মেলে। এই যুগসন্ধির সাহিত্যকে (শুরুতে যার মহাযুদ্ধ এবং শেষে দেশবিভাগ নামক দারুণ রাষ্ট্রবিপর্যয়) অনেক অভিজ্ঞতার পথ পার হতে হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক বিশ্বাস ভেঙেছে, অনেক মূল্যবোধের বদল ঘটেছে। সুবোধ ঘোষ এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে যুদ্ধকালীন কথাসাহিত্যের শুরু, অবশ্য 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের সাহিত্যসাধনাও এ পর্বে বিরামবিহীন। প্রবোধকুমারের অঙ্গারদাহ এবং অচিন্ত্যকুমারের যতনবিবির গরলকে অমিয়ভ্রম আরো নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পরবর্তীদের সাহিত্যসাধনায়। মহাযুদ্ধের প্রভাবে আমাদের সব মূল্যবোধই অস্থির—সংশয় এবং আশ্বাস, সন্দেহ এবং নির্ভরতার মাঝখানে আমাদের লেখকেরা প্রেম সম্পর্কেও সন্দিহান। এই অবিশ্বাসের জন্য কারো কারো লেখায় প্রেম সম্পর্কে ব্যঙ্গ এবং তির্যক দৃষ্টিই প্রধান। আবার কেউ বাইরের জীবনে নির্ভরতা না পেয়ে মনের গহনে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও ক্লেদ আর গ্লানি। এর চরম প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই প্রেমের দেহ-সর্বস্বতায় বিকৃতিতে।

প্রেম সম্পর্কে এই ধারণার মূলে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এ সম্পর্কে স্বভাবতই সবার প্রতিক্রিয়া সমান নয়। এরও মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত। এ জীবনে দুঃখ আছে, বঞ্চনা আছে, কিন্তু প্রেমও আছে যা ছায়ার মতো ঘিরে রাখে সব মালিন্য আর রুক্ষতাকে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যুদ্ধোত্তর রচনার মূল সুর হতাশার, সরাসরি এ-ধরনের সিদ্ধান্তে আসা কিছুটা যান্ত্রিক। কেননা অনেকেই আছেন যাঁরা এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আনন্দের অন্বেষণ করছেন। অনেক সময় দেখা যায় একই লেখক একটি গল্পে সুস্থ-সহজ জীবনে বিশ্বাসী, আবার অন্য একটি গল্পে বীভৎসভাবে জীবনদ্বেষী। তাঁর কোন্ মানসিকতাকে আমরা খাঁটি বলে

মনে করব?—আসলে অস্থিরতাই এই পর্বের সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষণ।

এই সংশয় শুধু আমাদের দেশ ও সাহিত্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে প্রেমের যে চিত্রণ চোখে পড়ে, তার সঙ্গে অনেক সময় সেখানকার অধিবাসীদের ধ্যান ধারণার মিল নেই। নিনা এপটনের Love and the French (১৯৫৯) পড়ে জানা গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ ফ্রান্স (ক্রুবাদুরদের দেশ) ছাড়া এবং একেবারে অভিজাতশ্রেণীকে বাদ দিলে সাধারণ ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে প্রেম, পরিণয় ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়েছে, প্রেমে আস্থা ফিরে এসেছে এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়েছে। French Institute Of Public Opinion' থেকে সম্প্রতি জনমত সংগ্রহের ফলাফলেই তা প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি ফ্রাঁসোয়া সার্গাঁর মতো লেখিকাও সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রেমই হল তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় এবং 'fidelity' খুব প্রয়োজনীয় তবে দুরূহ। এবং বালজাক যদি বেঁচে থাকতেন তবে এই উত্তরপুরুষদের মধ্যে খুব অস্বস্তি বোধ করতেন।'

অবশ্য সাধারণের এই মতাদর্শের সঙ্গে আধুনিক অনেক ফরাসী লেখকেরই মিল নেই। তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে ফরাসী সাহিত্যেও একদিন এই দাম্পত্যপ্রেমের মহিমা ঘোষিত হবে। এমনি ভাবে সব দেশে, সব কালে চলেছে রুচির বিস্ময়কর উত্থান-পতন। তবু নিরবধিকাল জুড়ে প্রেমের বিচিত্র রঙের ক্ষান্তি নেই। এই অশ্রান্ত পরিক্রমায় পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি হয়তো ক্ষণিক, কিন্তু তাতে কী এসে যায়!

সুবীর রায়চৌধুরী

সংকলন প্রসঙ্গে

'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্পে' ১৯০১ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে প্রকাশিত সাতান্নটি গল্প সংকলিত হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দীর ব্যবধানে অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম সম্পর্কেও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটেছে। আলোচ্য গল্প-সংগ্রহে এই ক্রম-পরিণতির ধারা স্পষ্টলক্ষ্য। অবশ্য এর মধ্যে কেউ যুগের আগে চলেন, কেউ স্বভাবে রক্ষণশীল। কিন্তু সমগ্রভাবে আমাদের জীবনে এই মূল্যবান 'অনুভূতি'র স্বরূপ পরিবর্তনের চেহারাটা চোখে পড়বে।

কাব্য-সংকলনের সুবিধা গল্প-সংগ্রহে নেই। একজন লেখকের বহুমুখী সৃষ্টিকর্মের পরিচয় কাব্য-সংকলনে থাকতে পারে, কিন্তু স্থান সংকোচের দরুন এখানে সেটা সম্ভব নয়। অথচ প্রথম সমস্যা রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু—শুধুমাত্র একটি গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বকে ধরবার চেষ্টা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর একাধিক গল্প নিলে স্বভাবতই আরেকজন লেখকের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে অস্বীকার করতে হত। বহু লেখকের ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে তাঁদের বহুমুখী নিরীক্ষার পরিচয় একটিমাত্র গল্পে সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে নিরুপায় বলে আমার লক্ষ্য ছিল নির্বাচিত গল্পগুলি যেন লেখকদের অক্ষম প্রতিনিধি না হয়। সে বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকের ওপর।

অবশ্য প্রত্যেক পাঠক যদি তাঁর সব প্রিয় লেখক এবং গল্পকে একটি সংকলনে প্রত্যাশা করেন সেটা অসম্ভব দাবি হয়ে দাঁড়ায়। সম্পাদকের সঙ্গে পাঠকের মতভেদ ঘটা বিচিত্র নয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংশোধনের সুযোগ প্রশস্ত করা যেতে পারে। নির্বাচিত গল্পগুলি সম্পর্কে পাঠকেরা তাঁদের মূল্যবান মতামত জানালে বিশেষ উপকৃত হব।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার। আধুনিকতার প্রবাহমান ধারা নির্দেশ করবার জন্য পঞ্চাশোত্তরকালে প্রকাশিত কয়েকটি গল্প আমরা গ্রহণ করেছি। যেমন, জেনানা সংবাদ (১৯৫১), গোধূলির রঙ (১৯৫১), অকাল বসন্ত (১৯৫৪), অপরিচিতা (১৯৫৫), পালকের পা এবং পূর্বক্ষণ (১৯৫৬)।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'প্রাইভেট টিউটর' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশকাল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু 'সাজি' নামে যে গ্রন্থে গল্পটি অন্তর্ভূর্ত হয়েছিল, সেটি ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় আমি অনেকের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছি। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সিংহ এই গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত আগাগোড়া যুক্ত। সম্পাদনা সংক্রান্ত বিষয়ে নিরন্তর সহায়তা করেছেন শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীসমর বসু। এঁদের নিষ্ঠা এবং প্রীতি আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত, শ্রীমতী মীনাক্ষী দত্ত, শ্রীঅমল দাশগুপ্ত, শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর পত্রী, শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকের কাছেও আমার ঋণ অসামান্য। গ্রন্থ এবং অনুলিপির ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরাও আমার ধন্যবাদার্হ।

রবীন্দ্রনাথের গল্প পুনর্মুদ্রণের অনুমতি 'বিশ্বভারতী'র সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁদের গল্প প্রকাশের অনুমতি দেবার জন্য অন্যান্য লেখকদেরও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সু. রা. চৌ

সূচীপত্র

"চার দিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে;
হাওয়ায় লাগে শীত-বসন্তের ছোঁওয়া—
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল।
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ॥ পয়লা নম্বর

আমি তামাকটা পর্যন্ত খাইনে। আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে, তারই আওতায় অন্য সকল নেশা একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে মরে গেছে। সে আমার বই-পড়ার নেশা। আমার জীবনের মন্ত্রটা ছিল এই—

যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।

যাদের বেড়াবার শখ বেশি অথচ পাথেয়ের অভাব তারা যেমন করে টাইম-টেবল্ পড়ে, অল্প বয়সে আর্থিক অসদ্ভাবের দিনে আমি তেমনি করে বইয়ের ক্যাটালগ পড়তুম। আমার দাদার এক খুড়শ্বশুর বাংলা বই বেরবা-মাত্র নির্বিচারে কিনতেন এবং তাঁর প্রধান অহংকার এই যে, সে বইয়ের একখানাও তাঁর আজ পর্যন্ত খোওয়া যায়নি। বোধ হয় বাংলা দেশে এমন সৌভাগ্য আর কারও ঘটে না। কারণ ধন বলো, আয়ু বলো, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বলো, সংসারে যতকিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের চেয়ে সেরা। এর থেকে বোঝা যাবে, দাদার খুড়শ্বশুরের বইয়ের আলমারির চাবি দাদার খুড়শাশুড়ীর পক্ষেও দুর্লভ ছিল। 'দীন যথা রাজেন্দ্রসংগমে' আমি যখন ছেলে-বেলায় দাদার সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যেতুম ঐ রুদ্ধদ্বার আলমারিগুলোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়েছি। তখন আমার চক্ষুর জিভে জল এসেছে। এই বললেই যথেষ্ট হবে, ছেলেবেলা থেকেই এত অসম্ভব রকম বেশি পড়েছি যে পাস করতে পারিনি। যতখানি কম পড়া পাস করার পক্ষে অত্যাবশ্যক তার সময় আমার ছিল না।

আমি ফেল-করা ছেলে বলে আমার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ঘড়ায় বিদ্যার তোলা জলে আমার স্নান নয়—স্রোতের জলে অবগাহনই আমার অভ্যাস। আজকাল আমার কাছে অনেক বি-এ, এম-এ, এসে থাকে;

তারা যতই আধুনিক হোক, আজও তারা ভিক্টোরীয় যুগের নজরবন্দী হয়ে বসে আছে। তাদের বিদ্যার জগৎ টলেমির পৃথিবীর মতো আঠারো-উনিশ শতাব্দীর সঙ্গে একেবারে যেন ইস্ক্রু দিয়ে আঁটা ; বাংলাদেশের ছাত্রের দল পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাকেই যেন চিরকাল প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। তাদের মানস-রথযাত্রার গাড়িখানা বহু কষ্টে মিল বেন্থাম পেরিয়ে কার্লাইল-রাস্কিনে এসে কাত হয়ে পড়েছে। মাস্টার-মশায়ের বুলির বেড়ার বাইরে তারা সাহস করে হাওয়া খেতে বেরোয় না।

কিন্তু, আমরা যে দেশের সাহিত্যকে খোঁটার মতো করে মনটাকে বেঁধে রেখে জাওর কাটাচ্ছি সে দেশে সাহিত্যটা তো স্থাণু নয়—সেটা সেখানকার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। সেই প্রাণটা আমার না থাকতে পারে, কিন্তু সেই চলাটা আমি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজের চেষ্টায় ফরাসী, জর্মান, ইটালিয়ন শিখে নিলুম ; অল্প দিন হল রাশিয়ান শিখতে শুরু করেছিলুম। আধুনিকতার যে এক্‌স্‌প্রেস গাড়িটা ঘণ্টায় ষাট মাইলের চেয়ে বেগে ছুটে চলেছে, আমি তারই টিকিট কিনেছি। তাই আমি হাক্‌স্‌লি-ডারুয়িনে এসেও ঠেকে যাইনি, টেনিসনকেও বিচার করতে ডরাইনে, এমন-কি, ইব্‌সেন-মেটার্‌লিঙ্কের নামের নৌকা ধরে আমাদের মাসিক সাহিত্যে সস্তা খ্যাতির বাঁধা কারবার চালাতে আমার সংকোচ বোধ হয়।

আমাকেও কোনোদিন একদল মানুষ সন্ধান করে চিনে নেবে, এ আমার আশার অতীত ছিল। আমি দেখেছি, বাংলাদেশে এমন ছেলেও দু-চারটে মেলে যারা কলেজও ছাড়ে না, অথচ কলেজের বাইরে সরস্বতীর যে বীণা বাজে তার ডাকেও উতলা হয়ে ওঠে। তারাই ক্রমে ক্রমে দুটি-একটি করে আমার ঘরে এসে জুটতে লাগল।

এই আমার এক দ্বিতীয় নেশা ধরল—বকুনি। ভদ্রভাষায় তাকে আলোচনা বলা যেতে পারে। দেশের চারি দিকে অসাময়িক সাহিত্যে যে সমস্ত কথাবার্তা শুনি তা এক দিকে এত কাঁচা, অন্যদিকে এত পুরনো যে মাঝে মাঝে তার হাঁফ-ধরানো ভাপ্‌সা গুমোটটাকে উদার চিন্তার খোলা হাওয়ায় কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ লিখতে কুঁড়েমি আসে। তাই মন দিয়ে কথা শোনে এমন লোকের নাগাল পেলে বেঁচে যাই।

দল আমার বাড়তে লাগল। আমি থাকতুম আমাদের গলির দ্বিতীয় নম্বর বাড়িতে, এদিকে আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈতচরণ, তাই আমাদের দলের নাম

হয়ে গিয়েছিল দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়। আমাদের এই সম্প্রদায়ের কারও সময় অসময়ের জ্ঞান ছিল না। কেউ-বা পাঞ্চ-করা ট্রামের টিকিট দিয়ে পত্র-চিহ্নিত একখানা নূতন-প্রকাশিত ইংরেজি বই হাতে করে সকালে এসে উপস্থিত—তর্ক করতে করতে একটা বেজে যায়, তবু তর্ক শেষ হয় না। কেউ-বা সন্থ কলেজের নোট-নেওয়া খাতাখানা নিয়ে বিকেলে এসে হাজির, রাত যখন দুটো তখনো ওঠবার নাম করে না। আমি প্রায় তাদের খেতে বলি। কারণ, দেখেছি, সাহিত্যচর্চা যারা করে তাদের রসজ্ঞতার শক্তি কেবল মস্তিষ্কে নয়, রসনাতেও খুব প্রবল। কিন্তু যাঁর ভরসায় এই সমস্ত ক্ষুধিতদের যখন-তখন খেতে বলি তাঁর অবস্থা যে কী হয় সেটাকে আমি তুচ্ছ বলেই বরাবর মনে করে আসতুম। সংসারে ভাবের ও জ্ঞানের যে-সকল বড়ো বড়ো কুলালচক্র ঘুরছে, যাতে মানব সভ্যতা কতক-বা তৈরি হয়ে আগুনের পোড় খেয়ে শক্ত হয়ে উঠছে, কতক-বা কাঁচা থাকতে থাকতেই ভেঙে ভেঙে পড়ছে, তার কাছে ঘরকন্নার নড়াচড়া এবং রান্নাঘরের চুলোর আগুন কি চোখে পড়ে।

ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গি ভবই জানেন, এমন কথা কাব্যে পড়েছি। কিন্তু ভবের তিন চক্ষু; আমার একজোড়া মাত্র তারও দৃষ্টিশক্তি বই পড়ে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুতরাং, অসময়ে ভোজের আয়োজন করতে বললে আমার স্ত্রীর ভ্রূচাপে কি রকম চাপল্য উপস্থিত হত তা আমার নজরে পড়ত না। ক্রমে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ঘরে অসময়ই সময় এবং অনিয়মই নিয়ম। আমার সংসারের ঘড়ি তাল-কানা এবং আমার গৃহস্থালির কোটরে কোটরে ঊনপঞ্চাশ পবনের বাসা। আমার যা-কিছু অর্থ-সামর্থ্য তার একটিমাত্র খোলা ড্রেন ছিল, সে হচ্ছে বই-কেনার দিকে; সংসারের অন্য প্রয়োজন হ্যাংলা কুকুরের মতো এই আমার শখের বিলিতি কুকুরের উচ্ছিষ্ট চেটে ও শুঁকে কেমন করে যে বেঁচে ছিল তার রহস্য আমার চেয়ে আমার স্ত্রী বেশি জানতেন।

নানা জ্ঞানের বিষয়ে কথা কওয়া আমার মতো লোকের পক্ষে নিতান্ত দরকার। বিদ্যা জাহির করবার জন্যে নয়, পরের উপকার করবার জন্যেও নয়; ওটা হচ্ছে কথা কয়ে কয়ে চিন্তা করা, জ্ঞান হজম করবার একটা ব্যায়াম-প্রণালী। আমি যদি লেখক হতুম, কিংবা অধ্যাপক হতুম, তা হলে বকুনি আমার পক্ষে বাহুল্য হত। যাদের বাঁধা খাটুনি আছে খাওয়া হজম করবার জন্যে তাদের উপায় খুঁজতে হয় না—যারা ঘরে বসে খায় তাদের অন্তত ছাতের ওপর হন্ হন্ করে পায়চারি করা দরকার। আমার সেই দশা। তাই যখন আমার

দ্বৈত দলটি জমেনি তখন একমাত্র দ্বৈত ছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি আমার এই মানসিক পরিপাকের সশব্দ প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল নিঃশব্দে বহন করেছেন। যদিচ তিনি পরতেন মিলের শাড়ি এবং তাঁর গয়নার সোনা খাঁটি এবং নিরেট ছিল না, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে যে আলাপ শুনতেন, সৌজাত্য বিদ্যাই (Eugenics) বলো, মেণ্ডেল-তত্ত্বই বলো, আর গাণিতিক যুক্তিশাস্ত্রই বলো, তার মধ্যে সস্তা কিংবা ভেজাল-দেওয়া কিছুই ছিল না। আমার দলবৃদ্ধির পর হতে এই আলাপ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে জন্যে তাঁর কোনো নালিশ কোনোদিন শুনিনি।

আমার স্ত্রীর নাম অনিলা। ঐ শব্দটার মানে কী তা আমি জানিনে, আমার শ্বশুরও যে জানতেন তা নয়। শব্দটা শুনতে মিষ্ট এবং হঠাৎ মনে হয়, ওর একটা কোনো মানে আছে। অভিধানে যাই বলুক, নামটার আসল মানে—আমার স্ত্রী তাঁর বাপের আদরের মেয়ে। আমার শাশুড়ী যখন আড়াই বছরের একটি ছেলে রেখে মারা যান তখন সেই ছোট ছেলেকে যত্ন করবার মনোরম উপায় স্বরূপে আমার শ্বশুর আর একটি বিবাহ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে কি রকম সফল হয়েছিল তা এই বললেই বোঝা যাবে যে, তাঁর মৃত্যুর দু-দিন আগে তিনি অনিলার হাত ধরে বললেন, "মা, আমি তো যাচ্ছি, এখন সরোজের কথা ভাববার জন্যে তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।" তাঁর স্ত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের জন্যে কী ব্যবস্থা করলেন তা আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু অনিলার হাতে গোপনে তিনি তাঁর জমানো টাকা প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে গেলেন। বললেন, "এ টাকা সুদে খাটাবার দরকার নেই —নগদ খরচ করে এর থেকে তুমি সরোজের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ো।"

আমি এই ঘটনায় কিছু আশ্চর্য হয়েছিলুম। আমার শ্বশুর কেবল বুদ্ধিমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন যাকে বলে বিজ্ঞ। অর্থাৎ, ঝোঁকের মাথায় কিছুই করতেন না, হিসেব করে চলতেন। তাই তাঁর ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার ভার যদি কারও ওপর তাঁর দেওয়া উচিত ছিল সেটা আমার ওপর, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, তাঁর মেয়ে তাঁর জামাইয়ের চেয়ে যোগ্য, এমন ধারণা যে তাঁর কী করে হল তা তো বলতে পারিনে। অথচ টাকাকড়ি সম্বন্ধে তিনি যদি আমাকে খুব খাঁটি বলে না জানতেন তা হলে আমার স্ত্রীর হাতে এত টাকা নগদ দিতে পারতেন না।

আসলে, তিনি ছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের ফিলিস্‌টাইন, আমাকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারেননি।

মনে মনে রাগ করে আমি প্রথমটা ভেবেছিলুম, এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কব না। কথা কইওনি। বিশ্বাস ছিল কথা অনিলাকেই প্রথম কইতে হবে, এ সম্বন্ধে আমার শরণাপন্ন না হয়ে তার উপায় নেই। কিন্তু অনিলা যখন আমার কাছে কোনো পরামর্শ নিতে এল না তখন মনে করলুম, ও বুঝি সাহস করছে না। শেষে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম, "সরোজের পড়াশুনোর কী করছো?" অনিলা বললে, "মাস্টার রেখেছি, ইস্কুলেও যাচ্ছে।" আমি আভাস দিলুম, সরোজকে শেখাবার ভার আমি নিজেই নিতে রাজী আছি। আজকাল বিদ্যাশিক্ষার যে সকল নূতন প্রণালী বেরিয়েছে তার কতক কতক ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। অনিলা হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না। এতদিন পরে আমার প্রথম সন্দেহ হল, অনিলা আমাকে শ্রদ্ধা করে না। আমি কলেজে পাস করিনি, সেইজন্য সম্ভবত ও মনে করে, পড়াশুনো সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার ক্ষমতা এবং অধিকার আমার নেই। 'এতদিন ওকে সৌজাত্য অভিব্যক্তিবাদ এবং রেডিও-চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যা কিছু বলেছি নিশ্চয়ই অনিলা তার মূল্য কিছুই বোঝেনি। ও হয়তো মনে করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেও এর চেয়ে বেশি জানে। কেননা মাস্টারের হাতের কান-মলার প্যাঁচে-প্যাঁচে বিদ্যেগুলো আঁট হয়ে তাদের মনের মধ্যে বসে গেছে। রাগ করে মনে মনে বললুম, মেয়েদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবার আশা সে যেন ছাড়ে বিদ্যাবুদ্ধিই যার প্রধান সম্পদ।

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবন-নাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়। আমি যখন আমার বৈতদের নিয়ে বের্গসঁর তত্ত্বজ্ঞান ও ইব্‌সেনের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করছি তখন মনে করেছিলুম, অনিলার জীবন যজ্ঞবেদীতে কোনো আগুনই বুঝি জ্বলেনি। কিন্তু আজকে যখন সেই অতীতের দিকে পিছন ফিরে দেখি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই, যে সৃষ্টিকর্তা আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, জীবনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন, অনিলার মর্মস্থলে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। সেখানে একটি ছোট ভাই, একটি দিদি এবং একটি বিমাতার সমাবেশে নিয়তই একটা ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা চলছিল। পুরাণের বাসুকী যে পৌরাণিক পৃথিবীকে ধরে আছে সে পৃথিবী স্থির। কিন্তু সংসারে যে মেয়েকে বেদনার পৃথিবী বহন

করতে হয় তার সে পৃথিবী মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে তৈরি হয়ে উঠছে। সেই চলতি ব্যথার ভার বুকে নিয়ে যাকে ঘরকন্নার খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন চলতে হয় তার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ছাড়া কে সম্পূর্ণ বুঝবে। অন্তত, আমি তো কিছুই বুঝিনি। কত উদ্‌বেগ, কত অপমানিত প্রয়াস, পীড়িত স্নেহের কত অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা, আমার এত কাছে নিঃশব্দতার অন্তরালে মথিত হয়ে উঠেছিল আমি তা জানিইনি। আমি জানতুম, যেদিন দ্বৈতদলের ভোজের বার উপস্থিত হত সেইদিনকার উদ্যোগ-পর্বই অনিলার জীবনের প্রধান পর্ব। আজ বেশ বুঝতে পারছি, পরম ব্যথার ভিতর দিয়েই এ সংসারে এই ছোট ভাইটিই দিদির সবচেয়ে অন্তরতম হয়ে উঠেছিল। সরোজকে মানুষ করে তোলা সম্বন্ধে আমার পরামর্শ ও সহায়তা এরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলে উপেক্ষা করাতে আমি ওদিকটাতে একেবারে তাকাইনি, তার যে কিরকম চলছে সে কথা কোনোদিন জিজ্ঞাসাও করিনি।

ইতিমধ্যে আমাদের গলির পয়লা নম্বর বাড়িতে লোক এল। এ বাড়িটি সে কালের বিখ্যাত ধনী মহাজন উদ্ধব বড়ালের আমলে তৈরি। তারপর দুই পুরুষের মধ্যে সে বংশের ধনজন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে, দুটি একটি বিধবা বাকি আছে। তারা এখানে থাকে না, তাই বাড়িটা পোড়ো অবস্থাতেই আছে। মাঝে মাঝে বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে এ বাড়ি কেউ কেউ অল্প দিনের জন্যে ভাড়া নিয়ে থাকে, বাকি সময়টা এত বড়ো বাড়ির ভাড়াটে প্রায় জোটে না। এবারে এলেন—মনে করো, তাঁর নাম রাজা সিতাংশুমৌলি—এবং ধরে নেওয়া যাক্ তিনি নরোত্তমপুরের জমিদার।

আমার বাড়ির ঠিক পাশেই অকস্মাৎ এত বড়ো একটা আবির্ভাব আমি হয়তো জানতেই পারতুম না। কারণ কর্ণ যেমন একটি সহজ কবচ গায়ে দিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন আমারও তেমনি একটি বিধিদত্ত সহজ কবচ ছিল। সেটি হচ্ছে আমার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতা। আমার এ বর্মটি খুব মজবুত ও মোটা। অতএব সচরাচর পৃথিবীতে চারি দিকে যে সকল ঠেলাঠেলি গোলমাল গালমন্দ চলতে থাকে তার থেকে আত্মরক্ষা করবার উপকরণ আমার ছিল।

কিন্তু আধুনিক কালের বড়োমানুষেরা স্বাভাবিক উৎপাতের চেয়ে বেশি, তারা অস্বাভাবিক উৎপাত ; দু-হাত, দু-পা, এক মুণ্ড যাদের আছে তারা হল মানুষ ; যাদের হঠাৎ কতকগুলো হাত-পা মাথামুণ্ড বেড়ে গেছে তারা হল

দৈত্য। অহরহ দুদ্দাড় শব্দে তারা আপনার সীমাকে ভাঙতে থাকে এবং আপন বাহুল্য দিয়ে স্বর্গ-মর্ত্যকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তাদের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অসম্ভব। যাদের 'পরে মন দেবার কোনোই প্রয়োজন নেই অথচ মন না দিয়ে থাকবারও জো নেই তারাই হচ্ছে জগতের অস্বাস্থ্য, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত তাদের ভয় করেন।

মনে বুঝলুম, সিতাংশুমৌলি সেই দলের মানুষ। একা একজন যে এত বেজায় অতিরিক্ত হতে পারে তা আমি পূর্বে জানতুম না। গাড়ি-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে সে যেন দশ-মুণ্ড বিশ-হাতের পালা জমিয়েছে। কাজেই তার জ্বালায় আমার সারস্বত স্বর্গলোকটির বেড়া রোজ ভাঙতে লাগল।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাদের গলির মোড়ে। এ গলিটার প্রধান গুণ ছিল এই যে, আমার মতো আনমনা লোক সামনের দিকে না তাকিয়ে, পিঠের দিকে মন না দিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেও এখানে নিরাপদে বিচরণ করতে পারে। এমন-কি, এখানে সেই পথ-চলতি অবস্থায় মেরেডিথের গল্প, ব্রাউনিঙের কাব্য অথবা আমাদের কোনো আধুনিক বাঙালী কবির রচনা সম্বন্ধে মনে বিতর্ক করেও অপঘাত-মৃত্যু বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু সেদিন খামকা একটা প্রচণ্ড 'হেইয়ো' গর্জন শুনে পিঠের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা খোলা ব্রুহাম গাড়ির প্রকাণ্ড একজোড়া লাল ঘোড়া আমার পিঠের উপর পড়ে আর কি! যাঁর গাড়ি তিনি স্বয়ং হাঁকাচ্ছেন, পাশে তাঁর কোচম্যান বসে। বাবু সবলে দুই হাতে রাশ টেনে ধরেছেন। আমি কোনোমতে সেই সংকীর্ণ গলির পার্শ্ববর্তী একটা তামাকের দোকানের হাঁটু আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করলুম। দেখলুম, আমার উপর বাবু ক্রুদ্ধ! কেননা, যিনি অসতর্ক ভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারেন না। এর কারণটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পদাতিকের দুটি মাত্র পা, সে হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ। আর যে ব্যক্তি জুড়ি হাঁকিয়ে ছোটে তার আট পা; সে হল দৈত্য। তার এই অস্বাভাবিক বাহুল্যের দ্বারা জগতে সে উৎপাতের সৃষ্টি করে। দুই-পা-ওয়ালা মানুষের বিধাতা এই আট পা-ওয়ালা আকস্মিকটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

স্বভাবের স্বাস্থ্যকর নিয়মে এই অশ্বরথ ও সারথি সবাইকেই যথাসময়ে ভুলে যেতুম। কারণ, এই পরমাশ্চর্য জগতে এরা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যে পরিমাণ গোলমাল করবার স্বাভাবিক বরাদ্দ

আছে এঁরা তার চেয়ে ঢের বেশি জবরদখল করে বসে আছেন। এইজন্যে যদিচ ইচ্ছা করলেই আমরা তিন-নম্বর প্রতিবেশীকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু আমার এই পয়লা-নম্বরের প্রতিবেশীকে এক মুহূর্ত আমার ভুলে থাকা শক্ত। রাত্রে তাঁর আট-দশটা ঘোড়া আস্তাবলের কাঠের মেঝের ওপর বিনা সঙ্গীতের যে তাল দিতে থাকে তাতে আমার ঘুম সর্বাঙ্গে টোল খেয়ে তুবড়ে যায়। তার উপর ভোরবেলায় সেই আট-দশটা ঘোড়াকে আট-দশটা সহিস যখন সশব্দে মলতে থাকে তখন সৌজন্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে তাঁর উড়ে বেহারা, ভোজপুরী বেহারা, তাঁর পাঁড়ে তেওয়ারী দরোয়ানের দল কেউই স্বরসংযম কিংবা মিতভাষিতার পক্ষপাতী নয়। তাই বলছিলুম, ব্যক্তিটি একটিমাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ। সেটা তার নিজের পক্ষে অশান্তিকর না হতে পারে। নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো। স্বর্গের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরিমাণসুষমা, অপরপক্ষে একদা যে দানবের দ্বারা স্বর্গের নন্দনশোভা নষ্ট হয়েছিল তাদের প্রধান লক্ষণ ছিল অপরিমিতি। আজ সেই অপরিমিত দানবটাই টাকার থলিকে বাহন করে মানবের লোকালয়কে আক্রমণ করেছে। তাকে যদি বা পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে চাই সে চার ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়ে—এবং উপরন্তু চোখ রাঙায়।

সেদিন বিকেলে আমার দ্বৈতগুলি তখনো কেউ আসেনি। আমি বসে বসে জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছিলুম, এমন সময়ে আমাদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে দরজা পেরিয়ে আমার প্রতিবেশীর একটি স্মারকলিপি ঝনঝন শব্দে আমার শার্সির উপর এসে পড়ল। সেটা একটি টেনিসের গোলা। চন্দ্রমার আকর্ষণ, পৃথিবীর নাড়ির চাঞ্চল্য, বিশ্বগীতিকাব্যের চিরন্তন ছন্দতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকে ছাড়িয়ে মনে পড়ল আমার একজন প্রতিবেশী আছেন এবং অত্যন্ত বেশি করে আছেন, আমার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অথচ নিরতিশয় অবশ্যম্ভাবী। পরক্ষণেই দেখি, আমার বুড়ো অযোধ্যা বেহারাটা দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। এই আমার একমাত্র অনুচর। একে ডেকে পাইনে, হেঁকে বিচলিত করতে পারিনে—দুর্লভতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, একা মানুষ কিন্তু কাজ বিস্তর। আজ দেখি, বিনা তাগিদেই গোলা

কুড়িয়ে সে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। খবর পেলুম, প্রত্যেকবার গোলা কুড়িয়ে দেবার জন্যে সে চার পয়সা করে মজুরি পায়।

দেখলুম, কেবল যে আমার শার্সি ভাঙছে, আমার শান্তি ভাঙছে, তা নয়, আমার অনুচর-পরিচরদের মন ভাঙতে লাগল। আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে অযোধ্যা বেহারার অবজ্ঞা প্রত্যহ বেড়ে উঠছে সেটা তেমন আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমার দ্বৈতসম্প্রদায়ের প্রধান সর্দার কানাইলালের মনটাও দেখছি পাশের বাড়ির প্রতি উৎসুক হয়ে উঠল। আমার উপর তার যে নিষ্ঠা ছিল সেটা উপকরণমূলক নয়, অন্তঃকরণমূলক, এই জেনে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম ; এমন সময় একদিন লক্ষ্য করে দেখলুম, সে আমার অযোধ্যাকে অতিক্রম করে টেনিসের পলাতক গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পাশের বাড়ির দিকে ছুটছে। বুঝলুম, এই উপলক্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে চায়। সন্দেহ হল, ওর মনের ভাবটা ঠিক ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মতো নয়—শুধু অমৃতে ওর পেট ভরবে না।

আমি পয়লা নম্বরের বাবুগিরিকে খুব তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতুম। বলতুম, সাজসজ্জা দিয়ে মনের শূন্যতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিক যেন রঙিন মেঘ দিয়ে আকাশ মুড়ি দেবার দুরাশা। একটু হাওয়াতেই মেঘ যায় সরে, আকাশের ফাঁকা বেরিয়ে পড়ে। কানাইলাল একদিন প্রতিবাদ করে বললে, মানুষটা একেবারে নিছক ফাঁপা নয়, বি-এ পাস করেছে। কানাইলাল স্বয়ং বি-এ পাস করা, এজন্য ঐ ডিগ্রীটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলুম না।

পয়লা নম্বরের প্রধান গুণগুলি সশব্দ। তিন তিনটে যন্ত্র বাজাতে পারেন—কর্নেট, এসরাজ এবং চেলো। যখন তখন তার পরিচয় পাই। সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে আমি নিজেকে সুরাচার্য বলে অভিমান করিনে। কিন্তু আমার মতে গানটা উচ্চ-অঙ্গের বিদ্যা নয়। ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল তখনই গানের উৎপত্তি—তখন মানুষ চিন্তা করতে, পারত না বলে চিৎকার করত। আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালবাসে। কিন্তু দেখতে পেলুম, আমার দ্বৈতদলের মধ্যে অন্তত চারজন ছেলে আছে, পয়লা নম্বরের চেলো বেজে উঠলেই যারা গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্রের নব্যতম অধ্যায়েও মন দিতে পারে না।

আমার দলের মধ্যে অনেক ছেলে যখন পয়লা নম্বরের দিকে হেলেছে এমন সময়ে অনিলা একদিন আমাকে বললে, "পাশের বাড়িতে একটা উৎপাত

জুটেছে, এখন আমরা এখান থেকে অন্য কোনো বাসায় গেলেই তো ভালো হয়।"

বড়ো খুশি হলুম। আমার দলের লোকদের বললুম, "দেখেছো মেয়েদের কেমন একটা সহজ বোধ আছে? তাই যে-সব জিনিস প্রমাণযোগে বোঝা যায় তা ওরা বুঝতেই পারে না, কিন্তু যে-সব জিনিসের কোনো প্রমাণ নেই তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হয় না।"

কানাইলাল হেসে বললে, "যেমন পেঁচো, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলোর মাহাত্ম্য, পতিদেবতা-পূজার পুণ্যফল ইত্যাদি ইত্যাদি।"

আমি বললুম, "না হে, এই দেখো না, আমরা এই পয়লা নম্বরের জাঁকজমক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কিন্তু অনিলা ওর সাজ-সজ্জায় ভোলেনি।"

অনিলা দু-তিনবার বাড়ি-বদলের কথা বললে। আমার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কলকাতার গলিতে গলিতে বাসা খুঁজে বেড়াবার মতো অধ্যবসায় আমার ছিল না। অবশেষে একদিন বিকেলবেলায় দেখা গেল, কানাইলাল এবং সতীশ পয়লা নম্বরে টেনিস খেলছে। তার পরে জনশ্রুতি শোনা গেল, যতি আর হরেন পয়লা নম্বরে সঙ্গীতের মজলিসে একজন বক্স-হারমোনিয়ম বাজায় এবং একজন বাঁয়া তবলায় সঙ্গত করে, আর অরুণ নাকি সেখানে কমিক গান করে খুব প্রতিপত্তি লাভ করেছে। এদের আমি পাঁচ-ছ বছর ধরে জানি, কিন্তু এদের যে এসব গুণ ছিল তা আমি সন্দেহও করিনি। বিশেষত আমি জানতুম, অরুণের প্রধান শখের বিষয় হচ্ছে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। যে সে কমিক গানে ওস্তাদ তা কি করে বুঝব।

সত্য কথা বলি, এই পয়লা নম্বরকে মুখে যতই অবজ্ঞা করি মনে মনে ঈর্ষা করেছিলুম। আমি চিন্তা করতে পারি, বিচার করতে পারি, সকল জিনিসের সার গ্রহণ করতে পারি, বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান করতে পারি, মানসিক সম্পদে সিতাংশুমৌলিকে আমার সমকক্ষ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তবু ঐ মানুষটিকে আমি ঈর্ষা করেছি। কেন সেকথা যদি খুলে বলি তো লোকে হাসবে। সকালবেলায় সিতাংশু একটা দুরন্ত ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত—কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রাশ বাগিয়ে এই জন্তুটাকে সে সংযত-করত। এই দৃশ্যটি রোজই আমি দেখতুম আর ভাবতুম, 'আহা আমি যদি এইরকম অনায়াসে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে পারতুম!' পটুত্ব বলে যে জিনিসটি আমার একেবারেই নেই সেইটের 'পরে আমার ভারী একটা গোপন লোভ ছিল। আমি গানের

স্থর ভালো বুঝিনে, কিন্তু জানলা থেকে কতদিন গোপনে দেখেছি সিতাংশু এসরাজ বাজাচ্ছে—ঐ যন্ত্রটার 'পরে তার একটি বাধাহীন সৌন্দর্যময় প্রভাব আমার কাছে আশ্চর্য মনোহর বোধ হত। আমার মনে হত যন্ত্রটা যেন প্রেয়সী-নারীর মতো ওকে ভালবাসে—সে আপনার সমস্ত স্থর ওকে ইচ্ছা করে বিকিয়ে দিয়েছে। জিনিসপত্র বাড়ি-ঘর জন্তু-মানুষ সকলের 'পরেই সিতাংশুর এই সহজ প্রভাব ভারী একটি শ্রী বিস্তার করত। এই জিনিসটি অনির্বচনীয়, আমি একে নিতান্ত দুর্লভ না মনে করে থাকতে পারতুম না। আমি মনে করতুম, পৃথিবীতে কোনো কিছু প্রার্থনা করা এ লোকটির পক্ষে অনাবশ্যক, সবই আপনি এর কাছে এসে পড়বে, এ ইচ্ছা করে যেখানে গিয়ে বসবে সেই-খানেই এর আসন পাতা।

তাই যখন একে একে আমার দ্বৈতগুলির অনেকেই পয়লা নম্বরে টেনিস খেলতে, কন্সার্ট বাজাতে লাগল, তখন স্থানত্যাগের দ্বারা এই লুব্ধদের উদ্ধার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলুম না। দালাল এসে খবর দিল, মনের মতো অন্য বাসা বরানগর-কাশীপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমি তাতে রাজী। সকাল তখন সাড়ে নটা। স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে বলতে গেলুম। তাঁকে ভাঁড়ার ঘরেও পেলুম না, রান্নাঘরেও না। দেখি শোবার ঘরে জানলার গরাদের উপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে পড়লেন। আমি বললুম, "পরশুই নতুন বাসায় যাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন, "আর দিন পনেরো সবুর করো।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন।"

অনিলা বললেন, "সরোজের পরীক্ষার ফল শীঘ্র বেরোবে—তার জন্য মনটা উদ্বিগ্ন আছে, এ কয়দিন আর নড়াচড়া করতে ভালো লাগছে না।"

অন্যান্য অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে ওই একটি বিষয় আছে যা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করিনে। স্থতরাং আপাতত কিছুদিন বাড়িবদল মুলতুবী রইল। ইতিমধ্যে খবর পেলুম, সিতাংশু শীঘ্রই দক্ষিণ-ভারতে বেড়াতে বেরোবে, স্থতরাং দুই নম্বরের উপর থেকে মস্ত ছায়াটা সরে যাবে।

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ দৃষ্ট হয়ে ওঠে। কাল আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন; আজ ফিরে এসে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করলেন। তিনি জানেন, আজ রাত্রে আমার দ্বৈতদলের পূর্ণিমার ভোজ।

তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায়ে দরজায় ঘা দিলুম। প্রথমে সাড়া পাওয়া গেল না। ডাক দিলুম, "অনু!" খানিক বাদে অনিলা এসে দরজা খুলে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ রাত্রে রান্নার যোগাড় সব ঠিক আছে তো?"

সে কোনো জবাব না দিয়ে মাথা হেলিয়ে জানালে যে, আছে।

আমি বললুম, "তোমার হাতের তৈরি মাছের কচুরি আর বিলাতি আমড়ার চাটনি ওদের খুব ভালো লাগে, সেটা ভুলো না।"

এই বলে বাইরে এসেই দেখি কানাইলাল বসে আছে। আমি বললুম, "কানাই আজ তোমরা একটু সকাল-সকাল এসো।"

কানাই আশ্চর্য হয়ে বললে, "সে কী কথা! আজ আমাদের সভা হবে নাকি।"

আমি বললুম, "হবে বইকি। সমস্ত তৈরি আছে—ম্যাক্সিম গর্কির নতুন গল্পের বই, বের্গ্‌সঁর উপর রাসেলের সমালোচনা, মাছের কচুরি, এমন-কি আমড়ার চাটনি পর্যন্ত।"

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে বললে, "অদ্বৈতবাবু, আমি বলি আজ থাক।"

অবশেষে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, আমার শ্যালক সরোজ কাল বিকেল-বেলায় আত্মহত্যা করে মরেছে। পরীক্ষায় সে পাস হতে পারেনি, তাই নিয়ে বিমাতার কাছ থেকে খুব গঞ্জনা পেয়েছিল—সইতে না পেরে গলায় চাদর বেঁধে মরেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কোথা থেকে শুনলে?"

সে বললে, "পয়লা নম্বর থেকে।"

পয়লা নম্বর থেকে! বিবরণটা এই—সন্ধ্যার দিকে অনিলার কাছে যখন খবর এল তখন সে গাড়ি ডাকার অপেক্ষা না করে অযোধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে পথের মধ্যে থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল। অযোধ্যার কাছ থেকে রাত্রে সিতাংশুমৌলি এই খবর পেয়েই তখনি সেখানে গিয়ে পুলিসকে ঠাণ্ডা করে নিজে শ্মশানে উপস্থিত থেকে মৃতদেহের সৎকার করিয়ে দেন।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে তখনি অন্তঃপুরে গেলুম। মনে করেছিলুম, অনিলা বুঝি দরজা বন্ধ করে আবার তার শোবার ঘরের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এবারে গিয়ে দেখি, ভাঁড়ারের সামনের বারান্দায় বসে সে আমড়ার চাটনির আয়োজন করছে। যখন লক্ষ্য করে তার মুখ দেখলুম তখন বুঝলুম, এক রাত্রে তার

জীবনটা উলট-পালট হয়ে গেছে। আমি অভিযোগ করে বললুম, "আমাকে কিছু বলোনি কেন।"

সে তার বড়ো বড়ো চোখ তুলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালে—কোনো কথা কইলে না। আমি লজ্জায় অত্যন্ত ছোট হয়ে গেলুম। যদি অনিলা বলত, 'তোমাকে বলে লাভ কী' তা হলে আমার জবাব দেবার কিছুই থাকত না। জীবনের এই সব বিপ্লব—সংসারের সুখ-দুঃখ—নিয়ে কী করে যে ব্যবহার করতে হয়, আমি কি তার কিছুই জানি।

আমি বললুম, "অনিল, এসব রাখো, আজ আমাদের সভা হবে না।"

অনিলা আমড়ার খোসা ছাড়াবার দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, "কেন হবে না। খুব হবে। আমি এত করে সমস্ত আয়োজন করেছি, সে আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না।"

আমি বললুম, "আজ আমাদের সভার কাজ হওয়া অসম্ভব।"

সে বললে, "তোমাদের সভা না হয় না হবে, আজ আমার নিমন্ত্রণ।"

আমি মনে একটু আরাম পেলুম। ভাবলুম, অনিলের শোকটা তত বেশি কিছু নয়। মনে করলুম, সেই-যে এক সময়ে ওর সঙ্গে বড়ো বড়ো বিষয়ে কথা কইতুম তারই ফলে ওর মনটা অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে এসেছে। যদিচ সব কথা বোঝবার মতো শিক্ষা এবং শক্তি ওর ছিল না, কিন্তু তবু 'পার্সোনাল ম্যাগনেটিজম্' বলে একটা জিনিস আছে তো।

সন্ধ্যার সময় আমার দ্বৈতদলের দুই-চারজন কম পড়ে গেল। কানাই তো এলই না। পয়লা নম্বরে যারা টেনিসের দলে যোগ দিয়েছিল তারাও কেউ আসেনি। শুনলুম, কাল ভোরের গাড়িতে সিতাংশুমৌলি চলে যাচ্ছে, তাই এরা সেখানে বিদায়-ভোজ খেতে গেছে। এদিকে অনিলা আজ যে রকম ভোজের আয়োজন করেছিল এমন আর কোনোদিনই করেনি। এমন-কি, আমার মতো বেহিসাবী লোকেও একথা না মনে করে থাকতে পারেনি যে, খরচটা অতিরিক্ত করা হয়েছে।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া করে সভাভঙ্গ হতে রাত্রি একটা-দেড়টা হয়ে গেল। আমি ক্লান্ত হয়ে তখনি শুতে গেলুম। অনিলাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "শোবে না?"

সে বললে, "বাসনগুলো তুলতে হবে।"

পরের দিন যখন উঠলুম তখন বেলা প্রায় আটটা হবে। শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর যেখানে আমার চশমাটা খুলে রাখি সেখানে দেখি চশমা-চাপা

দেওয়া এক টুকরো কাগজ, তাতে অনিলের হাতের লেখাটি আছে—'আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খুঁজে পাবে না।'

কিছু বুঝতে পারলুম না। টিপাইয়ের উপরে একটা টিনের বাক্স—সেটা খুলে দেখি, তার মধ্যে অনিলার সমস্ত গয়না—এমন-কি, তার হাতের চুড়ি বালা পর্যন্ত, কেবল তার শাঁখা এবং হাতের নোয়া ছাড়া। একটা খোপের মধ্যে চাবির গোছা, অন্য অন্য খোপে কাগজের-মোড়ক করা কিছু টাকা সিকি দুয়ানি। অর্থাৎ মাসের খরচ বাঁচিয়ে অনিলের হাতে যা কিছু জমেছিল তার শেষ পয়সাটি পর্যন্ত রেখে গেছে। একটি খাতায় বাসন-কোসন জিনিসপত্রের ফর্দ এবং ধোবার বাড়িতে যে-সব কাপড় গেছে তার সব হিসাব। এই সঙ্গে গয়লাবাড়ির এবং মুদির দোকানের দেনার হিসাবও টোকা আছে, কেবল তার নিজের ঠিকানা নেই।

এইটুকু বুঝতে পারলুম, অনিল চলে গেছে। সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলুম—আমার শ্বশুরবাড়িতে খোঁজ নিলুম—কোথাও সে নেই। কোনো একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলে সে সম্বন্ধে কি রকম বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়, কোনোদিন আমি তার কিছুই ভেবে পাইনে। বুকের ভিতরটা হা হা করতে লাগল। হঠাৎ পয়লা-নম্বরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সে বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। দেউড়ির কাছে দরোয়ানজী গড়গড়ায় তামাক টানছে। রাজাবাবু ভোররাত্রে চলে গেছেন। মনটার মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠল। হঠাৎ বুঝতে পারলুম, আমি যখন একমনে নব্যতম ন্যায়ের আলোচনা করছিলুম তখন মানব-সমাজের পুরাতনতম একটি অন্যায় আমার ঘরে জাল বিস্তার করছিল। ফ্লোবেয়ার, টলস্টয়, টুর্গেনিভ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গল্পলিখিয়েদের বইয়ে যখন এই রকমের ঘটনার কথা পড়েছি তখন বড়ো আনন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তার তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করে দেখেছি। কিন্তু নিজের ঘরেই যে এটা এমন সুনিশ্চিত করে ঘটতে পারে তা কোনোদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নিয়ে আমি প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞানীর মতো সমস্ত ব্যাপারটাকে যথোচিত হালকা করে দেখবার চেষ্টা করলুম। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছিল সেইদিনকার কথাটা মনে করে শুষ্ক হাসি হাসলুম। মনে করলুম, মানুষ কত আকাঙ্ক্ষা, কত আয়োজন, কত আবেগের অপব্যয় করে থাকে। কত দিন, কত রাত্রি, কত বৎসর নিশ্চিন্ত মনে কেটে গেল, স্ত্রী বলে একটা সজীব পদার্থ নিশ্চয় আছে বলে চোখ বুজে ছিলুম; এমন সময় আজ হঠাৎ

চোখ খুলে দেখি বুদ্‌বুদ ফেটে গিয়েছে। গেছে যাক গে—কিন্তু জগতে সবই তো বুদ্‌বুদ নয়। যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করে টিকে রয়েছে এমন সব জিনিসকে আমি কি চিনতে শিখিনি।

কিন্তু দেখলুম হঠাৎ এই আঘাতে আমার মধ্যে নব্য-কালের জ্ঞানীটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, আর কোন্ আদিকালের প্রাণীটা জেগে উঠে ক্ষুধায় কেঁদে বেড়াতে লাগল। বারান্দার ছাতে পায়চারি করতে করতে, শূন্য বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে, শেষকালে, যেখানে জানলার কাছে কতদিন আমার স্ত্রীকে একলা চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি, একদিন আমার সেই শোবার ঘরে গিয়ে পাগলের মতো সমস্ত জিনিসপত্র ঘাঁটতে লাগলুম। অনিলের চুল বাঁধবার আয়নার দেরাজটা হঠাৎ টেনে খুলতেই রেশমের লাল ফিতেয় বাঁধা এক-তাড়া চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিগুলি পয়লা-নম্বর থেকে এসেছে। বুকটা জ্বলে উঠল। একবার মনে হল, সবগুলো পুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু যেখানে বড়ো বেদনা, সেইখানেই ভয়ংকর টান। এ চিঠিগুলো সমস্ত না পড়ে আমার থাকবার জো নেই।

এই চিঠিগুলি পঞ্চাশবার পড়েছি। প্রথম চিঠিখানা তিন-চার টুকরো করে ছেঁড়া। মনে হল পাঠিকা পড়েই সেটি ছিঁড়ে ফেলে তার পরে আবার যত্ন করে একখানা কাগজের উপরে গঁদ দিয়ে জুড়ে রেখেছে। সে চিঠিখানা এই—

'আমার এ চিঠি না পড়েই যদি তুমি ছিঁড়ে ফেলো তবু আমার দুঃখ নেই। আমার যা বলবার কথা তা আমাকে বলতেই হবে।

'আমি তোমাকে দেখেছি। এতদিন এই পৃথিবীতে চোখ মেলে বেড়াচ্ছি, কিন্তু দেখবার মতো দেখা আমার জীবনে এই বত্রিশ বছর বয়সে প্রথম ঘটল। চোখের উপরে ঘুমের পর্দা টানা ছিল ; তুমি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছো— আজ আমি নবজাগরণের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখলুম, যে তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের ধন সেই অনির্বচনীয় তোমাকে। আমার যা পাবার তা পেয়েছি, আর কিছু চাইনে, কেবল তোমার স্তব তোমাকে শোনাতে চাই। যদি আমি কবি হতুম তা হলে আমার এই স্তব চিঠিতে তোমাকে লেখবার দরকার হত না, ছন্দের ভিতর দিয়ে সমস্ত জগতের কণ্ঠে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে যেতুম। আমার এ চিঠির কোনো উত্তর দেবে না জানি—কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারি, এমন সন্দেহমাত্র মনে না রেখে আমার পূজা নীরবে গ্রহণ কোরো। আমার এই

শ্রদ্ধাকে যদি তুমি শ্রদ্ধা করতে পারো তাতে তোমারও ভালো হবে। আমি কে সে কথা লেখবার দরকার নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই তা তোমার মনের কাছে গোপন থাকবে না।'

এমন পঁচিশখানা চিঠি। এর কোনো চিঠির উত্তর যে অনিলের কাছ থেকে গিয়েছিল, এ চিঠিগুলির মধ্যে তার কোনো নিদর্শন নেই। যদি যেত তা হলে তখনি বেসুর বেজে উঠত—কিংবা তা হলে সোনার কাঠির জাদু একেবারে ভেঙে স্তবগান নীরব হত।

কিন্তু এ কী আশ্চর্য! সিতাংশু যাকে ক্ষণকালের ফাঁক দিয়ে দেখেছে আজ আট বছরের ঘনিষ্ঠতার পর এই পরের চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে তাকে প্রথম দেখলুম। আমার চোখের উপরকার ঘুমের পর্দা কত মোটা পর্দা না জানি! পুরোহিতের হাত থেকে অনিলাকে আমি পেয়েছিলুম, কিন্তু তার বিধাতার হাত থেকে তাকে গ্রহণ করবার মূল্য আমি কিছুই দিইনি। আমি আমার দ্বৈতদলকে এবং নব্যন্যায়কে তার চেয়ে অনেক বড়ো করে দেখেছি। সুতরাং যাকে আমি কোনোদিনই দেখিনি, এক নিমেষের জন্যও পাইনি, তাকে আর কেউ যদি আপনার জীবন উৎসর্গ করে পেয়ে থাকে তবে কী বলে কার কাছে আমার ক্ষতির নালিশ করব!

শেষ চিঠিখানা এই—

'বাইরে থেকে আমি তোমার কিছুই জানিনে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আমি দেখেছি তোমার বেদনা। এইখানে বড়ো কঠিন আমার পরীক্ষা। আমার এই পুরুষের বাহু নিশ্চেষ্ট থাকতে চায় না। ইচ্ছা করে, স্বর্গমর্ত্যের সমস্ত শাসন বিদীর্ণ করে তোমাকে তোমার জীবনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ধার করে আনি। তার পরে এও মনে হয়, তোমার দুঃখই তোমার অন্তর্যামীর আসন। সেটি হরণ করবার অধিকার আমার নেই। কাল ভোরবেলা পর্যন্ত মেয়াদ নিয়েছি। এর মধ্যে যদি কোনো দৈববাণী আমার এই দ্বিধা মিটিয়ে দেয় তাহলে যা হয় একটা কিছু হবে। বাসনার প্রবল হাওয়ায় আমাদের পথ চলবার প্রদীপকে নিবিয়ে দেয়। তাই আমি মনকে শান্ত রাখব—একমনে এই মন্ত্র জপ করব যে, তোমার কল্যাণ হোক।'

বোঝা যাচ্ছে, দ্বিধা দূর হয়ে গেছে—দুজনার পথ এক হয়ে মিলেছে। মাঝের থেকে সিতাংশুর লেখা এই চিঠিগুলি আমারই চিঠি হয়ে উঠল—ওগুলি আজ আমারই প্রাণের স্তবমন্ত্র।

কত কাল চলে গেল, বই পড়তে আর ভালো লাগে না। অনিলকে একবার কোনোমতে দেখবার জন্যে মনের মধ্যে এমন বেদনা উপস্থিত হল, কিছুতেই স্থির থাকতে পারলুম না। খবর নিয়ে জানলুম, সিতাংশু তখন মসুরি-পাহাড়ে।

সেখানে গিয়ে সিতাংশুকে অনেকবার পথে বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু তার সঙ্গে তো অনিলকে দেখিনি। ভয় হল পাছে তাকে অপমান করে ত্যাগ করে থাকে। আমি থাকতে না পেরে একেবারে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। সব কথা বিস্তারিত করে লেখবার দরকার নেই। সিতাংশু বললে, "আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে কেবল একটিমাত্র চিঠি পেয়েছি—সেটি এই দেখুন।"

এই বলে সিতাংশু তার পকেট থেকে ছোট এনামেল করা সোনার কার্ড কেস খুলে তার ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দিলে। তাতে লেখা আছে, "আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো না। করলেও খোঁজ পাবে না।"

সেই অক্ষর, সেই লেখা, সেই তারিখ এবং যে নীলরঙের চিঠির কাগজের অর্ধেকখানা আমার কাছে এই টুকরোটি তারই বাকি অর্ধেক।

জলধর সেন (১৮৬১—১৯৩৮) ॥ এক পেয়ালা চা

○○ এক ○○
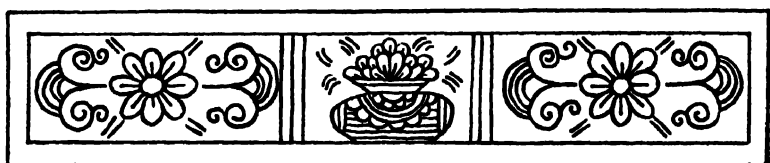
বেশ ছিলাম আমি পাটনায়। বাবার কি ইচ্ছা হইল, তিনি বলিলেন, "না বিহারে আর থাকব না। পেনশন নিয়ে দেশে চলে যাব।"

আমি বলিলাম, "একটু তদ্‌বির করলেই আপনি আর এক বৎসর extension পেতে পারেন। আর এরই মধ্যে আমার এম-এ একজামিনটাও হয়ে যায়। তারপর বি-এল—সে কলকাতায় গিয়ে দেখা যাবে।"

বাবা বলিলেন, "না, না! আমার মন নিতান্তই উঠেছে; নইলে এত-কালের বাস তুলতে চাচ্ছি! এই বাঁকিপুরে—বলতে গেলে—তিন পুরুষ কাটালুম। এতদিন তো কিছুই মনে হয়নি। না—না, এখানকার বাস তুলে দেশে যাব। এখানে আর থাকব না।" বাবার জিদ দেখে আমি চুপ করে গেলাম।

এইখানে আমাদের একটু পরিচয় দিই। আমার পিতামহ ৺নীলকমল চাটুজ্যে—এই বাঁকিপুরে এসে প্রথম ওকালতি আরম্ভ করেন। সে মিউটিনির আগের কথা। শুনিয়াছি, পিতামহ যদি রোজগার করতেন একগুণ, তো খরচ করতেন তার তিনগুণ। সে সময় নাকি বিহার অঞ্চলে বাঙালীর মধ্যে অতবড়ো বাবু কেউ ছিল না, অতবড়ো খাইয়ে—অতবড়ো খাওয়াইয়েও কেউ ও অঞ্চলে ছিল না। বিহারীরা একবাক্যে বলত, "আরে বাবু তো নীলকমলবাবু—আউর সব বাবুয়া।"

সেই নীলকমল চাটুজ্যে মহাশয়ের পুত্র আমার পিতা শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। দাদামহাশয়ের নাকি ভারী ইচ্ছা ছিল যে, বাবাকে উকিল করেন; কিন্তু বাবা তাহাতে একবারে গররাজী। বাবা উর্দু, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় খুব লায়েক ছিলেন। সত্য-সত্যই তিনি উকিল হইলে

যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন। দাদামহাশয় যখন দেখিলেন যে বাবার উকিল হইবার মোটেই ইচ্ছা নাই, তখন তিনি বাবাকে কালেক্টরীর পেশকারিপদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন; আর সেই বৎসরই উত্তরপাড়ায় বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি বাবার বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহে এত ঘটা হইয়াছিল যে উত্তরপাড়া ও পাটনা—বাঁকিপুরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

এত বাবুগিরি, এত আমিরির পরিণাম যাহা হয়, তাহাই হইল। পিতামহ যখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন, তখন বাবা হিসাব করিয়া দেখিলেন পিতামহের ঋণের পরিমাণ আটত্রিশ হাজার টাকা। কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় ছিল না। পিতামহের অতবড়ো নাম-ডাক; তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য তো তিলকাঞ্চনে সম্পন্ন করা যাইতেই পারে না। বাবা স্থির করিলেন—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন—যাঁহা আটত্রিশ তাঁহা আটচল্লিশ। তখন দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া বাবা পিতামহের আদ্যকৃত্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন। পাটনার সকলে বলিল, "সরবেশর বাপকা বেটা।"

০০ দুই ০০

সেকালে পেশকারি চাকুরিতে বিলক্ষণ দু-পয়সা আয় থাকিলেও নীলকমল চাটুজ্যের ঠাট বজায় রাখিয়া মায় সুদ আটচল্লিশ হাজার টাকা শোধ করা বাবার মতো লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বাবা তখন বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিয়াছিলেন, বাঁকিপুরে, দারাগঞ্জে পিতামহ যে কয়েকখানি বাড়ি করিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। তাহাতেও যখন ঋণ শোধ হইল না, তখন পাটনার উপকণ্ঠস্থিত চল্লিশ বিঘার একটি সুন্দর ফলকর বাগান মাটির দরে বেচিয়া ফেলিলেন। থাকিবার মধ্যে রহিল আমাদের বাঁকিপুরের বসত বাড়িখানি আর বাবার পেশকারি চাকুরি। অন্য কেহ হইলে এই অবস্থা-বিপর্যয় সহ্য করিতে পারিতেন না; যে-স্থানে এত পদ-প্রসার, মান-সম্ভ্রম ছিল সে-স্থান ত্যাগ করিতেন। কিন্তু আমার পিতা সত্যসত্যই দেব-প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই অবস্থা-বিপর্যয় তাঁহাকে অধীর করিতে পারিল না। ভাগ্যের এই পরিবর্তন তিনি সহাস্যবদনে, অবনত মস্তকে বরণ করিয়া লইলেন। এ সকল আমার জন্মের পূর্বের কথা।

যে বৎসর আমার জন্ম হয়, বাবারও সেই বৎসর পদোন্নতি হয়—তিনি পাটনার কালেক্টরীর নায়েব-নাজির নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে বাবার

কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাগম হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চাল বদলায় নাই। তিনি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। আমিই বাবার একমাত্র সন্তান—পিতামাতার স্নেহের আদরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী। পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে আমার পাঠ আরম্ভ হয়। সেখান হইতেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হই। তখন আমাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠাইবার জন্য অনেকে পিতাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বংশের দুলাল, আদরের গোপাল, একমাত্র পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে পিতামাতার মন সরিল না; আমি পাটনা কলেজেই প্রবিষ্ট হইলাম।

সেই সময়ে আমার বিবাহের যে কত সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বাবা সে-সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা তাঁহার একদিনের একটি কথায় আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি একদিন মাতাঠাকুরানীকে বলিতেছিলেন, "দেখো গিন্নী! ছেলের লেখাপড়া শেষ না হইলে বিবাহ দিব না বলিয়া যে কথা বলি, তাহা সত্যিসত্যি আমার মনের কথা নয়। আসল কথা কি জানো গিন্নী, নীলকমল চাটুজ্যের পৌত্রের বিবাহ এই বাঁকিপুরে থেকে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।" সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, সেই প্রশান্ত, গম্ভীর হৃদয়ের মধ্যে অতীত গৌরবের, অতীত ঐশ্বর্যের কী জ্বালাময়ী স্মৃতি ঐ ব্রাহ্মণ-সন্তান নীরবে পোষণ করিতেছেন। আমি কি কোনোদিন তাঁহার এই হৃদয়ের জ্বালা দূর করিতে পারিব—কোনোও দিন কি স্বর্গীয় নীলকমল চাটুজ্যের উপযুক্ত পৌত্র বলিয়া আমি পরিচয় দিতে পারিব?

আমি যথাসময়ে এল-এ ও বি-এ পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর পিতাঠাকুর রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর এক বৎসর থাকিবার জন্য আমি অনুরোধ করিলাম—তিনি স্বীকৃত হইলেন না। দুই পুরুষের প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থালি তুলিয়া আনিতে—বিহারের সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে একেবারে কৃতসংকল্প হইলেন। উকিল হইয়া বাঁকিপুরে বসিলে অতি অল্প আয়াসে অল্প দিনেই আমার পসার হইতে পারিবে, এ কথাও তিনি ভাবিলেন না।

আমাদের পূর্ব-নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পানিহাটিতে। সেখানে

আমাদের একটি ছোট দ্বিতল কোঠাবাড়ি ছিল। বহুদিন অযত্নে পড়িয়া থাকায় বাড়িখানি বাসের অযোগ্য হইয়াছিল। বাবা তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতাকে বাড়িখানিকে বাসোপযোগী করিবার ভার প্রদান করিলেন। বাড়িখানির সংস্কার সাধিত হইল, খিড়কির পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইল, জঙ্গল পরিষ্কার করা হইল, বাড়ির চারিপার্শ্বে নূতন প্রাচীর নির্মিত হইল। এই কার্যে বাবার প্রায় তিন হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া গেল। ইতিমধ্যে তাঁহার পেনশন মঞ্জুর হইয়া আসিল। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে বাঁকিপুরের বাড়িখানি বিক্রয় না করিয়া এক ভদ্রলোককে ভাড়া দেওয়া হইল। প্রায় সত্তর বৎসর পরে বাঁকিপুরের নীলকমল চাটুজ্যের নাম বিহার প্রদেশে বিসর্জন দিয়া আমার পিতা শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্র আমি —শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বি-এ-কে সঙ্গে লইয়া পানিহাটিতে ফিরিয়া আসিলেন।

০০ তিন ০০

আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রবিষ্ট হইলাম। সেকেণ্ড ক্লাসের একখানি মাসিক টিকিট করিয়া আমি কলিকাতায় প্রতিদিন আসি, কলেজ করি এবং যথাসময়ে পানিহাটির বাড়িতে ফিরিয়া যাই। আমি তখনও অবিবাহিত। এই সময় আমি যে এক গোলে পড়িয়াছিলাম, তাহারই কথা বলিবার জন্য এতগুলি কথা এতক্ষণ বলিলাম। আর সেইজন্যই আমার এই কথা আরম্ভের সময়ে আমি বলিয়াছি, আমি বেশ ছিলাম পাটনায়।

এইস্থানে একটা কথা বলিতে হইতেছে—কথাটা নিজের মুখে বলা ভালো শুনা যায় না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যখন কথাটা শুনাইবার জন্য অন্য কেহ উপস্থিত নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইতেছে। সকলেই বলিয়া থাকে এবং আমিও বুঝি যে, আমি সুপুরুষ। আমার গৌর বর্ণ, আমার শরীরের গঠন-পারিপাট্য দেখিলে সকলেই আমাকে সুপুরুষ বলিবে। তাহার পর আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহাদের আদর, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা— সকলেরই একমাত্র অধিকারী। পিতামহের তুলনায় পিতার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইলেও, অপরের অবস্থার তুলনায় আমার পিতাকে সম্পন্নই বলিতে হয়। মাসে ৮০৲ টাকা পেনশন, ত্রিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ, তা ছাড়া

বিহার প্রদেশের তিন-চারিটা লাভজনক কারবারের অংশ—অবস্থা মন্দই বা কি। পোষ্যের মধ্যে মা, বাবা, আর সবে-ধন নীলমণি আমি—সুতরাং আমি বিশেষ আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইতেছি, একথা আর বলিতে হইবে না। এখন বি-এ পাস করিয়াছি, বয়সও হইয়াছে ; ভগবান যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে আর দুই-চারিদিন পরে আমি দশজনের একজনও হইব। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে, আমি এখনও আমার মায়ের কাছে খোকাই আছি। তিনি এখনও আমাকে 'খোকা' বলিয়াই ডাকেন এবং আমার সহিত খোকার ন্যায়ই ব্যবহার করেন। এখনও অনেক সময় ভালো করিয়া আহার না করিলে, তিনি নিজেই ভাত মাখিতে বসিয়া যান ; আমার মুখে গ্রাস তুলিয়া দিতে উদ্যত হন। তিনি গোছাইয়া না দিলে আমার ভালো করিয়া কাপড়-চোপড় পরা হয় না। তিনি তৈল মাখাইয়া না দিলে আমি মাথায় একটু তৈল দিয়াই স্নান করিতে নামিয়া পড়ি। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এখনও খোকার মতো নাকে কাঁদিবার উপক্রম করি। এখনও রাত্রিতে শয়ন করিলে মা যদি আমার বিছানায় বসিয়া গায়ে হাত না বুলান, তাহা হইলে আমার নিদ্রা হয় না। আর কত বলিব ; যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই সকলে বুঝিবেন যে, আমি সত্যসত্যই বাপ-মায়ের আদরের খোকা। এই অবস্থায় দেশে আসিলাম।

০০ চার ০০

পানিহাটির বাটীতে থাকি ; সেকেণ্ড ক্লাস ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া কলিকাতায় আসি ; এম-এ ক্লাসে হাজিরা দিই ; তাহার পর সহধ্যায়ীদিগের মধ্যে যাহাদের সহিত একটু অধিক ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, কখনও তাহাদের বাড়ি যাই, কখনও বা দল বাঁধিয়া শিবপুরের বাগান, আলিপুরের বাগান, মিউজিয়ম দেখিয়া বেড়াই ; কখনও বা original প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুরাতন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নোট সংগ্রহ করি।

সহপাঠীদিগের মধ্যে যাহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রই প্রধান। যোগেন্দ্রের পুরা নাম মিস্টার ড্যানিয়েল যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইনি স্বকৃত-ভক্ত নহেন—দুই পুরুষে খ্রীষ্টান। যোগেন্দ্রকে দেখিলে কেহ খ্রীষ্টান বলিয়া বুঝিতে পারে না। সে হ্যাট-কোটও পরে না, তৈলের পরিবর্তে দিনের মধ্যে তিনবার সাবান গায়ে ঘষিয়া বর্ণ ফ্যাকাশে ও সুন্দর কেশ রুক্ষও করে না। সে আমাদের মতো কালো ফিতে-পেড়ে ধুতি পরিয়া,

পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া, উড়ানি গলায় জড়াইয়া কলেজে আসে। ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নাম কখনও তাহার মুখে শুনি নাই, ধর্মের গোঁড়ামিও কখনও করিতে দেখি নাই। তাহার কথাবার্তা বড়োই মধুর, তাহার ব্যবহার বড়োই মনোহর। ইংরাজি ভাষায় অধিকারও তাহার অনন্যসাধারণ। এইজন্য খ্রীষ্টান হইলেও তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। এতকাল পাটনায় ছিলাম, সেখানে আমরা যে কয়জন বাঙালী ছাত্র ছিলাম, বলিতে গেলে তাহারা সকলেই আপনা-আপনির মধ্যে। সেখানে আমার বন্ধু ছিল হরিহরপ্রসাদ, প্রয়াগনারায়ণ, রামসহায় প্রভৃতি। বাল্যকাল হইতে বিহারীদিগের সহিত মিশিয়া আমি প্রায় সম্পূর্ণ বিহারী-ভাবাপন্ন হইয়াছিলাম। তাই কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম বাঙালী ছাত্রদিগের সহিত মিশিতে পারিতাম না। সেই সময় যোগেন্দ্রই প্রথম আমার সহিত যাচিয়া আলাপ করে; অল্পদিনের মধ্যেই সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

কলিকাতা আসিয়া কলেজের ছুটি হইলে প্রথম কতকদিন এখানে-সেখানে টো-টো করিয়া বেড়াইতাম। তাহার পর আর অমন করিয়া বেড়ানো ভালো লাগিল না; অথচ বেলা আড়াইটার ট্রেনে পানিহাটির জঙ্গলের মধ্যে যাইতেও ইচ্ছা করিত না। এ অবস্থায় একটা আড্ডার প্রয়োজন হইল। বলা বাহুল্য যে, যোগেন্দ্রই আমার আড্ডাধারী হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের বাড়িতেই অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত কাটাইতাম, তাহার পর বাড়ি চলিয়া যাইতাম।

০০ পাঁচ ০০

যাতায়াতেই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। দুই-চারিদিন যোগেন্দ্রের পড়িবার ঘরে আমরা দুইজনেই বসিয়া গল্পগুজব ও পড়াশুনার আলোচনা করিতাম। তাহার পর ক্রমে যোগেন্দ্রের মাতাও সেখানে আসিয়া বসিতে লাগিলেন। তিনি শিক্ষিতা মহিলা। তিনি আমাদের কথাবার্তায় বেশ যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমার প্রথম দুই-একদিন একটু বাধ-বাধ ঠেকিল; কিন্তু যোগেন্দ্রের মাতার ব্যবহারে ক্রমে আমার সংকোচ দূর হইতে লাগিল।

এমন সময় একদিন বেলা তিনটার সময় যোগেন্দ্রের সহিত তাহাদের বাড়ি যাইয়া দেখি, তাহার পড়িবার ঘরে তাহার মাতার পার্শ্বে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী বসিয়া আছেন।

যোগেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সহাস্যবদনে বলিল, "আরে, সুরো যে! খবরবার্তা নেই, তুমি কখন এলে?"

যুবতী বলিল, "কেন, বাবাকে তো আমি চিঠি লিখেছিলাম—আজ দার্জিলিং মেলে আসব।"

যোগেন্দ্র বলিল, "কৈ, তা তো শুনিনি।"—এই বলিয়াই সে চাহিয়া দেখিল, আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি, আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি নাই।

তখন সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল, "বেশ, ওকে দেখে তুমি বুঝি ঘরে ঢুকছ না—ও যে আমার বোন সুরবালা। এসো তোমাদের পরিচিত করে দিই।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র আমাকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন যোগেন্দ্র তাহার ভগিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি আমার বন্ধু, ক্লাস-ফেলো মিঃ গোপেশ্বর চ্যাটার্জি।" আবার আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি আমার ভগিনী মিস্ সুরবালা ভট্টাচার্য।"

মিস ভট্টাচার্য তখন আমাকে নমস্কার করিলেন, আমিও প্রতি নমস্কার করিলাম। আমার তো ভয়ই হইয়াছিল। মিস ভট্টাচার্য যদি আমার সহিত করমর্দন করিতে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলেই আমি গিয়াছিলাম আর কি! এত বড়ো হইয়াছি; বি-এ পাস করিয়াছি; কিন্তু কোনো অপরিচিতা যুবতী বা কুমারীর সহিত করমর্দন দূরে থাকুক বাক্যালাপও করি নাই। সে কি পারা যায় মহাশয়? পাটনায় কখনও এ সব অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা হয় নাই এবং সে দিকে আকৃষ্টও হই নাই। আমার পক্ষে এ ব্যাপার একেবারে নূতন—অগ্নিপরীক্ষা বলিলেই হয়।

পরিচয় তো হইয়া গেল। বুঝিলাম যে, যুবতী আমার বন্ধু যোগেন্দ্রের অবিবাহিতা ভগিনী। তাহার পর যোগেন্দ্র আপনা হইতেই বলিল যে, তাহার এ ভগিনীটি কার্সিয়াঙে একটা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন; পিতা মাসে মাসে খরচ পাঠাইয়া দিতেন। সেখানকার পাঠ শেষ করিয়া কুমারী এখন কলিকাতায় আসিলেন। ইহার পর যাহা হয় একটা স্থির করা যাইবে।

এ সকল বিবরণ বর্ণনা শেষ হইয়া গেল; আমি চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম। এ সকল কথার মধ্যে আমি আর কি বলিব। কিন্তু যোগেন্দ্র যখন চুপ করিল, তখন কে কথা আরম্ভ করিবে, তাহা লইয়াই গোল হইল। অপরিচিতা

যুবতীর সম্মুখে আমি শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বি-এ, পাটনা কলেজ প্রত্যাগত ছাত্র—একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। এমন বিপদে আমি কখনও পড়ি নাই বোধ হয়, আমার ভাবগতিক দেখিয়াই যুবতী উঠিয়া গেলেন, আমারও দেহে প্রাণ আসিল ; আমি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম।

সে দিন আর অধিকক্ষণ যোগেন্দ্রদিগের বাড়িতে থাকিলাম না ; একটা ওজর করিয়া একটু সকাল-সকালই সেখান হইতে বাহির হইলাম এবং বরাবর শিয়ালদহ স্টেশনে যাইয়া গাড়িতে বসিলাম।

০০ ছয় ০০

এখন আসল কথাটা বলি। যোগেন্দ্রের ভগিনীকে সেই অল্পক্ষণ দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মধ্যে যেন কি একটা ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। এমন ভাবে, এমন সুন্দরী ষোড়শীকে তো আমি কখনও দেখি নাই। আমি আমাদের গৃহস্থের ঘরের মেয়ে দেখিয়াছি ; তাহারা সেই এক রকমের। তাহাদের মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই—ঠিক আমাদের মতো—ঠিক আমাদের নিত্যনৈমিত্তিকের মতো। কিন্তু, এই যে যুবতীটিকে দেখিলাম, এ তো তেমন নহে। ইহার মধ্যে লজ্জাশীলতাও দেখিলাম না, আবার লজ্জাহীনতাও দেখিলাম না ; বেশ নরম সরম, মুখে যেন একটা জ্ঞানের প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, চালচলন বেশ সভ্যভব্য, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; বেশ আদব-কায়দা দোরস্ত ; হাবভাব কোনোরকম দেখিলাম না। মোট কথা আমি একটা নূতন ভাব লইয়া সেদিন যোগেন্দ্রের বাড়ি হইতে বাহির হইলাম।

রেলে আসিতে আসিতে কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, যোগেন্দ্রের বাড়িতে আর যাওয়া হইবে না। তাহারা খ্রীষ্টান, তাহাদের অন্তঃপুর নাই—সেখানে গেলেই যোগেন্দ্রের ভগিনীর সহিত কথাবার্তা বলিতে হইবে। প্রথম দিন তাহাকে দেখিয়াই যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, ক্রমে যাতায়াতে তাহা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, কে বলিতে পারে? কে যেন তখন আমার মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল, সাবধান হওয়াই ভালো। আমি তখন সংকল্প করিলাম আর ও-দিকে যাইতেছি না।

পরদিন যথাসময়ে কলেজে গেলাম। কলেজের পাঠ শেষ হইলে আমি যোগেন্দ্রের আগেই বাহির হইলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটের সম্মুখে ফুটপাথে উপস্থিত হইলে আমার গতি সংযত হইল ; মনে হইল, হঠাৎ এমন ভাবে যোগেন্দ্রের

সঙ্গ ত্যাগ করা, তাহার বাটীতে যাওয়া বন্ধ করা সঙ্গত নহে। সেখানে যাওয়া যে উচিত নহে, তাহা তখনও মনে ছিল। কিন্তু এমন ভাবে এতদিনের যাতায়াত হঠাৎ বন্ধ করা ভালো কাজ হইবে না বলিয়া আমার মনে হইল।
সেই সময় যোগেন্দ্রও আসিয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইল। একবার ইচ্ছা হইল, তাকে বলি যে, বাড়িতে বিশেষ দরকার আছে, আজ আর তাহাদের বাড়ি যাইব না; কিন্তু, কি জানি, কেন, কথাটা মুখে বাধিয়া গেল। যোগেন্দ্র বলিল, "চলো হে, দাঁড়িয়ে কেন?" আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না, তাহার সঙ্গে তাহাদের বাড়ি উপস্থিত হইলাম।
বারান্দায় উঠিতেই যোগেন্দ্রের ভগিনী আসিয়া সহাস্যবদনে আমাকে নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন; এবং ঘরের মধ্যে যাইতে-যাইতে বলিলেন, "গোপীবাবু, কাল আমি চা তৈরি করতে উঠে গেলাম; একটু পরে এসে দেখি, আপনি চলে গিয়েছেন; আজ কিন্তু চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।"
সুরবালা এমন ভাবে, এমন মিষ্টস্বরে কথা কয়টি বলিলেন যে, আমি হাঁ কি না, কিছুই বলিতে পারিলাম না; কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেমন একটা গোল-যোগ বাধিয়া উঠিল। আমি—৺নীলকমল চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র, শ্রীযুক্ত সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র; পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে আমার জন্ম—আমি উচ্চবংশোদ্ভব কুলীন-সন্তান, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত; এখনও সন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করি না—আমার পিতামাতার স্বধর্মে কত নিষ্ঠা, আমি তাহাদের একমাত্র সন্তান, পুন্নাম নরক হইতে তাঁহাদের আমিই উদ্ধার করিব বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট রহিয়াছে; আর আমি কিনা খ্রীষ্টানের বাড়ি চা খাইব? একবার মনে হইল, কোনোও একটা ওজর করিয়া তখনই প্রস্থান করি; কিন্তু পরক্ষণেই সুরবালার মুখের দিকে চহিয়া সে কথা বলিতে পারিলাম না। সত্যসত্যই তখন আমার মধ্যে সুমতি ও কুমতির দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিয়াছিল। একদিকে সুমতি, আমাকে ব্রহ্মণ্য-দেবের দোহাই দিয়া এই স্বেচ্ছাচার ও ম্লেচ্ছাচারের পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল; আর একদিকে কুমতি বলিতে লাগিল, এক পেয়ালা চায়ে দোষ কি? কত বড়ো বড়ো পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ বাবুর্চির হাতে চা খান, আর তুমি তো একটা ইংরিজি-পড়া কলেজের ছেলে। আর এক কথা, সামান্য একটু চা খাইতে অস্বীকার করিলে সুরবালা মনে কষ্ট পাইবে। কুমতির এই শেষের যুক্তিটাই, কি জানি কেন, আমার কাছে সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। সত্যই তো—এক পেয়ালা চা বই তো নয়; তাতে আর দোষ কি?

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সুরবালা বলিলেন, "গোপীবাবু কি ভাবছেন ?"
এ কথার উত্তরে সত্য কথা বলিতে পারিলাম না। আপনারা দশজন আমাকে ক্ষমা করিবেন ; খ্রীষ্টানের তৈরি চা খাইতে আমার ব্রহ্মণ্যদেব কুণ্ঠিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু কপটাচরণ করিতে বা মিথ্যা বলিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিলেন না। কারণ, সময়ে-অসময়ে ও-রকম মনের ভাব গোপন করাটা এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, উহা দোষের বলিয়াই মনে হয় না। আমি অনায়াসে বলিলাম, "না কিছু ভাবছি না। আজকার রোদটা বড্ড লেগেছে।"
এই কথা শুনিয়া সুরবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "রোদে পুড়ে মরবেন তবু আপনারা কলেজের ছেলেরা ছাতা ব্যবহার করবেন না। আপনি একটু বসুন, আমি ওডি-কোলন এনে মাথায় দিয়ে দিচ্ছি, এখনই মাথা ঠাণ্ডা হবে।"—এই বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।
এই দেখুন, আর এক বিপদ। মিথ্যা কথা বলা বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। এই এখনই আমার মিথ্যা বাক্যের শাস্তিস্বরূপ, আমার ঠাণ্ডা মাথায় খানিকটা ওডি-কোলন বৃষ্টি হইবে, আর একটি নিঃসম্পর্কীয়া যুবতী আমার শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইবেন। কিন্তু উপায় নাই, মিথ্যা বাক্যের শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। একটু পরেই যুবতীর সেই সুকোমল হস্তে আমার মস্তকে ওডি-কোলন বর্ষণ, সুবাসিত রুমালদ্বারা আমার মস্তকে ব্যজন ইত্যাদি হইল। ইহাই আমার মিথ্যার শাস্তি।
তাহার পর সুরবালা বলিলেন, "চা তৈরি হয়েছে, আমি এখনই এনে দিচ্ছি। একটু চা খেলেই আপনার শরীর বেশ ঠিক হয়ে যাবে।"
দশ মিনিট পরেই চা আসিল। তখন ঘরের মধ্যে আমি, যোগেন্দ্র ও সুরবালা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। সুরবালা এক পেয়ালা চা আমার হাতে দিলেন। তখন যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "ভগবান করুন, এই এক পেয়ালা চায়ের মধ্য দিয়া যেন দুইটি হৃদয় একত্র বাঁধা পড়ে।"
সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যদি হঠাৎ একটা বোমা ফাটিত, তাহা হইলেও আমি এত ভীত হইতাম না। এ কী কথা ? আমি তো এ বাড়িতে হৃদয় বাঁধা দিতে আসি নাই। আমাকে মা-বাপের ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার জন্যই কি যোগেন্দ্র তাহার যুবতী ভগিনীকে বাড়িতে আনাইয়াছে ! আমি যে মা-বাপের একমাত্র সন্তান—আমি যে তাঁহাদিগের অবলম্বন যষ্টি ! একটা

যুবতীর রূপের ফাঁদে পড়িয়া কি আমি আমার জাতি নষ্ট করিব? আমার বাপ-মায়ের হৃদয়ে শক্তিশেল হানিব? এক পেয়ালা চায়ের বিনিময়ে কি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করিব? না, না, তাহা কিছুতেই হইবে না।

আমার অজ্ঞাতসারে চায়ের পেয়ালা আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল—দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। একটি কথাও আমার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পরদিনই আমি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ট্রান্স্‌ফার লইয়া রিপন কলেজে ভর্তি হইলাম।

সেই জন্যই তো গোড়ায় বলিয়াছি, বেশ ছিলাম আমি পাটনায়। সেখানে কখনও তো কেউ এক পেয়ালা চা দিয়া আমার সর্বনাশের চেষ্টা করে নাই। যাক, এক পেয়ালা চায়ের উপর দিয়াই যে আমার গ্রহ কটিয়া গেল—এই আমার পরম লাভ।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) ॥ মধুরেণ
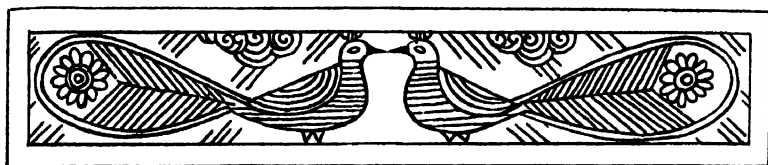
০০ এক ০০

আজ ছুটি ছিল। তারিণী চাটুজ্যে সকালে চারটি মুড়ি আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর বেরুনো মানেই—কন্যা শৈলের জন্য পাত্র খুঁজতে বেরুনো। তিনি আজ তিন বছর এইরূপ বেরুচ্ছেন।

এক পা ধুলো নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে, মাথায় হাত দিয়ে বাড়ির রোয়াকে তিনি বসে পড়েন। পত্নী নবদুর্গা তাড়াতাড়ি মাদুরখানা এনে পাশেই পেতে দেন, উঠে বসতে বলেন। গরমের দিন, পাখা নিয়ে বাতাস করতে বসেন। তারিণীবাবুর মুখে ম্লান হাসি না ফুটতেই দীর্ঘশ্বাসে তা মিলিয়ে যায়। বলেন, "আমাকে আর যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা কেন?"

শৈল আজ তিন বছর বাপের এই অবস্থা দেখে আসছে, আর ওই কথা শুনে আসছে। সে পনেরো উত্তীর্ণ হল, এইবার ম্যাট্রিক দেবে। ওটা নাকি সর্বাগ্রে দরকার, তারিণীবাবু পাত্র খুঁজতে যেখানেই যান, প্রথম শুনতে হয়—ম্যাট্রিক পাস কি-না! তিনি যেন কেরানিগিরির দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছেন তাই আধপেটা খেয়েও শৈলকে পড়াতে হচ্ছে।

শৈল গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, সংসারের সকল কাজেই মাকে সাহায্য করে। এখন সংসারের সকল চিন্তায় যোগ দেয়, সব বোঝে ও ভাবে।

তারিণীবাবু রেলে চাকরি করেন, মাইনে পান পঁয়ত্রিশ টাকা। সন্ধ্যার পর মাড়োয়ারীদের গদিতে গিয়ে ইংরাজি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম লিখে দেন, তাঁদের মাল খালাসও করে দেন। তাতেও কিছু পান। কাকারিয়া বিশিষ্ট ধনী, গরিব ব্রাহ্মণকে ভালবাসেন, দয়া করে কাজকর্ম দেন। এই পাঁচ রকমে তাঁর সংসার চলে।

একদিন সকালে কাকারিয়ার মোটর তারিণীবাবুর ভাড়াটে বাড়ির সামনে

এসে দাঁড়ায়। বেরিয়ে এসে শেঠ কাকারিয়াকে সপরিবারে নামতে দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন।

কাকারিয়া সহাস্তে বলেন, "বাড়িতে একটি বিবাহোৎসব আছে, আমার স্ত্রী-কন্যা তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, তাঁরা বাড়ির মধ্যে যাবেন।"

শুনে তারিণীবাবুর কথা যোগালো না। ইতিমধ্যে দাসীর হাতে একখানি পরাতে মিষ্টান্নাদি, পশ্চাতে স্ত্রী-কন্যা, বাড়ির ভিতর গিয়ে উপস্থিত।

দুঃখের সংসারে তারিণী চাটুজ্যের এত বড়ো বিপদ কোনোও দিন ঘটেনি। একতলা, আড়াইখানি স্যাঁতসেঁতে কুঠরি, তার তদুপযুক্ত আসবাব, ময়লা ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, মাটির হাঁড়ি কলসি সরা। সেদিন 'তৃণাদপি সুনীচেন' একবার তাঁর মনেও পড়েনি, পড়লেও বোধ হয় শান্তি দিত না। তিনি ন যযৌ অবস্থায় কাকারিয়ার মোটরের পাশে দাঁড়িয়ে দু-একটি বিনয়-বচন ভিন্ন কথাই কইতে পারেননি, তাঁকে নামতেও বলতে পারেননি—কোথায় বসাবেন?

প্রৌঢ় কাকারিয়া তাঁর অবস্থাটা বুঝে অন্য কথা পাড়েন। বললেন, "তারিণী-বাবু, যে কাজ আমি জানি না, বুঝি না, এমন একটা কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি। অনেক টাকার কাজ, তাতে ফ্যাসাদও বহুৎ। তোমার সাহায্য আমার দরকার. অনেক লেখাপড়া করতে হবে। বিলেত থেকে মালপত্র মেশিনারি এসে পড়েছে, খালাস করতেও হবে। এখন ভগবতী মাই যা করেন।"

তারিণীবাবু কথা কইবার অবলম্বন পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "কী কাজ শেঠজী?"

কাকারিয়া হাসতে হাসতে বলেন, "বাইসকোপ, তস্‌বির-ঘর। তস্‌বির বনবে—"

তারিণীবাবুকে আর কথা কইতে হয়নি; কাকারিয়ার স্ত্রী-কন্যা তাঁর বাসা থেকে এসে মোটরে ওঠেন।

"আচ্ছা, কথা পরে হবে।" বলে শেঠজীর মোটর বেরিয়ে যায়।

তারিণীবাবুর যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল, তিনি সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। কাকারিয়ার কথাগুলি তাঁর কানে গেলেও প্রাণে পৌঁছয়নি। বড়োলোকের সদ্ব্যবহারও গরিবদের উপভোগ্য হয় না, স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না।

নবদুর্গা ডাকায় তাঁর চমক ভাঙে।—"এ-সব আবার কি? আমাকে খবরটা দিতে হয়! আমি এই ছেঁড়া কাপড় পরে শাক-সড়সড়ি চড়িয়েছি, মেয়েটা ওই

কাপড়ে ডালের খুদ বাটছিল, তাড়াতাড়ি তোমাকে দুখানা বড়া ভেজে ভাত দেব বলে, এমন সময়—ছি-ছি—"

শৈল বললে, "তাতে কি হয়েছে মা? যে যা, তার তাই থাকাই তো ভালো। আমি সাটিনের শাড়ি পরে বাটনা বাটলে কেমন দেখাত? ওঁদের আসায় আর অন্যায়টা কি হয়েছে মা? বড়োলোক যদি আদর করে আসেন, সেটা কত মিষ্টি।"

নবদুর্গা বলেন, "আমি কি ওঁদের দুষছি? হঠাৎ কিনা, তাই আতান্তরে পড়তে হয়। এই দেখো না, কত রকমের মেঠাই, আবার পাঁচ টাকা নগদ দিয়ে গেছেন। আমাদের তো—"

শৈল বলে, "তুমি বুঝি তাই ভাবছ মা? ওঁরা বড়োলোক, ওঁদের মতো কাজ ওঁরা না করলে সমাজে নিন্দে আছে। আমরা গেলেই ওঁরা খুশি হবেন। তুমি আজ একবার যেও বাবা।"

শুনে তারিণীবাবুর মনটা শান্ত হয়। তাঁকে ভাত বেড়ে দিয়ে নবদুর্গা বলেন, "তোমার মেয়ে তাঁদের সঙ্গে এমন কথা কইলে গো, যেন কত কালের চেনা! তাঁদের মুখেও শৈলর কথাবার্তার, রূপের সুখ্যাত ধরে না।"

"আর রূপের সুখ্যাত! তাতে টাকার কামড় তো কমে না!"—বলে উদাস-ভাবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারিণীবাবু উঠে আপিসে চলে যান।

স্ত্রী-কন্যাও যথাসময়ে কাকারিয়া ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসেন। শেঠ-কন্যা রুক্মিণীবাই শৈলর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে সখী-সম্পর্ক পাতায়।

০০ দুই ০০

উল্লিখিত ঘটনার পর তারিণী চাটুজ্যে এই প্রথম পাত্র-খোঁজা 'টুর' থেকে হতাশ শ্রান্ত অবস্থায় ফিরে নবদুর্গাকে ব্যস্ত হয়ে বাতাস করতে দেখে, দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ম্লান হাসি মিশিয়ে যখন বলেন, "আমাকে আর যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা কেন?"—শৈল তা শুনেছিল।

কষ্টের এরূপ মর্মন্তুদ অনেক কথা অনেকবার সে শুনেছে এবং নিভৃতে নীরবে অসহায়ের মতো কেঁদেছে। এখন সে কেবল কষ্টই পায় না, তার আত্মাভিমান বিদ্রোহ করে ওঠে, সে দারুণ লজ্জা ও অপমান বোধও করে।

আজ আর সে থাকতে পারলে না, বাপকে সবিনয়ে জানিয়ে দিলে, "তুমি আমার জন্য পাত্র খুঁজতে আর যেয়ো না বাবা। এ-সব পাঁচ বছর আগে সম্ভব

ছিল, তখন আমার জ্ঞান হয়নি। এখন কিন্তু তোমার অপমান, আর তার সঙ্গে নিজেরও—আমাকে অত্যন্ত লাগছে। প্রত্যেকবারই শুনছি ও বুঝছি, কোনোও ভদ্রলোকই তো নগদ দু-হাজার টাকার কমে ছেলে ছাড়বেন না। ছেলেও নিজের সম্মান সেই টাকার ওজনে যখন সপ্রতিভভাবেই মেপে রেখেছেন, তখন সে বৃথা চেষ্টা আর কেন বাবা? দু-আড়াই হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে? ভদ্রলোকে কি চুরি-ডাকাতি করবে? যাঁরা চান, তাঁদের ক-জন তা বার করতে পারেন? তিন বছরে কাকাবাবুদের পাওনা পঁচাত্তর টাকা দিতে পারা গেল না দেখে দাদা লেখাপড়া ছেড়ে দিলে। কাকা-(রিয়া) বাবুরা ভালবাসেন, যাই আসি, কিন্তু মুখ তুলে রুক্মিণীর সঙ্গেও কথা কইতে পারি না। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। তুমি আর ভেবো না; পাত্র খুঁজতেও আর যাওয়া হবে না বাবা। এবার গেলে কিন্তু—"

তারিণীবাবু অবাক হয়ে শৈলর কথাগুলি শুনছিলেন। শৈল বরাবরই শান্ত ও অল্পভাষী। আজ তার কথার মধ্যে এমন একটা সত্য ও দৃঢ় সুর ছিল, যা তাঁকে বিচলিত করে দিলে। তাঁর মুখ থেকে সরব চিন্তার মতো বেরিয়ে গেল, "সমাজ যে রয়েছে সে কি বলবে?"

শৈল তেমনই ধীরভাবেই বললে, "সমাজের যদি 'বলা' ছাড়া আর কোনোও কাজ না থাকে, তবে সে সমাজের জন্য মিছে ভেবো না। ওই সমাজই অন্য পক্ষের সমাজ নয় কি? নির্জীব কেন, সেখানে তার বলার কিছু নেই কি? যাক, সমাজ বলুক না বলুক, আমি কিন্তু বাবা, তোমাকে আজ বলছি, এইবার তুমি আমার জন্য পাত্র খুঁজতে গেলে, তার পর আর যাতে না যেতে হয় তা আমায় করতেই হবে। এ কষ্ট, এ অপমান তোমাকে আর সইতে দেব না।"

নবদুর্গার হাতের পাখা থেমে গিয়েছিল। শৈল রান্নাঘরে চলে গেল।

তারিণীবাবু স্তব্ধ উদাস দৃষ্টিতে মূঢ়ের মতো বসে রইলেন। ক্ষণপরেই সহসা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, ঠিক, আঁর য়াব নারে শৈল। যা করবার ভগবান করবেন। ঠিক বলেছিস।"

০০ তিন ০০

বেচু, নেপেন আর তারিণীবাবুর ছেলে বিজয়, তিন বেকার বন্ধু। কলেজ ছেড়ে কলকাতায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত, হতাশ। তিনজনেই সমদুঃখী, দুঃখের সমবায়ই তাদের দুঃখের সান্ত্বনা দাঁড়িয়েছিল।

বেচুর বিদকুটে চেহারাই শেষে তার কাজে লাগল—qualification-এ দাঁড়াল। নাক নাই বললেই হয়, সে চেপটে মুখের অনেকখানি দখল করেছে। ব্যাক-ব্রাশ করা লম্বা চুল। তাতে কান দুটো—খোলা ফটকে দুটি পাল্লার মতোই দেখাত। নাকের নিচে—সযত্নে দু-ধার কামানো গোঁফের মধ্যমাংশটুকু যেন প্রাণরক্ষার্থে নাকের ডাঁটি কামড়ে রয়েছে।

বেচু জন্তুজানোয়ারের স্বর হুবহু নকল করতে পারে এবং করেও। কেরানী হওয়া সম্বন্ধে হতাশ হলেও সে বলত, "জগতে আমারও দরকার আছে রে, ভগবান মিছিমিছি কিছু করেন না।"

ভগবানকে ঐ সার্টিফিকেট দিয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, কথাটা তার ফলে গেল। অস্ট্রেলিয়ার এক সার্কাস-পার্টি কলকাতায় খেলা দেখাচ্ছিল, বেচু তাদের নজরে পড়ে গেল। তাদের সঙ্গে সাংঘাই যাবার সময়ে বললে, "I. Sc. পড়ে কটা বছর কী নষ্টই করেছি!"

বিজয়ের কাছে সংবাদটা পেয়ে শৈল মৃদুহাস্যে বললে, "এইবার তার বাপও দু-হাজার হাঁকবে। নেপেনদা বি-এ না পড়ে যদি—। ওদের বড়ো কষ্ট! বাপ বিয়ের যুগ্যি এক মেয়ে ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি।"

নেপেনের চেহারা ভালো, সুগঠিত পৌনে ছ-ফিট দেহ, সুপুরুষ যুবা, সচ্চরিত্র। বাপ তাকে গ্র্যাজুয়েট বানাতে গোয়ালের গোরু পর্যন্ত বিক্রি করে গিয়েছেন। বি-এ পাস করার পর খিদিরপুর স্কুলে বছর দেড়েক একজনের বদলি মাস্টারি করেছিল। অধুনা বেকার। ওয়াটগঞ্জ থিয়েটারে হিরো (Hero)—রোজগার জিরো। প্রাইভেট টিউশনি করে টাকা পনেরো পায়! কাকারিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত ফিল্‌ম্‌-হাউস্‌—'মরীচিকা মঞ্চে' ঢোকবার উমেদারি করছে।

শৈল যখন থার্ড ক্লাসে পড়ে, তখন নেপেনদার বাড়িতে পড়া বলে নিতে যেত—তাই তাদের অবস্থা জানে। নেপেনের ভগ্নী মনোলোভা তার সমবয়সী, আলাপী, অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই—বয়স উভয়কেই বেরুতে বাধা দেয়। মন ছুটোছুটি করে।

নেপেন বিবাহ করবে না—দুঃখের উপর সে কষ্ট বাড়াতে চায় না। কন্যাপক্ষেরা এলে তার মাও বি-এ পাস ছেলের যে নজরানা আশা করে আছেন, তা শুনে মধ্যবিত্তদের চিত্ত চমকে যায়।

০০ চার ০০

তিন মাস ধরে কাকারিয়ার 'মরীচিকা-মঞ্চে' একখানি সামাজিক নাটকের মহলা চলছে।

কাকারিয়ার অর্থের অভাব নেই, নামী অভিনেত্রীদের—যারা নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে সুপরিচিতা—স্বদেশী তারকা, তাদের মোটা টাকায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কাকারিয়ার ধারণা, সেরা সেরা সুন্দরীরাই ফিল্‌মের প্রধান আকর্ষণ। পুরুষের পার্টে লোকাভাব নেই—পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ দিলেই হীরো (Hero) মেলে। সুতরাং সুন্দরী সংগ্রহের ব্যয়টা এইতে পুষিয়ে যাবে।

শেঠের অদৃষ্ট বাধাবিঘ্ন কেটে চলে। প্রথম প্রচেষ্টার মুখেই ঘটেও গেল তাই। নানা সদুদ্দেশ্যে সভ্যজগৎ আজকাল ভারতের আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতি জানবার জন্য উৎসুক ও উদগ্রীব। কাকারিয়ার ভাগ্য ইওরোপের এক ফিল্‌ম্ কোম্পানির মালিক ভারত-ভ্রমণে এসে ভদ্র হিন্দুদের বিবাহ-পদ্ধতিটার নিখুঁত ছবি বিশেষ মূল্যে সংগ্রহ করতে চান এবং কাকারিয়ার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করেন। সুযোগ বুঝে কাকারিয়া অভাবপীড়িত নেপেনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ও ভবিষ্যতের বড়ো আশা দিয়ে, চট করে একখানি নাটিকা লিখিয়ে নেন।

তারই জোর রিহার্সাল চলছে। ক্রেতা বসে আছেন—কণ্ট্রাক্ট-মতো দিনে তাঁর পাওয়া চাই, নচেৎ তিনি নেবেন না। জাহাজের টিকিট কিনে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। কাল ফিল্‌ম্ তোলা হবে।

নাটিকাখানির বিষয়বস্তু—দুই জমিদারের বহু দিনের পোষা বিরোধ ও শত্রুতা একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ের অভাবনীয় প্রণয়-আকর্ষণে, শেষে —তাদের বিবাহের মধ্য দিয়ে শুভমিলনে মিটে গেল।

দুই জমিদারের প্রত্যেকেই অপরের প্রতিযোগীভাবে ঐশ্বর্যবিকাশের আয়োজনে মুক্তহস্ত—শিল্পে, সৌন্দর্যে ও আড়ম্বরে। বিবাহসভায় নৃত্যগীতাদির জন্য বোম্বাই, মহীশূর, মণিপুর, কাশ্মীর হতে নর্তকীরা এসেছে। বাংলার প্রসিদ্ধারাও আছেন—প্রধানত তাঁরাই বাসরের আনন্দ-বর্ধন করবেন।

ফল কথা, কাকারিয়া তাদের সৌন্দর্যের সাহায্যে তাঁর 'মরীচিকা-মঞ্চ'কে সাফল্যমণ্ডিত করে নাম কিনতে ও আমদানির পথ করে নিতে চান।

স্টুডিওতে ফিল্‌ম তোলবার ব্যবস্থা হয়েছে প্রথম শ্রেণীর। সেজন্য বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করাও হয়েছে।

দেশের খ্যাতনামা বিশিষ্ট পদস্থদের দর্শকরূপে নিমন্ত্রণ করাও হয়েছে। তাঁরা সজীব অভিনয়টা দেখবেন এবং তাঁদের অভিমত-মতো কাটছাঁট পরিবর্তনও চলবে। কারণ ক্রেতার সন্দেহভঞ্জনার্থ কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এ-সব শর্তও আছে।

শৈলর সঙ্গে কাকারিয়া-কন্যা রুক্মিণীর সাক্ষাতের পর থেকে তাদের সখিত্ব এখন ঘনিষ্ঠ, দেখাশোনা প্রায়ই হয়। স্টুডিওতে অভিনয়াদি থাকলে শৈলকে আনিয়ে উভয়ে গোপনে দেখে। 'মধুরেণ' নাটকখানির খাতা তাকে দিয়ে লুকিয়ে পড়িয়ে শোনে। আজও তাকে আনিয়েছে।

শৈলরও অভিনয়াদি দেখবার শখ স্বাভাবিক। বিশেষ, লেখাপড়া-জানা মেয়ে, নিজেও ভালো-মন্দ বুঝতে আরম্ভ করেছে। কি হলে বা কি করলে স্বাভাবিক ও ঠিক হয়, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে। কুমকুম নাম্নী যে সুন্দরী তরুণীটি 'পাত্রী'র মহলা দিতে আসে, তার দোষগুণ সমালোচনা করে। বলে, "ও-ভাবে দাঁড়ানোটা ভুল, ও-কথাটি ও-সুরে বলাটা মানায় না" ইত্যাদি।

শুনে রুক্মিণী হাসতে হাসতে বলে, "একদিন তুমিই করে আমাকে দেখাও না ভাই। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, কুমকুমের চেয়ে তোমাকে ঢের বেশি মানাবে, ভালো দেখাবে। ওরা কেবল সেলাবতে থাকে, ঘষে-মেজে চটক রাখে। সত্যি বলতে, না আছে সৌষ্ঠব, না সাইজ। শরম রাখে না বলেই পুরুষদের অত ভালো লাগে।"

রুক্মিণীর কথা শৈল উপভোগ করে, হাসে। বলে, "ওইটাই ঠিক বলেছ, আমাদের শরমে বাধে, আড়ষ্ট হয়ে পড়বার ভয় থাকে। নইলে শক্তটা আর কি, অনায়াসেই পারা যায়।" ইত্যাদি শুনলে মনে হয়, ভদ্রঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়েদের অভিনয়ের সাধ যে হয় না, এমন কথা বলা যায় না।

আজ সারাদিন কাকারিয়ার স্টুডিও-কম্পাউণ্ডে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। গেট, মঞ্চ, উদ্যান, লতামণ্ডপ—সবই জীবনে যৌবনে যেন স্পন্দিত হচ্ছে, অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। বিচিত্রবর্ণের আধার বিদ্যুতালোক-দীপ্তি বিচ্ছুরিত করবার অপেক্ষা করছে। কর্মীরা উত্তেজনা-চঞ্চল।

আজ 'মরীচিকা-মঞ্চে'র উদ্বোধন বললে হয়। আজকের সাফল্যের উপর কাকারিয়ার এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই।

এইরূপ আসন্ন সময়ে শেঠজীকে না দেখতে পেয়ে কর্মচারীরা চঞ্চল ও চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক চাইছিলেন।

কাকাবাবু হঠাৎ নিজের কোয়ার্টার থেকে বিশৃঙ্খল এলোমেলো বেশে, অবিন্যস্ত কেশে, চিন্তামাখা মুখে তারিণীবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এলেন।—"চলো, একবার বম্বে থিয়েটারের মালিকের কাছে যেতে হবে, তাঁদের 'ফিমেল-ড্রেসার' আছে।" এই বলতে বলতে তারিণীবাবুকে মোটরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর চাঞ্চল্য দেখে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। "এ আবার কেন?"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁরা ফিমেল-ড্রেসার রেশমীবাঈকে নিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে ফিরলেন ও তাঁকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন।

এদিকে সময়ের কিছু পূর্বেই বিশিষ্ট দর্শকেরা আসতে আরম্ভ করেছিলেন। কাকাবাবু সহাস্য উৎফুল্ল মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সকলকে অভ্যর্থনা ও আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করতে লাগলেন। রৌপ্যাধারে আতর, গোলাপ, পান, জর্দা, এলাচ, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ঘুরতে লাগল।

০০ পাঁচ ০০

মঞ্চ পুষ্পলতার পারিপাট্যে মালঞ্চে পরিণত ও আলোকোজ্জ্বল। বরাসনে বর ও সভাশোভনবেশে বরযাত্রীরা উপবিষ্ট, কন্যাযাত্রীরাও উপস্থিত। উভয় পক্ষের গুণী গায়কদের সঙ্গীতালাপাদি ও নর্তকীদের নৃত্য, পর্যায়ক্রমে শ্রোতা ও দর্শকদের নয়ন-মন-রঞ্জনে সচেষ্ট।

দেব-দর্শন বরের মুখশ্রী, দেহসৌষ্ঠব ও সজ্জা, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ও মহিলাদের চিত্ত হরণ করছে।

লগ্ন উপস্থিত। বিবাহকার্য একে একে যথারীতি পর্যায়ক্রমে চলল, উৎসর্গ, স্ত্রী-আচার, কন্যা-সম্প্রদানাদি।

তন্মধ্যে স্ত্রী-আচার দৃশ্য 'বিশেষ উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য। বিজলী-জ্যোতি-সমুজ্জ্বল প্রাঙ্গণে নানা বর্ণের বিদ্যুতের মতো সুবেশা, পুলক-চঞ্চলা তরুণী ও যুবতীরা কলহাস্যে রহস্যমুখরা ও সুযোগমতো বরের কর্ণমর্দন-তৎপরা। নিরীহ বর আজ মৃদুহাস্যে সবই সইছেন। অলংকার ও বেনারসীর বিজ্ঞাপনের মতো প্রৌঢ়া সুন্দরীর সুকোমল হস্তের বরণ-বৈচিত্র্য ও বরকে চিরতরে ইঙ্গিতানুগামী পোষা পশুটি বানিয়ে রাখবার প্রক্রিয়া ও প্রবচন, সকলের পরিজ্ঞাত হলেও বেশ উপভোগ্য হল। কনেকে সাতপাক ঘোরাবার পর—শুভদৃষ্টি।

বর ও কন্যা উভয়ে উভয়ের সুপরিচিত, রিহার্সেল-ক্ষেত্রে নিত্য দেখা, সুতরাং পরস্পরের make-up চাতুর্য দেখার ঔৎসুক্য ছাড়া, শুভদৃষ্টির আগ্রহ বড়ো ছিল না। উভয়েই ভাবলে, বাঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কনের ঘোমটা খুলে দেওয়ায়, দেখে মেয়ে পুরুষ সবাই রূপমুগ্ধ হলেন। কেউ কেউ ভাবলেন, বাংলা দেশ সজ্জা-শিল্পে কী অভাবনীয় উন্নতিই করেছে, কুমকুমকে তো পূর্বেও দেখেছি, আজ যেন নূতন দেখছি।

এইবার হাফ-টাইমের অবকাশে, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের রাজসূয়ের ব্যবস্থা-মতো ভূরিভোজন আরম্ভ ও সমাপ্ত হল।

পরে কয়েকটি ছোটখাট আচার উপভোগ্যভাবে শেষ হলে বরবধূর 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম' বাসরঘরে প্রবেশ। রমণীকণ্ঠের সুমধুর রহস্যালাপ, নৃত্যগীত। বরকে মধুর পীড়ন ও যুগলকে মধুর নির্যাতন চলল। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে রমণীরা বাধাহীন, স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল—যা ইচ্ছে বলতে পারেন। বরের অঙ্কে বধূকে তাঁরা বসাবেনই, বধূ কিন্তু নারাজ, লজ্জানত।

বধূকে বর চুপি চুপি বললেন, "ও কি করছ রিহার্সেল-মতো হচ্ছে না যে, এসো।" বলে হাত ধরে টানতেই একেবারে গায়ে গায়ে! অবগুণ্ঠিতা বধূ ধীর কাতর অথচ বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন, "পায়ে পড়ি ছাড়ুন, বড্ড মাথা ঘুরছে।"

বর চমকে গেল, "এ কার কণ্ঠস্বর!" পরে রমণীদের প্রতি—"একটু বাতাস করুন, শুতে দিন শরীর ভালো নয়—"

শুনে কেউ হাসলেন, কেউ অবাক হয়ে বললেন, "এর মধ্যে এত! খুব মায়ার শরীর যে।"

কেউ বললেন, "এরপর আর সাধাসাধি করতে হবে না, মাথাও ঘুরবে না। মাথা ঘোরাবার জন্যে নিজেই ঘুরঘুর করে ঘুরবেন।"

পরক্ষণেই সুন্দরীদের নৃত্যগীতে বাসর জমে উঠল। ও-সব ক্ষণিকের বিঘ্ন ফিল্মের কোনোও অনিষ্টই করলে না, বাসরের স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই লোকে বুঝলে।

সুন্দরী নির্বাচন ও অর্থব্যয় সার্থক ভেবে শেঠ কাকারিয়া উৎফুল্ল।

বরের মন কিন্তু নৃত্যগীতাদিতে ছিল না। তিনি ভাবছিলেন, এ তো কুমকুম নয়, কুমকুম নির্দিষ্ট অভিনয়ে এত আপত্তি করবে কেন? একটু আপত্তির ভাব থাকবে বটে, তারপর তো—। তবে এ সুন্দরী কে?

পদস্থ অভিজ্ঞ দর্শকেরা কাকারিয়ার পিঠ চাপড়ে প্রশংসাবাদ শোনাতে শোনাতে রাত তিনটের পর সব ফিরলেন।

ফিল্ম-ক্রেতা নিজে উপস্থিত থেকে সবই দেখলেন শুনলেন।

কুশণ্ডিকা বা বাসী-বিয়ে শেষ করলে, বিষয়টি সম্পূর্ণ হবে। সকালে আবার কাজ চলল। বর্তমানে রুচি-বিরুদ্ধ হলেও তার আনুষঙ্গিক সব খুঁটিনাটিই তোলা হল। নচেৎ কণ্ট্রাক্ট খারিজ হয়ে যাবে। ক্রেতা উচ্চ-বর্ণের হিন্দু-বিবাহের নিখুঁত চিত্র চায়।

কিন্তু দু-একটি স্থলে অসহায়া বধূ দর্শকদের লক্ষ্য বাঁচিয়ে চাপা গলায়, বরকে সংযত হতে বলতে বাধ্য হন।

স্বর শুনে বিস্মিত বর বধূর দিকে চমকে চাইলেন। দিনের আলোয় চিনতে আর বাধল না। অশ্রুসিক্ত পল্লবে বধূকে কী সুন্দরই দেখাচ্ছে! বর মুগ্ধবৎ বলে ফেললেন, "তুমি! অশ্রু কেন? দুঃখের কারণ কি? কেন? অভিনয় সার্থক হয়েছে শৈল, তাই তো বলি, এত রূপ আর কার?"

ছবি তোলা সুচারুভাবে শেষ হয়ে গেল। শেঠজীর আনন্দের সীমা নেই। শৈলকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন মঞ্চের বাইরে গাঁঠছড়া বাঁধা অবস্থায় বরবধূ কথাবার্তায় মগ্ন। তিনি কন্যা রুক্মিণীকে দেখাবার জন্য ডাকতে গেলেন।

০০ ছয় ০০

রুক্মিণী প্রচ্ছন্ন থেকে শুনলে :

শৈল বরকে বলছে, "এখন আমায় এই বেশেই আপনাদের বাড়ি নিয়ে চলুন, নেপেনবাবু। আমি আর এখন বাপের বাড়ি যেতে পারি না, যাব না। সে যেমন নিয়ম আছে, সেই মতো হবে।"

নেপেন ঠাট্টা ভেবে কথা কইতে গেল।

শৈল তাঁকে দৃঢ়ভাবেই বুঝিয়ে দিলে, "ঠাট্টা নয়। আপনি জানেন, বাবা সরল সাধাসিধে লোক, গরিব। কুমকুমের হঠাৎ কলিক চাগায়, কাকাবাবু বিপন্নভাবে বাবাকে বিপদ জানিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। 'কণ্ট্রাক্ট' যায়, মান-সম্ভ্রম যায়, ভবিষ্যৎ যায়, মুখ রক্ষা করুন। শৈলকে মাত্র সেজে দাঁড়াতে দিন, মেয়ে-ড্রেসার সাজিয়ে দেবে, কেউ চিনতে পারবে না।

"বিপদের সময় ব্যাপারটার গুরুত্ব কেউ ভাববার অবকাশ পাননি। বড়োলোকের অনুরোধ গরিবদের এড়ানো যে কত কঠিন তা আপনি জানেন,

বাবাকেও জানেন—তিনি অতশত ভাবেননি। অভিনয় হলেও সর্বসমক্ষে বিধি-ব্যবস্থা-মতো মন্ত্রপূত বিবাহ আমাদের যখন হয়ে গিয়েছে, আর ছবিও তার সাক্ষী হয়ে রইল, তখন আমায় আর বিবাহ করবে কে? ওঁরা কেউ তলিয়ে ভাবেননি—পতিতা নিয়ে তো এ কাজ করা হয়নি। একে আমার বাবা গরিব, অর্থাভাবে আমার বিবাহ দিতে পারছিলেন না। এখন দশগুণ দিলেও কেউ আমাকে বিবাহ করবে কি? আপনি জ্ঞানবান গ্র্যাজুয়েট হয়ে আমার দশা কি করলেন? 'আমি কিছু জানতাম না'—এই সাফায়ে নিজেকে বাঁচাবার পথ পেতেও পারেন; কিন্তু আমাকে এভাবে ডুবিয়ে আত্মপ্রসাদ পাবেন কি?"

শুনে নেপেনের জিভ শুকিয়ে গেল। শৈলর কথা তো একটুও মিথ্যে নয়। সে চিন্তিতভাবে বিমর্ষ মুখে বললে, "আমরা নিজেরাই খেতে পাই না, নচেৎ এখানে বিশ-পঁচিশ টাকার লোভে, সেজে অভিনয় করতে আসব কেন? তোমাকে সুখী করা দূরে থাক, খেতে-পরতে দেওয়াও যে আমার অবস্থায় অসম্ভব।"

শৈল বললে, "দুঃখের সংসারে আমি আজ তিন-চার বছর অনেক দুঃখ-কষ্টের কথাই শুনে আসছি, আর তা বুঝতেও হয়েছে। তার মধ্যে একটা কথা, সংসারে সকলেই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে আসে। আমি কি কোনো ভাগ্যই নিয়ে আসিনি?"

নেপেন নীরব।

শৈল শেষে বললে, "অভিনয়ের মধ্যে অনুচিত ও অভব্য ব্যাপারও বাদ যায়নি, যা অসাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গেই সাজে। এর পরেও কি আপনি গরিব হিঁদুর মেয়েকে ঘরে না নিয়ে, মরণের পথে ঠেলে দিতে চান? তা ভিন্ন এখন আর আমার কোন্ পথ রইল?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শৈল নীরব হল।

দৃঢ় স্বরে, "চলো, বাড়ি চলো শৈল", বলে নেপেন তার হাত ধরলে।

রুক্মিণী গোপনে থেকে শঙ্খধ্বনি করলে।
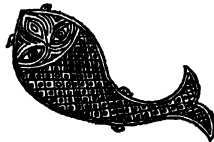
প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ॥ সীতেশের কথা
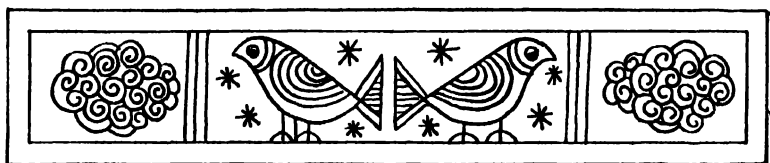
তোমরা সকলেই জানো, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উল্টো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে আমি তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার করে নূতন করে ভালবাসায় পড়তুম; তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ, এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বলতে তা ঠিক। আমি যে সে কালে, দিনে একবার করে ভালবাসায় পড়িনি, এতেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই! স্ত্রীজাতির দেহ ও মনের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যা আমার দেহ-মনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি কারোও বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে, কারও বা গলার স্বরে, কারও বা দেহের গঠনে। এমন-কি, শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের রঙে, গহনার ঝংকারেও আমার বিশ্বাস জাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে কাতর হয়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপরে তাকে আর একদিন আশমানি-রঙের কাপড় পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম! এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারেনি। আজও আমি মলের শব্দ শুনলে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোনো বন্ধ গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সেদিকে যায়; গ্রীক statueর গড়নের কোনোও হিন্দুস্থানী রমণীকে পথে-ঘাটে পিছন থেকে দেখলে আমি ঘাড় বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া, সে কালে আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেই জাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অনুরক্ত হয়। এ সত্বেও যে আমি নিজের কিংবা পরের সর্বনাশ করিনি, তার কারণ Don Juan হবার মতো সাহস ও শক্তি আমার শরীরে

আজও নেই, কখন ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাঁচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে,—অর্থাৎ তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা কাঁচও ভাঙিনি, তার কারণ ও-বস্তু ভাঙলে প্রথমত বড়ো আওয়াজ হয়—তার ঝন্‌ঝনানি পাড়া মাথায় করে তোলে; দ্বিতীয়ত তাতে হাত পা কাটবার ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন eternal feminine একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন—আর আমি অনেকের ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পাননি, আমিও পাইনি। তবে দুজনের ভিতর তফাত এই যে, সেনের মতো কঠিন মন কোনোও স্ত্রীলোকের হাতে পড়লে, সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম খুদে রেখে যায়; কিন্তু আমার মতো তরল মনে, স্ত্রীলোক মাত্রেই তার আঙুল ডুবিয়ে যা-খুশি হিজিবিজি করে দাঁড়ি টানতে পারে, সেই সঙ্গে সে-মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করেও তুলতে পারে—কিন্তু কোনোও দাগ রেখে যেতে পারে না; সে অঙ্গুলিও সরে যায় —তার রেখাও মিলিয়ে যায়। তাই আজ দেখতে পাই আমার স্মৃতিপটে একটি ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি, কেননা এক জীবনে এমন ঘটনা দু-বার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধহয় অক্টোবরের শেষ কিংবা নভেম্বরের প্রথম। কেননা এইটুকু মনে আছে যে, তখন চিমনিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সন্ধ্যে হয়েছে;—যেন সূর্যের আলো নিভে গেছে, অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয়নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলের মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যাঁরা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে, কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে, হন্‌হন্‌ করে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডানহাতে ছাতা ধরে বাঁহাতে গাউন হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরে কাদাখোঁচার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক। এই থেকে আন্দাজ করলুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে; কেননা এ বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে কানে শোনা যায় না।

ভালো কথা, এ জিনিস কখনও নজর করে দেখেছ কি যে, বর্ষার দিনে বিলেতে কখনও মেঘ করে না? আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায়, এবং

তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তা ঘাট সব কাদায় প্যাচ্‌-প্যাচ্‌ করে। মনে হয় যে, এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে, আর আধখানা নিচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য নোংরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মন-মরা হয়ে গেলুম, সে কথা বলা বাহুল্য। এরকম দিনে, ইংরাজরা বলেন তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

আমার একজনের সঙ্গে Richmond-এ যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দিনে ঘর থেকে বেরবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে Times নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত পড়লুম; এক কথাও বাদ দিইনি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, Times-এর শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশি মুখরোচক। তার আর্টিকেল পড়লে মনে যা হয়, তার নাম রাগ; আর তার অ্যাড্‌ভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে যা হয়, তার নাম লোভ। সে যাই হোক, কাগজ-পড়া শেষ হতে-না-হতেই, দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসেছিলুম, সেইখানে বসেই তা শেষ করলুম। তখন দুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনোও বদল হয়নি, কেননা এই বিলাতী বৃষ্টি ভালো করে পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না! তফাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে, বাতি না জেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার জো নেই।

আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে শুরু করলুম, খানিকক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে এল। ঘরের গ্যাস জেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই—Anson-এর Contract, এক কথা দশবার করে পড়লুম, অথচ offer এবং acceptance-এর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিগগেস করলুম "তুমি এতে রাজী?" তুমি উত্তর করলে "আমি ওতে রাজী।"—এই সোজা জিনিসটেকে মানুষ কী জটিল করে তুলেছে, তা দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লুম। মানুষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখত, তাহলে এই সব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তাঁর খুরে দণ্ডবৎ করে Ansonকে সেল্‌ফের সর্বোচ্চ তাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল সুমুখে একখানা পুরনো Punch পড়ে

আছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন Punch পড়ে হাসি পাওয়া দূরে থাক, রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরি রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে, এই ভেবে অবাক হলুম। দিব্য চক্ষে দেখতে পেলুম যে পৃথিবীর এমন দিনও আসবে, যখন Made in Germany এই ছাপমারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে, এদেশের আকাশের মতো এদেশের মনেও বিদ্যুৎ কালে-ভদ্রে এক-আধবার দেখা দেয়—তাও আবার যেমন ফ্যাকাশে, তেমনি ঘোলো। যেই এই কথা মনে হওয়া, অমনি Punch-খানি চিমনির ভিতর গুঁজে দিলাম, —তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড় পদার্থ Punch-এর মান রাখল দেখে খুশি হলুম।

তারপর চিমনির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তারপর আবার একখানি বই নিয়ে পড়তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের উপর সারি সারি রূপোর বাতিদান, গাদা-গাদা রূপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মতো পল-কাটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাঁচের গেলাস। আর সেইসব গেলাসের ভিতর, স্পেনের ফ্রান্সের জার্মানির মদ,—তার কোনোটির রঙ চুনির, কোনোটির পান্নার, কোনোটির পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম Algernon, নায়িকার Millicent। একজন Duke-এর ছেলে, আর একজন millionaire-এর মেয়ে; রূপে Algernon বিদ্যাধর, Millicent বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন, এবং সে প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে Algernon বিবাহের offer করবেন, Millicent তা accept করবেন—contract পাকা হয়ে যাবে।

সে কালে কোনোও বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘে চড়ে অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াশায় ভর করে এই নভেল-বর্ণিত রূপোর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম, সেখানে একটি যুবতী—বিরহিনী যক্ষ-পত্নীর মতো—আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরে মানিক দিয়ে সাজানো সোনার প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে, চার চক্ষুর মিলন হবামাত্রই আমার মনে ভালবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তার হাতে সমর্পণ করলুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ

করলে। ফলে, যা পেলাম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেই সঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময়ে ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল, অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জল-কাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল ; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানোই তো, জলই হোক, ঝড়ই হোক, লণ্ডনের রাস্তায় লোক চলাচল কখনও বন্ধ হয় না,—সেদিনও হয়নি। যতদুর চোখ যায় দেখি, শুধু মানুষের স্রোত চলেছে—সকলেরই পরনে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য Daguerrotype-এর ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর, ঘরের চাইতে আমার বেশি একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি ; অথচ সেই মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক, তা এই রকম দিনে এই রকম অবস্থায় পুরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশ ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি Holborn Circus-এর কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। সুমুখে দেখি একটি ছোট পুরনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নিচে বসে আছে। তার গায়ের ফ্রককোটের বয়স বোধহয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়স-কালে কালো ছিল, এখন তা হলদে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটি শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে, আমার মতো শৌখিন পোশাক-পরা খদ্দের ইতিপূর্বে তার দোকানের ছায়া কখনই মাড়ায়নি। এ-বই ও-বই সে-বইয়ের ধুলো ঝেড়ে, সে আমার সুমুখে নিয়ে এসে ধরতে লাগল। আমি তাকে স্থির থাকতে বলে, নিজেই এখান-থেকে সেখান-থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলুম। কোনো বইয়ের বা পাঁচ মিনিট ধরে ছবি দেখলুম, কোনো বইয়ের বা দু-চার লাইন পড়ে ফেললুম। পুরনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে, তা তোমরা সবাই জানো। আমি একমনে সেই আনন্দ উপভোগ করছি, এমন সময় হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি-জানি কোথা থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ, বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মতো

ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ,—এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা করে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেননা ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়; তার কোনোও মুখ নেই। কিন্তু এ সেই-জাতীয় গন্ধ, যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মতো বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির,—অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোক, লেজে ভর দিয়ে সাপের মতো, ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ-করে চেয়ে রয়েছি দেখে, সে চোখ ফেরালে না। পূর্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেরকম করে হাসে, সেই রকম মুখ-টিপে-টিপে হাসতে লাগল,—অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি যে, এ-স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিন্ কালেও দেখা হয়নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে, ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে, একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার একছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ-ছুটি যেন ছুরির মতো আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অসোয়াস্তি করতে লাগল যে, আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি সেই মুখ-টেপা হাসি তার লেগেই রয়েছে। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়,—চোখের। ইস্পাতের মতো নীল, ইস্পাতের মতো কঠিন ছুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মতো চিক্‌মিক্ করছে। আমি সে দৃষ্টি এড়াবার যতবার চেষ্টা করলুম, আমার চোখ ততবার ফিরে ফিরে সেইদিকেই গেল। শুনতে পাই, কোনো কোনো সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখি মাটিতে নেমে আসে,—হাজার পাখা-ঝাপটা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখির মতোই হয়েছিল!

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল,—ঐ পাচুলির গন্ধ আর ঐ চোখের আলো, এই ছুইয়ে মিশে আমার শরীর-মন ছুই উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না, সুতরাং তখন যে কি করেছিলুম তা আমি জানিনে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ে ধাক্কা লাগল। আমি মাপ চাইলুম; সে হাসিমুখে উত্তর করলে—"আমার

দোষ, তোমার নয়।" তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ করলুম, যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু। আমি তাকে এ-বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিগগেস করে আমি তা পড়েছি কিনা। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানিনে। তার কথাবার্তায় বুঝলুম যে, তার পড়াশুনো আমার চাইতে ঢের বেশি। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, তিন ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম, তাই নিজের বিদ্যে দেখাবার জন্যে একখানি ফরাসী কেতাব তুলে নিয়ে, ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, আমি কি পড়ছি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা ফুলের গন্ধ ছিল; কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর-মনে আগুন ধরিয়ে দিলে। ফরাসী বইখানির যা পড়ছিলুম, তা হচ্ছে একটি কবিতা—

Si vous n'avez rien a me dire,
Pourquoi venir aupres de moi ?
Pourquoi me faire ce sourire
Qui tournerait la tete au roi ?

এর মোটামুটি অর্থ এই—"যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে তো আমার কাছে এলেই বা কেন, আর অমন করে হাসলেই বা কেন, যাতে রাজা-রাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়!"

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক করে হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপটা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপসা দেখতে লাগলুম। আমার পড়া আর এগোল না। ছোট ছেলেতে যেমন কোনো অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়লে শুধু হেলে-দোলে ব্যাঁকে-চোরে, অপ্রতিভ ভাবে এদিক ওদিক চায়, আর কোনোও কথা বলতে পারে না,—আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিগগেস করলুম। সে বললে এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে একটি মরক্কোর পকেট কেস বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি; একটিও

শিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথাও একটি শিলিং পেলুম না। এই সময়ে আমার নব-পরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে, বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বললে—"তোমার আর গিনি ভাঙাতে হবে না, ও-বইখানি আমি নেব।" আমি বললুম—"তা হবে না।" তাতে সে হেসে বললে—"আজ থাক, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিন তুমি টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।"

এর পরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসে আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে—"এখন তোমার বিশেষ-করে কোথাও যাবার আছে?"

আমি বললুম—"না।"

"তবে চলো, Oxford Circus পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চলতে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।"

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিগগেস করলুম—"কেন?"

"তার কারণ পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনোও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপ-যৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচ-শ জন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আর অন্তত একজন এসে বলবে, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"এই যদি আমাদের স্বভাব হয় তো কি ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?"

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমাকে আমি ভয় করিনে।"

"কেন?"

"বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে,—যারা আমাদের রক্ষক।"

"সে জাতটি কি?"

"যদি রাগ না করো তো বলি। কারণ কথাটা সত্য হলেও, প্রিয় নয়।"

"তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পারো—কেননা তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"সে হচ্ছে পোষা কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর-কোনোও পুরুষকে আমাদের কাছে আসতে

দেয় না। বাইরের লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তারপর দাঁত বার করে,—তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তাহলে তাকে কামড়ায়।"

আমি কি উত্তর করব না ভেবে পেয়ে বললুম—"তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশি।"

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে—"ভক্তি না থাক, ভালবাসা আছে।" আমার মনে হল তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা Oxford Circus-এর দিকে চলেছিলুম, কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হতে পারিনি, কেননা দুজনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ কথাগুলি শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম। তারপর যা জিগগেস করলুম, তার থেকে বুঝতে পারবে যে তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি—"তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে?"

"কখনই না।"

"এই যে একটু আগে বললে যে আবার যেদিন দেখা হবে···"

"সে তুমি শিলিংটে নিতে ইতস্তত করছিলে বলে।"

এই বলে সে আমার দিকে চাইলে। দেখি তার মুখে সেই হাসি—যে হাসির অর্থ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

আমি তখন নিশিতে-পাওয়া লোকের মতো জ্ঞানহারা হয়ে চলেছিলুম। তার সকল কথা আমার কানে ঢুকলেও, মনে ঢুকছিল না।

তাই আমি তার হাসির উত্তরে বললুম—"তুমি না চাইতে পারো, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।"

"কেন? আমার সঙ্গে তোমার কোনোও কাজ আছে?"

"শুধু দেখা-করা ছাড়া আর কোনোও কাজ নেই।—আসল কথা এই যে, তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারব না।"

"একথা যে-বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেল?"

"পরের বই থেকে বলছিনে, নিজের মন থেকে। যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

"তোমার বয়সের লোক নিজের মন জানে না; মনের সত্য-মিথ্যা চিনতেও সময় লাগে। ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলে খাবার লোভ হয়,

বিশ-একুশ বৎসর বয়সের ছেলেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালবাসা হয়। ও-সব হচ্ছে যৌবনের দুষ্ট ক্ষিধে।"

"তুমি যা বলছো তা হয়তো সত্য, কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মতো এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে।"

"ও হচ্ছে যৌবনের season flower, দু-দণ্ডেই ঝরে যায়,—ও-ফুলে কোনোও ফল ধরে না।"

"যদি তাই হয় তো, যে ফুল তুমি ফুটিয়েছ তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছ কেন? ওর প্রাণ দু-দণ্ডের কি চিরদিনের, তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যৎই দিতে পারে।"

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে বললে—"তুমি কি ভাবছো যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু পিছু চিরকাল চলতে পারবে?"

"আমার বিশ্বাস পারব।"

"আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে?"

"তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আমি যদি আলেয়া হই! তাহলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে।"

আমার মনে এ-কথার কোনোও উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বললে—"তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে, আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনের কথাই বলছো। সেই জন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাইনে। তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি, সে কষ্ট আমি তোমাকে দিতে চাইনে;—প্রথমত তুমি বিদেশী, তার পর তুমি নিতান্ত অর্বাচীন।"

এতক্ষণে আমরা Oxford Circus-এ এসে পৌঁছলুম। আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বললুম—"আমি নিজের মন দিয়ে জানছি যে, তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশি কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও, তাহলে বলো আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সম্ভবত আমার কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল, যা তার মনকে স্পর্শ করলে, তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে, তার মনে আমার প্রতি একটু

মায়া জন্মেছে। সে বললে—"আচ্ছা তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।"

আমি অমনি আমার পকেট-কেস্ থেকে একখানি কার্ড বার করে তার হাতে দিলুম। তারপর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে—"সঙ্গে নেই।"

আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলুম, সে কিছুতেই বলতে রাজী হল না। শেষটা অনেক কাকুতি-মিনতি করবার পর বললে—"তোমার একখানি কার্ড দাও, তার গায়ে লিখে দিচ্ছি; কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখবে না।"

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য ধরে থাকতে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেস্‌টি আমার হাত থেকে নিয়ে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, একখানি কার্ড বার করে তার উপর পেন্সিল দিয়ে কি লিখে, আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে, কেস্‌টি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই, পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়েছিল তার উপর লাফিয়ে উঠে সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বললে। দেখতে-না-দেখতে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি Regent Street-এ ঢুকে, প্রথম যে restaurant চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে, এক পাইণ্ট শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে লাগলুম। দশ মিনিট দশ ঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছটা বাজা, অমনি আমি পকেট-কেস্ খুলে যা দেখলুম, তাতে আমার ভালবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে গেল। দেখি কার্ডখানি রয়েছে, গিনি কটি নেই! কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই কটি কথা লেখা ছিল: "পুরুষমানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনও খোঁজ না করো, তাহলে যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করিনি, পুলিস দিয়েও করাইনি। শুনে আশ্চর্য হবে, সেদিন আমার মনে রাগ হয়নি, দুঃখ হয়েছিল,—তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২০) প্রাইভেট টিউটর

১

বিজয়ের প্রথম পত্র

মন্মথ,

আমি বসুজার মেয়েকেই পড়াচ্ছি। মাসে ১২৲ বারোটি টাকা মাইনে পাই, তাতেই একরকম চলে যাচ্ছে।

কেমন আছি জিজ্ঞাসা করেছ। আছি ভালো—তোমার মতো ভগিনীপতি, এই সুখের চাকরি, দুঃখ কিসের বলো? তবে এক মহা অভাব এই যে, কিছুতেই আমি তোমাদের মতো কবি হতে পাল্লেম না। যাই হোক, এবার থেকে চেষ্টা করে দেখব, যদি কারও প্রেমে পড়তে পারি,—কবি হতে পারি। প্রেমিক-জীবনটা যদিও সুখের বলে মনে হয় না, তবু তোমাদের সহানুভূতি পাবার আশায় আমি বিরহের যন্ত্রণা সহিতেও রাজী আছি।

আমার ছাত্রীটি বড়ো শান্ত মেয়ে। বয়স বছর বারো-তেরো হবে। কায়েত-বামুনের ঘরে আজকাল মেয়ে বড়ো হয়েও আইবুড়ো থাকে—নীলাম ডেকে বর না কিনতে পাল্লে তো আর মেয়ের বিয়ে হয় না। তবে বসুজার টাকার অভাব নাই বটে, কিন্তু পছন্দমতো বরও তো জোটা চাই?

আমি যে ঘরে পড়াই, তার সুমুখের ঘরেই সরলার দাদারা পড়ে, পাশের ঘরে বসুজার বৈঠকখানা। সকালে তিনি এই ঘরে বসে নিরিবিলি খবরের কাগজ পড়েন। মাঝে মাঝে ছেলেদের ও মেয়েটির পড়াশুনার খবরও নিয়ে থাকেন। আমি এই তিন বছর সরলাকে পড়াচ্ছি। এর মধ্যে সে বেশ উন্নতিও করেছে।

আচ্ছা মন্মথ, তুমি কি মনে করো? সরলার মতো শান্তশিষ্ট সুন্দর মেয়েটির কি রকম বর হবে? আমার ভাই ধ্রুব বিশ্বাস, সরলা যার হাতে পড়বে, সে

বাস্তবিকই কপালে পুরুষ। শুধু রূপ বলে নয়, আমি রূপের তত পক্ষপাতী নই, —কিন্তু গুণ ও হৃদয় যাকে বলে,—তা ভাই সরলার যেমন আছে, এমন আর কারও আছে কিনা, জানিনে।

আজ এখনও সরলা পড়তে আসেনি, তাই বসে বসে তোমায় চিঠি লিখছি। রোজ তো এমনি সময়েই সে আসে, আজ এত দেরি করছে কেন, কে জানে। তুমি কেমন আছ হে? আমাদের কথা মনে পড়ে? না, সংসারের কোলাহলে পড়ে সব ভুলে যাচ্ছ?

তোমার বিজয়

২

সরলার প্রথম পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

বড়দিদি, তুমি চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, আর এতদিন লিখি নাই বলিয়া রাগ করিয়াছ। কিন্তু ভাই, আমি যে মনের দুঃখে আছি, তাহা আর কি বলিব। বাঙালীর ঘরে কেন মেয়ে হয়? দেখো ভাই, মেয়ে না হলে মা-বাপের এত ভাবনা হইত না। আচ্ছা দিদি, বিয়ে কি না হলেই নয়? মা আমার বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছেন, বাবার একতিল বিশ্রাম কি সোয়াস্তি নেই। আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এ-কথা যেন আর কাকেও বলিও না। ভুবন-বাবুকেও এ চিঠি দেখিও না, তিনি যেন এ চিঠি না পড়েন। তোমার পায়ে পড়ি, পড়ে ছিঁড়ে ফেলো। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। খোকা কেমন আছে; নতুন ঝি কেমন আছে, তাহা লিখিবে। তোমার শাশুড়ী কি এখনও তোমাকে তেমনি বকে? তুমি বলো, তোমার শাশুড়ীর বকুনির জ্বালায় তুমি ঝালাপালা হয়েছ। আমায় কিন্তু বুড়ীর বকুনির কথা মনে পড়লেই হাসি পায়। তুমি আমার প্রণাম জানিবে।

অধিনী সরলা

৩

সুমতির প্রথম পত্র

সরলা,

তোর চিঠি পড়ে হেসে মরি। আগে বিয়ে হোক তখন তাকে চিঠি লিখে অধিনী বলে নাম সই করিস্। বড়ো বোনকে চিঠি লিখে নাম সই করিবার

সময় কি লিখিতে হয়, জানিসনি?—তুই অত বড়ো বিদ্বানী, বাবা বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়াচ্ছেন, আজও একখানা চিঠি লিখতে শিখলিনি? কেবল ইংরাজি পড়ে মেম হচ্ছিস বুঝি?

তোর বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে বলে কত দুঃখই করেছিস্। হবে লো হবে, অত ব্যস্ত কেন? মা-বাপের কাজ মা-বাপ করবেন, তোর অত মাথাব্যথা কেন? স্পষ্ট কথা বল্ যে এখনও আইবুড়ো আছিস তাই দুঃখ করে চিঠি লিখেছিস্। তোমার ভাবনা নেই বোন, শিগ্‌গির তোমার বিয়ে দিতে আমি মাকে চিঠি লিখছি।

তোমার ভগিনীপতি যে রসিক, তাঁকে আর চিঠি দেখাব কি। প্রাণটা গেল এমন লোকের হাতেও পড়েছিলাম। এত দিনের পর, এই বুড়ো বয়সে, একটা ভাঙা হারমোনিয়াম কিনে রাতদিন বাজানো হচ্ছে তার কঁ্যা কোঁ শব্দে পাড়াসুদ্ধ লোকই অস্থির, তা খোকাকে ঘুম পাড়াব কি? আবার আমাকেও বলেন শিখতে। কপালে আগুন!

ও সরলা, তোর মাস্টারের ভগিনীপতি মন্মথবাবু, পরিবার নিয়ে এসে আমাদের বাড়ির পাশে বাসা করেছেন। আমার সঙ্গে তোর মাস্টারের বোনের ভাই বড়ো ভাব হয়েছে। কিন্তু জানোই তো তোমার ভগিনীপতি কেমন সদালাপী, তিনি গম্ভীর হয়েই জন্ম কাটালেন—লোকের সঙ্গে আলাপ প্রণয় তাঁর অদৃষ্টে আর এ জন্মে ঘটিল না। এঁর সঙ্গে মন্মথবাবুর তেমন মেশামেশি হয়নি, আলাপ আছে এইমাত্র।

খোকার কাল থেকে গা-গরম হয়েছে। তোরা সকলে কেমন আছিস লিখিস্। বাবা, মা, দাদাদের আমার প্রণাম জানাইবে, তোমরা আশীর্বাদ জানিবে।

আশীর্বাদক—সুমতি

৪

মন্মথবাবুর প্রথম পত্র

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি কবি হবে বলে ভয় দেখাইয়াছ, কিন্তু তাহার আর বাকি কি? তোমার পত্রের রূপবর্ণনার দৌড়টা একটু বেশি; আর তোমার অন্তর্দৃষ্টিটাও যেন কিছু অধিকমাত্রায় বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে। আর একটা কথা এই যে, "প্রেম" নিয়ে অত রঙ্গ করিও না। তোমার কঠিন মন, নহিলে তুমি প্রেম লইয়া উপহাস করিতে না। আজ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ বটে কিন্তু

কাল তুমি ধরা পড়তে পারো। রবীন্দ্রবাবুর "মায়ার খেলা" দেখেছ। তাতে বেশ একটি গান আছে,—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে?
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

বড়ো ঠিক কথা। অতএব, প্রেমিক কি বিরহবিধুর হবার জন্যে তোমায় বড়ো একটা চেষ্টা-চরিত্র করিতে হইবে না। হয়তো সে আপনি হবে; আর তোমায় ভরসা দিতেছি যে তখন আমাদের কাছে তুমি সহানুভূতি পাবে। কেননা, মানব প্রকৃতির প্রতি আমাদের তত বিরুদ্ধভাব নাই।

আচ্ছা, তোমার চিঠিতে তোমার ছাত্রীর অত কথা কেন? আমাদের কাছে সেই কুমারীর রূপগুলির অত বিস্তারিত বিবরণ পাঠানোই বা কেন? এখন সূর্যমুখী, কমলমণি, কুন্দ, শান্তি, এমন কি দেবী চৌধুরানী (সেই ব্রহ্মচর্য ও ঘড়া ঘড়া মোহর সমেত) প্রভৃতি বঙ্কিমবাবুর 'মানসী মেয়েদের যদি বিয়ের কনে বলে আমাদের কাছে কেউ নিয়ে আসে, তাহলেও আমরা ফিরে চাইনে। আমাদের যা আছে, তাই ভালো। কুমারীদের বর্ণনা আর আমাদের কাছে কেন?

যা হোক, এবার তোমাদের বাড়ির খবর বিশেষ করিয়া লিখিবে। তোমার ছাত্রীর কথা আমরা শুনতে চাইনে।

আমার ঠিকানা তোমার নিতান্তই অপছন্দ হবে। নূতন জায়গায় এসেছি, কিছু নূতন খবরের আশা তুমি করিতে পারো। এখানে একটি নূতন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি তোমার ছাত্রীর ভগিনীপতি ভুবনবাবু। যা তুমি বলেছিলে সত্য হে! কেবল থ্যাকারের গল্প—অসহ্য! অসহ্য! থ্যাকারে না হলে যেন দুনিয়া চলত না। কিন্তু থ্যাকারে ধন্য যে তাঁর এমন ভক্ত পাঠক জন্মেছেন! ভুবনবাবুর প্রাচীন বাংলা কাব্যও দেখা আছে, বিদ্যাপতির কিছু কিছু মুখস্ত। আর তাঁর বিদ্যাপতি পড়িবার ভঙ্গিটুকুও একটু নূতনতর। যাই হোক, এই মেড়ুয়া মহলে ভুবনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাই বাঁচা গেছে। কথা কয়ে আর সুদীর্ঘ সমালোচনা শুনে, এই প্রবাসে বিকেল বেলাটা এক এক দিন এক রকম কেটে যায়।

তোমার মন্মথ

৫

সরলার দ্বিতীয় পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমার রঙ্গ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে। তোমার বিয়ের আগে বুঝি তুমি 'বিয়ে বিয়ে' করে পাগল হয়েছিলে? সত্যই বুঝি তুমি ওসব কথা মাকে কিছু লিখেছ! মা কাল বলিতেছিলেন—"মেয়ে এত বড়ো হয়ে উঠলো, আজও বিয়ে হল না, ভেবে ভেবে সরলা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে।" কী লজ্জা! তুমি কেন এমন কাজ কল্লে? তোমায় আমি আর চিঠি লিখব না।

আমি না হয় ইংরিজি পড়ে মেম হয়েছি, অধিনী লিখে দোষ করেছি। তুমি যদি লোহারামের বাংলা ব্যাকরণখানাও মাস্টারের কাছে পড়তে পেতে, তা হলে "আশীর্বাদক" না লিখে "আশীর্বাদিকা" লিখিতে। আর লেখাপড়া শিখলেই বুঝি "বিদ্বানী" বলে ঠাট্টা কত্তে হয়? তোমাদেরও তো মাস্টারনী পড়িয়ে যেত। আমার মতন মাস্টার পেতে তো তুমিও বেঁচে যেতে। পাওনি, তাই বুঝি হিংসা হয়েছে?

মাস্টারমশায়ের বোনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে শুনে মাস্টারমহাশয় কত আহ্লাদিত হলেন। তার নাম হরিদাসী, নয়? আচ্ছা দিদি, হরিদাসী কেমন দেখতে? বোনের মুখে যদি ভাইয়ের মুখের আদল এসে থাকে, তাহলে বোধ হয়, হরিদাসী ভাইয়ের মতো বড়ো বড়ো ভাসা ভাসা চোখ, ছোট্ট কপালখানি, পাতলা ঠোঁট, কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল পেয়েছে। এ দিকে কেমন?—হরিদাসী মাস্টারমহাশয়ের মতো সাদাসিদে ও শান্তশিষ্ট কিনা, লিখিবে।

আমরা সকলে ভালো আছি। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। খোকা কি সারিয়াছে?

সরলা

৬

ভুবনবাবুর পত্র

সরলে

তোমার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তুমি সুমতিকে যে পত্র লিখেছিলে তাহা দৈবাৎ আমার হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য যে আমি তাহা পড়িয়াছি।

"পহিল হি বরষ না পুরল সাধ।"

তোমার অতৃপ্ত হৃদয়ে অনেক আশা জাগিতে পারে। কিন্তু সরলে! সাবধান, এ পৃথিবীতে সকলের সব আশা পূর্ণ হয় না।

থ্যাকারের নভেলে একটি চরিত্র আছে। সেও তোমার মতো প্রথমে তাহার মাস্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিত। শেষে তাহাকে ভালবাসিয়া বেচারী কী কষ্টই না সহ্য করিল! সে তবু বিলাতে। আমাদের এই পতিত ভারতে, বিশেষ এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, প্রেম তো জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই প্রেমিকের প্রাণসংহার করে। তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, "হরি হরি পীরিতি না কর জনি কোই।"

তুমিও মাস্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিতে দেখিতে চাই কি ভালবাসিতে পারো। কিন্তু তোমাদের মিলন অসম্ভব। আমার সন্দেহ হয় যে, হয়তো তুমি নিজের অজ্ঞাতসারে মাস্টারকে ভালবেসে ফেলেছ। কিন্তু তোমার বাপ তোমায় কখনও গরিবের হাতে সমর্পণ করিবেন না। অতএব সাবধান! লক্ষ্মি, তুমি নিজে মন বাঁধিতে চেষ্টা করো।

আমিও প্রথম বয়সে প্রাইভেট টিউশন কত্তে গিয়ে, একটি ছাত্রের ভগিনীকে ভালবাসিয়াছিলাম। কখনও কখনও তাহাকে চকিতে মতো দেখিতে পাইতাম, এইমাত্র। তাহার সহিত কখনও কথা পর্যন্ত কহি নাই। কিন্তু সেই অতৃপ্তি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। পুরুষের কঠিন প্রাণে যে প্রেম এত দাগ রাখিয়া যায়, নারীর কোমল প্রাণ যে তাহাতে ক্ষত-বিক্ষত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার কথাগুলি অপ্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু সরলে! "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভুবনচন্দ্র মিত্র

৭

বিজয়ের দ্বিতীয় পত্র

প্রিয় মন্মথ,

তোমার পত্র পাইয়া বড়ো আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি চিঠিপত্রে আবার তর্ক তুলিতে চাও। কিন্তু আমি তাহাতে নারাজ, জানিবে। কেননা, আজ কাল আমি তর্কে বড়ো প্রস্তুত নই। আট-ঘাট বেঁধে কথা কওয়া এখন বড়ো কষ্টকর বলে মনে হয়। সেই যখন প্রথম বয়সে আমাদের "সাহিত্য সমাজে" তর্ক শুনতে পাওয়া যেত, সেই এক দিন আর এই এক দিন। আমার সেই তখনকার তর্কযুদ্ধ মনে পড়িলে, এখনও বেশ আমোদ হয়। ক-বাবু অনর্গল

বক্তৃতা-ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে যুক্তির লৌহ-পথ বাহিয়া সবেগে চলিয়াছেন আর সভ্যগণ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন। আমি এককোণে সিগারেটের ধূমজালে আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি, এবং মধ্যে মধ্যে তোমাদের সভার সম্পাদক, সেই কুঞ্চিতকুন্তল নবীন কবি বন্ধুর কানে কানে গল্প করিতে গিয়া "সভায় নীরবে শোনাই বিধি", এই অমূল্য উপদেশ শুনে আবার স্বস্থানে ফিরে বসছি। আর খ-বাবুর সঙ্গে ক-বাবুর কী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। তোমার মনে পড়ছে কি,—যেই খ-বাবু ধীরললিতে দুটি-একটি কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, ক-বাবু অমনি সর্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক, তৎক্ষণাৎ নোটবুক বের করে টুকতে বসতেন। তারপর, সেই নোট-বই দেখে দেখে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদবাণ বর্ষণ করা হত। আর, তোমাদের সমিতির একজন সভ্য, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কি যুগ্ম নাম দিয়াছিল মনে পড়ে?—ওসমান আর জগৎসিংহ। কিন্তু এখনও জানা গেল না,—দুজনের মধ্যে ওসমান কে? ক-বাবুকে তোমরা বক্তা বলতে, কিন্তু যদি মাপ করো তো বলি,—আমার তো ভাই তাকে কমবক্তা ছাড়া আর কিছু মনে হত না।

তুমি দেখছি এখনও "সাহিত্য-সমাজের" ঝোঁক কাটাতে পারোনি। পত্রেই প্রেম নিয়ে ঝগড়া কত্তে চাও। আমি দু-কথা লিখি তারপর তুমি পাঁচ পাতায় ক্রমাগত আমাকে আক্রমণ করো আর কি।

আমি ধীরে সুস্থে দুই চারিটি কথা বলিয়া যাইব মাত্র। এখন কেমন একরকম হয়ে পড়েছি,—কেবল বহুদিনের গত কথা ভাবিতে ভালো লাগে, বর্তমান যেন বিষের মতো বোধ হইতেছে। কেন জানো?

মনটা তত ভালো নয়। কেমন যেন অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি। আজ আর তোমায় মনের কথা লিখে কষ্ট দেব না। যদি তুমি অনুমতি দাও, তাহলে নয় আমি তোমায় জব্দ করিবার জন্য, বারান্তরে যা খুশি তাই লিখিতে আরম্ভ করিব।

আচ্ছা, কে বললে যে, আমি কঠিন? আমি কখনও এমন কথা বলিনি যে, প্রেম পাগলামি। আমার বক্তব্য এই যে, ভালবাসা নিয়ে অত নাড়াচাড়া কেন? এই যে কাগজে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত নানাবিধ কবির রকমারী প্রেমের খেয়াল পড়া যায়, সে সব কবিতা, সে সব সেন্টিমেন্টাল জিনিস জগতে ছড়িয়ে লাভ কি? আমি যদি ভালবেসে থাকি,—ভালবেসে নিরাশ হয়ে থাকি, কি ভালবেসে সুখী হয়ে থাকি, সে-সব সুখ-দুঃখ

আমার হৃদয়ের ভিতরেই বন্দী থাক না কেন? তা নিয়ে সমস্ত দুনিয়া ওলট-পালট করিবার কিছু গুরুতর প্রয়োজন আছে, এমন তো বোধ হয় না। তবে বলতে পারো, বন্ধুবান্ধব, যাঁরা হৃদয়ের অংশভাগী, লুকোচুরি কত্তে গেলে তাদের কাছেও কপটাচরণ কত্তে হয়। কিন্তু আমি বলি, দু-দলে কপটাচার না করে, একপক্ষেই সেটা সংযত করে রাখা কি সঙ্গত নয়? আমি যদি আজ তোমার কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলে দিই—তুমি কি সেখানে বিচরণ করে বিন্দুমাত্র সুখ পাবে? অথচ সেই বৃথা শ্রমের বিরক্তিটুকু কি সাধ্যমতো আমার কাছে লুকোবে না? আন্তরিক সহানুভূতি জগতে বড়ো অল্প, সেই দুর্লভ রত্ন লাভ করিবার জন্য যদি উপহাস মাথায় বহিতে হয়, তবে এ বিড়ম্বনায় কাজ কি?

বাড়ির খবর আর কি দেব? প্রাণে প্রাণে সকলে বেঁচে আছে মাত্র। কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ করিয়াছি—এখন মাসে মাসে সেই টাকাটাও আদায় করতে পারা অসম্ভব। ঝক্‌মারী আর কাকে বলে?

সরলার দিদি সুমতির সঙ্গে হরিদাসীর আলাপ হয়েছে, শুনে সত্যি বড়ো আহ্লাদ হল। আমি ভাই তোমার কাছে আর সরলার নাম করব না। শেষে তুমি মনে করবে, আমি সরলার প্রেমে পড়েছি। তোমাদের অসাধ্য নেই—মানুষের মন না মতি, কিসে কি হয় কে জানে?

তোমায় চিঠি লিখছি না প্রবন্ধ করে তুলছি বুঝতে পারছি না। যদি প্রবন্ধ হয়ে থাকে—তাহলে যা হোক একটা নূতন বাংলা মাসিকের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিও—লুফে নেবে।

আজ আর "ইতি" দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাই, সরলাকে পড়াইয়া আসি। তুমি কিছু বিরুদ্ধ ভেবো না,—নিতান্ত অশান্তির সময়েও, সরলাকে যখন পড়াতে যাই, তখন আমি থাকি ভালো। হে কবিবর! তুমি কি ইহার মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে পারিবে না?

বিজয়

৮

মন্মথবাবুর দ্বিতীয় পত্র

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,

তোমার পত্র পড়ে এবার বড়ো সন্দেহ হল। তোমার মনটা যে বড়ো চঞ্চল, কত কি যে লিখেছ,—তার হিসাব করা ভার। তোমার মনের ভিতর যেন

একটা কি গোলমাল চলছে—বলিতে ইচ্ছা করিতেছে,—কিন্তু পারিতেছ না ;—সাধ্যমতো ঢাকিয়া রাখিতেছ। ব্যাপার কি বিজয়! আমার কাছে ভাই লুকোচুরি কেন? তুমি তো কোনোও কালেই সহানুভূতির প্রার্থী ছিলে না। আজ সেজন্যে এত ওকালতি কেন? মনের যে অবস্থায় মানুষ একলা দাঁড়াইতে পারে না—একজনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে চায়, তোমারও যেন সেই দশা বলিয়া মনে হইতেছে।

উপহাস ভাবিও না, ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিও না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি যথার্থ উত্তর দাও—তুমি কি সরলাকে ভালবাসো?

তোমার মন্মথ

বিজয়ের তৃতীয় পত্র

মনু,

তুমি সত্যই মানুষের অন্তস্থল দেখিতে পাও—আমায় একবার তোমার সেই শক্তি দিতে পারো?—দেখি সে আমায় ভালবাসে কিনা।

তোমার কাছে লুকাইব না। আর লুকোচুরি চলিতেছে না। আজ বলিবই—

"—পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

আমারও প্রেমের স্রোত চলিল,—এই আগ্নেয় নিঃস্রব ছুটিল,—মন্মথ, তুমি দেখো, কেহ ইহার গতি রোধ করিতে পারিবে না। তোমার অনুমান সত্য ; সত্যই আমি ভালবাসি—আমার নাকে কানে খৎ, আমার ঘাট হইয়াছে—আমি ঝকমারী করিয়াছি—হে প্রেম! তোমার আর নিন্দা করিব না! তুমি আমার—এই দীন দরিদ্র প্রাইভেট টিউটরের ঘাড় হইতে নামিয়া যাও—আমি বাঁচি। কে বলল, প্রেম করা পাগলামি? কে বলে, প্রেমের কবিতা, কাব্য, সব ছাই। এত দিনে বুঝিলাম, আর শিখাইবার দরকার নাই। হে প্রেম, তুমি রূপজ, গুণজ, মোহজ, রোগজ, যাই হও, আমায় ছাড়ো! তুমি সকাম, নিষ্কাম, অকাম, সহেতুক, অহেতুক, যাই হও না কেন, আমায় অব্যাহতি দাও। তুমি আমায় পাকড়াও করিলে কেন? বারোটি টাকা মাহিনা পাই, চারিটি টাকা দেশে পাঠাইয়া আটটি টাকায় কথঞ্চিৎ কলিকাতার বাসায় দগ্ধোদর পূর্ণ করি, আর বাঁচিয়া মরিয়া থাকি, আমার ওপর তোমার এ জারিজুরি

কেন? 'সানকির উপর বজ্রাঘাত' কেন? প্রেম! তুমি অন্ধ কে বলে? তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া এই দুর্বল শিকার বাছিয়া লইলে কিরূপে? আমি কি পারিব? আমার কি সহিবে? আমি কেমন করিয়া "প্রেমের পাগল" হই বলো? আমার পক্ষে লম্বা লম্বা চুল রাখা অসম্ভব—তেল যোগাইব কেমন করিয়া? রাস্তার ধূলায় ও বিনা তৈলে প্রেমিকের কুন্তলজাল দু-দিনে সন্ন্যাসীর জটা হইয়া যাইবে। সোনার চশমা নাই যে চোখে দিয়া চোখের জল ঢাকিয়া রাখিব। আমায় হাঁটিয়া শহর মাথায় করিয়া উমেদারী করিতে হয়,—লোকের সামনে পড়িলেই যদি ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইতে হয় তো আমি গাড়িচাপা পড়িয়া মরিব! তবে কবিতা লিখিতে বলো তো পারি; কিন্তু হাতে কিছু নাই যে ছাপাইয়া শেষে বিনামূল্যে বেচিব। আমার সঙ্গতি নাই যে, নিরাশ হইয়া, শেষকালে, চন্দন কাঠের পাখা ভাঙিয়া চিতা করিয়া, প্রিয়তমের পত্র কি প্রথম সম্ভাষণে কবিতাগুলি পোড়াইব, তারপর পিনোর ফরাসী সৌরভ ঢালিয়া চিতা নিভাইব। হে প্রেম, তোমায় দুঃখের কথা বলিব কি, আমি যে জামার একটি বোতাম খুলিয়া রাখিয়া একটু কবিতা করিব, আমার সে গুড়েও বালি। কেননা আমার শ্লেষ্মার ধাত। এই জন্যই 'রাতে চাঁদের পানে চাহিয়া বারে বারে কাঁদিতে' পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি নিতান্তই নালায়েক কম্বক্ত; আমার প্রতি তোমার এ জুলুম কেন? শৌখিন বাবুদের কাছে যাও, আমায় ছাড়ো—কেন এই দীন-দুঃখীর ইহকাল পরকাল নষ্ট করো, বলো।

মনু, কি পাগলের মতো বকিলাম, কিছু মনে করিও না। আমাতে আর আমি নেই। বিজয় অনেক দিন গেছে, আমি তার প্রেত। আচ্ছা মনু, আমার কেন এ দুরাশা? যাহাকে পাইব না জানি, প্রাণ কেন তাহাকে পাইতে চায় বলিতে পারো? সরলা, সরলা। তোমাকেও বুঝি তাহার কথা লিখিয়াছি? তা হবে। সেই যে এখন আমার জ্ঞান, ধ্যান, সব।

তুমি ভাই আমায় দোষ দিও না! প্রেম অন্ধ, তা তো জানো। কে কবে বুঝিয়া-সুজিয়া, হিসাব করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেম করিয়াছে? প্রেম কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। আমিই না হয় রুক্ষকেশ, ছিন্নবেশ, প্রাইভেট টিউটর, পরাধীন দাস, কিন্তু আমার হৃদয় তো স্বাধীন।

দারিদ্র্য এত দুঃখের। দারিদ্র্য বাঞ্ছিতকে কাড়িয়া লইয়া যায়। আগে ভাই আমার সন্তোষ ছিল কিন্তু এখন আমি ঘোর অসন্তুষ্ট। কি করিলে পয়সা হয় বলিতে পারো? হায়! আমার মরণের জন্য এ পাপ দারিদ্র্য কোথা হইতে

আসিল ?—এক প্যাক বাহারে কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই যে, তাহাকে চিঠি লিখিয়া মনের জ্বালা জুড়াই। এই ছাই-ভস্ম কাগজগুলোতে কি প্রণয়িনীকে চিঠি লেখা যায় ? কত কবিতা লিখিয়াছি, কিন্তু পয়সা কই যে, ছাপাইয়া, সাফ 'তুমি নাও' বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিই, প্রাণটা সুস্থির করি। হায়, হায়, করি কি ?

আচ্ছা, সরলা কি আমাকে ভালবাসে ? কখনও কখনও আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, আমি চাহিলেই চোখদুটি অবনত করিয়া, নখ দিয়া খাতার উপর দাগ টানে, নয় তো আঁচলের খুঁট লইয়া আঙুলে জড়ায়। ভালো না বাসিলে সে বড়োমানুষের মেয়ে আমার দিকে চাহিবে কেন ? সে তো আমার মতো মুখাপেক্ষী উমেদার নয় যে, সদা সর্বদা আমার মুখ প্রতি কাতর দৃষ্টি সন্ধান করিয়া দিন রাত মুখ চাহিয়াই বসিয়া থাকিবে ? তবে সেও আমায় ভালবাসে। হায়, হায়, এই সুন্দর বালিকা ফুল, এ কি এ যাতনা সহিয়াও ফুটিয়া উঠিবে, না ঝরিয়া যাইবে ?

আমারও তোমার মতো রবি ঠাকুরের গানটি মনে পড়িতেছে—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

এখন মরণ! তুমিই আমার সুহৃদ, সহায়, সব। এসো, এই দারুণ অতৃপ্ত বাসনা তুমিই পূর্ণ করো, আমায় শান্তি দাও।

আর কি লিখিব, বলো। আর কি লিখিয়া তোমায় বুঝাইব যে, আমি প্রেমের নিন্দুক নহি—একটি শিকার—

শ্রীবিজয়

১০

সরলার তৃতীয় পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমরা দুজনে কি পাগল হয়েছ ? আমি মাস্টার মহাশয়ের কথা কি লিখিয়াছি যে, ভুবনবাবু আমায় অমন করিয়া পত্র লেখেন ? ভুবনবাবুর চিঠি পাঠাই, দেখিবে। তোমরা সব করিতে পারো। এই চিঠি যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, তাহা হইলে মাস্টার মহাশয়ের সর্বনাশ হইত। আমারও লজ্জার সীমা থাকিত না। তিনি পূজনীয়, গুরু ; আমার জন্য তাহার অনিষ্ট হইলে কি আমার পাপ হইবে না ? আমি না হয় আর তাহার কাছে পড়িব না। তোমাদের পায়ে পড়ি, এমন করে আর আমার কলঙ্ক রটিও না। মা এসব

মিছে কথা শুনলে একে আর বুঝবেন, হয়তো গলায় দড়ি দিবেন। আমরা মরিলেই কি তোমরা বাঁচো?

সরলা

১১

মন্মথবাবুর তৃতীয় পত্র

প্রিয় বিজয়,

তোমার পত্র পড়িয়া প্রথমটা মনে করিয়াছিলাম, তুমি ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু শেষভাগ পড়িয়া বুঝিলাম, তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারিয়াছ। কিন্তু ভাই, এই প্রাণের যন্ত্রণার কথা যে আমায় খুলিয়া লিখিয়াছ, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন আমি তোমায় উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারিব। তুমি এই পত্রপাঠ মাত্র চাকরি ছাড়িয়া দিবে, আর বসুজার বাড়ির ত্রিসীমায় যাইবে না। সরলা, তোমার হইবার নয়, ইহা স্থির জানিবে। শুধু তাহাকে দেখিবার আশায় পড়াইতে গিয়া নিজে মজিও না। এখন তুমি আমার কাছে এসো। আমি প্রাণপণে তোমার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে, অন্যথা করিও না, পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে।

তোমার মন্মথ

১২

বিজয়ের চতুর্থ পত্র

প্রিয় মন্মথ,

তবে নাকি আমি কবি নই, তবে নাকি আমি প্রেম বুঝিনি। তুমি যাই বলো, আর আমি ফিরিব না। হয় সরলা, নয় মরণ, এ দুয়ের এক নহিলে আমার শান্তি নেই। উঃ, কী কষ্ট! কী বিরহ! কী যন্ত্রণা! হা দগ্ধোস্মি, হা হতোস্মি! তুমি গোটা কতক নলিনী-পত্র পাঠিয়ে দিও; আমার ষোলো আনা বিরহ! নলিনী-পত্রের শয্যায় শুয়ে থাকবো, বিছানায় যে ছারপোকা, রাত্রে ঘুম হয় না।—যদি বিরহীদের শয়নে শুয়ে একটু ঘুমাইতে পারি তো চাই-কি স্বপ্নেও মিলন হতে পারে।

তুমি কি পাগল? ঠাট্টা করে একখানা চিঠি লিখিয়াছি, তুমি সত্য মনে করিয়া লইলে! তোমরা কবিতাই পড়ে থাকো, একখানা চিঠি পড়ে বুঝতে পারো না। আ আমার অদৃষ্ট।

তোমার কথায় এই বারো টাকা মাহিনার চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে উপোস করে মরি আর কি।

তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি বেশ আছি; শারীরিক ও মানসিক, আমার সর্বাঙ্গীণ কুশল। আর আমার পূর্ব পত্রখানি ছিঁড়ে ফেলো, যদি দৈবাৎ কারও হাতে পড়ে, একটা গুজব রটিতে পারে। ভদ্রলোকের মেয়ের নামটা করে ভালো হয়নি। এখন পস্তাচ্ছি। বেশ জেনো, পত্রে বিন্দুমাত্র সত্য নেই, আগাগোড়া ঠাট্টা করে লিখে গেছি। "ভালবাসার ধার ধারিনে, ভালবাসা কে বা জানে?"

তোমার বিজয়

১৩

সরলার চতুর্থ পত্র

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমাদের মনে এই ছিল? তোমাদেরই বা দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। নইলে তিল থেকে তাল হবে কেন? তোমাদের কে বললে যে, আমি মাস্টারকে ভালবাসি। তুমি দাদাকে কি লিখেছ তুমিই জানো। দাদা বউকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, বউদিদি আমায় ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন—"ছি! মাস্টারকে কি ভালবাসতে আছে?" আমি তো অবাক। পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি লুকাই। আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার এই কলঙ্ক রটালে? আমি গলায় দড়ি দিয়া না মরিলে আর তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। তাই হবে।

সরলা

১৪

বিজয়ের শেষ পত্র

নাগপুর

প্রিয় মনু,

আমি এখানে একজন তুলা ব্যবসায়ীর ফার্মে একটি চাকরি পাইয়াছি। মাসে ১২৲ টাকা থেকে একেবারে ১৫০৲ টাকা। বসুজার বড়োছেলে আমার জামিন, তিনি নিজে চেষ্টা করে, আমায় এ চাকরি করে দিয়েছেন। আমি তো প্রথমে অবাক হইয়া গিয়েছিলাম, কিন্তু শেষে তোমার পত্র পড়িয়া সব বুঝিতে পারিলাম।

তোমার চিঠি redirect হইয়া এখানে আসিয়াছে। কাজেই অনেক দেরিতে পাইলাম।

তুমি লিখিয়াছ যে আমি ঠাট্টা করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠি দুখানি হরিদাসী চুরি করিয়া পড়িয়া বালিশের নিচে রাখিয়া দিয়াছিল, তার পর আর পাওয়া যায় নাই। সেইদিন সরলার বোন সুমতি তোমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিল, এবং অনেকক্ষণ সেই ঘরে ছিল, তাই ভয় করেছিলে যে হয়তো সুমতিই চিঠিখানা দেখতে পেয়ে নিয়ে গেছে। তোমার শেষ অনুমান এই যে, যদি সে চিঠি সত্যই সুমতির হস্তগত হয়ে থাকে, তাহলে সে হয়তো চিঠিখানি বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছে ; এবং বয়স্কা শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে এ ভাবটা বড়ো গৌরবজনক মনে না করাতে, আমার চাকরিটি গেছে। তোমার অনুমান সত্য—চাকরিটি গেছে কিন্তু তার চেয়ে ভালো চাকরি হয়েছে। আর তোমার আশঙ্কাও সত্য, চিঠিগুলি সরলার বোন সুমতিই দেখিতে পাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তারপর বাপের বাড়িতে পাঠাইয়াছিল ; সেখানেও সকলে ঘটনাটা সত্য মনে করিয়াছে। কেননা, পরবর্তী ঘটনায় তা ছাড়া আর কিছু তো অনুমান করা যায় না। কিন্তু এই প্রহসনের শেষে যে উত্তম-মধ্যম জল-যোগের ব্যবস্থা হয়নি, সেটা আমার ভাগ্য। আমি সরলার দাদার চিঠিখানি নকল করিয়া দিই, পড়িলে বুঝিতে পারিবে, ব্যাপারখানা কি?

"প্রিয় বিজয়,

"তোমার আর সরলার, উভয়ের মঙ্গলের জন্য তোমার স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। তুমি আজ রাত্রেই নাগপুরে রওনা হও, সেখানে —ফার্মে গিয়া দেখা করিও। তুমি সেখানে চাকরি পাইবে। এই সঙ্গে যে খানকতক নোট রহিল, তদ্দ্বারা নাগপুরে যাইবার আয়োজন করিও। আমি তাদের টেলিগ্রাম করিলাম ; নাগপুরে গিয়াও তোমার কোনো কষ্ট হইবার নাই।

"তুমি টাকা লইতে সংকুচিত হইও না। তুমি চাকরি করিতে চলিলে, অনায়াসে এই সামান্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে। বাবা না থাকিলে আমি প্রাণপণ করিয়াও সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়—দুঃখিত হইও না,—না বলিলে নয় তুমি কুলীন নও, ধনী নও। বাবার আদরের ছোট মেয়ে। তিনি কিছুতেই রাজী হইবেন না।

"ফার্স্ট বুক থেকে আমরা একসঙ্গে পড়ে আসছি। তুমি কি আমার একটি

কথা রাখিবে না? সরলার কোনোও সংস্রবে তুমি থাকিও না। তাকে চিঠি লিখিও না; যদি তার চিঠি পাও, পড়ো না।

"একথা যেন কর্ণান্তর না হয়, একটি পরিবারের সম্মান আশা করি তুমি রক্ষা করিবে।

"আমার সঙ্গে দেখা করো না। আজ রাত্রেই চলিয়া যাইও,—অন্যমত করিও না।

"পুরুষের মন, অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত রাখিতে পারিবে। আশা করি, 'প্রতাপে'র মত সংযমী হইয়া সংসার-রণে অগ্রসর হইবে।

সোদরাভিমানী

শ্রীজগদীশ্বর বসু"

এই তো জগদীশ্বরের চিঠি! চিঠি পাইয়া নোট ক-খানি লইয়া, সেইদিন রাত্রেই নাগপুর রওনা হইয়াছিলাম। তারপর, এখানে আসিয়া, এই নূতন চাকরিতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। জগদীশ্বরের ৪০০৲ টাকা লইয়াছি বলিয়া কিছু মনে করিও না। চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই আমি পরিশোধ করিব। আমি কমিশন পাই, তাছাড়া আপকেওয়াস্তে রাজাদের দরখাস্ত ও চিঠিপত্র লিখিয়াও কিছু পাইব। আমার টাকা জমিবে, তখন ঋণমুক্ত হইব।

আর সরলা!—তুমি চিরকাল সুখে থাকো। আমি জানি, তোমার অমল মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়েনি। বালিকার প্রেম, বিশেষত বাঙালীর মেয়ের পূর্বরাগ, ওসব বঙ্কিমবাবুর গাঁজাখুরি।

আর মনু, আমাকেও তো তুমি চেনো; যার পেটে ভাত নেই, তার প্রেমে পড়িবার অবসর বড়োই কম, এটা অবধারিত জানিবে।

আমি জগদীশ্বরকে সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছি। এসব যে কিছুই নয়, খুব সম্ভব, সে তাহা বুঝিতে পারিবে। সরলার নাম. এই রহস্যের ব্যাপারে না জড়াইলে আমার চাকরি হইত না বটে, কিন্তু এটা বড়ো ভদ্রোচিত হয় নাই। এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছি, সে কি আমাকে ক্ষমা করিবে না?

এখন এক কাজ করো দেখি, নাগপুরে বেড়াতে এসো না। সন্ধ্যার সময় বাহিরে বসিয়া, এই পর্বতময় প্রদেশের হরিৎ ছবি দেখিতে দেখিতে নাগপুরের কমলালেবু খাওয়া যাবে। প্রেমের চেয়ে এখানকার লেবু ভালো, আমি তোমায় তা শপথ করিয়া বলিতে পারি। সফল প্রেমিক, বিজয়

আমি সুখী কেন (—১৯৩১) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
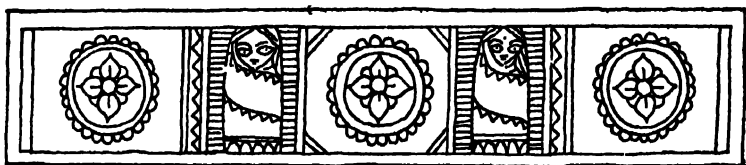
০০ এক ০০

তোমরা সুখ-দুঃখের কি জানো? তোমরা যাহা জানো, আমি তাহা জানি, আমি তাহা হইতেও অধিক জানি।

আমি জানি—অপরাজিতা বিধবা হইয়াছিল। তোমরা তাহা জানো কি? দেখিতেছি, তোমরা তাহার কিছুই জানো না। কিন্তু সংসারে কে কার খোঁজ রাখে? তোমাদের কোনো দোষ নাই।

তোমরা বলো—সংসারে এত দুঃখ কেন? তাই বলিয়া কাঁদো। আমি বলি, সংসারে এত সুখ কেন? তাই বলিয়া হাসি। তোমার সুখের গৃহে দুঃখ দেখিলে কাঁদো। আমার দুঃখের কুটিরে সুখ দেখিলে হাসি। তোমার প্রাসাদে খঞ্জ অন্ধ গেলে তুমি কাঁদো। আমার ভাঙা ঘরে রাঙা বধূ দেখিলে আমি হাসি। তোমারও দোষ নাই, আমারও দোষ নাই।

এই হাসি-কান্নার মধ্যে অপরাজিতা বিধবা হইয়া গেল। স্বামীর কুল পিতার কুল, দুই কুলই কাঁদিয়া আকুল। আমি হাসিলাম। কেন বুঝিলে? পরে বলিতেছি।

অপরাজিতা ছোট। তবে এমনই কি নিতান্ত ছোট? আবার এমনই কি নিতান্ত বড়ো? অপরাজিতা রাঁধিতে জানে না, গৃহকর্ম জানে না। অপরাজিতা মুখরা। এমন বিধবা ঘরে রাখিয়া লাভ কি? তাই অপরাজিতা বাপের বাটী আসিল। আসিয়াই ফুটিল।

কিন্তু অপরাজিতা ফুটিলেই কি ভ্রমর ছুটে? তাহাও নয়। অপরাজিতা নীল বৈধব্য-অবগুণ্ঠন পরিয়া প্রাচীর বেষ্টিত গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া সুনীল অনন্ত আকাশপানে চাহিয়া থাকিত। কাজেই ভ্রমরকুলের অভাব হইয়া পড়িল।

অপরাজিতা কি স্বামীর সোহাগ পাইয়াছিল? মোটেই না। সে স্বামীকে

একবারের অধিক দেখিয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাহাও বিবাহের পূর্বে। বিবাহের সময়, অর্থাৎ শুভদৃষ্টির সময়, অপরাজিতা চক্ষু উন্মীলন করে নাই। তারপর কয়টা দিন স্বামীর ভয়ে রাত্রিকালে বিড়ালের সঙ্গে রন্ধনশালায় শুইয়া থাকিত।

তুমি মনে করিবে, স্বামীটা হয়তো ছিল মাতাল। তাহাও না। তবে কিছু কিছু অর্থাৎ ৺চন্দ্রকান্ত দেবশর্মা অনেক বিবাহ করিয়া শেষ বিবাহের কিয়দ্দিন পূর্ব হইতে অহিফেন সেবন করিতেন, এবং বিবাহ করিয়া মাত্রা এত বাড়াইয়া ছিলেন যে, নবীনা বধূর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোনো বিশ্বাসই ছিল না। ফুলশয্যার নিশাকালে অপরাজিতা কাঁদিতে বসিলে ৺চন্দ্রকান্ত দেবশর্মার অহিফেনানুপ্রাণিত পরম নেশামধুর ক্ষীরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র তিনি সত্রাসে বলিয়াছিলেন, "ঘরে ম্যাও করে কেটা—বিড়াল নাকি?" যাহারা আড়ি পাতিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই এই অপূর্ব রহস্যোক্তির তীক্ষ্ণ ধারে হাসিয়া আটখানা হইল। কেবল অপরাজিতা কাঁদিল। ৺চন্দ্রকান্তের বয়স তখন পঞ্চান্ন বৎসর। রীতিমতো ত্রৈরাশিক কষিলে তাঁহার শেষ পক্ষের স্ত্রীর বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া চতুর্দশ হইয়া গিয়াছিল, ইহা তো স্বাভাবিক কথা নয়!

আমার সহিত অপরাজিতার পূর্বেই বিবাহের কথা হইয়াছিল, কিন্তু ৺চন্দ্রকান্ত কুলীনাগ্রগণ্য এবং রাশীকৃত ধনের ঈশ্বর। এখনও কৌলীন্যের প্রভাব বঙ্গের বায়ু ও বল্লরীতে মুদ্রিত। আমার দাবির মধ্যে কেবল চেহারাখানা ও একটু ভাষাজ্ঞান। তাহার পরিচয় পাইতেছেন বোধ হয়। আমার চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির পরিচয়ে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তখন মনে মনে দারুণ অভিশাপ দিয়াছিলাম,—"তুমি মরিলে আর একবার দেখিব।"

মানব-চরিত্র বিচিত্র ব্যাপার, সত্য কথায় চটা উচিত নয়। ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলিল।

০০ দুই ০০

রুদ্ধ হৃদয়বেদনা দগ্ধ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ছাড়িয়া দিয়া ৺চন্দ্রকান্ত দেবশর্মার মুখাগ্নি জ্বলন্ত করিলাম। তোমরা বলিতে পারো, "লোকটা (অর্থাৎ আমি) কী পাজি এবং ভাষাটা কী রুক্ষ ও অশ্লীল।" তবে আমার চরিত্রটাও দৃষ্টিপাত-

যোগ্য। আমি একটা পাড়াগেঁয়ে বানর, আমি যদি বলিতাম, "সেই ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাবেলায়, য[illegible] লোহকঠিন মানবদেহ ভেদ করিয়া ৬চন্দ্রকান্তের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ আত্মা অগ্নিসংস্কৃত হইয়া দ্যুলোকে উঠিতেছিল, তখন একটু সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া অপরাজিতার শান্ত লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি চর্মচক্ষুর অন্তরালবর্তী মনোনেত্রের উপর ঈষৎ-পূরবী-রাগিণী-কম্পিত তুলিকায় টানিলাম," তবে তুমি বলিতে, "ব্যাটা রবি ঠাকুরের নকল হচ্ছে।" কাজেই সেকালের ভাষাবীণাযন্ত্রে একালের বখামির একটু মিড় টানিয়া কিঞ্চিৎ নূতনত্বের সৃষ্টি করিতেছি।

আমার মাথার সম্মুখে বড়ো চুল, পশ্চাতে খাটো, তদুপরি বাঁদুরে টুপি (মন্‌কি ক্যাপ), দাড়ি কামানো, গাত্রে চাঁদনির আড়াই টাকার অ্যাঙ্গোলার ডবলব্রেস্ট কোট, তন্নিম্নে গেঞ্জি এবং তাহারই দক্ষিণ দিকের পকেটে অগ্‌ডেনের ট্যাবসিগারেট, বাম দিকে নস্যের ডিবা ও দেশলাই। চক্ষু কটা। বয়স দেখলে অনুমান করা যায় না। যখন বাইসিকেলে ছুটি, তখন আমাকে অনেকটা বালকের মতো বোধ হয়। কেননা গোঁফ দেখা যায় না। যখন পাড়ায় বেড়াই, তখন প্রৌঢ়া ও যুবতী সকলেই আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানে। ইহাতে বয়সের অনুমান করিয়া লও।

শ্মশানঘাট হইতে বাইসিকেল পৃষ্ঠে গৃহাভিমুখে দৌড়িলাম। সম্মুখেই এক গোরুর পাল। তন্মধ্যে বসাকদিগের শামলা নব-বৎস-রক্ষণশীলা চঞ্চলা গাভী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মতো আমার পশ্চাতে দৌড়িল। আমি দুই চারিবার ওয়ার্নিং-বেলটাতে টংকার দিয়া এবং দুইবার সারকিট কষিয়া অচিরাৎ জানোয়ারটার অকারণ আক্রমণ হইতে উদ্ধারলাভ করিলাম। তৎপরে চলদবস্থায় টক করিয়া একটি সিগারেট জ্বালিয়া মুখে সংযুক্ত করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ এক টিপ নস্য লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রাম্য কৃষকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তেমোহানার উপর বাইসিকেল হইতে অবতীর্ণ হইলাম।

বাইসিকেল ধীরে ধীরে বামহস্তে হেলাইয়া দুলাইয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন স্বভাবতই জীবনের সম্ভাবিত নূতন অঙ্ক মনোনাট্যশালায় জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল। কাজেই গ্রামের খোনা ভট্টাচার্যের সহিত আমার মস্তক অন্ধকারে বাধিয়া গেল। ভট্টাচার্য মহাশয়েরও অন্যমনস্ক হইবার কোনো বিশেষ কারণ ছিল। বোধ হয় অনেক দিন দক্ষিণা জুটে নাই। ম্রিয়মাণ ভট্টাচার্য বলিলেন, "রাম, রাম! কে ও?"

আমি বলিলাম, "ভয় নাই, আমি হৃষীকেশ।"

ভট্টাচার্য। "চন্দ্রকান্তের কাল হইয়াছে জানো?"

আমি। "এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসিলাম।"

ভট্টাচার্য। "শ্রাদ্ধে ব্যয়াদি কত হইবে জানো?"

আমি। "অনেক। যদি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণা না দেয়, আমি ডবল দিবো।"

ভট্টাচার্য। "বাঁচিয়া থাকো বাবা! তোমরা বড়ো লোক, ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারো?"

আমি। "আর যদি একটা বিধবা-বিবাহের বিধান দিতে পারেন তবে আপনার সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুনিশ্চিত। নস্য লইবেন কি?"

ভট্টাচার্য। (নস্য গ্রহণান্তে) "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু আমার তিনটি কন্যা জানো তো, বিধান দিতে ভয় হয়, বিশেষত পল্লীগ্রাম, চক্রবর্তীর দল আমাকে ঠেঙাইয়া মারিয়া ফেলিবে। তবে এখন আসি বাবা—"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "আপনার তিনটি কন্যাসুদ্ধ আমি গছিয়া লইব।" কিন্তু ভাবিলাম, আমি স্বার্থপর! চন্দ্রকান্ত কি দোষ করিয়াছিল? হায় রে সংসার এবং সংসারের মানুষ!

০০ তিন ০০

গ্রামের দৃঢ়, কর্মঠ ও সুচতুর জনকতক প্রেম-পাথারের নূতন পুরাতন নাবিক সংগ্রহপূর্বক বড়ো দীঘির পাড়ে একটা সভাস্থাপন করিলাম। সকলেরই মতে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাবনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। অনেক অনুসন্ধান ও তদন্তের পর, এবং কর্তৃপক্ষের মনের ভাব গ্রহণানন্তর বেশ বুঝা গেল যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এ গ্রামে বিধবা-বিবাহের কোনো সম্ভাবনা নাই। তবে একজিকিউটিভ কমিটির মতে একটা পথ ছিল তাহা এই যে, বালিকাহরণ পূর্বক অন্য কোনোও স্থানে বিবাহকার্য সম্পাদিত করা।

মনে হইল কর্তৃপক্ষের খোসামোদ অপেক্ষা উক্ত উপায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। একে তো একটা বাহাদুরী, তাহার উপর নির্বিঘ্নে কন্যালাভ। তর্ক স্থলে ইহাও স্বীকার করিলাম যে, দণ্ডবিধির ৩৬৩ ধারা প্রভৃতির সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু তদ্বিপক্ষেও অনেক আপত্তি ছিল।

আসল কথা, স্বয়ং কন্যার অভিপ্রায় তখনো অবিদিত।

সেটার ভার সম্পূর্ণ আমার উপর পড়িল। সারারাত বসিয়া ভাবিলাম, এবং বাঁশিতে দুই চারিটি গৎ বাজাইলাম। গহন তিমির ভেদ করিয়া যখন উষার আলোকচ্ছটা সুদূর পূর্বে দেখা দিতেছিল, তখন একবার হালদারদিগের খিড়কিঘাটের দিকে কলাবাগানের মধ্যে পায়চারি করিয়া আসিলাম। জনমনুষ্য নাই। রাত্রিকালের মৃদুমধুর লক্ষ্ণৌঠুংরির বাছা বাছা গৎ বিফল হইয়া গিয়াছে। তবে কি অপরাজিতার হৃদয়ে প্রেম নাই? সেই নিশি! কতবার বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মর্মর শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, এইবার বুঝি অপরাজিতা আসিতেছে। কতবার ঘনান্ধকার হইতেও কিঞ্চিৎ ঘন আবছায়া দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, ঐ বুঝি অপরাজিতা গৎ-বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলই বিফল?

এমন সময় শ্বেতবর্ণের মতো একটা কি নড়ন্ত-চড়ন্ত পদার্থ দেখিয়া নিরাশা-শীতল শোণিত আবার তড়িদ্বেগে হৃদয়ে ছুটিল। সেটাও একটা গাভী। অনেকক্ষণ আমার উদাস মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি পূর্বদিনের কথাটা স্মরণ করিয়া পলাইয়া আসিলাম।

ঋতুটা শীতকাল। আমার সারা নিশির কষ্ট পুরাতন আমলের প্রেমিক ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। সূর্য উঠিলে কত রাখালবালক অর্ধ-জীর্ণ শীতবাসের অপেক্ষাকৃত অটুটভাগে মুড়ি বাঁধিয়া প্লীহা পরিপূর্ণ ডাগর উদর দেখাইয়া চলিয়া গেল। কত পুরাতন রামের মা, সাতকড়ির বৌ, নবীনের পুত্রবধূ, ছোট-বড়ো কলসিকক্ষে যথা নির্দিষ্ট ও নিয়মিত সময়ে ধীরে ধীরে যাইল আসিল। কেহই আমার নিদারুণ উদ্বেগ, কষ্টকর অশান্তি, উপায়বিহীন দীর্ঘনিশ্বাস বুঝিল না।

অবশ্য জগতে একটা নিয়ম আছে। কার্যমাত্রেরই সফলতা ও নিষ্ফলতা আছে। শুনিয়াছিলাম, কর্মফল ভোগ করিতে হয় নিশ্চিত। কর্মটাই যদি নিষ্ফল হইল, তবে আর ভোগ করিব কি ছাই? সুতরাং আমার মতো জ্ঞানীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে এত বড়ো কর্মটাই কর্মভোগ। কর্মটা সুসিদ্ধ হইলে তাহার পর সেটার ফলভোগ কর্মভোগ নহে। তাহার বিচার তো এখন হইতেছে না।

কর্ম-নিষ্ফলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়। মনে ভাবিলাম এত বাড়াবাড়ি কেন? আমার কপালে অন্য একটা সুন্দরী স্ত্রী জুটিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কর্মক্ষেত্রে আমার বিধিনির্দিষ্ট পথ সরল রেখার

উপর দিয়া যায় নাই। দুই চারিবার নস্য লইয়া মস্তিষ্কটাকে মাঘমাসের মৃত আকাশের মতো পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম।

বিকালে ঘনশ্যাম হালদারের বাটীতে মলিনমুখে গেলাম। ঘনশ্যাম হালদার অপরাজিতার পিতা। যথাযোগ্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং পরিধেয় বস্ত্রে বারবার অশ্রুমোচন করিয়া আমার প্রতি হালদার মহাশয়ের অনুরাগ বিশেষরূপে বর্ধিত করিলাম।

"বাবা, তুমি যদি আমার জামাই হতে—তবে কি আর—(চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত)—"

আমি 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন' ইহা বলিয়াই বেগে খিড়কি দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলাম। "অপরা! তুমি দুপুর রাত্তিরে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি আসবো।" অপরা সেখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া শুনিল।

০০ চার ০০

অনেক সময় অতি সহজেই একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়া যায়। কে জানে অপরাজিতা খিড়কির দুয়ারে দাঁড়াইবে, আর কেই বা জানে যে, আমার অদৃষ্টে অমন সুযোগটা এক মুহূর্তে ঘটিয়া উঠিবে? এইরূপ সুযোগেই বড়ো বড়ো যুদ্ধবিগ্রহ চক্ষের নিমেষে শেষ হইয়া যায়। এবং এইরূপ সুযোগেই বড়ো বড়ো দেহ চক্ষের নিমেষে লাশ হইয়া যায়।

বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলাম, অপরাজিতা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে, এবং বোধ হইল পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া একটিবার সেই লাখ টাকার মাথাটি দুলাইয়া দিল। উদ্দেশ্য "তুমি আসিও, আমি থাকিব।" আমি একটি দুই লাখ টাকা মূল্যের দীর্ঘনিশ্বাস সুখে টানিলাম। এটা আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণের খেলা।

আমি সিগারেটের ধূম ছাড়িয়া রুমাল নাড়াইয়া দিলাম। সেটা সিগনাল অর্থাৎ সংকেত—"তুমি এখন যাও।" এমন সময় পূর্বদ্বার দিয়া একটি যুবা-পুরুষকে বাহির হইতে দেখিয়াই আমি কপাট রুদ্ধ করিয়া তাহার ফাঁক দিয়া উভয় পক্ষের গতিবিধি পরিদর্শন করিলাম।

যুবক অপরাজিতাকে লইয়া চলিয়া গেল।

আমি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলাম, "মধু! হালদারের বাড়িতে একটা তেড়িকাটা বাবু এসেছে, সে কে?"

মধু। "তিনি হালদার মশাইয়ের ভাইপো। কাল রাত্তিরের গাড়িতে ছোট বোনকে নিয়ে কলিকাতা হতে এসেছেন।"

মনের খটকা অন্তর্হিত হইয়া যুবকের ভগ্নীবৎসলতার করুণ চিত্রে হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। ভাবিলাম এবারে কলিকাতায় গিয়া একটু পবিত্রচিত্ততার চর্চা করিব।

ঘোর সন্ধ্যার সময়ে আমার গবাক্ষপ্রান্তে একটি ছোট ঢিল পড়িল। তৎপরেই আর একটা। দ্রুতগতি গবাক্ষ খুলিয়া বাহিরে গিয়া ঢিল কুড়াইয়া আনিলাম। একটাতে একখণ্ড কাগজ জড়ানো ছিল। এবং সেই কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা—

"কুল মান সবই সঁপিয়াছি। রাত্রি দুইটার সময় আসিও। পূর্বদুয়ারি ঘরের দিকে যাইও না, সেখানে ক্ষীরোদ ও বুড়ি শুইয়া থাকিবে। আমি উত্তরদিকে থাকিব। রাত্রি তিনটার গাড়িতে আমরা কলিকাতায় চলিয়া যাইব। কিন্তু আমার একটি প্রতিজ্ঞা রাখিতে হইবে। যতক্ষণ আমার সহিত তোমার বিবাহ না হয়, ততক্ষণ আমার মুখ দেখিবে না এবং অঙ্গস্পর্শ করিবে না। করিলেই আত্মহত্যা করিব। সঙ্গে ছুরিকা লইলাম। কলিকাতায় গিয়া ২৩ নং—স্ট্রীটে মাসির বাড়িতে রাখিয়া আসিও এবং বিবাহের দিন ও স্থান স্থির হইলে আমাকে লইয়া যাইও। মাসি জানিবেন, তুমি আমার দেবর। সাবধান, অভাগিনীর মনে অপমান এবং জীবনের আশা ভরসা তোমার হাতে—স্বামিহীনা অ......"

একে দারুণ শীত, তাহাতে দারুণ হর্ষ, উভয়ে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়া আমাকে শৃঙ্খলবদ্ধ কাকাতুয়ার মতো দোলাইতে লাগিল। পত্রখানি হৃদয়ে এবং চক্ষুতে বুলাইয়া ব্রেস্ট-পকেটে রাখিলাম।

বুঝিতে পারিলাম, ক্ষীরোদ সেই আগন্তুক যুবক ভ্রাতা এবং বুড়ি তাঁহারই বালিকা ভগ্নী। পূর্বে কখনও দেখি নাই। তাহারা কলিকাতার লোক, কতক্ষণই বা? দশটার সময় ঘুমাইয়া পড়িবে।

নিভৃতে আসিয়া পত্রখানি আবার পড়িলাম। ডাউডেন সেক্ষপীয়রের "ম্যাকবেথ" যেমন করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেও অধিক অধ্যবসায়সহকারে পাঠ করিলাম। শেষে স্থির করিলাম, অপরাজিতার চরিত্র পবিত্র, রহস্যময় অথচ স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অপরাজিতা সামান্য প্রেমগদগদা রিপুপরতন্ত্রা সুন্দরী নহে। বিধবা না হইলে লেখাপড়া না জানিলে এমনটি হয় না। এই জন্যই বিলাতে যুবতী বিধবার এত আদর।

পাছে ঘুমাইয়া পড়ি, তাই তুইবার চা খাইলাম। নেত্রে ক্যাজুপুটি অয়েল মাখিলাম। ক্রমে সম্পূর্ণ তারকামণ্ডিত আকাশের তলে হিমানীসিক্ত শীতক্লিষ্ট দ্বিপ্রহর নিশি তালে তালে বহিয়া গেল।

০০ পাঁচ ০০

যাঁহারা এ পথের পথিক, তাঁহারা জানেন, অভিসার কার্যটা কতদূর বিঘ্নসংকুল। দারুণ গ্রীষ্মকালেও অভিসারকর্মে রক্ত হিম হইয়া যায়, এ তো শীতকাল, তাহার উপর আর একটা চম্পটের জঞ্জাল। দারুণ শীতে বিধবা যুবতীকে লইয়া কলিকাতায় পলায়ন কি সোজা কথা? তদুপরি সেই পত্রবর্ণিত কঠিন প্রতিজ্ঞা। সংসারে কোনো জটিল ব্যাপারে রত হইলে অন্তত একটি মানুষের সাহায্য লইতে হয়। ভৃত্য মধুকে সবকথা ভাঙিয়া বলিতে হইল, এবং মধুকে পোর্টম্যাণ্টো প্রভৃতি লইয়া প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরস্থ রেলওয়ে-স্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম।
ঠিক রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় হালদারদিগের স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অবৈধ পদার্পণ করিলাম। পরের ঘরে রাত্রিকালে যাওয়া আসা পূর্বে কখনই অভ্যাস ছিল না, তাই প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে অনেক সময় বহিয়া গেল। অনেকে প্রেমের প্রভাবে আত্মহারা হইয়া পড়ে। আমার কিন্তু সে অবস্থাটা ঘটে নাই। প্রত্যেক শুষ্কপত্রের মর্মর, প্রত্যেক কণ্টকাঘাত, প্রত্যেক জীবসমাগমের শব্দ, কোনোটাই ইন্দ্রিয়প্রহরীগণকে বঞ্চনা করিতে পারে নাই। ইহারই মধ্যে মন একটু কবিত্বপূর্ণ ভাব ধারণ করিয়া মানবত্বের সফলতা সম্পাদন করিতেছিল।
বহু যত্নে পূর্ব পুষ্করিণীর ভাঙা পাড় অতিক্রম করিয়া গোয়ালের নিকট দাঁড়াইলাম। একঘণ্টায় এতদূর আসিয়াছি, ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে।
ভাবিলাম, একটু বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু এত শীতে বিশ্রাম করি কোথায়? তখনো তুইটা বাজিতে আধঘণ্টা বাকি আছে।
একটা কুকুর সেখানে শুইয়া ছিল। সেটা অতি মৃদুস্বরে নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া আবার লাঙ্গুল নাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল।
বোধহয় কুকুর আমাকে নির্দোষ ভাবিয়া লইয়াছিল, কিংবা সেটা প্রভুভক্ত নহে। যাহাই হউক, তাহার শব্দহীনতার চেষ্টা দেখিয়া বুঝিলাম, বিধাতা আমার প্রতি বাম নহেন।
কাজেই নির্ভয়ে সিগারেট জ্বালিলাম এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই নস্য লইলাম।

নস্যের সহিত প্রেমের কোনো সম্বন্ধ নাই, তবে নস্য সর্বদাই মস্তিষ্ক পরিষ্কার রাখে এবং বিশেষত শীতকালে হিমের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার উহা একটি প্রধান উপায়। আরও একটা কারণ ছিল, যদি অপরা না উঠিয়া থাকে, তবে একটা হাঁচিতে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থা টুটিয়া যাইতে পারে।

তাই অন্ধকারে ধীরে ধীরে উত্তর দিকের ঘরের গবাক্ষের নিকট গিয়া একটা হাঁচিলাম। গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল। অন্য কোনোও গোলমাল হইল না। চোর ও শত্রু কখনো ঘোর নিশীথকালে হাঁচিতে আসে না, অতএব এবংবিধ শব্দে কাহারও সন্দেহ হওয়া অসম্ভব।

অপরা বাহিরে আসিল। শীতে কাঁপিতেছিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, অতএব গাত্রস্পর্শ করিলাম না। কেবল বলিলাম, "আমার সঙ্গে এসো।"

অবশ্য সংসার ছাড়িতে জীবের যখন এত কষ্ট হয়, তখন পিতৃগৃহ ছাড়িতে বিধবার কষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি। অপরা একটু কাঁদিল। সেই সুখের ঘর, পিতা-মাতার সোহাগ, সেই কামিনী ফুলের গাছ; শীতকালের মোলায়েম লেপ ও শয্যা, সেই কুলমানের বন্ধন, মৃত স্বামীর স্মৃতি, সেই জীবনের আক্ষেপ।

সকলই বোধহয় অপরার মনে উদিত হইতেছিল। কিন্তু হইলে কি হয়? নারী সংসারে আসে প্রেম করিতে, শিখাইতে এবং শিখিতে। যাহার প্রেমতৃষ্ণা ফুরায় নাই, সে মরিয়াও আবার প্রেম চাহে।

'আমারে আবার যেন রমণী জনম দিবে' বটে কিনা। আমি সব বুঝিতে লাগিলাম এবং আত্মশ্লাঘাভরে আবার সিগারেট জ্বালিলাম। সেই ক্ষীণালোকে অপরার গৌরবর্ণ ফুটিয়া প্রতিমার রঙের মতো দেখাইতে লাগিল। কিন্তু অবগুণ্ঠন ছিল।

কালবিলম্ব দেখিয়া আমি নস্য লইলাম। বাটীর মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল, "হাঁচে কে?"

আমি অপরাকে বলিলাম, "শীঘ্র এসো।" এবং উভয়ে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাগানের শেষ সীমায় আসিলাম।

এমন সময় পুনর্বার দূর হইতে শুনিলাম, "কে রে?" আমি উচ্চৈঃস্বরে একটা শৃগালধ্বনি করিয়া স্টেশনের দিকে চলিলাম।

সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার শৃগালধ্বনি কুকুরকে জাগাইয়া তুলিল এবং গৃহস্থের ভয় তিরোহিত করিল।

কলুষিত প্রেম ও কাঁচা সোনা—প্রেমের পার্থক্য না পুড়াইলে বুঝা যায় না, কিংবা কষ্টিপাথরে ঘষিতে হয়।

তবে কষ্টিপাথরটা ঠিক হওয়া চাই। কবিকুল মনকে কষ্টিপাথর বলিয়াছেন। প্রমাণ, যেমন "কূটস্থ আত্মা" প্রভৃতি।

শীতে ক্লেশ পাইয়া একবার ভাবিয়াছিলাম, একটা বিধবাকে লইয়া এত জঞ্জালে পড়া কি ভালো? বোধ হয় স্টেশনে আসিয়া সে ভাবটা অপরার মনে লাগিয়াছিল। অপরা কাঁপিতে লাগিল।

মনে করুণাসঞ্চার হইল। সে করুণার স্নিগ্ধ স্বার্থবিহীন উচ্ছ্বাসে প্রেমের পবিত্র কোরকগুলি ফুটিতে লাগিল। আমিও আবার সিগারেট টানিলাম।

স্ত্রীলোকদিগের গাড়িতে অপরাজিতাকে অধিষ্ঠিতা করিয়া এবং স্বয়ং নিকটবর্তী পুরুষদিগের গাড়িতে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন নস্য লইলাম, তখন প্রায় ভোর। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

যাইবার সময় কেবল মধু বলিয়াছিল, "সাবধান!"

আমি বিরক্তিসহকারে বলিয়াছিলাম, "সে আর তোমাকে শিখাইতে হইবে না।"

কলিকাতায় পঁহুছিয়া অপরাকে ২৩নং—স্ট্রীটে তাহার মাসির বাড়িতে লইয়া গেলাম। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। পথে অপরা জলগ্রহণ করে নাই। একবার মনে করিয়াছিলাম, হঠাৎ কোনো স্টেশনে রাহুমুক্ত শশি-মুখখানি দেখিয়া লইব। চেষ্টা বিফল হইল। তৎপরিবর্তে সেই গভীর অবগুণ্ঠন ও সেই সুন্দর কোমল দুইটি নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ তিলে শোভিত অঙ্গুলির মধ্যে রজার্সের ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝলসিতেছিল।

কাজেই প্রতিজ্ঞা অটুট রহিল, এবং বাড়াবাড়ি না করিয়া আমি কোচ্‌বক্সে উঠিয়া পড়িলাম।

বোধ হয়, অপরা পূর্বেই মাসিকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছিল। কারণ ২৩নং বাটীর দুয়ারে একজন দাসী আসিয়া অপরাকে অন্দরে লইয়া গেল।

আমি চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় বাটীর মধ্যে একটা হাস্য কিংবা ক্রন্দনের রোল উঠিল, বড়ো বুঝিলাম না। সারা রাত্রি জাগিলে হাস্য ক্রন্দনের পার্থক্য বড়ো বুঝা যায় না।

একবার ভাবিলাম, অপরা চাতুরী খেলে নাই তো? হয়তো আমার মাথায়

কাঁঠাল ভাঙিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে!—কিন্তু এমন নীচপ্রবৃত্তি কখনও অপরার পক্ষে সম্ভব না।

সেই রাত্রিকালের পত্র খুলিয়া আবার পাঠ করিতেছি, এমন সময় একটি গৌরবর্ণ বালক একখানা পত্র লইয়া আমার হাতে দিল।

"মাসিমাকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছি, মাসিমারা ব্রাহ্মমতের লোক। বিধবা-বিবাহে আপত্তি নাই। সুতরাং তুমি আর দেবর বলিয়া পরিচয় দিও না। এই বাটীতেই থাকো, কল্য বিবাহের দিন ভালো; বন্ধুবান্ধব যদি কেহ থাকে নিমন্ত্রণ করিও। অঃ।"

তাহার পরেই একটি সুন্দর শ্মশ্রুবিশিষ্ট যুবাপুরুষ অন্দর হইতে বাহিরে আসিলেন।

আগন্তুক। "নমস্কার!"

আমি। "নমস্কার।"

আগন্তুক। "আপনার মতো মহাশয় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া আমি সৌভাগ্যান্বিত হইলাম। শীঘ্রই আপনার সহিত আমার এক নূতন সম্বন্ধ ঘটিবে, ঈশ্বর করুন, সেই সম্বন্ধ যেন সুখের হয়।"

আমি বুঝিলাম, ইনিও গুপ্ত অভিনয়ের মধ্যে একজন এবং ব্রাহ্ম মেজাজের লোক।

আমি। "আপনি বোধ হয় আমার ভাবী শ্যালক। আপনি অপরার ভ্রাতা মাসতুতো সম্বন্ধে?"

আগন্তুক। "অপরা আমার ভগ্নী।"

আমি। "আপনি ব্রাহ্ম?"

আগন্তুক। "অবশ্য।"

তৎপরে আহারাদি সমাপনান্তে প্রায় দশ ঘণ্টাকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিলাম।

সুখ-দুঃখময় সংসারে মানব-চরিত্র ও পার্থিব ঘটনাবলী প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করিবার সময় কম লোকেরই আছে। কাজেই যখন রাত্রি দশটার সময় জাগরিত হইয়া ক্ষুধাতুর হইলাম, তখন আহার্য সামগ্রী ব্যতিরেকে আর কোনো দিকে আমার মন ছিল না।

দ্বিতলে সুন্দর ব্রহ্মসঙ্গীত হইতেছে। একে ব্রহ্মসঙ্গীত, তাহার উপর রমণীকণ্ঠ! জীবনের ভার ও মনের চঞ্চলতা প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই রূপার রেকাবির উপর নানাবিধ মিষ্টান্ন ও লুচি তরকারি লইয়া একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আমার ঘরে উপস্থিত হইল।

রূপের মোহে আমি হাঁ করিয়া থাকিলাম। বালিকা পুনরায় এক গেলাস জল ও রূপার ডিবাতে পান লইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে ঘরের একখানা দর্পণে আমার কুঞ্চিত কেশদাম আলুথালু করিয়া লইয়াছিলাম, এবং বালিকার পুনঃপ্রবেশের সময় যতদূর সতৃষ্ণ কোমল নয়নভঙ্গি সম্ভব, ততদূর নেত্রদ্বয়কে প্রস্তুত করিয়া বালিকার নয়নের উপর স্থাপন করিলাম।

বোধ হইল, বালিকা দেখিতে ঠিক অপরার ন্যায়, অন্তত প্রাতঃকালের হৃতা বালিকার হাত দুখানি ও গঠনের সহিত তাহার এতদূর সাদৃশ্য ছিল যে, আমি বিস্মিত হইলাম।

আমি। "তুমি অপরার কে?"

বালিকা। "বোন।"

আমি। "তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

বালিকা। "না।"

প্রায় চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ হয় নাই। বুঝিলাম, এরা ব্রাহ্ম-মতের।

আমি। "তুমি ঠিক অপরার মতো দেখিতে।"

বালিকা। "আপনি অপরা দিদিকে দেখিয়াছেন?"

আমি। "বোধ হয় বিবাহের পূর্বে একবার দেখিয়াছি।"

মোট কথা, আমার অপরাকে ভালো করিয়া দেখা হয় নাই। একবার ভাবিলাম, এ অপরাজিতা নয় তো? না, তাহা হইতে পারে না।

আমি। "তুমি উপরে গান করিতেছিলে?" বালিকা নিরুত্তর হইয়া রহিল। কেমন মিষ্ট কথা! কেমন মৃদু মধুর ভাষা! আমি তাহাই মনে করিতে করিতে প্রায় সমস্ত খাবারগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলাম।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

ক্রমেই রাত্রিকালে ভালবাসা প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। এমন-কি, ঘুমন্তে ও জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘুমাইলে রাত্রিকালে, বিশেষত শীতকালে, প্রেমের উচ্ছ্বাস বড়োই স্নিগ্ধ, রমণীয় ও মধুর বলিয়া বোধ হয়।

প্রাতঃকালে পূর্বদিনের সুন্দর যুবাপুরুষ আমার নিকট আসিলেন। জানিলাম, তাঁহার নাম মহেন্দ্রবাবু।

মহেন্দ্রবাবু কথার পৃষ্ঠে কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, আমার মস্তক ও হৃদয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হইয়া টলমল করিতেছে।

কোথা হইতে একটা আক্ষেপ আসিয়া জুটিল। যদি ঐ বালিকাটি আমার হইত, তবে অপরার জন্য এত সহিতাম না।

মহেন্দ্র। "আপনাদের বিধবা বিবাহ করিলে জাতি যায় ?"

আমি। "বোধ হয় যায়।"

মহেন্দ্র। "তবে এতদূর বাড়াবাড়ি করিলেন কেন ?"

আমি মৌন হইয়া রহিলাম।

তারপরে কোনোও কথা হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বে ঢাক-ঢোল, ব্যাণ্ড চতুর্দোল, রোশনাই ও বন্ধু-বান্ধব আসিয়া জুটিল। কলিকাতায় বিবাহের যোগাড় করিতে কতক্ষণ ? তবে এ বাটীতে বিবাহ হইবে না। অন্য একটি বাটীতে বিবাহ।

আমি মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিধবা বিবাহে এত ধুম কেন ?"

মহেন্দ্র। "বিবাহ হিন্দুমতে অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মতে হইবে। ব্রাহ্মমতে হইবে না।"

আমি। "খরচ যোগাইবে কে ?"

মহেন্দ্র। "অপরার মাসি।"

আমি। "ব্রাহ্মমতে হইলেই তো ভালো হইত।"

মহেন্দ্র। "দুই মতেই হইবে।"

আমি। "সে কেমন ?"

মহেন্দ্র। "অর্থাৎ সেই বাটীতে দুইটি বিবাহ হইবে, একটি ব্রাহ্মমতে ও আর একটি হিন্দুমতে।" আমি শুনিয়া অবাক।

তাহাই হইল। সন্ধ্যার পরেই ধুমধাম করিয়া অন্য বাটীতে অপরাকে বিবাহ করিতে গেলাম। একভাগে আমার বিবাহের আয়োজন হইয়াছিল, অন্যভাগে কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল জানি না। সেই ভাগের বর, কন্যা এবং ক্রিয়া আমাদিগের অজানিত থাকিল। কেবল ইহাই দেখিলাম, মহেন্দ্রবাবু আমাদিগের ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

মনে কেবল সেই বালিকার মুখখানি জাগিতেছিল।

ভাবিলাম, সংসারে মনের স্থিরতা নাই এবং প্রেমেরও স্থিরতা নাই। যখন ব্রহ্মাণ্ড অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে, তখন মানব ঘুরিবে বৈ কি।

কিন্তু যখন কন্যাদানের সময় ক্ষীরোদবাবুকে দেখিলাম, তখন চমকিয়া উঠিলাম।

আমি। "আপনাকে বোধ হয় আমাদিগের দেশে হালদার মহাশয়ের বাটীতে পরশ্ব দিন দেখিয়াছি।"

ক্ষীরোদ। "হ্যাঁ, দুয়ার হইতে উঁকি মারিয়া। তাহার পরই আমার ভগ্নীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। আপনাকে পুলিসের মারফত হ্যাণ্ডকফ্ (হাতকড়ি) না দিয়া বিবাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছি, ইহাতে আপনার সবিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

আমি (সলজ্জে)। "তবে আপনার এ বিবাহে সম্মতি আছে ?"

ক্ষীরোদ। "আমি সেইজন্যই আপনার দেশে গিয়াছিলাম। যাহা হউক, কন্যা আপনার পছন্দ হইয়াছে তো ?"

আমি। "কোন্ কন্যা ?"

ক্ষীরোদ। "ঐ যে বুড়ি। যাকে লইয়া আপনি পলাইয়া আসেন, এবং যে আপনাকে কাল রাত্রে জলখাবার দিতে গিয়াছিল।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল এবং কতক্ষণ ঘুরিয়াছিল জানি না। বিধির বিড়ম্বনা প্রহেলিকার মতো। সব সময় বুঝিয়া উঠা যায় না।

বোধ হইল, আমার একটা বিবাহ হইয়া গেল। বোধ হইল স্বপ্নের মতো আবার সেই কৃষ্ণতিলশোভিত পূর্ববর্ণিত অঙ্গুলি আমার করতলের মধ্যে বসন্ত-কিশলয়ের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কোথায় তুমি অপরা ?

তাহার পর বাসরঘরে অপরা নূতন স্বামী মহেন্দ্রবাবুর সহিত উপস্থিত। শ্যালিকাগণ বলিল, এটা "ডবল বাসর" অর্থাৎ ব্রাহ্মমত ও হিন্দুমত, উভয় জাতেরই বাসর।

পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলিয়া উঠিল, "৩৬৩ ধারার অপরাধ আপসে মিটমাট করিলে কিছু বকসিস চাই।"

কাজেই আমার ঘড়ির চেন লইয়া তাঁহার গলায় দিলাম এবং প্রদান করিবার সময় তাঁহার কান ভুলিয়া টিপিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপক্ষালনার্থ নস্য লইলাম।

সুখের বাসরে মহেন্দ্র, আমি, অপরা ও বুড়ি ওরফে মৃণালিনী (মিলি) তাস খেলিতে খেলিতে রাত্রি কাটাইলাম।

বুড়ির পিতা বড়োলোক, এবং বুড়ি আদরের কন্যা, কাজেই বুড়িকে সঙ্গে

লইবার সময় অপরা গেল এবং মহেন্দ্রও গেল। আমার দরিদ্র কুটির ও পিতৃমাতৃশূন্য ঘর তাহাদের দেখাইলাম। বুড়ি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিল। আমি ব্রাহ্ম-মেজাজের হইয়া দাঁড়াইলাম এবং মহেন্দ্র হিন্দু হইয়া দাঁড়াইল।

খোনা ভট্টাচার্য দক্ষিণা পাইয়া বলিল, "উভয় মতই বিদ্যাসাগরের মতের মধ্যে পড়ে।"

সকলে রীতিমতো বিদায় পাইয়া বলিল, "অবশ্য, অবশ্য।"

সুতরাং ঘনশ্যাম হালদারের জাতি পূর্বাপর বজায় রহিল। তাহাতেই আমি এত সুখী।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২) ॥ নিষিদ্ধ ফল
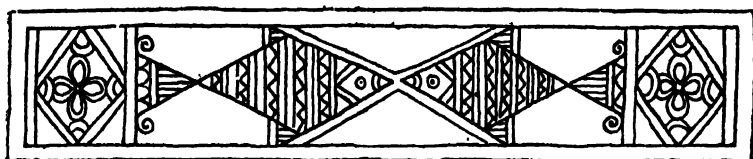
প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের দুর্গাচরণবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালংকারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেজো মেয়ে, রায়বাহাদুর।"—কন্যাকে বলিলেন, "মা, এঁকে প্রণাম করো।"

ভবানীপুর নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোশে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটাসোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড়ো বড়ো চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়াযুক্ত বহুমূল্য শালের জোড়া গায়ে দিয়া বসিয়াছিলেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাঃ! বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাকো মা, সুখে থাকো, দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ-নামা পারিষদ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "মা, তোমার নামটি কি বলো তো?"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারিত হইল না।

দুর্গাচরণবাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন, "বলো মা, বলো।"

মেয়েটি তখন অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "শ্রীমতী নন্দরানী দাসী।"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "নন্দরানী? বেশ, নামটিও বেশ। কেমন হে যতীন দাদা?"

যতীন্দ্র-নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "নন্দরানী নাম—বাড়িতে সবাই রানী বলে ডাকে।"

"রানী ? তা আপনার মেয়ে রাজরানী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁত। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন ?"
ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"
রায়বাহাদুর বলিলেন, "তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো, এখানে বোসো। দুর্গাচরণবাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।"
মেয়েটি ইতস্তত করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন, "বোসো মা, বোসো।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নিচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁষিয়া বসিল।
রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়ো মা ?"
"আখ্যান মঞ্জুরী দ্বিতীয়ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ আর সরল শুভংকরী।"
"পান সাজতে জানো ?"
"জানি।"
দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমার বড়ো মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অবধি বাড়ির সব পান ঐ তো সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পান।"
রায়বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পান লইয়া কপ্ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বেশ পান।" রান্না-বান্না কিছু শিখেছো মা ?
রানী বলিল, "শিখেছি।"
"তাও শিখেছো ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পারো ?"
মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পারি।"
রায়বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরই মধ্যে শিখেছো ? লক্ষ্মী মেয়ে!"
দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায়বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গতমাসে আমার স্ত্রী যখন আঁতুড়ে, বড়ো মেয়েটি শিবপুরে, অনেক কাকুতি মিনতি করাতেও বেয়াইমশাই তাকে পাঠালেন না, রানীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।"
মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায়বাহাদুর বলিলেন, "নেবো না ? নেবো না ? লুফে নেবো। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে ? কি হে সতীশ ?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি!"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তারপর মা-কে ছুটি দিই।"—বলিয়া নন্দরানীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমার মাথার পাকাচুল তুলে দিতে পারবে? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি?—এটি বোধহয় শেখোনি, কি বলো মা?—তোমার বাবার মাথায় তো পাকাচুল নেই!"—বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরানীর মুখেও ঈষৎ হাস্য সঞ্চার হইল। মুখটি তুলিয়া সে রায়বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে 'কলৌ সুজনা ইব' চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দূর দূরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রায়বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও, এখন বাড়ির ভিতরে যাও।"

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়াছিল। নন্দরানী তক্তপোশ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া প্রায় এক মিনিট কাল রায়বাহাদুর নীরবে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁকা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "তারপর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া তোমার মত বলো? ঐ যা, একেবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেললাম!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "তুমিই বলুন। আপনি বললে বরং আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায়বাহাদুর বলিলেন—"হ্যাঁ হে, হ্যাঁ—তুমি বয়সে যে আমার চেয়ে ছোট তা তো স্বীকারই করছি। তা বলে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেবো না—হা হা হা।"—বলিয়া তিনি দুর্গাচরণবাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন। পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ

হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক। তবে আমি অতি সামান্য লোক—গরিব—"

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "গরিব তো হয়েছে কি? গরিব তো হয়েছে কি? গরিবই বা কিসের? তুমি কি কারু কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছো? আর হলেই বা গরিব? গরিবের মেয়ের কি বিয়ে হবে না? সে আইবুড়ো থাকবে? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধহয় আজকালের বরপণ প্রথা ভেবে এ কথা বলছো? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ংকর বিরোধী।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই কথা শুনেই তো—"

"শুনেই তো কি? পড়োনি? আমার 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' কেতাব পড়োনি? তাতে বরপণ বলে একটা চ্যাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকেই আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিয়েছি—একেবারে যাচ্ছেতাই করে—পড়োনি?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "পড়েছি বৈকি। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "কোথা বিখ্যাত?—হ্যাঁ—বঙ্কিম একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কিনা। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে। তার একখানি নতুন বই বেরিয়েছে, রাজসিংহ। পড়েছো? হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। অথচ আমার বই পোকায় কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সেদিন।"

একজন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হল?"

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বঙ্কিমকে বললাম, ওহে তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ্ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখো যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা তো কেউ শোনে না, তোমার কথা শুনবে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে! বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখো দেখি? আর একখানা লেখো, যা পড়ে বাঙালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখো, যৌথ কারবার সম্বন্ধে, কেন বাঙালীর যৌথ কারবার ফেল হয়ে যায়, কি কি

উপায় অবলম্বন করলে তা সফল হতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ করে বুঝিয়ে দাও। প্লটও তোমায় বলে দিচ্ছি। তাতে দেখাও যে জন-কতক বাঙালী যুবক কলেজ থেকে বেরিয়ে, এক সঙ্গে মিলে যৌথ কারবার আরম্ভ করলে, আর দিন দিন তাদের খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তারা এক একটি লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল, গভর্নমেণ্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয়, খালি লভ্ আর লড়াই—লভ্ আর লড়াই। ও সব লিখে দেশের কি উপকার হবে বলো দেখি?"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিমবাবু কি বললেন?"

হুঁকাটি হাতে লইয়া রায়বাহাদুর বলিলেন, "হাসতে লাগল। বললে—'আচ্ছা তাহলে যৌথ কারবারের নভেলটাই আরম্ভ করি। কাঁচা মালের কি দর আর কোথায় কোন্ জিনিস পাওয়া যায়, রেলভাড়াই বা কত, সেগুলোও পরিশিষ্ট করে ছেপে দেবো কি?'—বিদ্রূপ হল!—'তোমার যা খুশি তাই করো'—বলে রাগ করে আমি চলে এলাম।"

রায়বাহাদুরের মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল তামাক খাইয়া তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ যদি করেন, তাহলে তো আর কোনো বাধাই নেই। যেদিন অনুমতি করেন, সেই দিনেই বিবাহ হতে পারে। সামনে ফাল্গুন মাসে—"

রায়বাহাদুর বলিলেন, "রও-রও। আরও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমার আর একটি মত আছে। সে বিষয়ে যদি তুমি স্বীকার হও, তবেই আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি।"

দুর্গাচরণবাবু একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "কী মত, আজ্ঞা করুন।"

রায়বাহাদুর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভালো করিয়া বসিয়া বলিলেন, "সামাজিক সমস্যা-সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পড়েছো?"

দুর্গাচরণবাবু বিপন্নভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে—বোধহয়—কি জানি—ঠিক মনে পড়ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, বাল্যবিবাহ খুব ভালো জিনিস। আমাদের সমাজে এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথা যত দিন প্রচলিত থাকবে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর-শাশুড়ী ভাসুর-দেওর-ননদ-ভাজ—এসব নিয়ে তাকে ঘরকন্না

করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কিনা ?"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু 'কিন্তু' আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কি বলো দেখি ? কিন্তু—কি ?"

দুর্গাচরণবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায়বাহাদুর বলিতে লাগিলেন, "বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোলো বৎসর আর ছেলের বয়স চব্বিশ—নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারিশাস্ত্র খুলে দেখো, আমার মত যথার্থ কিনা বুঝতে পারবে।"—বলিয়া রায়বাহাদুর একটু গর্বের হাসি হাসিয়া, মুখটি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণবাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কথা তো ঠিকই। কিন্তু বড়ো মুশকিল যে! আমার রানীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়বে, তবে কি তিন-চার বছর এখন জামাই আনতে পারব না ? বাড়ির মেয়েরা তা হলে যে—"

রায়বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন জামাই আনতে পাবে না ? অবশ্যই পাবে। যেদিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেবো। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর করো যত্ন করো—বাড়ির মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "বড়ো সমস্যার কথা!"

রায়বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—"সমস্যাই তো! সমস্যাই তো!—এই রকম সব সমস্যার সমাধান করেছি বলেই তো আমার কেতাবের নাম 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান।' এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি। যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলে উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।"

"কী উপায় ?

"বউ অন্দরে থাকবে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। ব্যাস্, হয়ে গেল,—কেমন, সহজ উপায় নয় ?" বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "লোকত ধর্মত সেটা কি ভালো হয়?"

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায়বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন, "আমি ভালো বুঝেছি—তাই লিখেছি। তোমার ভালো বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পারো। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে তো নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।"—বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায়বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। পাত্রটি হাতছাড়া হইলে বড়োই দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারির আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ি আছে, রায়বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হইবে না—এমন সুযোগটি কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই সবিনয়ে, নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণবাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। বাড়িতে পরামর্শ করিয়া, যেমন হয়, আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায়বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায়বাহাদুর তখন, হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ি যুগল ওয়েলারের পদভরে দুর্গাচরণবাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রায়বাহাদুর পুত্রের নাম শ্রীমান হেমন্তকুমার।

ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। কিন্তু তাহার পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরের সহিত আর তাহার সাক্ষাৎ হইল না, রায়বাহাদুর পূর্বেই তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি তাঁহার ভীষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী নিজের স্বামীকে চিনিতেন, সুতরাং হুকুম রদ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহকাল থাকিয়া রানী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা বুদ্ধির কার্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্তৃক এ বিষয়ে বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন,

"দেখো, জামাইকে সকালবেলা নিয়ে এসে, বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয়নি, এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জানো তো?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাইষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণবাবু রানীকে শিবপুরে তাঁহার বড়ো মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে রাখিয়া মাতব্বর 'এলিবাই' সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া, তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চনা করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায়বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্বাটীতে নির্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগজামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষা যাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ এবং দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন-পনেরো পরে একদিন হঠাৎ উভয়ের চোখাচোখি হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখাচোখি হইতে লাগিল। নির্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশেপাশে কেহ নাই। যাইবার সময় যে বধূর শাড়িটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বুল বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না—সেই ক্ষণিক মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখনও রেওয়াজ হয় নাই) 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় 'চকোরের ব্যথা' শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায়বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—'বধূমাতা অনেক-দিন আসিয়াছেন। মার জন্য বোধহয় তাঁহার অত্যন্ত মন-কেমন করে।

অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে।'

দুর্গাচরণবাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই-তিন দিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাংলায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য হইল, কারণ কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর দেখিল—শিবপুর।

পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল, "গিন্নীর চিঠি নাকি?"

"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুকপকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভান করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড়ো শ্যালীর শ্বশুরবাড়ি, সেখান হইতে কি পত্র আসিল?

(২) কখনও তো আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কি?

(৩) রানী কি তাহার দিদির মারফত তাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফত তাহাকে চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কিনা?

(৫) যদি লিখি তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কিনা?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন? এমন কঠিন, এমন নিষ্ঠুর কেন?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়াছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ পকেটের ভিতর লেফাফার মধ্যে তাহার তৃষাহর পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

১৭নং বিনোদ বোসের গলি,
শিবপুর।
২৫শে কার্তিক।

কল্যাণবরেষু,

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পারিবে কিনা বলিতে পারি না, কারণ একদিন মাত্র বাসর ঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমার শ্বশুরালয়।

আমার দিদিশাশুড়ী তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কলেজ হইতে শিবপুর এমন তো কিছু দূর নহে—বড়ো জোর এক ঘণ্টার পথ। শিবপুর ঘাটে নামিয়া, যাহাকে আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশ্যক কথা আছে—এতএব যত শীঘ্র পারো, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে, বেলা বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে আসিলেই ভালো হয়। আমার শ্বশ্রূঠাকুরানীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্বাদিকা
তোমার দিদি যামিনী

পুঃ—রানী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবেন।

পত্রখানি, বিশেষত শেষ দুই লাইন দুই-তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সেদিন কলেজে বাকি কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রানী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রানীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না, 'পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্যভঙ্গ করাই কেন?' এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয় হউক। তাহারা যদি আমায় জল

খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পান পর্যন্ত খাইব না,—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈকি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি তো আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ির ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া, কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রানী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধকরি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্যদিন অপেক্ষা এক ঘণ্টা পূর্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারোটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারোটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ি হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ি ফিরিতে তাহার দেরি হইবে, চারিটার পূর্বে গাড়ি আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ি চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকা গাড়ি লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্রামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকা গাড়িতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ী বেটারা কুড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া, বাড়ি অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্তা হাওড়ার উকিল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোনো হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে!

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল, "জামাই-

বাবু ভালো আছেন তো ? আসুন, বাড়ির ভিতর আসুন" ।— তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কি ভাই চিনতে পারো ?"—বলিয়া উনিশ কিংবা কুড়ি বৎসর বয়সের, গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইঁহাকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি ?" —বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল, "হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্বাদ করছি। আর, আশীর্বাদের দরকারই বা কি ? রানীর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেই দিনই তো রাজা হয়েছো।"—বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধ জানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণী-কণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল। "—কে লা ছুঁড়িগুলো—পালা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র, ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক জোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আমায় ডেকেছেন কেন ?"

"কেন বলো দেখি ? যদি বলতে পারো তো—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বলতে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজী হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল, "যাও বাবা—কোলে যাও, তোমার মেছো মছাই হন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর করবেন, নক্ষি বাবা—যাও বাবা, পাজী হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি তো ওঁর বয়েই গেল।"

বাড়ির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যামিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, কটা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে ?"

হেমন্ত এই অঙ্কটি পূর্বেই মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল, বলিল, "বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল, "আচ্ছা দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

দুই মিনিট পরে হেমন্ত শুনিল, ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী-দিদির পায়ে তো একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দটা কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "দিদিমার এখন অবসর হল না ভাই —এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয়নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয়তো বলো। আর কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম রঙের শাড়িতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এই নাও—তোমার রানী না ভাই রাজা। রাজা ও রানীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটো অবধি তুমি রাজত্ব করো। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জলখাবার তৈরি করিগে,"—বলিয়া যামিনী কোনো উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া, সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল, রানী পিত্রালায়ে। এখন হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়িতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল, "এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়োই ব্যাঘাত হচ্ছে। কলকাতার মেসে গিয়ে এ ক-টা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়ন স্পৃহায় পিতা কোনোও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে 'ধরিয়া' লইয়া যাইত। যামিনীর ভগিনী-স্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রানীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল, রায়বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায়বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন, "বাড়িতে গোলমালে পড়াশুনো ভালো হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাকো।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া, তর্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ি আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রানীর শাড়ির রঙটি পর্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ির একজন ঝিকে ঘুষ দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফত উভয়ের পত্র-ব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ি আসিল। বড়ো আশা করিয়াছিল, অন্তত বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষেও রানী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়োই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ি আসে, চুপ করিয়া উদাস নেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল, "দাদাবাবু বৌদিদি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল, "কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল, "হাজার হোক দাদাবাবু, সোয়ামি তো! বৌদিদিমণি বলেন, এমন কপাল করে এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখতে পাইনে।"

"তুই কি করে জানলি ঝি ?"

"যে ঘরে বৌদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শুই কি না।"

পর রবিবারে ঝি বলিল, "দাদাবাবু, একটিবার আপনি বৌদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল, "উপায় কি ?"

"আপনি যদি এক কাজ করেন তো হয়।"

"কী কাজ ঝি ?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, একদিন যদি বলেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই বলে যদি থেকে যান, তাহলে অনেক রাত্রে সবই ঘুমুলে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রানী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দুতলায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়ন ঘর সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে বোধহয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড়ো ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যাই ছি ছি—সে বড়ো কেলেংকারি !

ঝি বলিল, "কি বলেন দাদাবাবু ?"

"তোমার বৌদিদিমণি কি বলেন ?"

"তিনি বলেন, না ঝি ওসব কাজ নেই, আমার বড়ো ভয় করে।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাতত বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নামক নাটক পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া পশ্চাতের জানালার পথে আমিও রাত্রে রানীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেব বাড়িতে ১৫৲ মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্তী রবিবারে ছোট একটি হাত-ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ি গেল। যথাসময়ে ঝির দ্বারা সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল :—

হৃদয়ের রানী আমার,

এক বৎসরকাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস করো, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিসটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটি প্রান্ত, তোমার ঘরের বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিম্নে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনোও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নিচে ফেলিয়া দিবে। এগারোটা হইতে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌঁছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমার মর্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনোও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোরবেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় যাইব।

তোমার স্বামী

ঘণ্টা দুই পরে ঝি আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঝি, মত হয়েছে?"

ঝি বলিল, "হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কাল রাত্রে এগারোটার পর আমি আসব?"

"আসবেন।"

"আচ্ছা তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেকো।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শীতটা এবার বড়ো শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যা রাত্রেও

গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গরম মোজা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, কোহাট গিরিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি, বির্জিতলার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিল। ভবানীপুরের যে অংশে রায়বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস, তাহা রসা রোড হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর ফটকটি বড়ো রাস্তার উপর, বাড়ির পশ্চাতের বাগানের দুই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিমদিকের পথটি তো আরও জনহীন কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুরকির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড়ো থাকে না।

এগারোটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়ার রাস্তার মোড়ে একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃত দেহ এক ব্যক্তি গাড়ি হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ি তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে, বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুত পদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিছু হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কনস্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া, এক বাড়ির দেউড়িতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছু দূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল ঐ অন্ধকার অংশের কোনোও একটা সুবিধামতো স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিমন্যাস্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমতো ফুটবল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযোগী একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল দোকানী অথবা মিস্ত্রি শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।

হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে বাগানে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কনুইয়ে আঘাত লাগিল। অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনোও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এই এইখানে ঘুপ্‌টি মারিয়া বসিয়া থাকি।—বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেণ্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল বোধহয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্তি দেখিয়া হেমন্তর হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কৌন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হ্যায় কনস্টেবলজী।"

"কাঁহা কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া, মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হ্যায়। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হ্যায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনস্টেবল এক ভীষণ চিৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার

আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ দিল। সেখানে কতগুলা ভাঙা ইট পড়িয়াছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কন্‌স্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর, গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবারে অন্ধকার।

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটরপটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। কোনোও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন-চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "কাঁহা—কাঁহা কন্‌স্টেবলজী ?"

কন্‌স্টেবল বলিল, "জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন লোকগুলা ধীরে ধীরে জামরুল গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ির জমাদার মহাবীর সিং এবং দুইজন দ্বারবানের সঙ্গে কন্‌স্টেবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া মহাবীর সিং বলিল, "কেহু তো না বুঝায়হে ?"

কন্‌স্টেবল বলিল, "ভাগ গেলই কা ?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদ্‌তে দেখলি হো, তোহর্‌ কির্‌।"

এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল

গাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধোগো হো—পাকড়্লি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল, "ধেত্তেরিকে—ইতো খালি লুগা বুঝাহে।" বস্ত্রখানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিতলের আর একটা জানালা খুলিয়া আলোকরশ্মি বাহির হইল। রায়বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ক্যা হ্যায় ? ক্যা হ্যায় মহাবীর সিং ?"

কন্স্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চিৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর বাগিচামে চোর ঘুষা হ্যায়।"

রায়বাহাদুর হাঁকিলেন, "খোঁজ খোঁজ পাক্ড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কি ? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চিৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে!"

সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

"আরে বাপ্রে বাপ্—জান গইল রে বাপ্"—বলিয়া একজন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "ক্যা হুয়া ?"

এই সময় আরও দুই-তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল, "হুজুর পাত্থলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোড় দিহিস্ হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহে"—বলিয়া রায়বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকটে যাওয়া এখন আর নিরাপদ নহে, রাণীর

শয়ন-কক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনোও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তার পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কি দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্যসহ রায়বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন, "কে রে? কে রে?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায়বাহাদুর হাঁকিলেন, "চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো—সব আদমি ভিতর চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া গিয়া উপরে বধূর শয়নকক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায়বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্ছিত অবস্থায় পড়িয়া—চোর পালঙ্কের উপর লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন রায়বাহাদুর 'সামাজিক সমস্যা সমাধান' পুস্তকের একস্থান খুলিয়া 'চতুর্বিংশতি' কথাটি কাটিয়া 'দ্বাবিংশতি' এবং 'ষোড়শ' কথাটি কাটিয়া 'চতুর্দশ' করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ॥ সতী
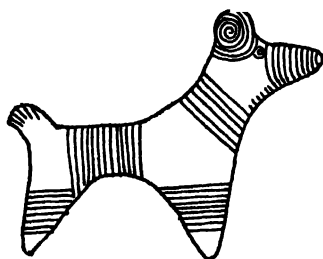
০০ এক ০০

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভালো উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। শহরের কোনো কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে 'দুর্নীতি-দমন' সমিতির কার্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোনোমতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোট বোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি ঘটে।

স্ত্রী নির্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিল, কহিল, কালকের কাগজে দেখলাম আমাদের লাবণ্যপ্রভা আসছেন এখানকার মেয়ে-ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা লাবণ্য নাম এমন তো কত আছে বৌদি।

নির্মলা বলিল, তা আছে। ওঁকে জিজ্ঞেসা করছি।

হরিশ মুখ তুলিয়া সহসা কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি জানবো কী করে শুনি? গভর্নমেণ্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, আহা রাগ করো কেন, রাগের কথা তো বলিনি। তোমার তদ্‌বির-তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে তো আহ্লাদের কথা। এই বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি মন্থর মৃদুপদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না—উঠো না—

হরিশ বিদ্যুৎ বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল—নাঃ শান্তিতে এক মুঠো খাবারও জো নেই। উঃ! আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর মধুর কণ্ঠ কানে গেল, তুমি কোন্ দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে সে একদিন জগৎ দেখবে।

এখানে হরিশের একটু পূর্ববৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিল সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সব্-জজ, হরিশ এম-এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার মেস ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহংকার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসত পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদর-আলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাকওয়ালা মুনসেফ, দাড়ি-ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সরকারী উকিল এবং শহরের অন্যান্য মান্য-গণ্যের দল সন্ধ্যার পরে কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিল। সদর-আলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। অতএব আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইত ধর্ম সম্বন্ধে এবং যেমন সর্বত্র ঘটে এখানেও তেমনি আধ্যাত্ম-তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা সমাধা হইত খণ্ডযুদ্ধের অবসানে।

সেদিন এমনি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনোদিন তিনি কোনো অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হোক অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাকওয়ালা মুনসেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। ইহার কারণ, এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল, শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না। সবাই খুশি হইলেন, হইলেন না শুধু সব্-জজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য? এবং বলিলেনও

ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাঁহার পরমপ্রিয় সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুনলেন তো ভাদুড়ী মশাই, ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!

ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না, কহিলেন, তা বটে। কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্ত। আগে মাস্টারি করত কিনা।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন, ও জানার মুখে আগুন। এরাই হল জ্ঞানপাপী। এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এই স্বল্পভাষী মেধাবী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং পিতার অভিমত যাহাই হোক, পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল—সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন।

এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যের সহিত হরিশের পরিচয় হইল। সেও আই-এ পরীক্ষার পড়া তৈরি করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল। সেইদিন হইতে প্রতিদিনের আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থই শুধু জানিল না, আরও একটা জটিলতর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইল যাহা তত্ত্ব হিসাবে ঢের বড়ো।

কিন্তু সে কথা এখন থাক। ক্রমশ পরীক্ষার দিন কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালোই দিল এবং ভালো করিয়াই পাস করিল।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইল হরিশ সমবেদনায় মুখ পাংশু করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ফেল্ করলেন যে বড়ো?

লাবণ্য কহিল, এইটুকুও পারব না, আমি এতই অক্ষম?

হরিশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হবার হয়েছে, এবার কিন্তু খুব ভালো করে একজামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, খুব ভালো করে দিলেও আমি ফেল হব। ও আমি পারব না।

হরিশ অবাক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, পারবে না কি রকম?

লাবণ্য জবাব দিল, কি রকম আবার কি? এমনি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশ কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে রামমোহনবাবু মকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে তাহার আর কোনো কূল-কিনারা না থাকে, এই শুভ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিদায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দ-যোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধকরি তিনি এতখানি বিচলিত হইতেন না। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কী! এত বড়ো—! ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর জোগাইল না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকিলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্মার্থ ও পেন্সানান্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোট মেয়ে নির্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন।

মেয়েটি দেখিতে ভালো। দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন—বলো কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজকালকার ছেলে—

কর্তা কহিলেন, কিন্তু আমি তো আজকালকার বাপ নই। আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ যদি না হয় তাকে আর কোনো উপায় দেখতে বোলো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্বাক হইয়া গেলেন।

কর্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর বাপের হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশও শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া, কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন এবং আশীর্বাদের কাজটাও এই সঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন।

তাহাদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন এবং ইংরাজি শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ-কীর্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকা মাহিনার চাকুরি দেওয়া ব্যতীত ইংরাজের আর কোনো গুণ নাই। আজকাল দিন-ক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজি না পড়াইলে চলে না। কিন্তু যে মূর্খ এই ম্লেচ্ছ-বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ-সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং যথাকালে শুভকর্ম সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিল না।

কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে মৈত্র গৃহিণী, নির্মলার সতী-সাধ্বী মাতা ঠাকুরানী—বধূ জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন। বলিলেন, মা পুরুষ মানুষকে চোখে চোখে না রাখলেই সে গেল। সংসার করতে আর যা-ই কেন না ভোলো, কখনো এ কথাটি ভুলো না।

তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্র-বুড়া চিতায় শয়ন না করিলে আর তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

নির্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিল এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘকাল কত পরিবর্তন, কত কি ঘটিল। রায়বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্মনিষ্ঠ মৈত্র গতায়ু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যের অন্যত্র বিবাহ হইল, জুনিয়ার উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তখন যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িল, কিন্তু নির্মলা তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র আর এ জীবনে ভুলিল না।

০০ দুই ০০

এই সজীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এত সত্বর শুরু হইবে তাহা কে জানিত! রায়-বাহাদুর তখনও জীবিত, পেন্সন লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল-বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভালো কীর্তনওয়ালী আসিয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল কাজকর্ম অন্তে একদিন ভালো করিয়া তাহার কীর্তন শুনা।

পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইল ; শুনিয়া বাড়িতে ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্মলা উপরের খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, গান লাগলো কেমন ?

হরিশ খুশি হইয়া কহিল, খাসা গায়।

দেখতে কেমন ?

মন্দ না, ভালোই।

নির্মলা কহিল, তা হলে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই তো পারতে।

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, কি রকম ?

নির্মলা সক্রোধে বলিল, রকম ভালোই। আমি কচি খুকী নই, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধুলো দেবে তুমি ? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে কহিল, তুমি করছো কি বৌদি, বাবা শুনতে পাবেন যে !

নির্মলা জবাব দিল, পেলেনই বা শুনতে। আমি তো চুপি চুপি কথা কইছিনে।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই জোড়-হাতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া কহিল, রক্ষে করো বৌদি, এত রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেংকারি কোরো না।

বধূর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িল বই কমিল না। কহিল, কিসের কেলেংকারি ! তুমি বলবে না কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা তো আর জলে-পুড়ে যাচ্ছে না ! বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

হরিশ কাঠের পুতুলের মতো নিঃশব্দে নিচে আসিয়া বাকি রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইল। অতঃপর দিন দশেকের মতো উভয়ের বাক্যালাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায় না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিল। বন্ধুরা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যত বুড়ো হচ্ছো, রোগও তত বেড়ে যাচ্ছে হে !

হরিশ অধিকাংশ স্থলেই জবাব দিত না, কেবল খোঁচা বেশি করিয়া বিঁধিলেই বলিত, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করতে পারো তো তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি।

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা! বৃথা! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

০০ তিন ০০

সেবার বসন্তরোগে লোক মরিতে লাগিল খুব বেশি। হরিশকেও রোগে ধরিল। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন; কহিলেন, মারাত্মক—রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন। নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘোচাবে সাধ্যি কার? তোমরা ওঁকে দেখো, আমি চললুম। এই বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িল। কহিল, উনি বাঁচেন তো আবার বাড়ি ফিরবো, নইলে এইখান থেকে ওঁর সঙ্গে যাবো।

সাত দিনের মধ্যে দেবতার চরণামৃত ভিন্ন কেহ তাহাকে জল পর্যন্ত খাওয়াইতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া বলিল, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েছেন, এবার তুমি ঘরে চলো।

লোক ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা পায়ের ধূলা লইল, তাহার মাথায় থাবা থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিল; কহিল মানুষ তো নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—বৃদ্ধেরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে, না কলিতে ধর্ম গেছে বলেই একেবারে ষোলো-আনা 'গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এল!

বন্ধুরা লাইব্রেরী-ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধে আর মানুষে স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে তো আমরাও করেছি, কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল কেন হরিশ সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকত না।

বীরেন উকিল ভক্ত লোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিল, আমি জানতাম

হরিশ মরতেই পারে না। সত্যিকার সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে? বাড়ি থেকে বলে গেল, যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই তো—উঃ! শরীর শিউরে ওঠে।

তারিণী চাটুজ্যের বয়স হইয়াছে, আফিংখোর লোক। একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শাস্ত্রমতে সহধর্মিণী কথাটা ভারী শক্ত। আমার দেখো না, কেবল মেয়েই সাতটা; বিয়ে দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভালো হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইল তখন কত লোক যে তাহাকে অভিনন্দিত করিল তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে অনেক লজ্জা দিয়েছি, মাপ কোরো। লক্ষ কেন, কোটি কোটির মধ্যেও তোমার মতো ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিল, সীতা-সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই স্বরাজ ফরাজ যাই-ই বলো, কিছুতেই হবে না মেয়েদের যতদিন না আবার তেমনি তৈরি করতে পারবো। আমার তো মনে হয়, শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ নারী-শিক্ষা-সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং যে আদর্শ মহিলা তার পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হবেন তাঁর নাম তো আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুজ্যে বলিলেন, সেই সঙ্গে একটা পণ-প্রথা-নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার তো ছেলেবেলায় খাসা লেখার হাত ছিল, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোনো কথারই জবাব দিতে পারিল না, কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

০০ চার ০০

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত অন্যান্য পুত্রদের বিষয়-সংক্রান্ত মামলা বাধিয়াছিল। হরিশ ছিল বিধবার উকিল। জমিদারের আমলা কে-যে কোন্ পক্ষে জানা কঠিন বলিয়া গোপনে পরামর্শের জন্য বিধবা

নিজেই ইতিপূর্বে দুই-একবার উকিলের বাড়ি আসিয়াছিলেন। আজ সকালেও তাহার গাড়ি আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিল। হরিশ সসম্ভ্রমে তাহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। আলোচনা পাছে ও ঘরে মুহুরির কানে যায়, এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিল। বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠের শব্দ আসিল, আমি সব শুনেছি।

বিধবা চমকিয়া উঠিল, হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল।

একজোড়া অতি সতর্ক চক্ষু কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ-কথা সে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়াছিল।

পর্দা ঠেলিয়া নির্মলা রণমূর্তিতে বাহির হইয়া আসিল, হাত নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, ফুস্ ফুস্ করে কথা কয়ে আমাকে ফাঁকি দেবে? মনেও কোরো না। কই, আমার সঙ্গে তো কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখিনি!

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিল, এ কী কাণ্ড হরিশবাবু!

হরিশ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পাগল।

নির্মলা কহিল, পাগল? পাগলই বটে। কিন্তু করলে কে শুনি? বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গাড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল। মুহুরি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, একজন জুনিয়ার উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিল—সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, বোস্ কোম্পানির বিল সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিল—আমি সব জানি, আমি সব বুঝি, থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সতী কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বই দুই না জেনে থাকি, যদি—

এদিকে বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এ কি ব্যাপার হরিশবাবু! এ কি দুর্নাম দেওয়া—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোনো প্রতিবাদ করিল না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও না কিসের জন্য?

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্য-সাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামুনঠাকুর রূপার বাটিতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিল। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্মলা কোনোদিন জল-স্পর্শ করিত না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিল, তাহার এই দুঃখময় দুর্ভর জীবনের অবসান হইবে কবে? এমনি অনেকদিন অনেক রকমেই ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোনো পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।

০০ পাঁচ ০০

বছর দুই গত হইয়াছে। নির্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, খবরের কাগজের খবর ঝুটা নয়। লাবণ্য যথার্থই পাবনার মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোট বোন উমাকে জানাইল যে, রাত্রের ট্রেনে তাহাকে বিশেষ জরুরী কাজে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধহয় দিন চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন-পনেরো হইল স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে স্টেশন দূরে, রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পর সে মকদ্দমার দরকারী কাগজপত্র হ্যাণ্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিল, নির্মলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

নির্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আজ কলকাতায় যাচ্ছো নাকি?

হরিশ কহিল, হুঁ।

কেন?

কেন আবার কি! মক্কেলের কাজ, হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চলো না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে? গিয়ে কোথায় থাকবে শুনি?

নির্মলা কহিল, যেখানে হোক। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভালো এবং সতী স্ত্রীর উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। কহিল, তোমার লজ্জা না থাক্, আমার আছে। আমি গাছতলার পরিবর্তে আপাতত কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠব স্থির করেছি।

নির্মলা বলিল, তা হলে তো ভালোই হল, তাঁর বাড়িতেও স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

হরিশ কহিল, না, সে হবে না। বলা নেই কহা নেই, বিনা আহ্বানে পরের বাড়ি তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি উঠতে পারব না।

নির্মলা বলিল, পারবে না সে জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যের ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল, হাত-মুখ নাড়িয়া চিৎকার করিয়া কহিল, তুমি যেমন নোংরা তেমনি মন্দ। সে বিধবা ভদ্র মহিলা, আমিই বা সেখানে যাবো কেন, সেই বা আমাকে যেতে বলবে কেন? তাছাড়া, আমার সময় বা কই? কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে তো নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাব না।

পাবে গো পাবে, বলিয়া নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন-তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিল, চার-পাঁচ দিন বলে গেলে, তিন দিনেই ফিরে এলে যে বড়ো?

হরিশ কহিল, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্মলা জোর করিয়া একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

হরিশ কহিল, না।

নির্মলা অতিশয় ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতাতেই যদি গেলে একবার খবর নিলে না কেন?

হরিশ জবাব দিল, সময় পাইনি।

অত কাছাকাছি গেলে সময় একটুখানি করে নিলেই হত। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাসখানেক পরে, একদিন আদালতে বাহির হইবার সময়ে হরিশ

ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, আজ আমার ফিরতে বোধকরি একটু রাত হয়ে যাবে উমা।

কেন দাদা?

উমা কাছেই ছিল, আস্তে বলিলেই চলিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে চড়াইয়া অদৃশ্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হরিশ উত্তর দিল, যোগীনবাবুর বাড়িতে একটা জরুরী পরামর্শ আছে, দেরি হয়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইল। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল, স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল যোগীনবাবুর বাড়ি থেকে এলে বুঝি?

আবদুল কহিল, নেহি মাইজী, স্টেশন সে আতেহেঁ।

ইস্টিশান? ইস্টিশান কেন? গাড়িতে কেউ এল বুঝি?

আবদুল কহিল, কলকাত্তাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে? বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন বুঝি?

আবদুল হাঁ বলিয়া জবাব দিয়া গাড়ি আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলে লইয়া এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিল, তাহাকে কহিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল, একবার সে এমনও বলিতে চাহিল যে, এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

বছর দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিল। ছেলেকে খাবার খাইতে দিল এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইল, কহিল, আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য ইহার উত্তর দিয়া বলিল, হরিশবাবুর মুখে শুনেছিলাম আপনি ক্রমাগত

বার-ব্রত আর উপবাস করে করে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলেছেন। এখনো তো বেশ ভালো দেখাচ্ছে না।

নির্মলা সহাস্যে কহিল, বাড়ানো কথা। কিন্তু এ আবার উনি কবে বললেন?

হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কহিল, এবার কলকাতায়, খেতে বসে কেবল আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে কিনা। ছাদের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে শোনা যায়।

নির্মলা বলিল, খুব সুবিধে তো।

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতেই শুধু হয়নি, ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমতো ধরে আনতে হত।

বটে!

লাবণ্য বলিল, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই, ব্রাহ্মদের ছোঁয়া খান না—আমার পিসিমার হাতে পর্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রেঁধে নিজে পরিবেশন করতে হত। এই বলিয়া সে হাসিমুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন তো? আমি কি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া?

হরিশের সর্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মনে হইল, এতদিনে মা বসুমতী দয়া করিয়া বোধহয় জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, নির্মলা আজ ভয়ংকর উন্মাদ কাণ্ড কিছু একটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিল। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধহয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হরিশ বাহিরে আসিয়া স্তব্ধ পাংশুমুখে বসিয়া রহিল। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করিবার কথা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-অবমাননাকর ও একান্ত মর্যাদাহীন লুকোচুরির প্রস্তাব সে কোনো মতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্র মহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যাবাদী! এত মিথ্যা কথা বলো?

হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল—বেশ করি বলি, আমার খুশি।

নির্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,

বলো যত ইচ্ছে মিথ্যে বলো, যত খুশি আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়মনে সতী হই—আমার জন্যে তোমার একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে, বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিল, এখন সেটা দৃঢ়তর হইল এইমাত্র। নিচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায় আসে, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময়ে একবার করিয়া ক্লাবে গিয়া বসিত, এখন সেটুকু বন্ধ হইয়াছে। কারণ শহরের সেইদিকে লাবণ্যের বাসা।

তাহার মনে হয় পতিপ্রাণা ভার্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আরশির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত, সতী-সাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর মেদ-মজ্জা-মাংস শুষ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে।

তাহার আলমারির মধ্যে একখানা কালী সিংহের মহাভারত ছিল। সময় যখন কাটিত না তখন তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িত। কী তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী। স্বামী পাপী-তাপী যাহাই হোক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকাল তাহারা একত্রে বাস করে। কল্পকাল যে ঠিক কত হরিশ জানিত না; কিন্তু সে যে কম নহে এবং মুনি ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত।

পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিত। কিন্তু কোনো পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যা হোক একটা ছাড়-রফা করিয়া ফেলিত; মুসলমানদের হইলে তিন তালাক দিয়া বহু পূর্বেই চুকাইয়া ফেলিত; কিন্তু নিরীহ, এক-পত্নীব্রত ভদ্র বাঙালী—না, কোনো উপায় নাই। ইংরাজি শিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে, বিশেষত নির্মলা—চন্দ্র সূর্য তাহার মুখ দেখিতে পায় না, আত-বড়ো শত্রুও যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিতে পারে না, বস্তুত স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকেই পরিত্যাগ!

বাপ্ রে! নির্মল নিষ্কলুষ হিন্দু-সমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে। দেশের লোক খাই খাই করিয়া হয়তো তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।
ভাবিতে ভাবিতে চোখ কান গরম হইয়া উঠিত। বিছানা ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকি রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিত।
এমনি করিয়া বোধহয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিল, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। কহিল, জবাবের জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে।
খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যের হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি আমার, খুললে কে?
ঝি কহিল, মা।
হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিল লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটিবারও খবর নিলেন না আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ বেশ জানেন এ বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক, এ-যাত্রা আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে নালিশের জন্যে নয়। আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরত একবার এসে তাকে আশীর্বাদ করে যাবেন এই ভিক্ষা।—লাবণ্য
পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এই-খানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান-বাজনার আয়োজনও আছে।
চিঠি পড়িয়া বোধকরি সে ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নিচু করিল—অর্থাৎ বাটীর দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাশার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিল—ইহার কি সীমা নাই, যতই সহিতেছি ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে?
জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি কে এনেছে?
তাঁদের বাড়ির ঝি।
হরিশ কহিল, তাকে বলে দাও আমি কোর্টের ফেরত যাবো। এই বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিল।
সে রাত্রে বাড়ি ফিরিতে হরিশের বস্তুত অনেক রাত্রিই হইল। গাড়ি হইতে

নামিতেই দেখিল, তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্মলা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে।

০০ ছয় ০০

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছে। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, বোধহয় সমস্ত আফিংটাই বার করে ফেলা গেছে,—বৌমার জীবনের আর কোনো শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিল, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন কাছে কাছে থেকে দিন দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

সেদিন বার-লাইব্রেরী ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠিল। ভক্ত বীরেন কহিল, আমার গুরুদেব স্বামীজি বলেন, বীরেন, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাই বাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তো বিশ্বাস করলে না, বললে হরিশ এ কাজ করতেই পারে না। এখন দেখলে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম করো না।

ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ—হরিশটা কী স্কাউণ্ড্রেল! ও রকম সতী-সাধ্বী স্ত্রী যার, —কিন্তু মজা দেখেছ সংসারে? বদমাইশগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ রকম স্ত্রী জোটে!

বৃদ্ধ তারিণী চাটুজ্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহ। আমার তো মাথার চুল পেকে গেল কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। অথচ আমারই হল সাত সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে ইস্কুলের পরিদর্শক হিসেবে লাবণ্যপ্রভা মহিলাটি দেখছি একেবারে আদর্শ! গভর্নমেণ্টে বোধকরি মুভ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যাবসোলিউটলি নেসেসরি!

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইল না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে শহরে কাহারও আর বাকি রহিল না। এবং সুহৃদ্‌বর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, দাদা, তুমি আবার বিয়ে করো।

হরিশ কহিল, পাগল!

উমা কহিল, পাগল কেন? আমাদের দেশে তো পুরুষদের বহুবিবাহ ছিল।

হরিশ কহিল, তখন আমরা বর্বর ছিলাম।

উমা জিদ করিয়া বলিল, বর্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানে তো আমি তো জানি? সমস্ত জীবনটা কি এমনি ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিল, উপায় কি বোন? স্ত্রী ত্যাগ করে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের তো নেই। তোর বৌদিরও যদি এ পথ খোলা থাকত তোর কথায় রাজী হতাম উমা।

তুমি কি যে বলো দাদা! এই বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী বসিয়া রহিল। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল একটি কথাই বারংবার উত্থিত হইতে লাগিল, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।

তাহার বসিবার ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ভিখারীর দল কীর্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সে কালে এ অভিযোগের কিরূপ উত্তর দূতীর মিলিয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু একালে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো দূতি, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভালো জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি তো সব কথা বুঝবে না—বললেও না। কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক-শ বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। কংশ-টংশ সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, তবু তো তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল—মথুরায় লুকিয়ে থাকা চল্‌তো। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) ॥ বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ

০০ এক ০০

মেয়ে-স্কুলের গাড়ির সহিস আসিয়া হাঁকিল—"গাড়ি আয়া বাবা।"

অমনি কালো গোরো মেটে শ্যামল কতকগুলি ছোটবড়ো মাঝারি মেয়ে এক-এক মুখ হাসি আর চোখভরা কৌতুক-চঞ্চলতা লইয়া বই হাতে করিয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। একটি ছোট মেয়ে একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ময়ূরের পেখম-শিহরণের মতন কাঁপাইয়া তুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান একটি কিশোরী সুন্দরীকে বলিল—"দেখো ভাই বিভাদি, এ আবার কি রকম সহিস!"

বিভা তাহার সুন্দর চোখ দুটি নূতন সহিসের মুখের উপর একবার বুলাইয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—"কি রকম সহিস আবার? অত হাসছিস কেন মিছিমিছি?"

ছোট মেয়েটি তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—"কত বড়ো ঘোড়ার কতটুকু সহিস!"

এতক্ষণে তাহার হাসির কারণ বুঝিতে পারিয়া সব মেয়ে কটিই হাসিয়া হাসিয়া বার বার তাহাদের স্কুলগাড়ির ছোট্ট নূতন সহিসের দিকে চাহিতে লাগিল।

সহিস বেচারা একেবারে নূতন, তাহাতে বালক; এইসব ফুলের মতো মেয়েদের পরীর মতো বেশ দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গিয়াছিল; এখন তাহাদের হীরক-ঝরা হাসির ধারা দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল; সংকোচে লজ্জায় থতমত খাইয়া সে একবার ঈষৎ চোখ তুলিয়া অপাঙ্গে মেয়েদের দিকে তাকায় আবার পরক্ষণেই চক্ষু নত করে।

বিভার মনে পড়িল রবিবাবুর ইওরোপের ডায়েরির কথা। ইটালিতে

আঙুরের মতো একটি ছোট্ট মেয়ে প্রকাণ্ড একটি মোষকে দড়ি ধরিয়া চরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া চশমাপরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট স্বামীর ছোট্ট নোলক-পরা বৌয়ের উপমা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। বিভারও তাই ভারী হাসি পাইল। সে হাসিমুখে তাহার সঙ্গিনীদের ধমকাইয়া বলিল—"নে নে থাম, শুধু শুধু হাসতে হবে না। চ'।"

পশ্চাৎ হইতে পুরাতন সহিস চিৎকার করিয়া উঠিল—"আসো না বাবা! বহুৎ দেরি হচ্ছে যে।"

মেয়েগুলি কাহারো শাসন না মানিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে লজ্জিত কুণ্ঠিত বালক সহিসের হাতে নিজেদের বই সেলেট খাতা চাপাইয়া দিয়া চলন্ত ফুলগুলির মতো আপনাদের চারিদিকে একটি রূপের মোহের আনন্দের হিল্লোল বহাইয়া একে একে গিয়া গাড়িতে উঠিল—কোনোটি ফুটন্ত, কোনোটি ফোটো ফোটো, কোনোটি বা মুকুল-কলিকা। সহিস দুজন গাড়ির পিছনে পা-দানের উপর চড়িয়া দাঁড়াইল। গাড়ি দূরের মেঘ-গর্জনের মতো গুরু-গম্ভীর শব্দে পাড়াটিকে উচ্চকিত করিয়া অপর পাড়ায় মেয়ে কুড়াইতে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

যে মেয়েটি প্রথমেই হাসির ফোয়ারার চাবি খুলিয়া দিয়াছিল সে লম্বা গাড়ির অন্ধকার জঠরের ভিতর হইতে গাড়ির পিছন দিকের চৌকা জানলার ঘুলঘুলির মুখের কাছে সেই নূতন সহিসকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আবার হাসিতে হাসিতে কুটিকুটি হইয়া বলিল—"দেখো বিভাদি দেখো, ওর মাথায় কী টোকা-পানা চুল।"

বিভা গাড়ির পিছনের জানলার মুখের কাছেই বসিয়াছিল। সে একবার যেন বাহিরের দিকে চাহিতেছে এমনি ছলে নূতন সহিসকে দেখিয়া লইল। তাহার একমাথা বাবরি চুল রুক্ষ জটায় এলোমেলো হইয়া মুখের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে। তাহার মাঝখানে যেন কালো পাথর কাটিয়া কুঁদিয়া-বাহির-করা কিশোর সুকুমার মুখখানি একটি নীল পদ্মের মতো, রমণীর হাসির সম্মুখে লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিভা সংক্রামক হাসি কষ্টে চাপিয়া চোখ দুটিতে তিরস্কার হানিয়া হাসির রানী সেই মেয়েটিকে বলিল—"দেখ্‌, ভীমরুল, ফের হাসলে মার খাবি।"

এ শাসনে কেহই বশ মানিল না। এক-এক বাড়ি হইতে এক-একটি নূতন মেয়ে আসিয়া গাড়িতে চড়ে আর হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া হাসির প্রবাহ আর

থামিতে দেয় না। গাড়ির ভিতরে ভিড়ও যত বাড়ে ঠাসাঠাসির মধ্যে হাসিও তত জমাট হইয়া উঠে।
কিশোর সহিসটি সেই ঘুলঘুলির মুখের কাছে ঠায় দাঁড়াইয়া নিরাশ্রয় অসহায়ভাবে কিশোরীদের হাসির সূচিতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে আপনাকে লুকাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু তাহার লুকাইবার জো ছিল না। তখন সে যথাসম্ভব একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিভার আড়ালে আপনাকে গোপন করিল। সে ছাতুখোর মেড়ো এবং একেবারে গোঁয়ার হইলেও এটুকু সে বুঝিতেছিল যে, যে-মেয়েটি জানলার মুখের কাছে বসিয়া আছে সে মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া না হাসিতেই চাহিতেছে। সে সকলের হাসির হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে বাঁচাইত। সে একবার করুণ নেত্রে বিভার দিকে ক্ষণিকের জন্য তাকাইয়া কুণ্ঠিত নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।
মেয়ে-স্কুলের বিশ্বম্বহ দীর্ঘ গাড়ি পথ কাঁপাইয়া, পথিকদের ব্যগ্র সচকিত করিয়া, হাজার দৃষ্টির উপর অতৃপ্তির ঝিলিক হানিয়া, বিরাট অবহেলার মতন, একবুক আনন্দ-প্রতিমা বহিয়া স্কুলে গিয়া পৌঁছিল। কিশোর সহিস অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

০০ দুই ০০

সে মুচির ছেলে। তাহার নাম কাল্লু।
ছেলে হাকিমের দপ্তরে নোকরি পাইবে আশায় তাহার বাপ তাহাকে ইংরেজি স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল। প্রথমে যে স্কুলে সে ভর্তি হইতে গেল সেখানে সে মুচির ছেলে বলিয়া স্কুলের কর্তারা হইতে ছাত্ররা পর্যন্ত আপত্তি তুলিয়াছিল। শেষে আরা শহরে এক সাহেব মিশনারীর স্কুলে স্থান পাইয়া সে বছর ছয়েক ইংরেজি ও নাগরী শিক্ষা করিয়াছিল। তারপর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে গ্রামের মাতব্বরেরা বলিল, কাল্লুর লিখাপড়ি শিখিয়া কোনো ফায়দা নাই; তাহার বাপ-দাদার পেশা অবলম্বন করাই তাহার উচিত। তখন বেচারা বইয়ের দপ্তর ফেলিয়া জুতা সেলাইয়ের থলি ঘাড়ে করিল। তাহার হাকিমের দপ্তরে নোকরি করিয়া মাতব্বর হওয়ার কল্পনা বাপের মৃত্যুর সঙ্গেই মিলাইয়া গেল। তবু তাহার জাতভাই বিরাদরীর মধ্যে কাল্লুর খাতির হইল যথেষ্ট— সে তুলসীকৃত রামায়ণ পড়িতে পারে, সে বিরাদরীর পঞ্চায়েৎ-মজলিসে তোতা-কাহিনী, বেতাল-পচিশী, চাহার দরবেশ পড়িয়া শুনাইতে পারে, খত চিঠ্‌ঠি

বাচাইতে পারে ; এবং সাড়ে সাত রূপেয়া তন্‌খা হইলে এক রোজের মজ্‌দুরি কত বা শতকরা দশ রূপেয়া সুদ হইলে এক রূপেয়ার সুদ কত মুখে মুখে কষিয়া দিতে পারে।

এইরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ও প্রণয়রস মধুর বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ কেতাব পড়িয়া কাল্লুর কিশোরচিত্ত পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর তাহার গাঁয়ে গঁওয়ার লোকদের মধ্যে থাকিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। সে স্থির করিল একবার কল্‌কাত্তা যাইতে হইবে ; সেখানে তাহার চাচেরা ভাই বহুৎ টাকা কামাই করে।

কাল্লুকে বাধা দিবার কেহ ছিল না ; সে জগৎ সংসারে একা। আপনার বাপের হাতিয়ারগুলি থলিতে ভরিয়া সে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার ভাই বলিল যে রাস্তায় রাস্তায় রোদে বৃষ্টিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জুতা সেলাই করিয়া বেড়াইতে তাহার বড়ো তক্‌লিফ্‌ হইবে ; তাহার চেয়ে কাল্লু স্কুলে নোকরি করুক। স্কুলে একটি নোকরি খালি আছে।

স্কুলে নোকরি ! শুনিয়া কাল্লু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। চাই কি সে সেখানে নিজের বিদ্যাচর্চারও সুবিধা করিয়া লইতে পারিতে পারে। তাহার পর যখন শুনিল যে সেটা জনানী স্কুল, তখন তাহার কল্পনাপ্রবণ মন সেখানকার পদ্‌মাবতী শাহারজাদী ও পরীবানুদের স্বপ্নে ভরপুর হইয়া উঠিল। কিন্তু পরীবানুদের সহিত প্রথম দিনের পরিচয়ের সূত্রপাত তাহার তেমন উৎসাহজনক মনে হইল না। পরীর মতো বেশভূষায় মণ্ডিত ফুলের মতো মেয়েগুলি যেন হাসির দেশের লোক।

কাল্লু ঘোড়ার সাজ খুলিয়া দানা দিয়া উদাসমনে আসিয়া আস্তাবলের সামনে একটা শিশু গাছের ছায়ায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মেয়েগুলো তাহাকে দেখিয়া অমন করিয়া মিছামিছি হাসিয়া খুন হইল কেন ? তাহার চেহারার মধ্যে হাসি পাইবার মতো এমন কি আছে ? তাহার গাঁয়ের বাচ্চী আকালী পব্‌নী তো তাহাকে দেখিয়া কৈ এমন করিয়া হাসে না। কিস্‌মতিয়া ইঁদারা হইতে জল ভরিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে বাড়ি ফিরিবার সময় তাহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিত বটে, কিন্তু তাহার হাসি তো এমন খারাপ লাগিত না—তাহার সেই দিল্‌লগীতে তো দিল্‌ প্রসন্নই হইয়া উঠিত। যত নষ্টের গোড়া ঐ কোঁকড়া-চুল-ওয়ালী ছোঁড়া ! ভীমরুলের উপর তাহার ভারী রাগ হইতে লাগিল—সেইই তো প্রথমে হাসি

আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সব মেয়েগুলোই খারাপ—কেবল—কেবল—ঐ গোরী-বাবা ভারী ভালো! সে তাহাকে দেখিয়া হাসে নাই, সকলকে হাসিতে মানা করিয়াছে, ভীমরুলকে মারিতে পর্যন্ত চাহিয়াছিল। ঐ বাবা বহুৎ নিক্। বহুৎ খাপ্‌স্থরৎ।

কাল্লু বসিয়া বসিয়া যত ভাবে ততই তাহার বিভাকে বড়োই ভালো লাগে। সে তাহার দৃষ্টিতে কেমন করুণা ভরিয়া একবার উহার দিকে তাকাইয়াছিল। সে কেমন করিয়া উহাকে সকলের হাসির আঘাত হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেছিল! বহুৎ নিক্! বহুৎ খাপ্‌স্থরৎ! সেই গৌরী-বাবা!

০০ তিন ০০

এইরূপে সে দিনের পর দিন ধরিয়া কত মেয়েকে দেখতে পায়, কত মেয়ের হাত হইতে সে বই গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো মেয়েই তাহার প্রাণের উপর তেমন আনন্দের ছটা বিস্তার করে না, যেমন হয় তাহার বিভাকে দেখিলে। আর সকলের কাছে সে ভৃত্য, গাড়ির সহিস, সে অস্পৃশ্য মুচির ছেলে—কুণ্ঠিত সংকুচিত অপরাধীর মতন। কিন্তু বিভাকে দেখিলেই তাহার অন্তরের পুরুষটি তারুণ্যের পুলকে জাগিয়া উঠে, মনের মধ্যে আনন্দের রসের শিহরণ হানে, তাহার দৃষ্টিতে কৃতার্থতা ঝরিয়া ঝরিয়া বিভার চরণকমলের জুতার ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বসন্তের অলক্ষিত আগমনে তরুশরীরে যেমন করিয়া শিহরণ জাগে, যেমন করিয়া নবকিশলয়-দলে শুষ্ক তরুর অন্তরের তরুণতা বিকশিত হইয়া পড়ে, যেমন করিয়া ফুলে ফুলে তাহার প্রাণের উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, মধুতে গন্ধে যেমন করিয়া ফুলের প্রাণে রসসঞ্চার হয়, বিভাকে দেখিয়া কিশোর কাল্লুর অন্তরের মধ্যেও তেমনি একটি অবুঝ যৌবনের বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল, তাহার অন্তরের পুরুষটি প্রকাশ পাইবার জন্য মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। তাহার শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যবর্তী অপটু অক্ষম মন চাহিতেছিল সেও তেমনি করিয়া আপনার অন্তর বেদনা তাহার আরাধিতার চরণে নিবেদন করে যেমন করিয়া বজ্রমুকুট পদ্মাবতীকে তাহার হৃদয় বেদনা নিবেদন করিয়াছিল, যেমন করিয়া শাহাজাদা পরীজাদীকে তাহার মর্ত্যমানবের মনের ব্যথা বুঝাইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে অক্ষম, অতি হীন, তাহার মনের কোণের গূঢ় গোপন প্রণয়বেদনা সে কেমন করিয়া এই অনুপমা মহিয়সী রমণীর চরণে নিবেদন করিবে। সে যদি তাহাদের গ্রামের কিসমতিয়া

হইত, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু ইহার তো কিস্‌মতিয়ার সহিত কোনোই মিল নাই! এ না পরে ঢিলি চুন্নুরি লহেঙ্গা, না পরে আঁটি আঙিয়া, না যায় ইঁদারায় জল আনিতে। না সে কাজরী গীত গাহিয়া তাহাকে সাহসী করিয়া তোলে! এ যে এ জগতের জীব নয়। এর পরনের শাড়িখানি বিচিত্র মনোরম ভঙ্গিতে তাহার কিশোর সুকুমার তনুদেহখানির উপর সৌন্দর্যের স্বপ্নের মতন অনুলিপ্ত হইয়া আছে; ইহার গায়ের ঝালর-দেওয়া, ফুলের-জালি-বসানো জামাগুলির ভঙ্গি যেন কোনো স্বর্গলোকের আভাস দেয়; ইহার পায়ে জুতা, চোখে সুনেহ্‌রী চশমা। ইহার কাছে সে কত হীন, কত অপদার্থ, কী সামান্য! সে আপনার মনের ভাবলীলার বিচিত্র মাধুর্যের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতায় নিজেই কুণ্ঠিত লজ্জিত সংকুচিত হইয়া পড়িতেছিল, সে পরের কাছে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না।

এমন কি বিভার সামনে দাঁড়াইতেও তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে যেন অপবিত্র, অশুচি, দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে ভয়ে সংকোচে কুণ্ঠিত হইয়া উঠে। আপনার দেহ-মন শিক্ষা সহবৎ জন্মকর্ম কিছুই তাহার বিভার উপযুক্ত তো নহে।

তবুও সে অন্তরের যৌবন-পুরুষের তাড়নায় আপনাকে যথাসাধ্য সংস্কৃত সুদর্শন করিতে চাহিল। সে রাস্তার ধারে একখানি ইঁট পাতিয়া বসিয়া দেশওয়ালী হাজামের কাছে হাজামত করাইল; কপালের উপরকার চুল খাটো করিয়া ছাঁটিয়া মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার ও দুই পাশে দুই কোণ করিয়া থর কাটিল। তারপর বাজার হইতে একখানি টিন-বাঁধানো আয়না ও একখানি কাঠের কাঁকই কিনিয়া দীর্ঘ বাবরি চুলগুলিকে প্রচুর কড়ুয়া তেলে অভিষিক্ত করিয়া শিশুগাছের তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া বসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া কাঁধের উপর কুঞ্চিত সুবিন্যস্ত ফণাকৃতি করিয়া তুলিল। সেদিন সে নাহিয়া ধুইয়া মাজিয়া ঘষিয়া আপনাকে চক্‌চকে সাফ করিয়া যথাসাধ্য নিজের মনের মতন করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহার সহিসের পোশাকটা তাহার মোটেই রুচি-রোচন হইতেছিল না। নীল রং-করা মোটা ধুতির উপর হলদে-পাটি-লাগানো নীল রঙের খাটো কুর্তা ও নীল পাগড়ি তাহাকে যে নিতান্ত কুৎসিত করিয়া তুলিবে, ইহাতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি ও লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, সেই কুৎসিত উর্দি পরিয়াই তাহাকে বিভার সম্মুখে বাহির হইতে হইবে। তখন সেই পোশাকই অগত্যা যথাসম্ভব শোভন সুন্দর করিয়া পরিয়া সেদিন সে গাড়ির

পিছনে চড়িয়া বিভাকে বাড়ি হইতে স্কুলে আনিতে গেল। কিন্তু তাহাতেও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার চক্ষুশূল সেই ভীমরুল ছুঁড়ী তাহাকে দেখিয়াই আবার হাসিয়া গড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে, আবার ফ্যাশান করে চুল-কাটা হয়েছে।"

তাহার সেই বিশৃঙ্খল রুক্ষ চুলই মেয়েদের চোখে ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহাকে নববেশে দেখিয়া তাহাদের আবার ভারী হাসি আসিল। বিভা ঈষৎ হাসিমুখে তাহার দিকে যখন চক্ষু ফিরাইয়া ভীমরুলকে বলিল—"কি হাসিস!" তখন কান্নুর চোখ দুটি আগুনের ফুলকির মতন ভীমরুলের দিকে চাহিয়া জ্বলিতেছিল। ভীমরুল হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখো দেখো বিভাদি, ও কেমন করে তাকাচ্ছে।"

বিভা যেই তাহার দিকে স্মিতমুখে তাকাইল অমনি তাহার দৃষ্টি কোমল প্রসন্ন হইয়া যেন বিভার চরণে আপনার জীবনের কৃতার্থতা নিবেদন করিয়া দিল। বিভা ভীমরুলকে ধমক দিয়া বলিল—"কৈ কী করে তাকাচ্ছে আবার!" ভীমরুল বলিয়া উঠিল—"না বিভাদি, ও এমনি করে কটমট করে তাকাচ্ছিল, তুমি ফিরে চাইতেই অমনি ভালো-মানুষটি হয়ে দাঁড়ালো!"

ক্রমে তাহার নূতন বেশও মেয়েদের চোখে সহিয়া গেল। একজন তরুণ পুরুষ যে নিত্য তাহাদের সেবা করিতেছে এ-বোধ তাহাদের মনে আর জাগ্রত রহিল না। কিন্তু সেই তরুণ সহিসের মনে তরুণী একটি নারীর ছাপ দিনের পর দিন গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহার মনে হইত সে একদিন বিভার চরণতলের ধূলায় পড়িয়া যদি বলিতে পারে যে সে একেবারে সাধারণ নয়, নিতান্ত অপদার্থ নয়, সেও তাহাদেরই মতন স্কুলে ইংরেজি পড়িয়াছে, এখনো দু-চারটা ইংরেজি বাত সে পড়িতে পারে, সে রামায়ণ পড়িতে পারে, কাহানিয়া পড়িতে পারে! তবে তাহার জীবন সার্থক হইয়া যায়। কিন্তু পারিত না সে কোনোদিন বিভাকে একলা পাইত না বলিয়া, পারিত না সে ভীমরুলের হাসির হুলের ভয়ে! তখন সে ভাবিত, মুখের কথা যাহাকে খুশি শুনানো যায়, আর মনের কথা মনের মানুষটিকেও শুনানো যায় না কেন? মনের মন্দিরে সে যে-সব পবিত্র অর্ঘ্য সাজাইয়া সাজাইয়া তাহার আরাধ্য দেবতার আরতির আয়োজন করিতেছিল, তাহা যদি তাহার দেবতা অন্তর্যামী হইয়া অনুভব করিতে পারিত! দেবতা যদি অন্তরের মুখর ভাষা না বুঝে তবে মূক মুখের ভাষায় সে তো কিছুই বুঝিতে পারিবে না!

তবু একদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া সে বিভার হাত হইতে বই লইতে লইতে উপরকার বইখানির নাম যেন নিজের মনেই পড়িল—লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস্ অ্যাণ্ড রোম!

ভীমরুল অমনি হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিল—"বিভাদি, তোমার সহিস আবার ইংরেজি পড়তে পারে। এইবার থেকে তুমি ওর কাছে পড়া বলে নিয়ো।" ভীমরুলের চেয়ে বড়ো একটি মেয়ে সরযূ হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"লিগেণ্ডস্! লিগেণ্ডস্ অফ্ গ্রীস অ্যাণ্ড রোম্! লেজেণ্ডস্‌কে লিগেণ্ডস্ বলছে!" বিভা হাসিমুখে কাল্লুর দিকে চাহিয়া বলিল—"তুই ইংরেজি পড়তে পারিস?" কাল্লুর মনের সমস্ত বিদ্রূপ গ্লানি লজ্জা সংকোচ বিভার হাসিমুখের একটি কথায় কাটিয়া গেল। সে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"হাঁ বাবা, হাম তো কয়ইক বরষ ইংলিশ পঢ়া থা!" বিভা তাহার কথা শুনিয়া হাসিল। কাল্লু সাহস পাইয়া বলিল যে, সে গোরীবাবার পড়িয়া-চুকা পুরানা-ধুরানা একখানা কেতাব পাইলে এখনও পড়ে। বিভা হাসিয়া বই দিতে স্বীকার করিল। গর্বের আনন্দে কাল্লুর মন ফুলিয়া উঠিল। আজ সে বিভার কাছে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বিভা আজ তাহার সহিত কথা বলিয়াছে! বিভার প্রথম দান আজ সে পাইবে! ভীমরুল যে তাহাকে 'পণ্ডিত-সহিস' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া কত হাসিল আজ আর সেদিকে সে কানই দিল না।

সেই দিন হইতে সে আবার পাঠে মন দিল। বিভা তাহাকে একখানা ইংরেজি বই দিয়াছে; সেইখানা পাইয়া সে ভরা মনে শিশু গাছের তলায় গামছা পাতিয়া পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিল। প্রথমে বই খুলিয়াই সে খুঁজিতে লাগিল বইয়ের কোথাও গোরীবাবার কোনো নাম লেখা আছে কিনা; কোথাও কোনো নাম খুঁজিয়া সে পাইল না। সে শুনিয়াছে ভীমরুল তাহাকে বিভাদি বলিয়া ডাকে। বিভাদি আবার কী রকম নাম? তাহাদের গাঁয়ে একটি মেয়ের আবাদিয়া নাম আছে, একটি মেয়ের নাম আছে বিদেশিয়া; পারবতীয়া, পরভাতিয়া নামও হইতে পারে। কিন্তু বিভাদি, সে কী রকম নাম? সে মনে মনে ভাবিয়া ঠিক করিল উহার নাম দুলারী কি পিয়ারী হইলে বেশ মানায়। সে স্থির করিল গোরীবাবাকে সে পিয়ারী নামেই নিজের মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিবে। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল এই বইখানি পিয়ারী পড়িয়াছে; বইয়ের স্থানে স্থানে পেন্সিলের দাগ ও দুই-একটা কথার মানে লেখা আছে—

সেগুলি পিয়ারীই লিখিয়াছে, তাহার সোনার মতো আঙ্‌লগুলি এই বইয়ের বুকের উপর বুলাইয়া বুলাইয়া গিয়াছে। বইখানি তাহার কাছে পরম অমূল্য নিধি হইয়া উঠিল। সে সমস্ত দিনের অবসরের সময় সেখানিকে খুলিয়া কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া থাকে; কদাচিৎ এক আধ লাইন পড়ে, শুধু বইখানিকে কোলে করিয়াই তাহার আনন্দ। রাত্রে সে বইখানিকে বুকের কাছে লইয়া শোয়। যখন বইখানি আস্তাবলে তাহার কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া বইখানিকে ছাড়িয়া দু-বেলা মেয়েদের আনিতে ও রাখিতে যাইতে হয়, তখন তাহার মন সেই বইখানির কাছেই পড়িয়া থাকে। তখন সে অবাক হইয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে।

একদিন তাহাকে ঐরূপে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীমরুল বলিয়া উঠিল—"বিভাদি, বিভাদি, দেখো, সহিসটা তোমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখো?" বিভা একবার চকিতে কাল্লুর দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া হাসিমুখে বলিল—"তুই ভারী দুষ্টু হচ্ছিস ভীমরুল।" কাল্লু বিভাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া ব্যথিত অনুতপ্ত হইয়া নিজের অসাবধান দৃষ্টি নত করিল। সেই দিন হইতে সে এক মুহূর্তের বেশি বিভার দিকে আর চাহিতে পারিত না। সে যে হীন, সে যে মুচি, সে যে ঘোড়ার সহিস, সে যে বিভার দিকে তাকাইতে সাহসী এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবার যোগ্যতা তাহার যে নাই!

এই ক্ষণিকের চকিত দর্শনই তাহার জীবনের আনন্দ প্রদীপ! যে দিন ছুটি থাকে, সেদিন তাহার সহকর্মীরা ডুড়্‌ক, খঞ্জনী ও করতাল খচমচ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাইয়া গোলমাল করিয়া ছুটি উপভোগ করে, আর কাল্লু গাছতলায় বইখানি কোলে করিয়া উদাস মনে আকাশের দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া থাকে। কেহ তাহাকে গানের মজলিসে যোগ দিতে ডাকিলে সে ওজর করিয়া বলে—"জী বহুৎ সুস্ত্‌ হ্যায়, আচ্ছি নেহি লাগ্‌তা।" প্রাণ আজ তাহার বড়ো অসুস্থ, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না। যেদিন বিভাদের বাড়ি হইতে স্কুলে অপর সকল মেয়ে আসে, কেবল বিভা আসে না, সেদিন সকলের বইয়ের বোঝা হাতে করিয়া কাল্লু বিভার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে—"উয় বাবা জায়েগী নেহি?" যখন শুনে আজ সে যাইবে না, তখন সে একবার বাড়ির দিকে একটি চকিত দৃষ্টি হানিয়া গাড়ির পিছনে গিয়া উঠে, এবং চলন্ত গাড়ি হইতে যতক্ষণ সেই বাড়ি দেখা যায় ততক্ষণ বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যায় যদি কোনো জানালার ফাঁকে

একবার পিয়ারীর খাপ্সুরৎ মুখখানি তাহার নজরে পড়ে। দীর্ঘ অবকাশের সময় তাহার দেশওয়ালী বন্ধুরা সকলেই বাড়ি চলিয়া যায়, ঘোড়া তখন কুকের বাড়িতে পোষানী থাকে, সহিসদের ছুটির দরমাহা মিলে না। কিন্তু কাল্লু নিজের সঞ্চিত অর্থে একবেলা দুটি চানা ও একবেলা একটু ছাতু খাইয়া দীর্ঘ অবকাশ কলিকাতাতে পড়িয়াই কাটায়, পিয়ারী যে শহরে আছে সে শহর ছাড়িয়া সে দূরে যাইতেও পারে না। দিনের মধ্যে একবারও অন্তত বিভাদের গলি দিয়া সে বেড়াইয়া আসে, সেই গলিটাতে গিয়াও তাহার আনন্দ, যে বাড়ির মধ্যে পিয়ারী আছে তাহার দর্শনেও তাহার পরম সুখ। ছুটির সময়কার উদাস দীর্ঘ কর্মহীন দিনগুলি কোনোরকমে কাটাইয়া রাত্রে কেরোসিনের ডিবিয়ার প্রচুর ধূমোদ্গম দেখিতে দেখিতে কাল্লু ভাবিতে থাকে সেই বিভারই কথা। কবে সে তাহাকে দেখিয়া একটু হাসিয়াছিল, কবে সে তাহার সহিত দয়া করিয়া কি কথা বলিয়াছিল, কবে তাহার হাত হইতে বই লইতে গিয়া আঙুলে একটু আঙুল ঠেকিয়াছিল। তাহার নিকষের মতো কালো দেহে সেই সোনার মতো আঙুলের ঈষৎ স্পর্শ লাগিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে সোনার রেখা আঁকিয়া দাগিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাই সে বিভার প্রভাতারুণ রশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল হাসির আলোকে এক মনে মুগ্ধ নয়নে বসিয়া বসিয়া দেখিত। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত অন্তর প্রভাতের পূর্বাকাশের মতো একেবারে সোনায় সোনায় মণ্ডিত হইয়া একেবারে সোনা হইয়া উঠিত। পূজা ও হোলিতে সহিসেরা সকল মেয়ের নিকট হইতেই কিছু কিছু বকশিশ পায়; কাল্লু বিভার কাছ হইতে যে সিকি-দুয়ানিগুলি পাইয়াছিল সেগুলিকে একটি গেঁজেয় ভরিয়া কোমরে লইয়া ফিরিত, বিরহের দিনে গেঁজে হইতে সেগুলিকে বাহির করিয়া হাতের উপর মেলিয়া ধরিয়া দেখিত যেন রজতখণ্ডগুলি বিভারই শুভ্র সুন্দর দন্তপংক্তির মতন তাহাকে দেখিয়া হাসির বিভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

oo চার oo

এমনি করিয়া দিনের পর দিন গাঁথিয়া বছরের পর কত বছর চলিয়া গেল। কত মেয়ে স্কুলে নূতন আসিল, কত মেয়ে স্কুল হইতে চলিয়া গেল। কাল্লুর চোখের সামনে তিল তিল করিয়া কিশোরী বিভা যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ সুন্দরী হইয়া উঠিল। কেবল কোনো পরিবর্তন হইল না কাল্লুর মনের

এবং অদৃষ্টের। কিন্তু তাহার কর্মের পরিবর্তন হইয়াছে। বিভা এম-এ পাস করিয়া স্কুলে পড়াইতেছে; কাল্লু লেখাপড়া জানে বলিয়া বিভা তাহাকে দু-প্রহরের জন্য বেহারা করিয়া লইয়াছে। সকাল-বিকাল সে সহিসের কাজ করিয়া দু-প্রহরে গোরীবাবার বেহারার কামও করে। ইহাতে তাহার পাওনা বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেশেরও পরিবর্তন ও পারিপাট্য হইয়াছে। এখন সে অন্তত দুপুর বেলাটা চুড়িদার পায়জামার উপর ধোয়া চাপকান পরিতে পায়; মাথার চুলগুলিকে সেই কাঠের কাঁকইখানি দিয়া আঁচড়াইয়া তাহার উপর সাদা কাপড়ের পাগড়ি বাঁধে। আর গোরীবাবার আপিসঘরের দরজায় সে পাষাণমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। এখন সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পিয়ারীকে দেখিতে পায়। তাহার দিল এখন পুরা ভরপুর আছে।

এই সময়ে একজন বাবু বড়ো ঘন ঘন কাল্লুর গোরীবাবার কামরায় আনাগোনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সহিত বিভার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল। তাহার গায়ের রং এমন সুন্দর যে সোনার চশমা যে তাহার নাকে আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না, সুন্দর সুগঠিত শরীর; দেখিবার মতো তাহার মুখখানি। কিন্তু ইহাকে কাল্লু মোটেই দেখিতে পারিত না। ইহাকে দেখিলেই কাল্লুর মাথায় খুন চড়িত, তাহার চোখ দুটা কয়লার মালসায় দুখানা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতন জ্বলিয়া উঠিত।

প্রথম যেদিন এই সুন্দর যুবকটি আসিয়া হাসি হাসি মুখে পর্দা-টানা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নিস্পন্দ কাল্লুর হাতে একখানা কার্ড দিয়া বলিল—"মেমসাহেব কো সেলাম দেও", তখনই তাহার হাসিবার ভঙ্গিটা কাল্লুর চোখে কেমন কেমন ঠেকিল। সে কার্ড লইয়া সন্তর্পণে পর্দা সরাইয়া বিভার হাতে গিয়া কার্ডখানি দিল। কার্ড পাইয়া বিভা যেমনতর হাসিমুখেই উৎফুল্ল হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবুকো সেলাম দেও", বিভার তেমনতর উৎফুল্ল আনন্দমূর্তি কখনো কাল্লুর দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। তাই গোরীবাবার এইরূপ আনন্দের আতিশয্য কাল্লুর মনে কেমন একটা অশুভ আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। তারপর যখন সে পর্দাটা একপাশে সরাইয়া ধরিয়া যুবকটিকে বলিল—"যাইয়ে" এবং পর্দার ঈষৎ ফাঁক দিয়া কাল্লু দেখিতে পাইল যুবকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই বিভা হন হন করিয়া আগাইয়া আসিল ও যুবকটি দুই হাতে বিভার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া মুগ্ধ নয়নে বিভার দিকে চাহিয়া রহিল, এবং

বিভারও চোখদুটি আবেশময় বিহ্বলতায় ও সুখের লজ্জায় ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল, তখন কাল্লুর অন্তরাত্মা অনুভব করিল সেই আগন্তুক যুবক—ডাকু হায়! সে কাল্লুর সর্বস্ব অপসরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে। সেইদিন হইতে তাহার মন যুবকটির প্রতি হিংসায় ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দিনের পর দিন যত সে বিভার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল ততই কাল্লুর নিষ্ফল ক্রোধ তাহার অন্তরে আগুন লাগাইয়া তাহার চোখ দুটাকে জ্বলন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার বুকের মধ্যে যখন ধক্ ধক্ করিয়া উঠিত তখন মনে হইত সে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতের দশ আঙুলের নখে করিয়া তাহার বুকটাকে ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া রক্ত খাইতে পারিলে তবে শান্ত হয়। সে শক্ত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া রাখিত, কিন্তু সে এমন করিয়া চাহিত যে তাহার অন্তরের সকল জ্বালা যেন দৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই ডাকুটাকে দগ্ধ ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। আজ সে কত বৎসর ধরিয়া কৃপণের ধনের মতন যে বিভাকে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ দিয়া ঘিরিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে, সেই তাহার পলে পলে সঞ্চিত সর্বসুখ এই কোথাকার কে একজন হঠাৎ আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে। শুধু একখানা গোরা চেহারা ও একজোড়া সুনেহরী চশমার জোরে! কাল্লু কালো কুৎসিত মুচি, কিন্তু তাহার অন্তরে পিয়ারীর প্রতি যে একটি ভক্তি পুঞ্জিত পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিছু কি ঐ বাবুটার অন্তরে আছে? যদি থাকিত তবে কি সে বিভার সম্মুখে অমন করিয়া বকবক করিয়া বকিতে পারিত, অমন হো হো করিয়া হাসিতে পারিত? অমন করিয়া পা ছড়াইয়া চেয়ারে হেলিয়া পড়িতে পারিত? লোকটার মনে এতটুকু সম্ভ্রম নাই, এতটুকু সংকোচ নাই; এতটুকু দ্বিধা ভয় আশঙ্কা নাই! সে যেন ডাকাত, জোর করিয়া, লুটপাট করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

কাল্লু শুনিয়াছিল যে কয়লার মধ্যে হীরা হয়। সে যদি কয়লার মতো কালো তাহার বুকের মধ্যে হীরার মতন উজ্জ্বল বিভাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিত! যদি সে কালো মেঘ হইয়া বিদ্যুতের মতো এই তরুণীটিকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এই ডাকাত লোকটার মাথায় বজ্রের মতন গর্জন করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া এক নিমেষে তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া খাক করিয়া ফেলিতে পারিত! কিন্তু যতই সে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না, যতই সে নিজের যে কি দাবি তাহা নিজের কাছেই সাব্যস্ত করিতে পারিতেছিল না, যতই সে নিজেকে

অসহায় মনে করিতেছিল, ততই তাহার অন্তর জ্বলিয়া চোখ দুটাতেও আগুন ধরাইয়া তুলিতেছিল। যুবকটিকে দেখিলেই তাহার চোখ দুটা বুনো মহিষের চোখের মতো যেন আগুন হানিতে থাকে; কিন্তু তখনই যদি বিভা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহার সেই অগ্নিদৃষ্টি অমৃতে অভিষিক্ত দুটি ফুলের অঞ্জলির মতো তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে।

একদিন কাল্লু পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিল সেই শয়তানটা বিভার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া, নিজের হাত হইতে একটা আংটি খুলিয়া বিভার আঙুলে পরাইয়া দিল! তারপর সেই হাতখানিকে ধরিয়া চুম্বন করিল—তাহারই চোখের উপরে।

আজ কাল্লুর সর্বাঙ্গে একেবারে আগুন ধরিয়া উঠিল। তাহার অন্তরের পুরুষত্ব উন্মত্ত হইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত পীড়িত বিদলিত করিতে লাগিল। তাহার পায়ের তলা দিয়া মাটি সরিয়া যাইতে লাগিল, তাহার চোখের সামনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাগলের মতো টলিয়া টলিয়া বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল! কোথায় তাহার আশ্রয়? কোথায় তাহার অবলম্বন?

কতক্ষণ সে এমন ছিল সে জানে না। অকস্মাৎ দেখিল তাহার সম্মুখে সেই যুবকটি দাঁড়াইয়া হাসিমুখে দুইটি টাকা ধরিয়া বলিতেছে—"বেহারা, এই লেও বক্‌শিশ্। কাল্লু দেখিল, সেই যুবকের ঠোঁটের উপর ও তো হাসি নয়, ও যেন আগুনের রেখা। তাহার হাতে ও তো টাকা নয়, ও যেন দু-খণ্ড উল্কা। আর সেই লোকটা তো মানুষ নয়, সে সাক্ষাৎ শয়তান!—ইহারই কথা সে মিশনারী সাহেবদের কাছে পড়িয়াছিল, আজ একেবারে তাহার সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ। তাই উহার বর্ণ এমন আগুনের মতন! তাই উহাকে দেখিলে কাল্লুর অন্তরে অমনতর অগ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠে। কাল্লুর মাথায় খুন চাপিয়া গেল, তাহার চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইতে লাগিল, তাহার দশ আঙুলের নখের মধ্যে রক্ত-পিপাসা ঝন্‌ঝনা হানিয়া গেল। এমন সময় তাহার কানে গেল কোনো স্বর্গের পরম দেবতার অমোঘ আদেশ—"কাল্লু, বাবু বক্‌শিশ দিচ্ছেন, নে।" কাল্লু মন্ত্রবশ সর্পের মতো মাথা নত করিয়া তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিল, যুবকটি তাহার হাতের উপর টাকা দুটি রাখিয়া দিল।

কাল্লুর মনে হইতে লাগিল টাকা দুটা তাহার হাতের তেলো পুড়াইয়া ফুটো করিয়া অপর দিক দিয়া মাটিতে ঝনঝন করিয়া পড়িয়া যাইবে। সে-ঝনৎকার তাহার কাছে বজ্রবিদারণ শব্দের ন্যায় মনে হইল। সে প্রাণপণে টাকা দুটাকে

চাপিয়া মুঠি করিয়া ধরিল,—হাত পুড়িয়া যায় যাক, কিন্তু টাকা দুটা মাটিতে পড়িয়া অট্টহাস্য না করিয়া উঠে।

যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মনে হইল এই অগ্নিখণ্ড দুটা সেই শয়তানটার মুখের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে বেশ হইত। তাড়াতাড়ি ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে ছুঁড়িতে গিয়া দেখিল সেখানে কেহ নাই। সে একা দরজার একপাশে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কাল্লু মুশ্‌কিলে পড়িয়া গেল, এই টাকা দুটা লইয়া সে কি করিবে! এ সে লইল কেন, এ তো সে লইতে পারে না। কী করিবে, কী করিবে সে এই টাকা দুটা লইয়া। তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে যেন টাকার মতো চাকা চাকা আগুনের চোখ জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল—সেগুলা যেন সেই আগুনে লোকটার চশমা পরা চোখ দুটার হাসিভরা ক্রূর দৃষ্টি।

কাল্লু টাকা দুটাকে ঠায় চাপিয়া ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সে কোথায় ফেলিবে এই বিষের চাকতি দুটা। যেখানে পড়িবে সেখানকার সকল সুখ সকল আনন্দ সকল শুভ সকল হাসি যে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে।

তাহাকে টাকা হাতে করিয়া ভাবিতে দেখিয়া একজন ভিখারী তাহাকে বলিল —"এক পয়সা ভিখ মিলে বাবা।" কাল্লু হঠাৎ যেন অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি দুটা টাকাই সেই পঙ্গুর হাতে দিয়া ফেলিল। অনন্তা উড়ে তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"কি রে কাল্লু, তু কল্পতরু হউচি পারা।" স্কুলময় রটিয়া গেল কাল্লুর মনিবের বিয়ে হইবে বলিয়া কাল্লু মনের আনন্দে একটা ভিখারীকে দুটা টাকা দান করিয়া বসিয়াছে!

০০ পাঁচ ০০

আজ বিভার বিবাহ। সেখানে কত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কাল্লুর হয় নাই। তবু তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। স্কুলের বোর্ডিঙের মেয়েদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে; তাহাদের গাড়ির সঙ্গে তাহাকে বিনা নিমন্ত্রণেও যাইতে হইবে। আজ তাহার সম্পূর্ণ পরাজয়ের দিন। সেখানে আজ আলোক সমারোহের মধ্যে সুসজ্জিত হইয়া হাসিমুখে সেই শয়তান ডাকাতটা চিরজন্মের মতো তাহার পিয়ারী গোরীবাবাকে আত্মসাৎ করিতে আসিবে, সেখানে আজ তাহাকে সহিসের নীল রঙের কুৎসিত উর্দি পরিয়া ম্লান-মুখে বিনা আহ্বানে

যাইতে হইবে, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশের অধিকার থাকিবে না, তাহাকে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

তাহাকে যাইতেই হইল। তাহার চোখের সামনে সেই শয়তানটা নিজের হাতে বিভার হাত ধরিয়া ফুলের মালায় বাঁধিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য দখল করিয়া লইল। তখন কাল্লু পুষ্প-বিভূষণা আলোকসমুজ্জ্বলা সভা হইতে পলায়ন করিয়া আপনার অন্ধকার দুর্গন্ধ আস্তাবলে আসিয়া বিচালির বিছানায় শুইয়া বিভার দেওয়া বইখানি বুকে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

সেইদিন হইতে তাহার কাছে স্কুল শূন্যাকার অন্ধকার। শতেক বালিকা যুবতীর হাসি সৌন্দর্য আনন্দলীলা সত্ত্বেও একজনের অভাবে সে স্থান নিরানন্দ অসুন্দর। সে গাড়ির পিছনে চড়িয়া বিভাদের বাড়িতে যায়, কিন্তু সেখান হইতে বিভা আর স্মিতমুখে বাহির হইয়া আসিয়া তাহার হাতে বই দেয় না; গাড়ির জানালাটির কাছে বিভার সোনার কমলের মতন অপরূপ সুন্দর মুখখানি আর হাসিতে ঝলমল করে না! সে বাড়ি হইতে বাহির হয় কাল্লুর চক্ষুশূল সেই ভীমরুলটা, আর সেই গাড়ির মুখের কাছে বসিয়া বসিয়া তাহাকে দেখিয়া হাসে।

এরকম জীবন কাল্লুর অসহ্য হইয়া উঠিল। সে একদিন ছুটির দিনে বিভার নূতন বাড়িতে গিয়া গোরীবাবার সহিত দেখা করিয়া বলিল, যে, গোরীবাবা যদি তাহাকে কোনো নোকরি দেয় তো তাহার পরবস্তি হয়। বিভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন কাল্লু, স্কুলের চাকরি ছাড়বি কেন? ওখানেই তো বেশ আছিস্।" কাল্লুর বুক এই প্রশ্নে যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহার অশ্রুসাগর যেন উথলিয়া পড়িতে চাহিল। পিয়ারী, তুই, তুই এমন বাত্ পুছলি! এতটুকু দয়া তোর হইল না। এতটুকু বুদ্ধি তোর ঘটে নাই। সে কী বলিবে, কেমন করিয়া বলিবে, যে, স্কুলের নোকরি আর তার ভালো লাগিতেছে না কেন? কাল্লু মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিভা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কেন স্কুলের চাকরি ছাড়বি কেন?"

কাল্লু ধীরস্বরে বলিল—"জী নেহি লাগতা!" এর বেশি সে কী বলিবে। প্রাণ তাহার সেখানে থাকিতে চাহিতেছে না, সেখানে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে।

বিভা বলিল—"আচ্ছা, তুই দাঁড়া, আমি একবার বাবুকে বলে দেখি।"

বাবুর নামে কাল্লুর রক্ত গরম হইয়া উঠিল। যে শয়তান তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন

করিয়াছে, ভিক্ষার জন্য হাত পাতিতে হইবে তাহার কাছে! কাল্লু বলিয়া উঠিল—"গোরীবাবা, হাম নোকরি নেহি ···" কাল্লু চাহিয়া দেখিল বিভা তখন চলিয়া গিয়াছে।

বিভা স্বামীকে বলিল—"ওগো শুনছো, দেখো, আমাদের স্কুলের সেই যে সহিসটা আমার বেয়ারার কাজ করত, সে আমার এখানে কাজ করতে চায়। তাকে রাখব? তাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, বড়ো ভালো লোক সে।"

বিভার স্বামী সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কে, সেই কালো কুচকুচে শয়তানটা? সে ভালো লোক! তুমি দেখোনি তার চোখের চাউনি—যেন কালো বাঘের চোখ! তাকে রেখো না, রেখো না, সে কোন্‌দিন ঘাড় ভেঙে রক্ত খাবে, আমায় খুন করবে!"

বিভা হাসিয়া বলিল—"অনাছিষ্টি ভয় তোমার! সবাই তো তোমার মতো সুন্দর হতে পারে না। ভগবান ওকে কালো করেছে তা এখন কি হবে।"

বিভার স্বামী ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"শুধু কালো রং নয়, তার ঐ ছুরির নখের মতো জ্বলজ্বলে চোখ দুটো যেন একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। ওকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া সে কিছুতেই হবে না।"

বিভা স্বামীর স্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া আর কিছু বলিল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গিয়া ডাকিল—"কাল্লু!"

কাল্লু আর সেখানে নাই, কাল্লু চলিয়া গিয়াছে।

বিভা মনে করিল তাহার স্বামীর কথা শুনিতে পাইয়াই কাল্লু বোধ হয় ব্যথিত আহত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বিভাও ইহাতে একটু বেদনা অনুভব করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। আহা, গরিব বেচারা!

কাল্লু স্কুলে গিয়া কর্মে ইস্তফা দিল। তাহার আলাপীরা বলিল, তুই কাজ ছাড়িয়া করিবি কি? কাল্লু বলিল, সে জুতা সেলাই করিবে। ইহা শুনিয়া তাহার সঙ্গীরা স্থির করিল কাল্লু নিশ্চয় বাউরা হইয়া গিয়াছে, নতুবা কাহারো কি কখনো এমন নোকরি ছাড়িয়া জুতা সেলাই করিবার শখ হয়? তাহারা কত বুঝাইল, কাল্লু কোনো উপদেশই কানে তুলিল না।

কাল্লু বিভার নিকট হইতে যে সিকি-দুয়ানি বখশিশ পাইয়াছিল তাহাতে কোঁড়া ঝালাইয়া পাটোয়ারকে দিয়া রেশম ও জরি জড়াইয়া গাঁথাইয়া লইয়াছিল। সেই মালাটিকে সে আজ গলায় পরিল। তারপর সেলাই বুরুশের সরঞ্জামের মধ্যে বিভার-দেওয়া বইখানি থলিতে ভরিয়া থলি কাঁধে উঠাইয়া

স্কুল হইতে সে বাহির হইয়া চলিল। পথে তাহার দেখা হইল ভীমরুলের সঙ্গে। একটি ছোট মেয়ে হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"বা রে সহিস আবার সেলাই ক্রুশ সেজেছে! লা-ক্রুশ!" কাল্লু একবার তাহাদের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া গেট পার হইয়া পথের জনস্রোতে ভাসিয়া পড়িল।

বিভা হঠাৎ জানালার কাছে গিয়া দেখিল তাহাদের বাড়ির অপর দিকের ফুট-পাথের উপর কাল্লু-তাহার জুতা সেলাইয়ের তোড়জোড় লইয়া বসিয়া আছে। বিভাকে দেখিয়াই তাহার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া বুঝাইয়া দিল সে স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং সে বেশ সুখেই আছে। কিন্তু বিভা কেন অকারণে বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, সে আর জানালায় দাঁড়াইতে পারিল না।

তারপর হইতে রোজই বিভা দেখে সকাল-বিকাল দু-বেলাই কাল্লু সেই ঠিক এক জায়গাতেই বসিয়া থাকে—রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, সে বসিয়াই থাকে, কোনোদিন তার কামাই হয় না। অতিবৃষ্টির সময়ও সে নড়ে না, জুতার তলায় হাফসোল দিবার চামড়াখানি মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া সে ঠায় বসিয়া বসিয়া ভিজে; দারুণ রৌদ্রের সময়ও সে নড়ে না, গামছাখানি মাথার পাগড়ির উপর ঘোমটার মতন করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া সে বসিয়া বসিয়া দর দর করিয়া ঘামে। বর্ষা ঘনাইয়া আসিলে সে আনন্দে কাজরীর গান গাহে—

পিয়া গিয়া পরদেশ,
লিখত নাহি পাঁতি রে;
রোয় রোয় আঁখিয়া,
ফাটত মোর ছাতি রে!

উৎসবের দিন সুসজ্জিত বিভাকে গাড়ি চড়িয়া কোথাও যাইতে দেখিলেও তাহার গান পায়, সে গাহে—

করি উজর শিঙার
তু চললু বাজার,
তেরি কাজর নয়না
ছাতি তোড়ত হাজার!

তাহার গানে শুধু ছাতি টুটিবারই সংবাদ সে ছুতায় নাতায় প্রকাশ করিত। পথের লোকে এই রস-পাগল মুচির কাছে জুতা সেলাই করাইতে করাইতে এমনি সব গান শুনিত—

নৈঁয়া ঝাঁঝরি,

অন পরি মউজ ধারা

বায়ু বহি পুরবৈয়াঁ

অব কস্ মিলন ভঁয়ে হুঁ. হামারা।

রহি গো পংথ, পাগর পবনা,

সুনহর ঘুংঘট কাজর-নয়না।

পার করো গোঁসাইয়া।

তাহার টুটা নৌকা, তাহার উপর অবিরল বর্ষণ, এবং প্রবল পবন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। কাজল-নয়না মেঘ সোনালী বিদ্যুতের ঘোমটা টানিয়া রহিয়াছে। পথ এখনও অনেক বাকি। মিলনের আশা তাহার আর নাই। তাই তাহার ব্যথিত অন্তর হায় হায় করিয়া দেবতার শরণ মাগিতেছিল—ওগো স্বামী, ওগো প্রভু, তুমিই আমার এই ভগ্ন জীবনতরণীকে পাড়ে ভিড়াইয়া দাও, ওগো পাড়ি জমাইয়া দাও!

পরশুরাম (১৮৮০—) ॥ হনুমানের স্বপ্ন
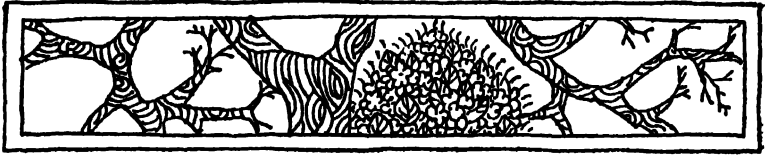
রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ্য শান্তির ও স্বাস্থ্যের নিলয় হইল, প্রজার গৃহ ধনধান্যে ভরিয়া উঠিল, তস্কর বঞ্চক ও পণ্ডিত-মূর্খগণ বৃত্তিনাশহেতু পলায়ন করিল। দেশে আর্ত পীড়িত নাই, ধর্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদী নাই, কারাগার জনশূন্য। ভিষগ্‌গণ রোগীর অভাবে ভোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন, বিচারকগণ পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধানে রত হইয়া অবসর বিনোদন করিতে লাগিলেন।

হনুমান এখন অযোধ্যাতেই বাস করেন। রাম তাঁহার জন্য এক সুরম্য কদলী-কাননে সপ্ততল কাষ্ঠভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহাবীর তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত প্রজাবর্গের সমাদরে সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি লাভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। অযোধ্যাবাসী উদ্বিগ্ন হইয়া দেখিল পবননন্দন দিন দিন কৃশ হইতেছেন, তাঁহার কান্তি ম্লান হইতেছে, তাঁহার আর তেমন স্ফূর্তি নাই। রামের আদেশে রাজবৈদ্যগণ হনুমানের চিকিৎসা করিলেন, বিস্তর অরিষ্ট মোদক রসায়নাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কোনোও উপকার দর্শিল না। ভিষগ্‌গণ হতাশ হইয়া বলিলেন, মহাবীরের যে ব্যাধি তাহা আধ্যাত্মিক ঔষধে সারিবার নয়। অগত্যা বশিষ্ঠ ঋষি হনুমানের মঙ্গল কামনায় এক বিরাট যজ্ঞের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজ্ঞী সীতা হনুমানকে শুদ্ধান্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তোমার কি হইয়াছে প্রকাশ করিয়া বলো, আমি তোমার মাতৃতুল্য, বলিতে সংকোচ করিও না।

মহাবীর কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাম গ্রীবা কণ্ডুয়ন করিলেন, তাহার পর দক্ষিণ গ্রীবা

কণ্ডূয়ন করিলেন। তদনন্তর মস্তক নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, মাতঃ, আমার গোপন কথা যদি নিতান্তই শুনিতে চাও তবে না বলিয়া উপায় নাই। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে পিতৃগণকে দেখিয়াছি। তাঁহারা সুমেরুশিখরে সারি সারি পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন এবং বিষণ্ণ বদনে নিজ নিজ উদরে হাত বুলাইতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বশিষ্ঠপুত্র বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, হে মহাবীর, ও কিছু নহে, তোমার পিতৃগণ ক্ষুধিত হইয়াছেন, তুমি কদলী দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধ করো এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূরিদক্ষিণা দাও। আমি বামদেবের উপদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহার পর আবার পিতৃগণ আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তখন আমার জ্ঞান হইল যে তাঁহারা ক্ষণিক ব্যবস্থায় তৃপ্ত হইবেন না। আমার মৃত্যুর পর কে তাঁহাদের পিণ্ড দিবে? লোকে যে-বয়সে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে, আমি সেই বয়সে সুগ্রীবের অনুচর হইয়া বানপ্রস্থে কালহরণ করিয়াছি। এখন প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সুগ্রীব রাজ্যলাভ করিয়াছেন, রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে, আমারও অবসর মিলিয়াছে। কিন্তু আমি এখন বার্ধক্যের দ্বারদেশে উপস্থিত, এখন যদি দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে চাই তবে লোকে আমাকে ধিক্‌কার দিবে। হা, আমার পিতৃঋণ শোধের কি উপায় হইবে? হে দেবি, এই দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ দহন করিতেছে, আমি নিরন্তর পিতৃগণের ম্লান মুখ ও শূন্য উদর দেখিতে পাইতেছি, আমার ক্ষুধা নাই নিদ্রা নাই শান্তি নাই। এই বলিয়া হনুমান্ নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

হনুমানের বচন শুনিয়া দেবী জানকী ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ, এজন্য আর চিন্তা কি? তুমি লোকলজ্জায় অভিভূত হইও না, এই দণ্ডে বিবাহ করিয়া পিতৃগণকে নিশ্চিন্ত করো। তোমার কী এমন বয়স হইয়াছে? আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় তোমার অপেক্ষাও অধিক বয়সে ভরত জননীকে গৃহে আনিয়াছিলেন। আমি আমার সখীগণকে ডাকিয়া আনিতেছি, তাহারা সকলেই সুরূপা সুশীলা সদ্‌বংশীয়া। তোমার যাহাকে ইচ্ছা পত্নীত্বে বরণ করো। হে কপিপ্রবর, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এই অযোধ্যায় এমন কন্যা নাই যে তোমাকে পতিরূপে পাইয়া ধন্য হইবে না। তুমি তোমার জাতির জন্য কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। আমি অনুরোধ করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ উপনয়নসংস্কার দ্বারা তোমাকে ক্ষত্রিয় বানাইয়া দিবেন। অথবা যদি মানবীতে তোমার অভিরুচি না থাকে তবে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করো এবং একটি পরমা সুন্দরী বানরীর

পাণিগ্রহণ করিয়া সত্বর অযোধ্যায় ফিরিয়া আইস। তোমার পত্নীর নাম যাহাই হউক আমি তাহাকে হনুমতী বলিব এবং এই রাজপুরীর বধূগণ মধ্যে সাদরে গ্রহণ করিব।

তখন হনুমান্ প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, জনকনন্দিনি, তোমার জয় হউক। আমি কৌলীন্য ভঙ্গ করিব না, বানরীই বিবাহ করিব এবং শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি লইয়া অদ্যই কিষ্কিন্ধ্যা যাত্রা করিব।

হনুমান্ নানা গিরি নদী বনভূমি অতিক্রম করিয়া দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্যাস্তের বিলম্ব নাই। মহাবীর এক বিশাল শাল্মলিতরুর শাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন নিকটে কোথাও রাত্রিবাসের উপযুক্ত আশ্রয় আছে কিনা। সহসা অদূরে একটি সুবৃহৎ পর্ণগৃহ নয়নগোচর হইল। হনুমান্ বৃক্ষ হইতে নামিয়া সেই গৃহে উপনীত হইয়া দেখিলেন তাহার অভ্যন্তর পরিপাটিরূপে সজ্জিত। ভূমিতে কোমল তৃণরাশির উপর মসৃণ মৃগচর্মের আস্তরণ, এক কোণে স্তূপীকৃত সুপক্ক আম্র-পনস-রম্ভাদি ফল, অন্য কোণে চন্দনকাষ্ঠের মঞ্চের উপর রাজোচিত বসন উত্তরীয় উষ্ণীষ প্রভৃতি পরিচ্ছদ এবং বিবিধ প্রসাধনদ্রব্য, প্রাচীরগাত্রে লম্বিত একটি সুরম্য পরিবাদিনী বীণা।

হনুমান্ সমস্ত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন, অহো, নিশ্চয়ই স্বর্গস্থ পিতৃগণ আমার প্রতি স্নেহবশে এই উপহারসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রীতির নিমিত্ত আমি এখনই এই পরিচ্ছদ ধারণ করিব এবং রাত্রি-কালে এই উপাদেয় ভোজ্যসকল আহার করিব।

এই বলিয়া হনুমান্ সেই বিচিত্র বসন-উত্তরীয়াদি পরিধান করিলেন এবং মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া অতিশয় শোভমান হইলেন। তাহার পর শয্যায় উপবেশন করিয়া ভাবিলেন, এখনও বেলা অবসান হয় নাই, ভোজনের বিলম্ব আছে, ততক্ষণ আমি এই বীণা বাজাইয়া দেখি।

মহাবীর সাবধানে বীণাটি পাড়িলেন, কিন্তু বাদ্যের উপক্রম করিতেই তাঁহার প্রবল অঙ্গুলিস্পর্শে সমস্ত তার ছিঁড়িয়া গেল। হনুমান্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর যন্ত্র মাদৃশ বীরের অস্পৃশ্য। তখন তিনি মৃগচর্মে শয়ান হইয়া ভাবী ভার্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্তা কেমন হইবে? তন্বী না স্থূলা, পিঙ্গলবর্ণা না রক্তকপিশপ্রভা,

ধীরা না চপলা, কলকণ্ঠী না কর্কশনাদিনী? ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার চিত্তে নির্বেদ উপস্থিত হইল। হনুমান্ স্বগত কহিতে লাগিলেন, অহোবত আমি একি ঘোর কর্মে সমুদ্যত হইয়াছি! আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছি, লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি। সাগরে অম্বরে পর্বতে অরণ্যে আমার অজ্ঞাত কিছু নাই। আমি সমরে অভিজ্ঞ, সংকটে ধীর, দেবচরিত্র কাকচরিত্র আমার নখদর্পণে। কিন্তু স্ত্রীজাতির রহস্য আমি কী-ই বা জানি! এই অদ্ভুত প্রাণীর গুম্ফ নাই শ্মশ্রু নাই বল নাই বুদ্ধি নাই। অথচ দেখো ইহারা শিশুকে স্তন্যদান করে কিন্তু আমরা তাহা পারি না। ইহারা অকারণে হাস্য করে, অকারণে ক্রন্দন করে, তুচ্ছ মুক্তা প্রবাল ইহাদের প্রিয়, সন্তানপালন ও নিরর্থক বস্তুসংগ্রহই একমাত্র কার্য। ঈদৃশী কোমলাঙ্গী মসৃণবদনী পয়স্বিনী শিশুপালিনী ভার্যার সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব? যদি সে আমার প্রিয়কার্য করে তবে কি মস্তকে উত্তোলন করিয়া সমাদর করিব? যদি অবাধ্য হয় তবে কি চপেটাঘাতে বিনীত করিব? বানর ধর্মশাস্ত্রে এবংবিধ শাসনের বিধান আছে বটে, কিন্তু মানবশাস্ত্র কি বলে?

হনুমান্ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সেই পর্ণগৃহের দ্বারদেশে এক সুদর্শন যুবাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বেশভূষা বহুমূল্য, স্কন্ধ হইতে শরাসন লম্বিত, পৃষ্ঠে তূণীর, এক হস্তে বাণবিদ্ধ দশটি তিত্তির পক্ষী, অন্য হস্তে একটি সদ্য আহৃত বৃহৎ মধুচক্র।

আগন্তুক হনুমান্‌কে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন, ওরে বানরাধম, তুই কোন্ সাহসে আমার রাজবেশ আত্মসাৎ করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া আছিস? দাঁড়া, এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাইতেছি।

হনুমান্ কহিলেন, ওহে বীরপুংগব, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। হঠকারিতা মূর্খের লক্ষণ, ধীর ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য করেন। আমি রামদাস হনুমান্, লোকে আমাকে মহাবীর বলে। ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

তখন আগন্তুক সসম্ভ্রমে ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া কহিলেন, অহো, আজ আমার কী সৌভাগ্য যে শ্রীহনুমানের দর্শন লাভ করিলাম! মহাবীর, তুমি অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করো। আমি তুম্বদেশের অধিপতি, নাম চঞ্চরীক। তোমার যোগ্য সৎকার করি এমন আয়োজন আমার এই অরণ্যকুটিরে নাই। যদি কোনোও দিন আমার রাজপুরীতে পদরেণু দাও তবেই আমার তৃপ্তি হইবে। হে অঞ্জনানন্দন, তুমি ঐ রমণীয় পরিচ্ছদ উষ্ণীষাদি খুলিয়া ফেলিতেছ কেন,

উহাতে তোমাকে সাক্ষাৎ কন্দর্পের ন্যায় দেখাইতেছে। আমি এই রজতময় দর্পণ ধরিতেছি একবার অবলোকন করো। তুমি অনুমতি দাও, আমি এই সুস্বাদু তিত্তির মাংস অগ্নিপক্ক করিয়া দিতেছি। তুমি বুঝি নিরামিষাশী? তবে ঐ আম্র-পনস-রম্ভাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করো। হে মারুতি, তুমি বিমুখ হইও না, একবার মুখব্যাদান করো, আমি এই মধুচক্র তোমার বদনে নিংড়াইয়া দিই। তুমি বোধহয় সঙ্গীত-চর্চা করিতেছিলে, তাই আমার বীণাটির এমন দশা হইয়াছে। হে মহাবীর, তুমি বুঝি কার্মুক ভাবিয়া উহাতে টংকার দিয়াছিলে?

হনুমান্ কহিলেন, চঞ্চরীক, তোমার অভ্যর্থনায় আমি প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তুমি অধিক বাচালতা করিও না, আমার এই বজ্রমুষ্টি দেখিয়া রাখো, ইহা হঠাৎ ধাবিত হয়। এই পরিচ্ছদে আমি অস্বস্তি বোধ করিতেছি, তুমিই ইহা পরিধান করিও। আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইও না, যথাকালে তাহা হইবে। তোমার বীণা কোনোও কর্মের নয়। দুঃখ করিও না, আমি উহাতে শণের রজ্জু লাগাইয়া দিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কিজন্য বিজন অরণ্যে এই কুটির নির্মাণ করিয়াছ? যদি নরপতি হও, তবে তোমার গজ বাজি অনুযাত্র সৈন্যদল দেখিতেছি না কেন? তোমার রথ সারথি কোথায়, বিদূষকই বা কোথায়?

চঞ্চরীক কহিলেন, হে বানরর্ষভ, আমি মনের দুঃখে একাকী অরণ্যবাস করিতেছি, এখন আমিই আমার রক্ষী, আমিই সারথি, আমিই বিদূষক। আমার কাহিনী অতি করুণ, শ্রবণ করো। আমার মহিষী পরম রূপবতী এবং অশেষ গুণশালিনী, কিন্তু তাঁহাকে ঠিক পতিব্রতা বলিতে পারি না। একদা আমি তাঁহার এক সুন্দরী সখীর সহিত কিঞ্চিৎ রসচর্চা করিতেছিলাম, দুরদৃষ্টক্রমে তিনি তাহা দেখিয়া ফেলেন। এই তুচ্ছ কারণে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ক্রোধাগারে বসতি করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে এই অরণ্যে বাস করিতেছি এবং পশুপক্ষী মারিয়া বিরহযন্ত্রণা লাঘব করিতেছি। হে পবননন্দন, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে একা ভার্যা অশেষ অনর্থের মূল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন—অল্পে সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ। শুনিয়াছি এই অরণ্যে মহাতপা লোমশ মুনি বাস করেন। নারীজাতিকে বশে রাখিবার উপায় তিনি সম্যক অবগত আছেন, কারণ তাঁহার একশত পত্নী। আমি স্থির করিয়াছি তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিব। আমার কথা সমস্ত বলিলাম, এখন তুমি

কিজন্য অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছ শুনিতে ইচ্ছা করি। রামচন্দ্র কি পূর্বোপকার বিস্মৃত হইয়া তোমার অনাদর করিয়াছেন?

হনুমান্ কহিলেন, সাবধান, তুমি রামনিন্দা করিও না। আমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাইতেছি, সেখানে দারপরিগ্রহ করিয়া বধূর সহিত অযোধ্যায় ফিরিব। তোমার উপর আমার প্রীতি জন্মিয়াছে, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলি। হে চঞ্চরীক, আমি স্ত্রীতত্ত্ব অবগত নহি, কেবল পিতৃ-ঋণ পরিশোধের নিমিত্তই এই দুরূহ সংকল্প করিয়াছি। তোমার দাম্পত্যকাহিনী শুনিয়া আমার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।

চঞ্চরীক হাস্য করিয়া কহিলেন, হে হনুমন, ভয় নাই। তুমি যখন গন্ধমাদন বহন করিয়াছ তখন ভার্যার ভারও বহিতে পারিবে। আমি তোমাকে সমস্তই শিখাইয়া দিব। সম্প্রতি কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিতেছি শ্রবণ করো। পুত্রার্থে ভার্যা করা অতি সহজ কর্ম, কিন্তু যদি প্রেমের জন্য ভার্যা করিতে হয় তবে স্ত্রী চরিত্রে অভিজ্ঞতা আবশ্যক। নিজ স্ত্রী সলজ্জা হইবে এবং পরস্ত্রী নির্লজ্জা হইবে ইহাই রসজ্ঞজনের কাম্য। তোমার রামরাজ্যের কথা অবগত নহি, কিন্তু সংসারে এই শুভসমন্বয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। অতএব—

হনুমান্ কহিলেন, ওহে চঞ্চরীক, তুমি ক্ষান্ত হও। অগ্রে নিজ সমস্যার সমাধান করো তাহার পর আমাকে উপদেশ দিও। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন ভোজনের আয়োজন করিতে পারো। কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দাও, বনভূমির শীতবায়ু আর আমার তেমন সহ্য হয় না।

চঞ্চরীক অর্গল বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ভোজনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সহসা দ্বারে করাঘাত করিয়া কে বলিল, ভো গৃহস্থ, অর্গল মোচন করো, আমি শীতার্ত ক্ষুধার্ত অতিথি।

চঞ্চরীক দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে এক শীর্ণকায় তপস্বী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তক জটামণ্ডিত, শ্মশ্রু আজানুলম্বিত, দেহ লোমে সমাকীর্ণ।

চঞ্চরীক প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন, আপনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছি যে আপনি স্বনামধন্য লোমশ ঋষি। আপনার দর্শনলাভের জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়াছিলাম, আপনি বোধহয় যোগবলে জানিতে পারিয়া কৃপাবশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তুম্বরাজ চঞ্চরীক, আর ইনি আমার পরমবন্ধু জগদ্‌বিখ্যাত মহাবীর হনুমান্। এই কপিপ্রবর দারপরিগ্রহের নিমিত্ত কিষ্কিন্ধ্যায়

যাইতেছেন, কিন্তু সহসা ইঁহার চিত্ত সংশয়াকুল হইয়াছে। আমার অবস্থাও ভালো নয়। আমার একটি ভার্যা আছেন বটে, কিন্তু আমি বৈচিত্র্যের পিপাসু, ভূমার আস্বাদ লইতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, শুনিয়াছি দাম্পত্যতত্ত্বে আপনার জ্ঞানের পরিসীমা নাই। আপনার জন্য এই পক্ষিমাংস শূল্যপক্ক করিয়া দিতেছি, আপনি ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সৎপরামর্শ দিন।

ইত্যবসরে মহর্ষি লোমশ একটি অতিকায় পনস ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তাহার সুপক্ক কোষ সকল ক্ষিপ্রহস্তে বদনে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এখন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, পবননন্দন চিরজীবী হও, তুম্বরাজ তোমার জয় হউক। এখন আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছি। অষ্টাহকাল আমার আহার নিদ্রা নাই, আমি গৃহচ্যুত, কৌপীনমাত্র সম্বল।

শরাসনে ঝটিতি জ্যারোপণ করিয়া চঞ্চরীক কহিলেন, প্রভো, কোন্ দুরাচার রাক্ষস আপনার আশ্রম লুণ্ঠন করিয়াছে? অনুমতি দিন, এই দণ্ডে তাহাকে বধ করিব। আহা, আপনার সকল পত্নীই কি অপহৃতা হইয়াছেন? মহাবীর, অবাক্ হইয়া ভাবিতেছ কি? গাত্রোত্থান করো, আবার তোমাকে সাগরলঙ্ঘন করিতে হইবে। বিভীষণকে ছাড়িয়া দিয়া ভালো করো নাই।

লোমশ কহিলেন, তোমরা ব্যস্ত হইও না, আমার ইতিহাস শ্রবণ করো। পূর্বে এই দক্ষিণাপথে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রতিকারকল্পে শতজন নরপতি আমার শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের রাজ্যের হিতার্থে আমি এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা সুবৃষ্টি আনয়ন করি। কৃতজ্ঞ নরপতিগণ দক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহাদের শতকন্যা আমাকে সম্প্রদান করেন এবং ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থাও করেন। আমি এই রাজনন্দিনীগণের বাসের নিমিত্ত আমার তপোবনে এক শত গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছি।

চঞ্চরীক জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর আপনার তপোবনে ক্রোধাগার আছে তো?

লোমশ কহিলেন, প্রত্যেক গৃহই ক্রোধাগার। হতভাগিনীগণ নিরন্তর কলহ করে, তাহাদের গৃহকর্ম নাই, পতিসেবা নাই, ব্রতপূজা নাই। আমি আদর করিয়া তাহাদের প্রথমা দ্বিতীয়া ইত্যাদিক্রমে নবনবতিতমা শততমা পর্যন্ত নাম রাখিয়াছি, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে মূষিকা চর্মচটিকা পেচকী ছুছুন্দরী প্রভৃতি ইতর নামে সম্বোধন করে এবং আমাকে ভল্লুক বলে। আমি উত্ত্যক্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছি। এখন সেই ব্যাপিকাগণ যত ইচ্ছা কলহ করুক। হে রাজন্, তুমি কি ভূমার আস্বাদ চাও? তবে আমার আশ্রমে যাও। শ্রীহনুমান্ও

তথায় পত্নীনির্বাচন করিতে পারিবেন। আমি আর সেখানে ফিরিতেছি না। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি শান্তি চাই এবং আর একটি বিবাহ করিয়া এক পত্নীর যে সুখ তাহাই উপলব্ধি করিতে চাই।

লোমশ মুনির বচন শুনিয়া হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, হে তপোধন, প্রণিপাত করি, হে চঞ্চরীক, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। এখন বিদায় দাও, আমি সুগ্রীবের নিকট চলিলাম।

চঞ্চরীক ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, সে কি! এই গভীর রজনীতে অরণ্যপথে কোথায় যাইবে? অন্তত প্রভাত পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম করো।

হনুমান্ কর্ণপাত করিলেন না।

কিষ্কিন্ধ্যার এক সুরম্য উপবনে নল নীল গয় গবাক্ষ প্রভৃতি মিত্রগণের সহিত বসিয়া বানররাজ সুগ্রীব নারিকেল ভক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

সুগ্রীব রাজোচিত গাম্ভীর্য সহকারে কহিলেন, মহাবীর, কি মনে করিয়া? আমি এখন রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, অবসর নাই, অন্যকালে তোমার বক্তব্য শুনিব।

হনুমান্ কহিলেন, হে বানরাধিপ, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।

সুগ্রীব কহিলেন, কিষ্কিন্ধ্যায় তোমার সুবিধা হইবে না। তোমার অরণ্যসম্পত্তি যাহা ছিল সমস্তই অঙ্গদ বাবাজী দখল করিয়াছেন, ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। আমারও এখন অত্যন্ত অভাব চলিতেছে, তোমাকে কিছু দিতে পারিব না। অযোধ্যা ছাড়িলে কেন? ফিরিয়া গিয়া তোমার প্রভু রামচন্দ্রকে নিজ প্রার্থনা জানাও, তিনি অবশ্যই একটা বিহিত করিবেন। রাঘব তো মন্দ লোক নহেন।

হনুমান্ কহিলেন, ওহে সুগ্রীব, তোমার চিন্তা নাই। আমি পূর্বসম্পত্তি চাহি না, তোমার রাজ্যের ভাগও চাহি না, প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনোও অভাব নাই। আমি বিবাহ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এই অনভ্যস্ত ব্যাপারে আমি সংশয়াম্বিত হইয়াছি, তুমি সৎপরামর্শ দাও।

সুগ্রীব তখন প্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুহৃদবর, তোমার সংকল্প অতিশয় সাধু।

এতক্ষণ বাজে কথা বলিতেছিলে কেন? ঐ সুকোমল বৃক্ষশাখায় উপবেশন করো, কিঞ্চিৎ নারিকেলোদক পান করিয়া স্নিগ্ধ হও। হে ভ্রাতঃ, আমি সর্বদাই তোমার হিতকামনা করিয়া থাকি। কেবলই ভাবি, আহা আমাদের হনুমান্ এখনও সংসারী হইল না! তুমি বিবাহের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা অতি সহজ কর্ম। দেখ, আমি অষ্টোত্তর-সহস্র ভার্যায় পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেছি।

হনুমান্ কহিলেন, তুমি এই পত্নীপুঞ্জ শাসনে রাখো কি করিয়া? তাহারা কলহ করে না? তোমাকে বাক্যবাণে প্রপীড়িত করে না?

সুগ্রীব সহাস্যে কহিলেন, সাধ্য কি। আমি কদলী-বল্কল দ্বারা তাহাদের ওষ্ঠাধর বাঁধিয়া রাখি, কেবল প্রেমালাপকালে খুলিয়া দিই। যাহা হউক, তোমার ভয় নাই, আপাতত তুমি একটিমাত্র পত্নী গ্রহণ করো, পরে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি করিও। আমি বলি কি—তুমি অন্যত্র চেষ্টা না করিয়া শ্রীমতী তারাকে বিবাহ করো, আমার আর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই। তিনি প্রবীণা এবং পতি-সেবায় পরিপক্কা। তাঁহাকে লাভ করিয়া তুমি নিশ্চয় সুখী হইবে।

হনুমান্ কহিলেন, তুমি তারাদেবীর নাম করিও না, তিনি আমার নমস্যা।

সুগ্রীব কহিলেন, বটে! অযোধ্যায় থাকিয়া তোমার মতিগতি বিগ্‌ড়াইয়াছে দেখিতেছি। আচ্ছা, তুমি আর এক চেষ্টা করিতে পারো। এই কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণে কিচ্চট দেশ আছে। তাহার অধিপতি প্লবংগম অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরগমন করিয়াছেন, এখন তাঁহার দুহিতা চিলিম্পা রাজ্যশাসন করিতেছে। এই বানরী অতিশয় লাবণ্যবতী, বিদুষী ও চতুরা। আমি বিবাহের প্রস্তাবসহ দূত পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু লাঙ্গুল কর্তন করিয়া চিলিম্পা তাহাকে বিদায় দিয়াছে। নল নীল গয় গবাক্ষ ইঁহারাও প্রেমনিবেদন করিতে তাহার কাছে একে একে গিয়াছিলেন কিন্তু সকলেই ছিন্নলাঙ্গুল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই দুর্বিনীতা বানরীর উপর আমার লোভ ও আক্রোশ উভয়ই আছে, কিন্তু আমার অবসর নাই, নতুবা স্বয়ং অভিযান করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতাম। এখন তুমি যদি তাহাকে জয় করো তবে আমার ক্ষোভ দূর হইবে, তোমারও পত্নীলাভ হইবে।

হনুমান্ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাহাই হউক। আমি এখনই কিচ্চট দেশে যাত্রা করিতেছি।

হনুমান্ কিচ্চটরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া প্রজাগণ সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল এবং চিলিম্পাকে সংবাদ দিল, হে রাজনন্দিনি, আর রক্ষা নাই, এক পর্বতাকার বীর বানর তোমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে।

চিলিম্পা কহিলেন, ভয় নাই, অমন অনেক বীর দেখিয়াছি। তাহাকে ডাকিয়া আনো।

হনুমান্ এক মনোরম কুঞ্জবনে আনীত হইলেন। চিলিম্পা তথায় সখীগণ পরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার কর্ণে রক্তপ্রবাল, কণ্ঠে কপর্দমালা, হস্তে লীলাকদলী। হনুমান্ মুগ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো সুগ্রীব যথার্থই বলিয়াছেন। এই তরুণী বানরী পরমা সুন্দরী, ইহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সংশয় দূর হইল। ইহাকে যদি লাভ করিতে না পারি তবে জীবনই বৃথা। ঈষৎ হাস্যে কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া চিলিম্পা কহিলেন, হে বীরবর, তুমি কি-হেতু বিনা অনুমতিতে আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, কি চাও, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলো, আমি তোমাকে অভয় দিলাম।

হনুমান্ উত্তর দিলেন, হে প্লবংগম-নন্দিনি, আমি রামদাস হনুমান্, অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি, তোমার পাণিগ্রহণ করিয়া আবার অযোধ্যায় ফিরিতে চাই। আমিও তোমাকে অভয় দিতেছি।

হনুমানের বাক্য শুনিয়া সখীগণ কিল্‌কিলা রবে হাসিয়া উঠিল। চিলিম্পা কহিলেন, হনুমান, তোমার ধৃষ্টতা তো কম নয়! তোমার কী এমন গুণ আছে যাহার জন্য আমার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইয়াছ।

হনুমান্ কহিলেন, আমি সেই রামচন্দ্রের সেবক, যিনি পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে যান, যিনি রাবণকে সবংশে নিধন করিয়াছেন, যিনি দূর্বাদলশ্যামল পদ্ম-পলাশলোচন, যিনি সর্বগুণান্বিত লোকত্তরচরিত।

চিলিম্পা কহিলেন, হে রামদাস, তুমি কি রামচন্দ্রের সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ?

হনুমান্ জিহ্বা দংশন করিয়া কহিলেন, আমার প্রভু একদারনিষ্ঠ। জনকতনয়া সীতা তাঁহার ভার্যা, তিনি মূর্তিমতী কমলা, যাঁহার তুলনা ত্রিজগতে নাই। আমি নিজের জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি।

চিলিম্পা কহিলেন, তবে নিজের কথাই বলো।

হনুমান্ কহিলেন, নিজের কীর্তি নিজে বলা ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়াছি শত্রু ও প্রিয়ার নিকট আত্মগৌরবকথনে দোষ নাই। অতএব

বলিতেছি শ্রবণ করো। আমি সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, গন্ধমাদন উৎপাটিত করিয়াছি, ভগবান ভানুকে কক্ষপুটে রুদ্ধ করিয়াছি, এই দেখো স্ফোটকের চিহ্ন। আমি শতলক্ষ রাক্ষস বধ করিয়াছি, রাবণের মস্তকে চপেটাঘাত করিয়াছি, তাহার রথচূড়া চর্বণ করিয়াছি, এই দেখো একটি দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে।

চিলিম্পা কহিলেন, হে মহাবীর, তোমার বচন শুনিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল বীরত্ব চাহে না। তোমার কান্তগুণ কি কি আছে? তুমি নৃত্যগীত জানো? কাব্য রচিতে পারো?

হনুমান্ কহিলেন, অয়ি চিলিম্পে, রাবণবধের পর আমি অধীর হইয়া একবার নৃত্যগীতের উপক্রম করিয়াছিলাম, কিন্তু নল নীল প্রভৃতি বানরগণ আমাকে উপহাস করে, তাহাতে আমি নিরস্ত হই। সুমিত্রানন্দন তখন আমাকে বলেন—মারুতি, তুমি ক্ষুব্ধ হইও না। তুমি যাহা করো তাহাই নৃত্য, যাহা বলো তাহাই গীত, যাহা না বলো তাহাই কাব্য, ইতরজনের বুঝিবার শক্তি নাই।

চিলিম্পা তাঁহার করধৃত কদলীগুচ্ছ লীলাসহকারে দংশন করিতে করিতে কহিলেন, হে পবননন্দন, তুমি প্রেমতত্ত্বের কতদূর জানো? তুমি কোন্ জাতীয় নায়ক? ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত প্রশান্ত না ললিত? তুমি কি করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিবে, কি করিয়া আমার মানভঞ্জন করিবে? আমি যদি গজমুক্তার হার কামনা করি তবে তুমি কোথায় পাইবে? যদি রাগ করিয়া আহার না করি তবে কি করিবে?

হনুমান্ ভাবিলেন, এই বিদগ্ধা বানরী এইবার আমাকে সংকটে ফেলিল, ইহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যাহা হউক, আমি অপ্রতিভ হইব না—হে সুন্দরি, তোমাকে দেখিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বের ইহাই আমার প্রথম জ্ঞান। তুমি চিন্তা করিও না, কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব আমার অগ্রজতুল্য, তিনি আমাকে সমস্ত শিখাইয়া দিবেন। ভৃঙ্গরাজ চঞ্চরীক আমার বন্ধু, তিনিও আমাকে জ্ঞানদান করিবেন। তুমি যদি মুক্তাহার কামনা করো তবে জানকীর নিকট চাহিয়া লইব, যদি আহার না করো তবে এই লৌহকঠোর অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে খাওয়াইব। হে প্রিয়ে, আর বিলম্ব করিও না আমার সহিত চলো। সীতা তোমার হনুমতী নাম দিয়াছেন, তিনি তোমাকে বরণ করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রতীক্ষা করিতেছেন।

চিলিম্পা তখন হনুমানের চিবুকে তর্জনীর মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর স্বরে

কহিলেন, ওরে বর্বর, ওরে অবোধ, ওরে বৃদ্ধবালক, তুমি প্রেমের কিছুই জানো না। যাও, কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দাও।
হনুমান্ আকুল হইয়া কহিলেন, অয়ি নিষ্ঠুরে, আমাকে আশা দিয়া নিরাশ করিতেছ কেন? আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এই বলিয়া তিনি চিলিম্পাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিলেন।
চিলিম্পা করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিলেন। সহসা বনান্তরাল হইতে কালান্তক যমের ন্যায় দুই মহাকায় নরকপি নিঃশব্দে আসিয়া হনুমান্‌কে অতর্কিতে পাশবদ্ধ করিল। চিলিম্পা কহিলেন, হে অরঙ্গ-অটঙ্গ, এই মর্কটের বড়োই স্পর্ধা হইয়াছে, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ ছাঁটিয়া দিয়া ইহাকে বিতাড়িত করো। তখন প্রত্যুৎপন্নমতি হনুমান্ প্রভঞ্জনকে স্মরণ করিলেন। নিমেষে তাঁহার দেহ হিমাদ্রিতুল্য হইল, পাশ শতচ্ছিন্ন হইল, প্রচণ্ড পদাঘাতে নরকপিদ্বয় সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল প্রকম্পিত করিয়া মহাবীর উপ্ উপ্ রবে তিন বার সিংহনাদ করিলেন, তাহার পর চিলিম্পার কেশ গ্রহণ পূর্বক জয় রাম বলিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ দিলেন।

ঝঞ্ঝাবাহিত মেঘের ন্যায় হনুমান্ শূন্যমার্গে ধাবিত হইতেছেন। আকাশ-বিহারী সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরগণ বলিতে লাগিল, হে পবনাত্মজ, এতদিনে তোমার কৌমারদশা ঘুচিল, আশীর্বাদ করি সুখী হও। দিগ্‌বধূগণ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, হে অঞ্জনানন্দন, মুহূর্তের তরে গতি সংবরণ করো, আমরা নববধূর মুখ দেখিব। হনুমান্ হুংকার করিলেন, গগনচারিগণ ভয়ে মেঘান্তরালে পলায়ন করিল, দিগ্‌বধূগণ দিগ্‌বিদিকে বিলীন হইল।
চিলিম্পা কাতর কণ্ঠে কহিলেন, হে মহাবীর, আমার কেশ ছাড়িয়া দাও বড়োই লাগিতেছে। বরং আমাকে পৃষ্ঠে লও, নতুবা বক্ষে ধারণ করো।
হনুমান্ বলিলেন, চোপ্!
চিলিম্পা বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ, আমি একান্ত তোমারই। হে অরসিক, তুমি কি পরিহাস বুঝিতে পারো নাই? আমি যে তোমা-বই আর কাহাকেও জানি না।
হনুমান্ পুনরপি বলিলেন, চোপ্!

নিম্নে কিষ্কিন্ধ্যা দেখা যাইতেছে। সুগ্রীব স্বল্পতোয়া তুঙ্গভদ্রার গর্ভে অষ্টাধিক-

সহস্র পত্নীসহ জলকেলি করিতেছেন। হনুমান্ মুষ্টি উন্মুক্ত করিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বানরী ঘুরিতে ঘুরিতে সুগ্রীবের স্কন্ধে নিপতিত হইল।
ভারমুক্ত হইয়া হনুমান্ দ্বিগুণ বেগে ধাবিত হইলেন। পঞ্চবটী—জনস্থান—চিত্রকূট—শৃঙ্গবের—প্রয়াগ—অবশেষে অযোধ্যা।

সীতা সবিস্ময়ে বলিলেন, একি বৎস! সংবাদ দাও নাই কেন? আমি নগরী সুসজ্জিত করিতাম, বাদ্যভাণ্ড প্রস্তুত রাখিতাম। হনুমতী কই?
হনুমান্ অবনত মস্তকে বলিলেন, মাতঃ, হনুমতীকে পাই নাই। আমি এক সামান্যা বানরী হরণ করিয়া সুগ্রীবকে দান করিয়াছি। হে দেবি, বিধাতা আমার এই বিশাল বক্ষে যে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াছেন তাহা তুমি ও রামচন্দ্র পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, দারাপুত্রের স্থান নাই।
সীতা বলিলেন, বৎস, পিতৃঋণ শোধের কি করিলে?
হনুমান্ মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিলেন, অহো পাষণ্ড! আমি সেকথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। জননি, তুমি এই বর দাও যেন অমর হইয়া চিরকাল পিতৃগণের পিণ্ডোদক বিধান করিতে পারি।
সীতা বলিলেন, বৎস তাহাই হউক।
তখন হনুমান্ পরিতুষ্ট হইয়া বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া ভুজদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, জয় সীতারাম!

অনুরূপা দেবী (১৮৮১-১৯৫৮) ॥ মিলন

০০ এক ০০

সুধার বিবাহ হইয়াছিল এই পর্যন্ত বলিতে গেলে। সে তার স্বামীকে চোখেই দেখে নাই। সেই যা বিবাহের দিন ও ফুলশয্যার রাত্রে আধো-অন্ধকারের মধ্যে সাক্ষাৎ ও অতি সংক্ষিপ্ত আলাপ।

সুধা কুলীন কন্যা নয় এবং গরিবের ঘরের মেয়েও নয়, তবু যে কেন তার এই সপ্তদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহাকে স্বামীদর্শনে বঞ্চিতা থাকিতে হইয়াছিল, তার জীবনের সেই বিড়ম্বনা সম্বন্ধে একটু পূর্বাভাষ দেওয়া আবশ্যক।

বিবাহের অল্পদিন পরেই সুধার পিতামহের সহিত তাহার শ্বশুরের পিতার একটা সামান্য বিষয় লইয়া মনোবাদ আরম্ভ হইয়া শাখায় পল্লবে সেটা ক্রমেই বেশ একটুখানি বিস্তৃত হইয়া উঠে। সেই সময় সুধার শ্বশুর বলিয়া পাঠান,— 'আজই আমার বউ পাঠিয়ে দাও, অমন বাড়ির সঙ্গে আমি সম্পর্ক রাখতে চাইনে,—বউও রাখবো না।'

সুধার পিতামহ ইহার বেশ সদুত্তর দিয়া ফিরাইয়া দিলে, উত্তর আসিল, 'যদি এক সপ্তাহ মধ্যে বুড়ো নিজে এসে পায়ে ধরে মেয়ে পৌঁছে ক্ষমা চেয়ে যায় তো যাক,—না হলে ফের আমি ছেলের বিয়ে দেবো। আমি হরনাথ ঘোষ, আমার ছেলের পায়ে মেয়ে দিয়ে ওর চৌদ্দপুরুষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে,—জানে না! আমায় এত বড়ো অপমান!'

কিন্তু বৃদ্ধ উমাপদ মিত্রও বড়ো কম জেদী লোক তো নন। তিনি সকলকার সভয় মিনতি উপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন—'যদি কখনো নিজে যেচে এসে পুত্রবধ্ নিয়ে যান তো তাঁর নাতনি সে ঘরে ঘর করতে যাবে, নইলে তিনিও মেয়ে পাঠাবেন না। ঘোষ বংশে আছে কি! তিনি না অমুক মিত্তিরের বংশধর!'

শুনিয়া পাড়ার লোকে ছি-ছি করিতে লাগিল, পুত্র সভয়ে অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'বাবা, এটা কি ভালো হল? মেয়েটা যে জন্মের মতো রয়ে যায়।'
বৃদ্ধ শুধু ভ্রূকুটি করিলেন, উত্তর করিলেন না।
এরপর একদিন লাল কাগজে সোনালী অক্ষরে ছাপা এক নিমন্ত্রণ পত্রে এই খবরটি জানা গেল,—'আগামী ২৭শে আষাঢ় রবিবার আমার পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্রের দশঘরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রামহরি বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। মহাশয়েরা সবান্ধবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।
সুধার মা এই সংবাদ পাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা আর একবার তস্য পিতার নিকট অনুনয় করিতে গিয়া দ্বিগুণ হতাশা লইয়া ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিলেন। সুধা কিছু ভালো করিয়া না বুঝিলেও—তার পক্ষে যে একটা কিছু মারাত্মক কাণ্ড ঘটিতেছে ইহা বুঝিয়া মুখটি ম্লান করিয়া রহিল। আপনার জেদে অটল থাকিয়া জেদী বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তার উকিল ডাকাইয়া এক উইল প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে আর সব কথার সঙ্গে এই কথাটা বাড়তি রহিল, —'তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শ্রীমতী সুধাময়ী নগদ ২৫০০০৲ টাকা পাইবে।' যদি তার স্বামী তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য দার পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে এই পিতামহদত্ত টাকায় সুধার স্বামীর কোনোই স্বত্বাধিকার জন্মিবে না। যদি তার স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পর আবার কখনো তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহে এবং সুধা সপত্নীর—স্বামী গ্রহণে সম্মতা হয়, তাহা হইলে তারও এই পিতামহদত্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব বাতিল হইয়া যাইবে।
এর অর্থ, হরনাথ ঘোষ বোধহয় বধূর এই মোটা টাকাটা ত্যাগ করিবেন না। তাঁর এদিকে যে বিলক্ষণ লোভ আছে, তাহা এই সম্প্রতি তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ উমাপদ মিত্রের তো আর অজ্ঞাত ছিল না। কথাটা যথেষ্ট চাউর করিয়া দিলেন।
যাহা হউক, তাঁর জাল পাতিবার উদ্দেশ্যটা আর একদিক দিয়া কিন্তু সফল হইয়া গেল। জামাতা সুধীরচন্দ্র এই নূতন বিবাহটার দিন কয়েক মাত্র পূর্বে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। প্রথমটা এই কাণ্ডে উমাপদর হাত আছে সন্দেহে হরনাথ তাঁর 'পরেই অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প পরেই জানা গেল যে, তা নয়—তিনি তখন পি এণ্ড কোং'র 'অ্যাপোলো' নামক জাহাজে আরব সমুদ্র পার হইতেছেন। তাঁর বি-এ পাসের ৪০৲ টাকা বৃত্তি

জমানোর ও বিবাহের দাদাশ্বশুর-দত্ত বহুমূল্য ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, আশীর্বাদী ও মন্ত্রদানের মোহর দক্ষিণাদি, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রদত্ত গিনি মোহর প্রভৃতি যা কিছু সমস্ত বিক্রয় করিয়া যাহা পাইয়াছেন,—তাহা লইয়াই আত্মরক্ষার্থে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। পত্রের শেষে লেখা ছিল, 'দাদু, আপনার অবাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তবু আমি নিশ্চিত জানি আপনার অগাধ স্নেহ আমার এ অপরাধকে ক্ষমা করিতে অসমর্থ হইবে না। এযুগে দু-দুটো বউ পোষার মতো বুকে বল নাই।'

০০ দুই ০০

ইহার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুধীরচন্দ্র এখন সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ইওরোপ হইতে এক বৎসর হইল ভারতে আসিয়াও সুধীর কিন্তু এ পর্যন্ত দেশ বলিতে যা বোঝায় অর্থাৎ স্বগ্রামে পদার্পণ করে নাই। বোম্বাইয়ে সে চাকরি পাইয়াছিল, আসিয়া অবধি সেই-খানেই আছে। বিলাত ফেরত সে, হঠাৎ বাড়ি আসিলে যদি গ্রামে কোনোরূপ বিপ্লব দেখা দেয়,—ভয় সেইখানে। বাড়ির লোকের ক্ষমা করিতে অবশ্য বিলম্ব ঘটে নাই। বাপ মা আসিয়া দেখা করিয়াও গিয়াছেন, শ্বশুরও একবার পূজার বন্ধে দেশ-ভ্রমণের ছলে জামাতার হালচাল বুঝিতে ও দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সুধারই ভাগ্যে এ পর্যন্ত স্বামীসন্দর্শন ঘটিয়া উঠিল না। তার দাদাশ্বশুর হরনাথ ঘোষ ও পিতামহ উমাপদ মিত্র উভয়েই এখন পরস্পরের হার মানার প্রতীক্ষা করিয়া অনর্থক এই বিলম্ব ঘটাইতেছেন। দুজনেই ভাবিতেছিলেন—একবার মুখ ফুটিয়া বলিলে হয়। কিন্তু জেদী দুজনেই সমান। কে প্রথম ঘাট মানিয়া নিচু হইতে যাইবে?

শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীরের পিতা সুধীরকে প্রথমে দেশে আনাই স্থির করিলেন। বিধান ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিবার সব উদ্যোগও হইল। পিতৃ-পিতামহের জলপিণ্ড নহিলে যে লোপ পায়। সুধীরও ইহাতে অমত করিল না। সে আসিয়া যথা কার্য শেষ করিয়া একদিন মাত্র থাকিয়া 'ছুটি নাই' বলিয়া কর্মস্থলে মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। সে-ও সেই জেদী পিতামহের পৌত্র—তিনি না বলিলে আর দাদাশ্বশুর না ডাকিলে, সেই বা কেন যাচিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইবে? বেচারী সুধারই শুধু কোনোরকমেরই মানাভিমানের জেদ ছিল না—সেই শুধু লজ্জার দায়ে পড়িয়া মাঝ হইতে এই কষ্টটা পাইতেছিল। আর তার বাপ-মার কষ্ট তো তার চেয়েও অধিকতর।

যদিও তাঁরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া দিন কাটাইতেছিলেন বটে, কিন্তু জামাতার ধরন-ধারণে তাঁদের মনে ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট আশাও সঞ্চিত হইতেছিল। বিলাতের পরশমণি যে এই বঙ্গ যুবককে পিতল হইতে সোনায় পরিণত করিতে পারে নাই, তাহা তিনি স্বয়ং তার বাসায় গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এমনই ভাবে দিন চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন সুধার একঘেয়ে জীবন-নদীতে একটা ছোটরকম বন্যা আসিল। একদিন প্রভাতে সে একখানি সাদা-সিধা চৌকা খাম ছিঁড়িয়া চোখ মুখ লাল করিয়া এক গা ঘামিয়া এই পত্রখানি পাঠ করিল—

সুধা!

তুমি আমায় চেনো না, তবু এইটুকু আশা করে লিখছি যে হয়তো আমায় তুমি একেবারে ভুলে যাওনি। যদি জিজ্ঞাসা করো হঠাৎ আজ কেন এতদিন পরে এ চিঠি লিখছি? তার উত্তর দিতে হয়তো বা আমি পেরে উঠব না। কেননা নিজেই তা তো দেখছি বুঝে উঠতে পারছিনে! আজ এই চিঠিটুকু লেখবার বড়োই লোভ হল, তাই একটু লিখে ফেললুম। এর জন্যে কি বাড়ির লোকেরা আরও বেশি করে রাগ করবেন?—সুধীর

সুধার বিবাহের দিন ধরিয়া পাঁচ বৎসর তিন মাস সাতদিন পরে এই সুধার প্রথম প্রেমপত্র লাভ! সুধা এখন তো বড়োটি হইয়াছিল, তার নিজের সঙ্গীন অবস্থা বুঝিবার সময়ও তার যথেষ্ট হইয়াছে। সে জোর করিয়া লজ্জা অভিমান ত্যাগ করিয়া কাহারও মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই লিখিল, "এতদিন পরে অভাগিনী সুধাকে তবে আবার মনে পড়িয়াছে? যদি মনে পড়িয়াছেই তবে দয়া করে এখন থেকে মনে রেখো, আর যেন ভুলো না যে আমি তোমার চির-দুঃখিনী স্ত্রী।"

চিঠি পাঠাইয়া দিয়া সুধা বুঝিল এ চিঠির ধরনটা যেন বেশ একটুখানি নভেলি ধাঁচের হইল! কিন্তু তখন আর সে কি করিতে পারে? চিঠি তো এখন ডাক বাক্সের দিকে রওনা হইয়াই গিয়াছে। যা হয় হোক, এই ভাবিয়া সে লজ্জা ভুলিবার চেষ্টায় অধিকতর লজ্জিত হইয়া রহিল।

ইহার পরে উভয়েরই দু-তিনখানা পত্র বিনিময় হইয়াছিল। শেষ পত্রে সুধা জানিল তার স্বামীর শরীর সুস্থ নাই, তিনি কিছু দিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। হয়তো দার্জিলিং নয় তো শিমলা পাহাড় এমনি একটা কোথাও চেঞ্জে যাইবেন। সঙ্গে থাকিবেন তাঁর বাবা।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা ভাবিল, "তবু বলতে পারেননি—তোমার কাছে যাবো—কিংবা তোমায় আনতে যাবো—পুরুষ মানুষ কত নিষ্ঠুরই যে হয়!"
৺পূজার বন্ধে জব্বলপুরে পিসিমার বাড়ি পিতার সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়া সুধা একটুখানি আনন্দ পাইল। পিসিমার মেয়েরা তার সমবয়সী।
কয়েকদিন গত হইলে একদিন সুধা, স্নেহ ও নীরদ মার্বেল রক দেখিবার জন্য বড়োই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুধার পিসিমা বলিলেন, "আজ থাক বাছা, আজ উনি বাড়ি নেই; আর একদিন তখন যেও সব।" কিন্তু মেয়েরা কিছুতেই সে কথায় কান দিল না। সুধা বলিল, "তা নাই বা পিসেমশাই থাকলেন, বিনোদদা আমাদের নিয়ে যাবেন। তোমার দুটি পায়ে পড়ি পিসিমা, আজ আমাদের যেতে দাও। কোন্‌দিন আবার বাবা ফিরে যেতে চাইবেন, তাঁর কি কিছু ঠিক আছে? আজ আমরা দেখে আসি।" অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিসিমা সম্মতি দিলেন। মেয়েরা আনন্দে তাড়াতাড়ি যেমন পারিল গুছাইয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।
বিনোদকুমার দর বাড়াইবার জন্য একবার একটু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি যে তোদের এতগুলোকে ঘাড়ে করে বইব, তা তার জন্যে আমায় তোরা কি দিবি তা বল্।"
স্নেহ রাগিয়া বলিল, "দোবো আবার কি গো? বড়ো ভাইকে বুঝি আবার কেউ কিছু শোধ দেয়?"
"নাঃ দেয় না। বড়ো বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছে। সুধা তুই তো ভাই খুব বড়ো মানুষ, তুই কি দিবি তাই বল্ দেখি? তুই হলি ম্যাজিস্ট্রেট মহিষী—একটা যে-সে না কি!"
সুধার কর্ণমূল হইতে চক্ষের প্রান্ত পর্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কি হিসাবে তাহাকে বড়ো মানুষ বলা হইতেছে—তাই বুঝিয়া তার এ লজ্জা। হায়, বিনোদ তো তার অন্তরের বিপুল দৈন্য দেখিতে পায় নাই। সে যে ভিখারিনীরও অধমা।
কিন্তু তা পায়! বিনোদও তো তার সত্যকার অবস্থা না জানে তা নয়। এই পরিহাসে তার মুখের বিষাদ করুণ ভাব দেখিয়া বিনোদ পরিহাস সংবরণ করিয়া বলিল, "নে নে তোরা যাবি তো চটপট তৈরি হয়ে নে, ওঠ চট করে।"
সুধা অনুরোধ করিল, "পিসিমা তুমিও চলো না গো। পিসিমা ইহাতে রাজী হইতে পারিলেন না। কহিলেন, 'না বাছা, উনি দাদা কেউ বাড়ি নেই, কখন

ফিরে আসেন, সব্বাই বাড়ি ছেড়ে গেলে কি চলে ? না হয় আমার দেখা নাই বা হল। দেবতাও নয়, ঠাকুরও নয়, ঝরনা, পাহাড়, এসব আমার দেখতে যেতে বড়ো বেশি ইচ্ছেও এখন করে না। তোরা যা, খুব কিন্তু সাবধানে যাস্।"

"পিসিমার যেমন সবেতেই ভয়, এই তো এখান থেকে এখানে,—তার আবার সাবধানই বা কি ?—আর কিই বা কি ?"

পৌঁছিতেই বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, দেখা শুনা করিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। যখন শ্বেত মর্মরের উপর প্রচণ্ড বেগে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি-মিশ্র স্বর্ণবর্ণ জলস্রোত আছড়াইয়া পড়িয়া হীরক চূর্ণের ন্যায় চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল, তখন সেই দৃশ্য হইতে কাহারও চোখ ফিরিতেছিল না। ক্রমেই যে সেই জলের বর্ণ পরিবর্তিত হইতেছিল, তাহা তখন যেন কাহারও লক্ষ্য পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু এ পৃথিবী শুধু ভাবেরই সাম্রাজ্য তো নয়—ইহা বাস্তব এবং অত্যন্ত গতিশীল। সহসা ভাবে বিভোর সেই দর্শকদলকে সচেতন করিয়া তুলিয়া হুহুংকার সহকারে অশনিভরা মেঘ গর্জিয়া উঠিল। তখন মুখ ফিরাইয়া উহারা সকলেই একসঙ্গে দেখিল—কালো মেঘে নীল আকাশের একটুখানিও আর ফাঁক রাখে নাই এবং চারিদিকের গাছপালারা স্তব্ধ হইয়া যেন কি একটা বিপ্লবেরই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

স্নেহ ইহা দর্শন করিয়া বলিল, "এই সময় এমনি নির্জন জায়গায় ছুটোছুটি করতে বড়ো ভালো লাগে। আয় না ভাই এক ছুটে গিয়ে ঐ দেবদারু গাছটা কে আগে ছুঁতে পারে দেখা যাক্।"

তাহারা সেই অদূরের গাছ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বিনোদের বারণ ও আহ্বান কেহই নিজেদের সে বন্ধন-মুক্তির উৎসাহে কানেই তুলিল না।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কেহ ফিরিল না দেখিয়া বিনোদও তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে—তাদের দিকে তখন ব্যস্ত হইয়া ছুটিলেন। মেঘ তখন আকাশের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—আর ভরিবার জায়গা পাইতেছিল না। ঝড় যে এইবার আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাহা পাখিদের ব্যস্ততা দেখিলেই বেশ বোঝা যায়। তাহাদের সংকটময় অবস্থা দেখিয়া যেন চারিদিক হইতে সমস্ত গাছপালা হঠাৎ একসঙ্গে ঝাঁকড়া মাথা দুলাইয়া হাসিয়া উঠিল। হু হু শব্দে বাতাস সেই অট্টহাস্যে যোগ দিয়া তার ভৈরব বিষাণ বাজাইয়া দিল। আকাশে গম্ভীর বজ্রধ্বনি হইল, বিনোদ চিৎকার করিয়া ডাকিল, "স্নেহ! সুধা!

নীরু! ওরে তোরা শিগ্‌গির ফের, শহরের দিকে ছুটে চল্‌—ওরে শিগ্‌গির ফের।"

কড়কড় শব্দে তাঁর সে উচ্চ শব্দ কোথায় ডুবাইয়া দিয়া লহরে লহরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে পট পট শব্দে বৃক্ষলতা ছিঁড়িয়া, উপড়াইয়া, ভাঙিয়া, স্বর্গে-মর্ত্যে রসাতলে একশা করিয়া দিয়া সর্বত্রই বিষম ওলট-পালট বাধাইয়া এক ভীষণ ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। মেঘান্ধকারে একেবারে চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া গেল।

যখন ঝড় থামিল তখন গভীর অন্ধকারে আকাশ-পাতাল পরিপূর্ণ। মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া রাস্তায় জলস্রোত বহিতেছে।

বিনোদ স্খলিতপদে দুই ভগিনীর দুই হাত ধরিয়া—ধীরে ধীরে সেই অতি পিচ্ছিলপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সুধা এই দুর্যোগের মাঝখানে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কোথাও আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোথায় গেল? এই অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে আর দুটি শীতার্ত ভয়ার্ত বালিকার সঙ্গে বিনোদ নিজেকে বড়ো বিপন্নই বোধ করিল। কোথায় যায়? ইহাদের লইয়াই বা কি করে? সুধাকেই বা সে খোঁজ করিয়া বেড়ায় কোথায়?

এদিকে ঝড়ের মধ্যে ছুটিতে ছুটিতে কে কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল তার কোনোই ঠিকানা ছিল না। যখন বৃষ্টির ঝাপটা খুব জোরে পিঠের উপর আছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন সকলের সঙ্গছাড়া হইয়া চারিদিকে জমাট বাঁধা অন্ধকারের মাঝখানে সুধার চটকা ভাঙিয়া গেল। দারুণ ভয়ে সে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে—কণ্ঠ হইতে শব্দ বাহির হইতে চাহিতেছে না, প্রাণপণ শক্তিতে কোনোমতে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল—'বিনোদদা, নীরু, ও ভাই মেজদি!'

আবার ভরা মেঘ ভৈরব গর্জনে হাঁকিয়া উঠিল, বৃষ্টি আরও জোরে চাপিয়া আসিল, আর কোনো দিক দিয়া কোনো সাড়াই আসিল না। ভয়ত্রস্ত সুধা দিকনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া যেদিকে পারিল জ্ঞানশূন্যবৎ একটা দিকেই ছুটিতে লাগিল। কোথা যাইতেছে—কোথায় যাওয়া উচিত—সে জ্ঞানটুকুও হয়তো তার তখন ছিল না। কেবল এইটুকুই হুঁশ ছিল যে, এই একটি দিকে ঝরনা-ঝরা নদী আছে। ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ কিসে বাধা পাইয়া সহসা সে হোঁচট খাইয়া চোচাপটে আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। "মা গো!" বলিয়া

কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন পায়ের হাড়টাই মচকাইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। পায়ের যন্ত্রণা একটু পরে ঈষৎ কমিয়া আসিলে হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া সে দেখিল—যাহা তাকে বাধা দিয়াছে—সে হয়তো এই বৃষ্টির মুষলধারা হইতে আশ্রয়ও দিতে পারে। সেটা একটা বাংলো বাড়ির সামনের সিঁড়ি।

আশ্বস্ত চিত্তে সে তখন সাবধানে পৈঠা কয়টি উঠিয়া অতি কষ্টে আহত পা-টাকে টানিয়া টানিয়া বারান্দায় উঠিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরের দ্বারও ঠিক করিল। কিন্তু কে আর এ দুর্যোগে দ্বার মুক্ত করিয়া রাখিবে? দরজা ভিতর হইতে খিল আঁটিয়া বন্ধ করা। সুধার তখন বড়ো দায়। যার পর নাই—সেই প্রাণের দায়ই তার উপস্থিত, এখন—এটা কার বাড়ি, এর কি বৃত্তান্ত—এসব কিছুই ভাবিবার ক্ষমতা বা বিবেচনা তার নাই। একটুখানি মাথা গোঁজার মতো আশ্রয়ের নিতান্তই দরকার। তা এটা বাঘের বাসা হইলেও সে এখন তাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে রাজী আছে। প্রাণপণে দ্বার ঠেলাঠেলি করিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "ওগো! কে আছো গো, দোরটা খুলে দাও না।"

কিন্তু সে দুর্যোগে—প্রকৃতির সেই উচ্চ রোদনরোলে সুধার সেই পরিশ্রান্ত-কাতর ক্লান্ত আহ্বান কেই বা শুনিতে পাইবে? সেও কিন্তু আর বেশিক্ষণ সে অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, বিশেষ করিয়া পায়ের ব্যথা, অবসন্ন হইয়া সেইখানেই দ্বারের কাছে মাথা ঘুরিয়া শুইয়া পড়িল।

০০ তিন ০০

সুধা যখন চোখ মেলিল, প্রথমটা তার স্বপ্নই মনে হইয়াছিল, তারপর ভালো করিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতে বুঝিতে পারিল যে যেটা দেখিতেছে সেটা স্বপ্ন নয়, সত্য সত্যই সে এক অপরিচিত গৃহে একটা অচেনা শয্যায় শুইয়া আছে।

তখন ধীরে ধীরে সেই এতক্ষণকার আশ্রয় পালঙ্ক হইতে নামিয়া একটুখানি অগ্রসর হইতেই উভয় গৃহের মধ্যস্থ একটি দ্বারের পর্দা নড়িয়া উঠিল এবং সেই দরজা দিয়া কে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষমানুষ এই ঘরটায় প্রবেশ করিয়াই সসম্রমে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আপনি উঠেছেন!"

সুধা অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে মাথা নিচু করিল। সে বুঝিল, ইনিই তার আশ্রয়দাতা। আশ্রয়দাতাকে যে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত সে-কথাটা তার কিন্তু

একটি বারের জন্যও মনে পড়িল না—বরঞ্চ সে একটুখানি অসন্তুষ্ট হইয়াই ভাবিল, "এ লোকটি তো বাঙালী দেখছি, এবাড়ির মেয়েরাও নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আছেন, তা তাঁদের কারুকে পাঠালেই তো হত ? এ আবার কেমন ভদ্রতা বাপু!"

আগন্তুক উহাকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন—"আপনার কাপড়-জামা সমস্তই ভিজে, এই পাশের ঘরটায় অন্য কাপড় দেখতে পাবেন। ওগুলো সব শিগগির ছেড়ে আসুন। না হলে হয়তো অসুখ করবে। অনেকক্ষণ যদিও ওগুলো গায়েই রইলো—কি করি উপায় তো ছিল না। মাপ করবেন—আমার এখানে স্ত্রীলোক দাসী পর্যন্ত একটা নেই। তাই অন্যায় হচ্ছে জেনেও আমায় আপনাকে এই অবস্থায় রেখে দিতে হয়েছে।" সুধার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, দ্বিরুক্তি না করিয়াই সে তাই তখনি পার্শ্বের স্নানাগারে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে চলিয়া গেল।

সে ঘরে তার জন্যই বোধ করি একটা আলো জ্বালা ছিল, সরু পাড় ধুতি ও একখানা রামপুরী চাদর মাত্র সে আলনার উপর দেখিতে পাইল।

কাপড়-চোপড় সব ছাড়িয়া, চুলগুলি তোয়ালে দিয়া মুছিয়া সে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, গৃহস্বামী সেই ঘরেই একটা চৌকিতে তখনও বসিয়া আছেন। অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুধা মনে মনে এ নূতন আশ্রয়ের নূতন বিপদটাকে বেশ করিয়া অনুভব করিতেছিল। এখন ইহাকে কাছে দেখিয়া তার সে ভয়টা আরও একটু যেন বাড়িয়া গেল। এই নারীশূন্য গৃহে অচেনা পুরুষের সঙ্গে কেমন করিয়া সে রাত কাটাইবে ? মনের ভয় ভাবনা সে চাপিতে পারিল না, সভয়ে বলিয়া উঠিল, "বিনোদদাদা কি আসেননি ?"

গৃহস্বামী সেই কেদারায় উপবিষ্ট পুরুষটি, তার সাড়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"তিনি কে ? কই কেউই তো এখনও আসেননি। আপনি দেখছি বাঙালীর মেয়ে। আপনার এ রকম নিরাশ্রয় অবস্থাই বা হল কি জন্যে ?"

সুধার এইবার চোখ ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। অতি কষ্টে সে চোখের জল চাপিতে চাপিতে রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলিল, "আমরা যে মার্বেল রক দেখতে এসেছিলুম। সন্ধ্যার গাড়িতেই আবার বাড়ি ফিরতুম, তা হঠাৎ এই ঝড়-বৃষ্টিটা এসে পড়ল কিনা, কে কোথায় গিয়ে পড়লাম,—আমিও এইখানে—" বলিতে বলিতে তার চোখ ছাপাইয়া টস টস করিয়া ফোঁটা কয়েক জল ঝরিয়া

পড়িল। আবার পড়িতে যদি আরম্ভই করিল তো আর তা থামিতে চাহিল না। সন্ধ্যারাত্রের সেই সর্বনেশে বৃষ্টিটার মতোই তা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেই থাকিল।

তার আশ্রয়দাতা বড়ো বিপদেই পড়িলেন। কি বলিয়া তিনি তরুণী অতিথিকে সান্ত্বনা দিবেন, অথবা কি যে করিবেন, কিছুই যেন ভাবিয়া কূল কিনারা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ বিব্রতভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তার কান্না দেখিয়া অবশেষে বিপন্নভাবে বলিলেন, "তিনিও এমনি কোথাও একটা আশ্রয় নিয়েছেন আর কি! সকালেই আমি তাঁর খোঁজ-খবর করবো-খন আজ আপনি বড্ড পরিশ্রান্ত হয়েছেন, এখন একটুখানি বিশ্রাম করুন—আমি ও ঘরে যাই।"

তিনি দরজার দিকে দু-পা অগ্রসর হইয়াই আবার ফিরিলেন। তাঁর পশ্চাতে একটা অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ অস্ফুট ধ্বনি শোনা গিয়াছিল।

সুধা একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া একটু দৃঢ়ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "না না, এমন করে এখানে আমি থাকতে পারবো না, আমি তার চাইতে বরং রাস্তায় বসে থাকবো—সেও ঢের ভালো।"

তার আশ্রয়দাতা একজন তরুণ পুরুষ—তার শরীরের রক্তও নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা নয়! তিনি তার এই ভয়, সন্দেহ ও দারুণ অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া নিজেকে কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ করায়, তার উপর বেশ কিছু বিরক্তি বোধ করিলেন। একটু রুষ্টভাবেই বলিলেন, "কেন, এখানে কি আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে? বলুন, তা না হলে কি জন্যে এরকম উদ্ভট কথাটা বললেন? আপনাকে ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই তো মনে হচ্ছে, আমিও আপনারই একজন স্বদেশী ভদ্রলোক—আমাদের কি একটুও মনুষ্যত্ব নেই ভাবেন আপনারা? আমাতে আপনি কিছু যদি অভদ্রতা দেখেই থাকেন, স্পষ্ট করে তাও আমায় বলুন, আমি তা হলে সেটা এখনি শুধরে নিতেও পারি।"

গর্বিত কথাগুলো ও বক্তার মুখে তেমনি সগর্বভাব সুধার মনে ইহার প্রতি যেন কতকটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু সে অনেক বই-এ পড়িয়াছে যে সকল সময় বাহির দেখিয়া মন্দ লোককে চেনা যায় না। রামায়ণের সন্ন্যাস-বেশী রাবণ প্রভৃতির এবং ডিটেকটিভ সিরিজের অনুকম্পার দৃষ্টান্তের কোনোই অভাব ঘটে নাই।

সে কহিল, "আপনি রাগ করবেন না। এখন তো ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে,

আমি কেন এইবার যাই না?" এই বলিয়া সে আরও একটু অগ্রসর হইল।

গৃহস্বামী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তাও কি কখনো হতে পারে? এ রাত্রে এ দুর্যোগে আমি কি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি?"

সুধা ভয়ে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করিয়া উঠিল, "ওমা! আমি তবে কি করব?" ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হইতে গিয়া গৃহস্বামীর হঠাৎ মনে পড়িল যে, এটা ইংরোপ নয়, এটা নেহাত ভারতবর্ষ, বাঙালীর মেয়ের পক্ষে এই দুর্যোগে একরাত্রি অচেনা প্রদেশে এক নারীশূন্য গৃহে, অপরিচিত একটা কমবয়সী পুরুষের সঙ্গ খুবই ভীতিজনক এতে সন্দেহ নাই। নিজের অন্যায় অভিমানে লজ্জিত হইয়া তাই একটু দয়ার্দ্র কণ্ঠেই বলিলেন, "তবে এক কাজ করা যাক, আমি আপনার বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করি, তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন। তাঁদের ঠিকানাটা কি বলুন দেখি?" অশ্রুপ্লাবিতা সুধা কলের ন্যায় বলিয়া গেল, "বিপিনবিহারী রায়—শেরপুর।"

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আসিয়া যুবক দেখিলেন—সুধা তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া অঝোরঝরে কাঁদিতেছে। তাঁর অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল দুইটা ভালো কথায় এই বিপন্না নারীকে একটুখানি সান্ত্বনাদান করিয়া তার চোখের অজস্র প্রবাহিত জলের ধারা থামান। কিন্তু কেমন একটা অনভ্যাসজনিত লজ্জাও বোধ হইল, আর তা ছাড়া সেটা কিভাবে এই সন্দিগ্ধচিত্তা নারী গ্রহণ করিবে সে সম্বন্ধেও একটুখানি ভয় ছিল। বিপন্নভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বল্প পরে বলিলেন, "চুপ করুন, বোধ হয় ভোর চারটের ট্রেনে কেউ না কেউ শেরপুর থেকে এসে পৌছবে। দুর্যোগ থেমে গেছে যখন, তখন আসার কোনো বাধা নিশ্চয়ই পড়বে না!"

সুধা এইবার একটু কৃতজ্ঞতাভাবে তার আশ্রয়দাতার মুখের দিকে চাহিল। তার সৌম্যমুখে ও সহানুভূতিপূর্ণ সহজ দৃষ্টিতে তার এতক্ষণ পরে তার উপরে যেন একটু বিশ্বাস ও ভরসা জন্মাইতে চাহিল। সে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

যুবক মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি একজন ভদ্র কায়স্থ সন্তান, নাম আমার সুধীরচন্দ্র ঘোষ।"

নামটা শুনিয়া সুধার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিয়াছিল, একটু ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, "সংসারে একই নামের কত লোকই তো থাকে!"

০০ চার ০০

ক্লান্ত সুধা অতি শীঘ্রই এই অপরিচিত পরাশ্রয়ে বিপদের ভয় ভাবনা ভুলিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি সেই মৃদু স্পর্শেই তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ চাহিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে প্রথমটা সে নিজের দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে অবিশ্বাস করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। কিন্তু সেই এক মুহূর্ত পরেই যখন অবিশ্বাস্যকে অবিশ্বাস করিবার মতো আর কিছুই বাকি রহিল না, তখন নিদারুণ ক্রোধে তার ক্ষুদ্র ললাট কুঞ্চিত ও কালো চোখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। আহত হইলে ফণিনী যেমন করিয়া ঊর্ধ্বে ফণা তোলে তেমনি করিয়া সে তার জলসিক্ত কেশগুচ্ছ মুখের উপর হইতে সবেগে অপসারিত করিয়া মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

সুধীর একটু যেন অপ্রতিভভাবে ঈষৎ সরিয়া গেলেন। সুধা একবার মাত্র তার রাগ-রক্তিম নেত্রের তীব্র দৃষ্টি তাঁর কুণ্ঠিত মুখের উপর বজ্রের মতো নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ় পদে ও বিনা বাক্যব্যয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বার খুলিয়া যখন সে বাহির হইয়া যায়, তখন সহসা গৃহস্বামীর ক্ষণিক নিশ্চলতা দূর হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদু একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "সুধা কোথায় যাচ্ছ?"

সুধার উজ্জ্বল চোখে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিত বিদ্রূপের স্বরে সে বলিল, "আপনি না ভদ্র কায়স্থ সন্তান।"

গৃহস্বামী সুধার রাগ দেখিয়া সমানেই মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, সেই সহাস্যভাবেই বলিলেন, "হ্যাঁ সুধা। আমার পরিচয়টা আমি মিথ্যে করে দিইনি। যা বলেছি সত্যই আমি তাই, জানো তো ঘোষ বোস মিত্তির কুলের অধিকারী ইত্যাদি। এ-ঘরের সব দোরগুলো তুমি ভিতর থেকে বন্ধ করেছিলে, তাই জন্যেই এই বাথরুমের দোরটা খুলেই এসেছি এই যা বলো। তা কি করি—তোমার ঘুম ভাঙা পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করে থাকতে যে পারিনি।"—সুধীর হাত বাড়াইয়া তার একটা হাত ধরিল, ডাকিল—'সুধা!'

ক্রুদ্ধ সুধা তাঁর হাত ঠেলিয়া দিয়া দু-পা পিছাইয়া গিয়া ক্ষোভে দুঃখে কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিল—"তুমি এতবড়ো পাপিষ্ঠ।" বলিতে বলিতে নিজের একান্ত অসহায় অবস্থা ভাবিয়া সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আর আত্মদমন করিতে পারিল না।

তখন গতিক মন্দ দেখিয়া সুধীর আর তামাশার লোভটুকুকে প্রশ্রয় দিয়া বজায় রাখিতে পারিলেন না, পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া সুধার হাতে গুঁজিয়া দিযা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এটা কার হাতের লেখা বলতে পারো ?"

সুধা তার পিতার হস্তাক্ষর চিনিয়া তৎক্ষণাৎ আগ্রহভাবে সেই পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তার মুখ প্রথমে সাদা ও পরে গাঢ় রক্তবর্ণে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাঠশেষে অধিকতর সলজ্জ মুখে সে মাথা নিচু করিল। তখন তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত যেন কিসের একটা অজ্ঞাত তাড়নায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। চিঠিখানা সেই আবেগ ও আবেশ-কম্পিত শিথিল হস্ত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এ দৃশ্যের দর্শকটি নীরবে সতৃষ্ণ ও সকৌতুক দৃষ্টিতে সুধার এই ভাববিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। চিঠিখানি ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "দেখলে তো তোমার বাবা লিখেছেন—

পরমশুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপন, বাবা সুধীর।

আমি আজ বৈকালে মাত্র জানিলাম যে তুমি মীরগঞ্জে মার্বেল রকের কাছে আছো। আমি মনে করেছিলাম সুধাকে আমি নিজেই লইয়া গিয়া তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া আসিব। বাড়ি ফিরে দেখি মেয়েরা মার্বেল রক দেখিতে গিয়াছে। বিনোদের ও তোমার টেলিগ্রাম প্রায় এক সঙ্গেই এল, তাইতে জানলাম সুধা স্বয়ংই তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই মিলন নিশ্চয়ই তোমাদের অবিচ্ছিন্ন সুখের হইবে। বিনোদ এই চিঠি নিয়া যাইতেছে তারই সঙ্গে তোমরা দুজনে একবার এখানে এসো। সুধার পিসিমাও তোমাদের একটিবার একত্রে দেখতে চাচ্ছেন, তা না হলে আমরাই তোমাদের কাছে যেতাম।

আশীর্বাদক

শ্রীকালীপদ মিত্র

সুধা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেতসীর মতোই কাঁপিতেছিল, এ সকল কথার একটি অক্ষরও তার কানে হয়তো পৌঁছায় নাই। সে আপনার এতবড়ো সৌভাগ্য কিছুতেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, তাই সে হঠাৎ অর্ধ অবিশ্বাসে অস্ফুটে বলিয়া উঠিল, "যদি এ চিঠি বাবার লেখা না হয়—"

তার ঠোঁটে বাকি কথা আটকাইয়া গেল। সেটা বড়ো ভীষণ অপবাদ যে,—সহসা কাহাকেও তা দেওয়াও যায় না।

সুধীর এবার মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, "এ তো বড়ো মন্দ মজা নয়! সুধা তুমি সেই যে প্রথম থেকে আমাকে মস্ত বড়ো একটা বদমায়েশ বলে ধরে রেখেছো, কিছুতেই দেখছি সেটা আর ভুলতে পারছো না। তা তুমি বলতেই পারো—যেহেতু আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরিচয়টা বেশ ভালো রকমই নিবিড় কিনা! আমিই কি তোমাকে এতক্ষণ 'আমার সুধা' বলে মনে ভেবেছিলাম? বরং মনে হচ্ছিল এ আবার কি একটা অপবাদ এসে জুটলো! আচ্ছা তুমি আমায় চেনো না, কিন্তু—"

বলিতে বলিতে সে দ্বার খুলিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপরের রাইটিং কেস হইতে অর্ধলিখিত একখানা পত্র তুলিয়া লইয়া আবার সুধার নিকটস্থ হইল। সেখানা তার সামনে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার লেখা তো চেনো? দেখো দেখি এ লেখাটা তোমার স্বামীর কিনা?"

সুধা মাটি হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কম্পিত কটাক্ষে তার প্রসারিত হস্তস্থিত পত্রখানার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। 'প্রাণের সুধা!' এই তো সেই চেনা হাতের প্রিয় সম্বোধনটি! হায় এ কী বিড়ম্বনা? এই অপরিচিত প্রাণীদ্বয়ই কি পরস্পরের চিরজীবনের সহায়? ইহারাই কি ইহাদের দুজনের একমাত্র 'প্রাণাধিক! প্রিয়তম!' লজ্জায় সুধার রাঙামুখে একটুখানি বড়ো সকরুণ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। নাটক-নভেলেও যে এমন ধারার প্রেমিক-প্রেমিকাযুগলের প্রেম-কল্পনা দেখা যায় না!

সুধীর কিন্তু এইটুকু প্রমাণ দিয়াই নিশ্চিত হইল না—হাজার হউক সে-ও তো একটা S. D. O.—গত বৈকালে প্রাপ্ত বম্বে হইতে redirect করা পত্রখানা নিজের বেড়াইবার কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সুধার চোখের সামনে তেমনি করিয়াই ধরিয়া দিয়া বলিল—"এ-ও যাক! এবার চেয়ে দেখো দেখি সুধা! এ চিঠিখানা বোধহয় তুমি তোমার 'স্বামী সুধীরকে'ই লিখে থাকবে! অন্য কোনো 'জালিয়াত সুধীরের' হয়তো এটা পাবার কোনোই চান্স ছিল না? না, কি বলো?"

সুধার একবার ইচ্ছা হইল তার লেখা এই চিঠিখানা ইহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা! কী অসহ্য কেলেংকারি! এই যে অপরিচিতের প্রতি রাত্রের মধ্যে কত বারই ঘোরতর

ও নিকৃষ্ট অবিশ্বাস তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই অবিশ্বাসে যাঁকে সে অকথ্য অপমান পর্যন্ত করিতে দ্বিধামাত্র করে নাই, তাঁর প্রতি এই লিপিখানি কতই না ভালবাসা, কত মান-অভিমান সাদর-সোহাগই না বহন করিয়া আনিয়াছে! যাঁকে চোখে দেখিলে চিনিতে পারিবার মতো এতটুকুও সম্বল তার নাই, তাকে কি বলিয়া তার আপনার মনের সমস্ত সঞ্চয়টুকু সরল বিশ্বাসে সে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে?—ছিঃ ছিঃ, এমন বোকা মেয়ে কে!

সুধীরের কথায় অভিমানে দু-ফোঁটা চোখের জল তার লজ্জারক্তিম গালের উপর ঝরিয়া পড়িল। তাকে আবারও কাঁদিতে দেখিয়া সুধীর এবার সস্নেহে সে অশ্রুবিন্দুদুটি মুছাইয়া দিতে গেল, আবার হাতখানি সরাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুধা! এবার তোমায় কি আমি ছুঁতে পারি?"

সুধীর তাকে নিজের কাছে টানিয়া লইতেই সে তাঁর বুকে আছড়াইয়া পড়িয়া এবার বড়ো সুখে-বিজড়িত ঘোর অভিমানের কান্না কাঁদিয়া তারও আলোড়িত বুকের বাহিরটা ভাসাইয়া দিল। তখন জানালার আশ-পাশ দিয়া উষাদেবী তারই মতো রাগরক্তিম মুখে উঁকিঝুকি দিতেছিলেন। ভোরের বাতাস গাছপালার উপর হইতে গত বৃষ্টির বারিবিন্দু ডাল নাড়া দিয়া দিয়া তারই গভীর আনন্দের অশ্রুবিন্দুর মতো একটি একটি করিয়া ঝরাইয়া ফেলিতেছিল।

বাহির হইতে বিনোদ ডাকিয়া উঠিল, "ওহে সুধীর! সুধা কি উঠেছে? উঃ! তার জন্যে বড্ড বেশি ভাবনা হয়েছিল—তাকে একবারটি ডেকে দাও তো চোখে একবার দেখি। এ আমাদের সত্যি সুধা কিনা!"

সুধা মুখ তুলিতেই তার একটি হাত ধরিয়া ফেলিল, হাসিয়া ডাকিল—'বিনোদদা! তোমাদের সুধা আমার সঙ্গে সারারাত ধরে ঝগড়া করেছে, বলছে, আমি নাকি একটা বদমাশ, জালিয়াত, ও চিঠিপত্র সবই জাল করেছি। তুমিও তো এসে তোমার বোনকে আইডেন্টিফাই করতে চাইছো, তোমরা দেখছি সব্বাই জাত ডিটেকটিভ। যাক্ এখনও আমায় এসে এই ভীষণ ক্রিমিনাল চার্জটা থেকে উদ্ধার করে বাঁচাও!"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) ॥ বিভ্রম
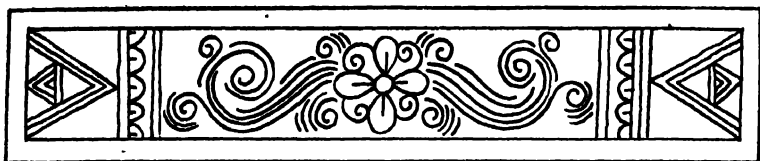
০০ এক ০০

প্রথম চাকরি পাইলাম শিমলা পাহাড়ে।

বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল, অজ্ঞাত বিদেশের হালচাল একটু না বুঝিয়া প্রথমবারেই সদ্যঃপরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। 'পথি নারী বিবর্জিতা'র দিন অবশ্য গত হইয়াছে। তথাপি সুন্দরী তরুণী স্ত্রী সুদীর্ঘ পথে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনকও নহে। তাহার কারণ সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে; মায় কলিকাতা হইতে শিমলা এগারো শত মাইল পথ তাঁহাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার দায়িত্বের মানসিক ভার পর্যন্ত। কিন্তু আমার দিকের কোনো ভার, এমন কি আমার ছাতাটির ভারও, তাঁহাকে বহিতে দেওয়া শোভন হইবে না।

স্ত্রী কিন্তু ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। কহিলাম, প্রস্তাবটা খুবই উৎসাহোদ্দীপক কিন্তু যা-হয় একটা গৃহের ব্যবস্থা না করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে লইয়া গিয়া রাখিব কোথায়?

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি থাকবে কোথায়?"

"আমি? আমি প্রথমে গিয়ে সরকারী ব্লকে উঠব। তারপর তোমার থাকবার মতো একটি বাড়ি ঠিক করব।"

"কত দিন লাগবে? ছ-মাস?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "ক্ষেপেছো? ছ-মাসে তো আবার কলকাতায় ফিরে আসবার সময় হবে। মাসখানেকের মধ্যে ঠিক করব।"

প্রসন্নমুখে স্ত্রী কহিলেন, "আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

কহিলাম, "তথাস্তু।"

০০ দুই ০০

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। দুর্জয় শীত। আপিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম, সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়িতে পত্র লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য আমার চক্ষে ঠিক ভালো লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং বয়েল গাড়ি চলিয়াছে, চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন কোনো রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস-দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ধূমাস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম, পর্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্তে কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সেই পল্লীর মধ্য দিয়া একটি সংকীর্ণ গলি এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষে দুইটি উৎসুক চক্ষু। কিন্তু সে ক্ষণিকের মোহ। রিক্‌শার শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম, সেই পর্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের গাম্ভীর্য এবং নির্জনতা লইয়া প্রকাশ রহিয়াছে। কোথায়ই বা কলিকাতার গলি এবং কোথায়ই বা উৎসুক দুইটি চক্ষু! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শিমলার শীতবায়ুতে মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার। আপিসের উপদ্রব ছিল না। ভৃত্য টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থটুকু নিঃশেষ করিবার পর কি করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম—

"বাবুজী, ফুল।"

চাহিয়া দেখিলাম, ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরনে নীল বর্ণের পায়জামা এবং কুর্তি এবং গাত্রে একখানি পীতবর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখ সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স ষোলো-সতেরো বৎসরের অধিক হইবে না।

তাহার হস্ত হইতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম, পাহাড়ী গোলাপ এবং ফার্ন দিয়া প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানি

লইয়া বালিকাকে দিলাম। বালিকা দুয়ানি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "বাবুজী, ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন!"

তাই তো! দরদস্তুর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া ফিরাইয়া লইতেও ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, "তা হোক, তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি দুয়ানিটি লইয়া যাও, তাহার পরিবর্তে আমাকে আট দিন ফুল দিয়া যাইও।"

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। 'আচ্ছি বাত'—বলিয়া দুয়ানিটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

০০ তিন ০০

পরদিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত, যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গি, তেমনই অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা বলিত, তেমনই অবলীলা-ক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাংলাদেশের হিন্দীতে তাহার সহিত কথা কহিতাম, সে পাহাড়ী হিন্দীতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্তা একরকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জানকী। খড়-এর অর্ধপথে তাহাদের বাড়ি। তাহার পিতা জঙ্গল দফ্তরের (Forest office) জমাদার। তাহারা তিনটি ভগিনী এবং চারিটি ভাই। তাহার বড়ো ভাই তিন মাস হইল সরকারে চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া জানকী

বলিত, "বাবুজী, তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধ হয়, বরফে তুমি কি করিয়া থাকিবে ?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজ কথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম, "বরফ পড়িবার দুই মাস পূর্বেই আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।"

জান্‌কী আশ্চর্য হইয়া বলিত, "বাবুজী তুমি বরফে থাকিবে না ?"

বলিয়া সে বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কী সুন্দর! যখন পাহাড় পর্বত গাছপালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায়, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক ঝক করিতে থাকে, তখন তাহারা কী আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! সেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম! শিমলার মতো ত্রিশটা শহর একত্র করিলেও কলিকাতার মতো বড়ো হয় না—সেখানে কত লোক, কত গাড়ি, কত আনন্দ! যে 'হাওয়া-গাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, সে হাওয়া-গাড়ি কলিকাতার পথে গণিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রামগাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ।

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিত হৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য লাগিত হাওয়া-গাড়ির কথা শুনিয়া। এখানে যত রিক্‌শা আছে, কলিকাতায় তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়া-গাড়ি আছে, কী আশ্চর্য! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না। জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত, "বাবুজী, শিমলাই ভালো।"

এমনই করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশ ফুলের তোড়া মাত্র উপলক্ষ হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্রকিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্বতগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কালো কালো পাহাড়গুলা দেখিয়া মনে হইত, যেন রূপকথার দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম। প্রভাত সূর্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমজর্জর পর্বতগুলা কেমন খাপছাড়া

বলিয়া মনে হইত। এমন সময়ে একমুখ হাস্য ও একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া পড়িত।

এই সরল-হৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার ভালো লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্বতের মধ্যে চতুর্দিকের গাঢ় নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেল করিয়া রাখিত, তাহার উপমা পর্বতের মধ্যে, আমি আর কোনোও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরিনির্ঝর ছাড়া। মনে হইত, সে যেন নির্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই,—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত, গল্প শুনিতেও তাহার তেমনই আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে হৃদ্যতা।

দুয়ানির হিসাব যেদিন শেষ হইল, তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জান্‌কীকে বলিলাম, "জান্‌কী, তোমার দু-আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে। আজ থেকে আবার নূতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দুয়ানি প্রদান করিলাম।

দুয়ানিটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া জান্‌কী বলিল, আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না, আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম, "তাও কি হয়—!"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল, ফুল বিক্রয় করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে, অতএব পয়সা না লইলেও তাহার ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্তে বাবুজীর অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম, ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জান্‌কীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজী করিতে পারা যাইবে না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

০০ চার ০০

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে জান্‌কী একদিনও আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য

আসিতে পারে নাই, সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নহে, এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে, যাহার মাত্রা আমার মনে হয় ক্রমশ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসে না, সে আমার জন্য আসে; ফুল তাহার উপলক্ষ— আমিই তাহার লক্ষ্য।

কী আশ্চর্য! এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ শুধু হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় না— এ আবার ভালোও বাসে! ক্ষুধার সময়ে আহার এবং নিদ্রার সময়ে নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তিলাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলে!

কিন্তু আমি তো এই পর্বত-বালিকাকে ভালবাসি নাই—একান্ত সহৃদয়তা ভিন্ন আমি তো আর কিছুই ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কি পদার্থ সে লাভ করিয়াছে, যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

এই হৃদয়ের খেলা দেখিয়া আমি মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে অথচ অনন্যগতিভরে এই উদাস ও চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল! কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে? আমার মধ্যে এমন কি শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে, যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোনোক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না। সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক, ইহাকে রোধ করিতে হইবে, ইহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণত-বুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা মোহকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে, আমার কর্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয় সংঘাতের মধ্যে আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কিছুই নাই; কিন্তু বেচারী জানকী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে যখন তাহাকে এই অপরিণামদর্শিতার মূল্য দিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে, ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করলাম, জান্‌কীকে সাবধান করিয়া দিব। কিন্তু কী তাহাকে বলিব, কেমন করিয়া সাবধান করিব? সে তো একদিনও প্রকাশ করিয়া বলে নাই সে আমাকে ভালবাসে। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি, আমাকে ভালবাসিও না—ভুল করিও না। বিশেষত, সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অবাধে গল্প করিতে থাকে, নির্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে।

কিন্তু ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, একটা কোনো প্রতিকার না করিলেই নয়। দুই-একজন বন্ধুবান্ধব জান্‌কীর বিষয়ে লক্ষ্য করিতে ভুলিল না এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জান্‌কীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয়, তাহারা আমার বিষয়ে আলোচনা করে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি, জান্‌কীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোনোক্রমেই উচিত হয় না।

অবশ্য এ কথা বলিলে জান্‌কীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট দেওয়া হইবে; কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম, জান্‌কীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করিব। ফুলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লইব না। বিনামূল্যে ফুল গ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, মূল্য দিয়া ফুল গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই অপসৃত হইবে।

সেদিন প্রভাতে এক পশলা শ্রাবণের বর্ষণ খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্যের কিরণ আকাশ এবং পর্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জান্‌কী উপস্থিত হইল, এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড়ো বোঁচকা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আজিকার ফুলের তোড়াটি সকল দিন অপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং কর্তব্যজ্ঞানকে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম, "জান্‌কী, ফুলের দাম তুমি যদি না লও তো আমি আর ফুল লইব না।"

জানকীর প্রফুল্ল মুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল।—"কেন বাবুজী ?"

আমি কহিলাম, "তা বলিতে পারিব না, কিন্তু দাম তোমাকে লইতেই হইবে।"

একটু দুঃখিত স্বরে জানকী কহিল, "বাবুজী, আমি যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না, আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি।"

কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

জানকী কহিল, "আমি আজ বিদেশে যাইতেছি, এখান হইতে এক বেলার পথ। ইনি আমার স্বামী।"

জানকীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "জানকী, তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বলো নাই তো! কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে ?"

জানকী কহিল, "পাঁচ বৎসর।"

দেখিলাম, বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্যকিরণের মধ্যে জানকীর মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্মল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জানকী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করজোড়ে কহিল, "বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয়, একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভালো—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।"

আমি কহিলাম, "ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।"

জানকী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞ নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

বিদায়কালে জানকী বলিল, "বাবুজী, আপনার দয়া ও ভালবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আপনি আমাকে যে দোয়ানিটি দিয়াছিলেন, সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি, খরচ করি নাই।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দুয়ানিটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জানকী এবং তাহার স্বামী খডের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল, আমি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

জানকীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে বিকৃত রূপ দিয়া তাহাকে শোধন করিবার সাধু সংকল্পের আত্মপ্রসাদে কিছু পূর্বে মনে মনে নিজের পিঠ ঠুকিতেছিলাম। সেই শূন্যগর্ভ অহমিকা হইতে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল, কাল হইতে "বাবুজী, ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না, তখন একটা সূক্ষ্ম বেদনায় মনটা পীড়িতও হইতে লাগিল।

সেইদিন আপিসে গিয়া বলিলাম, "সাহেব, আমাকে দশ দিনের ছুটি দাও, স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন, "তথাস্তু।"

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২—) ॥ বিশ্বনাথ
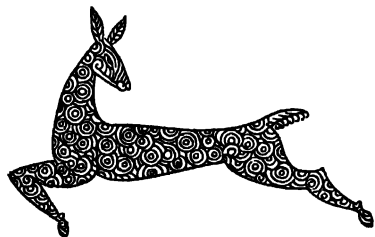
০০ এক ০০

শহরের এক কোনায় জঙ্গলে ঘেরা বিশ্বনাথের মন্দির। অনেক লোক সেখানে আসিয়া পূজা পৌঁছাইয়া যায়। মাঝে মাঝে সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া সেখানে কুণ্ড জ্বালাইয়া বসেন। আশে পাশে গৃহস্থ কয়েক ঘর আছে; কিন্তু মন্দিরের স্থায়ী বাসিন্দা এক পূজারীর পরিবার—আর একটি পাগল।

পাগল—সে একলা একটা অশ্বত্থগাছের তলায় পড়িয়া থাকে, আপনমনে বিড়বিড় করিয়া কি বকে, আপনমনে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পরনে তার শুধু ছোট একখানা দারুণ ময়লা কাপড়, কোনোমতে কোমরে জড়ানো। তাও সে সব সময় পরিয়া থাকা আবশ্যক বোধ করে না; আর পরিলেও সেই ছেঁড়া কাপড়ে ঠাট বজায় থাক বা না থাক, লজ্জা নিবারণ হয় না।

পাগলের একদিকে জ্ঞান টনটনে। বিশ্বনাথের বাড়ির পাগল, অনেকে তাকে বাবার অবতার বলিয়া এক আধটুকু মানে। তাই তারা পূজার সঙ্গে সঙ্গে পাগলকেও কলাটা মূলাটা দিয়া যায়। তাছাড়া পাগল দিনের বেলা এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া চাল ডাল যা পায়, তাতে তার দিন গুজরান বেশ হয়। সে আর যাই করুক, তার সমস্ত দিনের ঘোরা ফেরার পর তার সেই গাছতলায় বসিয়া রান্নাটা করা চাই-ই। দিনের বেলায় সে যেখানেই যা খাইয়া বেড়াক, রাত্রে তার নিজে রাঁধিয়া খাইতেই হইবে। সে রান্নার যোগাড় না হইলে উদ্দাম হইয়া উঠিত। রাঁধিয়া বাড়িয়া সে এমন ভাব করিয়া বসিয়া খাইত—যেন সে রাজা কি বাদশা।

পাগলের নাম কেহ জানিত না, সবাই তাহাকে বলিত বিশ্বনাথ। সে ছিল ছেলেদের মহা আনন্দের খনি। পাশের গৃহস্থ বাড়ির ছেলেপিলে তাহাকে একরকম সারাদিন ঘিরিয়া বেড়াইত, তাহাকে খ্যাপাইত, তার রাঙা চোখ দেখিয়া

হাসিয়া গড়াইত। সাধারণত পাগল ছিল খোস-মেজাজের লোক। সে নাচিত, গাইত, আর ছেলেমেয়েদের হাসাইত। হাসাইয়া সে হাসিতে যোগ দিয়া আনন্দে গড়াগড়ি যাইত।

সেদিন সে বিশ্বনাথের বাড়ির আঙ্গিনায় হঠাৎ আনন্দে নাচিয়া গাইতে লাগিল। ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল। তাকে নানারকম ফরমায়েস করিতে লাগিল। খোঁড়া কুকুরের নাচ, ব্যাঙের নাচ, খেঁকশিয়ালির নাচ প্রভৃতির সে অদ্ভুতরকমের নমুনা দেখাইয়া সকলকে হাসাইল। আর সেই হাসির গর্‌রায় যোগ দিয়া মাটিতে পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

তখন ঠিক দুপুর বেলা, রাজ্যের লোক পূজা দিতে আসিয়াছে। তাছাড়া পাড়ার ছেলেরা তো পাগলকে ঘিরিয়া আছেই। একটা প্রকাণ্ড মজলিস বসিয়া গেল। হাসির উপর হাসির তরঙ্গ উঠিয়া গেল।

তারপর পাগলের খেয়াল হইল বাইনাচ দেখাইবার। চট করিয়া পরনের কাপড়খানা খুলিয়া সে ওড়নার মতো করিয়া হাতে ধরিয়া বাইনাচের নমুনা দেখাইতে লাগিল। রমণীরা মুখ ফিরাইলেন। পুরুষরা ইতস্তত চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। ছেলের দল পরম আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল।

ঠাকুরের সেবাইত মহাশয় বেশির ভাগ শহরেই বাস করিতেন। কিন্তু আজ আসিয়াছিলেন একটা উৎসবের দিন বলিয়া। তিনি পাগলের নৃত্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর মোটা লাঠিখানা দিয়া খুব কষিয়া দুই-চার ঘা লাগাইয়া পাগলকে কাপড় পরিবার আদেশ দিলেন। পাগল চিৎকার করিয়া কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে ছুটিল। তার অশ্বত্থতলায় গিয়া সে অনেকক্ষণ পড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল।

০০ দুই ০০

পাগলের নাচ দেখিতেছিল আর একজন, পূজারীর ঘরের একটা জানালায় দাঁড়াইয়া—সে পূজারীর মেয়ে সরমা। সবাই যখন হাসিয়া লুটাইতেছিল, তখন সরমার দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সরমা ছিল বিধবা, বয়স বছর কুড়ি-বাইশ। চলনসই রকম সুন্দরী। কিন্তু যৌবনের ঐশ্বর্যে ভরপুর। তার যৌবনের ভিতর আবেগ ছিল না, চঞ্চলতা

ছিল না। সে ছিল ভাদ্রের নিস্তরঙ্গ পদ্মার মতো স্থির, স্নিগ্ধ, গভীর। সে ছিল পরম শুদ্ধাচারিণী। বিশ্বনাথের সেবা-পূজায় সে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিল।

বিশ্বনাথের সেবাইত মহাশয় প্রায় মন্দিরে থাকিতেন না। পূজারীর লাভের দিকে যতটা নজর, পূজার সৌষ্ঠবের দিকে ততটা আগ্রহ নাই। তবু এক সরমার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যে বিগ্রহের নিত্য নৈমিত্তিক সেবা-পূজা যেরকম সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইত, অনেক মন্দিরে তেমন হয় না।

সরমা ঘর ও মন্দিরের বাহিরে কখনও পা দেয় না। বাহিরের লোকের সঙ্গে তার কোনোও সংশ্রব নাই। তার জীবনের একমাত্র আনন্দ ও একমাত্র কর্তব্য বিশ্বনাথের সেবা ও পিতার সেবা।

আর ছিল তার এক ভার—এই পাগল। সে রোজ পাগলকে প্রকাশ্যে হউক গোপনে হউক খাইতে দিত। সরমার সংক্ষিপ্ত সুযোগ ও অবসরে যতদূর পারিত, সে পাগলের সেবা করিয়া তার নিঃসঙ্গ অসম্বদ্ধ জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করিত।

এ পাগলের জন্য তার দুঃখ ও চিন্তার অবধি ছিল না। শীতের রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে ভাবিত, পাগল এখন একা এই শীতে গাছের তলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। অমনি তার আরাম ঘুচিয়া যাইত, ঘুম ছুটিয়া যাইত। প্রায় সে একটা লোক পাঠাইয়া দিত পাগলের কাছে, একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দিতে। আবার তাতেও তার স্বস্তি ছিল না। সে ভাবিয়া মরিত বুঝি বা পাগল সেই আগুনে হাত-পা পোড়াইয়া কষ্ট পাইতেছে। সরমার নিজের জীবনে তার সুখের কিছু প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু এমনি করিয়া দিনরাত পাগলের দুঃখের কথা ভাবিয়া তার জীবনটা আরো দুঃখে বোঝাই হইয়া উঠিয়াছিল।

সরমার সবচেয়ে বেশি দুঃখ হইত এই ভাবিয়া যে, এ হতভাগ্য নিজের দুরদৃষ্টের কথা কিছুই বোঝে না। এত দুঃখ তার, তবু সে আনন্দে অধীর—এ কথা ভাবিতে সরমার বুক ভাঙিয়া যাইত। ভগবান পাগলকে সব সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে তার বুঝিবার শক্তি হরণ করিয়াছেন, এইটাই তার সবচেয়ে বেশি দুঃখ বলিয়া সরমা মনে করিত। তাই সবাই পাগলের যে নৃত্য গীত শুনিয়া হাসিত, সরমা তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া সারা হইত।

কাজেই পাগলের যেসব কাণ্ড দেখিয়া মন্দির-ভরা লোক হাসিয়া আকুল

হইতেছিল, সরমা তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেছিল। জানালার গরাদ ধরিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল। একদৃষ্টে পাগলের অসুন্দর মলাময় মুখের দিকে চাহিয়া তাই সে চোখের জল মুছিতেছিল।

পাগলের যে দুঃখ তা সরমা যত বুঝে আর কে তত বুঝিবে। তার বুকের ভিতর পাগলের ব্যথা যে মেরুর তুষার-পর্বতের মতো জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল।

সে তো বেশি দিনের কথা নয়, যখন সরমা আনন্দে উৎফুল্ল হৃদয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছিল। সেখানে গিয়া সে কী এক স্বপ্নপুরীর ভিতর আনন্দ-ধারায় নিরন্তর স্নাত হইয়া বাস করিয়াছিল মাত্র একটি বৎসর। তারপর—সে কী দারুণ অন্ধকার। কী বুকভাঙা তার বেদনা। যে স্বামীর মুখ চাহিয়া তার এত আনন্দ, যার আদরে সে রাজরানী, সেই স্বামী তার পাগল হইয়া গেলেন। তারপর দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ দুই বৎসর সে পাগল স্বামীর সেবা করিয়াছে। অশ্রুজলে ভাসিয়া, মার খাইয়া, তাড়া খাইয়া সে ছায়ার মতো পাগল স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তার শুশ্রূষা করিয়াছে। তারপর এই পাঁচ বছর সেই পাগল স্বামীর ধ্যান করিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছে! পাগলের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদিবে না তো কি?

যখন সেবাইত নির্দয় প্রহারে জর্জরিত করিয়া পাগলকে তাড়াইয়া দিলেন, তখন অসহায় সরমা সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তারপর যতক্ষণ পাগল আর্তনাদ করিল, ততক্ষণ সে বলির পশুর মতো ধড়ফড় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর মন্দিরের গোলমাল অনেকটা শান্ত হইলে, সরমা ধীরে ধীরে সসংকোচে গেল সেই গাছতলায় পাগলের কাছে। সে সঙ্গে লইল একখানা কাপড় আর কিছু খাবার। পাগল তখন একলা পড়িয়াছিল। আর আপনমনে কি বিড়বিড় করিতেছিল ও মাঝে মাঝে হাসিতেছিল। কিন্তু সে অসাধারণরূপে শান্ত। আর মাঝে মাঝে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—যেন মাঝে মাঝে কি সব কথা তার মনে আসিতেছে, অথচ সে ভালো করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। পাগল তার নেকড়াখানা পরিয়াই ছিল, কিন্তু তাহাতে তার লজ্জানিবারণ হয় নাই। সরমা একটু সংকুচিত হইল। কিন্তু পাগলের সেবা করা তার অভ্যাস আছে,—সে সংকোচ জয় করিল।

কাপড়খানা পাগলকে দিয়া সে বলিল, "ক্ষেপু, কাপড়খানা পরো।" এ নারীর সদয় ব্যবহারে পাগল চিরদিনই তার কথার বশ। সে হাত পাতিয়া

কাপড়খানা লইয়া পরিল। পুরা দশহাত সে কাপড় সে সামলাইতে পারিল না, কোনোও মতে কোমরে জড়াইল মাত্র। সরমা কিছুক্ষণ মুখ ফিরাইয়াছিল, ফিরিয়া দেখিল পাগল ভালো করিয়া কাপড় পরিতে পারে নাই। তখন সে সকল সংকোচ দূর করিয়া নিজেই ভালো করিয়া তাহাকে কাপড় পরাইয়া দিল আর একটা দড়ি দিয়া সে এমন করিয়া কাপড় আঁটিয়া বাঁধিয়া দিল, যাহাতে সে সহসা তাহা খুলিতে না পারে।

পাগল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

তারপর সরমা তাহাকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থির করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁর আঁচলে চক্ষু মুছিল।

০০ তিন ০০

পাগল হাঁ করিয়া সরমার দিকে চাহিয়া রহিল। আজ তার মনের ভিতর একটা ভীষণ গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে। এতদিন তার মনের ভিতর সব কথা এলোমেলো হইয়া আসিত। কিন্তু এলোমেলো বলিয়া তার কিছু মনে হয় নাই। সে যখন যে কথাটা ভাবিত তাই বলিত, সেই অনুসারে কাজ করিয়া যাইত। একটা চিন্তার সঙ্গে আর একটা মিশাইবার চেষ্টা করিত না বা তার অসঙ্গতি লক্ষ্য করিত না। আজও তার মনে অনেক কথা এলোমেলোভাবে আসিতেছে, কিন্তু তার মনে হইতেছে যে, যেন কথাগুলো এলোমেলো। সে একটু চেষ্টা করিতেছে তার ভাবনা চিন্তাগুলিকে গুছাইবার।

সরমা যতক্ষণ কাছে ছিল ততক্ষণ তার কোনোও এলোমেলো কথা মাথায় আসে নাই। সে একাগ্রচিত্তে সরমাকে দেখিতেছিল, তার সেবা গ্রহণ করিতেছিল—আর কিছুই ভাবিতেছিল না। কেবল যখন সরমা তাহাকে কাপড় পরাইতে লাগিল, তখন সে একটু লজ্জা অনুভব করিয়াছিল।

সরমা চলিয়া গেল। তখন সে তার দিকে চাহিয়া রহিল, আর ভাবিতে লাগিল। তার মনে হইল সরমা সুন্দরী, সরমা স্নেহময়ী, দয়াময়ী। সরমার প্রতি তার মন স্নেহে প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া গেল। তার ইচ্ছা হইল, সে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তার লজ্জা বোধ হইল।

সরমার চিন্তা আশ্রয় করিয়া তার অনেক দিনের হারানো বুদ্ধি ধীরে ধীরে উষার আলোকের মতো তার চিত্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেক কথা তার একে একে মনে হইল। সে তো এখানকার নয়। অনেক দিন আগে সে এখানে আসিয়াছে। কেমন করিয়া সে আসিয়াছে তা তার মনে নাই, তবে মনে পড়ে এক সাধুর সঙ্গে সে আসিয়াছিল। তার আগে সে যেখানে ছিল, সে স্থান অনেক দূরে।

পাগল যে কোথাকার কে তাহা কেহ জানিত না। একদিন এক সাধু তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সাধু তাহাকে পীড়িত অবস্থায় পথে কুড়াইয়া পাইয়া তাহাকে শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করেন। তারপর সে সাধুর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরিয়া শেষে এই মন্দিরে আসিয়া থাকিয়া যায়।

সে ছিল এক গরিব ভদ্রপরিবারের একমাত্র সন্তান, বিধবা-মায়ের ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপ। সে কলেজে পড়িত। ভালো ছেলে বলিয়া তার প্রতিপত্তি ছিল, দুঃখিনী মা তাকে আশ্রয় করিয়া কত না আকাশ কুসুম রচনা করিয়াছিলেন। একদিন সে পাগল হইয়া ঘরে ফিরিল। মা তার চোখের জলে ভাসিয়া পাগল ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু রাখিতে পারিলেন না। বারে বারে সে উধাও হইয়া বাহির হইয়া যায়, অনেক সন্ধানে তাহাকে তিনি ধরিয়া আনেন। এমনি করিতে করিতে একদিন সে যে কোথায় গেল, কেহ তার সন্ধান দিতে পারিল না।

আজ পাগলের মনে পড়িল তার সেই মায়ের কথা। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, মার কাছে যাইবার জন্য সে ছটফট করিয়া উঠিল। কিন্তু কেমন করিয়া সে যাইবে? সে যে অনেক দূর, তার সম্বল কই? এখানে তার বন্ধু কে আছে?

ভাবিতে ভাবিতে পাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন দারুণ শীতে সে তার কাপড়খানা গায়ে জড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। শীতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাগল দেখিল, সরমা বসিয়া একটা কাঠের কুঁদায় আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিতেছে। খড়ের আগুন করিয়া সে তার উপর কতকগুলি কাঠ চাপাইয়া ফুঁ দিতেছে।

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়া পাগল মুগ্ধ হইল। সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নির্বাপিত-প্রায় অগ্নিতে ফুৎকার দিতে তার উজ্জ্বল জ্যোতিতে সরমার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, ধোঁয়ায় তার চক্ষু দুটি সজল হইয়া

উঠিতেছিল। দেখিতে বড়ো সুন্দর। পাগল বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া পড়িয়া রহিল, সে যে জাগিয়াছে তার কোনোও সাড়া সে দিল না।

অনেকক্ষণ চেষ্টা ও যত্নের পর আধপোড়া কুঁদাটা জ্বলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখাটাও বেশ উঁচু হইয়া উঠিল। সরমা হাঁটু গাড়িয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার আগে পাগলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল—আর কি করিয়া তার আরামের আয়োজন করা যায়, তাই সে ভাবিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল পাগল ঘুমায় নাই, তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে! চমক লাগিয়া সরমার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া এক পায়ে দু-পায়ে সরিয়া যাইতে লাগিল।

পাগল উঠিয়া বলিল, "দয়া করে যদি এসেছো দেবী, তবে যেও না, একটু বোসো।"

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরমার সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, সে পিছন ফিরিয়া ছুটিল। পাগল উঠিয়া তার পিছু পিছু ছুটিল।

পাগল বলিল, "দাঁড়াও, ভয় নেই আমার দুটো কথা না শুনে যেও না—আমার কথা না শুনে তুমি যেতে পারবে না?"

সরমা ছুটিল।—তার বুকের ভিতর হিম হইয়া গেল—সে যত ছুটিতে চায় ততই তার পা যেন ভারী হইয়া যায়। কয়েক পা যাইতে না যাইতে পাগল তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

"মাগো!" বলিয়া চিৎকার করিয়া সরমা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। পাগল দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এক মুহূর্ত কপালে হাত দিয়া পাগল সরমার মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিল। তারপর সে অত্যন্ত যত্নের সহিত সরমাকে কোলে করিয়া তার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। ঘরের সম্মুখের দাওয়ায় সে সরমাকে শোয়াইয়া দিল। তারপর সে পূজারীকে ডাকিতে চলিল। কিন্তু সরমার সংবিৎ ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইল।

আড়াল হইতে সে দেখিল, জ্ঞানলাভ করিয়া সরমা উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল। তারপর ছুটিয়া সে ঘরে পলাইয়া দুয়ারে খিল দিল।

পাগল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তার সেই গাছতলায় সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে ফিরিয়া গেল। রাজ্যের ভাবনা সে ভাবিল। তার সমস্ত ব্যর্থ জীবনের

ব্যথার উপর তার আজকার সহসা ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তাহার হৃদয় চুরচুর করিয়া দিল। কী শুভক্ষণে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। কী পাপ ভালবাসা তার মনে জাগিয়াছে। কী সর্বনাশ সে করিতে বসিয়াছিল। এই যে নারী তার নিঃসঙ্গ জীবনে দয়া দিয়া সেবা দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছে, তাকে সে বীভৎসভাবে প্রেম নিবেদন করিতে গিয়া কী যাতনা দিয়াছে। হায় কেন তার জ্ঞান হইল। কেন তার সঙ্গে সঙ্গে এমন দুর্মতি তার কাঁধে ভর করিল।

তার স্নেহময়ী সেবাময়ী দেবী স্বরূপিনী শুশ্রূষাকারিণীকে আর সে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে?

পরের দিন সকলে দেখিল পাগলের দেহ সেই অশ্বত্থ গাছের ডালে ঝুলিতেছে। তার পরনে সেই পুরাতন মলিন বসন, গলায় বাঁধা সরমার দেওয়া সেই বড়ো কাপড়খানা।

সবাই দেখিয়া আহা উহু করিল। সরমা মাথা চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল—হায়, সে-ই যে কাপড়খানা দিয়া পাগলকে মারিবার উপায় করিয়া দিয়াছে!

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪—) ॥ ঝড়
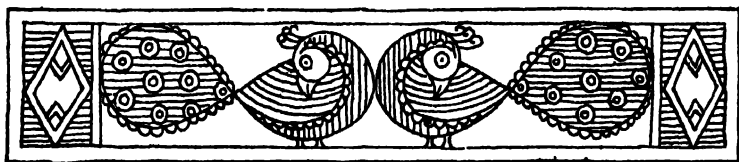
বেশ মনে পড়ে, সে-ও এমনি ঝড়ের রাত! চারিধারে বাতাসের এমনি গর্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি! পনেরো বছরের কথা—তবু মনে হয়, যেন সে কালকের ঘটনা! সেই রাতটিকে যদি আমার সর্বস্ব দিয়েও আজ ফেরাতে পারতুম।

বাবা আমার মস্ত জমিদার। মান-সম্ভ্রম, আদব-কায়দার দিকে পুরোদস্তুর তাঁর নজর ছিল—আমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। সকলে বলত, হাঁ, বাপকা বেটী। মা বলতেন, বাপের অহংকারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে হয়। মেয়েমানুষের পক্ষে ও জিনিসটা যে ভারী সর্বনেশে!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝছি, আমার স্নেহময়ী মার সে কথাটুকু কত খাঁটি। মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে কেন অত তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে। যাবার বেলায় কেন মা, তোমার এই দুর্দান্ত মেয়েটিকে তার সব অহংকার সব গর্ব চূর্ণ করবার মন্ত্রটুকু শিখিয়ে দিয়ে গেলে না? তাহলে যে আজ তাকে বুকের মধ্যে এমন বেদনা নিয়ে······

সেই কথাই বলতে বসেছি। কোনোখানে এতটুকু গোপনতা রাখব না। মানুষের কাছে আমি বিচার চাইতে আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। রাখা-ঢাকার ফাঁকি তো আর নিজের মনের সঙ্গে চলে না।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার লক্ষ্মী মা হঠাৎ একদিন বাড়িটায় কান্নার রোল তুলে বিদায় নিলেন। বাবা ছিলেন পুরুষ। তিনি সংসারী জীবের এই মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য জেনে মিথ্যা শোকের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন না। তিনি তাঁর জমিদারীর কাজকর্ম—পথ-ঘাট তৈরি, খাজনা আদায়, বাকি বকেয়া উসুলের দরুন বেয়াদব প্রজাকে শায়েস্তা করা প্রভৃতি বেশ যথানিয়মেই করতে লাগলেন।

দেখে সকলে বললে, মার মৃত্যুর পূর্বে যেমন, পরেও তেমনি তাঁর কাজকর্মের ধারাটি বেশ অবিচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে। আচার-ব্যবহার বা ভাব-ভঙ্গিতে কোথাও এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না যা থেকে বাহিরের লোকে কোনোরকম বিচ্ছেদ বা অমঙ্গলের আভাস পেতে পারে। বাড়ির গুরু-পুরোহিত শাস্ত্র আওড়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এই তো স্থিতধী মুনির লক্ষণ। আর একদল লোক আড়ালে বলাবলি করেছিল, মানুষটাকে কি ভগবান এক ফোঁটা প্রাণও দেননি। এ-কথাটা খুব অস্ফুটে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও আমার কানে পৌঁছুতে কিছুমাত্র বাধা পায়নি।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা মেয়ে। বোধহয় নিজের সম্বন্ধে এর বেশি আর কোনো কথা না বললেও চলে।

লেখা-পড়া গান বাজনা—এই সব নিয়ে বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলেছিলুম। বাহিরে বিশ্বের পানে চেয়ে দেখবার অবসর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এল যে বয়স আমার পনেরো পার হতে চলেছে। বাড়িতে এক বিধবা পিসী ছিলেন। তিনি বাবাকে শুনিয়ে বললেন, এ বয়সে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা কিছুতেই চলে না। ইহলোকে লোকলজ্জা তো আছেই, তা ছাড়া পরলোকেও নাকি বিস্তর লাঞ্ছনা জমা হচ্ছে।

বাবা হেসে বললেন, নীরু এখনও ছেলেমানুষ। ওর যখন জমিদারী চালাবার মতো বুদ্ধি হবে, তখন ওর বিয়ে দেব।

পিসী বললেন, শোনো কথা। মেয়েমানুষ আবার জমিদারী চালাবে কি রকম? তার চেয়ে নয় তোমাদের ঐ লেখাপড়া-জানা শান্ত শিষ্ট সুন্দর একটি ছেলে দেখেই বিয়ে দাও। সেও তোমার বশে তোমারই ঘরে থাকবে—জমিদারীও বজায় রাখবে।

বাবা বললেন, বেশি নিরীহ লোক নীরুর সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসী বললেন, তা ঠিক। যে ধিঙ্গি মেয়ে!

পিসীর মুখ গম্ভীর হল, বাবা চুপ করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

বিয়ে!

এক গা গহনা পরে আধ হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে মাটির পুতুলের

মতো জড়-ভরতটি হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা তো। পরের ইশারায় নড়া-চড়া, খাওয়া-বসা, শোওয়া-দাঁড়ানো—সুখে হাসতে পাবো না, দুঃখে বুক ভেঙে গেলেও একফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার নেই—এই তো বাঙালীর বৌয়ের সুখের ছবি। কাজ নেই আমার অমন সোনার চাঁদ বরের আদরে ডুবে সংসার করা। যেমন আছি, আমি যেন এমনি থাকি—এই গান-গল্প, খেলা-ধুলো, হাসিখুশি নিয়ে। কোনো নতুন লোকের নতুন সঙ্গ-সুখের স্বাদ আমি চাই না

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন একদিন বাবা বললেন, চ' নীরু একবার পশ্চিমে ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চলো।

দিল্লী, আগ্রা, লখ্‌নৌ, প্রয়াগ নানান দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কাশীতে আস্তানা পাতলুম। তীর্থ বলে যে কাশীর উপর টান পড়ল, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। জানি না বাবা কোনোদিন বিশ্বনাথ দর্শনে গেছলেন কিনা--তবে আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। দেবতাকে প্রণাম করতে যাব বলে যাইনি, একথা স্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি কেউ নাস্তিক বলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে মুখ ফেরান, তাহলে নিরুপায়। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি। আর বলেছি তো কারো বিচারের প্রত্যাশী হয়ে আমি নিজের এ কাহিনী আজ বলতে বসিনি। আমি গেছলুম মন্দির দেখতে—শুধু সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার কৌতূহল নিয়ে।

এবং এই যে কাশীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা শিবত্বপ্রাপ্তির লোভে নয়। বাবার এক বন্ধু জুটে গেলেন, ছেলেবেলায় কবে নাকি দুজনে একসঙ্গে কলকাতার কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন ; ভাব ছিল, আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে দুজনে এই কাশীতে দেখা। তাঁরই বন্ধুত্বের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীরু মা, এখানে আর কিছুদিন থেকে যাই।

ঘুরে ঘুরে আমিও একটু শ্রান্ত হয়েছিলুম, বললুম, বেশ।

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিশুবাবু। বিশুবাবু লোকটি ভারী অদ্ভুত ধরনের। আর্যামির গর্বে তিনি এমনই আত্মহারা যে, পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুকুর-বিড়ালের সামিল বলেই তিনি মনে করতেন।

বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলত। বাবা যখন সাংসারিক সচ্ছলতা বা নানাবিধ

আধিভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিশুবাবুর তর্কে আধ্যাত্মিক আগুন এমনি তীব্র তেজে জলে উঠত যে, তাঁর দিকে বেশি এগিয়ে যাওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল না। কারণ বিশুবাবুর তর্কে আগুন যতখানি জ্বলত, গালাগালের ধোঁয়া তার চেয়ে ঢের বেশি উঠত। সে ধোঁয়ায় তাঁর প্রতিপক্ষের চোখের জল বার করিয়ে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক-আধদিন আড়াল থেকে তাঁর তর্ক-যুক্তি শুনতুম—কিন্তু কোনো দিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বিশুবাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে মন আমার অশ্রদ্ধায় ভরে উঠত।

এই তর্কে এক-আধদিন আবার বিশুবাবুর ভাগ্নে তিনকড়ি খুব মৃদু-মন্দ ছন্দে সুর মেলাতো। তবে তিনকড়ির বয়স ছিল কাঁচা, কাজেই আর্যবংশাবতংস এমন মাতুলের যুক্তিধারা সে বেচারা তেমন পরমানন্দে পান করতে পারত না। ফলে অনেক সময়েই ঘটত এই যে, তর্কের গোড়ায় মাতুলকে অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ বরাবর তিনকড়ি বাবার যুক্তির স্রোতে ভেসে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিত। তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা বাতুলের মতো হয়ে উঠত। আমি নেপথ্যে বসে এদের কাণ্ড দেখে হেসে সারা হতুম।

একদিন এই তর্কের মুখে ভাগ্নের উপর চটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, তোমার মাথায় যদি এমন সব ম্লেচ্ছ ভাব তাল পাকাতে থাকে, তাহলে তোমায় আমার কাছে বাস করতে দেওয়া তো নিরাপদ নয়।

এই আকস্মিক রসভঙ্গে তিনকড়ি একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাবা কোনোমতে গোল থামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাঁধনটুকু অটুট রাখলেন।

এরপর কথায় কথায় বাবা একদিন বললেন, বুঝলি নীরু, এই বিশুটা পাগল। এদিকে তো আমাদের চালচলন পছন্দ হয় না—তবু বলে কি জানিস্—বলে, ঐ তিনকড়ির সঙ্গে যদি তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই। তিনকড়িরও একটা হিল্লে হয়, তাছাড়া—

আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। কী আশ্চর্য আজগুবী সাধ! স্পর্ধাও কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝেছি, তিনকড়িকে বাড়িতে রাখতে বিশুর আর তেমন ইচ্ছা নেই।

ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে চাড় আছে—বিশু বলে, যা হোক কোনো উপায় করতে লেগে যা।

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে গেলেন। আমিও তাতে কোনো রকম সায় বা সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন কিছু দেখি না। লোকটি নেহাত মন্দ নয়। বাহিরের চেহারা প্রভৃতি ভদ্র সমাজে চলবার মতো—কিন্তু বড়ো গরিব সে। যাক, কাজ কি আমার মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে।

এরপর একদিন মজার ঘটনা ঘটল।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন দুপুর থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। আমি তা গ্রাহ্য না করে চিরপ্রথামতো বেড়াতে বেরুলুম।

কাশীতে স্ত্রীজাতির মস্ত একটা স্বাধীনতা আছে—এ জন্য হে তীর্থ, নমো নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে এখানে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে তাদের নারীজন্ম কতক সার্থক করতে পায়।

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে অনেকগুলো গলি ঘুঁজি পার হয়ে বেণী-মাধবের ধ্বজায় এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। ধ্বজার উপর থেকে ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম। রামনগর থেকে অসি অবধি গঙ্গার উপর দিয়ে এপার-ওপার জুড়ে কে যেন মস্ত একটা স্বচ্ছ বালির দেওয়াল তুলে দিয়েছে। আমার হাতে একখানা রুমাল ছিল—দমকা বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে কোথায় চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু হু করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। তখন ভাবলুম, না, বাড়ি যাই। বেণীমাধব থেকে নেমে আবার গলি ভেঙে একেবারে দশাশ্বমেধের কাছে এসে পৌছুলুম। মাথার উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে। দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে কী রকম একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় ওপার থেকে অদ্ভুত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসছে। আমি বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। পথে না আছে একখানা এক্কা, না গাড়ি। খানিক আসতে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা ঝরতে শুরু হল। গায়ে যেন হাজার তীর ফুটছিল। আমি আরো জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও আরো বেড়ে উঠল। আমার গা ছমছম করতে লাগল। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃষ্টিতে আপনি পথে বেরিয়েছেন?

পা কেমন থমকে থেমে পড়ল। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি তিনকড়ি, মাথায় তার ছাতা।

কোনো জবাব দিলুম না। দরকার ছিল না। তিনকড়ি বললে, এই বৃষ্টি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাদটার নিচে দাঁড়াবেন চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।

তবুও কোনো কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথায় ধরল। অমন ভীষণ মুহূর্তেও আমার হাসি পেল। কী নির্লজ্জ রূপযৌবনলোলুপ পুরুষের যেচে এই সেবা দেবার প্রয়াস। অভদ্র দাসত্বপনা! কেউ তো তার এ সেবা চায় না। হায়রে এই পুরুষই আবার শাস্ত্র লিখে স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব খাটাতে চায়। জেনো তোমরা নিতান্ত দুর্বল দয়ার পাত্র বলেই স্ত্রীজাতি তোমাদের এইসব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো কথাটি কয় না—ঘাড় পেতে সমস্ত সহ্য করে যায়। একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্র ইঙ্গিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শাস্ত্র আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ।

হঠাৎ একটা খেয়াল হল। সামনেই দেখি এক বড়ো গাছের নিচে খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট্ট আস্তানা। বোধহয় কোনো সন্ন্যাসী কোনো যোগের সুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন—এখন তাঁর সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেই টিনের ছাদ দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালুম। যতখানি পারে তিনকড়ি আমায় বৃষ্টির জল আর ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় ছাতা ঘিরে আড়াল তুলে দাঁড়াল। ঝড়ের তখন কী সে প্রচণ্ড বেগ—বৃষ্টিরও কী জোর! মাথার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ এক সময় তার খুঁটির মায়া ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হল। আমায় রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেললে। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল—তিনকড়ি শেষে টিনের ভার রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল।

ভালো গ্রহ। তাড়াতাড়ি আমি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাতে তার বেশ জখম। রক্ত পড়ছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃষ্টিতে ভেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলুম। তিনকড়ি ধুঁকছিল।

আমি বললুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন। পথে আরো

ঢের বিপদ ঘটতে পারে। দেখুন দিকি আমার জন্য নিজেকে একেবারে এতখানি ক্ষতবিক্ষত করে ফেললেন।

তিনকড়ি আমার পানে চাইল—বড়ো করুণ সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝলুম তা নয়। সে দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দমনীয় বিজয় স্পৃহা জাগিয়ে তুললে। একটু কৌতুক করবার ইচ্ছে হল। দৃষ্টিতে করুণা মাখিয়ে তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে মেঘের এই চপল লীলা, তার উপর এ কৌতুক। সে এক মারাত্মক ব্যাপার।

তিনকড়ি বোধহয় আমার চোখে সে সময় এমন কিছু দেখেছিল, যাতে তার সমস্ত সংকোচ চট করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠল, আপনার যে গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ। এর জন্য আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হল না। আদরের প্রত্যাশায় পোষা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায় তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইল।

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে চেপে আর-একবার ভালো করে জড়িয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আমি আপনাকে ভালবাসি, বড়ো ভালবাসি। জানি পাবার নয়, তবু আমার মনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েছে। চলুন বাড়ি যাই।

বলেই তাকে আর দ্বিতীয় কথাটি কইবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলুম। তিনকড়িও আমার পাছু পাছু আসতে লাগল।

বাড়ি ফিবে চা খেয়ে গরম কাপড় চোপড় পরে বিছানায় এসে বসলুম। ধবধব করছে নরম বিছানা। সামনের টেবিলে বাতি জ্বলছিল। সেই বাতির আলোয় হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, আজ আমার মতো সুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। এমন ঐশ্বর্য আমার, এমন বয়স, এমন রূপ। মানুষ এর বেশি কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মানুষের কামনা করবার মতো বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়ল। মাতুলের ভিক্ষা-অন্নে লালিত, নিতান্তই সে কৃপার পাত্র! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই। আজ ঐ মামা বিশ্বনাথ যদি তাকে পথে বার করে

দেয়, আজ, এই রাত্রে—এই ঝড়বৃষ্টির পরে বাহিরের পথঘাট যখন অত্যন্ত কদর্য বিশ্রী হয়ে আছে—তাহলে এই কদর্য পথে-ঘাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

সামনে প্রকাণ্ড আয়না ছিল—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে চেঁচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ মূর্তি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে। বেচারা, বেচারা তিনকড়ি!

মন যখন এমনি গর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে বলে উঠল—এই তো রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বসে আছিস্—কে এল রে তোর কুঞ্জদ্বারে, কে তোর স্তুতিগান শোনাতে এল। আর এই তিনকড়ি, এ মানুষ!

মন আবার চোখ রাঙিয়ে উঠল, বললে, কী! আমি রাজার মেয়ে আর ঐ তিনকড়ি পথের ভিখিরি। সে আমায় পুজো করতে পারে, কিন্তু—

ভাবনার আর অন্ত রইলো না। হু হু করে যা-তা ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে।

কিসেরই যে ছাইপাঁশ ভাবনা। হাসি পেল। আমি শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কিন্তু সেই এক স্বর কানের কাছে বাজতে লাগল, ভালবাসি, ভালবাসি, ওগো বড়ো ভালবাসি।

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন বোধ হল। জোর করে চাবুক মেরে তাকে সিধে করলুম। তারপর কারা দু-দলে মিলে মনের মধ্যে এক বিষম লড়াই বাধিয়ে দিলে। অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা যাই চলো, বাবা, এখানে আর ভালো লাগছে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা আছে মা।—

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা! ও আমায় বড্ড ধরেছে। লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হতে চায়, কিন্তু অর্থপিশাচ মামা তার জন্য আর একটা কানা-কড়িও খরচ করতে রাজী নয়। সে বলে, কাশী হেন স্থান, যাত্রী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি তাতে রাজী নয়। সে বলে, তার মার যা গহনাপত্র ছিল, সেগুলো দাও, তা বিক্রি করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে দেছে, বলে, গহনা আবার কি! তাই বেচারা আমায় এসে ধরেছে। কি বলিস্ মা?

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। আবার সেই তিনকড়ি। যার জন্য মনের সঙ্গে অহরহ এই যুদ্ধ চলেছে—যার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই, এমনি করে ভূতের মতো সে সঙ্গ নেবে। না কখনো না। কে তিনকড়ি—সে আমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা। না, সে কেউ নয়, কেউ নয়। হতভাগা বেচারা, পথের এক সামান্য পথিক সে।

বাবা আবার বললেন, তাহলে কি বলিস্ মা?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে চাও নাকি?

বাবা বললেন, তুই যা বলিস্ তাই করি—

ইচ্ছা হল বাবাকে বলি, আর ফ্যাসাদ জড়িয়ো না বাবা। কিন্তু গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, বেশ, কিন্তু আমাদের একসঙ্গে থাকা হবে না, তা বলে রাখছি। কোথাকার কে, কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধহয় মন্দ হবে না। ছেলে ভালো, তার মামার মতো নয়। তবে হ্যাঁ এক বাড়িতে থাকা হয় না—কেননা আমি আজ কোথায় থাকি, কাল কোথায় যাই, ঠিক নেই—তার চেয়ে ওকে মাসে মাসে বরং কিছু করে দেব, ও কলকাতায় গিয়ে মেসে থেকে পড়ুক। কেমন?

আমি বললুম, বেশ—তাহলে ওকে কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে আরো ক-দিন মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে তারপর কলকাতায় যাবো-খন।

কোথায় যেন আমার বাধছিল। গা ছমছম করছিল। তিনকড়ির সঙ্গে আর না দেখা হয়। একটু ভয়ও হচ্ছিল। কিন্তু না কিসের ভয়?—আমি রাজার মেয়ে, তার উপর এই রূপ, এই বয়স! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের সুর তুলবে, আর অমনি আমি—না, না, কখনো না!

তারপর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠল। আমরা তখন কলকাতার বাড়িতে। অজস্র ফুলের গন্ধে, পাখির গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমারোহ করে আমার হৃদয়-রাজ্যেশ্বর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্দীর রায় বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ যুবার হাতে বাবা আনন্দাশ্রু চোখে আমায় সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো, গান-বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অসহ্য সুখের সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠল। সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হল, মস্ত একজন সহায় পেলুম, বন্ধু পেলুম, স্বামী, স্বামী,

স্বামী। মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখ-দুঃখ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে আমার প্রাণ কৃতার্থ হল। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ব মায়াকুঞ্জ আমার চোখের সামনে ধরে দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মতো অজস্রভাবে অপরূপ শোভায় ফুটে উঠল।

কিন্তু হায়রে, সে কতক্ষণের জন্য!

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের গহনা পরে মনের মধ্যে প্রেমের মণিদীপ জ্বেলে ফুলের বাগান সাজিয়ে বসেছিলুম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাব। অস্থির পুলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল—এমন সময় আমার স্বামী দেবতা দেখা দিলেন। হায়, ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে নয়, শান্তি, আরাম, আশ্বাসভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয়—চোখ তাঁর জবাফুলের মতো লাল, পা টলমল করছে, মুখে বিশ্রী গন্ধ, মদ খেয়ে মাতাল। নিমেষে যেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠল—তার দাপটে আমার প্রাণের মধ্যে সে দীপের আলো নিভে গেল—অত সাধের ফুলের রাশ ছিঁড়ে কোথায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। সুন্দর মায়াকুঞ্জ চোখের পলকে শ্মশানের মতো বীভৎস হয়ে উঠল। অসহ্য জ্বালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাতিয়ে তুললে। ঘৃণায় আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে ফেললুম, মাথাটা দপদপ করে উঠল। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিল, জোরে খুলে ফেললুম। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে যেন অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দিলে। দূর হতে কার বাঁশিতে সাহানার সুর ভেসে আসছিল, আকাশে একরাশ নক্ষত্র —মনে হল, সবাই হাসছে, সবার মুখে তীব্র বিদ্রূপ। ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জ্বালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জ্বালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হত।

দেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁচল টেনে জড়ানো গলায় ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী—

এক ঝটকায় আঁচল টেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালুম। মাতাল অবাক হয়ে চেয়ে রইল—খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামী-সম্ভাষণ এই প্রথম, এই শেষ!

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। বাড়ি এসে বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাব না বাবা। যদি আর আমায় সেখানে পাঠাও, আমি আত্মহত্যা করব।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এমন আগুন

জলছিল যে তার ঝাঁজ অবধি আমার চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল। আমি বললুম, এক পাষণ্ড মাতাল—

কেঁদে ফেললুম। বাবারও চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বাবার মুখে একটিও কথা ফুটল না।

তারপর আবার সেই পুরনো জীবনধারায় গা ঢেলে দিলুম। বাপে-মেয়েতে নানান দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে বেড়ানো।

দেবতার কাছ থেকে এত্তেলা এল, পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তাঁরা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জি হয় দাওগে।

তাঁরা আবার শাসালেন, আদালত আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো।

তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু এই নানান দেশে ঘুরে বেড়িয়ে, নর-নারীর এই বিপুল মেলায়—তাদের সুখের ঢেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক বিষম দোল দিয়ে যেত। পাখির গান, ফুলের গন্ধ, এসব তেমনি আছে—তবে আমার প্রাণে তারা আর কোনো সাড়া জাগায় না। বসন্ত তেমনি আসে, চাঁদ তেমনি আলোর ঢেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব নির্জীব, সব জড়। কুয়াশায় আগাগোড়া কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে দিয়েছে। এক-একবার সেই কবেকার ঝড়ের রাত্রির কথা মনে পড়ত। সেই বেচারা তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনাভরা আবেদন। সে যে একটা স্বপ্ন! মনকে চাবকে বললুম, খবরদার! তোর আপন তেজে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না, তোর। ভেঙে যাস্ যদি যা—কিন্তু মচকে পড়িস্ নে……

এমনি বিপুল দ্বন্দ্বে মনকে নিয়ে যখন অস্থির, তখন কোথা থেকে বুকে বাজ পড়ল। বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃশ্যলোকে চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ একা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়! আমার অগাধ ঐশ্বর্য—রাজার ঐশ্বর্য। দু-দিন পরে আবার এক খবর এল। আমার স্বামীদেবতা এক গণিকার গৃহে মজলিস করছিলেন—শেষে একসময়ে মদের নেশায় ভালবাসার সীমা দেখাতে

গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন। মস্ত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল। বাঃ। আমার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। চমৎকার।

শ্রান্ত মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ি ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতাপত্র থেকে মহাল পর্যন্ত নিজে দেখে তদ্‌বির করতে লাগলুম। এক-এক সময় চোখের সামনে পড়ত, গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী ক্ষেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শুধু খাটছে, খাটছে, খাটছে! তার স্ত্রী ছোট ছেলে কাঁকালে করে থালায় ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এল। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্ট ছেলেটিকে একটু নাড়াচাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ি ফিরে গেল, স্বামী ক্ষেতে খাটতে লাগল। কোথাও বা স্বামী কাজে বেরুচ্ছে, আর তার তরুণী স্ত্রী লোকচক্ষু বাঁচিয়ে ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে। অনাদি কালের সংসার তার সরল ধারাতে বয়ে চলেছে।

দেখে মন আমার হু হু করে উঠত।

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের ভীষণ যুদ্ধ। ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়েছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছিল। বৃদ্ধ নায়েব মশায় এসে বললেন, উকিলবাবু এসেছেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহার গাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিল—কাল তাদের নামে নালিশ রুজু না করলে সব তামাদি হয়ে যাবে। তাই আর্জি তৈরি করে আপনাকে তা বুঝিয়ে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেছেন।

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

নায়েব দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছিল। আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এস্টেটের সমস্ত কাজকর্ম সে-ই দেখছে।

উঠে একটা ইজি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে দাঁড়াল। নিষ্ফলতার তীব্র রোষে মন আমার মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। তারপর হাসিমুখে সহজ সুরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি বললে, এই আর্জিগুলো এনেছি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়ো।

তিনকড়ি পড়তে লাগল। আমার কানে তার কিছু গেল না। শুধু জাগছিল এক বিষম ঝড়ের হু হু গর্জন। আর তারি ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছিল অত্যন্ত কোমল স্বরে এক করুণ আবেদন, ভালবাসি, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি। কলের মতোই কতকগুলো সই করলুম। নায়েব মশায় আর্জিগুলো হাতে নিয়ে বললেন—আমি তাহলে তফসিলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

নায়েব মশায় চলে গেলেন।

তিনকড়ি চলে যাচ্ছিল। আমি বললুম, দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক আমার দুর দুর করে উঠল। আমি বললুম, আর কোনো কথা নেই তোমার?

না।

নিজের······কোনো কথা নয়?

তিনকড়ি চুপ করে রইল। আমি বললুম, এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট করে এসেছো। এই জল-ঝড়—কোনো কথা নেই?

একটা নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না। তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে নির্বাক—মুখ তার মাটির পানে। খুব সাবধানে ছোট একটা নিশ্বাস চেপে আমি বললুম, বাড়ির সব খবর ভালো? বৌ ভালো আছে?

হ্যাঁ।

যাও।

তিনকড়ি চলে গেল। এই সেই তিনকড়ি। একটা কদর্য মাংসপিণ্ড—বিয়ে করে পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করছে।

আর আমি? শুধু সেই কবেকার এক ঝড়কে বুকের মধ্যে পুষে রেখেছি।

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর সে তেজ, সে গর্ব! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখের জল আর কোনো মতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ির দোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে বাহিরে উদ্দাম ঝড় হা-হা করে গর্জে ফিরতে লাগল।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ॥ আশা এবং আমি
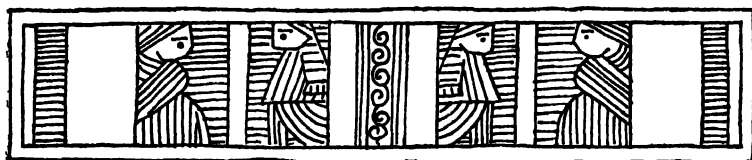
পাশের বাড়ির ষোড়শী কুমারী শ্রীমতী আশাকে আমি, শ্রীবিভূতি, একেবারে নিজস্ব করিয়া পাইতে চাই—বিবাহ হইতে পারে না, তবু চাই।······বিবাহ তো সেই ব্যাপারই। বিবাহ একটি নারী এবং একটি পুরুষকে পরস্পরের একেবারে নিজস্ব করিয়া পাওয়াইয়া দেয়।

আশা আমার প্রতিবেশিনী—

আর, খুব নিকটে সে বাস করে, কিন্তু কেবল ঐ অবারিত অবস্থিতির সুযোগই আমার এই পাইতে চাওয়ার কারণ নয়—কারণ তদতিরিক্ত এবং নিগূঢ়······ কারণ এই যে, আশার সঙ্গে দৃষ্টিতে দৃষ্টি সন্নদ্ধ হইয়া এবং পুনঃ পুনঃ সপ্রীতি আর সম্মতিসূচক দৃষ্টিবিনিময়ের পর আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত, ভবিষ্যৎ অন্তহীন ও প্রোজ্জ্বল, আর চিন্তারাজ্য সুসংবদ্ধ ভাবগৌরবে অভূতপূর্বভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে······

ভাবিয়া দেখিয়াছি, সামগ্রীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি—মানুষের মনে চিরকাল তা দুর্বার হইয়া অবস্থান করে। শিশুর কথাই সর্বাগ্রে স্মরণ হয়ঃ মায়ের পেটে ভাই কি বোন জন্মিলে তার প্রতি শিশুর ঈর্ষা কত! এত ঈর্ষা যে, অনিষ্টের ভয়ে লোকে সাবধান হয়। মা একেবারে নিজস্ব হইয়া ছিলেন; আর একজন আসিয়া সেই অধিকারে চ্যুত আর সেই আনন্দে বঞ্চিত করিবে, এই ভয়েই না শিশুর ঈর্ষা! মাতৃস্নেহের রস কি কি উপাদানে প্রস্তুত তা জানি না, কিন্তু শিশুর মতো নিজস্ব মায়ের কেউ নয় বলিয়াই শিশুর প্রতি মায়ের এত টান······

উদাহরণ আরো আছে—

এবং অনুভব সবাই করে যে, লোভের বস্তুর ভিতর মানুষের সেই সত্তা অদম্য হইয়া প্রবেশ করে, নানা দিকে প্রসারিত সত্তার যে অংশটুকু তার প্রিয়তম—

যাকে সে কায়মনোবাক্যে লালন করিয়া সঞ্জীবিত তুষ্ট তৃপ্ত সুখী করিতে চায় —না পাইলে মনে হয়, সত্তার শ্রেষ্ঠতম অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া, শূন্যে মিলাইয়া, জীবনধারণের উপকরণ আর আকাঙ্ক্ষা ঠিক ততখানি নষ্ট হইয়া গেল।

এ সংসার ভোজবাজি, মায়ার খেলা, দারাপুত্র পরিবার কেউ কারো নয় ইত্যাদি খেদের মূলেই আছে এ অনুভূতি যে, নিজস্ব কিছুই হয় নাই, সত্তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই, বঞ্চিত হইয়াছি—অতএব কেউ কাহারো নহে, আসল বস্তু কিছুই নাই। এই যন্ত্রণাকর বঞ্চনা আর হতাশার যারা মূল, অর্থাৎ দেখা যায় যারা নিজস্ব হয় না, তাহাদের কেবল পর নয়, পরিত্যাজ্য শত্রু মনে করিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণত কেউ তা করে না—উপরন্তু নিজস্ব পাওয়ার লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে খুনোখুনি করে—বাধায় যুদ্ধ।

এই সব চিন্তা অকাট্য হইয়া আমার মনে জাগে—চিন্তাগুলিকে আমি ভালবাসি।

বিবাহ আমি করি নাই; কিন্তু জানি যে, বিবাহ অতিশয় ভদ্র, সামাজিক এবং প্রচণ্ড রবে বিঘোষিত পবিত্র অনুষ্ঠান। কিন্তু ইহাও জানি যে, মূল ইচ্ছাটা ধর্মপালন নয়, নিজস্ব করিয়া পাওয়ার। সবাই জানে যে, নিজস্ব করিবার উদ্যমের নামই প্রেমাকাঙ্ক্ষা, নিজস্ব হইয়া থাকার নামই দাম্পত্য ধর্মপালন এবং নিজস্ব করিয়া পাইবার পর আচরণের বাহিরের পিঠটা মার্জিত রাখিতে পারিলেই লোকে দেখে প্রণয় হইতে দ্যুতি নির্গত হইয়া স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছে······

কিন্তু তর্কাতীত অব্যর্থ কথা এই যে, আশার প্রতি অঙ্গের জন্য আমার প্রতি অঙ্গ কাঁদিতেছে। কেবল কাঁদিতেছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়—বলিতে হইবে যে, কান্নার সঙ্গে প্রতি অঙ্গ কাঁপিতেছে, তীক্ষ্ণ উদ্দাম হইয়া উঠিতেছে, এপাশ ওপাশ করিতেছে······

আশাকে আমি ভালবাসি, যদি ভালবাসার নাম হয় তার দেহটাকে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার ইচ্ছা। দৈহিকভাবে ধরা দিবার আগে ছোটে মন—মনে মন বাঁধা পড়িয়া কেহ হয় পদলুণ্ঠিত বা কণ্ঠলগ্ন। আশার মন আমি পাইয়াছি, আবিষ্কারের পর অধিকার করিয়াছি; কিন্তু নিরাকার মন কিছুমাত্র উপভোগ্য নয় যদি রূপময় ভোগায়তন আর সুখাবহ বস্তুগৌরবে গরীয়ান দেহ থাকে স্পর্শাতীত অনধিগম্য হইয়া······

সে বড়ো যন্ত্রণা।

মনে পড়ে জীবনের আগেকার কথা। বর্তমানে আমার চিন্তারাজ্য সমৃদ্ধ বটে কিন্তু ভৌতিক রাজ্য সমৃদ্ধ কোনো কালেই ছিল না, এখনও নয় ; তার মানে এই যে, চিরকালই আমি সামগ্রীহীন, বুভুক্ষু ; নিজস্ব করিয়া আজ পর্যন্ত এমন কিছু পাই নাই যার স্মৃতি স্মৃতির রাজ্য সমৃদ্ধ করিতে পারে, এমন কি উৎফুল্লকর হইতে পারে—

শৈশবের কথা মনে নাই—

শৈশবোত্তীর্ণ বয়সে খেলার সাথী মিলিয়াছিল—নিজস্ব সম্পদ হিসাবে তারা গণ্য হইলে অন্তরীক্ষবিহারী পক্ষীও আমাদের জীবনের সম্পদ। কৈশোরে পঠদ্দশায়—কই কিছুই তো মনে পড়ে না! এমন কোনো অতি সুন্দর দুর্লভ মূল্যবান সামগ্রী এমন অবিসংবাদিতভাবে আমার অধিকারভুক্ত হইয়া যায় নাই যাহাকে স্মরণ করিলে মন সরস হয়।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরে প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত হইতে থাকে, মায়ের জন্য প্রকোষ্ঠ, পিতার জন্য, সহোদর-সহোদরার জন্য, স্ত্রীর জন্য, সন্তানের জন্য ইত্যাদি বহু······

আমার অন্তরেও কতকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল—আর একটি প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়া উঠিল আশার জন্য···অনুত্তরণীয়, অনবদ্য, নিভৃতির সুখে শিহরিত, মধুস্রাবী সে প্রকোষ্ঠে—সকল প্রকোষ্ঠের মধ্যমণি—

এই প্রকোষ্ঠে আশা বাস করিতেছে···

আমার সকল শিরার টান সেই দিকে, সকল অমৃত রস প্রবেশ করিতেছে সেখানে, আমার সকল জগৎ মদাক্রান্ত হইয়া অবিশ্রান্ত গুঞ্জন করিতেছে তাহাকেই ঘিরিয়া—

এবং আমার চিন্তারাজ্য ভাবগৌরবে আরো সমৃদ্ধ হইতেছে সেই উপলক্ষেই···

পাপ পুণ্য বলিয়া সংসারে কিছু নাই। মানুষের সহজাত আর সংবিতগত সংস্কার অপরিহার্য হইয়া পাপ-পুণ্যের যে বিচার চলিয়া আসিতেছে তাহা শোনা বা পড়া কথার ছাঁচে গড়া সংস্কার মাত্র। পাপ করিলে নরক, পুণ্য করিলে স্বর্গ ; কিন্তু একটু চোখ খুলিলেই দেখা যাইবে যে স্বর্গ নরক ইহলোকেরই রূপান্তর ছাড়া কিছুই নয়। এমন হাস্যোদ্দীপক কল্পনা মানুষ কোন্ বুদ্ধিতে করিয়াছিল জানি না। নরকে প্রচণ্ড দুস্তর অগ্নি আছে অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিপ্রবাহ, অগ্নি শলাকা আছে। কারণ অগ্নির তাপ আমরা সহ্য করিতে পারি না। নরকে

কণ্টক আছে, অঙ্কুশ আছে, কারণ এগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আর শরীরে বিঁধিলে এখানেও তা যন্ত্রণাদায়ক। তবে স্বীকার করি যে, কাহাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার অধিকারে বঞ্চিত করিলে তাহাই হয় নিয়মভঙ্গের কাজ, সুতরাং আপত্তিজনক। কিন্তু আমি চিন্তাপূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, আশাকে যে ব্যক্তি লোকাচার পালন করিয়া নিজস্ব করিয়া লইবে সে-ই করিবে নিয়মভঙ্গ অর্থাৎ অধিকারে হস্তক্ষেপ, কারণ আশার ইচ্ছা আমাকে পাওয়ার এবং সেই কারণে আশার উপরে আমার অধিকার জন্মিয়াছে। সতেজেই বলিতে পারি, আমার আত্মা তাহাকে চায়, তাহার আত্মা আমাকে চায়···

আত্মায় নাকি ভগবানের বিভূতি বিরাজ করে—আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়, কিংবা আসামী হইয়া বিচারের পর দণ্ডভোগ করে। মিথ্যা কথা। যান্ত্রিক যে ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতম ও জটিলতম বিলয় বিকাশ উৎপত্তি রক্ষণ পুষ্টি শোধন সঞ্চালন ধ্বংস অবিরাম চলিতেছে, আত্মাও সেই বিস্ময়কর সচলকারী যন্ত্রেরই সৃষ্ট একটি পদার্থ—তা এত সূক্ষ্ম স্নায়ুসমষ্টি যে তার অবয়ব চোখে দেখা যায় না। কেবল মস্তিষ্ক কি হাত পা কি হৃৎপিণ্ড দেহের বাহিরে যাইয়া যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি পারে না আত্মা—মৃত্যুকালে সে বায়ুর মতো কি পুত্তলিকার আকারে নির্গত হইয়া যায় না—জীবনবাহী অপরাপর যন্ত্রের মতো তার সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য স্নায়ুসমষ্টিরও ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়······

এই যদি হয় ব্যাপার, তবে আত্মার অধোগমন, উর্ধ্বে প্রয়াণ, নরকস্থ হওয়া, স্বর্গবাস ও যোনিভ্রমণের ক্লেশ ইত্যাদি উত্তর ফল বা ভবিষ্যৎ ঘটনার সম্ভাবনা রহিল কই !

কাজেই ওসব ভয় করি না—

কেবল আকাঙ্ক্ষা করি আশাকে, সশরীরে নিজস্ব করিয়া পাওয়ার। অন্য একটি দিকে দৃষ্টি ফেলিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিয়া একান্ত আমারই জন্য পৃথিবীর যে স্থানটুকু ছাড়িয়া দেওয়া আছে তা সংকীর্ণ—এত সংকীর্ণ যে চলিতে ফিরিতে গায়ে ঘর্ষণ লাগে; বাতাসের অভাবে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে······

তারপর অধিকতর স্বচ্ছভাবে আরো চিন্তাশীল হইলে ইহাও অনুভূতিতে পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়া গেল যে, আশাকে পাইলে আমি বিচরণের যে ক্ষেত্র পাইব

তাহার বিস্তৃতির সীমা নাই; আকাশে পাখির উড্ডয়নের স্থান যেমন অসীম আমিও পাইব তেমনি অসীমতা—উদ্দাম সঞ্চরণের অনন্ত অবকাশ, আনন্দ, আর স্থান।

আরো খানকতক পত্রবিনিময়ের পর আশাকে লইয়া আমি পলায়ন করিলাম—দূর শূন্য হইতে একাগ্র শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে কপোতীর মাংস আমি প্রাণপণে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম তাহা আমার নিজস্ব হইল—আশা তাহার মাংসপুঞ্জ নৈবেদ্যের ফুলের মতো লঘু আর ভক্তিপূত করিয়া আমার সেবার্থে নিবেদন করিয়া দিল......

আশা তেমন সুন্দরী নয়; তার প্রতি অসীম পক্ষপাতিত্ব করিয়াও বলা চলে না যে, সে গৌরবর্ণা আর নাক তার ভালো। আশার চোখের চাহনি যেন ঢিলে, একটু বিব্রত বিষণ্ন ধরনের; কিন্তু হাসিলে তার চোখ ভারী মধুরভাবে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে; ঠোঁট দুখানা লাল টুকটুকে—যখন কথা বলে তখন সাদা দাঁতের পৃষ্ঠপটে সেই কথার লহরী ধাক্কা খাইয়া অধরে যেন জ্যোতির্ময় অমিয়-ধারা ঝরিতে থাকে।

কিন্তু আমার চাহিদা হিসাবে রূপ তেমন বিবেচ্য নয়, যেমন বিবেচ্য একটি আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রীকে, যৌবনপুষ্ট সুস্থ নিটোল দেহটাকে, আমি নিজস্ব করিয়া কতখানি পাইলাম।—হাস্যপূর্বক স্বীকার করিতেই হইবে যে, সেদিক দিয়া আশা আমাকে একবিন্দু অপরিতৃপ্ত রাখিল না—প্রথম দিনেই সে চমৎকার নিষ্ঠা আর শারীরিক প্রগলভ উৎসাহের সঙ্গে ধরা দিল...আমার মাংসলোলুপ আর বহুদিনের ক্ষুধাপীড়িত মনের সে ক্ষিপ্ত উল্লাস আর উৎক্ষেপের তাড়নায় পৃথিবী যেন শিবের তাণ্ডবে অন্ধকার হইয়া গেল...চৈতন্যে আগুন ধরিয়া গেল যেন...যেমন করিয়া ইক্ষুর রস মুচড়াইয়া বাহির করা হয় তেমনি করিয়া জীবনের সবটুকু রস নিংড়াইয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। আশাও তৃপ্ত দানশীল হইয়া আমাকে মুহুর্মুহুঃ ঝলকে ঝলকে অমৃত পান করাইয়া অজ্ঞান সমাধির পর যেন অমরত্ব দান করিল।

কিন্তু আমার চিত্ত যে এমন অব্যবস্থিত তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। সকালবেলা উঠিয়া দেখিলাম, রাত্রির জাগরণ আর অপরিমেয় উৎসবের পর সম্মুখে আতসবাজির ছাই ছাড়া কিছুই নাই, অর্থাৎ সকাল বেলা উঠিয়াই

আশার দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইল, বহুপূর্বেই জ্বলন্ত ইন্ধনে ভস্মসাৎ হইয়া কতকাল যে এই নারী আমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহা যেন মনে করিতেই পারি না—এ অতি পুরাতন; ইহাকে নিজস্ব করিবার উদ্দামতা একেবারে শান্ত নিমজ্জিত হইয়া গেছে; এবং আমার নিজস্ব হইয়া আমাকে যা দান করিবার ছিল তাহা নিংড়াইয়া নিঃশেষে দান করিয়া এ নিঃস্ব অসার অপ্রয়োজনীয় হইয়া গেছে……

মনে হইতেই ভারী চমকিয়া উঠিলাম।

কৈফিয়তস্বরূপে বলিতে পারা যায়, দূরবর্তিনী আশা যে স্বপ্নের সৃষ্টি করিত সে স্বপ্ন আর স্বপ্ন নয় এখন, জাগ্রত জগতের মূর্তিমান ব্যাপার। বাতায়নে, শার্সির কাঁচের ওপিঠে দাঁড়াইয়া অর্থাৎ একটা অজ্ঞাত লোক হইতে যে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া কল্পনার কারুকার্যবিশিষ্ট অপ্সরীর মতো আশা দুর্বার হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিত, ইন্দ্রজালের সে চাতুরী, কারুকার্য, কুহেলিকা আর চঞ্চল মায়া এখন বিতৃষ্ণাজনক আর কুরূপ স্থূল শরীরে সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আমার মন আমি জানি; তাই তো সব নয়!

সামগ্রীকে নিজস্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে কেমন স্বাভাবিক তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় পূর্বেই ব্যক্ত এবং ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু তখন বলি নাই যে, মানুষের মনের গতি স্বাভাবিকভাবেই যেমন জীর্ণ সংস্কারের দিকে, তেমনি নূতনের দিকেও থাকে—নিজস্ব করিয়া পাওয়ার মতো সামগ্রীকে পুরাতন মনে হইলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনূতন সামগ্রী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের কম প্রবল নয়। মনে মনে অবহিত হইয়া একটুখানি চেষ্টা করিলেই যে কোনো ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, শৈশব হইতেই মানুষ নিত্যনূতন পাওয়ার লোভে অস্থির আর অভ্যস্ত হইতে থাকে।

নূতন নূতন খেলনা পাইবার বায়না হইতে শুরু করিয়া পুরাতন বই টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন বই কিনিবার আনন্দ আমাদের মনে নাই কি! ছেলেবেলাকার নূতন কাপড় পাওয়ার আনন্দ নূতন কাপড় পরিলেই এখনো যেন জাগে……অভ্যাসটা যায় না—থাকেই। সেই শৈশবাগত অভ্যাসের বশেই মানুষ বেশি দামী জিনিস যা অকেজো হয় নাই তার বদলে অল্প দামের নূতন জিনিস আহরণ করিতে পারে; রঙ লাগাইয়া পুরাতনকে নূতন করে……

নূতন নূতন অলংকারে আর বস্ত্রে পুরুষ নারীকে সজ্জিত করে নূতন বস্তু পাইবার

আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত না হউক দমন করিবার অভিপ্রায়ে—সন্তান জন্মিলে স্ত্রীর প্রতি প্রণয় গাঢ়তর হয়, পুরুষ নূতন করিয়া আসক্ত হয়, স্ত্রীকে নূতন পরিবেশের অভ্যন্তরে নূতন রূপে পাইয়া।

এই কথাগুলি মিথ্যা বলিয়া কেহ অস্বীকার করিলেই মিথ্যা হইয়া যাইবে না ; কিন্তু আশা একদিনেই পুরাতন হইয়া উঠিবে, এবং তাহাকে লইয়া সীমাহীন উন্মুক্ত বিশ্ব-ভবনে বিহার আর বিচরণ করিবার উগ্র উষ্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছা একদিনেই এমন নিস্তেজ শীতল হইয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ভাবিতে যখন পারিলাম তখন বিস্ময়ের সীমা রহিল না—আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এমনি অভ্যাসের দাস!

কিন্তু আশাও বড়ো বেশি গা-ঘেঁষা—স্পর্শ ত্যাগ করিতে সে কিছুতেই দিবে না—

আমার গা নড়িলেই যেন আঁতকাইয়া ওঠে ; বলে—ও কি উঠছো যে?

বলি : উঠছিনে!

ঠেলিয়া যদি উঠিতে চাই তবে দু-হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আর্তস্বরে বলে,—কোথায় চললে ?

—এখানেই আছি, যাবো না কোথাও।

তারপর আশার আর্ততা দেখিয়া নিবিড় একটা মমতা জন্মে ; ঢোঁক গিলিয়া বলি—তোমাকে পেলাম, আশা!

আশা যেন ধন্য হইয়া যায়—

উদ্বেল আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া বলে—আমিও তোমাকে পেলাম। তুমি আর আমি……

যেন দুনিয়ায় কোথায় আর এমন কেউ নাই যাহাকে আশা আর আমি চাই। আমরা দুটিতে মিলিয়া একটি সত্তা।

আশাকে আবার মিষ্ট লাগে—হঠাৎ একটু যেন নূতন করিয়া তাহাকে পাই… পূর্বেই বলিয়াছি, আশাকে লইয়া পলায়ন করিবার পূর্বে আমার খুব প্রাণপ্রদ সতেজ উৎসাহের সহিত মনে হইত, এই বিপুল বিশ্বে স্বাধীন আনন্দে নৃত্য করিয়া বিচরণ করিব আশা আর আমি। সেও যে মনে মনে অত ব্যাপক আর প্রগাঢ় কল্পনা করিয়া বসিয়া আছে তাহা জানিতাম না।

তার মুখে 'তুমি আর আমি' শুনিয়া ভারী মুগ্ধ হইলাম। প্রেমের মন্ত্রশক্তিতে স্থান-কাল-বস্তু পুনরায় সীমাহীন হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হইল ; এবং তার

মুখের কথার মাধুরী মাখিয়া তার দেহ তৎক্ষণাৎ আমার চোখে মধুময় হইয়া উঠিল।

আশাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বলিলাম—হ্যাঁ, আশা, তুমি আর আমি।

আশা আমার বুকের উপর মুখ রাখিয়া গা ঢালিয়া দিল।

বৈকালে বলিলাম—আশা, চলো বেড়িয়ে আসি।

প্রস্তাবটা ভয়ংকর বা উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু আশা চমকিয়া উঠিল; বলিল: কোথায়?

—এই রাস্তায়।

—যদি তুমি হারিয়ে যাও! বলিয়া আশা অত্যন্ত ভীত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রকম দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

বলিলাম—না, না, হারাবো কেন? পাশাপাশি চলব দুজনে।

—চলো। বলিয়া আশা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রাস্তায় বাহির হইয়া কিন্তু ভারী বিড়ম্বনায় পড়িলাম—বলিয়াছিলাম, দুজনা পাশাপাশি চলিব, তাহা হইলেই হারাইবার ভয় থাকিবে না। কিন্তু কাজে-কর্মে দেখিলাম, কেবল পাশাপাশি চলিয়া আশা নিশ্চিন্ত নয়—সে আমার হাত ধরিতে চায়—জামা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিতে চায়!

তার হাত ছাড়াইয়া দিতে দিতে চলিলাম। বলিলাম—হাত ধরো না, জামাও ধরো না। লোকে তাকিয়ে দেখে হাসছে যে!

আশা বলিল—তা হাসুক, হাসলো তো বয়ে গেল। হারিয়ে গেলে এনে দেবে তারা?

কথা কহিলাম না।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি তো তাকিয়ে কিছুই দেখছো না আশা! কত নতুন নতুন, ভালো ভালো জিনিস রাস্তার দু-ধারে! ঘন ঘন আমার মুখের দিকে দেখছো কি?

—দেখছি বৈকি দোকানের জিনিস। কিছু জিজ্ঞাসা করছিনে তুমি যদি বিরক্ত হও।

—কিছু নেবে না?

—কী নেবো?

—কত জিনিস কত দোকান! কিছু কিনতে ইচ্ছে হয় তো বলো।

—উঁ হুঁ। তুমি আরো সরে এসো আমার কাছে—আমাদের ভেতর দিয়ে কাউকে যেতে দিও না—আমার ভারী গোলমাল লাগে। এত লোক এখানে!

আশার ইচ্ছা পালন করিলাম—তাহার আরো কাছে সরিয়া আসিলাম এবং এখানকার লোক সংখ্যায় এত কেন, এ বিস্ময়ের জবাব দিলাম না—আর অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার চিন্তারাজ্যের বিস্তৃতি সার্বভৌম পর্যায়ে উঠিয়া পুনরায় ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ হইতেছে।

বুঝিতে পারিলাম যে, দেহকে নিজস্ব করিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিকেও উপভোগ্য মনে না হইলে, আর, বুদ্ধিকেও বশবর্তিনী করিয়া তুলিতে না পারিলে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘটে না। প্রেম সংলগ্ন করিয়া রাখে সত্যই, সে সাধ্য তার আছে। কিন্তু ইহাও একটি সত্য যে, মিলনে বিরহে প্রেমের প্রকাশ যতই হৃদ্য হউক, সেই প্রকাশে অভিনবত্ব দেয় বুদ্ধি, দেহ নয়। যার বুদ্ধি নাই, সে পুত্তলিকার মতো একঘেয়ে। মানুষকে নিত্যই নূতন করিয়া তোলে তার বুদ্ধির দীপ্তি—বুদ্ধির দীপ্তিতেই ঘটে অপূর্বত্ব আর রূপান্তর; অপূর্ব রূপান্তর দেখিয়া জাগে বিস্ময় আর নিমেষে নিমেষে নূতন করিয়া পাওয়ার উল্লাস—তার কৌতুক· আর সত্তা ঝকমক করে বুদ্ধির দীপ্তিতেই, আসে রসজ্ঞান এবং আলাপ পরিবেশিত হয় রসপূর্ণ হইয়া।

আরও বুঝিলাম যে, পৃথিবী এখনো নীরস হইয়া পুরুষের পক্ষে বাসের অযোগ্য হয় নাই, নারীর ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে বলিয়া আর বুদ্ধি দিয়া নিজেকে সে সতর্ক শানিত স্বতন্ত্র আর সজ্জিত করিয়া রাখে বলিয়া।

কিন্তু আশার কেবল দেহই আছে, আর কিছুই নাই। খালি দেহকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তিষ্ঠিতে পারে কতক্ষণ!

আশাকে লইয়া পথে পথে প্রমোদ-ভ্রমণ শেষ হইল এবং তাহাকে লইয়া যখন বাসস্থানে ফিরিলাম তখন মনে মনে আমি তাহাকে চৌদ্দ আনা ত্যাগ করিয়াছি—উড্ডয়নশীল মন ভারাক্রান্ত হইয়া পাখা গুটাইতে বাধ্য হইয়াছে; পৃথিবীকে আশার দেহের সৌষ্ঠবে নবীন আর শ্রীযুক্ত আর দেহের আলোকে উৎফুল্ল উজ্জ্বল অন্তহীন আকাশ মনে হইতেছে না। তখন আশাকে মনে হইতেছে পিঞ্জর, আর নিজেকে মনে হইতেছে সেই পিঞ্জরে বন্দী!

কাল রাত্রে বসিয়া বসিয়া শুইয়া শুইয়া আশার সঙ্গে যত গল্প করিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা কোনোদিনই করিতে পারিব না—নেশার ঘোরে সেই অনর্গল আলাপ, আর আশার অর্ধোচ্চারিত কথা এত মধুর এমন নূতন এমনি প্রাণময় মনে হইয়াছিল যে নিজেরই দিক ঠিক রাখিতে পারি নাই—কৃতার্থতায় আর তৃপ্তিতে একশ বার মনে হইয়াছিল, পৃথিবীতে যদি কেহ সুখী থাকে তবে সে আমি·········

কিন্তু আজই, একটি অহোরাত্রেই, পৃথিবী যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া একটি জনমানবহীন শুষ্ক প্রান্তর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল—

মনে হইল ভুল করিয়াছি······

ভাবিয়াছিলাম, আশাকে লইয়া সংসারের বৃন্তচ্যুত হইতে পারিলেই নিশ্বাস-রোধকর সংকীর্ণ স্থানের ভিতর হইতে মুক্তি পাইয়া অসীম নভোমণ্ডলের অধিবাসী হইব ; কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল, এই জীবনই সংকীর্ণ—এত সংকীর্ণ যে মুখখানা রাখিবার স্থান নাই। সেই জীবনই ছিল অবাধ অসংকোচ প্রফুল্ল—কেহ কোনোদিন বলপূর্বক টানিয়া নামায় নাই ; বলে নাই, এই গণ্ডির ভিতর তুমি থাকো।

—কি ভাবছো? আশা জিজ্ঞাসা করিল—অনুকম্পার স্বরটি অনুভব করিলাম।

বলিলাম—ভাবছি না কিছু, আশা। তুমি কি ভাবছিলে এতক্ষণ চুপ করে?

আশা কথা কহিল না।

দেখিলাম, চোখে তার জল আসিয়াছে।

—বলো কি ভাবছো!

—মায়ের কথা। বলিয়াই আশা আমার ডান হাতখানা দু-হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, বটু আর মণির কথাও ভাবছি। তুমি তাদের কথা ভাবছো না?

আশা বিধবা মায়ের জ্যেষ্ঠা সন্তান। বটু আর মণি তার ছোট দুটি ভাই। এই নিঃস্ব বিধবাকে আর্থিক সাহায্য করেন তাঁর দেবর—আশার বাবার খুড়তুতো ভাই।

আমি তাহাদের কথা ভাবি নাই—কাহারও কথা ভাবি নাই—উন্মত্ত হইয়া কেবল ভাবিয়াছিলাম আশার কথা, আর তার প্রণয়ীরূপে নিজের কথা·········

কিন্তু এখন তাহাদের কথা মনে পড়িল—নিঃশঙ্ক পরিপাটি তাদের পারিবারিক

জীবন—ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরেই তারা অম্লান স্বচ্ছন্দ চিত্তে বিচরণ করে। তারাও ছিল আমার জীবনকে প্রসারিত স্নিগ্ধ করিবার সামগ্রী।

আশা তার মা আর বটু আর মণির সহিত যোগদান করিয়াই আমার জীবন-প্রদীপ প্রদীপ্ত করিয়া তুলিত—

তা মনে পড়িল আর নিশ্বাস পড়িল।

কিন্তু আশাকে নিজস্ব করিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে রসবাহী নাড়ির যোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছি—আত্মার আলিঙ্গনের মধ্যে, আর আত্মাকে ক্রীড়াশীল করিয়া অসীমের দিকে তরঙ্গায়িত করিতে আপনার জন বলিতে যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সবাইকে ত্যাগ করিয়া বৃক্ষজননীর আশ্রয়ভ্রষ্ট ফলের মতো অধোগামী হইয়াছি—কোথায় যাইয়া পড়িব তাহার কল্পনাও করিতে পারি না।

আশা চোখ মুছিল।

বলিল—তুমি আমাকে ফেলে পালাবে না তো!

শুনিয়া সত্যই আহত হইলাম।

বলিলাম,—না, আশা, সে ভয় কেন করছো?

পলায়ন করিবার কথা একেবারে ভাবি নাই এমন নয়। কিন্তু এ সত্য যে অনিবার্য, আশা ভিন্ন আমার মুক্তির পথ নাই। যদি ঘরে ফিরিতে হয় তবে আশাকে লইয়াই ফিরিতে হইবে, অথবা মরিতে হইবে—পথে পথে প্রেতের মতো আমি বেড়াইতে পারিব না, আশাকে ত্যাগ করিয়া গেলেও জন্মভূমিতে আমার স্থান নাই।

কেউ যেন বাঁধন কষিতেছিল। কষিতে কষিতে হঠাৎ ছাড়িয়া দিল—নিষ্কৃতি পাইয়া গেলাম।

আনন্দে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আশাকে দু-হাতে জড়াইয়া ধরিলাম, তার দেহকে নয়, দেহের অবলম্বনে আর স্পর্শে তার আত্মাকে—সেখানেই শান্তির একটা শুদ্ধ রূপ চোখে পড়িল।

বলিলাম—তুমি মায়ের কাছে যেতে চাও, আশা?

শুনিয়া আশা ভয়ে যেন শুকাইয়া উঠিল; বলিল, কিন্তু তুমি?

বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল।

আশা একমাত্র আমাকেই সর্বাগ্রগণ্য, অত্যাজ্য আর উপাস্য করিয়া রাখিয়াছে। মন গলিয়া যেন কণ্ঠ অবধি হিল্লোলিত হইয়া উঠিল।

আশার বুদ্ধি নাই, রূপ নাই। কিন্তু ভুল নাই যে সে আমারই ভিতর নিজেকে

নিমজ্জিত মিশ্রিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—তার নির্মল প্রাণের এই সুকোমল সাধুতা আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

বলিলাম—আমিও যাব।

—তা কি হয়?

—হয়, আশা। বিয়ে করলেই হয়।

—তা কেমন করে হবে! আমরা যে এক জাত নই।

—তা না-ই বা হলাম!

—তবে তাই করো।

সে রাত্রে আশা অসীম মুক্তির মাঝে নূতনতর রূপ ধারণ করিয়া আবার আমার নিজস্ব হইল।

ঘুঘুডাঙার বস্তিতে সরকারী কলতলায় একদিন সকালে এক মহাকাণ্ড। হাজারির স্ত্রী লছমি কলে জল নিতে এসেছিল, সেইখানে পাড়ার মেয়ে ফুলিয়ার সঙ্গে তার কি বচসা হয়, কথা থেকে শেষে হাতাহাতি কামড়াকামড়ি, তারপর কখন ফাঁক পেয়ে লছমি মাটি থেকে একটা লোটা তুলে নিয়ে ফুলিয়ার কপালে ছুঁড়ে মারে—একেবারে রক্তে রক্ত-গঙ্গা। ফুলিয়া মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। লোকে ভাবলে বুঝি সে মরে গেছে—তাড়াতাড়ি তারা পুলিসে খবর দেয়; পুলিসের লোক এসে লছমিকে থানায় ধরে নিয়ে যায়।

যখন এই কাণ্ড ঘটে, তখন হাজারি ঘরে ছিল না, সে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে কোন্-এক কারখানায় কাজ করে—রোজ সকাল আটটায় তাকে হাজরে দিতে হয়।

লছমি আর হাজারি এই বস্তিতে আজ চার বছর বাস করছে। তার পূর্বে তারা কোথায় ছিল, এ বস্তির লোক কেউ জানে না। প্রথম যখন তারা এখানে আসে, ভারী গরিব ছিল—অতি জীর্ণ ছেঁড়া ময়লা কাপড়, না আছে বিছানা পত্র, না আছে একখানা বাসন। একেবারে খালি হাতে এই দুটি প্রাণী বস্তির মধ্যে সবচেয়ে যে কম-ভাড়ার ঘর, তাইতে এসে আশ্রয় নেয়। আজ তাদের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। একটা বিছানা এবং দুখানা বাসন তো হয়েইছে, তার উপর লছমির হাতে দু-চারখানা রূপোর গয়নাও উঠেছে।—এবং হয়তো আরো উন্নতি হত যদি না হাজারি গত বছর থেকে মদ ধরত।

লছমি যেমন তার স্বামীকে ভালবাসে, হাজারিও তেমনি লছমিকে ভালবাসত। দুজনকার মধ্যে এতটা প্রণয় ছিল যে বস্তির মধ্যে সেটা একটা ঈর্ষাসূচক আলোচনার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরা সুখেই ছিল।

হাজারি যখন হঠাৎ মদ ধরে, তখন এই ছোট্ট সংসারে যে সামান্য সচ্ছলতা ছিল, তাতে অনটনের সূত্রপাত হতে আরম্ভ করে; কিন্তু লছমি তা গ্রাহ্য করেনি। মদে যে-পয়সা যাচ্ছে, তাতে তারি গায়ের ভবিষ্যতের আর-একখানি অলংকারের রূপো যে ক্ষয়ে যাচ্ছে, সে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলেও, তাতে এক-দিনের জন্যেও কোনো আপত্তি প্রকাশ করেনি। তার কারণ লছমি জানতো হাজারি সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা আনে, সে তো তারি জন্যে; নিজের জন্যে সে কতটুকু নেয়? কাজেই সে যদি সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একটু আনন্দের জন্য দুটো পয়সা মদে খরচ করে, তাতে বাধা দিতে লছমির মায়া করত। সে তো বারণ করতই না, বরং স্বামী মদ খেলে তারও আনন্দ হত। স্বামী যে জিনিসটি খেতে ভালবাসে, নিজের ভাগের চাল কিংবা আটা অল্পে-অল্পে বাঁচিয়ে সেই উদ্‌বৃত্ত থেকে সেই জিনিস নিজের হাতে তৈরি করে যেদিন স্বামীকে সে দিতে পারত, সেদিন তার যেমন আনন্দ হত—স্বামীর মদ খাওয়াতে তার চেয়ে কম আনন্দ সে উপভোগ করত না। এই রকমে তারই আস্কারায় হাজারি অল্পে-অল্পে বেশ মাতাল হয়ে উঠতে লাগলো।

এতে সংসারে যদিও ক্রমেই অনটন বাড়ছিল কিন্তু বিশেষ কোনো অশান্তি ঘটেনি। কারণ হাজারি সত্যিই লছমিকে ভালবাসত; এবং সেই ভালবাসায় লছমির সমস্ত দৈন্য মুছে যেত।

গত বছর পুজোর সময়ও হাজারি লছমিকে একখানা গয়না দিয়েছিল এবং তার জন্যে একখানা রঙিন শাড়িও কিনেছিল, কিন্তু এ-বছর পুজোর সময় সে দেখলে যে হাতে এমন পুঁজি নেই যে গয়না তো দূরের কথা একখানা মোটা শাড়িও কিনতে পারে। হাজারির মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল—সেই দুঃখে সে মদ খাওয়া বন্ধ করলে। ইয়াররা তাকে টানাটানি করত, সে হাত ছাড়িয়ে চলে আসত। লছমি দু-দিন দেখে, তিন-দিনের-দিন জিগ্‌গেস করলে—"কি গো, মদ খাচ্ছ না যে?

হাজারি বললে—"মদে বড়ো খরচ হয়ে যায় লছ্‌মি!"

লছমি বললে—"হলেই বা, তাতে কি হয়েছে?"

হাজারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"হয়েছে এই যে এ-বছর পুজোয় তোকে গয়না দিতে পারলুম না!"

লছমি তীব্রস্বরে বলে উঠলো—"কে তোমার কাছে গয়না চায়!"

ছাই গয়নার জন্যে স্বামীর একমাত্র ফুর্তির জিনিস মদ তাকে ছাড়তে হয়েছে শুনে লছমির যেমন দুঃখ হল, তেমনি রাগও হল। সে আবার সজোরে বললে—"গয়না তোমার চাই না!"

হাজারি আদর করে বললে—"তা কি হয় লছমি! তুই আমার লক্ষ্মী, তোর দৌলতে আমার সব দুঃখ ঘুচেছে—তোকে সাজাতে হবে বৈকি!"

লছমি রাগ দেখিয়ে বললে—"অমন যদি করো, তাহলে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব কিন্তু!" বলে সে মুখ বাঁকিয়ে নিলে। হাজারি হাসতে লাগলো। শেষে লছমি এক-রকম জোর করেই আবার হাজারিকে মদ ধরালে; তাতে ফল হল এই যে লছমির গয়না-পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে জন্মের মতো দূর হয়ে গেল। লছমির তাতে এতটুকু দুঃখ হল না। তার স্বামী যে তাকে আদর করে বলেছিল—"তুই আমার লক্ষ্মী, তোকে সাজাতে হবে বৈকি!"—তাইতেই তার মনে হতে লাগলো তার সমস্ত অঙ্গ গয়নায় ভরে গেছে!

গয়না দিতে পারলে না বটে, কিন্তু হাজারি কোথা থেকে পুজোর সময় লছমির জন্যে একখানা ভালো শাড়ি এনে দিলে। লছমি বিস্মিত হয়ে জিগ্‌গেস করলে—"এ কি, টাকা কোথায় পেলে!"

হাজারি বললে—"ধার করেছি রে লছমি।"

লছমি বললে—"শুধু শুধু ধার করা কেন?"

হাজারি ধমক দিয়ে বললে—"থাম্ তো তুই!" বলে কাপড়খানা নিয়ে সর্বাঙ্গে তার জড়িয়ে দিলে। লছমি আনন্দে আর কিছু বলতে পারলে না; সে শুধু স্বামীকে একটা গড় করলে।

দিন এমনি সুখে চলছিল; কিন্তু এই চলার মধ্যে যে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে তা লছমি টের পেয়েও যেন পেতে চাইলে না। সে যতই মনকে বোঝাক, সুরা-রাক্ষসী যে তার সতীনের মতো সংসারে এসে প্রবেশ করেছে, সে-পরিচয় দিনে-দিনে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। সে শুধু যে অর্থের উপর ভাগ বসালে তা নয়, একটু-একটু করে স্বামীর আদরের উপরেও ভাগ বসাতে শুরু করলে। হাজারি মদই খাক আর যাই করুক, ঠিক সময়ে বাড়ি আসতে কোনো দিন তার কসুর হত না। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা লছমির জন্যে একটা আকুল তৃষিত দৃষ্টি নিয়ে সে ঘরে ফিরে আসত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল নির্দিষ্ট সময়ও উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং চোখের সেই রঙেরও বদল শুরু হয়েছে। লছমি যে এ সব বুঝত না, তা নয়;

এবং এর জন্যে তার মনে কষ্টও হত; কিন্তু স্বামীকে সে-কথা সে কিছুতে জানতে দিত না। পাছে জানতে পারলে স্বামী তার নিজের ঐ খুশিটুকু খরচ করতে দ্বিধা করে, এই ভয়ে হাসিমুখেই স্বামীর এই সব অবহেলা সে উপভোগ করত; নিজেকে পুড়িয়ে সে স্বামীকে আলো দিতে চাইত।

এমনি যখন অবস্থা, তখন পাড়ায় নতুন বাসিন্দা এল ফুলিয়া—তার পুরন্ত দেহ এবং পুরন্ত যৌবন নিয়ে—নিঃসঙ্গ একলা। সে ছিল সুন্দরী—তাকে দেখবামাত্রই এ কথা কি পুরুষ কি নারী সকলেরই মন আপনা হতেই বলে দেয়। ফুলের পাপড়ির মতো এই ফুলিয়া কোথাকার কোন্ ঝড়ে ছিট্‌কে এই গরিব পঙ্কিল পল্লীর মধ্যে এসে পড়ল, তা কে জানে? এবং কেনই বা এল, সে রহস্য কে নির্ণয় করে?

ফুলিয়ার ঐ ফুলের মতন সুন্দর কোমল পেলব দেহ এ-পাড়ার পক্ষে একেবারে নূতন এবং সম্পূর্ণ বেমানান ছিল, সেইজন্যে সকলকার দৃষ্টির আগে সে একটা আশ্চর্যতার দীপ্তি নিয়ে সর্বদা জাগ্রত হয়ে রইল;—আর-সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার অস্তিত্ব খর্ব হয়ে হারিয়ে গেল না। এখানে যারা থাকে, হয় অনবরত দুঃখের নিষ্পেষণে তাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের রেখা বক্র কুৎসিত হয়ে গেছে, নয় ক্রমাগত পরিশ্রমে একান্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ফুলিয়া যখন তার সেই শুভ্র চঞ্চল হাল্‌কা দেহখানি নিয়ে চলে-ফিরে বেড়াত, তখন মনে হত যেন সে বিচিত্র লীলায় উড়ে-উড়ে চলেছে। তার গলার স্বরের মধ্যে কী একটা মোহিনী ছিল যে অনেক দূর থেকে আওয়াজ এলেও কান আপনি সজাগ হয়ে উঠত; এবং কারণে-অকারণে যখন-তখন বিদ্যুৎ-লীলার মতো তার মুখে ফুটে উঠত যে তরল হাসিটি, যা একবার দেখে আশ মেটে না, তা বার-বার দেখবার পিপাসা নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। মন-ভোলানিয়া ফুলিয়া পাড়ার কড়ি-কোমল সব রকমের মনই ভুলিয়ে বেড়াতে লাগলো।

রূপ দুর্লভ, কাজেই রূপ মানুষের সম্ভ্রম দাবি করে। ফুলিয়া যদিও পাড়ার আর-পাঁচজনের মতো খুবই গরিব, তবু তাকে সকলে দেখতে লাগল যেন রাজরানীর মতো। সে অতি সামান্য হলেও, তার চারিদিকে এমন-একটা দুর্লভতা তাকে বেষ্টন করেছিল যে যে-কোনো পুরুষ তাকে খুব নিকটে পাবার আশা করতে পারত না। সেই জন্যে বিশেষ করে সে সকলের লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। সে যেদিন যাকে দয়া করে কাছে ডাকত, মাত্র সেই কাছে আসতে পেত; তার সেই করুণায় সে কৃতার্থ বোধ করত, বাকি লোক সেই সৌভাগ্যের

ঈর্ষায় দগ্ধ হত। এবং এই ঈর্ষার আগুনের আভায় ফুলিয়ার রূপের মোহ লোকের চক্ষে আরো মধুর, আরো দুর্দমনীয় হয়ে উঠতে লাগলো।

ফুলিয়া একপক্ষে যেমন দুর্লভ, অন্যদিকে তেমনি আবার সুলভও ছিল। তাকে ধরবার কারো সাহস হত না বটে, কিন্তু ফাঁদ পেতে সে ধরতে জানত এবং যাকে খুশি তার ধরতে বাধত না। কাজেই ধরা-দেবার আকাঙ্ক্ষা এবং ধরা-পড়বার আশা—এই দুই নেশায় পাড়ার বিবাহিত এবং অবিবাহিত দুই শ্রেণীর ছোকরাই টলমল করতে লাগল। মেয়েরা ভীত হয়ে উঠলো—এ আবার কি আপদ!

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল—আজ এ, কাল ও, ফুলিয়ার কবলে পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রথমে অপ্রকাশ্যে পরে প্রকাশ্যে এই নিয়ে পাড়ার মেয়ে-মহলে আলোচনা চলতে লাগলো; ঘরে-ঘরে মান-অভিমান, কোঁদল বেড়ে উঠতে লাগলো; কিন্তু তাতে বিজয়িনী ফুলিয়ার বিজয়-নিশান এতটুকু হেঁট হল না।

হাজারি কিন্তু এ সব আপদের মধ্যে ছিল না। তার মদ এবং লছমি তার হৃদয়কে এতটা বেশি অধিকার করে ছিল যে ফুলিয়ার সেখানে আমল পাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। ফুলিয়া আসে যায়, হাসে, হাজারিকে বাঁকা-চোখে দেখে, কিন্তু তার নয়ন-শর তাকে বেঁধে না এবং তার ফাঁদও তাকে বাঁধে না। যে-পাখি সহজে ফাঁদে পড়ে না, তাকে ফাঁদে ফেলবার আগ্রহ শিকারীর তত বেশি হয়। হাজারিকে ফুলিয়া অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারত—কারণ সে এমন কি মহামূল্য সামগ্রী! কিন্তু সে ধরা পড়ল না বলেই তাকে ধরবার আমোদ ফুলিয়ার কাছে দুর্দমনীয় হয়ে উঠলো। আর পাঁচজনের চেয়ে অনেকখানি বেশি মন তার দিকে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়ল। এতে ফল হল এই যে পাড়ার সকলকারই দৃষ্টি এই দুটো শিকার-শিকারীর খেলার নানা ভঙ্গি ও বিচিত্র লীলার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। লছমি একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

একদিন সন্ধ্যার পর হাজারি ঘরে ফিরছে—সেদিন তার নেশাটা বেশ-একটু বেশি হয়েছিল, একটা উদ্দাম ফুর্তি তার সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে উছ্‌লে পড়ছিল, পৃথিবীটাকে তার ফুলের মতন নরম সুন্দর এবং জীবনটাকে খুব হাল্‌কা মেঘের মতো উড়ন্ত মনে হচ্ছিল; থেকে-থেকে বোধ হচ্ছিল তার খুশির বাঁধ যেন ভেঙে পড়ছে—আজ যা-খুশি-তাই করা যায়! এমনি অবস্থায় সে বাড়ির দিকে ফিরছে; কিন্তু তার মনের মধ্যে তখন বাড়িও নেই, লছমিও নেই—এমন কি

কিছুই নেই ; আছে কেবল এমন একটা অনুভূতি—যাতে যা দেখি, যা শুনি, তাই ভালো লাগে, তাই মনে হয় মধুময়! ঠিক এই সময় বস্তির মোড়ে সন্ধ্যা এবং নেশার আবছায়ায় ফুলিয়ার সঙ্গে হাজারির দেখা। আরো কতদিন এইখানে এই সময় ফুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু সে দেখার সঙ্গে আজকের দেখার তুলনাই হয় না। আজ যেন এ সে জায়গা নয়, সে ফুলিয়া নয়, সে হাজারিও নয়। হাজারি আশ্চর্য অবাক হয়ে নেশাভরা চোখে দেখতে লাগলো—ফুলিয়ার সেই রূপ! তার আঁট-সাঁট বাঁধা দেহের ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত-হিল্লোলিত যৌবন, হাওয়ার উপর একটা লালসার মাদকতা ছড়িয়ে দিতে লাগল—সে কী উগ্র, কী তীব্র! সে-নেশা হাজারির চোখে এসে লাগবা-মাত্রই তার পিপাসা চতুর্গুণ বেড়ে উঠলো। হাজারির আজ খুশির মন—খুশির খেয়ালে সে আজ ভেসে চলেছে—কোথায় বাধা, কোথায় বন্ধ! সে ছুটে হাত বাড়িয়ে ফুলিয়াকে ধরতে গেল—কিংবা ফুলিয়ার রূপ-যৌবনের দুরন্ত আবেগই হাজারির বাহু-দুটোকে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগলো—যাই হোক হাজারি তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফুলিয়া ধরা দিলে না ; —সে নিজের শরীরটাকে ঢেউয়ের ছাঁদে বাঁকিয়ে, হাত দিয়ে হাজারির প্রসারিত বাহুকে বাধা দিয়ে, ধরা দিতে-দিতে ধরা না দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতো সরে গেল। এ ফুলিয়ার পালানো নয়, এ নিজের দিকে আরো টেনে আনা, ধরা না-দিয়ে যে ধরতে আসছে তার ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তোলা! এর মধ্যে নিবারণের চেয়ে আহ্বানই বেশি। বুঝতে হাজারির কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। সে উৎসাহে আবার এগিয়ে গেল। এবার ফুলিয়া ধরা দিলে বটে, কিন্তু সে এক নিমেষের জন্য! কোমল দেহের নরম পরশটি মাত্র ছুঁইয়ে তার রেশটুকু রেখে সে আবার চকিতের মধ্যে সরে গেল। সেই ছোঁয়ার বিষ তখনি-তখনি হাজারির দেহের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত হয়ে তাকে পাগল করে তুললে—সে দ্বিগুণ বেগে ফুলিয়াকে ধরতে গেল। সাপুড়ে যেমন বাঁশির সুরে সাপকে টেনে আনে, ফুলিয়া তেমনি করে হাজারিকে এঁকে বেঁকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল। হাজারির খেয়াল ছিল না, সে লোভের মোহে এগিয়ে-এগিয়ে চলেছিল, এবং হয়তো সে অনন্ত কাল এমনি করে চলতে পারত—কিন্তু হাজারির ঘরের সামনে আসতেই হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। প্রতিদিন এইখানে এসে থামবার অভ্যাসেই হোক কিংবা দরজার সামনে লছমিকে দেখেই হোক, হাজারির গতি একেবারে রোধ হয়ে গেল—সে আর অগ্রসর

হল না, মুহূর্তের মধ্যে তার ফুলিয়ার নেশাও বোধহয় কেটে গেল, সে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

লছমি এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ফুলিয়া আর হাজারির এই লীলাখেলা দেখছিল। রাক্ষসী যে তার স্বামীকে গ্রাস করবার চেষ্টায় আছে—এ কথা সে পূর্বেই জানত, কিন্তু স্বামী যে তার গ্রাসের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করতে যাবে, এ সন্দেহ তার কখনো হয়নি। কারণ স্বামী তাকে এমন ভালবাসত যে তাতে বিশ্বাস আপনিই হয়। আজ সেই সহজ বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে যাওয়াতে লছমির সমস্ত বুকের ভিতরটা কেমন আল্‌গা হয়ে গেল—মনে হল তার সমস্ত জীবনটা যেন চোখের সামনে ধ্বসে পড়ে যাচ্ছে। স্বামীর উপর রাগ হল না—শয়তানী ফুলিয়ার উপর একটা আক্রোশে তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল।

লছমি অতি সহজে মদের হাতে স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছিল—নিজের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও স্বামীর শুধু তৃপ্তির জন্যে ; কিন্তু ফুলিয়ার বেলায় সে তা পারলে না। তার নারী-চিত্ত ভীষণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। হাজারির কাছে সে অনেক ঋণে ঋণী। তার গরিব বাপ-মা তাকে নিঃসহায় রেখে যখন প্রায় একই সঙ্গে মারা যায়, সে সময় হাজারি যদি তাকে বিবাহ করে আশ্রয় না দিত, তাহলে তার অবস্থা পথের ভিখারীর চেয়েও দীনহীন হত, সে সময়ে হাজারি নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছে, নিজের ছোট্ট শোবার জায়গাটি লছমির জন্যে ছেড়ে দিয়ে, নিজে সারারাত বসে ঘুমিয়েছে। লছমি সে কথা ভোলেনি। স্বামী তার জন্যে অনেক সয়েছে, সেইজন্যে সে যখন মদে মত্ত হল, তখন তাতে সর্বনাশ আছে জেনেও লছমি খুশি-মনে তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ফুলিয়ার বেলায় এ সব কোনো যুক্তি, কোনো তর্ক আমল পেলে না। স্বামীর জন্যে তার মরতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু ফুলিয়াকে সে স্বামী দিতে পারবে না কিছুতেই! এ কথা কোনো যুক্তি-তর্কের কথা নয়—এ কথা তার সর্ব দেহ-মন থেকে কান্নার মতো উৎসারিত হয়ে উঠতে লাগলো। সে সারা অঙ্গে এই ক্রন্দন বহন করে সে-রাত্রে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করলে।

হাজারি আজকের ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছিল, অনুতপ্তও হয়েছিল। কেমন করে এ ঘটনা ঘটলো, সে নিজেই আশ্চর্য হচ্ছিল। সে তো ভালো-রকমই জানে ফুলিয়ার দিকে তার কোনো টানই নেই—তবে কেমন করে এমন হল? সে কি মায়াবিনী? সে কি মায়ায় ভুলিয়ে তাকে বশ করে নিয়ে

যাচ্ছিল? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু এ কথা সে লছমিকে কোন্ সুযোগে বোঝাবে, সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। লছমির দিকে চোখ তুলে চাইতেই তার সংকোচ হতে লাগলো, কথা কওয়া তো দূরের কথা। লছমিও স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা কইলে না—অভিমানে তার বাক্য হারিয়ে গিয়েছিল। এমনি করে রাত কাটলো, স্বামী-স্ত্রীতে কোনো বোঝাপড়ার অবকাশ হল না।

পরদিন সকালে যে কাণ্ড ঘটে, তার বিবরণ এই গল্পের প্রথমেই বলা হয়েছে। লছমি আর ফুলিয়া গিয়েছিল জল আনতে কলতলায়, ফুলিয়ার উপর লছমির কালকের সেই আক্রোশটা তখনো কিছুমাত্র শান্ত হয়নি; বরং সারারাত্রের অনিদ্রায় এবং রাগের উত্তপ্ততায় জীর্ণ স্নায়ু-জাল ভেদ করে সেই আক্রোশ কামানের গোলার মতো ফেটে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। এ সময়ে ফুলিয়ার সঙ্গে তার দেখা, বারুদের উপর আগুন-পড়ার মতো ভয়ংকর হয়ে উঠলো।

ফুলিয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লছমিকে ভালো করে দেখছিল। সে অনেকবার তাকে দেখেছে, তবু দেখছিল। দেখছিল—এই লছমি, এর মধ্যে এমন কি আছে, যার জন্যে ওর কাছে আমায় নতশিরে পরাজয় মানতে হল! সে যতই দেখছিল, ততই আশ্চর্য হচ্ছিল—কই কিছুই তো নেই, তবে কেন? কেন? অতি-যে-সামান্য, তার কাছে পরাভবের লজ্জায় ফুলিয়ার মনে ধিক্কার আসতে লাগলো; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হতে লাগলো—যে চিরদিনের ভিখারিনী, সে আজ বিজয়িনী লছমি! তার পায়ের তলায় সে যেন আজ ক্রীতদাসী। লজ্জায় ক্ষোভে তার সর্বশরীর জ্বলতে লাগলো। লছমির দৃষ্টি, তার নীরবতা, তার কাছে তাচ্ছিল্য বলেই মনে হতে লাগলো। সে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।...তারপর কোথা থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ এসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলে।

সে সময় কলতলায় আরো অনেক মেয়ে ছিল, তারা ইচ্ছা করলে অনায়াসে এই কলহে বাধা দিতে পারত—তা হলে ব্যাপার এতদূর গড়াত না; কিন্তু তাদের মনের মধ্যে ফুলিয়ার উপর যে রাগ সঞ্চিত ছিল, তার শোধ লছমিকে দিয়েই মিটিয়ে নেবার এই সুযোগ তারা অবহেলা করতে পারলে না। লছমি ছিল জোয়ান, ফুলিয়া পল্‌কা—কাজেই ফুলিয়ার নির্যাতন যে রীতিমতোই হবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না এবং তারই আমোদে তারা লছমিকে আরো উস্কে

দিতে লাগল। লছমি শান্ত মেয়ে, কখনো সে কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, হঠাৎ সে এতটা রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করবে তা বোঝা যায়নি, শেষে তার হাতের আঘাতে ফুলিয়া যখন রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তখন মেয়েরা সকলে বিশেষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। লছমিরও যেন চট্‌কা ভেঙে গেল—ভিতরে-ভিতরে সে কাঁপতে লাগলো।

হাজারি সন্ধ্যার পর কাজ থেকে ফিরে লছমিকে না দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রতিবেশীর মুখে যখন সব ব্যাপার শুনলে, এবং শুনলে যে লছমিকে পুলিসে নিয়ে গেছে, তখন লজ্জায় ঘৃণায় চিন্তায় সে একেবারে অবসন্ন হয়ে মাটিতে বসে পড়লো। কি করবে অনেকক্ষণ ঠিক করতে পারলে না। ক্রমেই তার মন আরো দমে যেতে লাগল,—এ পৃথিবী, এ জীবন, এ ঘর-দুয়ার. লছমি, লছমির ভালবাসা—সবই অত্যন্ত বিস্বাদ বোধ হতে লাগল। সে খুবই মদ খেয়ে এসেছিল, ছুটে গিয়ে আর-এক বেতল মদ নিয়ে এল। ঘন-ঘন মদ ঢালতে লাগলো। খেতে-খেতে লছমির উপর তার ভারী রাগ হল—সে পোড়ারমুখী এমন কাণ্ড কেন করলে! তারপরেই মনে হল—আহা, কাল রাত্রে সে লছমির সঙ্গে কথা কয়নি! ভিতর থেকে একটা গোমরানো কান্নার ঝোঁকে তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো। কিন্তু তারপরেই আর-এক ঢোঁক মুখে ঢেলে সে ফুৎকার দিয়ে বলে উঠলো—যাক্ গে মরুকগে সে! তারপর হঠাৎ ফুলিয়ার কথা মনে এসে পড়লো—সে শুনেছিল ফুলিয়ার কপালে চোট খুব বেশিই লেগেছে। ফুলিয়ার জন্যে তার দুঃখ হতে লাগলো—আহা বেচারা! সে হয়তো একলা পড়ে আছে—কেউ তাকে দেখবারই নেই।

সে টলতে টলতে ফুলিয়াকে দেখতে চললো মদের বোতলটা হাতে নিয়ে। তার দরজা ঠেলে হাজারি যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ফুলিয়া অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় একা শুয়ে আছে। সে হাজারিকে দেখে আশ্চর্যে চমকে উঠলো বটে কিন্তু কোনো আওয়াজ দিলে না ; একটু নড়লও না, গায়ের কাপড়ও টেনে দিলে না। যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল—চোখ বুজে। হাজারি পা-টিপে-টিপে অতি সন্তর্পণে তার শিয়রে গিয়ে বসলো।

হাজারিকে নিজের ঘরে বিনা-আহ্বানে আসতে দেখে ফুলিয়া মনে মনে খুশি হল। লছমির হাতের অপমানের গ্লানি তার মন থেকে মুহূর্তের মধ্যে মুছে গেল। তার মন বলে উঠলো—সেই বিজয়িনী! ছার লছমি! তুচ্ছ লছমি। লছমির প্রতি এখন আর হিংসা নয়—একটা করুণা সে অনুভব করতে

লাগলো। তার কপালে যে আঘাতের বেদনা ছিল, তার অর্ধেক এতেই জুড়িয়ে গেল। বিজয়-গর্বের উচ্চাসনে বসে লছমিকে সে মনে-মনে ক্ষমা করলে কিন্তু শাস্তি দিলে হাজারিকে। কাল তার আহ্বান অপমান করে সে যে ত্রুটি করেছে, তার শাস্তিভোগ শেষ হলে, তবে সে তাকে গ্রহণ করবে—মনে-মনে এই স্থির করে সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল; হাজারির দিকে ফিরেও চাইলে না। যে-পাখি ফাঁদে পা দিয়েছে, তাকে আর তখন ভোলাবার প্রয়োজন কি? সে তো বন্দী, তখন তাকে মারা-রাখা শিকারীর খুশি। দুষ্টু পশুকে বশ মানাতে হলে তাকে আহার না দিয়ে মানুষ যেমন জব্দ করে, হাজারিকে তেমনি তার হৃদয়ের কোনো খোরাক না দিয়ে ফুলিয়া তাকে জব্দ করতে লাগল। সে তাকে তাড়িয়েও দিলে না, গ্রহণও করলে না—তাকে অবহেলা করে শুয়ে রইল।

ফুলিয়ার এই ভাবগতিক দেখে হাজারি অত নেশার মধ্যেও একটু থতমত খেয়ে গেল। সে বসবে, কি চলে যাবে—কিছুই ঠিক করতে পারলে না। যতই সময় যেতে লাগলো, চলে-যাওয়া তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠলো।—একা নির্জন ঘরে সুন্দরী ফুলিয়ার সেই যৌবন-উচ্ছ্বসিত অর্ধ-নগ্ন দেহের একটা প্রচ্ছন্ন আহ্বান তাকে অন্তরে-অন্তরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর চুপ থাকতে না পেরে হাজারি ধীরে-ধীরে ডাকলে—"ফুলিয়া!" নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে কানের পাশে কম্পিত কণ্ঠে আবেগ-ভরা এই ডাকটি ফুলয়ার কানে ভারী মিষ্টি লাগলো। এই ডাকের সুরে তার সেই উদ্দাম চঞ্চল যৌবনের যেন ঘুম আসতে লাগলো। মনে হল এ ডাক যার, সে যেন অনেক দূরের—সে যেন দুর্লভ।

কোনো জবাব না পেয়ে হাজারির মনে হল, ফুলিয়া রাগ করেছে। সে আর কিছু উপায় না পেয়ে, ফুলিয়ার কপালের উপর যেখানে পটি বাঁধা ছিল, ধীরে ধীরে সেইখানটি স্পর্শ করিলে—অনেকক্ষণ হাতটি সেখানে রেখে দিলে। ফুলিয়া তবু কোনো সাড়া দিলে না। হাজারি হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। আজ তার কোথাও শান্তি নেই—ঘরে নেই, বাইরে নেই। আজ তার গৃহও নেই, গৃহিণীও নেই—কেউ নেই! সমস্ত জগৎ-সংসার তার মরুভূমি! সে পাশ থেকে বোতলটা একটানে তুলে নিয়ে এক গ্রাসে বাকি মদটা নিঃশেষে গিলে ফেললে। তারপর অল্পক্ষণ পরেই একেবারে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ফুলিয়া এতক্ষণ চোখ বুজে শুয়েছিল, হাজারির পড়ার শব্দে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। হাজারি পড়েছিল মুখ-গুঁজড়ে। "আহা বেচারা!"—বলে

তাড়াতাড়ি উঠে ফুলিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাজারিকে সোজা করে শুইয়ে দিলে। তারপর তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। ফুলিয়া দেখতে লাগলো হাজারির সেই মূর্ছিত তরুণ মুখের উপরে একটি দুঃখের অতি করুণ নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে তারও মন কেমন একটা দুঃখে গলতে থাকলো; তার অনুতাপ হতে লাগলো—হাজারিকে সে যে নিষ্ঠুরের মতো শাস্তি দিয়েছে, তার জন্যে।

হাজারি একেবারে অঘোরে-অচৈতন্যে পড়েছিল—তার কপালে মুখে ঘামের সঙ্গে মেঝের ধুলো লেপ্‌টে গিয়েছিল; ফুলিয়া নিজের আঁচল দিয়ে অতি যত্নে তাই মুছিয়ে দিতে লাগলো। আহা, আজ যত্ন করবার ওর কেউ নেই—এই কথাটা যতই মনে পড়ে, ততই হাজারির প্রতি একটা মমতায় তার সমস্ত চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। আজ কোথা থেকে যেন একটা করুণার বন্যা তার হৃদয়ে প্লাবন এনে দিলে। এই প্লাবনের স্রোতে সে যে কোথায় ভেসে চলেছে, তা সে নিজে ঠাহর করতে পারলে না। মন-ভোলানিয়া ফুলিয়া আজ যে কিসের মোহে ভুললো তা সে জানলে না। ফাঁদ পাতা যার ব্যবসা, ফাঁদে ফেলবার অতিমাত্র ব্যাকুলতায় সে নিজেই আজ ফাঁদে পড়ে গেল!

ফুলিয়া প্রায় সারারাত হাজারির শিয়রে জেগে বসে রইল।

হাজারি যখন জেগে উঠলো, তখন ফুলিয়া রান্নাঘরে; সে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ফুলিয়া তাড়াতাড়ি এসে বললে—"তোমার জন্যে রান্না করেছি। এইখানেই আজ খেয়ে কাজে যেও—বুঝলে!" হাজারির মাথাটা নেশার তলানিতে তখনো ভার হয়ে আছে, ভালো পরিষ্কার হয়নি। সে ফ্যাল ফ্যাল করে একবার ফুলিয়ার দিকে চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে ঢুকে হাজারির বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। ঘরে সব আছে, কেবল লছমিই নেই, তবু তার মনে হল এত বড়ো শূন্যতা সে জীবনে কখনো দেখেনি! সে সেখানে তিষ্ঠতে পারলে না—কোনোরকমে একখানা কাপড় আর গামছা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, কলতলায় দাঁড়িয়ে কি খানিকটা ভাবলে, তারপর ফুলিয়ার ঘরে গিয়ে খেতে বসলো।

পরের জন্যে সেধে দুঃখ নেওয়া ফুলিয়ার জীবনে এই প্রথম। এর মধ্যে যে এত সুখ, তা কে জানতো! প্রতিদিন সে নিজের জন্যে রান্না করে—তাতে কেবল বিরক্তিই সে পায়, নিজের ভাগ্যকে মনে মনে অভিসম্পাত দেয়, কিন্তু আজকের রান্নায় কোথা থেকে এল এ আনন্দ—এ বিপুল আনন্দ যার হিল্লোলে সারা

অঙ্গ তার নৃত্য করে উঠছে। এ অমৃতের স্বাদ সে জীবনে তো কখনো পায়নি! সে সামনে বসে অতি যত্নের সঙ্গে হাজারিকে খাওয়াতে লাগল; তারপর হাজারি যখন কাজে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো, ফুলিয়া তাকে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণটাও জানিয়ে দিলে--ভারী একটি মিষ্টি ব্যগ্র মিনতির স্বরে!

স্নান-আহারের পর হাজারির নেশার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে মাথা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছিল—কাল সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সে যেন একটা আবল্যের মধ্যে ছিল। লছমির কথা অনেকবার তার মনে হয়েছে বটে, কিন্তু তার এই বিপদে কি করা উচিত বিচার করবার মতো মস্তিষ্কের অবস্থা কাল তার ছিল না। নেশার ঝোঁকে এবং লছমির উপরে রাগে তার মনে হয়েছিল—লছমিটা চিরজন্মের মতোই গেছে! পুলিসের হাত থেকে সে যে ছাড়া পেতে পারে এবং তাকে যে ছাড়িয়ে আনা যেতে পারে—এ কথাটা তার মনে আসেনি। এখন সেটা মনে পড়ে তার দুর্ভাবনা হতে লাগলো। কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে অদূরে কারখানার কারিগরদের আহ্বানের বাঁশি বেজে উঠলো। অভ্যাসের বসে হাজারি কারখানার দিকে এগিয়ে চললো, ভাবলে ইয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করবে। কারখানার কাজ ঘড়ির কাঁটার মতো অতি সূক্ষ্ম নিয়মে চলে—কোথাও তার ব্যতিক্রম নেই। হাজারি ফটক পার হয়ে যেমন তার গহ্বরে প্রবেশ করলে, সর্দার এসে তাকে কাজের ঘানিতে জুতে দিলে—তারপর সে জোয়াল খুলে বেরিয়ে আসে কার সাধ্য! হাজারির হাত দুটো কাজের কারখানায় কলের মতো চলতে লাগল বটে কিন্তু থেকে থেকে লছমির মুখটা মনে পড়ে তাকে ভারী চঞ্চল করে তুলতে লাগলো। সে আর থাকতে না পেরে সর্দারের কাছে গিয়ে ছুটি চাইলে। কিন্তু ছুটি কোথায়? কারণ কাজ বেশি, লোক কম। কাজেরই সেখানে বেশি প্রয়োজন, লছমিকে হাজারির যে প্রয়োজন তার দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো অবসর কারখানার সেই—কাজেই কাজের কারাগারে হাজারিকে সমস্ত দিন বন্দী হয়ে থাকতে হল।

বিকেলে ছুটি পেয়েই সে একেবারে ছুট দিলে মদের দোকানে। আজ সে যতটা মদের প্রয়োজন অনুভব করছিল, এমন আর কখনো করেনি। দুটো দিন, একটা রাত কেটে গেল তবু সে লছমির সন্ধান করেনি—এর জন্যে এখন তার ভাবনার চেয়ে লজ্জাটা বেশি হতে লাগলো, এবং নিজেকে অতি হীন কাপুরুষ মনে হতে লাগলো। এই ঘৃণা, লজ্জা চাপা দেবার জন্যে সে মদের পর

মদ ঢালতে শুরু করলো। দু-চার পাত্র পেটে পড়বার পর, তার কোথায় রইল লজ্জা, কোথায় ভয়—কোথায় লছমি! তখন সারা জগতের মধ্যে জাগ্রত রইল কেবল সুরার সুরভি!

সেদিন যখন হাজারি বাড়ি ফিরছে, তখন অন্যদিনের চেয়ে রাত একটু বেশি হয়েছে। সে মদের খেয়ালে আপন-আনন্দে ভরপুর হয়ে চলেছিল—বস্তির মোড়ের কাছে আসতেই হঠাৎ তার বুকের ওপর যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল।—সে কোথায় চলেছে? হঠাৎ মনে পড়লো তার ঘর—তার সেই ভয়ংকর শূন্যতা ভরা ঘর! তার সমস্ত নেশাটা একবার মুহূর্তের জন্যে যেন ঝট্ করে কেটে গেল। যে পথ দিয়ে সে আসছিল সেই পথে সে ফিরে দাঁড়ালো। কিন্তু কোথায় যাবে? ঠিক এমনি সময় মনে পড়ল ফুলিয়াকে—সেই লীলাময়ী সুন্দরী ফুলিয়াকে—আজ সকালে তার আদর, তার যত্ন, তার নিমন্ত্রণ, আর তার সেই হাসিটি! হাজারি নতুন উৎসাহে আবার এগিয়ে চললো—কিন্তু নিজের ঘরের দিক থেকে মুখটা যথাসম্ভব ফিরিয়ে রেখে। সেদিকে চাইতেও তার বুকটা যেন শুকিয়ে আসছিল। নিজের ঘর বরাবর এসে সে পায়ের গতি বেশ একটু বাড়িয়ে দিলে—যতশীঘ্র সেখানটা পার হওয়া যায়! বাড়ি ছাড়িয়ে মাত্র একটি পা তুলেছে, এমন সময় হঠাৎ হাজারি চমকে উঠলো কার গলার কঠিন তীব্র তিরস্কারে—"কোথা যাস্।" হাজারি ফিরে দেখলে দরজায় দাঁড়িয়ে লছমি। মুহূর্তের মধ্যে তার ফুলিয়ার স্বপ্ন ভেঙে ঝরে পড়ে গেল। সে বিপুল আনন্দে ছুটে গিয়ে একেবারে লছমির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দের আবেগে তাকে এমন আদর করতে লাগলো যে লছমির এই দু-দিনের সমস্ত রাগ অভিমান তার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল। সেই আদরে লছমির বুকটা যেন আশ্বস্ত হল যে তার স্বামী তারই আপনার জিনিস! সে হাজারির হাত ধরে ঘরে ঢুকলো।

লছমি আজ দুপুরেই পুলিস থেকে ছাড়া পেয়েছিল। তার খুঁটিনাটি আমূল বৃত্তান্তে আমাদের কোনো দরকার নেই।...

ফুলিয়া জানত না যে লছমি ফিরে এসেছে। সে আজ সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরোয়নি—আজ তার ঘরের কাজ যেন অতিরিক্ত রকমের বেড়ে গিয়েছিল। ঘরে সাজাবার বিশেষ কিছু নেই, তবু ঘরটাকে সাজাবার জন্যে সে যে কতবার ওলট-পালট করতে লাগলো, তার ঠিক নেই—একই জিনিস পাঁচবার ঘুরিয়ে

পাঁচ জায়গায় বসাতে লাগলো। সে জীবনে কস্মিনকালে গোছালো ছিল না—জিনিস পত্তর তার এদিক ওদিক ছড়ানো থাকত; আজ বসে বসে সেগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গুছিয়ে রাখলে। ঘর দুয়ার ঘষে ঘষে তক্‌তকে পরিষ্কার করলে, বিছানাটাকে পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলে। তারপর রাঁধতে গেল। এইতে সমস্ত দিনটা তার কেটে গেল। তারপর সন্ধ্যার সময় স্নান করে একখানি ধোয়া পরিষ্কার শাড়ি পরলে, গায়ে একটি রঙিন কাঁচলি দিলে, আর কপালে দিলে একটি সিঁদুরের টিপ। অন্যদিন তার সাজ করতে কত সময় যায়, কিছুতে মনের মতন হয় না; আজ একটুতেই তার যথেষ্ট বোধ হল, আয়নায় নিজের মুখখানি দেখে তার মন খুশি হয়ে উঠলো। আজ যেন তার খুশির দিন—কোথাও খুশির অভাব নেই।

সাজ শেষ করে সে একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো, আকাশের দিকে চেয়ে বুঝলে হাজারির আসবার সময় হয়েছে। সে ঘরে গিয়ে বসলো—হাজারি কতক্ষণে আসবে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলো। বসে বসে সময় কাটাতে লাগলো—তার মধ্যে কত চিন্তার স্রোত বহে গেল; কিন্তু এ-কথা একবারও মনে এল না যে, যে অভিসারের যাত্রাপথে এসে সে আজ দাঁড়িয়েছে, তার গতি কোন্ নিরুদ্দেশের দিকে! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বোধ হল অনেকটা সময় কেটে গেছে; সে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে আকাশের দিকে দেখলে রাত অনেকটা এগিয়েছে। হাজারি এখনো এল না বলে তার মনটা যেন কেমন নিভে আসতে লাগলো। তবু সে মনটাকে জাগিয়ে নিয়ে আবার ঘরে গিয়ে বসলো। খানিক বাদে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালো। পাশ দিয়ে একটা ছোকরা তার দিকে কটাক্ষ করে শিস দিতে দিতে চলে গেল, ফুলিয়া তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। আপন মনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

আরো অনেকক্ষণ সময় গেল, রাত অনেক হল, অনেকবার ফুলিয়া ঘর বার করলে, তবু হাজারি এল না। সে আজ অনেকখানি আশা নিয়ে হাজারির প্রতীক্ষায় বসেছিল—সে আশা ভেঙে দিয়ে হাজারি এল না। ফুলিয়ার বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো। কে যেন তার বুকের ভিতর থেকে বলতে লাগল, আজ তার সব ব্যর্থ হল—এত যত্ন করে যে রান্না তা ব্যর্থ, এত কষ্ট করে যে ঘর সাজানো তা ব্যর্থ, নিজের সাজসজ্জা সব ব্যর্থ! এমন কি মনে হতে লাগলো তার জীবন-যৌবন সর্বস্ব এক নিমেষে ব্যর্থ হয়ে গেল! তার আর কিছু রইল না। ফুলিয়া একলা ঘরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

যতই কান্না বাড়ে, ততই মনে হয়,—হাজারিকে তার চাই—হাজারিকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। চোখের জল মুছে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হাজারির ঘরের দিকে। হাজারির ঘরের দরজা তখন বন্ধ—সেই বন্ধ দরজার গায়ে এসে ফুলিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়ালো। ভিতর থেকে লছমি আর হাজারির কথার মৃদু গুঞ্জন তার কানে এসে লাগতে লাগলো। ফুলিয়া তখন টের পেলে লছমি ফিরে এসেছে; এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে হাজারি কেন তার ঘরে যায়নি। হাজারি যদি নিজের খুশিতে তার কাছে না যেত, তাহলেও তার কষ্ট হত বটে, কিন্তু এতটা লাগত না। লছমির জন্যে যে সে তাকে অবহেলা করলে, এতে তার সমস্ত বুকটা আর একটা বিষম ব্যথায় টনটন করতে লাগলো—তার কপালের সেই কাটা জায়গাটা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো। তার সারা দেহের ভিতরে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় বইতে লাগলো। সমস্ত হৃদয় মন আরো জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো—হাজারিকে চাই—চাই! তারই তাড়নায় তার হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে দাবি জানালে—হাজারিকে চাই—চাই! রুদ্ধ কঠিন দুয়ার একবার কেঁপে খট্‌খট্‌ করে উঠলো। ভিতর থেকে লছমি বলে উঠলো—“ওগো, কে দেখো, দরজা ঠেলছে!” হাজারি বোধহয় তখন লছমিকে তার হৃদয়ের কোনো প্রিয় কথাটি শোনাচ্ছিল, এ বাধা তার ভালো লাগলো না, সেদিকে এতটুকু মন না দিয়ে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—“ও কেউ নয়! তুই শোন্।”

ফুলিয়া একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল! ও কেউ নয়! ফুলিয়া স্পষ্ট শুনলে, হাজারি বললে—ও কেউ নয়! তার ব্যাকুল হৃদয়ের সমস্ত আহ্বান অগ্রাহ্য করে, তার সমস্ত অস্তিত্ব তাচ্ছিল্য করে, সে শুনলে, হাজারি বললে—ও কেউ নয়!

ফুলিয়ার ভিতরে ঘুরে ঘুরে এতক্ষণ যে ঝড় বইছিল, একেবারে এক দমকে ঝট্‌ করে থেমে গেল—তার অন্তর বাহির, সমস্ত দেহ-মন পাথরের মতন নিস্পন্দ হয়ে গেল। ফুলিয়া অচল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কেউ নয়। সত্যিই তো সে কেউ নয়! ফুলিয়ার মন ছিন্নকণ্ঠ পাখির মতো অন্তিম যাতনায় কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো—সত্যই তো সে কেউ নয়! সে হাজারির কেউ নয়, লছমির কেউ নয়, এ পল্লীর কেউ নয়—এ সংসারের কেউ নয়! এতদিন সে জানত সে অনেক মনের মালিক—সে ভুল, সে ভ্রান্তি! সে কারো নয়, কেউ নয়!…

হাজারির আস্তানা ছেড়ে ফুলিয়া আস্তে আস্তে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো। সে চারিদিকে চেয়ে দেখলে—আশেপাশের কোনো জায়গা থেকে কেউ, কোনো কিছু তাকে কোনো মমতা দেখালে না। পল্লীর মাটি, ঘর দুয়ার, গাছপালা, পাখি পাখালি কেউ কিছু শুধোলে না, কেউ বললে না—ফুলিয়া তুই আমার! আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে অসংখ্য নক্ষত্র ভরা আকাশ—সেই নক্ষত্রপুঞ্জের কারো কাছ থেকে এতটুকু মমতা এল না।…ফুলিয়া একটি বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসে আকাশের সমস্ত আলো, পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পল্লীপথ ছেড়ে নিজের হাতে জ্বালা সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে অভিসার করলে।—কোথায় গেল, কে জানে?—কেউ কোনো খবরও নিলে না।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০—) ॥ বাণ
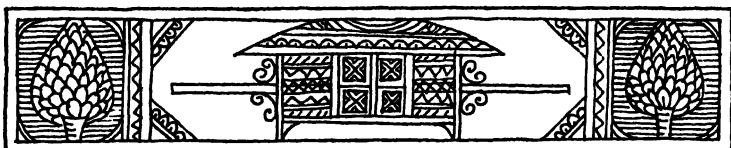
রোহিলখণ্ডের রেলপথ দিয়ে আমাদের ট্রেনখানা ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সন্ধ্যের কিছু পর থেকে সেই যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার আর বিরাম নেই। অন্ধকার দু-দিক থেকে যেন গাড়িখানাকে ঠেসে ধরেছে। দূরে কষ্টিপাথরের মতো কালো আকাশের গায়ে থেকে থেকে বিদ্যুতের কষ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। বাজের আওয়াজ আর বর্ষার অবিশ্রাম ঝরঝর ধ্বনির অন্ত নেই। দুর্যোগ—ভীষণ দুর্যোগ!

তৃতীয় শ্রেণীর ভাঙা গাড়ির সওয়ারি আমরা। জানলার ঝিলিমিলিগুলো নেই বললেই চলে। মাথার ওপরে যে আচ্ছাদন তারই অদৃশ্য অবকাশ বেয়ে অবিরল জলধারা যাত্রীদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। যাত্রীর দল এতেই সুখী। তাদের চারপাশের ভিজে পোঁটলাপুঁটলির মতো তারাও নেতিয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা দিচ্ছে।

গাড়ি চলতে চলতে শেষরাত্রির দিকে জঙ্গলের মাঝে এক জায়গায় থেমে গেল। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে সেও ঝিমিয়ে পড়ল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। একমাত্র বৃষ্টির শব্দে বন মুখরিত, বজ্রধ্বনিও তখন থেমে গিয়েছিল।

সকালবেলা জানতে পারা গেল, বর্ষায় রেলের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় একটা ট্রেন উল্টে গিয়েছে। যতক্ষণ না রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের গাড়িখানা নড়বার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

সংবাদটা শুনে যাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিপদ যতই গুরুতর হোক না কেন, না-জানার অন্ধকারে পড়ে যাত্রীরা এতক্ষণ হাঁপিয়ে মরছিল, সংবাদটা এসে যেন তাদের মুক্তি দিলে। এবার তারা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কবে কোন্ সালে কিরকম রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল, তারই আলোচনা করতে লাগল।

ব্যাপারটা মন্দ লাগছিল না। রেলপথে চলতে চলতে দু-পাশের এইসব গাছ-পালা যারা চোখের সামনে দিয়ে শুধু পালিয়েই বেড়িয়েছে, আজ তাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ মিলে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে ওরই মধ্যে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। বর্ষণধৌত নানান আভার সবুজের সমারোহ দেখে আমার রাতজাগা ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে গেল। দূরে একটা গাছে টকটকে লালফুল ধরেছিল, কি সে ফুল তা জানিনে, তবে তার মাথা অন্য সব গাছকে ছাড়িয়ে উঠেছে। মনে হতে লাগল, যেন সগুস্নাতা বনলক্ষ্মী সীমন্তে সিঁদুর পরে রোদে চুল শুকোচ্ছেন।

বনের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি যে, যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কে একজন সাহেব নাকি তাদের বলে দিয়েছে —এখুনি গাড়ি ছাড়বে।

আশায় আশায় বোধহয় দু-ঘণ্টা কেটে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যাত্রীরা কাতর হয়ে পড়তে লাগল। খাবার অথবা এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। অনেক লোক গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই রওনা হতে শুরু করলে। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম—কাছাকাছিই তাদের বাড়ি—এই দশ থেকে বিশ ক্রোশের মধ্যে। কাজের লোক তারা।

আমার কোনো কাজ নেই, কোথাও যাবার তাড়াও নেই। বসে বসে ভাবতে লাগলুম—কি করা যায়।

ক্রমে আমাদের কামরাও খালি হতে আরম্ভ করলে। একটি দুটি করে অধিকাংশ লোকই নেমে গেল। শেষকালে আমিও গাড়ি থেকে নেমে একটা দলের পেছন পেছন চলতে শুরু করে দিলুম। দেখাই যাক না—এরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ হয়তো আর মিলবে না।

যাত্রীদের সঙ্গে ভিড়ে গেছি। রেলের রাস্তা থেকে নেমে গঙ্গার রাস্তা ধরা হয়েছে। হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পৌছলুম।

সেটা একটা পুরনো শহর, নাম মনে নেই। বাড়িগুলো নিচু, দেখলেই মনে হয় যেন অনেক দিন আগেকার তৈরি। যাত্রীরা ঠিক করলে রাত্রিটা এখানকার সরাইয়ে কাটিয়ে সকালে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

সরাইয়ে এসে যখন পৌছলুম, তখন অন্ধকার বেশ ঘোরালো হয়ে এসেছে।

সরাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হয় সেও যেন অনেক দিনের পুরনো। অনেক খানি জায়গা চওড়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেওয়ালের গায়েই ছোট ছোট ঘর। মাঝখানটা ফাঁকা—এই জমির স্থানে স্থানে আর ছাতের ওপরে বেশ ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন, কখনো সেখানে লোক বাস করেছে বলে মনে হয় না। বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে ওরি মধ্যে একখানা ঘর দেখে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়া গেল। পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল জানতেও পারলুম না।

ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। উঠে দেখি যাদের সঙ্গে গিয়েছিলুম তারা যে যার গন্তব্যস্থানে চলে গিয়েছে। আমি ঘুরে ফিরে সরাইটার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করতে লাগলুম।

সরাইয়ের প্রকাণ্ড রাজবাড়ির মতন ফটক। কিন্তু তার রাজসিক ভাব আর নেই। রাজ্যহীন দরোয়ানের মতন শুধু সে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। অসংখ্য ঘর, অনেক ঘর ভেঙে পড়েছে। এই ভাঙা বেওয়ারিশ ঘরগুলোর বেরিয়ে-পড়া বরগার ওপরে কোনো রকমে একটু ছাউনি করে অনেক অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে বাস করে। এদেরই অসংখ্য ছেলেপিলে মাকড়শার বাচ্চার মতো সরাইয়ে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য কুকুর এখানে সেখানে বসে আছে। এদের হালচাল দেখে মনে হয় যেন এরাই এখানকার আসল মালিক। এক-একটা ঘরে কুক্কুরী তার বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে, দৈবাৎ কোনো যাত্রী সেখানে ঢুকলে কুক্কুরী চিৎকার করে বিরক্তি জানায়। তাদের ঘরও ভাঙা নয়, আস্তো। বলতে কি, এই মানুষ বাচ্চাগুলোর চেয়ে কুকুরের বাচ্চাগুলো সেখানে অনেক যত্নে আছে।

সরাই দেখা শেষ করে শহর দেখতে বেরুলুম। শহরের অবস্থা সরাইয়ের চেয়ে খুব বেশি উন্নত নয়। ছোট ছোট ভাঙা নিচু বাড়ি, মাঝে মাঝে একটা আস্তো নতুন বাড়ি। এরাই এযুগের বড়োলোক অর্থাৎ রহিস্‌।

সে সময়ে সেখানে কিসের একটা মেলা বসবার আয়োজন হচ্ছিল। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে এ-মেলা এখানে অনেক দিন থেকেই হচ্ছে, সেই সত্যযুগের কাছাকাছি সময় থেকে।

অনেক দিনের কথা। একবার পার্বতী ভোলানাথের সঙ্গে ঝগড়া করে মনের দুঃখে চলে এসে এইখানে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহস্থের মেয়ে ছিল না, তারা সেই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে নিজের সন্তানের মতন

পালন করতে লাগল। ওদিকে কিছুদিন যেতে না যেতেই মহাদেব মহা মুশ্‌কিলে পড়লেন। খিদের সময় খাবার, মৌতাতের সময় কলকে, এসব দেয় কে। তিনি যোগাসনে বসে পার্বতীর খবরাখবর সব জেনে নিয়ে একদিন সেই কুটিরে এসে হাজির। পার্বতীর অভিমান তখনো ভাঙেনি। তিনি কিছুতেই যাবেন না, মহাদেবও ছাড়বেন না। শেষকালে সেই গৃহস্থ ও তার স্ত্রী পার্বতীকে বুঝিয়ে স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজী করালে। ভোলানাথ তখন খুশি হয়ে গৃহস্থকে বললেন, তোমার কি চাই বলো?

গৃহস্থ এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি। লোকটা বর দিতে চায় দেখে তার মনে খটকা লাগল। যা থাকে কপালে ভেবে সে বলে ফেললে, দেবতা যখন খুশি হয়েছো তখন তোমরা চিরকাল স্বামী-স্ত্রীতে আমার ঘরে এসে বাস করো। আমি প্রাণপণে তোমাদের সেবা করব।

মহাদেব তখন মহাপ্যাঁচে পড়ে গেলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে গৃহস্থের ঘরে রয়ে গেলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা সেইখানে আছেন। যেদিন তাঁরা আত্মপরিচয় দিয়ে সেখানে বাস করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, প্রতি বৎসর সেই তিথিতে সেখানে মেলা বসে ও প্রায় পনেরো দিন ধরে মেলা চলে। আশেপাশের প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূর থেকে লোকে এই মেলায় যোগ দিতে আসে। ক-দিন খুব ধুমধাম, নাচ-গান হয়।

দেবতাদের দেখতে গেলুম। পার্বতীর সেই সোনার বর্ণ কালী হয়ে গিয়েছে। মহাকালের স্পর্শে তাঁর সেই নবনীত দেহ পাথর হয়ে গিয়েছে।

মেলা আরম্ভ হতে তখনও দু-তিন দিন দেরি ছিল। মেলাস্থানে তখুনি দোকানপাট বসে গিয়েছে, চারদিক থেকে লোক আসছে। অনেক লোক মাঠে তাঁবু ফেলেছে। যাদের অবস্থায় কুলোয়নি তারা আকাশের তলাতেই বাস করছে।

সরাইয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানেও মেলার সাড়া পড়ে গিয়েছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানেও অনেক লোক এসে জমেছে। সেদিনটা কোনোরকমে সেইখানেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। পরদিন উঠে দেখি যে, সরাই একেবারে লোকে লোকারণ্য। শুধু ঘরগুলো নয়, মাঝখানের সেই ফাঁকা জমিতেও দলে দলে নর-নারী বসে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকালবেলা আর কোথাও না গিয়ে আমি সেইখানেই ঘুরে-ফিরে দেখে বেড়ালুম।

দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছি, এমন সময় আমার ঘরের কাছেই তুবড়ি বাঁশির শব্দ শুনে বেরিয়ে দেখি এক সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে আর ফুলছে। আর একদিকে একটা লোক ভোজবাজি দেখাচ্ছে। খেলা দেখানোর চেয়ে লোকটার বক্তৃতা করবার শক্তি অদ্ভুত। বাজি দেখানো ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক বক্তা হলে এর চেয়ে বেশি পয়সা রোজগার করতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে খাতিরও পেত। আর একদিকে বাঁশবাজির আয়োজন হচ্ছে। এরা কথা কয় না, ঢাক বাজায়। ঢাকের আওয়াজ শুনে তাদের ঘিরে বিস্তর লোক দাঁড়িয়েছে। মোট কথা সরাইয়ের মধ্যেই একটা ছোটখাটো মেলা বসে গিয়েছে। যাত্রীদের ভারী ফুর্তি। না চাইতেই তারা পয়সা দিচ্ছে, খরচ করতেই তারা এসেছে।

চারদিক ঘুরে-ফিরে আবার সাপুড়ের কাছে এসে দাঁড়ানো গেল। সে তখন খুব জমিয়ে ফেলেছে। কারুর মাথা, কারুর নাক, কারুর পকেট থেকে টপাটপ সাপ বের করছে। চারদিক থেকে ঝপাঝপ পয়সা পড়ছে। সকলেই সন্ত্রস্ত, কখন কার কাছ থেকে সাপ বেরিয়ে পড়ে।

খেলা শেষ হয়ে গেলে সে পয়সাগুলো কুড়িয়ে গোখরো সাপের টুকরির মধ্যে ফেলে উঠবার উপক্রম করছে, এমন সময় একটা মুরুব্বী গোছের লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলে, এত তো গুণ শিখেছিস্, খেলতে টেলতে কিছু জানিস ?

সাপুড়ে বললে—জানি বৈকি কিছু কিছু।

—তবে খেল্ না ?

—টাকা লাগবে। পাঁচ টাকা দিতে হবে।

—পাঁচ টাকা না বিশ টাকা। চারটে টাকা দেব, খেল্।

সাপুড়ে চারদিকে চাইতে লাগল। একবার আমার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেই সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে—কে খেলবে, তুমি ?

মুরুব্বী লোকটা বললে—আমি খেলতে জানি না। টাকা দিচ্ছি, কেউ যদি জানে তো এগিয়ে আসুক।

সাপুড়ে চেঁচিয়ে বললে—লালাজী টাকা দেবে। এর মধ্যে যদি কোনো গুণী থাকো তো এগিয়ে এসো, আধাআধি বখরা।

দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হয়ে উঠল। নূতন আমোদের আশায় তারা কলরব শুরু করে

দিল। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে একেবারে প্রহেলিকা বলে মনে হতে লাগল। কি যে হবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে ভিড়ের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সাপুড়ে আবার চেঁচিয়ে বললে, দেখো, লালাজী চার টাকা দেবে। প্রায় দশ টাকা হবে। যদি কেউ গুণী থাকো তো এগিয়ে এসো, যা পাব তার অর্ধেক দেব।

দুঃখের বিষয় কোনো গুণীই এগিয়ে এল না।

সাপুড়ে হতাশভাবে আর একবার চারদিকে চেয়ে সেই মুরুব্বীকে বললে, হুজুর, মেলায় একজন গুণী এসেছে আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসব। কাল সকালে খেলা হবে।

তারপর চারদিকে ঘুরে কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে বাঁক কাঁধে তুলে তুবড়ি বাজাতে বাজাতে সে একদিকে চলে গেল।

মেলা উপলক্ষে এক রহিসের বাড়িতে সদাব্রত খোলা হয়েছিল। সেইখানে সন্ধ্যেবেলায় ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা করে ঘরে হজমি গুলির হিন্দী বিজ্ঞাপন পড়ছি, এমন সময় সেখানে সকালবেলার সেই সাপুড়ে এসে উপস্থিত। পশ্চিমে, বিশেষত সরাইয়ের মতন জায়গায় এরকম ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আমি তাকে বসতে বললুম। সে কম্বলের পাশে মাটিতে বসে বললে—তোমার বাড়ি বাংলা দেশে?

—হ্যাঁ।

সে বললে—আমি কলকাত্তা গিয়েছি। ভারী শহর।

চুপ করে তার বায়নাক্কা শুনে যেতে লাগলুম। জবাব দিচ্ছি না দেখে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তারপর টপ করে কম্বল থেকে একটা বিড়ি তুলে মোমবাতির শিখায় ধরিয়ে নিয়ে ভক্‌ভক্ করে খানিকটা ধোঁয়া আমার মুখের ওপরে ছেড়ে দিলে। তারপর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে আমায় বললে—তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি, বড্ড দরকার।

—কি দরকার বলো দিকিন?

সাপুড়ে উঠে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে এল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে ফেললে—কাল তোমাকে আমার সঙ্গে খেলতে হবে।

—খেলতে হবে? সে আবার কি!

—হ্যাঁ। অবশ্যি তোমাকে পড়তে-টড়তে কিছু হবে না। সে সব যা কিছু করবার তা আমিই করব। যা পাব আধাআধি।

ব্যাপারটা তবুও আমার কাছে পরিষ্কার হল না। আমি বললুম—দেখো বাপু, ঐ খেলা-টেলা যা বলছো সে-সব আমি জানি না।

সাপুড়ে অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে বার দুয়েক মুখে চকচক আওয়াজ করে বললে—বাবু, ওসব কি আর এখনকার দিনে কেউ জানে। তবুও কি করি পয়সা রোজগারের জন্য সবই করতে হয়—সবই করতে হয়।

কৌতূহল আর চেপে রাখা অসম্ভব হল। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বলো তো। ওসব হেঁয়ালি ছাড়ো।

সাপুড়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এত সাধারণ ব্যাপার আবার লোকে জানে না! কথাটা বোধহয় সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বললে—আরে তোমাদের দেশের কামরূপের খেলা জানো না? বাণমারা বিদ্যা।

কামরূপ কামাখ্যার এই মারণবিদ্যার কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। সে সম্বন্ধে অনেক সাংঘাতিক ইতিহাসও শোনা গেছে। শেষকালে কিনা আমাকেই—

আমি বললুম, রক্ষে করো বাবা! ওসব আমার দ্বারা হবে না।

সাপুড়ে বললে, ভয় পাচ্ছ কেন? এত ভয় পাবার তো কিছু নেই।

ভাবতে লাগলুম—ভরসাই বা কোথায় তা তো বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমাকে চিন্তা করবার অবসর না দিয়ে সে শুরু করলে—দেখো, আমরা মুখো-মুখি হয়ে দাঁড়াব। তারপর তুমি মাটি থেকে চারটি ধুলো তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে সেই ধুলো আমায় মারবে। আমি মন্ত্র পড়ে সে মার যেন কাটিয়ে দেব। তারপর খানিকটা ধুলোতে মন্ত্র পড়ে আমি তোমায় মারব। তোমার যেন খুব লেগেছে এই ভাব দেখাবে। তারপর একটু মন্ত্র পড়ে সে জায়গাটা ফুঁ দিয়ে মার কাটিয়ে আবার আমায় মারবে। এবারের মার খেয়ে আমি ঘুরে পড়ে যাব। এইরকম বারকয়েক পড়াপড়ি হয়ে আমাদের খেলা শেষ হবে। এর মধ্যে ভয় পাবার তো কিছু নেই।

বলতে কি, প্রস্তাবটা আমার ভালোই লাগল। উত্তেজনার অভাবে কয়েক দিন ঝিমিয়ে থাকা গিয়েছে, এ একটা মন্দ হবে না। বিশেষ আমার এই খাটুনিটা যখন নিরর্থক যাবে না। তাকে বললুম—আচ্ছা, রাজী। কাল সকালে আমি ঠিক হাজির হবো, তুমি এসো।

সাপুড়ে চলে যাবার পর তার কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করতে লাগলুম।

অতগুলো লোককে বোকা বানিয়ে সেই মিথ্যা অভিনয় করবার কথা মনে হওয়ায় হাসি পেতে লাগল। একবার মনে হল লোকটা আমাকেই বোকা বানাবে না তো! আমি তাকে ধুলো মারব, তারপর সে যদি বাহাদুরী দেখাবার জন্য আমাকে সত্যিকারের একটা বাণ ছাড়ে! সর্বনাশ! তাহলেই তো গিয়েছি! হায়! হায়! এত সহজ কথাটা তখন মনে হল না।

ভয়ে ভাবনায় রাত্রে ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না। পরদিন সকালে উঠে দেখি, সরাইয়ে আর লোক ধরে না। একে ক-দিন থেকে সেখানে যাত্রীর ভিড় লেগেছিল, তার ওপরে এই খেলার কথা কেমন করে সেই মেলায় গিয়ে পৌঁচেছিল। ফলে সেখান থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল।

সাপুড়ে আমাকে নিয়ে একেবারে কালকের সেই জায়গায় উপস্থিত করালো, তারপর বাঁক নিয়ে তুবড়ি বাজিয়ে একবার সাপ খেলিয়ে কিছু রোজগার করে নিলে। সাপ খেলানো শেষ হয়ে যাবার পরে, আমায় আসরে নিয়ে গিয়ে বললে, এই গুণী বাংলাদেশ থেকে এসেছে। সাধুলোক, অনেক বিদ্যে এর জানা আছে।

এই অবধি বলে সে কালকের সেই লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আজ সেই মুরুব্বী লোকটার আর খাতিরের অন্ত নেই। কোথা থেকে একটা মোড়া যোগাড় করে এনে সে জাঁকিয়ে বসেছে। আশপাশে দু-চারজন পারিষদও জুটেছে। সাপুড়ে তার কাছে গিয়ে বললে, কই টাকা দাও।

লোকটা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললে—আগেই টাকা দিতে হবে!

সাপুড়ে বললে—হ্যাঁ, আগেই দিতে হবে, ওসব কারবার আমার নেই।

মুরুব্বী এবার অতিকষ্টে ট্যাঁকের বত্রিশপাক খুলে চারটি টাকা বের করে সাপুড়ের হাতে দিলে। টাকা ক-টা আমার হাতে দিয়ে সাপুড়ে চেঁচিয়ে বললে—যে খেলা দেখবে সে পয়সা ফেলো, বাজে লোক সরে যাও—ভিড় বাড়িও না।

তার কথা শেষ হতে না হতে চারদিক থেকে টপাটপ পয়সা পড়তে লাগল। সাপুড়ে পয়সাগুলো কুড়িয়ে আমার জিম্মায় দিলে। আমি টাকাপয়সাগুলোকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে খেলবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

খেলা শুরু হল। সাপুড়ে তুবড়ি বাজাতে বাজাতে আমার সামনে কুস্তির পাঁয়তারার মতন পা ফেলে অর্ধচক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ করে দিলে। আমার ভয় তখনো ভাঙেনি। তার ওপরে তার সেই হাত-পা খেলানোর ওস্তাদি

কায়দা দেখে আমার মনে হতে লাগল, এ যাত্রায় বোধহয় আর নিষ্কৃতি নাই। কোনোরকমে নিজেকে স্থির করে মাটি থেকে চারটি কাঁকর তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে তাকে ছুঁড়ে মারলুম। সে একটা হাত ঝেড়ে—'রামঃ এ কিছুই নয়' এইরকম একটা ভাব দেখালে। তারপর সে চারটি কাঁকর তুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে আমায় মারলে।

ব্যস! যা সন্দেহ করেছি তাই। ঠিক বাণ ছেড়েছে। তার কাঁকর গায়ে লাগতেই আমার সর্বাঙ্গ একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠল। এখন কি করি। হাত-পা আমার ঠকঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করল।

সাপুড়ে আমার অবস্থা দেখে দু-পা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বললে—কী? ওরকম করছো কেন? খেলো—খেলো।

তাই তো! কিছুই হয়নি তো আমার! মাথাটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁকর তুলে তাকে মারলুম।

হায় বাপ্—বলে সে একেবাসে বসে পড়ল। তারপর তখুনি উঠে সে আমায় মারলে। আমিও তার দেখাদেখি দুই একবার বসে পড়লুম। এইভাবে আমাদের খেলা চলতে লাগল।

প্রায় মিনিট পনেরো খেলা চলেছে, এমন সময়ে সেই মুরুব্বী চেঁচিয়ে উঠল—এই তোমরা মিলে খেলছো। ওরকম করে খেললে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে।

অমনি চারদিক থেকে চিৎকার শুরু হল—আপসে খেলছে—আপসে খেলছে—ওরকম করলে চলবে না।

খেলা থেমে গেল। সাপুড়ে তাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে। শেষকালে একজন মধ্যস্থ হয়ে মিটমাট করে দেওয়ায় আবার খেলা শুরু হল।

এবারে কিছুক্ষণ খেলা চলবার পর একবার আমার বাণ খেয়ে সাপুড়ে দমাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। কোনোরকম অবলম্বন না থাকলে লাঠি যেমন পড়ে, সাপুড়ের পড়বার কায়দাও তেমনি আশ্চর্য। তাকে পড়তে দেখে চারদিককার লোক—সাবাস, সাবাস, মারা—জয় কামাখ্যা মাঈ কি জয়—বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ওদিকে সাপুড়ে আর ওঠে না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তার কাছে গিয়ে দেখি যে তুবড়ি বাঁশিটা তার মুখের মধ্যে প্রায় আধখানা ঢুকে গিয়েছে, আর দু-কষ বেয়ে ভল্‌ভল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাঁশিটা তার মুখ

থেকে টেনে বের করে দিয়ে আবার আমার জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। কিন্তু সাপুড়ে আর উঠল না, আস্তে আস্তে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। চার-দিকের লোকেরা কোলাহল করে উঠল—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মরে যাবে। আমি আবার এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত টেনে বললুম—এই ওঠো। কিন্তু সে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে ভিড় ভেঙে দু-চারজন লোক সাপুড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। একজন তার চোখ টেনে পরীক্ষা করে বললে—মরে গেছে যে দেখছি।

কী সর্বনাশ! মরে গেছে! আমার দুই কানে যেন জাহাজের ভোঁ বাজতে লাগল।

ইতিমধ্যে সাপুড়ের চারদিকে রাজ্যের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা যারা ছিল তারা হায় হায় করতে আরম্ভ করে দিলে।

একবার মনে হল এই অবসরে লম্বা দিই। কিন্তু পা দুটো এত কাঁপতে লাগল যে নড়তে পারলুম না।

ইতিমধ্যে সেই মুরুব্বীগোছের লোকটা ভিড় সরিয়ে দিয়ে আমাকে বললে—পাজী, বদমাশ, এখুনি এর মার ছাড়িয়ে দে। নইলে আমরা তোকে মেরে খুন করব। দে ছাড়িয়ে।

আমি ধীরে ধীরে সাপুড়ের কাছে গিয়ে যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছি এই রকম ভাব দেখিয়ে তার কানে কানে বললুম—বন্ধু হে, আর কেন? এইবার উঠে পড়ো। নইলে এরা আমায় প্রহার দেবে বলছে।

সাপুড়ে নির্বাক, নিস্পন্দ।

নিশ্বাস পড়ছে কিনা জানবার জন্য তার নাকের গোড়ায় হাত দিলুম, কিন্তু সেই দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের কোন্ ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ওদিকে সেই মুরুব্বী লোকটা মহা আস্ফালন শুরু করেছে—ওঠাও ওকে, নইলে কোতোয়ালিতে দেব।

অবস্থা ক্রমেই সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে লাগল। কেউ কেউ প্রস্তাব করলে—কোতোয়ালিতে দেবার আগে বেশ করে প্রহার দেওয়া যাক। আমি সেই মুরুব্বীটিকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম—এদের থামাও, নয়তো তোমারও বিপদ। মনে থাকে যেন, তুমিই টাকা দিয়ে খেলা শুরু করিয়েছিলে।

কথাটা বোধহয় তার মনে লাগল। সে তখনকার মতো সকলকে নিরস্ত করে আমায় বললে—কিন্তু এখনি ওর মার ছাড়াও।

আমি এবার সাপুড়ের বুকে কান দিয়ে পরীক্ষা করলুম। মনে হল যেন অতি ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছে। একজনকে বললুম—জল নিয়ে এসো।

তখুনি জল এসে হাজির, আমি মন্ত্র পড়ে তার চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলুম। প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করার পর সাপুড়ে চোখ চাইল। চারদিকের লোকেরা জয়ধ্বনি করে উঠল। তাদের বললুম—একে তুলে আমার ঘরে নিয়ে চলো।

কয়েকজন এগিয়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে আমার কম্বলে শুইয়ে দিলে। একজন তার বাঁক নিয়ে এসে ঘরের এক কোণে রেখে দিলে। আমি তখন ঘর থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তার শুশ্রূষা করতে লেগে গেলুম।

কিছুক্ষণ বাতাস করবার পর সে যেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। আমি একজন লোককে ডেকে তার জন্য খানিকটা গরম দুধ আনতে পয়সা দিলুম। দুধ খেয়ে সে উঠে বসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি বলো দিকিন্। ওরকম করলে কেন? বলা নেই কওয়া নেই, আচ্ছা লোক তো তুমি!

সাপুড়ে গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বলল—কি করি বলো? ওরা বলতে লাগল—মিলে খেলছে, এ না করলে কি উপায় ছিল?

—আর একটু হলেই যে হাতে দড়ি দিয়েছিলে বাপু! উঃ, কী রক্ত!

সাপুড়ে বললে, লোক দেখাবার জন্য আমরা টাকরায় ঘা করে রাখি। খেলবার সময় বাঁশি দিয়ে তাতে খোঁচা দিলেই রক্ত বেরোয়! কি রকম বেমক্কা লেগে যাওয়ায় একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলুম।

আহা-হা কী কাজই করেছিলে। ইচ্ছে হল লোকটার গালে ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু কি জানি বাবা, আবার যদি দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে, এই ভয়ে সেই অভিলাষ সংবরণ করে তাকে বললুম—শুয়ে পড়ো।

সাপুড়ে শুয়ে পড়ল। রক্তপাতে তার শরীর খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে বিকেলে এসে দেখি তখনো ঘুমুচ্ছে। তাকে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম—কিছু খাবে?

সে বললে, একটু খিচুড়ি খাওয়াতে পারো?

মনে হল, খিচুড়ি ছেড়ে তুমি এখন পোলাও খেতে চাইতে আমার তাই খাওয়াতে হবে। উঃ, আজ কী ফাঁড়াই না কেটেছে।

তাকে বসিয়ে আবার বাজারে চললুম খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে। রাত্রি আটটা কি নটার মধ্যে খিচুড়ি তৈরি করে তাকে খেতে দিলুম। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে সে বললে—বেশ হয়েছে।

আমিও খেয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লুম। সকালবেলা সাপুড়ে বললে—এবার আমি যাই।

কালকের টাকাপয়সাগুলো তার হাতে দিয়ে বললুম—হ্যাঁ যাও, আর কখনো এমন খেলা খেলো না।

সাপুড়ে বসে বসে পয়সাগুলো গুণে দুটো টাকা আর এক মুঠো পয়সা আমার দিকে এগিয়ে বললে—এই নাও তোমার বখরা।

কিন্তু তার সেই মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা পয়সা ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হল না। আমি বললুম—ও আমি নেব না, তুমি নিয়ে যাও।

সাপুড়ে আশ্চর্য হয়ে বললে—কেন নেবে না?

আমি বললুম—ও তুমি নিয়ে যাও, তোমায় আমি দিচ্ছি।

সাপুড়ে এবার অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললে—আমার উপর নারাজ হয়ো না বাবু।

—না, না, আমি খুশি হয়ে তোমায় দিচ্ছি।

সে আর কথা না বলে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে রাখলে। তারপর কোণ থেকে বাঁক তুলে কাঁধে ফেলে বললে—চললুম।

সাপুড়ে চলে গেল। বসে বসে ভাবতে লাগলুম—ওঃ, কী বাঁচনটাই বেঁচে গেছি। লোকটা মরে গেলে এরা তো আমায় ঠেঙিয়েই মেরে ফেলত। এদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পুলিসের হাতে গিয়ে মরতে হত।

বিপদ একেই বলে!

—গোড় লাগে বাবু।

মুখ তুলে দেখি এক বৃদ্ধ সস্মিত নেত্রে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কে বাবা?

—আমি মুসাফির। তোমার পাশের ঘরেই থাকি।

বৃদ্ধ আমার কম্বলে বেশ জাঁকিয়ে বসলে। আমি তাকে বিশেষ আমল না দিয়ে এদিক ওদিক চাইতে আরম্ভ করে দিলুম। কিছুক্ষণ পরে সে বললে—বাবু সাহেবের বাড়ি বাংলা দেশে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। তোমার সঙ্গে এসেছিল ব্যাটা চালাকি করতে।

—কার কথা বলছো ?

.—ঐ ব্যাটা দাগাবাজ, চোর, ঐ সাপুড়েটার কথা।

চুপ করে রইলুম। এ কথার আর কি উত্তর দেব। বৃদ্ধ আবার শুরু করলে —বাবু, এ বিদ্যে আপনি কতদিন শিখেছেন ?

আমার হাসি পেল। বললুম—বেশি দিন নয়। এই পরশু সন্ধ্যেবেলা।

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ হেসে ফেললে। সে আবার কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি বুঝি মেলা দেখতে এসেছো ? সে বললে—না বাবা, আমরা শহরে চলেছি। এখানে মেলা দেখতে এয়েছি। সে বললে—আমরা গায়ক। শহরে ও মেলায় গান গেয়ে পয়সা রোজগার করি। ছ-মাস ঘরে থাকি ও চাষবাস করি আর ছ-মাস ঘুরে বেড়াই গান গেয়ে গেয়ে।

এ শ্রেণীর লোক এর আগেও আমি অনেক দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলুম— তোমার স্ত্রী সঙ্গে আছে তো ?

সে বললে—হ্যাঁ আছে।

আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় পাশের ঘরে একটি যুবতীকে দেখেছিলুম। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলুম, ঐ বুঝি তোমার স্ত্রী ?

সে বলে যেতে লাগল—তুই বিয়ে। বড়ো স্ত্রী ছেলেপিলে নিয়ে বাড়িতেই থাকে, আর তার বয়স হয়েছে ঘুরতেও পারে না। কাজেই তাকে আবার বিয়ে করতে হয়েছে।

সে আরও অনেক দুঃখের কাহিনী জানিয়ে বললে, তোমার মতো যদি কোনো গুণ জানা থাকত, তাহলে এত কষ্ট পেতুম না।

মনে হল বলি, তাহলে বৃদ্ধ বয়সে ফাঁসি হত।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না। বিমর্ষ হয়ে বসে রইল। আমি তাকে বললুম—দেখো, ভগবান তোমায় যা গুণ দিয়েছেন, তাতে বনের পশু বশ হয়। তুমি দুঃখ কোরো না, তুমিও গুণী।

বৃদ্ধ বললে—কিন্তু এ গুণে আমার পেট ভরে না। তুমি সাধু লোক, তুমি যদি দয়া করো।

আমার কি আছে বাবা! আমি গরিব, তোমার চেয়েও গরিব!

বৃদ্ধ এবার একটু হেসে বলে—তোমার কাছে যা আছে তার একটি কণাও যদি আমায় দাও, তাহলে—

অবাক করলে! কি চায় এ বৃদ্ধ আমার কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি চাই তোমার বলো, আমার সাধ্য থাকলে দেব।

এবার সে একটু প্রফুল্ল হয়ে বললে—তোমার গুণ আমায় শিখিয়ে দাও। বেশি না, একটুখানি।

বৃদ্ধ আমার হাত চেপে কাতরস্বরে বলে যেতে লাগল—তোমার ভালো হবে—আমি বলছি তোমার ভালো হবে। ঘরে আমার বাচ্চারা রয়েছে, তাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।

তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল।

আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। এখন এ থেকে উদ্ধার পাই কি করে তাই ভাবতে লাগলুম। এদিকে বৃদ্ধের কান্নার বেগ বেড়েই চলেছে। শেষকালে তার হেঁচকি উঠতে আরম্ভ করলে। তার মুখ দেখে আমার ভয় হতে লাগল—এও কি সাপুড়ের মতো দাঁত খিঁচিয়ে পড়বে নাকি!

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—দেখো, এ বিদ্যে গৃহস্থকে শেখাতে মানা আছে। তুমি যাও, আমি এখন বেরুচ্ছি।

বৃদ্ধ ওঠে না। শেষকালে ওর হাত ধরে বের করে দিয়ে তখনকার মতন আত্মরক্ষা করলুম।

মেলায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে অবধি কাটিয়ে ঘরে এসে রান্না চড়িয়েছি, এমন সময় মিঠে স্বরে ডাক এল—বাবু সাহেব!

—কে!

মুখ তুলে দেখি সেই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা চৌকাঠের কাছে দরজাটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললুম, ওখানে কেন? ভেতরে এসো।

তরুণী যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনি অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল। সংকোচে তার পা উঠছিল না। আবার বললুম, এসো এসো, দাঁড়িয়ে কেন? বসো।

এবার সে ভয়ভঙ্গুর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কি রান্না হচ্ছে?

মনে মনে বললুম—তোমাদের মুণ্ডু। প্রকাশ্যে বললুম—খিচুড়ি, খাবে?

না, বলে সে কম্বলের উপর ধপাস করে বসে পড়ল।

বললুম—খাও না, বেশ রান্না হয়েছে।

সে বললে—না, তোমরা মাছ খাও।

—কে বলেছে?

—আমার স্বামী।

বোঝা গেল যে আমার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তাদের আলোচনা হয়েছে। এটাও বুঝতে পারলুম, রাত্রে আমার ঘরে এসে এই যে ভাব জমাবার চেষ্টা, এর মধ্যে অনেকখানি সেই বুড়োর কারসাজি।

মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা হিসাব-নিকাশ করছি, এমন সময় তরুণী বলে উঠল—খুব জব্দ করে দিয়েছিলে তুমি সেই সাপুড়েটাকে।

এই কথা বলে সে হাসতে লাগল। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে সে কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আমি উনুনের ধারে বসে মজা দেখতে লাগলুম। তরুণী কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল, তখনও তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। সকালবেলা স্বামী এসে কাঁদতে শুরু করেছিল, রাত্রিবেলা স্ত্রী হাসতে শুরু করলে, ব্যাপার কি! আমি উনুনের কাছ থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কাছে আসতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। সুন্দর তার মুখ, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটি। অমন কালো আর অমন পরিষ্কার চোখ আমি আগে দেখিনি। সেই স্বচ্ছ চোখ দুটোর ভিতর দিয়ে তার অন্তরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমি বললুম—জব্দ যে যার নিজের দোষেই হয়, কে কাকে জব্দ করতে পারে।

এবার সে আর কোনো ভনিতা না করে একেবারে বলে ফেললে—বাবু তোমার বিদ্যে আমায় একটু শিখিয়ে দাও না।

এইটেই আমি আশা করছিলুম। বললুম—মেয়েমানুষে এ বিদ্যে শিখতে পারে না।

সে বললে—তবে আমার স্বামীকে শিখিয়ে দাও।

—না, তাকেও শেখাব না।

তরুণী কোনো কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

আমি বললুম—এবারে তুমি যাও। আমি খাব।

—তা খাও না।

—না, কারুর সামনে আমি খাই না।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে উঠে চলে গেল।

তরুণীকে যে তার স্বামীই পাঠিয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কি কথা হয় শোনবার জন্যে

আমি আস্তে আস্তে তাদের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আসবার আগে বোধহয় দু-একটা কথা হয়ে গিয়েছিল। শুনলুম তরুণী বলছে, মেয়েমানুষের এ বিদ্যে হয় না।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে শেখাবে না?

তরুণী বললে—সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিছুতেই শেখাতে চায় না।

বুড়ো বললে—আবার যাবি, কিছুতেই ছাড়িসনি। দেখব তুই কেমন বাহাদুর।

তরুণী কিছু না বলে গুন গুন স্বরে গান শুরু করলে।

বুড়ো বললে—গান থামা। আমার কথা বুঝতে পারলি? কাল সকালে যেমন করে হোক রাজী করাবি।

তরুণী বললে—আচ্ছা আমি ঠিক করে নেব।

ঘরে ফিরে এসে মতলব আঁটতে লাগলুম। কালই এস্থান হতে লম্বা দিতে হবে। বেশি দিন থাকলে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া মুশ্‌কিল হবে। পরদিন সকালে আসন তুলে সরাই থেকে সরে পড়বার মতলব করছি, এমন সময় একমুখ হাসি নিয়ে তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুকল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি, অত হাসি কিসের?

সে বললে—আমার স্বামী মেলাতে গেছে, তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলুম।

—বটে। এসো, ভেতরে এসে বসো।

কম্বলটা আবার বিছিয়ে দিলুম। তরুণী তার ওপরে বসে বললে—কোথাও বেরুবে নাকি?

বললুম—হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেল এবার যেতে হবে।

তরুণী বললে—এরিমধ্যে কোথায় যাবে? মেলা আগে শেষ হয়ে যাক, আমরাও চলে যাব, তুমিও চলে যেও।

—সে তো অনেক দিন। অতদিন থাকা আমার চলবে না।

তরুণী এবার একটা চোরা কটাক্ষ হেনে বললে—তবে যাবার আগে তোমার বিদ্যা আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও।

ভাগ্যে আমার কোনো বিদ্যাই ছিল না, তা না হলে সমস্ত বিদ্যার বোঝা তখুনি সেই অতল কালো আঁখিসমুদ্রের কূলে নামিয়ে দিতে হত। বিদ্যা নাই বলে

একবার আপসোসও হল, কিন্তু তখুনি মগজটাকে ঠিক করে তরুণীকে বললুম—দেখো, তোমার স্বামী তোমার উপর অত্যাচার করে ?

একটি চালেই তরুণী মাত! তার ছলছল চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে সজল হয়ে উঠল। সে বললে—মারে বাবু, বড্ড মারে।

—তুমি আবার তোমার স্বামীকে এই বিদ্যে শেখাবার কথা বলছ! একবার শিখলে আগে সে তোমার ওপরে প্রয়োগ করবে। দেখেছো তো সেই সাপুড়ের অবস্থা।

আমার কথা শুনে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেছো তুমি, তা না হলে তার এ বিদ্যে শেখবার কি দরকার।

আমি বললুম—আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, সাপ কত রকমের জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হয়, এ বিদ্যা জানা থাকলে আমার অনেক সুবিধা হয়।

তরুণী এবার সরে বসে মিনতির স্বরে বললে—বাবু সাহেব, কখ্খনো তুমি ওকে শিখিও না। তা হলে আমার রক্ষে থাকবে না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম—ক্ষেপেছো তুমি ? নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ওকে কিছু শেখাব না। তরুণী তার ডান হাত থেকে আঁচলটা তুলে একটা দাগ দেখিয়ে আমায় বললে—এই দেখো মারের দাগ।

বললুম—আহা, বুড়োটা ভারী পাজী তো। সহানুভূতির কথা শুনে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—বাবু, তুমি আমায় নিয়ে চলো। আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যাব। যা করতে বলবে তাই করব—শুধু আমায় মেরো না।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে আবার বললে—চলো বাবু, বুড়ো নেই এইবেলা চলো।

প্রমাদ গণতে লাগলুম! এ যাত্রায় দেখছি কিছু না ঘটে আর যায় না। যেদিকে তাকাই সেদিক থেকেই একটা না একটা বিপদ এসে হাজির হয়।

সে আবার বললে—নিয়ে যাবে আমায় ?

তার মন ভোলাবার জন্য বললুম—গাইতে পারো ? সে বললে—পারি।

—একটা গান শোনাও না।

বলামাত্র একবার গলা খাঁকারি দিয়ে গান শুরু করলে।

সুন্দর তার গলা। আর কী অবলীলায় সে গাইতে লাগল! সে গানের ভাষা এখন আর মনে নেই, তবে তার ভাব হচ্ছে—যমুনার দু-কূল ভরে মেঘের গায়ে

ছায়া নেমেছে। দেবকীর কালো ছেলে সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করে বাঁশি বাজাচ্ছে। রাধার কানে সে আকুল আহ্বান গিয়ে পৌচচ্ছে, বাইরে যাবার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার, পৃথিবীতে কেউ কোথাও নেই, মিলনের এমন অবসর আর হবে না। কিন্তু রাধা যে পথ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবে সেই পথেই তার গুরুজন বসে রয়েছে। কেমন করে সে অগ্রসর হবে?

গানের প্রতি কথায় সে কী দরদ, সে কী আকুলতা!

গান চলেছে, এমন সময়ে তার স্বামী এসে উপস্থিত হল। স্বামীকে দেখে তরুণী গান থামিয়ে ফেললে।

আমি বললুম—থামলে কেন?

তরুণী যেমন হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ গান শুরু করলে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারা যেতে লাগল, এ যেন সে গান নয়। গানের মধ্যে সে দরদ আর সে আকুলতা নেই। একটা দম-দেওয়া মানুষ-পুতুল যেন গেয়ে চলেছে।

গান থেমে গেলে একটা সিকি তাকে দিয়ে বললুম—এই নাও, তোমার গান শুনে আমি বড়ো খুশি হয়েছি।

সিকিটা তখুনি ফিরিয়ে দিয়ে বললে—আমি পয়সা চাই না, তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বৃদ্ধকে বললুম—তোমার স্ত্রীর গলা ভারী মিষ্টি, বেশ গান গায়।

বৃদ্ধ বললে—মন দিয়ে তো শেখে না, তাহলে ও এর চেয়ে ঢের ভালো গাইতে পারত। আমার বড়ো স্ত্রীর বয়স ওর চেয়ে দশ বছর বেশি হবে, কিন্তু ওর চেয়ে ঢের ভালো গায়।

আমি বললুম—ও!

বুড়ো উঠতে উঠতে বললে—বাবু, আমার ওপর দয়া হল না?

তার কথায় কোনো উত্তর দিলাম না দেখে সে আস্তে আস্তে চলে গেল।

কম্বলটা গুটিয়ে রাখছিলুম, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বুড়োর চিৎকার শুনতে পেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনি, সে তার স্ত্রীকে বলছে—যা, পয়সা নিয়ে আয়। তরুণী কিছু বললে না।

বুড়ো বলতে লাগল, ভারী বদমাশ! এত করে বললুম কিছুতেই শেখালে না। ওর সঙ্গে আবার খাতির কিসের! যা এখ্খুনি যা।

সেখান থেকে সরে এলুম। একটু বাদেই তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুকল। প্রথমে আমি কিছু বললুম না। সে এসে দরজাটি ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম—সংকোচে সে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না।

অবস্থাটা সরল করবার জন্য বললুম—কি ?

সে বললে, কিছু না। আজ রান্না করবে না ?

—না, আজ আর রাঁধব না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে চলে যাবার উপক্রম করছে দেখে আমি বললুম—তোমার পয়সা নিয়ে যাও।

—পয়সা! তোমার কাছ থেকে আমি পয়সা নেব না।

এরপরে আর কিছু বলতে পারলুম না। সে বললে—দেখো, তুমি যে চলে যাবে বলেছিলে, তা এখ্খুনি যাও না।

—কেন ?

এ কেন-র জবাব সে দিল না বটে, কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে আমার দেরি হল না। কম্বলটা গুটোনোই ছিল। তখুনি সেটা বগলে নিয়ে উঠে পড়লুম। যাবার সময় আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—আমায় মনে রেখো।

সরাই থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তা ধরে উত্তরমুখো পা চালিয়ে দেওয়া গেল। লোকে বললে—এই পথ একেবারে দিল্লী অবধি গিয়েছে। জনহীন ধূসর পথ। দু-পাশে জঙ্গল, কোথাও নিবিড়, কোথাও ফাঁকা। এরই ভেতর দিয়ে আমার মন ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে মনেরই কোনো অজানা স্থানে। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। দূরের আবছায়াগুলো অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে আমার চারপাশে এসে জমতে লাগল। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টির জল আমার রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দেহের ওপর পড়ায় চমকে উঠলুম। ওপর দিকে চেয়ে দেখি চিরবিরহী আকাশের নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। আমার মনে পড়ল পেছনে ফেলে আসা সেই তরুণীর কথা, তার সেই অশ্রুসজল কালো চোখের কথা—যার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, অথচ এই চিরবিরহের ছলে যার সঙ্গে চিরমিলন হয়ে রইল, তার কথা।

চারদিককার এই আলো-আঁধারের আবছায়া ভেদ করে তারই মৃদু কণ্ঠ আমার কানে এসে বাজতে লাগল—আমায় মনে রেখো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ॥ রোমান্স
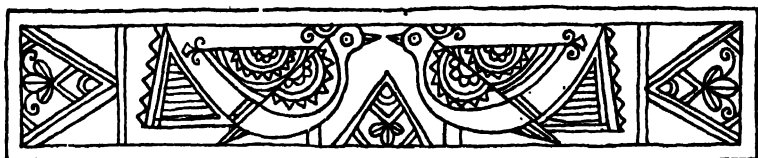
সমীরই প্রথম কথাটা তুললে।

তার মত এই যে রোমান্স প্রেম ওসব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে মনে হল। ক্রমে ক্রমে বাকি সবাই সমীরের মতেই মত দিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌঁছলো অন্য সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম-কেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনো কথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—দেখো তোমরা এতক্ষণ বকে যাচ্ছিলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে—সে চোখে দেখে কজন—দেখবার চোখই বা আছে কজনের? আচ্ছা, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এসো খেয়ে নেওয়া যাক—শোনো তারপর বলি…

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বর, মাস চারেক হল যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, দাবা কোনো খেলাতেই কোনোদিন তিনি যোগ দেননি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠে চলে যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে খুব পছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটা জিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে

তিনি উঠে চলে গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনোদিন বলত না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখ মুছে গল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও প্রচারের কার্যে ঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে একদফা পদ্মার ওপর স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে নটা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায় পৌছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনি শহরের একজন বড়ো উকিল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠব এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পৌছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ছোট্ট ফুলবাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকেবেঁকে উঠেছে—আলো-আঁধারে পাতার আড়ালে বড়ো বড়ো ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান রুটিসেঁকা ফেলে গাড়ির কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম উকিলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন-চার দিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই। কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাক-বাংলোতেই অগত্যা উঠব—একটি ছেলে বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দরোয়ানটিও এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে, 'বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনি যাবেন না—শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। ,রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও।'

সুতরাং রয়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হল, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে বসে কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকিলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাই তাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে।

গৃহস্বামী গাড়ি থেকে নেমে আমায় দেখে আমার পরিচয় জেনে খুব খুশি হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথা অন্তত দশবার এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে মনে হল রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাতে আমার আহারের স্থান হল বাড়ির মধ্যে দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরের ঘরে একটি বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর ডাগর চোখ, কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি খুকী এ-বাড়িরই না? নাম কি তোমার?

সে হেসে বললে—বীণা।

তারপরই সে চলে গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চলে গেল না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি স্কুলে পড়ো—না?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস্ স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড়ো?

—এবারে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুআরি মাসে···

—কি কি বই পড়ো?

কিছুক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চেয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো। বললে—আপনি বুঝি বই লেখেন?

—কি করে জানলে বলো দেখি?

—আপনার নাম দেখেছি, আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে······

—কই, কোন্ মাসিক পত্র, আনো তো দেখি।

বীণা দু-তিনখানা মাসিকপত্র নিয়ে এল।

একখানাতে আমার "বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্তব্য" বলে একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ বার হয়েছিল বটে, সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্প করতে লাগলো। আমি তাকে মুখে মুখে ট্রানস্লেসান্ জিজ্ঞাসা করলাম, সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকা মিউজিয়াম

দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটায় কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধরে ঘরে বসে রইলো—মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাতে কি জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলী গলায় কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিয়োমেট্রি পড়ছে—Two tangents can be drawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—, ভারী আশ্চর্য লাগলো। বীণা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ফোর্থ ক্লাসে জিয়োমেট্রির ট্যান্‌জেণ্ট কোনো স্কুলেই পড়ানো হয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটা বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটের সময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছে হল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা শেষরাত্রে কে জিয়োমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি ?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকে একজামিন বসবে কিনা ?

আমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি ? স্কুলের গাড়িতে তো তুমিই একলা যাও দেখেছি……

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বারে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তো অ্যালাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে ?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়-চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনেরো-ষোলো হবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীর দাঁতে কুঁদে তৈরি। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্ত গতিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন ?… ..পরে একটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন, না ?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে স্কুলের গাড়ির সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেই বলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকেলে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন—ঐ তো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি। দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে ও-বেলা…

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও ভদ্রলোকটি কে রে?

মনে মনে অভিমানে বড়ো ঘা লাগলো, বড়ো-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু আজ ছ-সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছি, এতদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকুও কি তাঁর কর্ণগোচর হয়নি?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম, তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনোদিনও। সুতরাং বীণার সঙ্গে দেখা হবার সময় হত না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতে বসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিত ভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—ঠাকুর দু-বার তারপর আমি দু-বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা?

আমি কৈফিয়ত দেবার আগেই সে আবার বলে উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারি থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানোই আছে……

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্ত ভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে অনর্গল বকে যেতে লাগলো—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিই বেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়ে বললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি…

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালির ধরন আমার জানা ছিল কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পরদিন সকালে সে এল—হাতে একখানা 'বঙ্গ-বন্ধু'। আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন

দিকি বুঝিয়ে ? লাল পেন্সিলে দিদি দাগ দিয়েছে জায়গাগুলো। সেই মাসের 'বঙ্গ-বন্ধু'তে আমার "যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য" বলে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক্ লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন পনেরো ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি যাতায়াত এবং নানান্ Year-Book নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হল ?

বীণা বিকেল বেলা একখানা খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে নিন—নিয়ে দিদির এই ট্রানস্লেসানটা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো। দিদি বললে আপনাকে দেখাতে··· ··

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রানস্লেসান্টা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি ? তখন একটু আমৃতা আমৃতা করে বললাম—নম্বর ? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি······

মোটে ? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরাজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলুঃ—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা ?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রানস্লেসান্ দেখে দিতে হবে—পারবেন তো ?

খুব—খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে। কেন দেখে দেব না ?

সেদিন থেকে আমার কাজ হল রোজ রোজ এক রাশ করে ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতার শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রীটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েক দিন খুব গুমোটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হল। উকিলবাবুর বাড়ির সামনে একটা বড়ো বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কতদিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষা নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে

মাটির গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে······মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্তু হয়তো এতক্ষণ আমাদের উঠানের বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে খেলা করছে, ·· ···গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাসের খুব মজলিস বসেছে··· তখন মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকুরি-বাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকিলবাবু কয়েক দিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারিও যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন—ক-দিন আপনার খোঁজ-খবর করতে পারিনি, কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রানস্লেসান্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস-টাস করবে? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি—মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময়মতো? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুআরি মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার······

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশিই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা, কোনো কোনো দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারী মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যা অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রানস্লেসান্ দেবার পরে সে মুখ নিচু করে হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন···

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে দেখবে এখন সোজা···

সে পুনরায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন···

যে সুরে সে কথাটা বললে, সেটা অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হল এরপর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়-বৃষ্টি নামলো—এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম কেদারাটাতে বসে আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হল।

চেয়ে দেখি আগে আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোনো সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টারমশায় ?

—এসো এসো, ভিজতে ভিজতে এলে যে ?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল্ গিয়ে গল্প···

প্রতিমা তার দিকে ভ্রূকুটি করে বললে—আমি ?

পূর্বেও কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হল, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপ খাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দুটি চোখ ও ভুরু দুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরনের সৌন্দর্য মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে—একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না? বসে বসে লেখেন বুঝি। উঃ, কী শক্ত লেখাই লিখেছেন—আচ্ছা অত পার্সেণ্টেজ, গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ ?

—মুখস্থ কি আর থাকে! ও-সব লাইব্রেরিতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year-Book হয়ে উঠবো যে···

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায় ?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিয়োগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে ?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিয়োগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি···

বীণা বললে—আমাদের ক্লাসের জিয়োগ্রাফিতে বর্ধমান জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না মাস্টারমশায় ?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিম ঘেঁষে···

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি ? আচ্ছা, ও কি করে হয় ?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগ বিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাত্মা ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি। একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য, অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা, অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোনোদিন —স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচু গলায় শাসনের স্বরে বলছে, কানে গেল—ও-রকম মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারী খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েক দিন পরে হঠাৎ কলকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম আপিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধাছাদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে? দিদি বলে দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ করে আয়, কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হল। পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটলো, দশটার গাড়িতে আমি চলে যাবো, উকিলবাবুও আমার সঙ্গে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো। সকালে দুজনে একসঙ্গে মাঝের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকিলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। আজকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকিলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেলায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে আমি অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখেছেন তো একবার কাণ্ডখানা? বলি এটা কি

ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না, আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু, আমি আজকালকার ও-সব বিবি-সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। খুব হয়েছে, পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে

আমার সামনে এসব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যপথবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেননা আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের সামনে পরিবেশন করতে বেরুলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে নিজের ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরেই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে, দুধ-মিছরি খেয়ে নিন……

—দুধ-মিছরি কেন বলো দেখি?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময়ে তাকে দুধ-মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে দিলে রমেনবাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে……

গত তিন দিন প্রতিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আজ এইমাত্র এই যা খাবার সময়ে দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়েও দেখা হল না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময়ে আমার কাছে ছিল। আমার মনে কয়েক দিন ধরে একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনোদিন। তিনি……

—আমার মা এক মাস হল মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোট-মামার বিয়েতে—এই বুধবারে আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই……

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—বা রে, অ্যাদ্দিন আছেন তাও জানেন না বুঝি? আপনার মন থাকে কোথায়? একদিন তো আপনার সামনে এ-কথা হয়ে গিয়েছে না?

কবে পূর্বে এ-কথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হলেও এতদিনের একটা খটকা আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে এতখানি তফাৎ! কথাটা অনেকবার মনে হলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এতদিন। অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে উকিলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম।

আজ কয়দিনের তো জানাশোনা—কিন্তু চলে যাবার সময়ে মনে হতে লাগল, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকাগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেক দূর পেছনে পড়ে গিয়েছে—আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা, ঐ পাতাবাহারের গাছটা, বাইরের উঠানের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড়ো প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্যে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোনো দাবি-দাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র। তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন বাড়ি থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পূজার পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ আপিসের হুকুম হল আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মতো ভিড় ছিল না। পদ্মাবক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মতো নীল। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে কিন্তু বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাকবাংলোয় উঠলাম। নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বারবার অনাহূতভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্নাপক্ষ ঘুরে এল। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না ঝোপের মিঠা মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষ্মীছাড়ার মতো ডাকবাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরাবহুল হস্তের ডালভাত ও সুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হলে তার সহ্য হয়নি, নানা অনুযোগ করে ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে

আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্যে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। এক একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্যকে অন্য কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমায় কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু 'ভারতমাতা ব্যাঙ্কের' শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝমঝম তোপের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠল। একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি হাতে নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে গেলাম—যেন এই পথ দিয়েই অন্য কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখে পড়ল বাড়ির ওপরের ঘরের সব জানালা বন্ধ। উকিলবাবুর আপিসঘরের সামনে রামধনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা…কি করা যায় বা কাকে ডাকব ভাবছি এমন সময়ে উকিলবাবুর পুরানো খানসামা ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায়?

—আপনি শোনেননি, জানেন না কিছু?

পরে সে একে একে যা বলে গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্র মাসে উকিলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তার ওপর আরও বিপদ—বড়ো দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মতো হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তার মা নিজের বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন। বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দরোয়ান আর সে ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্য চাকর-বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাকবাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকবাংলোর নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠল ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে।

পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময়

মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে আপিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার আপিসে বড়ো বড়ো রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাকবাংলোর বেয়ারা বললে, আপ্‌কো পাস এক আদমি আনে মাংতা হ্যায়।

একটু পরেই দেখি উকিলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের স্বরে বললাম, কি মনে করে?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ি এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি সেদিন বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কি না, থাকলে আমাদের বাড়ি অবশ্যি করে একবার আসতে বলে আয় আমার নাম করে। আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে দিলাম, আপিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব দেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা 'চাই গরম গরম বাখরখানি' বলে হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম। একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর ভালো আছে?

—একরকম মন্দ নয়। তোমার—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধহয় উচিত ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটা কতক মামুলী কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়ের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়! ডাকবাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই।

বীণা কথাটা এমন হুকুমের স্বরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার ভাবে নানা অনাবশ্যকীয় কথা ওঠালাম, যেন প্রধানত সেইগুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হেঁটে এসেছি।

শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায়? এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারিনি।

বীণা বললে, দিদি এখনও সারেনি। বড়ো-মামাবাবু সঙ্গে করে তাকে চুনার নিয়ে গেছেন, সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে বসে কি ভাবে, এছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই। কিন্তু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাতদিন বসে বসে ভাবছে—ঐ তার রোগ……

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে · ……

বীণা বললে, শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা তার এক সম্বন্ধ ঠিক করলেন। চাটগাঁয়ের উকিল, হাতে পয়সা আছে, কিন্তু তেজ পক্ষের বর, বয়স চল্লিশেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়ে খবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারির দরখাস্ত করে, চাকরিও পায়—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড। তারপরই পরীক্ষায় ফেল হল, সে আবার এক কাণ্ড। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে এ বিয়ে ঠিক হত। এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল। চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোনো দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারির দরখাস্ত করেছিল সে শুধু অপমানের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জলখাবারের রেকাবি আর জলের গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে, আসুন দিকি, খেয়ে দেখুন তো চা-টা—তবে কি আর আপনার ডাকবাংলোর বাবুর্চির মতো হয়েছে?

বীণা আগেকার চেয়েও সুশ্রী ও মাথায় বড়ো হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরনগুলো ঠিক আছে, একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে—কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো? আমি

মাকে বলছি, আপনি না এলে ভারী রাগ করব কিন্তু বলে দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাকবাংলোয় পাঠিয়ে দেবো এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, এবারকার আপিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশি দিন আর ঢাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এরপর যখন আসব—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশি কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে তবে একটু দেরি হয়ে যাবে হয়তো এই বেলা নটার মধ্যেই আসব। বীণা খুব খুশি হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাব। চলে আসবার সময়ে আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন।

ডাকবাংলোয় ফেরবার পথে সে দিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠল—হঠাৎ বীণারা আমার বড়ো আপন হয়ে উঠেছে। এত অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনি পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্তত তার কোনো কার্পণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এ রকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড়ো সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে দেখতে শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দর ভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবা প্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগতকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভরে রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসে মনে-প্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে···রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয়·· নৈশ পাখির ডাক দূর থেকে ভেসে আসে··· মনের মধ্যের নাম-না-জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে নিজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ডাকবাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরানো বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ইন্সিওরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জে কাজে এসেছেন এবং সেইখানেই আছেন। তাঁর নামে তাঁর একটা মনি অর্ডার এসেছে কিন্তু সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে টাকা দিচ্ছেন না। এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায়?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকি-

দারকে বলে গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলবে যে আমি জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে গিয়েছি, আজই ফিরব। নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা। পোস্টমাস্টার আমাকেও চেনেন না, টাকাও কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু-একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তারা টাকা-কড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাকবাংলোয় ফিরেই আপিসের চিঠি পেলাম বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে। চিঠি এসে দু-দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ডাকবাংলোর চাপরাশি বললে রঘু মিশির দু-দিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই বীণার সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হল চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা।

তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে এক মাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হল। আপিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে, শীঘ্র কাজে যোগ না দিলে অন্য লোক বহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই এতদিন পরে আজ ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড়ো রোমান্সের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো—এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—কখন কে জানতো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরের জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল। মাত্র নির্জন অবসর মুহূর্তে, বার লাইব্রেরি কক্ষে মক্কেলহীন দুপুর বেলায়, মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মতো ঠেকে।

এই সব স্মৃতিতেই জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক পাখি,

ফুলে-ফলে সকাল ছুপুরের সঙ্গে সুরমেলানো অনন্তমুখী সঙ্গীত এদেরই নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউণ্ড, গেটের ওপরকার লোহার জালতিতে থোকা থোকা মাধবীলতার গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না। বীণা!...

কিন্তু এ কোন্ বীণা? চার বছর আগের সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্যসুন্দরী, ধীরা, সংযতা তরুণী। মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভালো। বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়াছেন। বীণা চোখ নিচু করে ছিল, আমায় দিকে চায়নি, সে বোধহয় জানেও না যে আমিই পাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ওরকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোনো কথা বললাম না। শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হল না, এমনই ছুজনে ছুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফোটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা? তলে তলে বুঝি এইসব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধহয় কিছুতেই এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় ছুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে? আর এলেন না কেন সেবার? সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসেনি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সংযত স্বরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারেই মাঘ মাসে মারা যায়। মাথা তার ভালো হয়নি। আপনার নাম বড়ো করত, আমার কাছে কতদিন বলেছে।

রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪—) ॥ যৌবন

ধু ধু করে বিশাল প্রান্তর। শুকনা মাটি আর ধূলা, ধূলা আর মাটি। মাটির ডেলাগুলি রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া লোহার গোলার মতন গরম হয়। মাঠের দিকে আর চাওয়া যায় না।

ফসলের সময় কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ওঠে। লোকে বলে বাসা। ধান কাটা হইলে যে যার বাসা ভাঙিয়া নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যায়। থাকে শুধু একখানা ঘর আর দুটি প্রাণী। তারা দুটিতে কিছু দিন হইল এইখানে নীড় বাঁধিয়াছে। আর ভাঙে নাই।

বর্ষায় যখন চারিদিকে থৈ থৈ করে জল, মাঝি-মাল্লারা তখন দূর হইতে এই কুঁড়ের আলো দেখিয়া বিলের মধ্যে পাড়ি ধরে। বলে, ভাগ্যিস্ বুড়া বয়সে হীরালাল ভালবাসার চেরাগ জ্বালছিল।

হীরালাল সচ্ছল গৃহস্থ, পাঁচখানা তার হাল, সাতটি বলদ, টিনের ঘর তিনখানা। মরাইভরা ধান, ঘরভরা পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতিনীর দল। মানুষটা তার জাতের মাতব্বর। তাই বৃদ্ধ বয়সে সে যখন সংসার ছাড়িয়া তরুণী সুভদ্রাকে লইয়া বিলে আসিয়া ঘর বাঁধিল, ব্যাপারটা আর গোপন রহিল না। জানিল পরগনার যুবা-বৃদ্ধা তরুণ-তরুণী সবাই।

সুভদ্রা বালবিধবা। হীরালালের বাড়ির ধান ভানে। এক বেলা ভাত পায়, আর এক বেলার জন্য পায় নারিকেলের মালার একমালা খুদ। উহার কিছু সিদ্ধ করিয়া খায়। বাকিটা বেচিয়া তেল-নুনের সংস্থান করে। থাকে হীরালালের ঢেঁকিঘরের এক পাশে। সে এই জায়গাটুকু দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে।

নিজের অবস্থা সম্পর্কে মেয়েটি বেশ সজাগ। আশ্রয়দাতার বাড়ির সচ্ছল

আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে সে একপাশে গুটাইয়া রাখে। তরুণদের দিকে মাথা তুলিয়া চায় না। মেয়েদের খুশি রাখিবার চেষ্টা করে। হীরালালকে সম্বোধন করে 'আপনে' বলিয়া।

কিন্তু প্রকৃতি দৈন্যের বাধা মানে না। তার সমস্ত অঙ্গ যৌবন লাবণিতে ভরিয়া ওঠে। হীরালাল বলে, যৈবন বটে ভদ্দরার—আমার পাছদুয়ারের পাকুড় ব্রেক্ষডার মতন।

তার পাছদুয়ারে অর্থাৎ অন্দরমহলের দিকে একটা পাকুড় গাছ আছে। তিন বছরের গাছটা এরই মধ্যে আশপাশের পুরানো হিজল বরুণ নইল নোনা গাছ-গুলিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে—সুভদ্রার দৃপ্ত যৌবনভঙ্গির কাছে যেমন হার মানিয়াছে আশপাশের দশ-বিশ বাড়ির তরুণীর দল।

এই যৌবন একদিন গভীর রাত্রে হীরালালকে ঢেঁকিঘরে টানিয়া আনিল। ব্যাপারটা এমনিই অভাবনীয় যে, তরুণী ভয়ে ও বিস্ময়ে কোনো প্রতিবাদ করিল না।

গরিবের মেয়ে সে, অসহায়। তার নামে অল্পবিস্তর নিন্দা-কুৎসা ছিল। চৈত্র বৈশাখে কচি আমের ঝোলের মতন লোকে তাতে তৃপ্তি পাইত। কিন্তু হীরালালের কোনো দুর্নাম ছিল না। লোকে বলিত, মানুষটা দ্রেঢ় যেন শালের খুঁটি।

সেই মানুষ সুভদ্রাকে লইয়া ঘর ছাড়িল। নীড় বাঁধিল বাসাইলের বিলে।

দুজনে আছে বেশ। এই বিলে তার দশ বিঘা জমির চার বিঘা হীরালাল নিজে চষে। বাকিটা চাষ করে ছেলেরা। হীরালাল জমিতে ধান কলাই পায়, ফুটি কাঁকুড় কুমড়া প্রভৃতি আনাজও পায় পাঁচ রকম। সে চাষ করে, মাছ ধরে, হাট হইতে তেল নুন মসলা কিনিয়া আনে। সুভদ্রা রাঁধে, উঠান ঝাঁট দেয়। ঘর লেপে, মাঠ হইতে গোবর আনিয়া ঘুঁটে দেয়।

হীরালাল মশগুল হইয়া থাকে। নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে সুভদ্রাকে আদর করে। বলে, সোনাটুকু আমার, মণিটুকু আমার। হাট হইতে লাল লাল জিলাপি আনিয়া তার মুখে পুরিয়া দেয়। মাঠের ছোট ছোট কচ্ছপ আনিয়া বলে, এই দিয়া বেন্নুন রাঁধ্, লগে কাঁচা ফাপুয়া দিস্ কিন্তু—

পেঁপেকে সে বলে ফাপুয়া। কাঁচা পেঁপে দিয়া কাছিমের মাংস তার বড়ো প্রিয় খাদ্য।

এইভাবে কাটে চার বৎসর। চার চারবার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঘুরিয়া আসে। শরতের চাঁদ দুগ্ধ-ধবল চাঁদোয়ায় দিগন্ত ছাইয়া ফেলে। বসন্তের বাতাসে শীতশুষ্ক প্রকৃতি আবার সঞ্জীবিত হয়। বর্ষায় ঘরের মধ্যেও তাদের মাচা বাঁধিয়া থাকিতে হয়। মাচার উপরেই হয়তো মাছ লাফাইয়া ওঠে।

মনের আনন্দে হীরালাল গান ধরে, মোটা গলায় মেঠো গান। জলের উপর দিয়া গানের স্বর দিগদিগন্তে ভাসিয়া যায়।

কখনও কখনও সে বলে, তোর কোলে একটা ছাওয়াল দেখলে বড়ো সুখ পাইতাম, ভদ্দরা।

০০ দুই ০০

হীরালালের মনের আনন্দ বয়সের ভাঙন ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সমস্ত শরীর ঘিরিয়া এক জড়তা আসে।

স্ফূর্তির অভাব, আলস্য এসব কখনও তার ছিল না। কিন্তু আজকাল নড়িয়া বসিতেই ইচ্ছা করে না। কাজের মধ্যে যে আনন্দ পাইত তাহা আর নাই। কাজ করিতে হয় তাই করে, ঠিক যেন কলের পুতুল। একদিন সে প্রশ্ন করিল, এমন হইল ক্যানে রে, ভদ্দরা?

সুভদ্রা কহিল, ও ঠিক হৈয়া যাবে।

ঠিক আর হয় না।

মাস দুই পরের কথা। উজ্জ্বল দুপুর, বাংলার আর পাঁচটি চৈতালি দিনেরই মতন নীল নির্মল আকাশ। কিছু দূরে রূপমতীর গাঙ দিয়া পালের নৌকা যাইতেছিল। হীরালাল বলিল, কী সুন্দর হৈলদা পাল।

সুভদ্রা বলে, হৈলদা নয়, লাল।

লাল! চক্ষুরত্নও তা হৈলে গেছে—হীরালাল অত্যন্ত খেদের সহিত বলে, বয়স কিন্তু আমার অত বেশি না। ওপারের ডাক্তার ভুঁইয়ার দাদা প্যারী ভুঁইয়া এখনও বিনা কাচে পত্তর পড়তে পারে। আর আমি পালের রঙ ঠাহর করিতে পারি না। লালরে কই হৈলদা।

সুভদ্রা বলে, ভুল হয়তো আমারই হইছে। পালটা সম্ভব হৈলদাই ছিল।

তা নয় রে। ভুল তোর হয় না, হৈছে আমারই—বয়সের ভেরম।

ক্রমে ক্রমে অনেক কাজেই ভুল শুরু হয়, ভুল ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হীরালাল অনুভব করে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। সুভদ্রার কাজগুলি কী নিখুঁত, সে

কেমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সব করে। আঁকশি দিয়া পেঁপে পাড়িবার সময় যে পেঁপেটি পাড়িতে চায় ঠিক তারই উপর যাইয়া আঁকশিটা পড়ে। হাত একটু কাঁপে না।

আর সে তুলিলেই আঁকশিটা বেতের সরু ডগার মতন দোল খায়।

সুভদ্রার তৎপরতা বৃদ্ধকে তার অতীত জীবনের কথা মনে করাইয়া দেয়। যৌবনে তার কাজও ছিল এইরূপ নিখুঁত। জাল বোনা হইতে বেড়ার বাঁধ দেওয়া পর্যন্ত চাষী গৃহস্থের সব কাজই সে নিপুণভাবে করিত। ঢেকিতে চাল ও চিঁড়া এলানোর ব্যাপারে মেয়েরাও তার কাছে হার মানিত।

হীরালাল খাইতে বসিয়াছিল, সামনে তার প্রিয় খাদ্য কচ্ছপের মাংস, পেঁপে দিয়া রান্না করা হইয়াছে। সে বলিল, হইছে খাসা। মাংসু এমন রসুই করতে পারত শুধু বিশ্বাসের বৌ। আর আমাগো ছোট ঠাইরন।

সুভদ্রা বলিল, দি আর এট্টু?

তোর জন্য আছে তো?

এই সময় গেলাস তুলিতে যাইয়া হীরালালের হাত কাঁপিতে লাগিল। গেলাস পড়িল থালার উপর। মাংসমাখা ভাত আর জলে একাকার হইয়া গেল।

সুভদ্রা হাসিয়া ফেলিল।

হীরালাল বলে, হাসলি যে বড়ো?

সুভদ্রা কোনো উত্তর করিল না।

বল্ হাসলি কেন?

সুভদ্রা তবুও নীরব।

নিশ্চুপ রইলি যে হারামজাদী—বলিয়া হীরালাল আসন ছাড়িয়া উঠিতেই সুভদ্রা ভয়ে ভয়ে বলিল, আপনার হাত কাঁপা দেইখ্যা হাসছি।

অনেক দিন পরে সে আবার আজ আপনি বলে।,

হাত কাঁপা দেইখ্যা হাসছ, নিজের দেমাকে! আবার আপনে কও—বলিয়াই হীরালাল গুম হইয়া বসিয়া থাকে।

ভদ্দরা তাকে দেখিয়া প্রায়ই হাসে। ধরা পড়িয়াছে শুধু আজ। যৌবনে নিজেরাও বুড়া দেখিলে, বুড়ার থপথপ চলন দেখিলে হাসিত—হীরালাল, তার বন্ধু চন্নন মোড়ল আর খালেক মিয়া। দাঁত-পড়া মানুষের অনুকরণে তারা কথা বলিত। একদিন এক বুড়া তাকে অভিশাপ দেয়, দেখবি, তোরগোও মানুষে হাসবে।

সেই অভিশাপ আজ ফলিল।

সুভদ্রার হাসির পর হইতে তার দিকে চাহিলেই হীরালালের চোখ দুটি নিজের দেহের দিকে ফিরিয়া আসে। দেখে, কণ্ঠার হাড় বাহির করা, লোলচর্ম শীর্ণ দেহ। এই কঙ্কালের দিকে চাহিয়াই এতদিন পরে ভদ্দরা আবার তাকে আপনি বলিয়াছে।

নিজের বয়সের এই স্বাভাবিক পরিণতির জন্য সুভদ্রার উপর তার রাগ হয়। রাগ হয় আপনি বলার জন্য।

মনে করে, সুভদ্রা ছলনা করিয়া তাকে এখানে আনিয়াছে ঘরছাড়া করিয়াছে। বুড়া মানুষ সে—চোখের চেয়েও আগে তার মনে ছানি পড়িয়াছিল বলিয়া তরুণীর সেই ছলনা সে ধরিতে পারে নাই। এই সন্দেহ বৃদ্ধকে হিংস্র করিয়া তোলে। কথায় কথায় সে খুঁত ধরে, খিটখিট করে। সুভদ্রা নীরবে সব সহ্য করে বলিয়া আরও রাগিয়া যায়। বলে, ওটা একটা পশু, অর আবার তাপ উত্তাপ কি?

সেদিন দুপুরে হাট হইতে ফিরিয়া সে দেখে, উঠানে কতকগুলি গাছের পাতা ও খড়কুটা পড়িয়া আছে। সে গর্জন করিয়া উঠিল, উঠানডাও ঝাঁইট দিতে পারো নাই, বড়ো মানুষের বিটি?

সুভদ্রা কিছু আগেই ঝাঁট দিয়াছিল। বাতাসে গাছের পাতা উড়িয়া আসিয়াছে, উড়ন্ত পাখির মুখ হইতেও পড়িয়াছে দু-চারটা খড়কুটা।

সুভদ্রা রান্না করিতেছিল, সে কোনোও উত্তর করিল না।

হীরালাল বলিল, কথা কস্ না যে? বজ্জাতি তোর হাড়ে হাড়ে।

সুভদ্রা বলিল, দেখো না কাজ করতেছি।

কী! মুখে মুখে কথা—বলিয়াই হীরালাল ছুটিয়া গিয়া তার বাহুর উপর হাতের লাঠি দিয়া জোরে আঘাত করে। সুভদ্রার হাতখানা সঙ্গে সঙ্গেই যেন অবশ হইয়া যায়। সে বলিয়া ওঠে, মাগো।

সে বাঁ হাত দিয়াই অতিকষ্টে রান্না করিয়া হীরালালকে খাওয়ায়। নিজেও দুই গ্রাস মুখে দেয়। যন্ত্রণার চোটে পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না। যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। হাত ফুলিয়া ওঠে। সে ভিটার উত্তরে একটা গাছের নিচে আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকে।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের শব্দ হয়, যেন যৌবনের জয়গান। সূর্যের আলো আঁকাবাঁকা রেখায় তার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে।

বাড়ির ঠিক নিচেই ছোট ডোবা। একটা মাছরাঙা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার ধারে আসিয়া বসে, আবার উড়িয়া যায়। তার পাখার কাঁপন পর্যন্ত স্বভদ্রার চোখে পড়ে। সোনালী রোদে সবুজ পাখা আরও সবুজ দেখায়।

হঠাৎ পাখিটা ছোঁ মারিয়া ডোবা হইতে একটা মাছ তুলিয়া উড়িয়া যায়। লম্বা লাল ঠোঁটের নিচে সাদা মাছটা দু-একবার ধড়ফড় করে।

যন্ত্রণায় ক্লান্তিতে স্বভদ্রার চোখ একবার বুজিয়া আসে। ব্যথা বেদনা তার মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে—নিবিড় নীল আকাশকে যেমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য।

তার একটু তন্দ্রার মতন আসিয়াছিল। কতক্ষণ এইভাবে ছিল নিজেই জানে না। তন্দ্রা ভাঙিলে দেখিল পাশেই হীরালাল দাঁড়াইয়া। তার অনাবৃত বক্ষের দিকে চাহিয়া আছে।

স্বভদ্রা লজ্জায় বুকের কাপড় তাড়াতাড়ি টানিয়া দিতেই ডান হাতখানা টন টন করিয়া ওঠে। সে বলে, উঃ—

হীরালাল বলিল, মাঠে জুয়ানরা কাজ করতেছে। তারগো যৈবন দেখাইতেছিলি বুঝি?

হ। দেখাবো না?

দেখাবি, দেখাবি—বলিয়া লাথি মারিবার জন্য একবার পা তুলিয়া হীরালাল গজর গজর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্বভদ্রার হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। উঠান ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা— এক হাত দিয়াই সে সব কাজ করে, যখন একা থাকে তখন কোঁকায়। বলে, বাবাগো আর পারি না। আমারে তুমি নেও।

বৃদ্ধ হীরালাল একবার প্রশ্নও করে না, কেমন আছিস? তরুণীর এই কষ্টে সে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ পায়। তার নিকট যৌবনের এই পরাজয় যেন হিংস্র আনন্দের ব্যাপার।

কিন্তু হাতে খালি চুন-হলুদ লাগাইয়া স্বভদ্রা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সারিয়া ওঠে। হীরালালের আরম্ভ হয় কাশি—খুক্ খুক্, খক্ খক্। অনবরত উদ্বেগ, সারিবার নাম নাই। এর জন্যও সে স্বভদ্রাকে দায়ী করে। ভাবে ইহাও তারই কারসাজি।

মাঠে তার ছেলে গনু কাজ করে। হীরালাল আশে পাশে ঘোরে। গনু একদিন জিজ্ঞাসা করিল, কিছু কবা নাকি বাবা? সেইরকম যে ঠেকতেছে।

ভাবছিলাম তো।

সমাচারডা কইয়া ফেলাও। মনের বাষ্প তামুকের ধোঁয়ার মতন ছাড়িয়া দেও।

আমি বাড়ি ফেরতে চাই। কি কস্ তুই ?

গনুও উৎসাহের সহিত বলিল,

বত্তে দেব শশা
সে আবার জিজ্ঞাসা ?

ব্রতে শশা কিংবা কোনো ফল পাকুড় দিতে হইলে পুরোহিতের মতামত নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি সম্মতি দিবেন ইহা যেমন ধরিয়া নেওয়া যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরকম। ঘর-বাড়ি, জমিজমা, হাল বলদ সবই হীরালালের। সে ঘরে ফিরিবে, তার আবার মতামত কি ?

কথাটা সুভদ্রার কানে ওঠে। সে জিজ্ঞাসা করে, আপনে কি বাড়ি যাবা !

হ, ভাবছিলাম তো—মোটা গলায় জবাব দিয়া হীরালাল সামনে হইতে চলিয়া যায়। সুভদ্রার আর কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস হয় না।

কিন্তু বৃদ্ধ যাইবার দিন খালি পিছাইয়া দেয়। সুভদ্রা যদি আদর করিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, যাবা নাকি আমারে ফেলাইয়া তুমি—তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না।

কাটে আরও কয়েক দিন। গনু পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ি যাওয়ার করলা কি ? লাজলজ্জা ঠেকে নাকি ?

হীরালাল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া ওঠে, লাজ ! লাজ করব কোন্ হালারে ? পুরুষ মানুষের ওরকম নটঘট হইয়াই থাকে।

সুভদ্রা আবার একদিন প্রশ্ন করিল, আমার করিয়া যাবা কি ?

আমি তার কি জানি ?

তুমি জানো না তো জানে কেডা ?

হীরালাল এই প্রশ্নের জবাব দেয় না।

সুভদ্রার ভয় করে। তাদের পাশের গ্রামের বুড়া মিশ্র সরলাকে ঘরের বাহির করিল। মিশ্রের ছেলে আজ বড়ো ডাক্তার, বেশ আছে সে। আর সরলা খাতায় নাম লিখাইয়া হাটের পাশে একখানা চালার সামনে কুপি জ্বালাইয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকে। তাকেও কি তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না কি ? ভাবিলে গায়ে কাঁটা দেয়।

উঠানে বড়ো একটা কাঠের বাক্স। পাশেই হোগলায় জড়ানো বিছানা। একটা ধামায় থালা, ভরনের বাটি প্রভৃতি তৈজসপত্র। আর কয়েক বস্তা ধান চাল। বাক্সের উপর সুভদ্রা বসিয়া আছে। সামনে হীরালাল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া গনু।

হীরালাল বলিল, ওঠ্ ভদ্দরা। জোয়ার চলিয়া গেলে যাইতে দেরি লাগবে। আজকের জোয়ারে সে বাড়ি ফিরিবে। জোয়ার চলিয়া যাওয়ার অসুবিধার কথাই তাই বার বার মনে হয়। একবারও ভাবে না, সুভদ্রার কি গতি হইবে।

সুভদ্রা বলে, যাইতে পারবা না আপনে—

পারবা না, অ্যাঁ—বলিয়া হীরালাল কুৎসিত একটা শব্দ করে। তারপর বলে, সর্ মাগী।

স্বল্পবাক সুভদ্রা গনুর দিকে চায়। বলে, আমার কি করবা তোমরা? কি উপায় করবা?

গনু কোনো উত্তর করে না।

মাঠে ফেলাইয়া যাবা আমারে? চাউলগুলিও লইয়া যাবা?

ও ছাওয়ালপান। ও বোঝে কি! কবেই বা কি? ওঠ্ বাক্স ছাড়িয়া ওঠ্—বলিয়াই হীরালাল সুভদ্রার হাত ধরিয়া হ্যাঁচকা টান দেয়।

তার হাতের একগাছা কাচের চুড়ি বাক্সের শিকলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায়, হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে।

সুভদ্রা আর এক হাত দিয়া বাক্স চাপিয়া ধরে। আরম্ভ হয় টানাটানি। বৃদ্ধ হীরালাল যুবতী সুভদ্রাকে টানিয়া তুলিতে পারে না। তাতে আরও রাগিয়া যায়।

শেষ মুহূর্তে কি পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। না, না, সে অসম্ভব।

হীরালাল এবার একটা লাঠি দিয়া সুভদ্রার পিঠে এক ঘা বসাইয়া দেয়। সুভদ্রা কাতরাইয়া ওঠে।

গনু বলে, করো কি বাবা? কণ্ঠ তার রুক্ষ কর্কশ।

হীরালাল মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়ায়। তারপর দ্বিগুণ বেগে সুভদ্রার হাতের উপর আঘাত করে।

সে তবুও বাক্সটা ছাড়ে না। তার মনে হয়, কাঠের এই জিনিসটা তার শেষ আশ্রয়, তাদের উভয়ের মধ্যে শেষ বন্ধন। ওটা ছাড়িলে তার অবস্থা হইবে হালবিহীন নৌকার মতন।

গন্থ এতক্ষণ রাগে ফুলিতেছিল। সে বলিল, মাইয়াডারে মারিয়া ফেলবা না কি?—বলিয়াই পিতার হাত হইতে লাঠিখানা কাড়িয়া নেয়।
হীরালাল বলে, আলবত মারবো। আমি মারবো না কি মারবি তুই?
কাছেই ছিল একখানা বৈঠা। সেইখানা তুলিয়া লইয়া সে সুভদ্রার দিকে রুখিয়া যাইতেই গন্থ তাকে কাছে টানিয়া লইয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়।
আর একটু হইলে বৈঠাখানা গন্থর মাথায়ই পড়িত। সে হাত দিয়া ঠেকায়। হাত ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে।
যৈবন দেইখ্যা ভোলছ হারামজাদা, সেইজন্য মোরে সরাইতে চাও—বলিয়াই হীরালাল বৈঠাখানা ফেলিয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।
সুভদ্রা তখন গন্থর হাতের মধ্যে একটু একটু কাঁপিতেছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৫—) ॥ প্রেমপত্র

"গল্প কখনও সত্য হয় ?"

"নিশ্চয়ই হয়, নচেৎ আমি কখনও প্রেমে পড়ি !"

"বলো কি হে ? প্রেমে তো সকলেই পড়ে !"

"আমি তো আর সকলের একজন নই।"

"জানি তুমি অ-সাধারণ। শুনি এক অ-সাধারণ ব্যক্তির অ-সাধারণ গল্পটি।"

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছিল। দুজনেরই বয়স ত্রিশের উপর। ঠোঁটের চাপে, চোখের দীপ্তিতে, চিবুক-চোয়ালের গঠনে পার্থক্য ধরা পড়ে। একজন বুদ্ধিমান, বুদ্ধির গর্বে গর্বিত। অন্যজন সাদাসিধে ভালো মানুষ। দুজনে নদীর ধারে গিয়ে বসল।

"দেখো, অ-সাধারণ ব্যক্তির অভ্যাসই হচ্ছে যে, সে নিতান্ত সাধারণ ঘর-পোষা লোকের কাছে তার অ-সাধারণত্বের বড়াই করে। যখন তার দলের অন্য ব্যক্তির বিদ্রূপে সে কর্ণপাতই করছে না, তখন দেখা যায় যে, তার নিম্নশ্রেণীর লোকের ঠাট্টায় সে বিচলিত হচ্ছে। নেপোলিয়নের সর্বদাই ভয় হত, প্যারিসের মেয়েলী আড্ডায়, বুলভার্দের কাফেতে তার সম্বন্ধে কে কি বলছে। তোমাদের দেশের যে কোনো বড়ো লোকের কথা স্মরণ করতে পারো, নজির পাবে। সেইজন্য আমার গল্প শুনে তুমি ঠাট্টা করলে আমি বিচলিত হব। কিন্তু ঘটনাটি নিতান্তই সাধারণ হলেও ব্যাপারখানি সত্যই অ-সাধারণ ও অলৌকিক।"

"বলো।"

"সে ছিল আমার খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। আমার সঙ্গে সম্বন্ধও হয়েছিল—বিয়ে করিনি। এক বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। হয় কেন? আমিই ঘটকালি করে দিয়ে দিই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় Science Association-এর লেকচার

হলে। ছেলেটি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক—অর্থাৎ ইংরেজি না জানা, ইতিহাস মুখস্থ করবার অক্ষমতা এবং সংস্কৃত ঝামা অক্ষরের প্রতি প্রীতি না থাকার দরুনই যে সে বিজ্ঞান পড়ত তা নয়। তার নিজের মুখেই শুনেছিলাম যে, সে ছেলেবেলা থেকে লেন্‌স নিয়ে নাড়াচাড়া করত। বাপের বৌবাজারে একটা পাথুরে চশমার দোকান ছিল। সে যাই হোক, বিবাহ নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। বন্ধু স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে পুরলেন। বছর খানেক কি দেড়েক পরে মেয়েটি এল বাপের বাড়িতে। কারণটি শুনলাম সনাতন, সাধভক্ষণ। মাস খানেক পরে, এক গভীর রাতে মেয়েটির ভাই এসে ডাকাডাকি করল, কেদার দাসের বাড়ি যেতে হবে—ভীষণ বিপদ। শীতের রাত। যারা মূর্খ, যাদের স্বামী এমন মূর্খ তাদের সাহায্য করাই পাপ, তাদের মরাই উচিত। হঠাৎ মনে পড়ল, কেদার দাসের এক অ্যাসিস্ট্যাণ্টের ছেলে তো আমার বন্ধু—বুক কোম্পানিতে আলাপ—ছেলেটার বাপের পয়সা আছে, নূতন বই কেনে, পড়ে কিনা জানি না। মেয়েটির ভাইকে একটা চিঠি দিতে সম্মত হলাম। ছোকরা কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'দাদা, তুমি চলো, খুকী মরো-মরো, সবই করেছো, আর একটু উপকার না হয় করলে!" ওরকম কাকুতি করলে আমার আবার কেমন দুর্বলতা আসে। তাই গেলাম। সস্তার এক দাই ধরে নিয়ে এলাম। বাড়ি ঢুকতে যেন গা-টা ছম ছম করে উঠল, একটা গোঙানি কানে এল। ছিঃ, ugly শুধু নয়, একেবারে vulgar—। হাঁ, বুঝি Creative Evolution লেখা হচ্ছে, বার্গসনের গোঙানি বোঝা যায়। কিন্তু এ কি! জীবজগতের সৃষ্টির মধ্যে সহজভাব কোথায়? সব বাধাবিঘ্ন, impediments-কে consume করলেই, পুড়িয়ে ফেললেই তো আলো শুভ্র হয়। যা সৃষ্টি হচ্ছে তার ভবিষ্যৎ তো জানাই আছে! সকালে শুনলাম একটা জড়পিণ্ড জন্মেছে ও তখনি শিশুমৃত্যুর ক্রমবর্ধমান হারকে শ্রদ্ধা জানিয়েই মারা গিয়েছে। জড়পিণ্ডের জড়ভারতী মাটি তখনও জীবিতা, প্রথামতো খাবি খাচ্ছেন। উচ্ছন্ন যাক বাংলা দেশ! ভাগ্যিস্ একজন ডাক্তার এনে দিয়েছিলাম। ডাক্তারদেরও বিশ্বাস নেই। সেদিন দেখছিলাম, বিলেতে শতকরা যত মেয়ে আঁতুড়ঘরে মরে, অথচ যাদের মরা উচিত নয়, তাদের মধ্যে শতকরা ১৮জন মরে ডাক্তারদের দোষে, আর শতকরা সেই সংখ্যাই মরে নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতার দোষে। তা হলে ডাক্তারের বাহাদুরিটা কি? তবু আনলাম, এই যা।

কি জানি কেমন করে নিজেকে দেখলাম আঁতুড়ঘরের দরজায়। বোধহয় সৃষ্টি-

তত্ত্বের শেষ ফলটি দেখতে, সমালোচকের নেশাই তাই। ভাগ্যিস্ ঐতিহাসিক নই। গলা পর্যন্ত ঢাকা, ঘরের কোণে হাঁড়িতে গুলের আগুন টিম টিম করে জলছে—ধোঁয়ার ব্যূহ ভেদ করে কিছুই নজরে পড়ে না। নজরে পড়ল এক জোড়া চোখ! কী করুণ, গোরুগুলো যেমন করে চায়, কী বড়ো! আকাশ জুড়িয়া মেলিল তব আঁখি—চোখ দুটো বাড়তে বাড়তে আকাশ ভরিয়ে দিলে—ঘোলাটে মেঘের সঙ্গে মিশে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, চোঁয়ানো চাঁদের আলোয় ম্রিয়মাণ মুমূর্ষু দীপ্তি যেন আত্মগোপন করতে চাইছে, একটা যূথভ্রষ্ট বলাকা ডানার ঝাপটা দিতে দিতে করুণ আর্তনাদ করে উড়ে গেল, তারই আওয়াজ যেন কানে এল।

"এসেছো?"

"তার আর কি হয়েছে! এধারে যে ঘর বিষে ভরে গেল, গুল্ ভালো পুড়ছে না, পিসিমা, হাঁড়িটা বাইরে নিয়ে যাও।"

"বোসো—মাথা ঘুরছে, কথা কইতে পারছি না।"

"একটু কেমিস্ট্রি জানা ভালো, মেয়েদের রঙটাও পরিষ্কার হয়, আত্মরক্ষাও হয়, সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যও দূর হয়, তোমার স্বামী আবার পদার্থবিজ্ঞানের অপদার্থ এম-এসসি বুঝি, থুড়ি!"

"কাল মরছিলাম, সে কী কষ্ট!"

"দু-দিন পরেই ভুলে যাবে দিদি, কোনো কষ্ট কি ভয় থাকবে না।"

ভালো লাগলো না, চলে এলাম। সর্দা বিলের সর্দা সাহেব মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে বড়ো। আরও বড়ো হতে পারতেন, যদি সমাজ-রক্ষকের দল না থাকত।

তারপর রোজই যাই। মেয়েদের কী অসাধারণ সেরে ওঠবার ক্ষমতা! এক মাসের মধ্যেই উঠে হেঁটে বেড়াতে আরম্ভ করল। বেশ গোলগাল ধরন, রঙ গৌর নয়, তবে কেমিস্ট্রির সাহায্য ব্যতিরেকেও চামড়া পাতলা ও মসৃণ, নাইবার সময় তুর্কী-তোয়ালের দরকার হয় না, চোখের পালক sea-gull-এর ডানার মতন, সে ডানা যেমন দেহের তুলনায় বড়ো, তেমন বড়ো চোখের পালকগুলো তার, চোখ ঢেকে বয়ে এসে গালের ওপর পড়েছে। স্বভাব মিষ্টি, চরিত্রে কিসের একটা সাম্য আছে, লোভের অভাবে বোধহয়, চোখে, মনে কিসের একটা শান্তি আছে—অজ্ঞান তিমিরান্ধত্বের নিশ্চয়। লম্বা ধরনের ছিপছিপে হলে Nausica-র মতন হতে পারত। মোটের ওপর মন্দ নয়—ঢের

বেশি সুন্দর মেয়ে দেখেছি ওর চেয়ে। রোজ যেতে হয়, রোজই কথা কই। মাঝে মাঝে চাল ভাজা, মুড়ি খেতে ভালোই লাগে। গেলে কি যে করবে ঠিক পায় না। কিন্তু হাঁটে আস্তে আস্তে, চিরকালই তাই। মনে ভাবেন হয়তো থিয়েটারের রানীর মতন হাঁটাই আদর্শ হাঁটা। তাও নয় বোধহয়—জোরে হাঁটা শিক্ষায় বাধে। সংযম! কী যে সমাজের চাপ! কতবড়ো জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চাপানো রয়েছে। হৃদয়ের গোপুরমে সংস্কারের পাহাড়। মেয়েটি দেখি একদিন এক মাসিক-পত্রিকা পড়ছেন। খাঁটি অভিজাত, কুলীন সাহিত্য, এক সংখ্যায় তিন-তিনটি আই-সি-এসের লেখা ও গল্প। সাহিত্যের নামে শৌখিনত্বের snobbishness-এর প্রকাশ। সেও ভালো। একটু আলোচনার পর দেখি কেমন একটা সরলভাবে রসগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তাকে বুঝিয়ে দিলাম সরলভাবে রসগ্রহণ করার মূল্য নেই। আসল কথা সমালোচনা-শক্তি, তাকে অর্জন করতে হয় বিলেতি বই পড়ে, মার্জন করতে হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে মতামত শুনে। আমি ভালো ভালো বই যোগাবার ভার নিলাম, মাঝে মাঝে শক্ত জায়গাগুলো বুঝিয়ে দিতাম। আর, আমার মতামত ছাড়া আর কারুর মত শোনবার সুযোগ তার ছিল না—স্বামী তখন Compton effect নিয়ে ব্যস্ত। বেচারী সাহিত্যালোচনা কখনও করেনি। সে মাঝে মাঝে আসে, আর জিজ্ঞাসা করে, 'দাদা, যতীন সেনের কবিতা নাকি ভালো?' আমি কবির Pessimism-এর ব্যাখ্যা করি। বলি, 'আমাদের বর্তমান সাহিত্যের অবস্থায় নতুন সুর বটে, কিন্তু দেশের ঐতিহ্য ও অন্যান্য অবস্থা দেখলে এই সুরই স্বাভাবিক মনে হয়। এতদিন বাজেনি কেন আশ্চর্য হই! আশ্চর্যান্বিত হবার ফলে হয়তো যতীন সেনের কবিতাকে একটু বড়ো করে দেখি। অবশ্য লেখেন ভালো। আমি দুঃখরাগের অন্য রাগিণী শোনবার অপেক্ষায় বসে আছি'—ইত্যাদি। মেয়েটি গালে হাত দিয়ে, কখনও বাঁকা চোখে, কখনও পালক নামিয়ে শোনে—বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভুরু কোঁচকায় না। স্বামী নিজের মেসে চলে যায়। একটু আমার উপর কৃতজ্ঞ। কোনোদিন সেখান থেকে জলখাবার খেয়ে আসি—নিজে হাতে তৈরি করে। রান্নার হাত মন্দ নয়।

তারপর মধ্যযুগ। সে যুগের শুধু করুণাটুকু, ঘোড়ায় চড়া কিংবা তলোয়ার খেলা নয়! কেমন যেন আমেজ লাগে। আচ্ছা, মাথায় কি করুণা বাসা বাঁধে? মধ্যযুগের ধারণা ছিল করুণার পীঠস্থান পেটে। বেশ চিঁড়ে ভাজা

খাওয়া যেত, চা ভালো হত না, অত তাড়াতাড়ি জল গরম হয় না, এক চুমুক খেয়ে রেখে দিতাম, পরে শিখে নিলে। ঘরের কাজ ছেড়ে আমার কাজই করে। ঘরের আর কাজই বা কি? সেবা-খাওয়ার মধ্যে একটা মধুর বিলাস আছে, প্রথম শরতের হাওয়ার মতন। অভ্যাসের বশে দাবি করবার প্রবৃত্তি এল। অবশ্য এ ভাবটা ঠিক মধ্যযুগের নয়, তখন প্রেম ছিল কর্তব্যজ্ঞান। আর দাবি করবই না বা কেন? আমি না করলে আর কেউ করবে। আমার ধর্মই তাই—তার ধর্মও তাই। কথাটা সন্দীপ বলতে পারত, নয়? কিন্তু সেও মক্ষিরানী নয়, আর স্বামীটিও নিখিলেশ ছিলেন না। আমার দাবি করবার অধিকারকে সে কেমন নীরবে, বিনা ওজর-আপত্তিতে, হাওয়া যেমন মানুষে টেনে নেয়, সেই রকম সহজে মেনে নিলে। একটু খারাপ লাগত, অত অম্লান-বদনে কেউ কিছু মেনে নিলে তাকে ভালো লাগতে পারে না, তাকে শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। হাজার হোক সে তো পরস্ত্রী, আর পরের ক্ষেতেই ঝাল খেতে ভালো। আমার নিজের মানসী-প্রতিমা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই—কিন্তু পরের কি ধরনের হওয়া উচিত তা আমি জানি। পরস্ত্রী হবে যেন ধনুকের জ্যা, ছুঁলেই টঙ করে বাজবে, চাবুকের মতন চটপটে, লিক-লিকে—না হলে মনে হয় যেন বর্ষাকালে তিন দিনের বাসী মুড়ি খাচ্ছি, তাও আবার ঘি দিয়ে। কিন্তু তবু অত নির্বিবাদে আমার দাবিগ্রহণ ও অত অকৃপণ-ভাবে সে দাবিপূরণ দেখে দেখে মনে সন্দেহ হতে লাগল। কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকলো। এই নতুনত্বের মোহই আমার চোখে ছানি টানলে।

মোহটা কি ধরনের জানো? বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ে, বর্ষাকাল শেষ হলে আশ্বিন-কার্তিক মাসের ভোরবেলায় miasma দেখেছো? রোম সাম্রাজ্যের মতন দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য গেল কাম্পানার কবলে—আমার stoicism কোন্ ছার! কিন্তু এর বিপক্ষে লড়াই করিনি, কিন্তু সাবধানী হইনি ভেবো না। চার ধারের ডাঙা শুকনো রেখেছি, কোনো মশাকে ডিম পাড়তে দিইনি, নিজেকে মশারির ভেতর রেখেছি, নিম পাতা কুইনিন খেয়েছি—তবুও কোথা থেকে কামড়ে দিল, তাই মাঝে মাঝে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে কাঁপুনি আসত। হৃদয়ের আবেষ্টন নীরস রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও আকর্ষণের কোনো সুবিধা ও কারণ না ঘটতে দিয়েও, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেও, cynicism-এর আবরণ সত্ত্বেও, আমার সব পুরুষালি দাম্ভিকতাকে তার নীরব নারীত্ব ঠক ঠক করে কাঁপিয়ে দিলে।

কত কঠিন হয়েছি, কত বকেছি, কত নিষ্ঠুর, নির্মমভাবে অবহেলা করেছি—কিন্তু কই আমি তো—এই দেখো না তোমার কাছে জীবনকাহিনী বলছি। আগে কখনও ভাবতে পারতে যে আমি তোমার সঙ্গে বসে এ ধরনের 'কাব্যি' করব ?

একদিন তাকে দাবি ও অধিকারের ইতিহাস ও মর্ম বোঝাতে লাগলাম। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কি ছিল, কি হল তারই ইতিহাস। সমাজতত্ত্ব মেয়েদের বোঝা উচিত। চুপ করে শুনলে, মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো চোখ করে চায়, পালক ঝাঁপের মতো ওঠে পড়ে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝা যায় না। বুঝছে কিনা প্রমাণ পাই না। প্রশ্ন করে, 'দাবি-দাওয়ার ভাগবাঁটোয়ারা করে কার কতটুকু রইল ? যতটুকু রইল তাতে যদি সুখ না হয়, ভাগ না করে কেউ যদি শুধু দাবিই করে আর কেউ দাবির অধিকার পুরোপুরি স্বীকার করেই সুখ পায় তাতে ক্ষতি কি ?' উত্তর দিই, 'মেয়েদের ওভাবে মেরী ও মার্থার খোঁয়োড়ে পুরতে পারো—জানি না ঠিক— কিন্তু পুরুষ-মানুষের স্বভাব ও শিক্ষা ভিন্ন। একই পুরুষ দিতেও জানে নিতেও জানে। তোমার কি মনে হয় ?' 'কি জানি', বলেই ভাঁড়ার ঘরে চলে যায়। তর্ক সে কখনো করতে শেখেনি। সব শিক্ষা বৃথা হয়েছে, ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। সে কিছুই গ্রহণ করেনি। সে শুধু দিতে শিখেছে।

আর একদিন তার বাড়ি গিয়েছি। সপ্তাহ খানেক যেতে পারিনি। স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। আমি যেতেই বলে উঠল—'যে লোক তিলের তেল আর নারকেল তেলের তফাত বোঝে না, তার বিজ্ঞান পড়ার মুখে ছাই! আমি আনতে বললাম গন্ধ তেল, আনা হল বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল!' আমি বললাম, 'বৈজ্ঞানিকের মতোই কাজ করেছেন, ও সুগন্ধি তেলকে তোমার চুলের পক্ষে খারাপ ভাবে, তাই আনেনি।' 'আমার চুল কিসে ভালো হয়, আর কিসে খারাপ হয়, আমি জানি, বৈজ্ঞানিক জানে না, এ ফেরত দিও, যা বলেছি কাল এনো।' বন্ধু একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে চলে গেল। তারপর আধঘণ্টা ধরে তাকে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছি, কোনো রকমের অনুশোচনার চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়েনি। সংযম বটে! হয়তো সংযমের কথাই নয়। তবে কি মেয়েদের স্বভাব অন্য ধরনের ?—কারুর কাছে দাবিই করে, যতটুকু না দিলে নয় তাই দেয়, দেবার সময় ঠকায়, যেন সবই দিচ্ছে, আবার কারুর দাবি মাথা পেতে গ্রহণ করে, দ্বিধা করে না, বুঝিয়ে দেয় আরও ভার সে সহ্য করতে পারে ?

প্রত্যেকেই multiple personality, সামান্য উত্তেজনাতেই dissociated হয়ে যায়। আগে ভাবতাম, লোক ঠকিয়ে খায়, তা নয়।

ঠিক এই সময়ে আমাকে বার্গসনে পেয়ে বসল। জীবনী-শক্তি নাম শুনেই মনে হল, তাই তো, সবই তো এরি কাজ, আমরা তো এরি হাতের পুতুল! বুঝলাম, স্ত্রী-জাতি তো এরি প্রধান এজেন্ট! লোকটার কী লেখবার ক্ষমতা! যা সন্দেহ করে এসেছি তাই ঠিক বলে দেয়—এই না হলে লেখক! সামান্য সামান্য ঘটনায়—যার পারম্পর্য তুমি বার্গসন না পড়লে বুঝবে না—আমি প্রমাণ পেলাম যে আমি কোনো শক্তি-প্রবাহের ঘূর্ণিতে পড়েছি—আমাকে ঘাড ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, টানের জোরে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধিগড়া নিজত্বটুকু, অ্যালান পো-এর গল্পের ঘূর্ণির মধ্যে নৌকার মতনই, ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আমি নিজেকে হারালাম। যেদিন বুঝলাম যে হাল আমার হাত থেকে খসে গিয়েছে, সেদিন আমার যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ এসেছিল বললে, আশা করি, বিশ্বাস করবে। না, না, অত বিশ্বাস করে অপমান করো না। কী কুক্ষণেই বার্গসন পড়ি!

জানো বোধহয়, বার্গসনের শিষ্যবৃন্দ Syndicalistরা তাঁদের প্রধান কথা Direct Action। তাই একদিন তার দিকে সোজা চেয়ে বললাম, 'তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে।' চোখের পাতা নামিয়ে দিয়ে পায়ের আঙুলটা পর্যন্ত শাড়ির পাড় দিয়ে ঢেকে দিলে। বললাম, 'তা ভালো, পুব-পশ্চিমের তফাত অনেক।' আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কেমন বাধো-বাধো ঠেকল—আর কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ উঠে পড়লাম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে ঘন গলায় বললাম, 'আর আমার এখানে আসা উচিত নয়।' কী বড়ো চোখ তার, কালো তারা, পালকগুলো যেন চীনে কালিতে ডোবানো তুলির আঁশ। বুদ্ধির প্রভা তাতে নেই। শুধুই ভালো মানুষ, নিছক ভালো মানুষ। চোখ নিয়ে জন্মেছে, তাই চায়।

আবার গেলাম, পরের দিনই। তাকে বললাম যে, সে আমাকে আকর্ষণ করেছে, সে আকৃষ্ট হয়েছে কিনা প্রশ্নের হাঁ কি না সাফ উত্তর চাই, আমি আকৃষ্ট হয়েছি সে জানে কি না। নড়ে না চড়ে না নয়ন পাথার—নট্ নড়ন চড়ন ঠকাস মার্বেল। তাহলে জানাই ভালো—nothing like facing the issue—এই হল নতুন মনোবিজ্ঞানের কথা। আমি তার হাত ধরতেই উঃ করে উঠল, হাতের নোয়া বেঁকে গিয়েছে। কথা কয় না, দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপে। এ এক

বিপদ। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার জুড়ি দেখিনি। হয় নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা, না হয় প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, জড়ভারতী। 'কথা কও, কথা কও, অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না' বলতে চোখ তুলে চাইলে—তারপরই water works। ভাবলাম সুবিধা বটে, কেননা নীরবতা কান্নার সঙ্গে মিশলে স্বীকারোক্তি কেন চুক্তিপত্র পর্যন্ত রেজেষ্ট্রী হয়ে যায়। হলও তাই।

তারপর, তারপর আর কি? সে আমাকে এক লম্বা চিঠি লিখলে। অমন লম্বা অমন আবোল-তাবোল, অমন ভাবপ্রবণতার রসে ডোবানো রসগোল্লা মার্কা চিঠি, অমন boring লেখা এক বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও পড়িনি। উচ্ছ্বাস, কেবলই উচ্ছ্বাস, একটু ন্যাকামি মেশানো, রেডিওতে নতুন ঢঙের যেন গজল গান শুনছি। বিবাহের পর স্ত্রীকে পড়তে দেব ভেবে চিঠিখানি অনেক দিন রেখে দিয়েছিলাম। সেদিন পুড়িয়ে ফেলেছি। চিঠির উত্তর দিইনি। বিকেলে যখন গেলাম তখন দেখে মনে হল যেন সে ব্যক্তিই নয়। সুপারি কাটছে। এই শান্ত প্রকৃতির ঘরণী-গৃহিণীর মধ্যে এত উচ্ছ্বাস ছিল—আগ্নেয়গিরির বুকে ছাইয়ের মতন। যাই হোক, সে ছাই উড়ে আমার আকাশকে রঙিন করলে, কতদিন পর্যন্ত মনের আকাশে যে সূর্যাস্তের সময় সে ছাই রঙের ভিয়ান বসাত তাই ভেবে এখনও অবাক হই। স্মরণ আছে এখনও, না হলে তোমাকে গল্প বলি!

যখন জিজ্ঞাসা করলাম 'যা লিখেছো সব সত্যি', সে জবাব দিলে 'হাঁ সত্যি, সত্যির অর্ধেকেরও কম।'

'আর বাকিটা? সব মিছে?'

'না, তাও সত্যি।'

'আমাকে অনেক দিন থেকে বাসতে পারো, কিন্তু কত জন্ম ধরে বাসছো কি করে জানলে? জাতিস্মর?'

'জানি।'

'বিজ্ঞানে জানে না। রাইডার হ্যাগার্ডের গল্পটা বলেছিলাম, মনে হয় না তো।'

'তবু জানি।'

পিকিঙ মুণ্ডের যুগে না হয় সে আমাকে ভালবাসতে পারত, তারও আগে? বরফের যুগে? তারও আগে? পৃথিবী যখন আগুনে টগবগ করে ফুটত? তারি বুকের জ্বালায় বোধহয়!

'আমাকে দেখতে ভালো লাগে ?'

'হুঁ।'

'কেন ? সুন্দর বলে ?'

'জানি না।'

'জানো বই কি ? অনেকেরই চেহারা আমার বয়সে আমার চেয়ে ভালো ছিল।'

'হয়তো ছিল।'

'চিরকাল দাসী হয়ে সেবা করবে ? তুমি কোন্ যুগের ? এটা বিংশ শতাব্দী জানো ? বিলেতে মেয়েরা সমগ্র স্ত্রী জাতির অধিকারের জন্য জেলে পর্যন্ত যাচ্ছেন জানো ? কতবার না বলেছি জেলে পর্যন্ত যেতে হবে তোমাদের ?'

'দাসীও হব, জেলেও যাব।'

'সে কি করে হয়, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে দু-কাজ একত্রে সমাধা হয়ে গিয়েছে যে।'

'বিয়ে আমার হয়নি।'

এ কী কথা বলে ? সেই যে সাতপাক, সেই যে মধু দেওয়া, পিঠে পুতুল আঁকা, মন্ত্র পাঠ—মন্ত্রের শক্তি দেখছি, শুধু অনুরূপা দেবীই বুঝেছেন। সংস্কৃত মন্ত্রকে বাংলায় তর্জমা না করলে চলে না দেখছি। 'বিবাহ তোমার হয়ে গিয়েছে।'

'না গো হয়নি।'

কোথা থেকে তার গলায় এত জোর এল কে জানে। পাথরের গায়ে কোঁদা অক্ষরের মতন প্রত্যেক অক্ষরটি স্থির, সুনিশ্চিত, কথার মধ্যে কোনো জড়তা নেই, সন্দেহের দোলন কি কম্পন নেই, ভাবালুতার লেশ পর্যন্ত নেই। এ কী করে হয় ?

'আমাকে ও ভাবে চিঠি লিখলে কেন ? এতদিনে কি ঐ শিক্ষা হল ? বাকি ছিল প্রিয়তম, প্রাণেশ্বরটুকু, আরো বেশি বানান ভুল আর আটেশূন্য আশি তোমারই দাসী—বাদ পড়ল কেন ?'

'তুমি আমাকে ব্যথা দিতে ভালবাসো।'

'এই তো তরুণদের ভাষা জানো। তবে কেন আত্মগোপন ? ধরা দেবে না বলে ? আমাকে খুঁজে নিতে হবে বলে ?'

'আচ্ছা, আর কখনও লিখব না। তোমার সব শিক্ষা বিফল হয়েছে।'

'ঠিক বলেছো। ক্ষেত্র বোধ হয় উর্বর ছিল না।'

'আমি যে ও ছাড়া লিখতে জানি না।'

'এতে অবশ্য তোমার বেশি দোষ নেই। অন্য সাহিত্যে প্রেমপত্র সব ছাপা হয়, বড়ো বড়ো প্রেমিকের, হয়তো তারা বড়োলোকই ছিল না। প্রেমপত্রের চয়নিকা সস্তা দামে বিক্রি হয়, সেজন্য সে দেশের প্রেমপত্রের সাধারণ standard অত উঁচু। রবিবাবু ভানুসিংহের পত্রাবলী ছাপিয়েই ক্ষান্ত হলেন, তাই দেশের এই দুর্দশা, তুমি কি করবে!'

কিন্তু মনে তৃপ্তি পেলাম না। ও দেশের প্রেমপত্রও তো ঝোলাগুড়, কোনো দানা নেই, অথচ যারা লেখে তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও কাজ করবার শক্তিও অদ্ভুত! তবে কি প্রেমনিবেদনের ভাষাই ঐ? তাহলে সাহিত্যের ভাষা দুর্বল হলেও তার পিছনের ভাবটি সত্য হতে পারে? রূপ তাহলে কি? সেদিন এই সব প্রশ্নের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। উত্তর পাইনি। কিন্তু আমার অগোচরে একটি ধারণা আমাকে ধরে বসল যে হয়তো এই মেয়েটি সত্য কথা কয়েছে, কিন্তু ভাষার দোষে তার ভাবটি বিকৃত হয়েছে। একদল মনোবৈজ্ঞানিক বলেন, ভাষা থেকেই ভাবের সৃষ্টি হয়। সে কথা বোধহয় ঠিক নয়। জোর, ভাষার জোরে ভাবটি ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে কিংবা বিকৃত হতে পারে। সে সত্য কথা বলেছে ধারণাটি যখন আমাকে ভূতের মতন পেয়ে বসল, তখন বুদ্ধির সব আগড় গেল ভেঙে। হলাম বার্গসনের গোঁড়া শিষ্য।

এই হল আমার অ-সাধারণ গল্প। আমার মতন লোকের ছোটখাট মানসিক ঘটনাও অ-সাধারণ। যদি না বুঝে থাকো, তা হলে স্বীকার করো যে, ferroconcrete-এর ভিতর দিয়ে অশ্বত্থ গাছে চারা জন্মাতে পারে। আমার বার্গসনে বিশ্বাস, আমার পক্ষে স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করবার প্রবৃত্তি, আমার পক্ষে romanticism-এর, হৃদয়বৃত্তির দাবি মানা—এ-সব যদি অ-সাধারণ ঘটনা না হয়, তাহলে আর কাকে অ-সাধারণ ঘটনা বলবে জানি না।"

বন্ধুটি বললেন—"ও-রকম খোসামোদ স্ত্রীলোকে করলে সকলেই বার্গসনের শিষ্য হতে পারে। তুমিই আদত silly, তোমার বুদ্ধিবাদ সব pose—চাল! সে মেয়েটি তার সহজ অনুভূতি দিয়ে তোমার pose expose করেছিল। তুমি একটি আস্তো বোকা, ধরতেই পারোনি। অতি সহজেই মেয়েরা পুরুষের ফাঁকি ধরতে পারেন। মেয়েদের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে, যার জোরে—"

"যার জোরে তোমার বোকামি মাখানো কীর্তিকলাপ অবলীলাক্রমেই তোমার

গৃহিণী ধরতে পারেন, কেমন? তোমার স্ত্রীজাতির ওপর যে-রকম প্রগাঢ় বিশ্বাস তাতে তোমাকে যে-কোনো আশ্রমেই পাঠালে চলে—খুব বড়ো চেলা হবে হে। পরে মোহন্ত পর্যন্ত উঠতে পারো। হয়তো তোমার ওপর অন্যায় করেছি। বার্নার্ড শ পড়ে হয়তো cynic হয়েছো—তাই ভাবছো মেয়েটি বোধহয় অতিশয় চালাক ছিল। চলো, ওঠা যাক আজ সন্ধ্যাটাই মাটি, তুমি যাও সত্যের সন্ধানে, আমি যাই স্বপ্নের রাজ্যে। বার্নার্ড শ পোড়ো না হে. যদিও পড়ো, তাঁর গুরু বার্গসন পোড়ো না, বিপদে পড়বে। আচ্ছা, যদি এই নিয়ে একটা গল্প লিখি তাহলে 'বার্গসনের বাহাদুরি' নাম দিলে কি হয়?"

"মন্দ হয় না, কিন্তু 'pose exposed' নাম আরো ভালো হয়!"

"একই কথা।"

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩২) ॥ অল-ষ্টার ট্র্যাজেডি
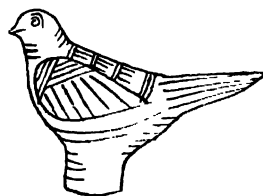
"তাহলে বলতে চান পোলানেগ্রী সতী নয়?"

এই কথা বলিয়াই মুক্ত দ্বারপথে চটক আসিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিল। সভাস্থ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সর্বেশ্বর ঘোষের চশমা চক্ষু হইতে নাকের ডগায় নামিয়া আসিল। যাঁহারা ইতিপূর্বেও তারস্বরে চিৎকার করিতেছিলেন তাঁহারা নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চটক প্রশ্নটি পুনর্বার উচ্চারণ করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। কয়েক দিন হইতে বাড়ির দেয়ালে এবং সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে দেখিতে দেখিতে বিজ্ঞাপন-বিহ্বল হইয়া পাড়ার প্রবীণেরা মাথায় চাদর ঢাকা দিয়া ও নবীনেরা সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গত রাত্রে মডেল সিনেমায় নগ্ন ও অর্ধনগ্ন রূপসীদের ছায়াচিত্রে নৃত্য দেখিতে গিয়াছিলেন। আজ সকালে সর্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানায় গত রাত্রির চিত্রাভিনয়ের সমালোচনা হইতেছিল। আলোচনা ক্রমে চিত্র হইতে চিত্রনটীগণের বয়স, রূপ, উপার্জন এবং চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল, কাল রাত্রে যাঁহারা বেশি করিয়া করতালি দিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই অভিনেত্রীদের নির্লজ্জতায় উষ্মা এবং সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। পথ দিয়া চটক যাইতেছিল, মিনিটখানেক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল, তাহার পর সর্বেশ্বর ঘোষের বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিয়া—তারপর পাঠকেরা জানেন।

সভাস্থ সকলের সন্ত্রস্ত হওয়ার হেতু ছিল। ৺চক্রপাণি চাকীর পুত্র চটক চাকী। পাড়ার সকলের চেয়ে পণ্ডিত, বি-এ পাস এবং সকলের চেয়ে ধনী—এ পাড়ার বারো আনা বাড়ির মালিক। অবিবাহিত। মঞ্চনাট্য ও ছায়ানাট্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। পিতা সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আজ পর্যন্ত ফিল্‌ম কোম্পানি খুলিতে পারে নাই। কিন্তু না খুলিলেও প্রত্যহ

বায়োস্কোপ দেখিত এবং হলিউডের প্রত্যেক অভিনেত্রীর কাছে চিঠি লিখিত। তেতলার পড়ার ঘরে বড়ো বড়ো আয়না টাঙাইয়া ভ্যালেন্টিনো এবং নোভারোর মুখভঙ্গি আয়ত্ত করিত এবং ঘরের কর্ত্রী এক মাসতুতো ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর কাছে তাহার আয়ত্ত বিদ্যার পরীক্ষা দিত। একদিন একখানা ছবি পরপর তিনবার দেখিয়া বাড়ি আসিয়া চটক দরজায় খিল দিল এবং রুডলফের নেত্র-ভঙ্গিমার অনুকরণ করিয়া ফেলিল। তাহার পর রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "বৌদিদি ?" বৌদিদি খুন্তি হাতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আজ এক মহাপরীক্ষার দিন। বিশেষ করে তোমার পক্ষে। আমি তোমার দিকে চাইব—তোমার মনে যে ভাব হয় সত্যি বলবে আমাকে—বলো।"

বৌদি কহিলেন, "হ্যাঁ, বলব।"

"তবে স্থির হয়ে দাঁড়াও।" বলিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত করিয়া মদির-স্তিমিত নেত্রে চটক তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি ? বুকের মধ্যে কুরকুর করছে না ?"

বৌদি মুখে কাপড় দিয়া কহিলেন, "না ভাই, হাসি পাচ্ছে।" চটক মুষড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে সে বাঙালী নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল এবং প্রতিজ্ঞা করিল বিবাহ করিবে না। করিলেও ভারতবর্ষের নারীকে নহে। কিন্তু ওদিকেও অন্তরায় ছিল—৺চক্রপাণি চাকীর উইলের শর্তের মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল—ছেলে ম্লেচ্ছায় গ্রহণ করিলে সেবায়েত পদ হইতে অপসৃত হইবে, কাজেই চটক মনে মনে হলিউডের প্রায় সকল অভিনেত্রীকেই বিবাহ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মানসবধূদের ফোটোগ্রাফে 'চক্রপাণি নিবাসে'র একতলার বারান্দা হইতে তেতলার চিলেকোঠার দেয়াল পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার এক শিষ্য ছিল সোমেন। সেও চটকের সহিত বহুকাল ভাবের আদানপ্রদান করিবার ফলে নিজের বাড়িখানিকে হলিউড করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইতে কি হইল! দেখা গেল যে, সোমেন টোপর মাথায় দিয়া মোটরে চাপিয়া একটি বাঙালী মেয়েকে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। চটক চটিয়া গেল, সোমেন নিজের পৈতৃক বাড়িতে বাস করিত বলিয়া বাড়িভাড়া দুনো করিতে পারিল না, তবে তাহার ইচ্ছার কথা সর্বত্র প্রকাশ করিয়া দিল। আসল ভয়ের কারণ ছিল ইহাই, কাজেই চটকের প্রশ্নের জবাব দিবার ইচ্ছা কাহারো থাকিলেও সর্বেশ্বর ঘোষের বৈঠকখানাস্থ কেহই বাঙ-নিষ্পত্তি করিলেন

না। কেবল একটি ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। নাম ব্যোমকেশবাবু। গত দুই বৎসর হইতে নিজের জন্য একটা সুপাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন এবং বৎসরের তিনশো ষাট দিন পাত্রীর অভিভাবকদের বাড়িতে লুচি ও ক্ষীরের সদ্ব্যবহার করিয়া ফিরিতেছিলেন।

গত তিন দিন হইতে সর্বেশ্বরবাবুর অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। সকলের মতো চটককে দেখিয়া তাঁহারও একটু সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ রহিল না। অন্য কেহ চটকের প্রশ্নের জবাব দিল না দেখিয়া তিনি কথা কহিলেন। চটকের দম্ভ দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল। তাঁহার কথা শেষ না হইতেই চটক জবাব দিল। মিনিট দুয়ের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তর উদারা হইতে তারায় চড়িল এবং সতী এবং সতীধর্ম সম্বন্ধে বিরাট তর্কযুদ্ধের আরম্ভ হইল। নূরজাহান বড়ো সতী কিংবা ক্যাথেরিন বড়ো সতী তাহার সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই প্রথমে একখানি চুড়ি পরা সুডৌল হাত, তাহার পর এক গোছা কোঁকড়ানো চুল, তাহার পরে একখানি সুন্দর মুখ বৈঠকখানার পিছনে দরজার ফাঁকে দেখা গেল এবং শব্দ হইল, "বাবা! আমার টেস্ট—"

চটক তর্কে ক্ষান্ত দিয়া তরুণীর দিকে চাহিয়াই মুখ নিচু করিল, চোখের ভঙ্গি কাহার মতো করিবে সহসা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। ব্যোমকেশ-বাবুর তর্কের খেই হারাইয়া গেল। তিনি অনাবশ্যকভাবে নাক চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বেশ্বরবাবু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ। এই আমরা সবাই যাচ্ছি মা।" তারপর চটকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মেয়েটার বি-এ এগজামিন কিনা—" চটক গদগদ কণ্ঠে কহিল, "যে অপরাধ করেছি আজ, তার জন্য ক্ষমা করবেন" বলিয়া বাস্টার কীটনের মতো করুণ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিল, কিন্তু দরজা তখন বন্ধ হইয়া গেছে।

০০ দুই ০০

সন্ধ্যায় সিনেমা যাইবার পথে গলি ঘুরিয়া অকারণেই চটক একবার সর্বেশ্বর-বাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা বন্ধ। উপরে চাহিয়া দেখিল বারান্দার এক কোণে ব্যোমকেশবাবুর মুখ। অকারণেই ঝাঁ করিয়া বাড়ির বন্ধ ও খোলা জানালা-দরজাগুলির উপর একবার চটক চোখ বুলাইয়া গেল। ব্যোমকেশবাবুর পরিচয় ইতিপূর্বেই সে লইয়াছিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিয়া গেল, "লোফার!"

রাত্রে খাইতে বসিয়া নানা কথার মাঝে ফস করিয়া চটক কহিল, "আজ একটা মেয়ে দেখলাম!" বৌদি প্রত্যহের মতোই কহিলেন, "কে? ম্যাডাম ফ্যান্নারা?" ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে অনেকগুলি নাম বৌদির মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।
চটক কহিল "না। বাঙালী।"
বৌদি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া খুশি হইলেন, কহিলেন, "রূপসী বুঝি?"
"এমন রূপ নয় যে চোখে কুলের কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে, তবু রূপসী। যাক—" বলিয়া সে আহার শেষ করিয়া উঠিল।
বৌদি চট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘটকী পাঠাব?"
চটক ঘাড় হইতে মাথাটাকে ইঞ্চি তিনেক কাত করিয়া কহিল, "ঘটকী! উঁহু! ততদূরে যেতে হবে না।" বৌদি আর অগ্রসর হইলেন না, তবে বুঝিলেন যে, দেবরের বাঙালী মেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পুনরায় গজাইতেছে।
পরদিন প্রাতঃকালে আবার অকারণে চটক সর্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানার জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, শুনিল গান হইতেছে। হারমোনিয়ামের আওয়াজে গলার স্বর কাহার বোঝা গেল না। তবে প্রভাতী গজলের সুর বড়ো ভালো লাগিল, চটক নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল—

বাগিচার নাচদুয়ারে আয় নেচে রে বুলবুলিয়া।
তপনের চুম লেগেছে ঘুম ভেগেছে ফুল গুলিয়া।
আঙিনার কলতলাতে কমলহাতে মাজছে হাঁড়ি
হা রে হা রূপগরবী সৈরভী ঝি চুল খুলিয়া
বাহিরে সজনেশাখে ডাকছে কাকে কাকবধূটি
'হাঁসের ডিম' যাচ্ছে হেঁকে পথের বাঁকে ফজলু মিঞা।

গান শেষ হইতেই "সর্বেশ্বরবাবু আছেন কি?" বলিয়াই চটক বৈঠকখানায় ঢুকিল। দেখিল ফরাসে ব্যোমকেশবাবু, তার সামনে হারমোনিয়াম, পাশে একখানি রেকাবে খানকয়েক বেগুনী ও এক পেয়ালা চা। চটকের যেন সহসা মনে হইল সে শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। অভ্যাসমতো পকেটে হাত দিল কিন্তু পিস্তলের পরিবর্তে উঠিল একটা লাল-নীল পেন্সিল। সেইটিকে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ব্যোমকেশবাবুর দিকে চাহিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আছেন আপনি আজও—" ব্যোমকেশবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিন-পা পিছাইয়া গেলেন। চায়ের পেয়ালা উলটাইয়া পড়িয়া গেল। চটক ফরাসে শায়িত চায়ের পেয়ালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "ভালো করে বসিয়ে রাখুন।"

ব্যোমকেশবাবুর অকস্মাৎ পশ্চাদ্‌গমনে ধুপধাপ শব্দ হইয়াছিল, বোধহয় শব্দটি ভিতরে পৌছিয়াছিল। কালিকার মতোই পিছনের দরজা খুলিয়া গেল এবং তিনিই প্রবেশ করিলেন। এক চক্ষু বিস্তৃত, অপর চক্ষু স্তিমিত করিয়া চটক চাহিল। তরুণী কহিল, "বাবা বাড়ি নেই।" চটকের হাতের পেন্সিল কাঁপিয়া গেল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "বসব তাহলে—"

তরুণী পুনরায় কহিল, "আমার এগজামিন—"

চটকের চোখে আগুন জ্বলিল, মনে মনে কহিল, ব্যোমকেবাবুর বেলায় চা আর বেগুনী, আর আমার বেলায় এগজামিন! মুখে কহিল, "আচ্ছা—"

তরুণী চলিয়া গেল।

চটক ব্যোমকেশবাবু দিকে চাহিয়া কহিল, "আর কত দিন থাকবেন?"

ব্যোমকেশবাবু আর এক পা পিছাইয়া গেলেন, কহিলেন, "ঘোষ মশাই যেতে বললেই—"

চটক আর দাঁড়াইল না।

সেদিন রাত্রে জোয়ান ক্রফোর্ডের ছবিখানার দিকে চাহিয়া চটক দেখিল যে, ছবিখানার মুখখানি যেন অনেকটা সর্বেশ্বর ঘোষের মেয়ের মতো হইয়া গিয়াছে। চটক বাতি নিভাইয়া দিল।

০০ তিন ০০

পরদিন প্রাতে ব্যোমকেশবাবু অমলাকে কহিলেন, "আমাকে যেতে হচ্ছে।"

অমলা কহিল, "বেশ যাবেন। বাবাকে বলুন।" সর্বেশ্বরবাবুকে পূর্বেও ব্যোমকেশবাবু বলিয়াছেন, পাত্রী পছন্দ হইয়াছে তাহাও জানাইয়াছেন। সর্বেশ্বরবাবু আহ্লাদিত হইয়া কন্যার নিকট অনুমতি লইতে অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যোমকেশবাবু কহিলেন, "আমি যেতাম না, কিন্তু—"

অমলা Hamletখানা উল্‌টাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি?"

"চটকবাবু আমাকে পছন্দ করেন না।" বলিয়াই ব্যোমকেশবাবু একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

"চটকবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি? মনিব?" অমলা জিজ্ঞাসা করিল।

"না, তবে আপনাদের বন্ধু তো বটে।" অমলা রাগিয়া গেল, "আমাদের বন্ধু কেউ নেই। থাকুন আপনি। আমি দেখব।" ব্যোমকেশবাবু খুশি হইয়া

বৈঠকখানায় বসিয়া ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া দিলেন।

আধঘণ্টা পর দরজার কাছে চটকের আওয়াজ শোনা গেল, "সর্বেশ্বরবাবু আছেন ?"

ব্যোমকেশবাবু দরজার খিলের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "না নেই। অমলার এগজামিন—"

বাহিরে একটা অর্ধস্ফুট আক্রোশবাণী শোনা গেল, তাহার পরেই প্রশ্ন, "আপনি আছেন আজও ?"

ব্যোমকেশবাবু পিছনের দরজার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অমলা দরজার পাশেই পড়িতেছে। সদম্ভে কহিলেন, "হাঁ আছি।"

"বাইরে আসবেন ?"

"না।" বলিয়াই হারমোনিয়ম খুলিয়া তান ধরিলেন—

বাগিচার নাচদুয়ারে—

তাহার পরই হারমোনিয়ম বন্ধ করিয়া দরজায় কান লাগাইলেন—বাহিরে কোনোও শব্দ নাই।

পাত্রের তো পছন্দ হইয়াছে, এখন আসল কাজ নির্ভর করিতেছে পাত্রীর পছন্দের উপর। ব্যোমকেশবাবু পাত্রীর দিকে বারবার চাহিতে লাগিলেন, মুখে প্রণয় কিংবা লজ্জা কিছুর চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না।

মোগল থিয়েটারে 'হ্যামলেট' ছবি দেখানো হইতেছে। সর্বেশ্বরবাবু যাইতে পারিলেন না। অগত্যা ব্যোমকেশবাবু অমলার শেক্‌স্‌পিয়রের নোটবইখানা বগলে করিয়া তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ট্রামে চড়িলেন।

Interval-এর সময়ে কে যেন ব্যোমকেশবাবুর কাঁধে হাত দিল। ব্যোমকেশবাবু চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চটক! চটক কহিল, "বাইরে আসুন।" ব্যোমকেশবাবু অমলার খাতাখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এখানেই বলুন।" "সে এখানে বলবার কথা নয়", বলিয়া চটক ব্যোমকেশবাবুর হাত ধরিয়া টান দিল।

অমলা কহিল, "যান না বাইরে!" অগত্যা ব্যোমকেশবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চটক কহিল, "আর একটু দূরে ঐ চামড়ার গুদামের পিছনে!"

মন্ত্রচালিতের মতো ব্যোমকেশবাবু চটকের পিছনে পিছনে চলিলেন।

চটক বাঁ হাতের Oxford Edition Shakespeare-খানা ডান হাতে লইয়া কহিল, "শোনো ব্যোমকেশ! এ সংসারে অমলার দুই প্রণয়ীর স্থান নেই। হয় তুমি থাকবে, নইলে আমি। এই অন্ধকার রাত্রি, এই নির্জন গলির মোড় —পাহারাওয়ালা নেই। তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ব। যে জিতবে অমলা তার।"

ব্যোমকেশবাবু কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি পারব না।"

"পারতে হবে তোমাকে কাপুরুষ! দাঁড়াও গলির ওধারে। তোমার হাতে ঐ খাতা, আর আমার হাতে এই শেক্‌স্‌পিয়র! এই দুই পিস্তল, ছোঁড়ো গুলি! এক দুই তিন!" বোঁ করিয়া গলির দু-ধার হইতে বহি ছুটিল, কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বেই চলন্ত একটি সাইকেলের সমুখের চাকায় দুই অস্ত্রই ঠেকিয়া গেল। আরোহী সাইকেল থামাইয়া নামিয়া পড়িলেন। ব্যোমকেশবাবু গলির উত্তর দিকে ভোঁ করিয়া ও চটক দক্ষিণ মুখে ক্লাইভ ক্রুকের ধরনে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দৌড় দিল। সাইকেলের আরোহী একবার চাহিয়া দেখিলেন কোথাও পুলিস নাই, অগত্যা নিমেষমধ্যে বহি দুখানি কুড়াইয়া লইয়া গলির পূর্বদিকের রাস্তা দিয়া সাইকেল চালাইয়া দিলেন।

০০ চার ০০

প্রকৃতপক্ষে ইহা গল্প নহে, উপন্যাস। কাজেই পাঠক-পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অমলার কি হইল?

কিছুই হইল না, অমলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চা তৈয়ারী করিয়া পান করিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যোমকেশবাবু কোথায়?" কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল, ব্যোমকেশবাবুর আহার্য লুচি তেমনই ঢাকা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ নাই। অমলা কহিল, "আমার খাতা?"

সর্বেশ্বরবাবু কহিলেন, "দেখিনি। ব্যোমকেশ দিয়ে যায়নি?"

অমলা কহিল, "আমার একজামিন—যাও বাবা চটকবাবুর বাড়িতে, সেখানে ব্যোমকেশবাবু আছেন হয়তো।"

সর্বেশ্বরবাবু চলিলেন। কিন্তু চটক শয্যাগত। গলি দিয়া ছুটিবার সময়ে বিড়ির দোকানওয়ালা তাহাকে চোর বলিয়া তাড়া করিয়াছিল, সে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের অনুকরণে লাফ দিয়া চলন্ত রিক্‌শাতে উঠিয়া গিয়া চার্লি

চ্যাপলিনের ভঙ্গিতে উল্‌টাইয়া পড়িয়া চোট খাইয়াছে। সে-কথা সর্বেশ্বরবাবু জানিলেন না, শুধু শুনিলেন ব্যোমকেশবাবু সেখানে নাই। খাতাও নাই। শুনিয়া অমলা কাঁদিয়া ফেলিল, ব্যোমকেশবাবুর জন্য নহে, খাতার জন্য। কাল তাহার টেস্ট।

এমন সময়ে বাহিরে কড়া বাজিয়া উঠিল। সর্বেশ্বরবাবু দরজা খুলিয়া দিলেন। একটি ভদ্রলোক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মিস্ অমলা ঘোষ এখানে—?" অমলা আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল "আমি।"

ভদ্রলোক কহিলেন, "এই আপনার খাতা। কাল কুড়িয়ে পেয়েছি।"

অমলা হাসিয়া কহিল, "বাঁচালেন আপনি। আমি খাতা না পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। কোথায় পেলেন?" আগন্তুক বীরেশ দাস হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা নাই-ই শুনলেন। আপনার খাতার সঙ্গে এটাও নিন—আমার নিজের নোট, স্টিফেন সাহেবের—কাজে লাগবে।"

অমলা কহিল, "ধন্যবাদ! চা খান।"

চা খাওয়া হইল।

অধ্যাপক বীরেশবাবুর সেদিন প্রথম ঘণ্টায় ক্লাস করা হইল না।

চটকের গায়ের ব্যথা সারিয়াছে। আবার অকারণে সেদিন সে সর্বেশ্বরবাবুর বৈঠকখানার জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিয়া এণ্টোনিও মরেনোর মতো ভ্রূকুঞ্চিত করিল—অধ্যাপক বীরেশ দাসের বড়ো বেশি কাছাকাছি বসিয়া অমলা শেক্‌স্‌পিয়র পড়িতেছে। ধিক!

বাড়িতে ফিরিবার পথে দেখিল যে ব্যোমকেশবাবু চানাচুর খাইতে খাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া চটক কহিল, "এবার!"

গলায় চানাচুর আটকাইয়া গেল। একটু কাশিয়া গলা সাফ করিয়া ব্যোমকেশ-বাবু কহিলেন, "অমলার বাড়িতে আর যাইনি তো?"

চটক সে কথা কানে শুনিল না, কহিল, "এখন!"

"মদন বড়ালের লেনে যাচ্ছি—সেখানে একটা পাত্রী আছে।" বলিয়া এক লম্ফে ব্যোমকেশবাবু দণ্ডায়মান বাসখানিতে গিয়া উঠিলেন।

চটক চলন্ত বাসখানির দিকে রোনাল্ড কোলম্যানের মতো বিদ্রূপ-ভঙ্গিতে চাহিয়া কহিল, "কাওয়ার্ড!"

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬—) ॥ হৈমন্তী
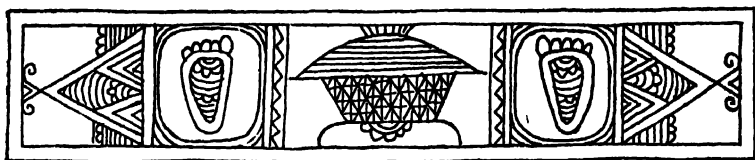
অতি সামান্যই একটি দৃশ্য—বহুদূরে খোলা মাঠের উপর দিয়া চলিয়াছে একটি সাঁওতাল দম্পতি। পুরুষটির মাথায় এক বোঝা ধান, স্ত্রীলোকটির কোলে একটি শিশু, দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলিতেছে। স্ত্রীলোকটি এক একবার মুখ তুলিয়া সঙ্গীর পানে চাহিতেছে।

জীবনে তো কতই দেখাশোনা হইল, কিন্তু আজ হেমন্ত-অপরাহ্ণে এই ফসল তোলার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যটুকু সুরেশ্বরকে কেমন অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে; দুটিই কেমন যেন একসুরে বাঁধা—সময় আর এই ঘরমুখী গতি; চোখ ফেরানো যায় না। ডেক-চেয়ারের অলস অঙ্ক ছাড়িয়া আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অথচ অমন অলসভাবে গা এলাইয়া পড়িয়া থাকিবার কথা নয়; মস্ত বড়ো রেলওয়ে সেতুর কণ্ট্রাক্ট্ হাতে, অধীনস্থ ওভারসিয়ার এইমাত্র আসিয়া খবর দিয়া গেল—যে স্তম্ভটা সবচেয়ে বেশি উঠিয়াছে তাহাতে কি একটা ত্রুটি দেখা দিয়াছে, গাঁথুনি আরও তুলিবার পূর্বে সুরেশ্বরের নিজে একবার দেখা দরকার।

সাঁওতাল পুরুষটি মাথার বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পথের ধারটিতে বসিয়াছে। কি একটু কথা হইল, দুইটি হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল, স্ত্রীলোকটি শিশুটিকে তুলিয়া দিল।

অন্যমনস্কভাবে ওভারসিয়ারের পানে চাহিয়া সুরেশ্বর বলিলেন, 'ও গাঁথুনিটা আজ বন্ধ থাক।'

ছোকরা নূতন পাস-করা, উৎসাহী, বলিল, 'অথরিটিরা একটু তাড়া দিচ্ছে, কাজটা বড়ো আর্জেণ্ট কিনা, ওভারটাইম দিয়ে চালানো হচ্ছে। আজ আবার—'

সুরেশ্বরের মুখে একটা অসহিষ্ণু হাসি ফুটিতে ছোকরা আর কথাটা বাড়াইল না, 'তাহলে আজ বন্ধই রাখিগে' বলিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ্বর পূর্বের মতোই ডেক-চেয়ারে গা এলাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

অস্ত যাইবার অনেক আগেই সূর্য পাণ্ডুর হইয়া পড়িয়াছে। রোদটা যেখানেই আসিয়া পড়িয়াছে, একটা কাঁচা সোনার রঙ—তালগাছের মাথায় মাথায় দূরের গ্রামখানিকে আড়াল করিয়া যে হরিৎপুঞ্জ তাহার গায়ে, যে কখানা বাড়ি একটু আধটু চোখে পড়ে তাহাদের দেয়ালে, খড়ের চালে,—সবখানেই যেন গলিত স্বর্ণের অবলেপ। শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের মধ্য দিয়া বহুদূরে বাঁকা নদীর একটা ফালি দেখা যায়, তাহার পাশেও বিস্তৃত বালুচরের উপর কে যেন মুঠা মুঠা কাঁচা সোনার গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়াছে।

একটু দূরে কোথায় কতকগুলা বুনো ফুল ফুটিয়াছে—ফুল দেখা যায় না, শুধু মনে হয়, খুব সাধারণ না হইলেও এ গন্ধ যেন চেনা চেনা। একটা অস্পষ্ট স্মৃতি মনটাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ্বরের আটচল্লিশ বৎসরের জীবনে আজ এই হেমন্ত অপরাহ্ণটি হঠাৎ বড়ো অপরূপ বোধ হইতেছে, অপরূপ যে শুধু সুন্দরেরই অর্থে এমন নয়, অল্পে অল্পে মনের কোথায় একটা বেদনা জমিয়া উঠিতেছে। শীতের হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই দিনটি যেন মৌন বিদায়ের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, সুরেশ্বরের মনে হইতেছে এ শুধু আজিকার দিনটির বিদায় নয়—ঋতুচক্র পূর্ণ করিয়া একটি বর্ষ যেন বিদায় লইতেছে—বসন্তে যাহার ছিল আরম্ভ তাহার সামনে এইবার আসিয়া পড়িল শীতের সমাধি। তাহার আগে এই কয়টা দিন লইয়া হেমন্ত—ফসল কাটার সময়—একটা জীবনের পরিক্রমায় যা পাওয়া গেল তা ঘরে তুলিয়া একটু সোনার হাসি হাসিয়া লওয়া।

সেই সাঁওতাল দম্পতির দিকে আবার দৃষ্টি গেল—পুরুষটি আবার মাথায় ধানের বোঝা তুলিয়া লইয়াছে, স্ত্রীলোকটির কোলে শিশু। গতি আরও চঞ্চল, ধানের শীষে দোল লাগিতেছে। টুকরা টুকরা মেঘের গায়ে অস্তরাগ আরও গাঢ় হইয়া উঠিল।

মনে হইতেছে কতকগুলা এলোমেলো চিন্তা যেন একটা স্পষ্ট রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিবে। অন্তরের অন্তস্থলে কে যেন জীবনের লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়া এক নূতন দৃষ্টিতে যাচাই করিতে বসিয়াছে। যেটিকে পরম সম্পদ বলিয়া একদিন বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরা গিয়াছিল, মনে হইতেছে

সেটা যেন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যেটাকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অবহেলার অঙ্গুলি ক্ষেপনে পাশে ঠেলিয়া রাখা গিয়াছিল সে এক অপূর্ব মোহন রূপে একেবারে সামনেটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেমন একটা গোলমেলে কাণ্ড যেন—জীবনে কি সত্যই এত ভুল হইয়া গেল? না, এ জীবনসন্ধ্যায় দৃষ্টিভ্রম? মধ্যাহ্নের স্পষ্ট আলোয় যার ছিল এক রূপ, সন্ধ্যায় তাহারই হইয়াছে রূপান্তর। বৎসরের সন্ধ্যা, এদিকে জীবনের আকাশও সন্ধ্যার বিদায় রাগে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে যে।

কাল পর্যন্ত—অথবা আরও ঠিকমতো বলিতে গেলে আজই এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য, জীবনের একমাত্র তপস্যা ছিল কাজ। পরন্তু চীফ ইঞ্জিনিয়ার তদারকে আসিয়াছিল। বেশ একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার হইয়া গেল। লোকটা একেবারে নূতন তাহার চেয়েও নূতন তাহার তদারকের পদ্ধতিটা। কালি ঝুল লাগা খাকি প্যাণ্ট আর হাফশার্ট পরা একজন সাহেব ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অবিচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে কয়েকবার নজরে পড়িল সুরেশ্বরের। কিন্তু পরিচয় লইবার না ছিল অবসর, না ছিল কৌতুহল। খুব বড়ো কন্‌স্ট্রাকশন—পাশের জংশন স্টেশন হইতে প্রায় সাহেব-সুবোরা দেখিতে আসে কৌতূহলী দর্শক হিসাবে। এমন কি হাওড়া-লিলুয়া থেকেও ছুটি-ছাটায় অজ্ঞাতকুলশীল সাহেবদের আমদানি হয়। নিজের মনেই দেখে শোনে, ফিরিয়া যায়, কেহ কেহ আসিয়া কিছু প্রশ্নাদিও করে। সন্ধ্যার একটু আগে একখানা আপ্ ট্রেনে সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার নামিল। জানা ছিল না, সুরেশ্বর স্টেশনে যান নাই। সেই ময়লা খাকি-পরা লোকটিকে লইয়া একেবারে আপিসে আসিয়া প্রবেশ করিল। পরিচয় দিল—রেলের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, যিনি এই নূতন আসিয়াছেন। তাহাকে ডাকিয়া লওয়া হয় নাই বলিয়া সুরেশ্বর একটু অপ্রতিভভাবে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—'But how did you find the work, Sir?' (কাজটা কেমন দেখলেন?)

লোকটা সত্যই একটু আমুদে, রহস্যপ্রিয়। মুখে অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া দুইটা হাত চিতাইয়া বলিল, 'But I did not see the work!' (কিন্তু আমি কাজ তো দেখিনি!)

বেশ একটু বিমূঢ়ভাবেই চাহিয়া থাকিতে হইল, কিছু বলিতে পারিবার পূর্বেই সাহেব হঠাৎ হাসিয়া করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিল, 'I was

watching you at work Mr. Gupta and that was enough.' (আমি তোমায় কাজ করতে দেখছিলাম, মিস্টার গুপ্ত, তাতেই সব বুঝে নিয়েছি।)

সারা জীবন ধরিয়া ভালো কাজের জন্য মুখে, কাগজে বহুৎ প্রশংসা পাওয়া গেছে, তবু নূতন ইঞ্জিনিয়ারের বলিবার ঢঙটুকু বেশ নূতন আর শ্রুতিরোচক। শোনার পর থেকে কানে যেন লাগিয়া ছিল।—এই খানিকটা আগে পর্যন্ত, তাহার পরই সাক্ষাৎ হইল এই হেমন্ত গোধূলির সঙ্গে। অতবড়ো কথাটার কোনো যেন অর্থ ই নাই আর।

শুধু অর্থ ই না-থাকা নয়, এই সব প্রশংসা জীবনে কি দিল সেই কথাই লইয়া পড়িয়াছে মনটা।

বালুতট আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষটি তাহার উপর ধানের বোঝা নামাইয়া রাখিল। হাঁটুভরও জল নয়, নদীতে দুইজনে নামিয়া মুখ-হাত ধুইতেছে। এলো খোঁপায় জলের হাত বুলাইয়া মেয়েটি আবার জবাফুল দুইটি গুঁজিয়া দিল। কোলের ছেলেটা ধানের বোঝা মাথায় লইবে—প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। দম্পতি গ্রীবা ঘুরাইল, দাঁড়াইল, ছেলের আস্বা দেখিয়া কি মন্তব্য হইতেছে, মাঝে মাঝে হাসিতে শরীর দুইটি উঠিতেছে দুলিয়া।

মন হিসাব করিতেছে এইসব প্রশংসা কি দিল জীবনে। শুধু কর্মে উদ্যম?—কিন্তু কাজই কি জীবন? আর কোনো পাওনা ছিল না এ জীবনে? চারিদিকের এই ফসল তোলার দিনে, এই সোনালী বৈকালে সুরেশ্বরের এমন কিছু একটা পাইবার ইচ্ছা হইতেছে যা জীবনের শীতের সম্বল হইয়া থাকে, তা যদি স্মৃতি-মাত্রই হয় তো তাই হোক, সেও তো নিঃসম্বলের কিছু: নইলে জীবন থেকে বিদায় লইবার বেলায় এই অনুতাপই থাকিয়া যাইবে যে শুধু বঞ্চিতই হইয়াছি।

বেশি দূরে হাতড়াইতে হইল না, সুরেশ্বরের হঠাৎ কালকের ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল। কালও সেটা একটু রেখাপাত করিয়াছিল মনে, কিন্তু আবার কাজের সংঘর্ষে মুছিয়া গিয়াছিল সে রেখাটুকু।

কাল একটা ইণ্টারভিউ ছিল। সুরেশ্বর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—একটি মেয়ে স্টেনোগ্রাফার চাই। সুরেশ্বর কোনোকালে দিবেন মেয়ে-স্টেনোর জন্য

বিজ্ঞাপন, এটা আর সবার কাছে তো বটেই—সুরেশ্বরের নিকটও বড়ো অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল প্রথমে। কিন্তু দিয়াছিলেন কেন অত ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই, শুধু হাত লইয়াই কাজ হইল জীবনে, মন লইয়া তো নাড়াচাড়া করা হয় নাই। সাক্ষাৎকারের মধ্যে মন যেন অল্প অল্প করিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। দরখাস্ত পড়িয়া তিনজনকে বাছিয়া লইলেন। দুইজন ফিরিঙ্গী কন্যা, একটি বাঙালীর মেয়ে। বাঙালীর মেয়েটি আই-এ পাস, নাম মিস্ অমিতা সেন।

সুরেশ্বর ফিরিঙ্গীদেরই ডাক দিলেন প্রথমে। বেশ স্মার্ট, ওরা যেমন হয়। যেটিকে পরে দেখিলেন, সেইটেই বেশি ভালো মনে হইল। একটু বয়স হইয়াছে, কাজের অভিজ্ঞতা আছে। ওটিকেই রাখা মনে মনে ঠিক করিলেন। চিঠি দিয়া জানাইবেন বলিয়া দুজনকেই বিদায় দিলেন।

এটা কিছু বেশি মাস খানেক আগেকার কথা। বাঙালী মেয়েটিকে ডাকিবেন কিনা একটু স্থির করিতে মাসখানেক লাগিল। আদৌ মেয়ে-স্টেনো রাখার মধ্যে যেটুকু মনোভাব স্পষ্ট ছিল তাহা এই—থাকুক না, আপিসটা একেবারে হাল-ফ্যাশানের হয়, সাহেব-সুবোরা আসে, ওরা সেই পুরনো একঘেয়েমি একটু অপছন্দ করে। নিজে তিনি অবিবাহিত—কিন্তু তা বলিয়া মেয়েদের অত ভয় করিবার কি আছে? বাঘও নয়, ভল্লুকও নয়।

একমাস ভাবিয়া চিন্তিয়া বাঙালী মেয়েটিকেও একটা সুযোগ দেওয়া ঠিক হইল। বাঙালী মেয়েরাও তো আপিসে বাহির হইতেছে আজকাল—এমন কিছু নূতন আর দৃষ্টিকটু হইবে না।

কাল সকালে মিস্ অমিতা সেন আসিয়াছিলেন দেখা করিতে, কিন্তু তাহার পূর্বেই সুরেশ্বর মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। মনস্থির এই যে, মেয়ে-স্টেনোর পাট উঠাইয়া দিয়া এবারে ভালো অভিজ্ঞ পুরুষ-স্টেনোর জন্য নূতন করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন।

এ ভাবান্তরটা আরম্ভ হইল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের প্রশংসাটুকুর পর। যে কর্ম লইয়া সুরেশ্বরের জীবন, নূতন প্রশংসার অনুকূল বায়ুতে সেই কর্মের প্রতি অনুরাগ যেন হঠাৎ আরও শতগুণ বাড়িয়া গেল। এ জীবনে কর্মের যাহা অনুমাত্রও অন্তরায় তাহার উপর মনটা আবার বিরূপ হইয়া উঠিল। সুরেশ্বর নিজের মনের কাছে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, মেয়ে-স্টেনো নিতান্তই আপিসটাকে শুধু অতি-আধুনিক করিয়া লওয়ার জন্যই নয়, এই নিঃসঙ্গ জীবনে

একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, শুধু পুরুষ সান্নিধ্যে দিনগুলা হইয়া পড়িতেছে রুক্ষ—ভাবিয়াছিলেন থাকুক না কাজে এমন একজন কেউ যে তাহার চলাফিরা দিয়াই এই কাগজ-কলম, লেজার ফাইল, লোহা-ইস্পাত, কুলি-মজুর দিয়া ঘেরা দিনগুলাতে একটু পরিবর্তন আনিতে পারে। দোষ কি?

প্রশংসা পাওয়ার পর মনে যে জোয়ারটা নামিল তাহাতে তাঁহাকে এটাও মানাইয়া ছাড়িল যে আছে দোষ। নারীর একটু সান্নিধ্যও একটা বিলাসিতা, সযত্নে পরিহার করিতে হইবে। সমস্ত জীবন এটুকুকেও খুব সাবধানে এড়াইয়া আসিয়াছেন বলিয়াই আজ তিনি কর্মজীবনে এতটা সাফল্যের অধিকারী। এ লঘুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

মনের এই রকম বজ্রকঠোর অবস্থায় মিস্ অমিতা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মিস্ সেনের বয়স হইবে বছর তিরিশ-বত্রিশ, এক-আধ বৎসর বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। অনপচয়িত যৌবন বয়সের সীমানা পার হইয়াও লুপ্ত হইয়া যায় নাই একেবারে। তবে মুখে দৃষ্টিতে একটি যে ক্লান্তির ছায়া আছে তাহাতে অনুমান হয়—দেহ যেমনই থাক মনটা যেন প্রৌঢ়ত্বেরও গণ্ডি ডিঙাইয়া একেবারে বার্ধক্যের কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছে। একটা যেন বহুদিন অপেক্ষা করার শ্রান্তি। সুরেশ্বরের মনে হইল এই রকমটা মনের ভ্রান্তিও হইতে পারে।

একটা কথা। মহিলাটিকে দেখামাত্রই সুরেশ্বরের ভ্রূ দুইটি একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, স্মৃতিতে একটু যেন দোল লাগিল। তখনই সে ভাবটা সামলাইয়া লইলেন। একটু প্রশ্নোত্তর হইল (নেহাত শুরু করা হিসাবে)—

'আপনারই নাম মিস্ অমিতা সেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

(অস্বস্তির সহিত একটু চুপ করিয়া থাকার পর)

'আপিস সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?'

'বিশেষ নয়, স্টেনোর পোস্ট—বাড়িতে শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিংটা শিখেছি, তাই ভাবলাম…… '

(সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে তাহা হইলে, একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল)

'হুঁ—এর আগে কোথায় কাজ করতেন?'

'স্কুলে—মিসট্রেসের পোস্টে। আই-এ-র বিশেষ কোনো প্রসপেক্ট নেই, তাই মনে করলাম……'

মেয়েছেলের মুখের উপর সহজভাবে দৃষ্টি ফেলায় অভ্যস্ত নন, তবুও কথাবার্তার মধ্যে যতটুকু চাহিতে পারিতেছেন বা চাহিতে হইতেছে তাহাতে স্মৃতিতে অল্প অল্প ঘা পড়িতেছে। কেমন যেন মনে হইতেছে আর একটু বসুক আরও দুইটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

অথচ মেয়ে-স্টেনো রাখা হইবে না এটা তো ঠিক হইয়া গেছে। নিজের মনের প্রতি কঠোর হইতে গিয়া সুরেশ্বর নবাগতার উপরই হঠাৎ একটু রূঢ় হইয়া উঠিলেন। একভাবে রূঢ়তাই বৈকি। একটু ব্যস্তভাবে এবং বেশ একটু বেখাপ্পা-ভাবেই বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু সরি, আমার বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে মিস্ সেন আপনাকে বসিয়ে রেখে, মানে—ইয়ে—অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট্ এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা আমায় আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে—মানে, হঠাৎ এইরকম স্থির করতে হল—আপনাকে একটা টেলিগ্রামও করবার—তা আমি সেকেণ্ড ক্লাসের ফেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি—বোথ্ ওয়েজ···আর যদি ভবিষ্যতে কখনও--মানে, যদি ভবিষ্যতে···'

কথাগুলো যেন গায়ে জড়াইয়া মুখে মিলাইয়া গেল। সামনে দেখা যাইতেছে মিস্ সেনের মুখটা দারুণ নিরাশায় একবার ছাইপানা হইয়াই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অতগুলা অবান্তর কথার জন্যও একটাও কিছু না বলিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'না, এতে ভাড়া দেওয়ার কি আছে?···আমি আসি তবে।'

একটা যেন কি হইয়া গেল। সমস্ত শরীরটা যেন ঘিনঘিন করিতে লাগিল খানিকক্ষণ—এ কী একটা বিসদৃশ ব্যাপার! নিতান্তই একটা লজ্জাকর কাণ্ড।

তাহার পর দিবাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের স্রোত আসিয়া পড়িল, প্রবল উন্মাদনার মধ্যে সামান্য একটা ঘটনা লইয়া লঘু ঐ অনুতাপটুকু কোথায় ভাসিয়া গেল।

০০ দুই ০০

কিন্তু সত্যই কি গিয়াছিল ভাসিয়া?

এখন মনে হইতেছে মনের কোথায় সুপ্ত ছিল, এই সময়টুকুর অপেক্ষায়।

সব যেন বিস্বাদ ঠেকিতেছে। সুরেশ্বর আপিসের পোশাকেই বারান্দায় ডেক চেয়ারটা টানিয়া শরীর এলাইয়া দিলেন—সামনে রহিল পাহাড়তলির সুবিস্তীর্ণ উচ্চাবচ প্রান্তর, আর হেমন্তের অপরাহ্ন—আকাশের গায়ে একখানি যেন করুণ

পূরবী রাগিণী। বেতালা সঙ্গীতের মতো দূরে পুলের গায়ে মাঝে মাঝে লোহা পেটার শব্দ হইতেছে। ওভারটাইমে জরুরী কাজ চলিতেছে। আজ সমস্ত সংযম লঙ্ঘন করিয়া মনটা একটি বিষন্ন মুখের চারিদিকে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চেনা মুখ কি। যেন এক একবার খুব কাছে আসিয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। মনে পড়িতেছে জীবনটা চিরদিনই এইরকম ছিল না, একটা সময় ছিল যখন ভালো লাগিয়াছিল কতকগুলি মুখ—বিভিন্ন সময়ে বা একসঙ্গেই—কম-বেশি করিয়া, তুলনার যাচাই করার দৃষ্টিতে। সেই স্বপ্ন বিলাসের যুগে বোধহয় এইরকম একখানি মুখ পড়িয়াছিল চোখে। যতই নিবারণ করা যায়, মনটা ততই যেন সুদূরে সেই দিনগুলির পাতা উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া কি একটা খুঁজিয়া বাহির করিতে চায়। অস্তরাগ যত গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল, ফসল সংগ্রহের পথে সাঁওতাল দম্পতি যতই হইয়া পড়িতে লাগিল সুদূর, মনটা ততই যেন অধিকারের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। শুধুই খোঁজা, শুধুই হাতড়ানো—এ কে ছিল?—কাহাকে আজ এমন রূঢ় বিদায় দেওয়া গেল?

এক সময় দূর ইতিহাসের পাতা ওলটানো বন্ধ হইল, পাওয়া গেছে। জীবনের কয়েকটি ঘটনা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। একখানি মুখ রেখায় রেখায় উঠিল বিকশিত হইয়া—সে এই মুখই, ঠিক এই মুখই তো—এইরকম শান্ত, নির্ভরশীল দৃষ্টি, আরও কচি বলিয়া আরও যেন নির্ভরশীল।

হ্যাঁ, এই সুরেশ্বরের জীবনেও একবার রোমান্সের রেখাপাত হইয়াছিল—সে আজ প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসরের কথা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস দিয়া সুরেশ্বর নূতন জীবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আর কিছু করিবার পূর্বে তিনি ধর্মতলার একটি ভালো দোকানে গিয়া নিজের ফোটোটা তুলাইয়া লইলেন, বোধহয় মনে হইল জীবনের এই সন্ধিক্ষণটিকে এই করিয়া একটু বিশিষ্ট করিয়া রাখা যাক, আজকের সুরেশ্বরও অন্যদিনের সুরেশ্বর হইতে একটু আলাদা হইয়া থাকুক।

চেহারা লইয়া সুরেশ্বরের বরাবর একটা সুখ্যাতি আছে। সে সময় ভরা যৌবন, তাহার উপর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাপ দেওয়া অটুট স্বাস্থ্য। ফোটোটা যেদিন আনিতে গেলেন, ফোটোগ্রাফার মিস্টার ব্যানার্জী বলিলেন, 'আপনার একখানি ফোটো মাউণ্টে বাঁধিয়ে আমার শো-কেসে রেখে দিলাম, নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। ফোটোটি উঠেছে খুব ভালো, তা ভিন্ন…'

'এমন চেহারাও সচরাচর চোখে পড়ে না'—এ কথাটা তো মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। মৃদু হাস্তের সঙ্গে ওটুকু উহ্যই রাখিয়া দিলেন। সুরেশ্বরও একটু লজ্জিত-ভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'না, আপত্তি আর কি। আমি নিজে তো শো-কেসে বন্ধ হচ্ছি না?'

'আসুন দেখবেন।'

একটি খুব নূতন ডিজাইনের নিকেলের মাউণ্টে হেলাইয়া দাঁড় করানো রহিয়াছে ফোটোটা, বেশ ভালো লাগিল সুরেশ্বরের। নিজের সৌন্দর্য মর্যাদা পাইলে লাগে না ভালো? কিন্তু এর চেয়েও ভালো লাগিয়াছিল অন্য একটি ফোটো! বোধহয় সাধারণ শিষ্টাচার বশেই ফোটোগ্রাফার সুরেশ্বরের ফোটোর ঠিক বাঁ পাশেই একটি কিশোরের ফোটো হেলাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পাশেই একটি তরুণীর। মুখসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় দুজনে ভাই-বোন।

সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত না হইলেও তাহার বেশ একটা মোটা অংশ দুইটি নরম চোখ সুরেশ্বরের চোখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ফোটোর পাশে আর একটি ফোটো দাঁড করানো আছে এইমাত্র, কিন্তু, সে সময়ের যা মন, এই ঘটনাটুকুই সুরেশ্বরের নিকট অর্থে অর্থে যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে একটি অদ্ভুততর বেদনায় মনটি রহিল ভরিয়া। দুইটা দিন যে কি করিয়া কাটিল যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। তৃতীয় দিনে মনের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া সুরেশ্বর শেষে হার মানিয়া ধর্মতলার দিকে যাত্রা করিলেন এবং অনেক আগে ট্রাম থেকে নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া গিয়া দোকানে উঠিলেন।

ফোটোগ্রাফার মিঃ ব্যানার্জী নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন—'আসুন।'

চোখ দুইটা একটু অবাধ্যভাবেই শো-কেসের উপর গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই সংকোচে আসিল ফিরিয়া, তবে সেই দুইটি চক্ষুর স্মৃতিকে ওরই মধ্যে একটু স্পষ্ট করিয়া লইয়া সুরেশ্বর ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—'এই দিক দিয়েই একবারই সার্কুলার রোডের দিকে যাচ্ছিলাম, মনে করলাম একবার আপনার দোকানটাও হয়ে যাই···'

'বেশ করেছেন, বসুন। এদিকে এলেই আসবেন দয়া করে।' একটু হইল এদিক ওদিক দু-একটা কথা, তবে বেশি জমিল না। দোকানদারের কাছে কাজ না থাকিলে জমে না কথা, তাহার উপর মনে এই কথাটাও চাপিয়া রহিল

যে এ-যাত্রার সঙ্গে সাকু'লার রোডের কোনো সম্বন্ধই নাই। এক সময় জড়তা কাটাইয়া--'আচ্ছা তবে আসি' বলিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া পড়িলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে আর একবার শো-কেসটার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বাসনা হইল, কিন্তু জড়তাটা অতদূর পর্যন্ত কাটানো গেল না।

আবার গোটা তিনেক দিন কাটিয়া গেল, ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এভাবে কাটানো চলিবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছু না হোক, মাঝে মাঝে একবার দেখাও চাই—ঐ ফোটোটিই। আর কিছু কি পোড়া ভাগ্যে জুটিবে?

অনেকটা দূর—কোথায় বরানগর, কোথায় কলিকাতার একেবারে মাঝখানের ধর্মতলা। অবশ্য বরানগরের লোকের যে কলিকাতায় কাজ থাকিতে মানা আছে এমন নয়, তবে প্রত্যেকটি কাজ যে এই পথেই পড়িবে--এই দোকানটির সামনে হইয়া, একথা লোককে কি করিয়া বিশ্বাস করানো যায়?

এদিকে ঐ এক কাজ ভিন্ন অন্য কোনো কাজে মনও বসিতেছে না।

কিন্তু তর্ক লইয়াই মানুষ বাঁচিয়া নাই, চতুর্থ দিন বৈকালে সুরেশ্বর আবার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ,—ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক দোকানে নাই। রহিয়াছে চাকর একটা। ছোকরা—দোকানপাট ঝাড়ে—এধার ওধার বাইরের কাজে যায়,—এই রকম গোছের।

জানাইল—ব্যানার্জীবাবু বাহিরে গিয়াছেন।

'ফিরবেন কখন?'

'আর আধঘণ্টাটাক দেরি হবে বাবু—ফোটো তুলতে গেছেন, খুব বেশি তো তিন কোয়াটার।'

'তিন কোয়াটার! তবেই তো!'

মুখটা কুঞ্চিত করিল যেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা না হওয়ায় কী ক্ষতিটাই যে হইয়া গেল।

তবুও শো-কেসটির দিকে যাইতে কেমন সংকোচ হইতেছে, ছোঁড়াটার কাছেও। অথচ এত সুযোগ, ফিরিতে ফিরিতে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে মন সরে না। ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে সেদিন কথার অভাব ঘটিয়াছিল, ছোঁড়াটার সঙ্গে ততটা হইল না। সুরেশ্বর দুই-পা পায়চারি করিয়া যেন অন্যমনস্কভাবেই শো-কেসটার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, কতকটা

নিজের মনেই বলিলেন—'তাই তো.—তিন কোয়ার্টার। ভাবছি অপেক্ষাই করে যাব কিনা।…কি, একটু পরে ঘুরেই আবার আসব…'

চাকরটা প্রশ্ন করিল—'কি দরকার বাবু, তিনি যদি এর মধ্যে ফিরে আসেন কি বলব ?'

'সে তুই গুছিয়ে বলতে পারবি না।…গেছেন কোথায় বল্ দিকিন ?'

'ভবানীপুরে, মিঃ সেনের বাড়ি।'

তাহার পর বলিল—'ওই যে শো-কেসে মিঃ সেনের ভাই আর বুনের ফোটো রয়েছে বাবু। তাঁর পরিবার এয়েছেন, আবার তার নিতে গেছেন।'

এ পরিচয় দেবার তাৎপর্যটা কি তা সুরেশ্বর বুঝিতে পারিলেন না, বোধহয় এইজন্য যে ছেলেমানুষেরা একটা কথা জানিলে প্রকাশ করিবার জন্য সদাই উৎসুক থাকে। তবে ওঁর একটু সুবিধা হইল। সিঁড়ির গোটা তিন ধাপ নিচে না নামিলে শো-কেসের ফোটোগুলা ঠিকমতো দেখা যায় না। সুরেশ্বর নামিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—'কোন্ ফোটো ?'

ছেলেটাও নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ফোটোর পাশে সেই মেয়েটির ফোটো দেখাইয়া বলিল—'উই যে মিস্ সেনের ফটোগেরাফ।'

সুরেশ্বরের বুকের ধুকধুকুনিটা হঠাৎ বাড়িয়া গেল। · মিস্ সেন!—সুরেশ্বরও বৈদ্য, পদবী গুপ্ত ; একটা যেন দৈব নির্দেশ রহিয়াছে। আর একটা কথা, মিস্ সেনের ফোটোটি এবারে সুরেশ্বরের ফোটোর পাশেই, ছেলের ফোটাটা তাহার পাশে। অতি সুমিষ্ট একটা সংকোচে সুরেশ্বরের সমস্ত শরীর মন যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিবর্তনের ইতিহাসটা ছোঁড়াটাই বলিল—'আমিই আজ ঝাড়বার মোছবার সময়ে এ রকম করে দিলুম, ভালো হল না বাবু ? ওনার ফোটোর দু-পাশে দুটো ভালো ভালো ফোটো রইল।…হল না ভালো ?'

নিষ্পাপ ছেলেমানুষের মন, সুরেশ্বর কি করিয়া বুঝায় ওকে যে ভালো হইয়াও একদিক দিয়া একেবারেই ভালো হয় নাই। কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া বলিল—'তোর বাবু থাকতে দেবে না। আগেকার মতন করে দে।'

'কেন ?…ঠিক থাকতে দেবে, দেখবেন আপনি এসে। আপনারা তিনজন সুন্দর একসঙ্গেটি কেমন মানাচ্ছে·· কখনও পাল্‌টাবেন না বাবু দেখে নেবেন আপনি।'

নিজের সৌন্দর্যজ্ঞান সম্বন্ধে জিদ ধরিয়া বসিল—ফোটোগ্রাফারের দোকানে কাজ করে—যে সে নয় তো ? সুরেশ্বরেরও কি মনে হইল, জিদটা ভাঙিবার জন্য

খুব অতিরিক্ত চেষ্টা করিলেন না। ঘড়িতে দেখিলেন আধঘণ্টা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সময় যেন পাঁচ-সাত মিনিটেই এতটা পথ সারিয়া লইল। 'তবে পারি তো আসছি ফিরে—' বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন সুরেশ্বর।

০০ তিন ০০

সৌভাগ্যই হোক বা দুর্ভাগ্যই হোক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা রোমান্সের ছোঁয়াচ থেকে মুক্তই থাকে। না আছে শেলী, না আছে শেক্‌স্‌পিয়র—নিশ্চিন্ত। সুরেশ্বরও ছিলেন, কিন্তু যখন লাগিল ছোঁয়াচ তখন যেন একেবারেই জীর্ণ করিয়া ফেলিল।

বিশ্বাস করা শক্ত—কিন্তু সত্যই উপর-উপরি দুইদিন সুরেশ্বর দোকানটিতে হানা দিতে চেষ্টা করিলেন। উল্টা দিকের ফুটপাথে বেশ খানিকটা দূরে আর নিরাপদ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকেন—ফোটো-গ্রাফার মিস্টার ব্যানার্জী একবার বাহির হইয়া গেলেই—আবার গিয়া জরুরী কাজের কথা পাড়িয়া ছোঁড়াটার কাছে বিরক্তি আর নৈরাশ্য প্রকাশ করিবেন। কিরকম যোগাযোগ, মিস্টার ব্যানার্জী পাদমপি নড়িলেন না।

তৃতীয় দিন সুরেশ্বর আবার কপাল ঠুকিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন কপালের জোর আছে। মিস্টার ব্যানার্জী সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন—'আসুন, আসুন, অনেক দিন আসেননি এদিকে······'

ছোঁড়াটা তাহা হইলে সেদিন আসার কথাটা বলিতে ভুলিয়া গেছে।

'আসা কি সহজ?'—হাসিয়া কথাটা একরকম শেষ করিবার পূর্বেই ছোঁড়াটা একটা পালকের ঝাড়ন হাতে করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'উনি তো এসেছিলেন সেদিন, পরশু না তরশু, কবে যে এসেছিলেন বাবু?'

সুরেশ্বর সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—'না তরশুই। সেই কথাই তো বলছিলাম—আসা তো সোজা নয় সেই বরানগর থেকে, তবু তো এসে ছিলাম তরশু একবার।'

'কোনো বিশেষ কাজ ছিল নাকি? এ ব্যাটা তো বলেনি আমায়।'

'কাজ—মানে······কাজ—একরকম বলতে গেলে'—

কপালের জোর ছিল, এই সময় একটি ছোট মোটর দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মিস্টার ব্যানার্জী হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 'এক মিনিট'—বলিয়া সুরেশ্বরের নিকট ছুটি লইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ফুটপাথে নামিয়া

দাঁড়াইলেন এবং একবার যুক্তকরে নমস্কার করিয়া লইয়া মোটরের দরজাটা খুলিয়া ধরিলেন। দুইজন তরুণী এবং একটি বছর দশ-বারোর কিশোর মোটর থেকে নামিল।

জীবনের সেই কয়েকটি মুহূর্ত আসিয়াছিল—সমস্ত ব্যাপারটি যেন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিতেছে। একজন তরুণী চেনা, ছেলেটিও, অবশ্য ফোটো-গ্রাফে। ওদের ফোটো এখনও সুরেশ্বরের ফোটোর পাশে বসানো রহিয়াছে, আজও সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় দেখিল।

আগ্রহে, উদ্বেগে, এক প্রকারের ভয়েও সুরেশ্বরের সমস্ত অন্তরাত্মা কণ্ঠে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। এত বড়ো যোগাযোগও হয় জীবনে। গল্প করিতে করিতে চারজনে দোকানে উঠিয়া আসিলেন। বেশ বোঝা গেল সেন-পরিবারের সঙ্গে মিস্টার ব্যানার্জীর বেশ পরিচয় এবং হৃদ্যতা আছে, হয়তো ফোটোগ্রাফ লইয়াই, হয়তো আরও পূর্বের জানাশোনা। ভিতরের ঘরে একটা ইজেলের উপর কাপড়ে ঢাকা একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ছিল, রঙ ফলানো হইতেছে, চারিজনে সেইটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। মিস্টার সেনের মায়ের এনলার্জমেণ্ট—খানিকটা আলোচনা হইল। বাহিরে আসিয়া নিতান্ত নিরুদ্দেশভাবেই আরও দু-একটা ফোটো দেখা-শোনার পর মিস্টার ব্যানার্জী ওঁদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। নূতন মহিলাটি মিস্ সেনের ভ্রাতৃজায়া। সুরেশ্বর সেই প্রথম নমস্কার করিলেন মিস্ অমিতা সেনকে। কত মধুর! হৃদয়ের মধ্যে কী এক নূতন জগতের তোরণ খুলিয়া গেছে, নমস্কার নয় তো করজোড়ে সেই স্মিতময়ীকে যেন সেই নূতন জগতে আমন্ত্রণ করিয়া লওয়া।

আজ, কুড়ি বছর পরে সেই মিস্ অমিতা সেনকে করা হইল শেষ নমস্কার—বিদায়ের।

সূর্য অস্ত গেছে, খণ্ড মেঘের গায়ে গায়ে শুধু রঙের প্রলেপ—যেন বুকের রক্ত ঢালিয়া গেল। শীতের হাওয়া আরও একটু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। সাঁওতাল দম্পতি নদী পার হইতেছে, গতি আরও মন্থর।

এত কথা—জীবনের সঙ্গে যে সবের সম্বন্ধ এত নিবিড় বলিয়া আজ মনে হইতেছে, আরও একদিন হইয়াছিল মনে—কোথায় ছিল চাপা এতদিন এসব? লোহার তলে?

লোহার তলেই বটে, জীবনটাকেও নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া গেল এই বোল্ট, নাট্, জয়েস্ট, অ্যাঙ্গল, শীট··· ·

পরিচয়ে পরিচয়ে একটু সম্বন্ধও বাহির হইয়া পড়িল। লখ্‌নৌয়ে সুরেশ্বরের কাকা থাকেন?—ডাক্তার হেম গুপ্ত? ওমা, তিনি তো মিসেস্ সেনের ভগিনীর জ্যেঠশ্বশুর হন, অবশ্য একটু দূর সম্পর্কের! কী আশ্চর্য!

মিস্টার ব্যানার্জী হাসিয়া বলিলেন, 'আপনাদের বৈদ্যদের তো সম্বন্ধ না বেরুলেই আশ্চর্য—আমি তো এই জানি।'

নূতন প্রীতিতে হাসি একটু বেশি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথাবার্তা আরও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল, নিমন্ত্রণ পর্যন্ত গিয়া উঠিল।

ছেলেটি কথা কহিতে ছিল না, তবে অত্যন্ত কুতূহলী ছেলেমানুষী দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের মুখের পানে থাকিয়া থাকিয়া তাকাইতে ছিল। একবার দিদির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কি বলিল, দিদি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চাপা গলায় বলিল—'আচ্ছা থাক।'

সুরটা একটু ধমকের।

গল্পের একটু বিরতি পাইয়া ছেলেটি এবার ভাজের কানের কাছে মুখ লইয়া কি বলিল।

'সত্যি নাকি? দেখি তো।' বলিয়া তিনি শো-কেসের দিকে পা বাড়াইলেন। একবার গ্রীবাটি ঘুরাইয়া বলিলেন, 'আসুন মিস্টার ব্যানার্জী, আপনার শো-কেসটা দেখি, সত্য বলছে, মিস্টার গুপ্তের ফোটোও নাকি ডিসপ্লে করেছেন। মিস্টার গুপ্তও আসুন না, অমিতা এসো।'

অমিতা গেল না। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ই শো-কেসে তাহার নজর পড়িয়াছিল, দুই পা গিয়া রাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহারই পাশ দিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেল। সেও রাঙিল। কিন্তু না গিয়া উপায় ছিল না।

কত স্পষ্ট মনে পড়িতেছে আজ, কিন্তু কত অসময়ে;

একটু এদিক ওদিক আলোচনা হইল—হ্যাঁ ফোটোটি বেশ উঠিয়াছে। মিসেস সেনের মুখে একটি চটুল, খুব সূক্ষ্ম হাসি লাগিয়া আছে, কি যেন একটা বলিলেন, শেষ পর্যন্ত বলিয়াও ফেলিলেন—'বেশ জায়গাটিও পেয়েছেন মিস্টার গুপ্ত। কনগ্র্যাচুলেট করছি।'

—দুই দিকেই ঠাট্টার সম্বন্ধ তো? একদিকে না হয় একটু বেশি দূরের।

ভুলটা মিস্টার ব্যানার্জীর এই এতদিনে চোখে পড়িল। মুখ অপ্রতিভ হইয়া

শো-কেসটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফোটো দুইটি আলাদা করিয়া বসাইয়া দিলেন—বেশ খানিকটা আগে পিছে করিয়া। বলিলেন, 'সরি, চাকরটার কাজ……গর্দভ।'

সুখে লজ্জায় চাপা কৌতুকে কী যে কয়েকটা মিনিট কাটিল। চাপা দিতে গিয়া যে ব্যাপারটি প্রকাশ হইয়া পড়িল সেটা সবাইকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে নানাভাবে। অমিতার ভাই শুধু নিরীহ কণ্ঠে কহিল, 'কেন সরালেন, বেশ তো ছিল।'

০০ চার ০০

এই হইল সাতটি দিনের রোমান্স সুরেশ্বরের জীবনে—প্রথম এবং শেষ।

বাড়ি আসিয়া সুরেশ্বর একটা আপিস-খামে চিঠি পাইলেন। খামের গায়ে প্রেরকের ঠিকানা দেখিয়া কম্পিত হস্তে খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নিয়োগ-পত্র! ···· দরখাস্ত একটা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এত বড়ো কনট্রাক্টরের ফার্মে যে কলেজ ছাড়িয়াই এতবড়ো দায়িত্বের কাজ পাইবেন আশা করেন নাই।···আর কী বিরাট একটা কাজ!

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উৎকর্ষপ্রাপ্ত শিরা পেশীগুলি। কর্মের উন্মাদনায় সব একসঙ্গে যেন নাচিয়া উঠিল! কী একটা আনন্দ—কী আনন্দ! এক মুহূর্তেই কোথায় ভাসিয়া গেল রোমান্স! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফার্স্ট বয়—সে কি এই ফিনফিনে হালকা একটা রোমান্সের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল? সুরেশ্বরের জীবনের রোমান্স তো কাজ—কাজ—শুধুই কাজ।

তাহার পর গিয়া একটানা কর্মের জীবন—সাফল্যের পর সাফল্য, যশের পর যশ, উন্মাদনার গায়ে উন্মাদনা—ডাইনে বাঁয়ে দেখিবার অবসর হয় নাই, ও রোমান্স এমন গেল ধুইয়া মুছিয়া যে অতি ঘরোয়া যে রোমান্স বিবাহ, সেটাকেও কেমন যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল—প্রায় হেয় একটা ব্যাপার। রেলের প্রখ্যাত কনট্রাক্টর সুরেশ্বর গুপ্ত যেন একটা এক্সপ্রেস ট্রেনেরই উদ্দাম গতিতে একেবারে জীবনের এইখানটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ হেমন্তের অপরাহ্নে আসিয়া গতি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেছে। কি আছে এই শীতল হাওয়ায়, কি আছে এই উদাস করা সোনালী রঙে? হেমন্তের দিন শেষে যে ঝিঁঝিটা ডাকে তারও একটানা সুরে কি শুধু একটানা কান্নাই ভরা?

কে ছিল অমিতা? সেই স্বচ্ছল অবস্থা কোথায় গেল। কেন গেল? অমিতাও বিবাহ করিল না কেন? আজ আসিয়াছিল কেন সে? জানিয়া শুনিয়াই কি? আর আশ্চর্য—একটিমাত্র বাঙালীর মেয়েকে বাছিলেন সুরেশ্বর—সেও অন্য কেহ নয় সেই বিশ বৎসর আগেকার সেই অমিতা। এত আশ্চর্য ব্যাপারও ঘটে জীবনে। অমিতাকে যায় না আর ফিরাইয়া আনা?

সন্ধ্যা নামিয়া গেল। নিতান্ত মোহ মায়ার মতোই অল্প একটু রঙের আমেজ আকাশের একেবারে উচ্চস্তরের এক-আধটা মেঘখণ্ডে এখনও লাগিয়া আছে। সেই সাঁওতালি দম্পতিটি নদী পারাইয়া গেছে, তীরের ঢালুতে দুইটি কালো রেখার মতো তাহাদের দেখা যায়—গতি মন্থর, তবু প্রাণবন্ত। পুরুষটির মাথায় ধানের ফসল সোহাগের দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে।
এরই পাশে কোথায় যেন সুরেশ্বর আরও দুইজনকে দেখিতে পাইতেছেন মাঝে মাঝে—দুজনেই অনেক আগে-পিছে নিঃসঙ্গ, শ্রান্ত, ব্যর্থ······কেহ কাহাকেও পাইবে না জীবনে। নীড় নাই, সোনার ফসলও নাই;—শ্রান্ত সন্ধ্যায় কোথায় গিয়া কি গুছাইয়া তুলিবে?
অস্তরাগের শেষতম আভাসটুকুও আকাশে মুছিয়া গেল।

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭—)॥ মালতী

০ ০ এক ০০

ভাদ্রের নদী কানায় কানায় ভরা। কোথাও তরঙ্গের ভঙ্গি নাই। দুই তীরের সুবর্ণ বর্ণের শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন। সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া—শান্ত পরিপূর্ণতার রূপ! শরৎ প্রভাতের স্বচ্ছ আলোকে হরিৎশ্যাম চিত্রপট ঝলমল করিতেছে। মাঝে মাঝে নদী-জলধারা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

ডেপুটিবাবুর বজরা ধীরে চলিয়াছে। মাঝিরা সারারাত্রি লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া এক প্রকাণ্ড বিল পার হইয়া শ্রান্ত। ভোরবেলা বজরা বড়ো নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। সকালের বাতাস উঠিতেই পাল তুলিয়া দিয়া মাঝিরা তাম্রকূট সেবনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

সুকুমার 'টুরে' বাহির হইয়াছে। সঙ্গে শ্রীমনোরমা। বিবাহ বহুদিন হইয়াছে কিন্তু ডেপুটি-গৃহিণীর কোনো সন্তান হয় নাই। স্বামী টুরে বাহির হইলে তিনিও স্বামীর সহিত বাহির হন। তাছাড়া এবার জমিদার-বাড়ির বজরা পাওয়া গিয়াছে, পৃথক রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতির অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত। পাড়িও দীর্ঘ।

বজরার ছাদে এক বেতের চেয়ারে বসিয়া সুকুমার শারদ-নদীর শোভা দেখিতেছিল—জলময় অগাধ পরিপূর্ণতা, দিকে দিকে রৌদ্রোজ্জ্বল শ্যামশ্রী, আকাশে নির্মল নীলিমা। পৃথিবী যে কী অপূর্ব সুন্দরী, তাহা সে কোনো-দিন এমন গভীরভাবে অনুভব করে নাই। কিন্তু এই বাধাহীন সোনালী আলোকময় আকাশ, এই বহুদূরবিস্তৃত শুব্ধ জলরাশি, এই মৃদু হিল্লোলিত শস্যক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ হইতে চঞ্চল মেঘস্তূপের মায়াময় শুভ্রতা পর্যন্ত অসীম পৃথিবী ভরিয়া যেমন গভীর শান্তি তেমনই করুণাপূর্ণ বিষণ্ণতা। সুকুমারের

দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সহিত বুঝি গভীর বেদনা জড়িত।

নদীটি একটু সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, অদূরে ছোট গ্রাম, তীরে বড়ো বড়ো নারিকেল খেজুর, আম, নানাপ্রকার ছায়াতরু, বাঁশবন, শরবন।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মতো জীর্ণ, শুষ্ক। পাতা প্রায় সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুধু সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিদ্যুল্লতার মতো কোনো মত্ত আবেগে দিগবিদিকে প্রসারিত। মাঝিরা সেই পুরাতন বটবৃক্ষের নিচে বজরা বাঁধিল।

চাপরাশি সেলাম করিয়া নিবেদন করিল, হুজুর নন্দিগ্রাম যেতে হলে এখানে নামতে হবে। নন্দিগ্রামের পেয়াদা ঘাটে বসে আছে দেখছি।

পথে নন্দিগ্রামে ইন্‌স্‌পেক্‌সনে যাইবার কথা। সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। কোট-প্যাণ্ট পরিয়া চা খাইয়া সে তৈরিই ছিল। চাপরাশিকে বলিল, আমার হ্যাট ও ছড়ি নিয়ে এসো। নন্দিগ্রাম এখান থেকে কতদূর?

চাপরাশি উত্তর দিল, আজ্ঞে দু-মাইল পথ হবে।

সুকুমার বুঝিল, দুই ক্রোশের কম হইবে না, ঘোড়া পাইলে সুবিধা হইত। পাল্‌কি বা গোরুর গাড়িতে যাওয়ার চেয়ে হাঁটিয়া যাওয়া ভালো। শীঘ্র বাহির হওয়া দরকার।

ডেপুটিগৃহিণী বজরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, ওগো, বেশি দেরি কোরো না। আর আরদালিকে দিয়ে দুটো মুরগি পাঠিয়ে দিও, শিগগির, মিঠে কোর্মা করব, কেমন?

সুকুমার তাহার স্ত্রীর দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল। আট বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তবু মাঝে মাঝে কেন মনে হয়, তাহার স্ত্রী তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা, সে অবাক হইয়া যায়।

স্ত্রী বলিলেন, কি অমন হাঁ করে চাইছো কি? দেখো, আলু আর দু-দিন হবে, এ গ্রামে যদি আলু পাওয়া যায় দেখো তো।

আচ্ছা—বলিয়া সুকুমার মাথায় সোলার টুপি দিল।

০০ দুই ০০

তীরে নামিয়া একটু চলিতেই সুকুমার চমকিয়া উঠিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল। এই গ্রাম, এই পথ তাহার বহু

পরিচিত মনে হইল, যেন কোনো পূর্বজন্মে দেখা, কোনো স্বপ্নে জানা। তাহার মনে হইল, এমনি এক করুণ মধুর প্রভাতে ঐ বটগাছের নিচে তাহাদের নৌকা আসিয়া লাগিল, সে তাহার বন্ধুর সহিত উৎসুক অন্তরে আনন্দে তীরে নামিল, হাস্যে গল্পে গ্রাম্যপথ মুখরিত করিয়া চলিল। সে কি কোনো স্বপ্নে এই শান্ত, সৌন্দর্য-লোকে আসিয়াছিল ?

ধীরে সুকুমারের মনে পড়িল। বোধহয় নয় বৎসর পূর্বে হইবে। তখন সে এম-এ পড়ে। সতীশ রায় তাহার অন্তরের বন্ধু ছিল। সে কলিকাতায় মানুষ, বাংলার গ্রামের সহিত বিশেষ পরিচিত নয়। কোনো ছুটিতে সতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের দেশে লইয়া আসিয়াছিল। এমনই সুন্দর প্রভাতে সতীশ ও সে কি আনন্দে ঐ বটগাছের ধারে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। বটগাছটি এমন জীর্ণ কংকালসার ছিল না, তাহার শাখা-প্রশাখা ঘন সবুজ পাতার ভারে আনত ছিল, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় পারাপারের খেয়াঘাট ছিল। তখন শরৎ কি শীত কি বসন্তকাল মনে পড়িল না, সে প্রভাতে আকাশের আলো আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল ছিল, বাতাসের স্পর্শ আরো মধুর ছিল, প্রকৃতির শোভায় কোথাও বিষণ্ণতা ছিল না। সে আকাশ, সে আলো কোথায় গেল ? এ জীবনে আর কি তাহার দেখা মিলিবে না ?

ঐ শূন্য মাঠে হাট বসিয়াছিল, এই বিজন নদীতীর বিপণি-নৌকায় ভরা ছিল, নদী এত স্ফীত, এত প্রশান্ত ছিল না, কিন্তু সুকুমারের মানস-নদী ছিল কূলে কূলে ভরা।

সতীশ ও সুকুমার তীরে নামিতেই এক বালিকাকণ্ঠে "দাদা" আহ্বানধ্বনি তাহাদের কানে আসিয়া পৌছিল, কিন্তু সুমিষ্ট আহ্বানকারিণীকে কোথাও দেখা গেল না। সতীশ হাসিয়া বলিল, ও মালতী, কোথায় নিশ্চয় লুকিয়ে আছে, বটগাছের পেছনে হবে। মাল্‌তি।

বটগাছের পেছন হইতে এক কিশোরী হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া "দাদা" বলিয়া সতীশকে প্রণাম করিল। সতীশ তাহাকে একটু আদর করিয়া বলিল, ইনি আমার বন্ধু সুকুমার, মস্ত কবি। মালতী মুগ্ধ চোখে সুকুমারের দিকে চাহিল, সদ্যফোটা শেফালির মতো স্নিগ্ধ চাহনি। দাদার বন্ধুকেও প্রণাম করা উচিত ভাবিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিতে আসিল। না, না, করো কি ?—বলিয়া সুকুমার একটু পেছনে সরিয়া গিয়া মালতীর হাত ধরিল, মালতী ঘাড়

হেঁট করিয়া কোনো মতে প্রণাম সারিয়া লইল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

—দাদা শিগগির চলো, মাসিমা বড়ো ভাবছেন, তোমাদের কাল সন্ধেতে আসবার কথা ছিল, মাসি সারারাত ঘুমোননি।

সতীশ বলিল, বা, আমরা যে কাল তীরণের বিলে পথ হারিয়ে সারারাত ঘুরেছি—চল্, তোর জন্যে ভালো শাড়ি আর ছবির বই এনেছি।

তিনজনে গ্রাম্য পথ দিয়া চলিল। মধ্যে সতীশ, এক পার্শ্বে স্থকুমার, অপর পার্শ্বে মালতী। মালতী সতীশকে বাড়ির ও গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে বলিতে চলিল, তাহার স্থমিষ্ট কুমারী কণ্ঠে সরল হাস্যলহরী চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্থকুমার নীরবমুখে মালতীর কণ্ঠস্বর বাক্যধারা শুনিতেছিল, বাংলাভাষা যে এত সহজ, এত মিষ্ট হইতে পারে, তাহা সে কোনোদিন ভাবে নাই।

মালতীর কথা সে সতীশের নিকট বহুবার শুনিয়াছে। পিতৃ-মাতৃহীনা এই বালিকা সতীশের মাসতুতো বোন। সতীশের মা-র কোনো কন্যা-সন্তান নাই, তিনি মালতীকে আপন কন্যার অধিক যত্নে রাখিয়াছেন। সতীশের ইচ্ছা মালতীকে কলিকাতায় আনিয়া স্কুলে পড়ায়। কিন্তু সতীশের মাতা কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চান না, গ্রামের জমিজমা দেখিবার ভার নায়েব মহাশয়ের হাতে দিতে তিনি নারাজ। একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই বদ্ধ নগরে ক্ষুদ্র বাড়ির মধ্যে দু-দিনেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, সতীশ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আপন বুদ্ধি পরিশ্রমে ক্ষুদ্র জমিদারীর পরিচালনা করিয়া তিনিস তীশকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। মালতীও সতীশের মাকে ছাড়িয়া থাকিতে চায় না, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়া তাহার শিক্ষালাভ হইল না। সে গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছে, তারপর সতীশ যখন ছুটিতে যায় তাহাকে পড়াইতে বসে। বই পড়া বিশেষ হয় না, নানা গল্পে সে দেশের বিজ্ঞানের নানা কথা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে।

মালতীকে স্থকুমারের অপূর্ব বোধ হইল। ডুরে শাড়ি পরা, কোঁকড়া চুল পিঠে দুলিতেছে, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষু দুটিতে স্নিগ্ধ সরলতা, সহজ হাসি মাখানো সুস্থ দীর্ঘ তনু বিকশিত, সদ্য প্রস্ফুটিত মৃণালের মতো, কিন্তু মুখখানি অতি কচি ; শ্যামবর্ণ, এই শরতের শ্যামশ্রীর মধ্যে গৌরবর্ণ মানায় না, তাহার শ্যামবর্ণই সব চেয়ে

সুন্দর দেখায়। বালিকার চঞ্চলতা তাহার চক্ষের নাচনে, দেহের ভঙ্গিতে। নিষ্কলুষ চিত্তের স্বচ্ছতা সরল সুকুমার মুখে প্রকাশিত। বিকচোন্মুখ কুঁড়ির ওপর ভৃঙ্গের মতো তাহার কিশোরী তনুতে যৌবন আসিয়া বসিয়াছে, তাহার অন্তরবাসিনী সে সংবাদ এখনও জানে না।

গ্রাম ছাড়াইয়া তাহারা অবারিত মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। যতদূর চক্ষু যায় সোনালী ধানের ক্ষেত, হরিতে হিরণে সবুজে সুনীলে কী অপরূপ শোভা! ক্ষেতের মধ্য দিয়া একটি পায়-হাঁটা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, এই পথ দিয়া সতীশের বাড়ি যাইতে হইবে। চারিদিকে সতীশের জমি, কয়েক শত বিঘা।

—হুজুর ওদিকে পথ নেই, নন্দিগ্রাম যাবার পথ এদিকে—যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া চমকিয়া সুকুমার চাহিল। সম্মুখে তকমাধারী দুই পেয়াদা, চারিদিকে শূন্য প্রান্তর ধু ধু করিতেছে, কোথাও ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, কোথাও পোড়ো জমি, কোথাও জল জমিয়া পানায় ভরিয়া গিয়াছে। ডেপুটি-জীবনের মূর্তিমান সাক্ষ্যস্বরূপ পেয়াদা দুইটি আবার বলিয়া উঠিল, হুজুর পথ এদিকে, ওদিকে মাঠের মধ্যে কোথায় যাবেন ?

সুকুমার গম্ভীর স্বরে বলিল, রায়দের বাড়ি যাবার পথ কোন্ দিকে হবে ?

স্থানীয় পেয়াদাটি উত্তর দিল, কোনো পথ নেই হুজুর। আলে আলে যেতে হবে। তাঁদের তো কেউ নেই হুজুর, বাড়ি ভেঙে পড়েছে, সব জঙ্গল হয়ে গেছে।

সুকুমার বলিল, আচ্ছা, তোমরা যাও। আজ আর নন্দিগ্রামে যাওয়া হবে না, তোমরা ফিরে যাও, আমার এদিকে একটু কাজ আছে।

পেয়াদারা অতি বিস্মিত হইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

কাদা ভাঙিয়া, আল পার হইয়া, কাশবনের পাশ দিয়া, বাঁশবনের মধ্য দিয়া জঙ্গলময় বাগানে ঢুকিয়া সুকুমার এক ভগ্ন অট্টালিকার সন্ধানে চলিল। মাথা হইতে টুপি দুইবার পড়িয়া গেল, জামা দু-জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল, হাত-পা ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইল, তাহার সহিত সতীশ ও মালতী হাসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে।

মালতী বলিল, দেখো দাদা, কী সুন্দর ধান হয়েছে।

সতীশ উত্তর দিল, মা খুব খুশি!

—হ্যাঁ দাদা, মাসিমা তিনটে নূতন গোলা করেছেন। জানো দাদা, কাল দয়ের ওদিকে কাদাখোঁচা পাখি দেখেছি, তোমার বন্ধু বন্দুক ছুঁড়তে জানেন?

—বন্দুক তো একটি এনেছেন, কি শিকার করেন দেখা যাক।

—জানো দাদা, কালিগ্রামে বাঘ বেরিয়েছে, আহা পরশু দুটো বাছুর নিয়ে গেছে না কি, তোমার বন্ধুকে বাঘ শিকার করতে নিয়ে যাও।

—ওরে বুড়ি, উনি কবি যে, উনি কি এখানে বাঘ শিকার করতে এসেছেন, উনি এসেছেন প্রকৃতির শোভা দেখতে—গাছ, ফুল, পাখি চিনতে, পাড়াগাঁয়ে চাষারা কেমন থাকে তাই জানতে।

—দাদা, এবার কিছু আমাদের কপির চাষ করতে হবে।

আম-জাম-বাগান ভরিয়া বাতাস মর্মরিত হইয়া উঠিল। মালতীর সরল হাস্যোচ্ছাস সুকুমারের কানে বাজিতে লাগিল।

০০ তিন ০০

কোথায় সেই দহ? দহটি প্রথম দেখিয়া সুকুমার চমৎকৃত হইয়াছিল। চার মাইল লম্বা ও প্রায় এক মাইল চওড়া এই দহ হ্রদের মতো মনে হয়। সতীশের পিতা এই দহের তীরে পৈতৃক পুরাতন বাড়ি ভাঙিয়া প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে সুকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা-জানালার পাল্লাগুলি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্মুখের বারান্দা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, দেওয়ালে বহুস্থানে বালি খসা, এক দিকের ছাদ নিচু হইয়া বাড়িটি যেন হেলিয়া গিয়াছে, নানা বন্য লতা বাড়ির সর্বাঙ্গ জড়াইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে খেজুর নারিকেল গাছের ভিড়।

জলাভূমি। সেই দিগন্তবিসারী নির্মল দহ আর নাই। সোলা, কলমি, কচুরিপানা, চেঁচো ঘাসে বদ্ধ জলা। তীরের নিকট কোথাও বা লাল সাদা নানা রঙের শাপলা ফুল। কাকচক্ষু অগাধ জলরাশি গলিত রজতধারার মতো টলমল করিত, সূর্যোদয় সূর্যাস্তে তাহাতে রঙের হোলিখেলা হইত, মেঘের ছায়া পড়িত, চাঁদের মায়া ঘনাইত, অন্ধকার রাত্রে দর্পণের মতো চকমক করিয়া উঠিত। কোথায় সেই দহ?

ভাঙা ঘাটে এক পাথরের উপর সুকুমার বসিয়া পড়িল। তাহার যেন আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। ঘাটের বাঁধানো বসিবার স্থান অশ্বত্থমূল বিদারিত।

চারিদিকে প্রাচীন শাখাবহুল বৃক্ষগুলি আন্দোলিত করিয়া হা হা করিয়া বাতাস বহিয়া গেল। সম্মুখে সবুজের পঙ্কিল আস্তরণের মধ্যে একটু জল রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে, অশ্রু ভরা নয়নের মতো করুণ।
স্বপ্নছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিল। কোনো পূর্ব সুখ-জীবনের কথা। বহু বৎসর পূর্বে সতীশ ও মালতীর সহিত কাটানো এই দহের ধারের দিনরাতগুলি গল্পের একটানা সুতায় সে-কথা সে ভাবিতে পারিল না, বেদনার টানে সুতা বারবার ছিঁড়িয়া গেল। স্মৃতি কথক নহে, সে চিত্রশিল্পী, চিরপ্রবাহমান জীবন হইতে কয়েকটি দৃশ্য বাছিয়া সে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। সুকুমারের মনে পড়িল খণ্ড খণ্ড ঘটনা।

কলিকাতায় কখনো সে ভোরে উঠিত না। কিন্তু সতীশদের গ্রামে আসিয়া প্রতিদিন সে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিত। দহের ধার দিয়া শিশির ভেজা ঘাসের উপর বহুদূর চলিয়া যাইত, তাল নারিকেল পত্রগুলির মধ্য দিয়া সূর্যোদয় দেখিতে বড়ো ভালো লাগিত। এক উষায় জাগিয়া দেখিল, সতীশ তখনো ঘুমাইতেছে, তাহাকে জাগাইল না। একা ঘর হইতে বাহির হইল। চারিদিক তখনো ছায়াভরা, প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে ধানের গোলাগুলি পার হইয়া সে গোয়াল-ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়াল ঘর, তাহার আঙিনাতে এক পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট গাভীর পার্শ্বে মালতীর স্নিগ্ধ মূর্তি, আবছায়ায় রহস্যময়। সুকুমার পা টিপিয়া গাভীর দিকে অগ্রসর হইল। তরল অন্ধকারে অজানা মানবমূর্তি দেখিয়া গাভীটি ভীত হইয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার পায়ের আঘাতে দুধে-ভরা এক পিতলের বালতি উলটাইয়া পড়িল। মালতী চেঁচাইয়া উঠিল, পুঁটি কি করলি! তারপর সুকুমারকে দেখিয়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, ও আপনি! বেশ! চোরের মতো আসছেন কেন, আপনার জন্যে কি হল দেখলেন?
সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, আমার জন্যে?
মালতী উত্তর দিল, বাঃ, আপনাকে দেখে ভয় পেয়েই পুঁটু বালতি ওলটালে। তা বেশ, মাসিমা বলেছিলেন, আপনার জন্যে ক্ষীর-কমলা আর চন্দ্রপুলি করবেন, তা আর খেতে পেলেন না।
সুকুমার লজ্জিত হইল। বলিল, দেখো, মাসিমাকে বোলো না; তুমি গাঁ থেকে কিছু দুধ আনাবার ব্যবস্থা করো। মালতী কলহাস্য করিয়া উঠিল, আচ্ছা

আচ্ছা, আপনার দুধের কথা ভাবতে হবে না। তাহার সরল হাসির মতো সুন্দর, শুভ্র ফেনময় দুগ্ধস্রোত গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে প্রবাহিত হইয়া গেল। গাভী পুঁটু মালতীর হস্তের একটি মৃদু চপেটাঘাত লাভ করিল।

সুকুমার দহের তীরে আসিয়া বসিল, শুকতারার দপদপানি, উষার আলো, জলের শীতল অতলতা তাহার বড়ো মধুর লাগিল।

একদিন প্রভাতে মালতী আসিয়া সতীশকে বলিল, দাদা, আজ দয়ে সাঁতার কাটবে চলো। তোমার বন্ধু সাঁতার কাটতে জানেন?

সুকুমারের সাঁতার শিক্ষা কলিকাতায়, গোলদীঘির সুইমিং ক্লাবের সে এক উৎসাহী সভ্য।

তিনজনে মিলিয়া সাঁতার কাটিতে চলিল। সতীশের মাতা মালতীর এত দুরন্তপনা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সতীশ তাহাকে প্রশ্রয় দিত বলিয়া তিনি বাধা দিতে পারিতেন না।

গাছ হইতে জলে লাফাইয়া পড়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি, মাতামাতি, ডুবসাঁতার —সে কি সহজ সুখ!

তিনজনে সাঁতার প্রতিযোগিতা। সুকুমার বেশি দূর যাইতে পারিল না, দহের জল যেন ভারী। সতীশ ইচ্ছা করিয়াই অতি পরিশ্রান্ত, এরূপ ভাব দেখাইল। প্রতিযোগিতায় জিতিয়া মালতীর কী হাসি কী আনন্দ! বহুদূর সাঁতার কাটিয়া গিয়া তিনজনে যখন দহের তীরে বিশ্রাম করিতে বসিল, সুকুমার মুগ্ধনেত্রে দেখিল, মালতীর জলেভেজা কালোচুলে সূর্যালোকের ঝলমলানি, হাস্যদীপ্ত আননে অধরে স্মাততনুর রেখায় রেখায় আলোকলীলা। যেন কোনো স্বপ্নময়ী নাগবালা সূর্যহসিত জলরাশির অতলতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

বিজন স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। দহের স্থির জলে শুভ্র মেঘস্তূপের ছায়া, বাঁশবন তালবনের ছায়া।

সুকুমার এক গাছের তলায় বসিয়া একটি ইংরেজি কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। গাছের উপর হইতে একটি পেয়ারা তার বই-এর উপর আসিয়া পড়িল। সে উপরে চাহিয়া দেখিল, গাছের পাতার আড়ালে মালতী লুকাইয়া। ধীরে সে গাছে উঠিতে চেষ্টা করিল, মালতী গাছ হইতে লাফাইয়া পালাইতে

গেল, সুকুমার তাহার পেছন ছুটিল, আম বাগানে দুজনে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। লাফাইয়া পড়িতে গিয়া মালতীর পা একটু মচকাইয়া গিয়াছিল, সুকুমার সহজে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কোমল হাত দৃঢ় করিয়াই ধরিল। মালতী হাসিয়া চেঁচাইল, উঃ লাগছে ছেড়ে দিন। তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত। সুকুমার আরো দৃঢ় করিয়া দুই হাত ধরিল। সহসা মালতী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার সত্যই লাগিতেছিল। সুকুমার হাত ছাড়িয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে বলিল, মালতী, আমায় ক্ষমা করো।

লজ্জায় কান্না চাপিয়া মালতী চলিয়া গেল। সুকুমারের চোখে প্রখরালোকদীপ্ত পৃথিবী বড়ো শূন্য মনে হইল। সে আনমনা গাছতলায় বসিয়া পড়িল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মালতী এক শালপাতার ঠোঙাতে অপরিমিত লঙ্কা-লবণ মিশ্রিত আমের আচার লইয়া আসিয়া যখন বলিল, খাবেন? লঙ্কা খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও সে হাসিমুখে 'উঃ' 'আঃ' করিয়া সমস্ত আচার শেষ করিল।

সে সন্ধ্যাটি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না। ঘর অন্ধকার, বারান্দায় বসিয়া সে সূর্যাস্ত দেখিতেছিল। পূর্বাকাশ কালো মেঘে ছাওয়া, পশ্চিমাকাশের মেঘস্তূপে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দহের জল গলিত স্বর্ণের মতো।

সুকুমার দেখিল, অদূরে অঙ্গন দিয়া মালতী প্রদীপ হস্তে চলিয়াছে, তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে যাইতেছে, দেবী প্রতিমার মতো মুখখানি প্রদীপের শিখায় উদ্ভাসিত, কী স্নিগ্ধ, কী অপরূপ!

তাহার ইচ্ছা হইল, সে বলিয়া উঠে, মালতী, আমার গৃহ অন্ধকার, ঐ প্রদীপ হস্তে তুমি আমার গৃহে এসো, ঐ মঙ্গলস্নিগ্ধ শিখায় আমার জীবন আলোকিত করিয়া তোলো।

সুকুমারের যৌবন হৃদয়ের যে বিজন গৃহে জীবনপ্রিয়ার জন্য আসন পাতা হইয়াছে, প্রেমারতির প্রদীপ অনাগতার প্রতীক্ষায় নীরবে জ্বলিতেছে, সে গৃহে মালতী কখন নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে সন্ধ্যায় প্রেম-প্রদীপ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

আর একটি দ্বিপ্রহর, নিঝুম উদাস আলোয় দিবা-স্বপ্নের জাল বোনা যায়। জমিদারীর কোনো মোকদ্দমা তদারকের জন্য সতীশকে শহরে যাইতে হইয়াছে,

সেখানে কয়েকদিন থাকিতে হইবে। তাছাড়া মালতীর জন্য এক সৎ-পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কোনো উকিলের পুত্র। তাহাকেও দেখিয়া সব খোঁজ-খবর লইয়া আসিবে।

সুকুমার এক কদমগাছের তলায় বসিয়া টুর্গেনিভের 'অন্ দি ইভ' বইখানি পড়িতেছিল। বইখানি তাহার দুইবার পড়া, আরেকবার পড়িতে চেষ্টা করিয়া আনমনা হইয়া উঠিতেছিল। মালতী সহাস্তে আসিয়া বলিল, বাঃ, বেশ, সারাক্ষণ নিজে নিজে বই পড়ছেন, আমায় তো একটু পড়ান না?

—শুনবে এই বইয়ের গল্প?

—বলুন, নিশ্চয় শুনব। মালতী চুল এলাইয়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল।

সুকুমার টুর্গেনিভের উপন্যাসের গল্পটি বলিয়া যাইতে লাগিল। তরুশ্রেণীর মর্মরে, মক্ষিকাদলের গুঞ্জরণে, দিগন্তে পুঞ্জিত সবুজের স্তব্ধতায়, দহের জলের ঝিকিমিকিতে, বাঁশের পাতায়, আলোর কম্পনে, মালতীর স্নিগ্ধ কালো চোখের চাওয়ায় দিবস আরো মধুর, আরো উদাস হইয়া উঠিল।

সুকুমার যখন গল্প শেষ করিল, করুণ কাহিনী শুনিয়া মালতীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। মালতীকে বড়ো সুন্দর দেখাইল।

সুকুমার মালতীর হাত নিজ হাতে টানিয়া লইল। মালতী বাধা দিল না। শ্যাম চিত্রপটে ছবির মতো বসিয়া রহিল।

সুকুমার ধীরে বলিল, মালতী, তোমাকে আমি ভালবাসি। যেন টুর্গেনিভের গল্পের উপসংহারে নিজ জীবনের গল্প বলিতেছে।

মালতী যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, হাত টানিয়া লইল, আয়ত কালো চোখ দুটি আরো কালো হইয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, শোনো মালতী, আমায় তুমি বিয়ে করবে, কেমন রাজী?

মালতী আবার স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া গেল।

সুকুমার বলিল, কি, মৌনং সম্মতিলক্ষণং?

মালতী মায়াময় হাসিয়া বলিল, তার মানে?

সুকুমার বলিল, তার মানে হচ্ছে, তুমি রাজী বলেই চুপ করে আছো।

মালতী উচ্চহাস্তে বলিল, বাঃ আমি কি জানি?

সুকুমার বলিল, তুমি জানো।

এবার মালতী গম্ভীর হইল, ধীরে বলিল, সত্যি বলছেন?

সুকুমার অস্ফুটস্বরে বলিল, হাঁ সত্যি।
মালতীর মুখ রাঙা হইল। সে বলিল, বেশ, তাহলে দাদাকে, মাসিমাকে বলুন।
সুকুমার বলিল, তোমার দাদা আসুন।
মালতী নিমেষে উঠিয়া অন্তর্হিত হইল। জলে নীলাকাশের ছায়ার দিকে চাহিয়া সুকুমার বসিয়া রহিল।

তারপর দুইদিন মালতীর বিশেষ দেখা পাওয়া গেল না। ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া সে পালায়।
সুকুমার দেখিল, তাহার হাস্য মৃদু, তাহার গমন মন্থর, তাহার দৃষ্টি গভীর হইয়াছে। কোনো গম্ভীর স্নিগ্ধ নারীপ্রকৃতি চঞ্চলা সরলা বালিকার দেহে মনে ধীরে ভরিয়া উঠিতেছে। কখন যাদুমন্ত্রে তাহার বালিকা-জীবন শেষ হইয়া নারী-জীবন আরম্ভ হইল, সে জানিতে পারিল না।
তৃতীয়দিন মালতী ধরা দিল।
রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে চমৎকার। দহের ঘাটে সুকুমার বসিয়াছিল চুপ করিয়া। এ কোন্ রূপকথার মায়াপুরী।
মালতী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, নৌকো চালাবেন? ঘাটে একটি দুই-দাঁড় নৌকা বাঁধা।
দুইজনে নীরবে নৌকায় গিয়া উঠিল, অতি মৃদুভাবে দাঁড় টানিয়া চলিল, জলের ছপছপ শব্দে জ্যোৎস্না রাত্রি শিহরিত হইয়া উঠিল।
দুইধারে মায়াময় বৃক্ষশ্রেণীর মর্মরিত অন্ধকার, সম্মুখে রজতশুভ্র টলমল জলপথ, ঊর্ধ্বে শুদ্ধ নীলাকাশ জ্যোৎস্না ধৌত। কয়েকটি সামান্য কথা, মাঝে মাঝে হাসি, দাঁড় ছাড়িয়া এলাইয়া বসা।
পদ্মবনে তাহারা নৌকা থামাইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারিল না, সহাস্য মৃদু গুঞ্জরণ।
গভীর রাত্রিতে যখন তাহারা বাড়ি ফিরিল, তাহাদের দেহমন কোন্ অতল সুধারসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন অপরাহ্নে সুকুমারের বাড়ি হইতে টেলিগ্রাম আসিল। সুকুমার তাহার প্রিয় গাছের তলায় বসিয়াছিল, বোধ হয় মালতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

চতুর্দিকে যে প্রাণধারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, শাখায় শাখায় আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এই পল্লবিত পুষ্পিত প্রাণোচ্ছ্বাসের স্পন্দন আপন অন্তরে অনুভব করিতেছিল।

টেলিগ্রাম লইয়া আসিলেন সতীশের মা। উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনো দুঃসংবাদ নয় তো?

সুকুমার ভীতস্বরে বলিল, মা-র বড়ো অসুখ, আমায় আজই যেতে হবে। তাঁর হার্ট খারাপ, বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সতীশ শহর হইতে ফিরিয়া আসে নাই। তাহার জন্য প্রতীক্ষা করা চলিবে না। সতীশের মাতা সুকুমারের কলিকাতা যাইবার সব বন্দোবস্ত করিতে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকায় বাহির হইলে ভোরে ট্রেন পাওয়া যাইতে পারে।

সতীশের মাকে প্রণাম করিয়া সুকুমার যখন তাহার হাত-ব্যাগ লইতে সন্ধ্যার আলোছায়াময় গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল, মালতী ভূমিতে নতজানু হইয়া তাহার বিছানাতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে সে মালতীর হাত ধরিল, মাথায় হাত বুলাইল, মালতী কাঁপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার বুকে মুখ গুঁজিল, দুই চক্ষু দিয়া দুই কপোল বহিয়া অশ্রু অঝোরে ঝরিতে লাগিল। এই চির হাস্যময়ীর ক্রন্দন সুকুমার বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহার বুক বুঝি ভাঙিয়া যাইবে। সে শুধু বলিল, মালতী, কেঁদো না, আমি গিয়েই চিঠি দেবো।

মাঝিরা যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, সূর্যের স্বর্ণরেখা মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশ তারায় তারায় ভরা। সুকুমার ব্যথিত ক্ষুধিত চোখে তটভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, তটবৃক্ষের অন্তরালে কে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে মনে হইল। সে মালতী।

তটভূমি ছায়ার মতো মিলাইয়া গেল, চারিদিকে সজল গম্ভীর অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল।

তারপর?

তারপরের দিনগুলির কথা সুকুমারের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু স্মৃতির ধারা মুক্তি পাইয়া অদম্য স্রোতে প্রবাহিত, কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে।

কলিকাতায় ফিরিয়া সুকুমার দেখিল, মা সারিয়া উঠিয়াছেন, একদিন অসুখ একটু বাড়িয়াছিল, সেজন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। সতীশকে সে চিঠি লিখিল কিন্তু তাহাতে মালতীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই লিখিল না। মালতীকে একটি ছোট চিঠি লিখিবে ভাবিল, কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

মালতী যেন কোনো গ্রাম্য রূপকথার স্বপ্ন। নদীর তীরে, আম্রবনের ছায়ায়, গোলা ভরা গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে, দহের পদ্মবনে, চন্দ্রালোকের মায়ায় তাহাকে মানায়। কলিকাতার কৃত্রিম সভ্যজীবনে অর্থগর্বিত সমাজে তাহার স্থান কোথায়? সুকুমার বুঝিল, মালতীকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করা অসম্ভব। সে যদি কোনো চরের ধারে নিভৃত শান্ত পল্লীতে জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে মালতীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইত।

এদিকে সুকুমারের অসুস্থা মাতা অতি শীঘ্র পুত্রবধূর মুখদর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার লোকের অভাব ছিল না।

মনোরমার পিতা সুকুমারের পিতৃবন্ধু। মেয়েটিকে মায়েরও পছন্দ। তাহার ভ্রাতা সুকুমারের স্কুল-কলেজের সহপাঠী। পিতৃবন্ধু স্বয়ং আসিয়া যখন প্রায়ই সুকুমারকে চায়ে বা রাতের ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, সুকুমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মনোরমাদের বাড়ির টেনিস ক্লাবে সে নিয়মিত সভ্য হইয়া উঠিল। কিছুদিন পর দেখিল, মনোরমার হাতে-তৈরি চা-র একটা অপূর্ব মিষ্টতা আছে ও মনোরমাও বিশেষ 'চার্মিং'। সাধারণ মেয়েদের মতো সে নয়।

বিকালবেলা টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাইতে ঘোরাইতে সুকুমার বালীগঞ্জের দিকে যাইতেছিল, পথে সতীশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সতীশের মুখ মলিন, চুল উস্কখুস্ক।

সতীশ একটু কর্কশ স্বরেই বলিল, বেশ তোমায় তিনখানা চিঠি দিলুম, কোনো উত্তর নেই, তোমার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলুম।

সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলিল, বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। কবে এলে? মায়ের অসুখে—

সতীশ দৃঢ়স্বরে বলিল, শোনো, মা ও মালতীকে নিয়ে এসেছি, আমার সেই পুরনো ঠিকানা—

—ওঁরা এসেছেন ?

—হাঁ, মালতীর যে কি অসুখ করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—তুমি চলে আসার পর থেকেই—যেমন রোগা তেমনি দুর্বল হয়ে পড়েছে—বলে, বুকের মধ্যে কিরকম একটা ব্যথা করে। মাঝে মাঝে একা ছাদে গিয়ে কাঁদে—বলে খানিকটা কাঁদলে বুকের ব্যথাটা কমে—

হঠাৎ কি অসুখ—সুকুমার আর বলিতে পারিল না, কোনো রকমে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল।

—মা বললেন, চল্ কলকাতায়, ডাক্তারদের দেখাই, কি যে হয়েছে, মেয়েটা মুখ ফুটে বলে না, কেঁদে কেঁদেই কি প্রাণটা দেবে! তাই নিয়ে এসেছি কলকাতায়। দু-তিনজন ভালো ডাক্তার দেখালুম, সবাই বলে, মনের অসুখ। জানো তো, ওর কী কচি মন। ওর কষ্ট দেখে আমার রাতে ঘুম হয় না—কি যে ওর ব্যথা, কিছু মুখ ফুটে বলে না—র‍্যাকেটটা যে তোমার হাত থেকে পড়ে গেল—

সুকুমার কোনো উত্তর করিল না।

—শোনো, আজ সন্ধ্যেতে এসো, মা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান, তোমার কথা রোজই বলছেন—

—দেখো ভাই, আজ আমার একটা বিশেষ 'এনগেজমেণ্ট' রয়েছে, আমি কাল যাবো।

—আচ্ছা, কাল নিশ্চয় এসো, আমি সারাদিন বাড়ি থাকব।

বালীগঞ্জ যাইতে সুকুমারের আর ইচ্ছা করিল না, কিন্তু কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। দুইদিন হইল মনোরমার সহিত তাহার এনগেজমেণ্ট হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সতীশের বাড়ি যাওয়া হইল না। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে এক সুন্দর বাগান পাওয়া গিয়াছে, পিকনিকের ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুকুমারকে মনোরমাদের সঙ্গে যাইতে হইল।

তার পরদিন টেনিস-টুর্নামেণ্ট আরম্ভ। প্রথম খেলাতেই সুকুমার।

সত্যই কি সে একটু সময় করিয়া মালতীকে দেখিতে যাইতে পারিত না ?

দিনের পর দিন আপনাকে নানা কাজে অকাজে জড়াইয়া সে মনকে বোঝাইতেছিল, তাহার সময় নাই।

ভাবী শ্বশুরের সুপারিশে গবর্নমেণ্ট চাকরির চেষ্টা চলিতেছিল। বঙ্গ গবর্নমেণ্টের

কয়েকজন উচ্চতম ইংরেজ কর্মচারীর সহিত দেখা করা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সে দার্জিলিং চলিয়া গেল।

সাতদিন পরে যখন সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সতীশ তাহার মা ও বোনকে লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

সতীশকে চিঠি লিখিয়া কোনো খবর লইতে সে লজ্জা বোধ করিল।

সংবাদটি কোনো সহপাঠী বন্ধু তাহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। তিন মাস পরে হইবে।

মনোরমার সহিত মহা ধূমধামে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ডেপুটিগিরি চাকরিও লাভ হইয়াছে।

বাংলার কোনো ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত শহরে গিয়া সে ম্যালেরিয়াক্রান্ত অসুখের সংবাদ জানিয়া মনোরমা তাহার পিতার সহিত স্বামীর নব কর্মস্থলে যেদিন আসিল, সেই দিনই সন্ধ্যায় বন্ধুর পত্র আসিল।

অপরাহ্নে প্রচুর কুইনিন খাইয়া র‍্যাগ মুড়ি দিয়া সুকুমার সার্কিট হাউসের বারান্দায় বসিয়াছিল। ডাক পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। দীর্ঘ পত্রটি দুইবার পড়িল, সব যেন বুঝিতে পারিল না, কুইনিন খাইয়া তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছে।

শুধু এইটুকু বুঝিল, মালতীর মৃতদেহ দহের জলে পাওয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রিতে একটি ছোট নৌকা লইয়া মালতী দহ পার হইতে চেষ্টা করে। দহের মধ্যস্থানে গিয়া তাহার নৌকা উল্টাইয়া যায়। সে অত্যন্ত দুর্বল ছিল। সে ইচ্ছা করিয়া ডুবিয়াছিল, না, তাহার সাঁতার কাটিবার শক্তি ছিল না, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সে রাত্রিতে সুকুমারের আবার জ্বর আসিল, জ্বর উঠিল একশো পাঁচ ডিগ্রি। সমস্ত রাত্রি ও পরদিন সে বিকারগ্রস্ত হইয়া ভুল বকিল, মালতী, মালতী।

অর্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিতে হইল চিকিৎসার জন্য।

দুইমাস পরে যখন সে সুস্থ হইয়া উঠিল, সতীশকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। কোনো উত্তর আসিল না।

খোঁজ লইয়া জানিল, মালতীর মৃত্যুর সাতদিন পরেই সতীশের মাতার মৃত্যু হইয়াছে। সতীশ তাহার সমস্ত জমিদারী বেচিয়া ব্রেজিলে চলিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় জমি কিনিয়া সে বসবাস করিবে। শুধু পৈতৃক বাড়ি ও দহ বৃদ্ধ নায়েবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছে।

কোথায় সেই দহ? শরতের মধ্যাহ্নালোক প্লাবিত শৈবালপূর্ণ দহের দিকে চাহিয়া সুকুমার দুই চক্ষের অশ্রু আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ছোট শিশুর মতো ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জনহীন জীর্ণ বনানী উদাস বাতাসে মাঝে মাঝে হা হা করিয়া উঠিল।

অতি পরিশ্রান্তভাবে সুকুমার যখন বজরাতে ফিরিল, সূর্য মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। চারিদিকে শুষ্ক প্রখর আলো।

মনোরমা স্বামীকে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে ছুটিয়া আসিলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, পেয়াদারা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। একি, রোদে মুখ কালি হয়ে গেছে, অসুখ করেনি তো?

মনোরমা স্বামীর কপালে মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কী ঠাণ্ডা তোমার হাত, গা যেন হিম। শোনো আর স্নান কোরো না, গরম জল করে রেখেছি, হাত মুখ ধুয়ে খেতে এসো। মাংসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

একটু পরে মনোরমা যখন সকল খাবার আনিয়া টেবিলে রাখিলেন, দেখিলেন স্বামী অতি ক্লান্ত, অতি উদাসভাবে চেয়ারে বসিয়া।

—বা, ওঠো, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসো। ওগো দেখো তো মাংসটা কেমন হয়েছে!

একটি ছোট প্লেটে মুরগির মিঠে কোর্মা আনিয়া মনোরমা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। সুকুমার এক টুকরা মাংস হতাশভাবে মুখে পুরিল, রান্না আলুনি মনে হইল। লবণহীন মাংসখণ্ড কোনোরূপে গিলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছে।

বেগে বাহিরে গিয়া সে মাঝিদের হুকুম দিল, নোঙর তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে।

তকমাধারী পেয়াদাটি বলিল, হুজুর, নন্দিগ্রামে—

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে হুকুম দিল, দরকার নেই—নোঙর তোলো, চলো, এগিয়ে চলো—

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭—) ॥ আর এক তরফা

০০এক০০

মিস্ এম, দত্ত, সেক্রেটারি, শিল্পকলা বিতান—

মহাশয়া,

আপনার পত্র পাইয়া ধন্য হইলাম। আমি রাজকর্মচারী হিসাবে আপনাদের শহরে আসিয়াছিলাম এখানকার কৃষি-আপিস পরিদর্শনের জন্য। এখানে এই আপিসে পাটের বীজ কি পরিমাণ আছে, এবং বীজধান তার তুলনায় কত বেশি বা কম আছে তাহার হিসাব লওয়াই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। দেশে পাট লোপাট হউক এবং ধান প্রধান হইয়া উঠুক ইহাই এখন আমাদের জাতি-গত কামনা। ইতিমধ্যে আপনার চিঠি পাইয়া আমি যে কী পরিমাণ আনন্দ-লাভ করলাম তাহা কৃষিবিভাগের লোক হইয়া উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় লাভ করিয়া আমি পরম পুলকিত হইয়াছি এবং আপনাদের পারিতোষিক বিতরণ সভার পৌরোহিত্য করা আমি বিশেষ সৌভাগ্য মনে করিতেছি। আমি অবশ্যই উপস্থিত হইব, কেননা শিল্পকাজে আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। বালিশের ওয়াড়ের কোণে ফুল তোলা, কাঁথা সেলাই প্রভৃতি কাজকে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রথম সোপান বলিয়া আমি মনে করি, বিশেষত রুমালের কোণে মনোগ্রাম লেখা এবং বড়ি দেওয়া বাল্যকাল হইতেই আমার কাছে পরম বিস্ময়কর কাজ বলিয়া মনে হয়। হালুয়া প্রস্তুত করা এবং চুল বাঁধাও আমি কখনও খুব নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ পাই নাই, এবং আমি এমনই হতভাগ্য যে কি করিয়া মেয়েরা আলতা পরে তাহাও কখনও ভালো করিয়া বুঝিবার সুযোগ পাই নাই। আপনার আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি আগামী শুক্রবার

৪টায় যাইব এবং গিয়া আপনার বর্ণিতরূপ বহু কুমারী এবং বিধবাদের দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিব।

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য
এম চ্যাটার্জি

০০ দুই ০০

মহাশয়া,

আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইলাম। আপনি যে আমার নির্দিষ্ট সময়টিতেই সব আয়োজন করিতেছেন ইহা জানিয়া ধন্য হইলাম। এখন মনে হইতেছে মঙ্গল-বার হইলেই ভালো হইত, কেননা শুক্রবার আসিতে আরও চার দিন বিলম্ব হইবে। আমি আপনাদের মনোহর প্রতিষ্ঠানটি দেখিবার জন্য অন্তরে অন্তরে একটি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করিতেছি। কিন্তু সে কথা যাক, আপনাদের কল্যাণ কামনা করি। ইতি—

খুবই সত্যভাবে আপনার এম. সি.

০০ তিন ০০

মহাশয়া,

আপনার পত্র পাইলাম। সেদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানগুলির শেষে এক রকম অভিভূত হইয়াই ফিরিয়াছি, ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করিব —সামাজিক প্রতিষ্ঠান, না ফিরিয়া উপায় ছিল না। আমার উপস্থিতি আপনার প্রতিষ্ঠানের কোষ্ঠী নির্দেশের ফল, না আমার কোষ্ঠী নির্দেশের ফল তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে দিন আপনি আপনাদের উচ্চাঙ্গের শিল্পগুলিকে নিকটতম দৃষ্টিতে দেখিবার যে অপূর্ব সুযোগ আমাকে দিয়াছিলেন তাহা আমার এই বত্রিশ বৎসর বয়সে আজ পর্যন্ত কেহ দেন নাই। সুপ্রিয়া নামক মেয়েটির খোঁপা আমি নিজ হাতে খুলিয়া দিলাম, অন্য একটি মেয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই খোঁপা আবার পূর্ববৎ বাঁধিয়া দিল ইহা আজও আমার কাছে স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। আমার চোখের সম্মুখে প্রভাবতী, উমা, গৌরী, সাবিত্রী, এই চারিটি মেয়ে চারিখানি রুমালে আমার মনোগ্রাম সেলাই করিল ইহাও একটি বিস্ময়কর ঘটনা। ইংরেজি এম সি অক্ষর দুইটি শিশুকাল হইতে পড়িতেছি এবং লিখিতেছি কিন্তু অক্ষর দুইটি যে এমন সুন্দর তাহা

একমাত্র সেই দিনই উপলব্ধি করিয়াছি। তারপর যখন আমি আলতা পরার রহস্য জানিতে চাহিলে আপনি আলতার শিশি তুলি আমার হাতে দিয়া একে একে আপনার পা দুইখানি আমার দিকে আগাইয়া দিয়া আমার হৃদয়ে আপনার কৌতুক-হাসির শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন আমি কি করিয়াছিলাম? আমার কিছুই মনে নাই। আমার হাত কাঁপিতেছিল, লজ্জায় ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। কিন্তু শুধু কি লজ্জায়? কে জানে কিসে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা হাসিতে হাসিতে মুখে আঁচল চাপা দিয়া দূরে সরিয়া গেল, আপনিও সম্ভবত হাসিতেছিলেন, কিন্তু আপনার প্রতিভা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমাকে রক্ষা করিল। কিন্তু সত্যই কি রক্ষা করিল? আপনি "কাকে বড়ি খেয়ে গেল" বলিয়া একলাফে উঠিয়া পলাইয়া গেলেন, সে কথা কি আমি ভুলিতে পারি? আপনি সে দিন নানা আয়োজনের ভিতর দিয়া আমাকে আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়াছেন।

আপনি আমার কাছে আসিতে চাহিয়াছেন, এ যে একেবারে আশাতীত। আপনি নিশ্চয় আসিবেন। অনেক বিষয় আলোচনা করিবার আছে। প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইতে হইবে। আমার সময় অমূল্য বলিয়া শ্লেষ করিবেন না।. আপনি জানেন না আমি স্বয়ং অমূল্য, মা বাল্যকালে আমাকে অমূল্য বলিয়া ডাকিতেন, কিন্তু তবু আপনার কাছে এবং একমাত্র আপনার কাছেই সুলভ হইয়া উঠিলাম। আপনি আমাকে লইয়া যা খুশি করিতে পারেন। ইতি—

আপনার মহেশ চট্টোপাধ্যায়

০ ০ চার ০ ০

প্রিয় মিস্ দত্ত,

আমি ঝোঁকের মাথায় এযাবৎ আপনার চিঠির উত্তরে এমন সব কথা লিখিয়া ফেলিতেছি যে এ সব চিঠি আপনাকে পাঠানো অসম্ভব। আমার মানসিক চাঞ্চল্য সত্ত্বেও একটি উপদেশবাক্য আমার মনে পড়িল। Do right and fear no man. Don't write and fear no woman. সুতরাং নিতান্তই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতে আমি এই চিঠিগুলি ডাকে দিব না। চিঠি ডাকে দিতে গেলে লেখার সময় যে-পরিমাণ সংযম দেখাইতে হয় সে সংযম আপাতত আমার নাই। সুতরাং আপনার চিঠি পাইলেই তাহার উত্তর

লিখিব, কারণ, না লিখিলে আমি স্থির হইতে পারিব না, কিন্তু সে চিঠি ডাকে দিব না। দিলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হইবে। আপনি বলিতে পারেন—হৃদয়-সম্পর্কিত ব্যাপারে এতখানি বিষয়-বুদ্ধি কেন? কিন্তু আগেই বলিয়াছি ইহা আত্মরক্ষা। এ আত্মরক্ষার অবশ্য কিছু মূল্য নাই—আত্মহত্যায় যেখানে প্রবল আকর্ষণ সেখানে আত্মরক্ষার চেষ্টার কোনো মানে হয় না, কিন্তু তবু একটুখানি হাতে রাখিলাম। তা ছাড়া আমাকেই আমি হঠাৎ এতখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি, আপনার দিকে কতখানি প্রকাশ হয় সেটাও আমি জানিতে চাই। চিঠি ডাকে না দিতে পারিয়া আমি ছটফট করিতেছি—তারপর 'জয় অজানার জয়' তো একদিন করিতেই হইবে। কিন্তু দেখাই যাক না।

আপনার এই চিঠি আমাকে উন্মাদ করিয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন 'আপনার সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিবার কোনো সুযোগ এখানকার কেহ পায় নাই'—ওঃ কী নিষ্ঠুরতা আপনার। তবে কি সেদিন যাহা বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন তাহা সবই অস্বাভাবিক? কিন্তু তাহাতে এত সংকোচ কেন? যে-সব কথা বলিয়াছেন, যে-সব কাজ করিয়াছেন, আপনাদের সঙ্গে মেলা-মেশার যে উদার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন, তাহা তো ক্রমশ দিতেই হইত—না হয় প্রথম দিনই দিলেন? ভূমিকা না হয় নাই করিলেন? একেবারেই না হয় ডবল প্রমোশন দিলেন? ক্ষতি কি? প্রমোশন দিবার পর এখন নিচের ক্লাসে নামাইতে চান, এ তো বড়ো অদ্ভুত! এতদিন পরে স্বাভাবিক কথা ও কাজের জন্য আমাকে আবার ওখানে ডাকিতে চান? আমি যাইব না। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছি, এবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার কথা। আমি আপনার অন্যায় অনুরোধ পালন করিব না। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ মহেশ

০০ পাঁচ ০০

প্রিয় মিস্ দত্ত,

আপনার চিঠি পাইলাম। আমি সদাশয়, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, মহানুভব, কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি? আমার মনুষ্যত্ব যে আমার পদের উপরে তাহাও আমি জানি, আমার বাহিরের জিনিস, নিতান্তই বাহিরের জিনিস এবং ইহা যে আমার পরিচয় নয় তাহাও জানি, আমার ব্যক্তিত্ব বড়ো তাহাও

না হয় মানিলাম, কিন্তু আপনারা মুগ্ধ হইয়াছেন কি? সেটা যে আমার ভালো করিয়া জানা দরকার। যদি সত্যই মুগ্ধ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার ব্যক্তিত্ব আপনাদের জীবনকে, কল্পনাকে, সাধনাকে এবং ভবিষ্যৎকে সঞ্জীবিত, মুকুলিত ও সার্থক নিশ্চয়ই করিবে। মধ্যে মধ্যে আমার দর্শন, আমার বাণী, আমার আলাপ-আলোচনা, আমার রসিকতা, আপনাদের সবাইকে সার্থক করিবে। কিন্তু সবাইকে করিয়া দরকার কি? সমস্ত জনতার মধ্যে যে সেদিন আপনাকেই আমি দেখিয়াছিলাম। বহুতে অরুচি না থাকিলেও একের প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি। সবাইকে সমান ভাবে সার্থক করিয়া তোলার যথেষ্ট সময় এবং পরিশ্রম দরকার—আমার একার মধ্যে ততটা ক্ষমতা এবং আমার হাতে ততটা সময় আছে বলিয়া কি আপনার৷ সত্যই বিশ্বাস? তবে কেন "আমাদের" "আমাদের" করিয়া মরিতেছেন?

আপনার মহেশ

০০ ছয় ০০

মণিকা দেবী,

আমি বদলি হইলেও আমার সত্তার কোনো বদল হয় নাই। সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নাই। আমার স্থানান্তরে বদলি হওয়ার কথা আমি ইচ্ছা করিয়াই আপনাকে জানাই নাই কারণ তাহা হইলেই বিদায় অভিনন্দনের ঝামেলা করিতেন তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পক্ষে বিদায় লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত, আপনার সান্নিধ্য দ্বিতীয়বার লাভ করিলে আমি সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া পড়িতাম, সুতরাং না জানাইয়া ভালোই করিয়াছি। প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা পেট্রন আপনার কাছে ক্রমেই বড়ো হইয়া উঠিতেছে, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা যতই মারাত্মক হউক, আমার কাছে ইহার মূল্য যে কতখানি তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না। আমাকে বাদ দিয়া প্রতিষ্ঠানের সুমধুর আবেষ্টন স্বাদহীন হইয়া পড়িয়াছে ইহা ভাবিতেও পুলকিত হইতেছি। আমাকে আর বেশি উস্কাইয়া তুলিবেন না, কেননা অল্প দিন হইল চাকরিটি পাইয়াছি, এটি হাতছাড়া হইলে আবার ভাগ্যান্বেষণে পথে পথে ঘুরিতে হইবে। আমি আরও নিরুপায় এই জন্য যে আমার হাতের লেখা আপনাকে পাঠাইতে পারিতেছি না, আপনার দিককার সব

কথাই শুনিতেছি, আমার কোনো কথাই আপনি শুনিতে পাইতেছেন না।
ইতি—

আপনার মহেশ

০০ সাত ০০

মণিকা দেবী,

পনেরো দিন পরে আপনার চিঠি পাইয়া আবার উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছি। 'আপনাদের প্রতিষ্ঠান' এবং 'আপনারা' গোল্লায় যান, শুধু আপনি থাকুন। আমি জগতে কাহারও উপরেই অসন্তুষ্ট হই না। আপনার ভিতর দিয়া আমি এ দেশের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতেছি। আপনি আদর্শ প্রতিষ্ঠান নেত্রী, প্রতিষ্ঠান মাত্রেই মানুষের জন্য স্থাপিত হয়। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে না। শুধু বিধি-বিধান লইয়া যাহারা থাকে তাহারা প্রাচীরে ঘেরা বদ্ধ জায়গায় বাস করে, তাহারা চলে না। কিন্তু আপনি এবং আপনার প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। আরও সুবিধা এই যে দুই জন দুই দিকে চলিতেছে। আমার সঙ্গে, অর্থাৎ সচল পৃথিবীর জীবন্ত মানুষের সঙ্গে একটুখানি পরিচয়েই দেখুন আপনার প্রতিষ্ঠান এবং আপনি সচল হইয়াছেন, এই মানুষটিকে আর বাদ দিতে পারিতেছেন না। আমি ক্রমশই আপনাকে পথে টানিতেছি। চিঠির উত্তর ডাকে না দিয়া কিছু নিষ্ঠুরতা আমি আপনার প্রতি প্রকাশ করিতেছি বটে, কিন্তু টান যদি প্রাণের হয় তাহা হইলে টানাটানিতে ভালোই হইবে। আমি আপনাদের কাহাকেও ভুলি নাই। আমার সৌভাগ্যবশত বর্তমান চাকরিটি না থাকিলে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানের দরোয়ান হইয়া জীবন কাটাইতাম। পত্রের আশায় বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? পত্র পাইবেন না।
ইতি—

আপনার মহেশ

০০ আট ০০

প্রিয়তমা মণিকা,

চিঠি পাই অথচ চিঠি দিতে পারি না এ যে কী দুঃখ তা তুমি বুঝিবে না। তোমার সাপ্তাহিক পত্র এখন নিয়মিত পাক্ষিক পত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে ইহা মন্দের ভালো। তুমি অন্তত পনেরো দিন সংবত থাকিতে পারিতেছ এবং

পনেরো দিন পরে মনের কথা আমাকে জানাইয়া ভারমুক্ত হইতে পারিতেছ, কিন্তু আমার অবস্থাটা ভাবো দেখি। প্রতি পনেরো দিনের রূপান্তরে তুমি চাঁদের মতো ক্রমশই আমার উপগ্রহ হইয়া পড়িতেছ অথচ গ্রহবৈগুণ্যে আমি মূক এবং বধির। তবে আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে এই কথাটি আমাকে বড়োই ভাবাইয়া তুলিয়াছে। শ্রদ্ধা ক্রমশ বেশি হওয়া ভালো না। শ্রদ্ধা বেশি হইলে নিষ্ঠুরতা এবং উদাসীনতা বাড়িয়া যায় এবং সেই পরিমাণে ভালবাসা কমিয়া যায়। স্কুলের হেডমাস্টারকে আমরা বেশি শ্রদ্ধা করি, কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে কিংবা গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে আমরা বেশি শ্রদ্ধা করি। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা যেন সে রকম না হয়। তোমাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি শ্রীমতী অমিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সুখের বিষয়—সবিতার স্বামীও সবিতাকে লইয়া গিয়াছেন এটাও সুখবর। আগামী খইভাজার প্রতিযোগিতায় আমি থাকিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু আমি থাকিলে আরও দুঃখিত হইতে। খইভাজায় আমিই বর্তমানে সবাইকে হার মানাইতেছি। আমার হৃদয়ে অহর্নিশি খইভাজা চলিতেছে, গরম বালির উপর ধান পড়িতেছে আর চট্‌পট্‌ শব্দে ফাটিয়া খই হইয়া ইতস্তত ছুটিয়া যাইতেছে। আমার মনে হয় ইহা এমনই একটি সত্য ঘটনা যে বাহিরের লোকেও হয়তো তাহা দেখিতে পাইতেছে। সুতরাং আমি থাকিলে তোমাদের মেয়েরা কেউ এই প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিত না। ইতি—

তোমারই মহেশ

০০ নয় ০০

প্রাণের মণিকা,

তুমি পত্র লিখিতে থাকো, উপায় কি? আমার সৌহার্দ্য কৃত্রিম নহে ইহা সেদিন ঠিকই বুঝিয়াছিলে, আমার হৃদয়ে সেদিন কোনো কৃত্রিমতা সত্যই ছিল না। তবে সেটা সাময়িক হইলেও তাহার জের টানিয়া চলিয়াছি। তোমার সংবাদ চাই—তোমার চিঠি চাই, এবং শেষ অবধি তোমাকেই চাই। ইহা কি আমার নীরবতাতে প্রকাশ হইতেছে না? আমি যত নীরব থাকিব ততই তুমি আমাকে বেশি আপনার ভাবিবে। কেন এমন হয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহার উত্তর দেওয়া যায় না। ইহা দোষের নহে, তুমি ওরকম ভাবিও না।

আমার উপর তোমার দাবি প্রাণ খুলিয়া বাড়াইয়া যাও, আমার উহাতেই সুখ। তুমি আবদার করিবে, অভিমান করিবে, কাঁদিবে, কাজে যাইতে চাহিলে দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে—পকেটে সর্বদা হাত চালাইবে।—না, না, আশা ছাড়িও না। ইতি—

তোমারই মহেশ

০০ দশ ০০

প্রাণের সেক্রেটারি,

পত্রের উত্তর না পাওয়া দুর্ভাগ্য বটে কিন্তু সব সময় নহে। কেন নহে তাহা সুযোগ আসিলে বুঝাইয়া দিব। প্রাণের মণিকা, তুমি ক্রমে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা তোমার নিজের সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তায় পরিণত করিয়াছ ইহাতে আমি ক্রমশই তোমার উপর একটা অমানুষিক আকর্ষণ অনুভব করিতেছি। তোমাদের প্রতিষ্ঠানের খবর না পাইলে যে আমি উৎকণ্ঠিত থাকি তাহা যখন বুঝিতে পারিয়াছ, তখন আমার কোনো চিন্তা নাই, এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু তোমার লেখা মাঝে মাঝে আমাকে নিরাশ করিয়া দেয়। অমিয়ার এবং ললিতার বিবাহ হইয়াছে, সবিতার স্বামী সবিতাকে লইয়া গিয়াছে, স্মারক হিসাবে এ সব লেখা তোমার দিক দিয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু রেবা পলাইয়া গিয়াছে লিখিয়া আমাকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে চাও? ইহার মধ্যে কি কোনো নিষ্ঠুর ইঙ্গিত আছে? খুলিয়া লিখিলে সজাগ থাকিব, এবং তোমার পিছনে গুপ্তচর লাগাইয়া তোমার গতিবিধির উপর নজর রাখিব। তোমার চিঠিতে আরও একটি মর্মান্তিক সত্য কথা লিখিয়াছ, ইহাও আমাকে পীড়িত করিতেছে। তুমি লিখিয়াছ ঃ—

"এবারকার নিখিল-ভারত আচার প্রতিযোগিতায় আমাদের এখানকার আমলকীর আচার প্রথম স্থান পাইয়া রৌপ্যপদক পাইয়াছে।"

ইহার ভিতরে আমি তোমার ভাবী চালচলনের ইঙ্গিত দেখিতে পাইলে কি অন্যায় করা হইবে? আচার পালনে আমাদের দেশের মেয়েরা পৃথিবীর আর সব দেশের মেয়েদিগকে চিরদিনই হার মানাইয়া আসিতেছে, তুমিও কি আমলকীর আচারের ভিতর দিয়া মেয়েদের আচার পালনের ইঙ্গিত করিতেছ? তাহা যদি হয় তাহা হইলে আমার উপর তোমার নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ হইবে।

তুমি যদি এই বয়সে দেবী চৌধুরানী হইবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকো তাহা হইলে আমাকেও সাবধান হইতে হইবে। আমি পাল্‌টা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সাজিয়া বন্দেমাতরম্‌ বলিতে পারিব না। অর্থাৎ তাহা হইলে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মাঝপথ হইতে তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।
তোমার সঙ্গে তুমি যাহা যাহা লিখিয়াছ সবই করিতে ইচ্ছা করে। তুমিও না করিবে কেন? আমার জীবন যে এভাবে কাটিবে না ইহাও নিশ্চিত, কিন্তু তোমার দিকের আকর্ষণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঘরে বসিয়াই তোমাকে টানিয়া তুলিতে ইচ্ছা করি। এখন সুতা ছাড়িতেছি। ইতি—

তোমার মহেশ

০ ০ এগারো ০ ০

সোনার সেক্রেটারি,
তোমার চিঠিতে আমার ভয় কাটিয়া গেল। তুমি যে ক্রমশই অধীর হইয়া উঠিতেছ তাহা অকারণ নয়। তুমি লিখিয়াছ সুকুমারীরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাক না, সবাই একে একে তোমার চোখের সম্মুখ দিয়া সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়া নত চোখে সলাজ মুখে চলিয়া যাক, শিল্পকলা বিতানের ছবি ধীরে ধীরে দৃশ্যপট হইতে মুছিয়া যাক, তারপর তোমাদের শহরটি শ্মশান হইয়া যাক, তারপর ধীরে ধীরে (অতি দ্রুত হইলে আরও ভালো) দেশ জনহীন হউক, পৃথিবী নির্জন হউক, কেবল থাকি তুমি আর আমি। দুই আদিম নরনারী, আদম এবং ঈভ। আমরা নিশ্চিত মনে ঘুরিয়া বেড়াই পথে মাঠে ঘাটে; অরণ্য পর্বতে, গুহায় গহ্বরে। চলিয়া যাই মেরু প্রদেশে, চির বরফের দেশে। শীত সহ্য না হয় ভূমধ্য সাগরে একখানা প্রকাণ্ড ব্যাটল্‌শিপে জীবনটাই কাটাইয়া দিই। তুমি লিখিয়াছ 'আপনিও একা, আমিও একা।'—আমিও তো তাই বলি। এক গুলিখোর ঘড়িতে দুইটা বাজিতে শুনিয়া বলিয়াছিল 'দুইবারই তো একটা বাজল।' সেই গুলিখোর ঠিক কথা বলিয়াছিল, অর্থাৎ আমরাও দুইজনে একা। যে গুলিখোর নহে সে দেখিবে আমরা দুইজনে মিলিয়া একটা অখণ্ড অবিভাজ্য যুগ্ম ঘটনা। লোকের ভয়, সমাজের ভয় আদৌ উঠিতে পারে না, ওটা তোমার কল্পনামাত্র, নরনারীর মিলনে আজ পর্যন্ত কোনো সমাজ আপত্তি করে নাই। তোমার পরবর্তী চিঠি পাইলে বুঝিতে পারিব তুমি আর কতদূর অগ্রসর হইলে। ইতি—

তোমারই প্রাণের মহেশ

○○ বারো ○○

প্রিয়তমাসু,

তুমি যে অনার্স গ্র্যাজুয়েট তাহা এই চিঠিতে প্রথম জানিতে পারিলাম। পূর্ব চিঠি লেখা পর্যন্ত আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি বড়ো-জোর ম্যাট্রিকুলেশন পাস। গ্র্যাজুয়েট জানিলে বিদেশী কবিদের অনেক ভালো ভালো কথা উদ্ধার করা যাইত, গুলিখোরের উপমাটা লিখিতে হইত না। রবার্ট ব্রাউনিং বলিয়াছিলেন:

Each looked on each,

Up in the midst a truth grew without speech.

কিংবা রসেটির আরও ভালো কথা—

Your heart is never away

But ever with mine, for ever

For ever without endeavour.

কিংবা আরও অনেক বলিতে পারিতাম। এখন বলিয়া আর লাভ নাই। কারণ তুমি ম্যাট্রিকুলেট জানিয়াই তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এ বিষয়ে আমার কোনো সংস্কার নাই। শুধু উমা নহেন, সীতা সাবিত্রী মৈত্রেয়ী গার্গী কেহই ম্যাট্রিকুলেট ছিলেন না। সেদিক দিয়া কোনো বাধাই নাই, বরঞ্চ তুমি গ্র্যাজুয়েট বলিয়াই আমার মনে কিছু ভয় ঢুকিল। নগদ টাকা তোমার যাহা আছে তাহা তোমারই থাক, আমি তাহাতে ভাগ বসাইতে চাই না; আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে আমার নিজেরও হাতে সামান্য কিছু কিছু জমিতেছে, তুমি আমার সেক্রেটারি হইলে হয়তো আরও বেশি জমিবে কিন্তু টাকার কথা থাক, তোমার হৃদয় আমার এবং আমার হৃদয় তোমার হইবে—এমন অবস্থায় হয়তো তোমার টাকা এবং আমার টাকাও এক হইতে পারে। উপরের ঐ রসেটির without endeavour কথাটি আমিই আণ্ডার-লাইন করিয়াছি। ঐ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো। বিনা আয়াসে যে একজনের সব কিছু আর একজনের হইতে পারে তাহা শুধু এ যুগের বৈশিষ্ট্য নহে, সব যুগেরই বৈশিষ্ট্য। আমি এতাবৎকাল শুধু ঐ কথাটির উপর ভরসা করিয়াই বসিয়া আছি—এবং আমার বিশ্বাস আমি ঠকি নাই। ইতি—

তোমারই মহেশ

০ ০ তেরো ০ ০

মণিকা লক্ষ্মী,

আমার মন স্থির করাই আছে, এখন তোমার মন শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকিলেই যে বাঁচি। তুমি আর অত লিখিয়া নিজেকে লোভনীয় করিয়া তুলিও না, আমি প্রথম দিন হইতেই ডুবিয়া আছি। তুমি তিলোত্তমা নহ বলিয়া দুঃখ করিও না। ওটা একটা ছলনা মাত্র। তিলোত্তমা বলিয়া এ পৃথিবীতে কেহ ছিল না। অকারণ তিলকে তাল করিও না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া নাই, তোমার দেশে তোমার পারিবারিক সকল তথ্য আমি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে জানিতে পারিয়াছি তুমি বি-এ পাস করিয়াছ বলিয়া তোমার পূর্বতন মফস্বলীয় জমিদার, জোতদার ও প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ জাতীয় প্রার্থীরা আর তোমাকে বিবাহ করিতে সাহস করে নাই। তবু কেহ কেহ আসিয়াছিল, তাহাদের তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তোমার ইচ্ছা গভর্নমেণ্ট চাকুরিয়াকে বিবাহ করা। আই-সি-এস হইলেই তোমার মনের মতো হয়। অগত্যা বি-সি-এস। সেই জন্যই আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। শিল্পবিতানের চাকরি তোমার একটা ছুতা মাত্র, কেননা তুমি যতই বিনয় করো তোমার অবস্থা ভালোই, চাকরি না করিলেও তোমার চলে, তবে চুপচাপ বসিয়া থাকা তোমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠায় তুমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলে। তুমি এটুকু বুঝিয়াছিলে যে আর যাই করো, বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে। তোমার সংকল্প এবং ধৈর্য দেখিয়া আমি দ্বিতীয় দফায় মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি আমারই। ইতি—

তোমারই মহেশ

০ ০ চোদ্দ ০ ০

লক্ষ্মীটি,

সর্বনাশ করিয়াছ, তুমি শুক্রবারে আমার কাছে চলিয়া আসিতেছ? সে দিন যে আমি মফস্বলে যাইব কথা আছে। অগত্যা যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইল। স্টেশনে যাইতে লিখিয়াছ। যাইব না। তীরে ভিড়িবার পর আর নৌকা-ডুবির ভয় করি না। তুমি অসাধ্য সাধন করিয়াছ, স্টেশনে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে না জানি। তোমার তপস্যার সঙ্গতি রাখার জন্যও আমি ঘরে বসিয়া থাকিব। তোমাকে পাইবার পর আমার দিকের কাজ শুরু হইবে। তুমি আমার বাড়িতে আসিয়া তোমার সব কথা বলিবে—সমস্ত শুনিবার পর

আমাকে ধরা দিব। আমার লেখা চিঠিগুলি অবসরমতো একদিন দেখানো যাইবে। কেমন? আর, তোমার রেশন কার্ডখানার কি ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছ? ইতি—

তোমারই মহেশ

০ ০ পনেরো ০ ০

ব্রহ্মময়ী, মা!—সবই তোমার ইচ্ছা!

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—) ॥ রাধারানী
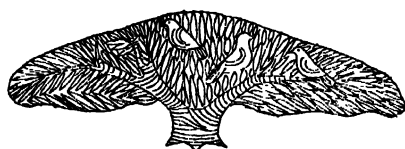
কোথা হইতে আসিয়া পড়িল এক কালীয় দমন—অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রার দল। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অচঞ্চল পল্লী-জীবনের মধ্যে তাহাদের আবির্ভাবটা অনেকটা—কোনো কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বীর সম্মুখে তপস্যাভঙ্গের জন্য প্রেরিত দেবমায়ার মতো হইয়া উঠিল।

দলটা খুব বড়ো নয়, জন ত্রিশ-বত্রিশ লোক—তাহার মধ্যে জন দুয়েক ভারবাহী, একজন চাকর, একজন পাচক, বাকি সাতাশ-আটাশ জন অভিনেতা। দক্ষিণে—ক্রোশ চারেক দূরের একখানা গ্রামে গান করিয়া তাহারা উত্তর মুখে চলিয়াছিল, কোথায় চলিয়াছিল সে কথা তাহারাই জানে। পথে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানা পাইয়া গ্রাম-প্রান্তের একটা প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়াতলে আসর বিছাইয়া বসিল। নিকটেই একটা বড়ো পুকুর। বেলাও তখন দু-প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। একজন রক্তচক্ষু দস্তুর প্রৌঢ় ভারবাহী দুইজনকে ও চাকরটিকে লইয়া স্থানটাকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উনান প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দিল। পাচক ব্রাহ্মণ ভারবাহীদের ভারের বোঝা খুলিয়া বাহির করিতে আরম্ভ করিল—একটা অ্যালুমিনিয়মের ডেকচি, একখানা কড়াই, তারপর একটা টিনের মগ—একটার পর একটা বাজিকরের ঝুলির ভিতরের ছোটখাট নানা টুকিটাকির মতো। বাকি সকলে পুকুরে মুখ-হাত ও হাঁটু পর্যন্ত পথের ধুলা ধুইয়া আসিয়া বটগাছের ছায়াতলে খানকয়েক পুরানো মাদুর ও চট বিছাইয়া গড়াইয়া পড়িল। স্থান সংকুলানের অভাবে জনকয়েক গামছা বিছাইয়া বসিল। দলের মধ্যে গুটিছয়েক ছেলে, তাহারাই শুধু যেন এখনও ক্লান্ত নয়; শীর্ণ শরীর তাহার উপর মুখ শুকাইয়া গেছে,—তবু তাহারা স্থানটা আবিষ্কারের জন্য চঞ্চল ব্যগ্র দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া নূতন কিছু খুঁজিতেছিল। চোখে চোখে ইশারাও চলিতেছে, ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে দুটি ছেলের মধ্যে একটা ঝগড়াও চলিতেছে।

রক্তচক্ষু দস্তুর প্রৌঢ় বলিল, পশুপতি শুয়ে পড়লে যে! ওঠো, একবার তামুক খাও, খেয়ে ভারী দুজনকে নিয়ে একবার বাজারে যাও, জিনিসপত্র যা নাই—তা কিনে দিয়ে এসো, বলি রমণ, তোমার নাসিকা যে গর্জন করছে মাঝে মাঝে! ওঠো, উঠে আলুগুলো কুটে ফেল।...

রক্তচক্ষু প্রৌঢ়ই দলের ম্যানেজার। কংস, আয়ানঘোষ, ভীম বা যে কোনো রাজার ভূমিকায় সে অভিনয় করিয়া থাকে। লোকটার চেহারার মধ্যে একটা উগ্রতা এবং রুক্ষতা আছে, একটা গাম্ভীর্যও আছে—দেখিয়া মনে ভয় হয়।

পশুপতি উঠি উঠি করিয়াও মধ্যে মধ্যে চোখ বুজিতেছিল; ম্যানেজার বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—ওঠো, ওঠো! ওই দেখো মূলগায়েনের গাড়ি এসে গেল!

সত্যই মূলগায়েনের গাড়ি আসিয়া পড়িয়াছিল; একখানা খোলা গাড়ির উপর গোটাচারেক বড়ো বড়ো কাঠের সিন্দুক-জাতীয় বাক্স বোঝাই করিয়া সেই বাক্সের উপর ছাতা মাথায় দিয়া মূলগায়েন বসিয়াছিল,—তাহার সঙ্গে দুটি সুশ্রী ছেলে। মূলগায়েনই দলের অধিকারী এবং পালাগানেও সেই অধিনায়কত্ব করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যে সেই হয় বৃন্দাদূতী, নন্দগোপের গৃহাঙ্গনের দৃশ্যে সেই হয় আবার যশোদা, সে কখনও হয় দাসী, কখনও সখী, কখনও রানী—একই বেশে সে সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে মূল অংশ করিয়া যায়। পালাগানের কঠিন এবং গভীর ভাবাত্মক গানগুলির সেই প্রথমে ধরতা ধরে। লোকটির বয়স যে কত সে বলা কঠিন, তবে ছোটখাট মানুষটি বেশ সুশ্রী—সর্ব অবয়বের মধ্যে একটি কমনীয়তা আছে। তাহার সঙ্গের ছেলে দুইটির একটি সাজে রাধা, অপরটি কৃষ্ণ।

পশুপতি আর বিলম্ব করিল না, সে ভারবাহী দুইজনকে লইয়া গ্রামের বাজারের ঠিকানায় বাহির হইয়া গেল। মূলগায়েন গাড়ি হইতে নামিয়াই প্রসন্নমুখে বলিল, সংসার যে পেতে ফেলেছেন দেখছি ঘোষাল মশায়! সাধে কি আর ব্রাহ্মণকে দেবতা বলেছে—প্রসন্ন দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেইখানেই মা-লক্ষ্মীকে এসে ভাণ্ডার খুলে বসতে হবে।

ম্যানেজার ঘোষাল প্রসন্ন হইতে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সে গম্ভীরভাবে আদেশ করিল, ওরে রাধু, পাত, সতরঞ্চিটা পেতে ফেল, হাত পা ধোবার জল নিয়ে আয়। আর ঠাকুর সরবত তৈরি করো দেখি।

মূলগায়েন বলিল—আপনাদের জল খাওয়া হয়েছে ?
—হ্যাঁ সে পথেই নদীর ঘাটে সেরে নিয়েছে সব।
—তা বেশ! আমার সখী-সখাকেও জল খাইয়েছি পথে। বলিয়া সস্নেহে রাধা ও কৃষ্ণ—ছেলে দুটির দিকে চাহিল! তারপর একটু চিন্তা করিয়া আবার বলিল,—সেও তো অনেকক্ষণ হল ঘোষাল মশায়! আমি বলি কি—সেরখানেক বাতাসা—। ম্যানেজার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান মশায়, ওদিকে আবার সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই লেগেছে! সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কিছু দূরেই সেই ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে বিবদমান ছেলে দুইটা কখন নিঃশব্দে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চিৎকার করিলে ম্যানেজার বা দলের লোক জানিতে পারিবে, যুদ্ধে বাধা দিবে—তাই তাহাদের এ নিঃশব্দ যুদ্ধ।
ম্যানেজার আসিয়া দাঁড়াইতেই ছেলে দুইটা পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া অতৃপ্ত ক্রোধভরে বন্য পশুর মতো শুধু শ্বাসে-প্রশ্বাসে ফুলিতে আরম্ভ করিল। একটা গাছের ডাল ভাঙিয়া ছেলে দুইটার পিঠে সপাসপ ঘা-কতক কষিয়া দিয়া ম্যানেজার ছেলে দুইটাকে দুইটি পৃথক স্থানে বসাইয়া দিল। মূলগায়েন বলিল, হরিদাসকে বাজার পাঠালাম ঘোষাল মশায়, নিয়ে আসুক এক সের বাতাসা, দুখানা করে মুখে দিয়ে একটু জল খাবে সব।
ম্যানেজার বলিল—দেখুন, এতে রেওয়াজ খারাপ হয়, আজ দিলেই কাল বলবে আমাদের বাতাসা দেওয়া হোক, আপনার কাছে তো কেউ যাবে না, জ্বালাবে সব আমাকে! এই দেখো—আজ বাতাসা মূলগায়েন নিজ হতে দিলেন। তা বলে—রোজকার রোজের কোনো সম্বন্ধ নাই এর সঙ্গে।
সেই ছেলে দুইটা ফুলিয়া ফুলিয়া তখনও কাঁদিতেছিল, ম্যানেজার অকস্মাৎ তাহার বড়ো বড়ো দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া কটকট শব্দ করিতে করিতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল,—কদ-লী বন দল-নের জন্য মদমত্ত হস্তীকে আর বারংবার অঙ্কুশাঘাতে জাগ-রিত করতে হবে না। চোপ—বলছি চোপ! কাঁদবি তো ছেলেকে ওই ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ করে খেয়ে নেব আজ! তাহার রক্তবর্ণ চোখের তারা দুইটা বন-বন করিয়া চরকির মতো ঘুরিতেছিল।
ছেলেগুলি এবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, মূলগায়েনও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—বেশ ভালো করে একটা পান দাও তো সখি!
ম্যানেজার বলিল—রাধে, আমার জন্যেও একটা।

রাধার ভূমিকার ফুটফুটে ছেলেটি মূলগায়েনের পানের বাটা লইয়া কিশোরী মেয়ের মতোই পান সাজিতে বসিল।

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া ছেলেগুলাও শান্তভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মূলগায়েন স্নান করিয়া তিলক কাটিয়া নির্জনে জপ করিতে বসিল। ম্যানেজারের বিশ্রাম নাই, সে ঠায় রান্নার কাছে বসিয়া আছে।

—ওহে—জল দাও হে, জল—। ভাত পুড়ে যাবে! অ-ঠাকুর। বলিতে বলিতে সে নিজেই এক ঘটি জল ভাতের হাঁড়িতে ঢালিয়া দিল। জল দিয়া উনানের কাঠগুলি টানিয়া বাহির করিয়া আগুন কমাইয়া দিল; তারপর সে নিজে তেল লইয়া মাখিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরই তাহার হাঁকে-ডাকে নিদ্রাতুর দলটি সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। —চান করে নে সব! এই এই—ওহে শশী—ও শ্যাম ওঠো হে—ওঠো সব। তখন তাহার নিজের স্নান হইয়া গেছে, লম্বা চৈতনের গোছাটা দুইহাতে টানিয়া টানিয়া গ্রন্থি দিতে দিতে সকলকে ম্যানেজার ডাক দিতেছিল।

একজন প্রৌঢ় আড়ামোড়া দিয়া উঠিয়া গান ধরিয়া দিল—'ঘুমিয়েছিলাম বাবুর বাগানে!' লোকটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট, কিন্তু কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা অপেক্ষাও তাহার ভঙ্গিটি আরো চমৎকার। স্বরের কৌশলে এবং ভঙ্গিতে খুব দূর হইতে ডাক শুনিয়া সাড়া দেওয়ার ইঙ্গিতটা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

একজন তেল বিতরণ করিতে বসিল—প্রত্যেকের বরাদ্দ এক পলা, তাহার পর স্নান। স্নানান্তে সকলেই একখানা করিয়া আয়না ও চিরুনি বাহির করিয়া বসিল। প্রসাধন পর্বটাই দীর্ঘ। নানা ছাঁদে টেরিকাটা শেষ করিয়া সব পাতা লইয়া বসিয়া গেল। সেই গায়ক প্রৌঢ়টি বাঁ হাতে খানিকটা মাটি খাল করিয়া তাহার উপর পাতা পাড়িল। পাতা ঢাকা খালটিতে তরল ডাল অধিক পরিমাণে ধরিবে।

আহারের পরই একজন গ্রামে গিয়াছিল। ইহারই মধ্যে কে কখন সন্ধান লইয়াছিল কে জানে, কিন্তু সঠিক সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল। লোকটি রায়েদের বাড়ির ভুলু রায়ের কাছে আসিয়া উঠিল। ভুলু রায়ের বয়স বৎসর চব্বিশেক; বেকার জমিদার-তনয়, আয় বাৎসরিক শতখানেক টাকা। কিন্তু তবুও সে এরণ্ডহীন দেশের মহাপাদপ, কায়া এতটুকু হইলেও ছায়ার ভনিতাটা তাহার বিপুল, লোকে না মানিলেও সে নিজেই মাতব্বর সাজিয়া বসিয়া আছে।

ভুলু প্রথমটা একেবারেই গা-ঝাড়া দিয়া বলিল—ক্ষেপেছ! লোকের ঘরে চাল অভাবে হাঁড়ি চড়ে না, লোকে যাত্রা শুনতে পয়সা দেবে!

লোকটি বলিল—বেশ তো, একবার দেখুন—যদি নাই হয়, তো আর কি করা যাবে!

—তা-দেখো, তোমরা নিজেই চেষ্টা করে দেখো। ওই লক্ষপতি বাঁড়ুজ্যেরা রয়েছেন, ওই গাঁয়ের শেষে আর বাবু রয়েছেন, তারপর—ও পাড়ার তো সবাই বাবু; লম্বা কোঁচা—দেখো চেষ্টা করে।

—দেখুন দেখি, রায়বাড়ির নাম হল বনেদী-বাড়ি! সে বাড়িতে না হলে আমরা চলেই যাব। আর আপনি চেষ্টা করলে কি না হয় বাবু! তবে আপনি না হলে হবে না!

ভুলু প্রসন্ন হইয়া বলিল—কি নেবে আগে শুনি। দক্ষিণে কত?

—সে যা হয় দেবেন; আপনাদের কাছে কি আমাদের কিছু বলা সাজে?

ভুলু হিসাব করিয়া দেখিল, গোটা পনেরো টাকা বেশ উঠিবে; দুই এক টাকা বেশি ওঠাই সম্ভব। সেটাকে সে পকেট খরচ খাতে রাখিয়া দিয়া হিসাব করিল, আসরের খরচ—আলো, পান-তামাক ইত্যাদিতে গোটা তিনেক টাকা লাগিবে; সুতরাং বারো টাকা দিতে পারা যায়। আরও দুইটাকা এদিক ওদিক বাদ দিয়া সে বলিল—এই দেখো, দশটি টাকা—আর খোরাকি এক মন চাল—এই পাবে, পারো যদি তবে দল-বল নিয়ে চলে এসো; এই নটা নাগাদ গান জুড়তে হবে।

লোকটি হতাশ হইয়া বলিল—বাবু আমাদের দলের মাইনেটা দেন! বত্রিশজন লোক—অন্তত ষোলোটা টাকা দেন।

ভুলু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর একটি টাকা মেরে কেটে! তোমাদের আবার কালীয় দমনের দল, ও আর কেউ শুনতেই চায় না। সখের দল হলে বরং লোকে দিত চাঁদা খুশি হয়ে।

লোকটি বলিল—তাই তো! একটু ভাবিয়া লইয়া সে আবার বলিল, আচ্ছা এই দশ মিনিট পরেই আমি এসে খবর দিয়ে যাচ্ছি।

ভুলু রায় ত্বরিত-কর্মা লোক—এবং বিজ্ঞতাও তাহার এই বয়সে যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়াই সে মনে করে। ওই এগারো টাকাই দলটির পক্ষে 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা' এ কথা সে বেশ জানে। সে পাড়ায় বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই

সে আসিয়া উঠিল 'উরু' দাদার বাড়ি। 'উড়োনচণ্ডী' হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া 'উরু'তে পরিণত লোকটির পরিচয় নামেই বিদ্যমান ; সে থিয়েটারে পার্ট করে, স্থাবর অস্থাবর বেচিয়া কলিকাতায় যায়, বেশ গোলগাল চেহারা, মাথায় একটি টাক—সে বলে, ও আমার টাকার টাক নয়, ফাঁকার টাক—সুখটাক নয়, দুখটাক।

—কি করছ উরুদা ?

—এই বসে বসে তামাক খাচ্ছি—আর তক্তা বাজাচ্ছি। বললাম তো-দিগে যে, একখানা বই ধরে রিহারশাল বসিয়ে দে—তা হুঁ। পচে মর গে তোরা!

—সে হবে। এখন একটা যাত্রার দল এসেছে ; কি করি বলো দেখি!

—যাত্রা? তা দে লাগিয়ে দে!

—কিন্তু ষোলো টাকার কম যে কিছুতে ঘাড় পাতছে না। কাঁদাকাটা করছে। বলছে—দলের মাইনেটা পুষিয়ে দেন।

—বেশ, আমি এক টাকা দোব। তুই আর সব দেখ্।

—তা হলে আসরের ভারটা কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে।

—তা সব ঠিক করে দোব। দাঁড়া আলো এখুনি দেখে আসি—কুমারীশ ময়রার আলোটা ঠিক করতে বলে আসি। ওর ডে লাইটটা খুব ভালো।

উরুদা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া রওনা হইল। ভুলুও বাহির হইয়া যাইতেছিল—উরুর স্ত্রী তাহাকে ডাকিল—শোনো-শোনো ও ঠাকুর পো! ভুলু ফিরিলে উরুর স্ত্রী বলিল—এই দেখো, আমি ভাই আলাদা চাঁদা দোব চার আনা, করাও যাত্রা। মেয়ে মহলে সবাই দেবে।

অতঃপর ভুলু গিয়া উঠিল শূলপাণির বাড়ি। বাড়িতে ঢুকিয়াই সে বুঝিল তাহার আসা ভুল হইয়াছে। বাড়িতে তখন তুমুল কলহ। বড়ো বৌয়ের পাঁচ বৎসরের কন্যা সেজ বৌয়ের কোলের মেয়ের দুধ তোলা দেখিয়া ঘৃণায় বমি করিয়া ফেলিয়াছে—সেই হেতু লইয়া কলহ। ভুলু ফিরিতেছিল, শূলপাণির ছোট ভাই নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল—সে ভুলুকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল—ফিরলে যে!

—এসেছিলাম—তা—একটু নীরব থাকিয়া সে বলিয়াই ফেলিল—একদল যাত্রা এসেছে। তাই চাঁদা করে—যদি হয় একরাত্রি, তাই—তা—

—তা বেশ তো, হোক না একরাত্রি—চাঁদা দোব আমরা। বেশ!

বড়ো বৌ মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—'ঘরে ভাত নাই—বাইরে রোশনাই'—

সেই বিত্তান্ত। লোকের তো সিন্দুকে টাকা ধরছে না, তাই চাঁদা করে যাত্রা করবে।

মেজ বৌ বলিল—আমি ভাই আট আনা দোব।

সেজ বৌ বলিল—একটা টাকাই দাও দিদি। আমি তো আট আনা পাব।

—সে ভাই আজ হবে না। এই আট আনাই আমাকে ধার করতে হবে।

সেজ বৌ আজ মেজ বৌয়ের প্রতি প্রসন্নই ছিল—সে বলিল—তাহলে আমিই এক টাকা দিই। তুমি আমাকে এক টাকাই দিয়ো।

বড়ো বৌ ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ভুলু, এই নাও ভাই। সবাই যখন দেবে—তখন আমরাই বা না দিলে হবে কেন? আমার ভাই একটাকার দলে নাম নিকো খাতায়। আর ভাই সকালে সকালে আরম্ভ করিয়ো। হ্যাঁ।

ছোট ভাই বলিল—তবে আমারটাও নিয়ে যা।

ভুলু বলিল—একখানা সতরঞ্চি দিতে হবে কিন্তু আসরের জন্যে।

—বেশ লোক পাঠিয়ে দিস। কিছুক্ষণ পর ছোট ছেলের দল বস্তা ঘাড়ে চাল আদায় করিতে আসিয়া বলিল—চাল দাও গো যাত্রার।

একদল মেয়ে আসিয়া বলিল—বড়ো বৌ চলো যেতে হবে তোমাকে।

আশ্চর্য হইয়া বড়ো বৌ বলিল, কোথায়?

—পদ্মকাকী চাঁদা দেয়নি। কেন দেবে না? চলো যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বৌ উঠিল, বলিয়া গেল,—মেজ বৌ দেখিস তো ভাই, আবার ভাতটা না পুড়ে যায়। চলো।

লোকটি নিবেদন করিল, এগারো টাকা আর এক মন চাল, এর ওপর আর কিছুতেই উঠিল না।

ম্যানেজার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, দলের মাইনেই তো বারো টাকা। এক টাকা কি আমরা গাঁট থেকে দেব না কি?

আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণতার মধ্যে একখানি পূরবী রাগিণী ধরিবার জন্য বেহালাদার বাক্স হইতে বেহালাখানি বাহির করিয়া সুর বাঁধিতেছিল, সে বলিল—বসে থাকলে তো কেউ কিছু পাবে না। বসে থাকি, না ব্যাগার খাটি, কিছু কমই না হয় নেবে সবাই। সিকি বারো আনা করে দেন, বারো সিকি তিন টাকা বাদ দিয়ে ন-টাকা মাইনে—তিন টাকা থাকবে।

ম্যানেজার বলিল—তাহলে তুমিই দেখো ওস্তাদ—বলে কয়ে দেখো সব। আমি মূলগায়েনকে বলে দেখি। ঘুমালো নাকি মূলগায়েন?

মূলগায়েন ঘুমায় নাই—নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়াছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে, এই গ্রামে সে বৎসর বৎসর যাত্রা করিতে আসিত। তাহার গুরু—অধিকারীর দলে সে তখন সাজিত রাধা। মনে পড়িয়া গিয়াছে!

ম্যানেজার আসিয়া ডাকিল—ঘুমলেন না কি গো!

চোখ মেলিয়া মৃদু হাসিয়া মূলগায়েন উত্তর দিল—বলুন!

—এরা যে এগারো টাকার বেশি দিতে চায় না গো!

—তা হলে?

—সেই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। ওস্তাদ বলছে যে বসে থাকার চেয়ে মাইনেও কিছু কম নিক—আপনারও কিছু কম থাক। হয়ে যাক ওতেই।

—বেশ, তাই হোক।

ম্যানেজার চলিয়া গেল। মূলগায়েন আবার চোখ মুদিয়া নিস্তব্ধ হইল। তাহার মনলোকে জাগিয়া উঠিল স্মৃতির ছবি—

ছোট দশ-বারো বৎসরের কমনীয় কান্তি একটি ছেলে—দর্পণে দেখা সে রূপ এখনও তাহার মনে আছে। কেমন করিয়া কোথা হইতে সে যে যাত্রার দলে আসিয়া জুটিয়াছিল, সে জানিতেন পূর্ব অধিকারী। অধিকারীর ঘরেই স্নেহ মমতার মধ্যেই সে বাস করিত, সন্ধ্যায় গান শিখিত—অধিকারী পাখির মতো তাহাকে শিখাইতেন, বৃন্দা প্রশ্ন করিত।—

—বলি—হ্যাঁ গো শ্রীমতী, ব্রজেশ্বরী, ব্রজের রানী তুমি, তোমার চোখে জল কেন গো?

সে সুর করিয়া ঝোঁক দিয়া উত্তর দিত—বৃন্দে গো! পিরীতির রীতি এমন কেন বলতে পারো সখি?

—কেমন সে রীতি বলো দেখি? আমি তো জানি না, বলো তো শুনি।

—পিরীতি এত দুঃখময় কেন সখি?

—দুঃখময়? না-না-না তা কি হয়! পিরীতি তো সুখের সায়র গো!

—না, না সখি—পিরীতি বড়ো দুঃখময়! বলিয়া সে গান ধরিত—'পিরীতি সুখের সায়র দেখিয়া নাইতে নামিনু তায়।'

যাত্রার আসরে মুখে অলকা-তিলকা আঁকিয়া বিচিত্র বেশ পরিয়া সে এমনি

কথাগুলি বলিয়া যাইত। দেশ দেশান্তরের কত বিচিত্র আসর—সামিয়ানা—নাটমন্দির—কত আলো—কত জনসমাবেশ! এই গ্রামের বাঁড়ুজ্যে বাবুদের প্রকাণ্ড নূতন নাট-মন্দিরের সে শোভা—অপরূপ শোভা! তখন তাহার বয়স বারো।

সাজঘরের দুয়ারে গ্রামের ছেলেদের কত উঁকি-ঝুঁকি। তাহার সহিত আলাপ করিতে তাহাদের কত ব্যগ্রতা! মধ্যে মধ্যে ঐ ঘোষালের মতো রক্তচক্ষু উগ্রদর্শন হরিশ ঘোষ তাহাদের তাড়া করিত—এই ধর তো ছেলের পালকে! খাবো! খাবো! ছেলেরা ছুটিয়া পলাইত। আসরে বসিয়া তাহারা পান ছুঁড়িত। সে সেদিকে তাকাইলে দেখিত দাতাও কৃতার্থ হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যাত্রা ভাঙিয়া গেলে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুতে ঘুমাইয়া ঘুম শেষ হয় নাই—সকালে বসিয়া বসিয়া সে সাজঘরের বারান্দায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছিল। কানের মধ্যে তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের রেশ যেন ভাসিয়া আসিতেছিল। বৃন্দা যেন ডাকিল—শ্রীমতী! রাধে! তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। স্বপ্ন নয়, একটি আট-নয় বছরের মেয়ে তাহাকে ডাকিতেছে—শ্রীমতী—রাধে!

—ধ্যাৎ ছেলে! ইয়ার্কি করতে এসেছ?

মেয়েটি ছুটিয়া কিছুদূর পলাইয়া গিয়া দাঁড়াইল—তোমাকে ডাকছে।

—ভাগ! সে আবার চোখ বুজিল।

—শ্রীমতী! তোমাকে আমার মা ডাকছে গো!

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে আবার আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল। মেয়েটি মিনতি করিয়া বলিল—আমার মা সন্দেশ তৈরি করেছে, তোমাকে ডাকছে। এসো!

সন্দেশ! লুব্ধ ছেলেটি এবার না উঠিয়া পারিল না। দলের লোকজন কতক উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনে গিয়াছে, কতক তখনও অসাড় হইয়া নিদ্রামগ্ন। সে উঠিয়া মেয়েটির সঙ্গে চলিল। আঁকা-বাঁকা পল্লীপথ—দুটি চারিটি লোক, কেহ যায়—কেহ আসে।

—ঐ দেখ্ রে, ঐ কাল রাধিকে সেজেছিল! নয় হে ছোকরা?

মেয়েটি ঝংকার দিয়া উঠিল—ঐ, ও যে আমাদের বাড়ি চলল!

—তোমাদের কেউ হয় বুঝি?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বিপন্ন হইয়াও প্রতিবাদের সময় পাইল না। মেয়েটি এবার গতি

দ্রুততর করিল—ত্বরিতগতিতে আরও কয়টা ছোট গলি ঘুরিয়া ঘন বৃক্ষপল্লব বেষ্টিত ছোট একটি আঙিনায় আসিয়া উঠিল। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের সুশ্রী মেয়ে—উজ্জ্বল হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এসো, এসো—গোপাল এসো। তোমার জন্যে আমি বলে আছি।

মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—দূর! গোপাল কেন হবে?—ও যে শ্রীমতী রাধে।

মা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল—পাজী মেয়ে কোথাকার, দেখবি? মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। মা ছেলেটিকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিল—মুখ-হাত ধোয়া হয়নি তো তোমার গোপাল? বলিয়া নিজেই একটু তামাকের গুলগুঁড়া—একটি তালপাতা—এক ঘটি জল নামাইয়া দিল। তারপর প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গোপাল, আমরা বোষ্টম। আমাদের ঘরে একটু জল খাবে তো?

ছেলেটি বলিল—আমিও বোষ্টম।

বোষ্টম! মেয়েটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাই তো বলি. বোষ্টম না হলে কি এমন সুন্দর রাধা হয়! একেবারে সাক্ষাৎ রাধা। তাহলে একটু জল খাও, কেমন?

ঘরের তৈরি ক্ষীরের নাড়ু, বড়ো চমৎকার। কিন্তু আর চাহিতে তাহার লজ্জা হইল। সে তাড়াতাড়ি জল খাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

—হ্যাঁ বাবা একটি গান শোনাবে?

—কি গাইব বলুন!

—ঐ যে শ্যাম শুক পাখি—!

গুন গুন করিয়া ক্রমশ কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া সে গাহিল—শ্যাম শুক পাখি সুন্দর নিরখি—ধরিলাম নয়ন ফাঁদে!

একটা নয়, আরও একটা গান শুনাইয়া সে পান চিবাইতে চিবাইতে বাসায় ফিরিল।

সেই কয়জন অল্পবয়সী বাবু! তাহাদেরও আজ মনে পড়িতেছে! তাহারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—এই ছোকরা শোনো তো!

—কি নাম তোমার?

—আজ্ঞে? সে কেমন ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল।

—তোমার নামটি কি ?
—আমার নাম ? আমার নাম গৌরদাস দাস।
—কোথায় বাড়ি তোমার ?
—আজ্ঞে, আমার মা-বাপ কেউ নেই। আমি অধিকারী মহাশয়ের বাড়িতে থাকি।
—মাইনে-টাইনে দেয় ? না, পেট-ভাতাতেই থাকো ?
সে চুপ করিয়া রহিল। একজন আবার বলিল—দেখো, আমাদের থিয়েটারের দল হয়েছে। আমাদের দলে যদি এসো, তবে আমরা মাইনে দেব। মা-বাপ নেই বলছ—বাড়ি ঘর করে দোব, বুঝেছো!
—আজ্ঞে না। সখের যাত্রা বা থিয়েটার তাহার ভালো লাগে না, সেখানে রাধাকে নাচিতে হয়। এমন করিয়া বৃন্দা সেখানে রাধাকে ভক্তি করে না।
—কেন ?
এবার সে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা আর তাহাকে উত্ত্যক্ত করিল না—হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। বাসায় আসিয়া দেখিল—সেই মেয়েটি দাঁড়াইয়া আছে।
—শ্রীমতী!
এবার সে হাসিয়া ফেলিল। মেয়েটি বলিল—মা ডাকছে।

* * * *

সেই বৎসর হইতে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির রাস-যাত্রায় তাহাদের দলের বায়না বাঁধা হইয়া গেল। বৎসরে বৎসরে সে দলের সঙ্গে আসিত। বিনা আহ্বানেই সে এখন সেই আখড়াতে গিয়া ডাকিত—মা!
কে,—গোপাল—গৌরদাস! এসো বাবা এসো। এই তোমার জন্যেই খাবার করছি। গোপাল ক্ষীরের নাড়ু বড়ো ভালবাসে—না বাবা ?.
সে উত্তর দিবার পূর্বেই কলকণ্ঠে মেয়ে বলিয়া উঠিল—নাড়ু-গোপাল! একবার হামাগুড়ি দিয়ে বসো তো নাড়ু-গোপাল!
—তোকে এইবার এক চড় মারব রাধু! মেয়েটির নাম রাধারানী। নয় হইতে দশ—দশ হইতে এগারো, এগারো হইতে বারো বছরের মেয়েটি এখন অনেক শিখিয়াছে! সে গৌরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।
গৌর বলিল—দেখুন, রাগ দেখুন!
রাধু তাহার অভিনয় ভঙ্গিকে ব্যঙ্গ করিয়া আরম্ভ করিল—না-না সখি—সে মুখ

আর আমি দেখব না গো! কালো-রূপ আর হেরব না। যমুনার জল কালো—যমুনায় আর যাবো না গো! মাথার কেশ কালো—সে কেশ আর রাখব না সখি! নীলাম্বরীর বর্ণ কালো, নীলাম্বরী আর পরব না গো! দাও দাও—আমাকে গৈরিক বাস এনে দাও সখি, আমায় যোগিনী সাজায়ে দাও!

মা তাহার হাসিয়া বলিল—মরণ তোমার! গৌরদাস অমনি করে বলে নাকি? আর গান কত সুন্দর—পারিস তুই?

—ছাই। ও আমি খুব পারি।

বেরো, বেরো বলছি। পালা! মেয়ে সত্য সত্যই পলাইয়া গেল।

মা বলিল—হাঁ বাবা গোপাল—এইবার তো বড়োটি হলে। এইবার একটা ঘর-দোর করো। রাধুর বাপ বলছিল, গৌর যদি বড়ো দলে যায়—অনেক মাইনে হয়! তোমার ভাবনা কি বাবা!

গৌর বলিল—অধিকারী আমাকে ঘর-দোর করে দেবেন, জমি কিনে দেবেন—বলেছেন।

—হ্যাঁ বাবা, আমার রাধুকে বিয়ে করবে? আমার বড়ো সাধ।

গৌর সলজ্জিত মুখে নত দৃষ্টিতে নীরব হইয়া রহিল। রাধারানীর রঙ ফরসা না হউক—এমন দেহভঙ্গি বড়ো দেখা যায় না। একটু দীর্ঘ তন্বী, পিঠে এক পিঠ চুল—চোখের তারা দুইটি অহরহ চঞ্চল—কথা কহিবার সময় যেন নাচে!

গৌরের সলজ্জ নীরবতা দেখিয়া রাধারানীর মা পুলকিত হইয়া উঠিল—মৃদু হাসিয়া সে বলিল—রাধুর বাপের সঙ্গে সেই কথা হয় আমাদের। তারও ভারী ইচ্ছে। বলে কি জানো, বলে গৌরও আমাদের রাধারানী সাজে, রাধুও আমাদের রাধারানী—কেমন মিল হবে বলো দেখি!......তাহলে আজ ওকে পাঠিয়ে দেবো অধিকারী মহাশয়ের কাছে। অধিকারী মশায়ই তো তোমার মা-বাপ সব!

গৌর চুপ করিয়া রহিল, খাইতে বসিয়া সলজ্জ কুণ্ঠায় পূর্বের মতো এবার আর চাহিয়া খাইতে পারিল না। রাধারানীর মা অযাচিত ভাবেই আরও কয়েকটা নাড়ু পাতে দিয়া বলিল—জামাই না হতেই লজ্জা আমার গোপালের।

আসিবার পথে—নির্জন গলির মধ্যে রাধারানীর সঙ্গে দেখা হইল। রাধু তাহাকে দেখিয়া একপাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। গৌর বলিল—মান বুঝি? রাগ হয়েছে?

রাধু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জারক্ত মুখে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল—যাঃ! তারপর দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আমি বুঝি শুনি নাই!

গৌরদাসের সমস্ত অন্তরটা আবেগময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল—কখন রাধারানীর বাপ আসিবে! কোনো কিছু তার ভালো লাগিল না। গ্রামের ছেলেগুলি এখন বন্ধু হইয়া গিয়াছে। তাহারা পান আনে—সিগারেট দেয়। তাহারা আসিয়া আজ ফিরিয়া গেল।

রাধুর বাপ আসিল সন্ধ্যার দিকে। অধিকারীকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভুর কাছে একবার এসেছিলাম আমি।

একখানা ছোট ঘরে অধিকারী, ম্যানেজার—দলের রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া থাকেন। স্বতন্ত্র তাঁর শয্যা ও আসন, ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। তিনি বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—কি বলুন।

গৌরদাস ঘরের পিছন দিকের জানালায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জানালার ছোট একটা ছিদ্র দিয়া সব দেখাও যাইতেছিল।

হাত জোড় করিয়া সহাস্যে রাধুর বাপ আপনার নিবেদন সবিনয়ে ব্যক্ত করিয়া বলিল—এখন আপনার আদেশ না পেলে তো হয় না। আপনিই তো গৌরের সব, রক্ষক বলুন রক্ষক—বাপ বলুন বাপ—সবই আপনি।

অধিকারী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—প্রস্তাব কিছু অন্যায় প্রস্তাব নয়। তবে গৌর এখন ছেলেমানুষ, বালক বললেই হয়। ছেলেটি ধরুন গান করেই খায়। কণ্ঠস্বর আর সঙ্গীতবিদ্যা হল সাধনার বস্তু। সংযম নইলে সাধনা হয় না।

রাধুর বাপ বলিল, আমার কন্যাটিও খুব বড়ো নয়, এই আপনার বছর বারো হবে। আপনি অনুমতি করলে—এক আধ বছর পরেই না হয়—

তাহার কথার মধ্যপথেই অধিকারী বলিলেন, ম্যানেজারবাবু একবার বাইরে যদি যান দয়া করে—তাহলে······দরজাটা একটু বন্ধ করে দিয়ে যাবেন। হ্যাঁ।

তারপর বলিলেন—দেখুন আপনি হলেন বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ, তার ওপর ভগবানের লীলাগান করাই হল আমার ব্যবসা। আমি তো আপনাকে প্রতারণা করতে পারব না। একটা কথা—

কিন্তু, কথাটা না বলিয়াই তিনি নীরব হইলেন। নীরবেই মাটির দিকে চাহিয়া

বসিয়া রহিলেন। রাধুর বাপও নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সে-ই উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিল—প্রভু!

অধিকারী বলিলেন—বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে বাবাজী। এতদিন একথা গোপন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আপনি যে প্রস্তাব করছেন—তাতে আপনার কাছে গোপন রাখা চলে না। দেখুন……একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অধিকারী বলিলেন—ছেলেটি জাতিতে বৈষ্ণব নয়।

—বৈষ্ণব নয়! তবে? রাধুর বাপ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

—সকলে অবশ্য বৈষ্ণব বলেই জানে, ছেলেটিও তাই জানে। আমি বরাবর ঐ পরিচয় দিয়ে এসেছি। অনেক দিন পূর্বে, ছেলেটির বয়স তখন ছয় কি সাত, সেই সময়ে বর্ধমানের পথ থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছিলাম ওর চেহারা আর গান শুনে। সেই বয়সেই—গান গেয়ে ছেলেটি ভিক্ষা করে বেড়াত। আমার দলের জন্য ওকে এনেছিলাম। দোকানীরা বলেছিল, ছেলেটির মা নাকি—অধিকারী নীরব হইলেন।

বাবাজী ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় প্রশ্ন করিল—মা নাকি?

—মানে—কি বলব? এই নাচগান করত, মানে বারাঙ্গনা ছিল।

—বেশ্যা?

—হ্যাঁ। তাই।

পিছনে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া গৌর কেমন অবসন্ন বিবশ হইয়া গেল—সে যেন পঙ্গু হইয়া গেছে।

বাবাজীও স্তব্ধ হইয়া স্তম্ভিতের মতো বসিয়া রহিল। অধিকারী আবার বলিলেন—ছেলেটিকে এনেছিলাম প্রথমে স্বার্থের জন্যেই। কিন্তু এখন বড়োই মায়া হয়ে গেছে। নিজের কাছেই রেখেছি, রাধা-কৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই। সেই পুণ্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভালো করে একটু অধিকার হলেই—আমি ওকে বৈষ্ণব করে দেব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি-কুলের বিচার বড়ো নয়, সে বাধাও নাই। তারপর দেখুন আপনি—

নিতান্ত অবসন্নের মতো বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া রাধুর বাপ জানাইয়া দিল—না না—সে হয় না। আমরা জাত বৈষ্ণব। ভেকধারী নই। তারপর অধিকারীর পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া সে বলিল—আপনি মহৎ লোক, আপনি আমাকে জাতিপাত থেকে রক্ষা করলেন। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল।

গৌরের চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অর্থহীন। মাথার ভিতর যেন অসীম

শূন্যতা নিঃশব্দ প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। বুকের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাসের মতো একটা যন্ত্রণাদায়ক আবেগ নির্দয়ভাবে তাহাকে পীড়িত করিতেছে। মুহুর্মুহু তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল—বারবার মুছিয়া মুছিয়াও সে জল সে শেষ করিতে পারিল না। তাহার মা—! সে—! এবার সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ সে দ্রুতপদে সকলকে এড়াইয়া—নির্জন পথ ধরিয়া গ্রামের বাহিরে আসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিল। সে কান্না তাহার আর ফুরায় না! তাহার মা—! সে—! ছি ছি ছি! রাধু—রাধারানীর কাছে সে অস্পৃশ্য! সহসা এক সময়ে অন্ধকার অনুভব করিয়া সে দাঁড়াইল। নির্জন প্রান্তর—পিছনে অনেক দূরে—উজ্জ্বল আলোগুলির উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত প্রভা অন্ধকার শূন্যলোকে জমাট সাদা কুয়াশার মতো ভাসিতেছে। আশেপাশে সম্মুখে গ্রামের চিহ্নই অনুভব করা যায় না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের অন্ধকার পথেই আগাইয়া চলিল। না—ছি ছি!

কিন্তু রাধু? রাধুও হয়তো কাঁদিতেছে! সে আবার কাঁদিল।

তারপর? কত পথ কত দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া কত বিভিন্ন যাত্রার দলে দলে ফিরিয়া সে নিজের দল গড়িল। নামটা পর্যন্ত সে পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান তাহার বড়ো ভালো লাগে। সখের যাত্রার দল তাহার ভালো লাগে নাই—সেখানে রাধা গান গাহিয়া নাচে! ছিঃ রাধা —অভিমানিনী মর্যাদাময়ী রাজনন্দিনী ব্রজসুন্দরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল বলিয়া সে কি নটীর মতো নাচিবে। কত বড়ো প্রেম—কত বড়ো সে বিরহ —কত দুর্বার সে অভিমান! ওরে আলোর সঙ্গে কি রঙের ভেজাল দেওয়া যায়। রাধা—রাধারানী—রাধু—রাধু! একখানি কিশোরীর মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—সে বলিতেছে—"না না সখি, সে মুখ আর দেখব না গো!...... নীলাম্বরী আর পরব না সখি!—দাও দাও আমায় গৈরিকবাস এনে দাও—যোগিনী সাজায়ে দাও!" তাহার কৌতুকময় কণ্ঠ আজ যেন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে দলের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাজ পোশাক লইয়া দল গ্রামের মধ্যে চলিয়াছে। বেহালাদার শশী বলিল—মূলগায়েনের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাব না কি? কথাটা চুপি চুপি সে ম্যানেজার ঘোষালকে বলিল।

ম্যানেজার বলিল—বোধহয় শুয়ে শুয়েই ইষ্টমন্ত্র জপ করছেন। নাও নাও—সব

গুছিয়ে গাছিয়ে চলো গাঁয়ের ভেতর। এই দেখো—ভদ্দরলোকের গ্রাম—চ্যাংড়ামি যেন কেউ না করে। বুঝলে।

তারপর সে অধিকারীর কাছে আসিয়া সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাভরে ডাকিল—মূলগায়েন! ওঃ আপনার ইষ্ট-স্মরণ হয়ে গেল দেখছি! তা শুয়েই কিরকম হল?

চোখ মুছিয়া মূলগায়েন বলিল—শরীরটা ক্লান্ত ছিল—আর, স্মরণে আপনি উদয় হলে—মানে মনে পড়লে—কি মনে না করে থাকা যায়?

—তাহলে চলুন গ্রামের মধ্যে। এরা সব চলে গেল।

* * * *

ভুলু রায় ও উরুদাদা আসরটা বেশ ভালো করিয়াই সাজাইয়াছিল। চারিদিকে চারিটা ডে লাইটে আসরটা আলোয় আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে। সম্মুখে বসিয়া ছেলের দল, তাহার পিছনে একদিকে ভদ্রলোক—অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর পুরুষেরা বসিয়াছে। পিছনে মেয়েদের আসর।

পালাটা হইতেছিল—দীর্ঘ বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন—প্রভাসযজ্ঞ। বিরহিনী রাধা দ্বারকার পথের সন্ধান করিতেছেন—কোন্ পথে গেলে দ্বারকায় শীঘ্র যাওয়া যায়।

এই সময়—এতক্ষণে মূলগায়েন আসরে প্রবেশ করিল। মাথায় পাটিপাড়া ধরনের পরচুলা, তাহাতে সিঁথি। সিঁথির দুইটি শাখা চুলের রেখায় রেখায় বেড়িয়া কবরী পর্যন্ত বিস্তৃত। কানে কান, নাকে নথ, গলায় চিক ও সাতনর, হাতে কঙ্কন, বাহুতে তাবিজ ও বাজুবন্ধ, পরনে বিচিত্র বেশ, কপালে তিলক-বিন্দুর সারি, নাকে রসকলি আঁকিয়া সাজিয়া দূতীরূপে সে আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। দলের চাকরটি পিছনে পিছনে আসিয়া—পানের বাটা, পরিপাটি ভাঁজ করা একখানি গামছা রাখিয়া দলস্থ একজনকে জিম্মা দিয়া গেল। পরম ভক্তিভরে মূলগায়েন প্রণাম করিয়া বসিয়া আসরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। আলোকিত আসরে সারি সারি মুগ্ধ শ্রোতার মুখ। কিন্তু রাধারানী কোথায়? চারিদিক সে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু কই?

—উঠুন গো আপনি, গান জমেছে ভালো। আপনি উঠলে আসর আগুন হয়ে যাবে! পিছন হইতে ম্যানেজার ঘোষাল মৃদুস্বরে ইঙ্গিত দিল। সে উঠিয়া দীর্ঘ সুর ছাড়িয়া ধরিল একখানি ধ্রুপদাঙ্গের গান। শিক্ষিত সুমিষ্ট কণ্ঠের রাগিণীর আলাপে আসর যেন ভরিয়া উঠিল।

* * *

পরদিন বিদায় লইয়া সে বাসায় ফিরিতেছিল, সঙ্গে ছিল—দলের যে ছেলে রাধা সাজে সেই ছেলেটি।

বিদায়ের কর্তা হইয়া বসিয়াছিল—সেই উরুদাদা। ভুলু ছিল তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ডানদিকে বসিয়া। উরুদাদা বলিল, নাঃ অধিকারী মশায়, মনে করেছিলাম কেষ্টযাত্রা ভালো লাগবে না, তা বেশ লাগল, চমৎকার। যেমন আপনার গলা—তেমনি শিক্ষা। সুন্দর! আর রাধা—যে ছেলেটি—এই যে এইটিই তো! বাঃ খাসা। ওর জন্যে আমরা এই আলাদা আট আনা দিলাম।

মূলগায়েন সবিনয়ে বলিল—আপনারা মহৎ ব্যক্তি। গুণীর গুণ আপনাদের চোখে তো এড়াবে না। নাও রাধে, বাবুদের প্রণাম করো।

বিদায় লইয়া ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সহসা সে চমকিয়া উঠিল—একি—এ কোন্ পথে সে আসিয়াছে? এ তো সেই আখড়ার পথ! হ্যাঁ এই তো! কিন্তু আখড়াটা কই? বোধহয় এইটাই! উঃ—গাছগুলি কত বাড়িয়া উঠিয়াছে! কুঞ্জবন যে বন হইয়া উঠিয়াছে।

—দাঁড়ালেন যে? ছেলেটি তাহার অনুসন্ধানরত বিচিত্র দৃষ্টি দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন না করিয়া পারিল না।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া মূলগায়েন বলিল—জল খাবে?

—না, আমার তো তেষ্টা পায়নি।

তবুও একবার উঁকি মারিয়া সে দেখিল। বনান্তরালে ঘরগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত, কেহ কোথাও নাই!—বনের ছায়ার নিবিড় অন্ধকারে ভালো করিয়া দেখাও যায় না, বনের ঝরা পাতা পচিয়া একটা ভ্যাপসা গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিল। রাধু নাই! দুর্দমনীয় একটা দুঃখের আবেগে বুকটা তাহার ভরিয়া উঠিল। দ্রুতপদে সে সেই চেনা গলিপথটা ধরিয়াই অগ্রসর হইল। কিন্তু চলিতে চলিতে বিব্রত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। নাঃ এ সংকীর্ণ পথে আসা ভালো হয় নাই, ওদিক হইতে একটি স্থূলাঙ্গী বিরল-কেশা স্ত্রীলোক আসিতেছিল। মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মধ্যপথেই এক পাশে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখে রাজ্যের বিরক্তি। মূলগায়েন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সন্তর্পণে সসংকোচে স্থানটা পার হইতে হইতে গৌরদাসের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। এই-খানেই—এইখানেই সেদিন সলজ্জিতা রাধু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আশ্চর্যের কথা—আজও যে স্থূলাঙ্গী সেখানে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেও রাধু। গাছের শিকড়ে শিকড়ে ঘর জীর্ণ হওয়ায় তাহারা স্থানান্তরে আখড়া বাঁধিয়াছে। সে এখন ঘরণী, গৃহিণী, সন্তানের জননী। কাল সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণযাত্রা দেখিয়া তাহার শরীরটা অবসন্ন হইয়া আছে—এবং মনটাও তাহার ভালো নাই। দলের রাধাটিকে দেখিয়া বহুদিন পূর্বের এমনই এক কিশোরকে তাহার মনে পড়িতেছিল। সেও রাধা। কতবার মনে হইয়াছে—এই যেন সেই! তাহাকে মনে করিয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিষণ্ণতা বিরক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিরক্তভাবেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

গৌরদাস পরম সম্ভ্রমভরে রাধুকে অতিক্রম করিয়া গেল, রাধুও অপরিচয়ের সংকোচ লইয়াই অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সম্মুখে শূন্য পথ। পিছনে রাধুর স্মৃতিবিজড়িত ঐ আখড়ার ভগ্নস্তূপ—ঐ গলিপথটা গভীর আকর্ষণে মূলগায়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, বুকে অসহ দুঃখ—রাধু নাই! বারবার তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। ছেলেটির গতির আকর্ষণে চলিবার অভিপ্রায়ে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মূলগায়েন রাধা ছেলেটিকে সম্মুখে আনিয়া বলিল, রাধে তুমি আগে চলো।

রাধারানী! রাধু না থাক, রাধারানী আছে!

* * *

কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণযাত্রার দলটি গ্রামখানি ছাড়িয়া পথে বাহির হইল। গাড়ির উপরে মূলগায়েন ও কৃষ্ণ ছেলেটির পাশে সেই রাধা ছেলেটি। মন্থর গতিতে গাড়িটা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ছেলের দল উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পল্লীর মেয়েরা ঘোমটার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। বুড়োদের মনও আজ কাজে বসিতেছে না। রায়েদের মুলতুবী ঝগড়াটা আজ আবার সকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মেয়ে রাধু ঘাট হইতে ফিরিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বাতের বেদনা যেন চাগাইয়া উঠিতেছে। তাহার উপর কানের পাশে যেন গানের সুর বাজিতেছে। চোখ বন্ধ করিলে ভাসিয়া উঠিতেছে—যাত্রার ছবি। রাধা বলিতেছে—না-না-সখি!

কিন্তু চোখ খুলিলে কই? কোথায়?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—) ॥ রোমান্স
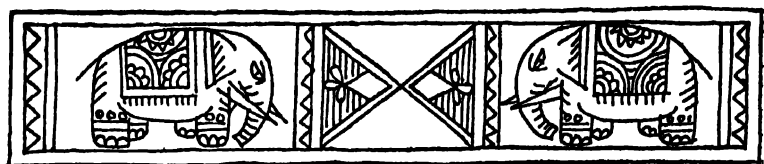
ছোটনাগপুরের যে অখ্যাতনামা স্টেশনে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম তাহার নাম বলিব না। পেশাদার হাওয়া-বদলকারীরা স্থানটির সন্ধান পায় নাই। এখনও সেখানে টাকায় ষোলো সের দুধ এবং দুই আনায় একটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগি পাওয়া যায়।

কিন্তু চাঁদেও কলঙ্ক আছে। কবির ভাষায় বলিতে গেলে 'দোসর জন নহি সঙ্গ'। দিনান্তে মন খুলিয়া দুটা কথা বলিব এমন লোক নাই। পোস্টমাস্টারবাবু আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে এবং মেজাজ অত্যন্ত কড়া। তা ছাড়া স্টেশনের মালবাবুটি আছেন বাঙালী। কিন্তু তিনি রেলের মাল ও বোতলের মালের মধ্যে নিজেকে এমন নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন যে সামাজিক মনুষ্য হিসাবে তাঁহার আর অস্তিত্ব নাই।

দুগ্ধ ও কুক্কুটমাংসের সুলভতা সত্ত্বেও বিলক্ষণ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। দিন এবং রাত্রি কোনো মতে কাটিয়া যাইত, কিন্তু বৈকালবেলাটা সত্যই অচল হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে বানপ্রস্থ অবলম্বনের যে বিধি ঠাকুর কবি দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকিলে আমার আপত্তি নাই, নচেৎ প্রস্তাবটা পুরা-মাত্রায় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। যৌবনকালে অবিবাহিত অবস্থায় একাকী হাওয়া বদলাইতে আসিয়া ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু দু-চার দিন কাটিবার পর সন্ধ্যাযাপন করিবার একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। রেলের স্টেশনটি নিরিবিলি। লম্বা নিচু প্ল্যাটফর্ম এপ্রান্ত ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে—উপরে কোনোও প্রকার ছাউনি নাই। মাঝে মাঝে একটি করিয়া বেঞ্চি পাতা আছে। একদিন বৈকালে নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াই একটা বেঞ্চির উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মিনিট কয়েক পরে স্টেশনে সামান্ত একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তারপরই হু হু শব্দে পশ্চিম হইতে কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া পড়িল। যাত্রীর নামা-ওঠার উত্তেজনা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সারা গাড়িটা যেন মনুষ্য-জাতির বিচিত্র সমাবেশে গুলজার হইয়া আছে। জানালা দিয়া কত প্রকারের স্ত্রী-পুরুষ গলা বাড়াইয়া আছে, কলরব করিতেছে। ফার্স্ট ক্লাসে দু-চারিটি ইঙ্গ-সাহেব-মেম নিজেদের চারিপাশে স্বতন্ত্রতার দুর্ভেদ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। ঘর্মাক্তকলেবর অর্ধ উলঙ্গ এঞ্জিন ড্রাইভারটা যেন এক পক্কড় কুস্তি লড়িয়া ক্ষণেকের জন্য মল্লভূমির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হইল, আমাদের চোখের সামনে লোহার খাঁচায় পোরা একটা ধাবমান মিছিল আসিয়া দাঁড়াইল।

এক মিনিট দাঁড়াইয়া ট্রেন-দৈত্য আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এখানে তাহার কোনোই কাজ ছিল না, শুধু হাঁফ লইবার জন্য একবার দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে একটা নেশা ধরাইয়া দিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্যোগের মতো হঠাৎ আসিয়া হাজির হওয়া, তারপর তেমনই আকস্মিকভাবে উধাও হইয়া যাওয়া—ইহার মধ্যে যেন একটা রোমান্স রহিয়াছে। জীবনের গতানু-গতিক ধারার মধ্যে এমনি বৈচিত্র্য আসিয়া প্রাণকে নাড়া দিয়া সজাগ করিয়া দেয়—ইহাই তো রোমান্স!

স্টেশন আবার খালি হইয়া গিয়াছিল। বেশ একটু প্রফুল্লতা লইয়া উঠি উঠি করিতেছি, ঠং ঠং করিয়া স্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সচকিতে গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, বিপরীত দিক হইতে ট্রেন আসিতেছে। আবার বসিয়া পড়িলাম।

ইনিও মেল। কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইতেছেন। তেমনিই বিচিত্র স্ত্রী-পুরুষের ভিড়। জানালার প্রতি ফ্রেমে চলচ্চিত্রের এক একটি দৃশ্য। তারপর সেই খাঁচায় পোরা দীর্ঘ মিছিল লোহা-লক্কড় বাষ্প ও কয়লার জয়গান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

স্টেশনে খবর লইয়া জানিলাম আজ আর কোনো ট্রেন আসিবে না। শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিলাম।

পরদিন বৈকালে আবার গেলাম। ক্রমে এটা একটা দৈনন্দিন অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইল। এমন হইল যে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দিকে সরিতে আরম্ভ

করিলেই আমার পদযুগলও অনিবার্য টানে স্টেশনের দিকে সঞ্চালিত হইতে থাকে। আধঘণ্টা সেখানে বসিয়া ছুটি ট্রেনের যাতায়াত দেখিয়া তৃপ্ত মনে ফিরিয়া আসি। কোনোও ট্রেন কোনোও দিন একটু বিলম্বে আসিলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি। নিজের উৎকণ্ঠায় নিজেরই হাসি পায়, তবু উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারি না। যেন ইহাদের যথাসময়ে আসা না আসার দায়িত্ব কতকটা আমারই স্কন্ধে।

সেদিনের কথাটা খুব ভালো মনে আছে। ফাল্গুনের মাঝামাঝি—ঝিরঝিরে বাতাস স্টেশনের ধারের ছোট ছোট পলাশগাছের পাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে কয়েক খণ্ড হাল্‌কা মেঘ অস্তমান সূর্য হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছিল। বাতাসের রঙ গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল। কনে-দেখানো আলো, এ আলোর নাকি এমন ইন্দ্রজাল আছে যে চলনসই মেয়েকেও সুন্দর মনে হয়।

স্টেশনে গিয়া বসিয়াছি, মনে এই কনে-দেখানো গোলাপী আলোয় ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। এমন সময় বংশীধ্বনি করিয়া কলিকাতা-যাত্রী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ির যে কামরাটা ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছিল, তাহারই একটা জানালা আমার চোখের দৃষ্টিকে চুম্বকের মতো টানিয়া লইল।

জানালার ফ্রেমে একটি মেয়ের মুখ। কনে-দেখানো আলো সেই মুখখানির উপর পড়িয়াছে বটে কিন্তু না পড়িলেও ক্ষতি ছিল না। এত মিষ্টি মুখ আর কখনও দেখি নাই। চুলগুলি অযত্নে জড়ানো, চোখদুটি স্বপ্ন দেখিতেছে। আমার উপর তার চক্ষু পড়িল, তবু সে আমাকে দেখিতে পাইল না। বাহিরের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যৌবনের অভিনব-স্বপ্নরাজ্যে নূতন প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ঘোর চোখে লাগিয়া আছে। মনের বনচারিণী। অন্তরের কৌমার্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিলারুদ্ধ পথ তটিনীর মতো পথ খুঁজিতেছে কিন্তু শিলা ভাঙিয়া ফেলিবার সাহস এখনও হয় নাই। যৌবনের তটে দাঁড়াইয়া তাহার পা দুটি ন যযৌ ন তস্থৌ।

গাড়ির কিন্তু ন যযৌ ন তস্থৌ নাই। এক মিনিট কখন কাটিয়া গেল। গাড়ি গোলাপী বাতাসের ভিতর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমার দৃষ্টির চুম্বক দিয়া লোহার গাড়িটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। গাড়ি কিন্তু থামিল না।

তারপর কতক্ষণ সেখানে বসিয়া রহিলাম। পশ্চিমগামী গাড়ি আসিয়া চলিয়া

গেল জানিতেও পারিলাম না। চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্কা বাতাস তখনও পলাশপাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে কিন্তু আকাশের কনে-দেখানো আলো আর নাই, কখন মিলাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম! বাঙালীর মেয়ে নিশ্চয়। এত সুকুমার মুখ বাঙালীর মেয়ে ছাড়া হয় না। কিন্তু পশ্চিম হইতে আসিতেছে। তা পশ্চিমে তো কত বাঙালী বাস করে। কোথায় যাইতেছে? হয়তো কলিকাতায়। কিংবা আগেও নামিয়া যাইতে পারে! কোথায়? বর্ধমান? চন্দননগর? বাংলা দেশটা তো এতটুকু নয়। এই বিপুল জনসমুদ্রে একবিন্দু শিশিরের মতো কে কোথায় মিলাইয়া যাইবে!

কুতূহলী জল্পনা চলিতে লাগিল। মন নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইল না। আবার কখনও দেখা হইবে কি? ইংরেজি বচন মনে পড়িল—Ships that pass in the night! না, তা হইতেই পারে না। একবারমাত্র চোখের দেখায় যে মনের উপর এমন দাগ কাটিয়া দিল, সে চিরজীবনের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইবে! আর তাহাকে কখনও দেখিতে পাইব না!

আশ্চর্য! এমন তো কত লোককেই প্রত্যহ দেখিতেছি, কাহারও পানে ফিরিয়া তাকাইবার ইচ্ছাও হয় না—আয়নার প্রতিবিম্বের মতো চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে মনের আড়াল হইয়া যায়। অথচ এই মেয়েটি এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল কি করিয়া?

সে কুমারী—আমার মন বুঝিয়াছে। তাছাড়া সিঁথিতে সিন্দুর, মাথায় আঁচল ছিল না। ঠোঁট দুটিও অনাঘ্রাত কচি কিশলয়ের মতো—

তবে? কে বলিতে পারে? জগতে এমন কত বিচিত্র ব্যাপারই তো ঘটিতেছে। হয়তো আমারই জন্য সে—

মন তাহাকে লইয়া মাধুর্যের হোলিখেলায় মত্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন অভ্যাসমতো আবার স্টেশনে গেলাম। দুটা গাড়িই পর পর বিপরীত মুখে চলিয়া গেল। আজ তাহাদের ভালো করিয়া লক্ষ্যই করিলাম না। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী। বহির্জগৎ যেন ছায়াময় হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মাথার ভিতর দিয়া তড়িৎ খেলিয়া গেল। কে বলিতে পারে হয়তো এই পথে সে ফিরিয়া যাইবে। কোথা হইতে আসিয়াছিল জানি না, কোথায় গিয়াছে তাহাও অজ্ঞাত। তবু এই পথেই ফিরিতে পারে তো!

পরদিন হইতে আবার সতর্কতা ফিরিয়া আসিল। শুধু তাই নয়, এতদিন যাহা ছিল নৈর্ব্যক্তিক কৌতূহল তাহাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইল। পশ্চিমযাত্রী গাড়ি আসিলে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। সময় অল্প তবু সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ঘুরিয়া সব জানালাগুলা অনুসন্ধান করিয়া দেখি। হঠাৎ জানালায় কোনোও মেয়ের মুখ দেখিয়া বুক ধড়াস করিয়া উঠে। তার পরই বুঝিতে পারি এ সে নয়।

মাঝে মাঝে মনে সংশয় উপস্থিত হয়। সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কই ফিরিল না তো! তবে কি অন্য পথে ফিরিয়া গিয়াছে? কিংবা—যদি না ফেরে? হয়তো চিরদিনের জন্য বাংলাদেশে থাকিয়া যাইবে। এমনও তো হইতে পারে, পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিবার পথে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। তবে, আমি যে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা ট্রেন সন্ধান করিতেছি, ইহা তো নিছক পাগলামি।

আবার কখনও কখনও মনের ভিতর হইতে একটা দৃঢ় প্রত্যয় উঠিয়া আসে। দেখা হইবেই। তাহাকে মনের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়াছি যে সে আমার মনের ঘরণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আর চোখে দেখিতে পাইব না, এ হইতেই পারে না।

কল্পনা করি, দেখা হইলে কি করিব। গাড়িতে উঠিয়া বসিব? কিংবা এই বেঞ্চিতে বসিয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিব। সে একটি কথা বলিবে না, গাড়ি হইতে নামিয়া আমার সামনে স্মিতমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। দুজন হাত-ধরাধরি করিয়া স্টেশনের বাহির হইয়া যাইব। পাথুরে কাঁকর-ঢালা পথ দিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিব—এত দেরি করলে কেন?

কিন্তু তাহার দেখা নাই।

তারপর একদিন—

সেদিনের কথাও বেশ মনে আছে।

পশ্চিমগামী মেল আসিয়া দাঁড়াইল। বেঞ্চি হইতে উঠিতে হইল না, ঠিক সামনের জানালায় সে। বারো দিন পরে আবার ফিরিয়া চলিয়াছে।

লাল চেলিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঢাকা, সিঁথিতে অনভ্যস্ত সিন্দুর লেপিয়া গিয়াছে। চোখের চাহনি তেমনই স্বপ্নাতুর। আমার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু এবারও সে আমাকে দেখিতে পাইল না। মনের বনচারিণী। কিন্তু তবু

আজ কোথায় একটা মস্ত তফাত হইয়া গিয়াছে। সেদিন আকাশের কনে-দেখানো আলো যে বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহা তাহার ভিতর হইতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এক মিনিট। গাড়ি চলিয়া গেল। তারপর কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসিয়া রহিলাম। নিজের দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিতে দেখিলাম, ফাগুনের হাল্‌কা বাতাস পলাশপাতার ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলিয়া ফিরিতেছে।

বনফুল (১৮৯৯—) ॥ ব্যতিক্রম

০০ এক ০০

স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জন করিতেছে, অথচ বিবাহ করে নাই, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে।

বহু অর্থবোধক ছোট্ট হাসিটুকুর বিশেষ কোনো তাৎপর্য বোঝা যায় না। পিতা-মাতা হার মানিয়া বহুদিন পূর্বেই স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। এখন জোরজবরদস্তি করিয়া বিবাহ দিবার মতো নিকট আত্মীয় কেহ নাই। হাল্‌কাভাবে চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধবগণও হাল ছাড়িয়াছেন। দুই একজন কন্যার পিতা, কন্যার পিতা বলিয়াই এখনও হতাশ্বাস হন নাই, নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাতেও সুরেনের কৌমার্য ব্রত ভঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইদানীং সে এই জাতীয় পত্রের উত্তর দেওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়াছে। কারণ সোজা 'না' উত্তরেও মিনতিপূর্ণ প্রত্যুত্তর আসে এবং তাহারও উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং ও বিষয়ে সে আর অকারণ সময় এবং অর্থ নষ্ট করিতে রাজী নয়। কয়েকদিন পূর্বে এইরূপ একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাহার এক পরিচিত ব্যক্তির মারফত তাহাকে ধরিয়াছিলেন। মেয়েটি আই-এ পাস, দেখিতে ভালো, গান-বাজনা, আদব-কায়দা, রন্ধনবিদ্যা, গৃহকর্মাদি সর্ববিষয়েই পারঙ্গমা। পরিচিত ব্যক্তি বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন—"এক কথায় তোমারই উপযুক্তা।"

সুরেন তাহার সেই হাসিটি হাসিল।

"হাসছ যে!"

আর একটু হাসিয়া বলিল—"হাসছি আপনার আক্কেল দেখে। যার নিজেরই খেতে কুলোয় না, তার আবার বিয়ে।"

"দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছ, খেতে কুলোয় না কি রকম?"

স্থরেন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"কোনোরকমে কুলিয়ে যাচ্ছে আমার একার। আর একজন তাহার সঙ্গে বহুজনের সম্ভাবনা—কুলোবে না। তা ছাড়া হাল-ফ্যাশানের দুরন্ত মেয়ের—"

কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না, কিন্তু মনের ভিতর ধারণাটা তাহার সম্পূর্ণই আছে। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চ ধারণা নাই তাহার। সে প্রাচীনপন্থী। আজকাল খবরের কাগজের কল্যাণে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আজকালকার মেয়েদেয় সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় না, ভয় হয়। মহাভারত রামায়ণে পুরুষ-দুঃশাসন, পুরুষ-রাবণ ছিল, এখনও তাহারা অবশ্য আছে। কিন্তু স্ত্রী-দুঃশাসন, স্ত্রী-রাবণের আমদানিটা বোধহয় আধুনিক। মাসিক মাত্র দেড়শত টাকা আয় লইয়া ইহাদের সহিত পাল্লা দিবার স্পর্ধা তাহার নাই। এই তো কয়েক দিন আগে সে খবর পাইয়াছে, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি-এ পাস বউ ভ্যানিটি-ব্যাগটি মাত্র সম্বল করিয়া কোথায় উধাও হইয়াছে। কানাঘুষা যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা গৌরবজনক নহে। কোনো এক আর্টিস্টের সঙ্গে নাকি—

সুতরাং ও পিছল পথে সে পা বাড়াইবে না। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে নিজেকে লইয়া। মনের মধ্যে ক্ষুধিত কামনা একটা তপ্ত তীরের মতো বিঁধিয়া আছে, সেটাকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ—

ভাবিয়া কোনো কূল কিনারা মেলে না, এই ভাবেই চলিতেছিল।

০০ দুই ০০

স্থরেন থাকে পশ্চিমের একটি শহরে। শহরের একপ্রান্তে গঙ্গার ধারে তাহার ছোট বাসাটি। বাসায় থাকিবার মধ্যে আছে বৃদ্ধ ভৃত্য হরুক আর একটি বাইক্। হরুক রাত্রে বাড়ি চলিয়া যায়, বাইক্‌টি বারান্দায় ঠেসানো থাকে। দুই বেলা খাইবার সময় পাড়ার একটি অজ্ঞাতশীল কুকুর আসিয়া উঠানে থাবা পাতিয়া উন্মুখ হইয়া বসে। গভীর রাত্রে সঙ্গোপনে একটি বিড়ালও যাতায়াত করে। মাঝে মাঝে দুই-একজন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক অথবা ঐজাতীয় কেহ আসেন। এতদ্ব্যতীত স্থরেনের বাসাটিতে অপর বিশেষ কাহারও গতায়াত নাই। তাহার কারণ, বোধহয়, স্থরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পা গোছের শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি। সাধারণ লোকের সঙ্গে কেমন যেন তাহার মিলে না। অপরিচিত প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায় অনাহূতভাবে গিয়া

দাদা খুড়া মেসো পাতাইয়া হুঁকা হস্তে তাসের আড্ডা গুলজার করিবার মতো স্বভাব তাহার নয়। সে একটু মুখচোরা-স্বভাবের লোক এবং সম্ভবত একটু অহংকারীও।

নিছক ডিগ্রীর জোরেই চাকুরিটি মিলিয়াছে।

০০ তিন ০০

হেমন্তের শুক্লা দ্বাদশী।

অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। আপিস হইতে প্রত্যাগত সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময় একটি গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিয়া সুরেনের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। কারণ গাড়ি হইতে যিনি অবতীর্ণা হইলেন, তিনি একজন তরুণী—রীতিমতো আধুনিকা একজন। হস্তে ভ্যানিটি-ব্যাগ, চোখে চশমা, পায়ে হাই-হীল জুতা। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সহাস্যে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"আপনার নামই বোধহয় সুরেনবাবু?"

প্রতিনমস্কার করিয়া সুরেনকে সত্য কথাই বলিতে হইল।

সুরেনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তরুণীটি হাসিয়া বলিলেন—"আমি হচ্ছি আপনার বন্ধু ললিতবাবুর স্ত্রী।"

স্তম্ভিত সুরেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিবার জন্য তরুণীটি ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া নানাভাবে সেটি দেখিলেন, তাহার পর ভিতর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন—"মুশ্‌কিলে পড়লাম তো, খুচরো নেই, এই নোটটা এখানে ভাঙাবার সুবিধে হবে কোথাও, কাছাকাছি কোনো দোকান-টোকান আছে?"

সুরেন বলিল—"ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি, খুচরো আছে আমার কাছে।"

গাড়োয়ান ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। সুরেনের আহ্বানে বন্ধু ললিতের স্ত্রী সুরেনের বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আহ্বান করিতেই হইল, ভদ্রতা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো! হাজার হোক ললিতের স্ত্রী।

০০ চার ০০

বলা বাহুল্য, এরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সুরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিনা ভূমিকায় হেমন্ত সন্ধ্যার চন্দ্রোদয় লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর

অভ্যাগম, তাও যে-সে স্ত্রী নয়, রীতিমতো রূপসী। সুরেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

তাহার অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া আভা বলিলেন—"আপনাকে বোধহয় বিব্রত করলাম, নয় ?"

"না না বিব্রত কি, কি বলেন !"

একটু হাসিয়া সুরেন অভিভূত ভাবটা সামলাইয়া লইল।

"ওঁর কাছে আপনার অনেক কথা শুনেছি। তাই দেখা করতে এলাম।"

কানের দুল দুইটি চমৎকার, লাল পাথরটায় ইলেকট্রিক আলো পড়িয়া অদ্ভুত দেখাইতেছে। সুরেন তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। হঠাৎ ভদ্রমহিলার প্রশ্নে পুনরায় আত্মস্থ হইল।

"আপনি কতদিন আছেন এখানে ?"

"বেশি দিন নয়, বছর খানেক হবে।"

দুইখানি চেয়ারে বসিয়া দুইজন দুইজনের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন ভাবিতেছিল, উনি কি এখানে থাকিতে চাহিবেন ? যদি চাহেন, তখন সে কি বলিবে ? আভা ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া কথাটা পাড়া যায়, উনি সব শুনিয়াছেন কি ? শুনিয়া থাকিলে কেমন ভাবে শুনিয়াছেন কে জানে।

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর মুখভাব যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া সুরেন বলিল—"এর আগে কখনও দেখিনি আপনাকে আমি। বিয়ের সময়টাতে কিছুতে যেতে পারলাম না, ছুটি পাইনি।"

আসল কথা অবশ্য, ছুটির জন্য সে চেষ্টাও করে নাই। ললিতের 'লভ-ম্যারেজ' শুনিয়াই তাহার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, তাহা ছাড়া পাওনা ছুটি এমন ভাবে নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না, বরং ছুটি জমিলে পুরী বেড়াইয়া আসিবে মনে মনে এই বাসনা ছিল। কিন্তু এসব কথা বলা চলে না। ছুটি পাই নাই বলাটাই শোভন।

আভা বলিলেন—"আপনার কথা শুনেছি কিন্তু অনেক, তাই তো এলাম। মনে হল, এই বিদেশে একমাত্র আপনাকেই বোধহয় বিশ্বাস করতে পারব।"

সুরেন মনে মনে ঘামিতে লাগিল, এই রে, এইবার বুঝি ভদ্রমহিলা থাকিবার প্রস্তাবটা করিয়া বসেন। আজকালকার এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই। ইহারা সব করিতে পারে। স্বামীকেই যখন

স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে, তখন ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে, কয়েক দিন আপনার বাসায় আশ্রয় দিন আমাকে। সুরেনের পক্ষে 'না' বলা মুশ্‌কিল, 'হাঁ' বলা আরও মুশ্‌কিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে বলিল—"কোথা থেকে আসছেন আপনি এখন ?"

"এখন আসছি আমি আমার কোয়ার্টার্স থেকে, এখানকার মেয়েদের ইস্কুলে হেড-মিস্ট্রেস হয়ে এসেছি আমি। কাল জয়েন করেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই মনে হল, যাই, আলাপটা করে আসি।"—বলিয়া আভা দেবী অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এই নিশ্চিন্তকর শুভসংবাদ শুনিয়া সুরেনের যেরূপ পুলকিত হইয়া উঠা উচিত ছিল, আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ততটা পুলকিত সে হইল না। বরং এই সমস্যাসংকুল অবস্থাটার এমন একটা নিরামিষ গোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষই হইয়া পড়িল। হয়তো তাহার মুখচ্ছবিতে সে ভাবটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

আভা দেবী বলিলেন—"সত্যি অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ-হয়, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি ?"

"না না, বিরক্ত আবার কিসের !"

এইরূপ ভাসা-ভাসা আলোচনা খানিকক্ষণ চলিল।

তাহার পর আভা দেবী বলিলেন—"আজ এইবার উঠি। আবার আসব এখন মাঝে মাঝে।"

হরুরু গাড়ি ডাকিয়া দিল, আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

সুরেন রীতিমতো বিস্মিত হইয়া গেল। যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে তেমন কিছু সাংঘাতিক বলিয়া তো মনে হইল না, ভালোই লাগিল বরং। বেশ তো সহজ সুন্দর ভদ্র কথাবার্তা, অথচ ইনিই ললিতের মতো স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিশ্চয়ই কোনোরকম কিছু—

সমস্ত সন্ধ্যাটা সুরেনের মাথায় অন্য কোনো চিন্তাই আসিল না।

০০ পাঁচ ০০

কয়েক দিন পরে আবার একদিন বৈকালে আভা দেবী আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়া নিজেই বলিলেন—"মুখ ফুটেই চাইব আজ, চা হুকুম করুন। সেদিন

আপনি যেরকম মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন তাতে চায়ের কথা বলতে আর ভরসা পেলুম না।"

আভা দেবী সহাস্যমুখে একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। সুরেন তাড়াতাড়ি চা আনিতে বলিল।

"খাবার-টাবার আনতে বলব কিছু? আমার এখানে মুখ ফুটেই বলতে হবে সব, কারণ বুঝতেই পারছেন, আমি ব্যাচিলর মানুষ, আমার ভরসা ঐ বুড়ো হরুক।"

"না, খাবার চাই না। ভালো এক কাপ চা হলেই চলবে। আপনার হরুক ভালো চা করতে পারে তো?"

সুরেন স্মিতমুখে বলিল—"হরুক আমার কাছে আসার পূর্বে আর কখনও চা করেনি। আমিই ওকে সম্প্রতি চা-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছি। সেজন্যে জোর গলায় কিছু বলতে পারছি না।"

"তাহলে ওকে জলটা গরম করে সব জিনিসপত্র এখানেই দিয়ে যেতে বলুন, নিজেরাই করে নেওয়া যাক।"

সুরেন সেইরূপই হুকুম করিল।

"চাটুকু মনমতো না হলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না, যাই বলুন আপনি।"

সুরেন একটু হাসিল।

যথাসময়ে চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া হরুক সামনের টেবিলটায় সাজাইয়া দিয়া গেল। আভা দেবী স্বচ্ছন্দ-নিপুণতার সহিত চা প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিলেন ও পান করিলেন।

"কেমন হয়েছে চা?"

"সুন্দর।"

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করিবার পর আভা দেবী হাতঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন—

"এইবার উঠতে হবে আমাকে, সেক্রেটারিবাবুর আসার কথা আছে আমার বাসায়।"

"কে আপনাদের সেক্রেটারি?"

"খালি ঘরের কোণে বসে পড়াশোনা করা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো খবরই রাখেন না বুঝি আপনি?"

"আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারি কে, এইটাই কি একটা রাখবার মতো খবর বলতে চান?"

"আপনার পক্ষে না হতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ঐটেই এখন সবচেয়ে বড়ো খবর।"

"কে বলুন তো সেক্রেটারি আপনাদের ?"

"মুরারিমোহন পুরকায়স্থ, উকিল একজন। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। আমার যাতে কোনো রকম অসুবিধে না হয়, তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। উঠি আমি, তাঁর আসবার কথা আছে এখন।"

আভা দেবী চলিয়া গেলেন। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আজও অনুক্ত রহিয়া গেল। এবং যাহা শুনিবার জন্য সুরেন মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। উভয়েই ললিতের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে সমুৎসুক। কিন্তু—। 'কিন্তু'তেই বাধিতেছে। সুরেন একবার ভাবিল, ললিতকে একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, সেটা ঠিক হইবে না। তাহার স্ত্রী এই শহরে আসিয়া চাকুরি করিতেছে, এবং আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি শুনিলে ললিত হয়তো অত্যন্ত মর্মাহত হইবে। দরকার কি, অনর্থক তাহাকে খবর দিয়া! কিন্তু এই পুরকায়স্থ লোকটা কে ?

০০ ছয় ০০

আরও মাসখানেক কাটিয়াছে। ললিতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। আভা দেবীর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সুরেনের কাছে আভা দেবীই এখন মুখ্য, ললিত গৌণ। আভা দেবীর সংস্পর্শে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে তাহার মতামতের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয় না, মতামত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে এখন ভাবে, আভা দেবী যদি শিক্ষিতা মহিলার নমুনা হন, তাহা হইলে সমাজের শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, আনন্দিত হইবারই কথা। সুরেনের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, ললিতঘটিত ব্যাপারটার নিগূঢ় একটা কোনো রহস্য আছে। মোট কথা, আভা দেবীকে তাহার ভালো লাগিয়া গিয়াছে, এবং ভালো লাগার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সে নিজেরই সঙ্গে নানারূপ জটিল তর্ক করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়াছে—

যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম। আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়। আজকাল সন্ধ্যার সময় সে আর বেড়াইতে বাহির হয় না, বাড়িতেই থাকে। আভা অবশ্য রোজ আসেন না। কিন্তু যদি কোনোদিন

আসিয়া ফিরিয়া যান, সেটা বড়ো অন্যায় হইবে। ইহাই বর্তমানে সুরেনের মনোভাব। আপনারা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হইয়াছে সুরেন নিজে।

০০ সাত ০০

মাস দুই পরে।

উপর্যুপরি তিনটি সন্ধ্যা বৃথা গিয়াছে। আভা দেবী আসেন নাই। চতুর্থ সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকুল অন্তঃকরণে সুরেন বসিয়া আছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া সুরেন দেখিল, আভা দেবী নয়, বকের মতো পা ফেলিয়া ফেলিয়া মুরারিমোহন পুরকায়স্থ আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন।

"আসতে পারি কি?"

"আসুন।"

পুরকায়স্থ মহাশয় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

"ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি। আভা দেবীর মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনতে পাই। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ করেই আসা যাক, মানে—চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন আর কি!"—গলা খাঁকারি দিয়া পুরকায়স্থ মহাশয় একটু হাসিলেন, চেয়ারটা আর একটু কাছে সরাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় বলিলেন—"মানে, শুনেছি আপনি ওঁর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। কিন্তু পুরকায়স্থ মহাশয় কাজের মানুষ, কাজের কথাটা পাড়িতে অযথা বিলম্ব করিলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন—"ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো। যা শুনছি, তাতে তো, মানে—"

"আমার মনে হয়, ওসব মিছে কথা।"

যেন মস্তবড়ো একটা ভুল ধারণা সংশোধিত হইয়া গেল, এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া পুরকায়স্থ বলিলেন—"তাই নয়?"

তাহার পর একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন—"গুজবের কথা আর বলবেন না, আপনার মতো নিরীহ লোকের নামও ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে কত কথাই না রটেছে শহরে!"

"তাই নাকি ?"

"আর বলেন কেন ! অতি পাজা জায়গা এ।"

সুরেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। পুরকায়স্থ মহাশয় বলিলেন—"আজ তবে উঠি, ঘোষপাড়ায় যেতে হবে একবার। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবেন না মশাই, নিজে নিজে ঠিক থাকলেই হল। কোন্ ব্যাটার তোয়াক্কা করেন আপনি ! আচ্ছা চলি তবে আজ।"

বকের মতো পা ফেলিয়া পুরকায়স্থ চলিয়া গেলেন।

আভা দেবী কেন আসিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেন বিমূঢ়ের মতো বসিয়া রহিল। শহরে গুজব রটিয়া গিয়াছে।

oo আট oo

তাহার পরদিন বৈকালে একটা স্টেশনারি দোকানে গিয়া অনেক নির্বাচন করিয়া সুরেন চিঠি লিখিবার প্যাড ও খাম কিনিল। দাম একটু বেশি দিতে হইল। এত দামী প্যাড ও খাম সে জীবনে এই প্রথম কিনিল এবং কিনিয়া আনন্দও পাইল। বাসায় ফিরিয়া ঘরে খিল দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথম দুই-তিনখানা কাগজ নষ্ট হইল, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইল, কিছুতেই ঠিক যেন মনমতো হইতেছে না। শেষে অনেক ভাবিয়া, অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া সে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল। খামের উপর ঠিকানা লিখিতে যাইবে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ। সেই পরিচিত পদশব্দ। তাড়াতাড়ি চিঠিটা প্যাডের তলায় চাপা দিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিল।

আভা দেবী আসিয়াছেন।

"কি করছেন ঘরের ভেতর একা একা ?"

সুরেনের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"হল কি আপনার ? অসুখ করেনি তো কিছু ?"

"না।"

"চলুন, ভেতরে বসা যাক একটু। সময় নেই বেশি হাতে।"

সুরেন একটু অনুযোগের সুরে বলিল—"অনেক দিন পরে এলেন !"

"হ্যাঁ, সময়ই হয়ে ওঠে না। আজ চলে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

"চলে যাচ্ছেন!"

"হ্যাঁ, চাকরি করা পোষাল না।"

"পোষাল না মানে?"

"মুরারিবাবুর জন্তে। তিনি সেক্রেটারির কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, রোজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল। যাক, সে কথা অবান্তর। যে কথাটা বলতে এসেছি, বলে যাই। অনেক দিনই বলব বলব মনে করেছি, হয়ে ওঠেনি। আপনি বোধহয় শুনেছেন, আপনার বন্ধুকে ত্যাগ করে আমি চলে এসেছিলাম। কথাটা মিথ্যে নয়, ত্যাগ করেই এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, সেই কথাটাই আপনাকে আজ বলব। আপনাকে বলে যেতে চাই এই জন্তে যে, আপনি আমার স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আপনি আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করবেন, এটা আমি চাই না।"

স্থরেন নির্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

"আপনার বন্ধু লেখাপড়া জানা স্বাধীন মনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি ঠিক তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ছিলাম কিনা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, আমাকে তাঁর ভালো লেগেছিল, আমারও তাঁকে ভালো লেগেছিল। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সাধারণত যেমন গল্পে পড়া যায়, আমার বেলায় সত্যি সত্যি তাই হয়ে গেল। আর্টিস্ট বন্ধু আর্টিস্টিক কায়দায় আমাকে একদিন একখানি চিঠি লিখে বসলেন। চিঠিটা পেয়ে ভাবলাম, স্বামীকে তাঁর বন্ধুর কীর্তিটা একবার দেখাই, তখুনি আবার মনে হল, কি দরকার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়ে! ওরকম ধরনের চিঠি জীবনে তো অনেকই পেয়েছি, কখনও হৈ চৈ করিনি। এসব নিয়ে হৈ-চৈ করতে কেমন যেন সংকোচ হয়। চুপ করে থাকাই ভালো। স্বামীকে কিছু না বলে চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। সেই হল কাল। পুড়িয়ে ফেললেই চুকে যেত। হঠাৎ সেই চিঠি একদিন আমার স্বামীর হাতে পড়ে গেল, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি, তুমুল কাণ্ড। আপনার বন্ধুর যে মূর্তি সেদিন আমি দেখেছিলাম, তা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলব না। সামান্ত একখানি চিঠি, তার ইতিবৃত্ত

কিছুই না জেনে তিনি এ রকম ভাষায় আমাকে গাল দিলেন যে, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে চলে এলাম। আসবার সময়ে বলে এলাম, লেখাপড়া জানা রূপসী মেয়ে বিয়ে করবার উপযুক্ত তুমি নও। কোনো খুকীকে বিয়ে করে হারেমে পুরে রাখা উচিত ছিল তোমার।"

এই পর্যন্ত বলিয়া আভা চুপ করিলেন।

"তারপর?"

"আজ ওঁর চিঠি পেয়েছি, উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠি লিখেছেন ফিরে যেতে। আমিও কিছুদিন চাকরি করে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোনো সত্য আশ্রয় নেই। যেখানেই যাই, নানা ছুতোয় এক ঝাঁক পুরুষ পেছু নেবে। জীবনে কত রকমারী ধরনেরই যে চিঠি পেয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানে মুরারিবাবু তো আছেনই, আরও আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, নাম আর করব না।" আভা দেবী চুপ করিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—"আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি, আপনিই একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেননি। সত্যি বলছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে এবং এত কথা আপনাকে বললাম এর জন্যেই। আপনার বন্ধু যা বলতেন, ঠিকই দেখছি, স্ট্রিক্ট্‌লি পিউরিটান আপনি। এবার কিন্তু বিয়ে করুন একটা। বলুন তো সম্বন্ধ করি।"

সুরেন বিবর্ণমুখে একটু হাসিবার ভান করিল।

আভা হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"ওমা, ট্রেনের আর বেশি সময় নেই তো! চললাম, নমস্কার। মনে রাখবেন।"

চলিয়া গেলেন। সুরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১—) ॥ বদলি মঞ্জুর

ছোট একটি ব্র্যাঞ্চ লাইন। এক জংশন স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আর এক জংশন স্টেশনে গিয়া মিশিয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোট ছোট স্টেশন।

তা লাইনের সব কয়টি স্টেশনই দেখিতে প্রায় এক রকম।

পয়েন্টিং করা লাল ইটের তৈরি ছোট্ট একখানি ঘর, সুমুখে একটুখানি ঢাকা বারান্দা, বারান্দার এক পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, তাহার পাশেই ওজন করিবার লোহার যন্ত্র, জানালার গায়ে টিকিট কিনিবার ঘুলঘুলি।

ভিতরে একটি টেবিলের উপর টেলিগ্রাফের যন্ত্র সাজানো। যিনি টেলিগ্রাফ করেন, তাঁহাকেই টিকিট দিতে হয়, তিনিই স্টেশন মাস্টার—তিনিই সব। অ্যাসিস্ট্যান্টের বালাই এ লাইনে নাই। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলিতে একজন খালাসী। স্টেশনেও কাজ করে, আবার মাস্টারের বাড়ির কাজও করিয়া দেয়। মাস্টারের চাকর রাখার খরচটা অন্তত বাঁচে।

মন্দ নয়।

স্টেশন মাস্টার এইচ পি ব্যানার্জী। আসল নাম হরিপদ। মাহিনা বাহাত্তর টাকা। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলে। স্টেশনের কাছেই ঠিক তেমনি পয়েন্টিং করা ইটের তৈরি দুখানি ঘরের একটি কোয়ার্টার—হরিপদ মাস্টারের সংসার। সংসার বলিতে একমাত্র তাহার স্ত্রী বীণাপাণি। ছেলেপুলে নাই, একা মানুষ—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট।

বীণার কাজকর্ম একরকম নাই বলিলেই হয়। ইঁদারা হইতে রামধনিয়া খালাসী জল আনিয়া দেয়, তাহার স্ত্রী লছমির কল্যাণে ঘর ঝাঁট দিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না—শুধু দু-বেলা দুটি রান্না।

আছে একরকম ভালোই, কষ্টের মধ্যে শুধু সে নিঃসঙ্গ, একাকিনী। এখানে

আসিবার পূর্বে বীণা ছিল এক পল্লীগ্রামে—তাহার মামার বাড়িতে। সেখান হইতে আসিয়া অবধি কোথাও যাওয়া তাহার আর একটিবারের জন্যও ঘটিয়া ওঠে নাই। মনে হয়, এই আট বৎসর ধরিয়া সে যেন এই ছোট্ট খাঁচাটির মধ্যে বন্দিনী হইয়া আছে। আশেপাশে এমন কেহ নাই যে, ডাকিয়া দুটা কথা কয়। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে শুধু ঐ খাঁচার মতো ছোট ঘরখানি এত অপরিসর যে, দু-দণ্ড নড়িয়া চড়িয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইবারও উপায় নাই—এক লছমির সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা কথা কহিতে তাহার ভালোও লাগে না।

হরিপদ খাইবার সময়ে বাসায় আসে। স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া খাইতে বসিলে পাখা হাতে লইয়া বীণা তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলে, 'হ্যাঁ গা, আর কতদিন? এখান থেকে তোমার বদলি কি আর হবে না ছাই?'

হরিপদর সেই এক জবাব।

বলে, 'কই আর হয়!'

বলে, 'কেন জায়গাটা তেমন মন্দ তো নয়। সব জিনিসই সস্তা। তরি-তরকারি তো একরকম কিনতেই হয় না, তাছাড়া কাল থেকে আধ সের করে দুধের বন্দোবস্ত করেছি, খাঁটি দুধ—একেবারে বিনি পয়সায়।'

বলিয়া একটুখানি গর্বের হাসি হাসিয়া হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকায়। ভাবে হয়তো বীণা তাহার এই বুদ্ধিমত্তার তারিফ করিবে। কিন্তু তারিফ করা দূরে থাক, হাতের পাখা তখন তাহার অত্যন্ত মৃদু গতিতে চলিতে থাকে, হেঁট মুখে বুকের আঁচলের পাড়টা সে বাঁ হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, মনে হয়, কথাটায় যেন সে কানই দেয় নাই।

হরিপদ কিন্তু না শুনাইয়া তৃপ্তি পায় না, বলে 'ঐখানে ঐ জানালায় দাঁড়ালে বাইরে দক্ষিণদিকে উ-ই যে ঐ গাছপালায় ঢাকা গাঁ-টা দেখা যায়, ঐ গাঁ থেকে চাষাদের আর গয়লাদের ছেলেগুলো সব লাইনের ধারে গোরু চরাতে আসে। কচি কচি অমন ঘাস তো আর কোথাও পাবে না। রামধনিয়াকে দিয়ে গোরুগুলো কাল আটক করেছিলাম। বললাম, খবরদার বেটারা ঐ একটা গোরু কি বাছুর কোনোদিন যদি লাইনের ওপর কাটা পড়ে তো হাজার টাকা জরিমানা—একেবারে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারা তো কেঁদেই অস্থির। বলে, গাঁয়ে আর কারও বাড়ি এক আঁটি খড় নাই হুজুর, গোরু চরাবার 'বাথান' নাই, ছেড়ে দিলেই পেটের জ্বালায় হাঁ-হাঁ করে, লোকের ফসলে গিয়ে

মুখ দেয়, এই লাইনের ধার ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই হুজুর। বললাম, আমি যে চরাবার হুকুম তোদের দেব, তাতে আমার লাভ? রামধনিয়া এক সের বলেছিল, কিন্তু এক সের আর হল না, শেষে আধ সের করে খাঁটি দুধ, ঠিক হল যে, ওরা নিজেরাই এসে কাল থেকে পৌছে দেবে।'

বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলে, 'কেমন ভালো হয়নি?' হাসিয়া একবার ঘাড় নাড়িয়া বীণা নীরবে সে কথার জবাব দেয়। কিন্তু অমন বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া করিয়া খাইতে গেলে তো হরিপদর চলে না।

রামধনিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বলে, 'বাবু টেলিগিরাপ'.. ব্যাস! সেদিনের মতো হরিপদর খাওয়া ঐখানেই শেষ।

হাতে জল ঢালিয়া দিয়া পান আনিয়া যে বীণা তাহার হাতে দিবে তাহারও অবসর নাই।

'পান ঐ রামধনিয়ার হাতে দিও।' বলিয়া হন্তদন্ত হইয়া হরিপদ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

আবার কখন ফিরিবে কে জানে!

বীণা তাহার জানালার কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন হুশ হুশ করিয়া স্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায়। কোনোটা বা এই দিক দিয়া, কোনোটা বা ঐদিক দিয়া। কিন্তু যেদিক দিয়াই হোক, তাহার এই জানালাটির পাশ দিয়া সকলকেই পার হইতে হয়। এই ট্রেনে চড়িয়াই সেই যে আট বৎসর আগে সে এইখানে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর কোনো দিনই তাহাকে ট্রেনে চড়িতে হয় নাই। ট্রেন দেখিতে তাহার বড়ো ভালো লাগে। জানালার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া ট্রেনের যাত্রীরা তাহারই দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যায়। বীণার দুটি ব্যথিত ম্লান ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষু পরম ঔৎসুক্যভরে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। কোনোদিন হয়তো বা একটি মুখের চেহারা সে সারাদিন মনে করিয়া রাখে, আবার কোনোদিন বা সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, মনে করিয়া রাখিবার মতো একখানি মুখও তাহার নজরে পড়ে না।

ট্রেন চলিয়া যায়। বীণা দেখে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর, এদিকে ধানের মাঠ, ওদিকে ঐ মাঠের মাঝখানে গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একখানি গ্রাম—দূরে—বহু দূরে, মাঠ প্রান্তর পার লইয়া গিয়া অস্পষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মাথার উপরে নীল আকাশ যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া

আসে, বীণার চোখের সুমুখে তাহার ঐ সংকীর্ণ সংকুচিত খণ্ড পৃথিবীটার রঙ বদলায়।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রতাপে দেখে চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে, মাঠের মাটি ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেছে, দূরে শুধু শুষ্ক প্রান্তরের মাঝখানে পত্রহীন কয়েকটি পলাশের গাছে রক্তরাঙা পুষ্পের সমারোহ। বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর কালো মেঘ দেখা যায়, মাঠের ধূলা উড়াইয়া ঘূর্ণিবায়ু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহার পর কোনোদিন বা বৃষ্টি নামে, কোনোদিন বা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে শুরু করে।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসে। দিবারাত্রি ঝন ঝন করিয়া বৃষ্টি পড়ে। নিদাঘ-তপ্ত তৃষিত ধরিত্রী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বীণা তাহার সেই ছোট্ট জানালার পাশে তখনও বসিয়া থাকে—দেখে বহু দূর হইতে বৃষ্টির ধারা ঝম-ঝম করিয়া তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, চোখে মুখে তাহার বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগে, তবু সে কোথাও উঠিয়া যায় না। তাহারও তৃষিত আত্মা যেন অজান্তে বর্ষণ কামনা করে, এদিকের দরজার ফাঁকে ঘন ঘন স্টেশনের দিকে তাকায়, স্বামী তাহার কাজ করিতেছে, কখন যে আসিবে তাহার কোনোও স্থিরতা নাই। মাঠ-ঘাট সব জলে ভরিয়া যায়, দুপুরে দূরের গ্রাম হইতে জালি কাঁধে লইয়া লাইনের ধারে ডোবায় বাগ্‌দীর মেয়েরা মাছ ধরিতে আসে, ধানের মাঠে চাষীদের নিড়ান চলে, সূর্যাস্ত হইতে না হইতেই কড় কড় করিয়া ব্যাঙের ডাক শুরু হয়।

তাহার পর শরতের নির্মল আকাশে চাঁদ ওঠে। জ্যোৎস্নার আলোয় সবুজ ধানের মাঠের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যায়। রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ যেন বীণার দেহে আসিয়া লাগে।

দেখিতে দেখিতে সবুজ ধানের মাঠ হলুদ হইয়া ওঠে। উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বয়। বীণা তখনও তাহার সেই ক্ষুদ্র বাতায়ন পার্শ্বের নির্দিষ্ট স্থানটি পরিত্যাগ করে না, গায়ে কাপড় জড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে, চাষীরা ধান কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া কাটা ধানের আঁটি লইয়া তাহারা গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

তাহার পরেই বসন্ত। সৃষ্টিছাড়া এই প্রান্তরের মাঝখানে তাহাদের ঐ ছোট্ট ঘরখানির ততোধিক ছোট জানালার পথেও বসন্তের হাওয়া অনধিকার প্রবেশ করে। অপরিসর উঠানের এক পাশে বীণা তাহার নিজের হাতে

বেলফুলের যে গাছটি পুঁতিয়াছে, তাহারও শুষ্ক শাখায় সাদা সাদা কয়েকটি কুঁড়ি ধরে।

এমনি করিয়া বছর কাটিয়া যায়।

জানালার বাহিরে প্রতিদিনই সেই একই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বীণার জীবন যেন এইবার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

সকালের ট্রেনটা পার করিয়া দিয়া হরিপদ যখন বাসায় আসে, বীণা তখন রান্না করে। তাও সে রান্না করিতে করিতে উঠিয়া একবার স্বামীর কাছে আসিয়া বসে। হাসিয়া বলে, 'হ্যাঁ গা, তুমি বদলির দরখাস্ত করছো, না আমায় মিছে কথা বলে ভুলিয়ে রাখছো?'

হরিপদ তাহার জুতায় কালি ঘষিতে ঘষিতে মুখ তুলিয়া বলে, 'কেন গো, বদলি বদলি করে যে আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে দেখছি।'

বীণা রাগ করিতে জানে না। মৃদু হাসিয়া আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ আর সে তাহাকে ক্ষেপাইবে না। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া এটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে ভাবে, রেল কোম্পানির মতো নিষ্ঠুর কোম্পানি আর পৃথিবীতে কেহ নাই, স্বামী তাহার খাটিয়া খাটিয়া হয়রান হইয়া উঠিতেছে, ছুটি না থাক, অন্যত্র বদলি না করুক—স্ত্রীর সঙ্গে দু-দণ্ড বসিয়া কথা বলিবার অবসরও তো দেওয়া উচিত।

উনানে ভাত চড়াইয়া দিয়া হাত ধুইয়া বীণা আবার ঘরে আসিয়া ঢোকে। বলে, 'কেন আমি কি তোমার জুতো ঘষে দিতে পারি না?'

হরিপদ বলে, 'না, পারবে না কেন? আমিই ঘষছি, তাতে আর হয়েছে কি!'

তাহার পর বেচারা বীণা আর কোনোও কথা খুঁজিয়া পায় না, হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে স্বামীর জুতা ঘষা দেখিতে থাকে।

সেইদিন দুপুরে বীণা হঠাৎ এক সময় বলিয়া বসে, 'বিকেলের দুটো ট্রেনই নাকি উঠে যাবে শুনছিলাম, কই গেল না তো?'

হরিপদ বলে, 'ট্রেন উঠে গেলে তোমার ভারী দুঃখু হয়, না?'

বীণা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

হরিপদ বলে, 'জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাহলে আর লোক দেখা হয় না।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'না, পারলে না বলতে। বিকেলের ট্রেন দুটো উঠে যাওয়াই আমি চাইছি। উঠে গেলে বাঁচি।'

এবার হরিপদ বলে, 'কেন ?'

এ 'কেন'র জবাব দিতে গিয়া বীণার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে। লজ্জায় সে তাহার গাল দুটি রাঙা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'বারে! ও সময় একা থাকতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি! তোমার কি! তুমি তো লোকজনের সঙ্গে……'

বলিয়াই বীণা জানালার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। বাহিরে চাহিয়া দেখে, ইঁদারাটার কাছে রামধনিয়ার পাঁঠী ছাগলটাকে একটা খুঁটির সঙ্গে 'দিক্ দড়ি' দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে লাইনে কাটা যায় বলিয়া লছমি তাহাকে এমনি করিয়াই গলায় তাহার একটি লম্বা দড়ি দিয়া রোজ বাঁধিয়া রাখে।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে তাহাদের একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ একদিন এক বৈচিত্র্য দেখা দিল।

সন্ধ্যার ট্রেনখানা স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হরিপদ তাহার কালো আলপাকার কোট ও মাথায় গোল টুপিটি পরিয়া ট্রেনের যাত্রীদের টিকিট লইবার জন্য একটা আলোর খুঁটির নিচে দাঁড়াইয়া। ট্রেন হইতে লোক নামিল মাত্র দুজন, উঠিল একজন। হঠাৎ কে যেন ট্রেনের হাতল ধরিয়া ডাকিল, 'হরিপদ দাদা!'

পরিচিত কণ্ঠস্বর!

হরিপদ দেখিল, প্ল্যাটফর্মের আলোটা তাহার মুখে গিয়া পড়িয়াছে। চিনিতে দেরি হইল না।—'সুকুমার যে রে? নাম, নাম।—নেবে পড়!'

সুকুমার ছোকরাটি কি যেন বলিতে যাইতেছিল, হরিপদ ততক্ষণে তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ি হইতে নামাইল, সঙ্গে মাত্র একটি সুটকেশ। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সুকুমার বলিল, 'তুমি যে এ স্টেশনে আছো সে আমি জানতাম না দাদা, তবে এই লাইনে যে আছো তা জানি। সেই জন্যেই তো প্রত্যেকটি স্টেশনে উঁকি মেরে মেরে দেখছিলাম—যদি দেখা হয়ে যায়। ভালোই হল, অনেক দিন পরে দেখা হয়ে গেল। তুমি ভালো আছো? বৌদি ভালো আছে?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিপদ বলিল, 'হ্যাঁ ভালোই আছে! আচ্ছা, চল্ তোকে বাসাতেই রেখে আসি।'

বলিয়া সেই জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় দুজনে তাহাদের সেই ছোট্ট বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। হরিপদ ডাকিল, 'ওগো, খোলো খোলো, দেখো, কে এসেছে দেখো।'

বীণা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে আসিয়া দেখে স্বামীর সঙ্গে এক অপরিচিত যুবক। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, হরিপদ বলিল, 'বিয়ের সময় মাত্র একবার দেখেছিলে, চিনতে পারবে না। আমাদের যোগেশ মামার ছেলে গো—সুকুমার। এবার চিনলে তো?'

বীণা এইবার তাহার ঘোমটাটি ঈষৎ তুলিয়া দিয়া সুকুমারের মুখের পানে চকিতে একবার তাকাইয়া চোখ নামাইল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'প্রণাম বৌদি, ওরকম লজ্জা যদি করেন তো এই আমি চললাম।'

বীণাকে বাধ্য হইয়া তাহার মুখের পানে আর একবার তাকাইতে হইল।

সুটকেসটা ঘরের ভিতর রাখিয়া হরিপদর সঙ্গে সুকুমার কথা কহিতেছিল। বীণা তাহার জন্য চা তৈরি করিতে গেল।

সুকুমার বলিল, 'কয়লার কারবার করছি কিনা, তাই একবার মানিকগঞ্জে যাচ্ছিলাম। কাল সকালেই কিন্তু আমায় চলে যেতে হবে হরিপদ দাদা!'

'আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে। তুই বোস, তোর বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বল্, ততক্ষণ আমি আমার কাজটা সেরে আসি।' বলিয়া হরিপদ স্টেশনে চলিয়া গেল।

বৌদিদির চা তখনও হয় নাই।

একটা ঘরের মধ্যে একাই বা সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেমন করিয়া!

উঠানের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘর। সুকুমার উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিল।

'বৌদির ঘরকন্না দেখতে এলাম। বাঃ! এখনও লজ্জা করছেন বৌদি? না বৌদি, তাহলে আমি চললাম।'

বীণা এইবার তাহার মাথার ঘোমটা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া তাহার সে সুন্দর মুখখানি অনাবৃত করিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেন যাবে কেন ঠাকুরপো? বিয়ে করেছো নাকি?'

সুকুমার হাসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না বৌদি, বিয়ে আর হল না। হলে আপনাকে নেমন্তন্ন করব। যাবেন তো?'

বীণা বলিল, 'কেন যাব না ?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটিটি বীণা স্নকুমারের হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ভালো চা হয়তো হল না ঠাকুরপো ; তা কি আর করবে বলো, ঐ খেতে হবে।'

চায়ে চুমুক দিয়া স্নকুমার বলিল, 'বৌদিদির হাতের তৈরি চা, এ-ই আমার অমৃত। এর চেয়ে ভালো চা আমার জোটে না বৌদি, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

আলাপ জমিয়া উঠিতে দেরি হইল না। বীণা আজ বহুদিন পরে কথা কহিয়া বাঁচিয়াছে। কথা যেন তাহাদের আর ফুরাইতে চায় না।

'রাত্রে তুমি কি খাও ঠাকুরপো ? লুচি করে দিই খানকতক কি বলো ?'

'দোহাই বৌদি, রাত্রে লুচি আমি কোনোদিনই খাই না, আমি ভাত খাব।'

বীণা বলে, 'ভালো তরি-তরকারির ব্যবস্থা কিছু নেই ঠাকুরপো, ভাত খেতে তোমার কষ্ট হবে। এমন হতচ্ছাড়া জায়গা—কিছু মেলে না।'

স্নকুমার বলে, 'এবার আমি রাগ করব বৌদি, এ কী আরম্ভ করলেন আপনি ? অত লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।'

বৌদিদি বলে, 'লৌকিকতা নয় ভাই, তুমি কি আর রোজ আসছো। পথ ভুলে হঠাৎ এসে পড়েছো, আর হয়তো এ বৌদিদিটির কথা তোমার মনেই থাকবে না—'

স্নকুমার বলে, 'থাক। ভুলে যাবার মতো বৌদিদি আপনি নন। আপনাকে একবার যে দেখে সে বোধহয় জীবনে আর ভোলে না।'

এ কথার জবাব সে আর খুঁজিয়া পায় না, চোখ তুলিয়া স্নকুমারের মুখের পানে একবার তাকাইয়াই মুখ নামাইয়া সেও ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'থাক।'

তাহার পর দুজনেই চুপ। ৮

স্নকুমারের চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। বাটিটি হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি এবার বোধহয় রান্না করবেন ? আমি এইখানে বসে থাকলে আপনার লজ্জা করবে না তো ?'

বীণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

বলিয়া সে চৌকাঠের কাছেই একটি আসন পাতিয়া দিয়া বলিল, 'ভালো করে এখানে চেপে বোসো ঠাকুরপো, তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

সুকুমার ভালো করিয়াই চাপিয়া বসিল।

পরদিন সকালেই সুকুমারের চলিয়া যাইবার কথা, বীণা বলিল, 'পাগল হয়েছো ঠাকুরপো, আজ কি তোমায় ভালো করে না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি কখনও? যেতে হয়, কাল যেও।'

এ অনুরোধ এড়ানো শক্ত। বাধ্য হইয়া সেদিন তাহাকে থাকিতে হইল।

বীণা তাহার স্বামীকে রাত্রেই বলিয়াছিল, সকালে হরিপদ কোথা হইতে একটা মাছ সংগ্রহ করিয়া রামধনিয়াকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুকুমার বলিল, 'দাদাকে দেখছি স্টেশনের সব কাজই করতে হয়, বাড়ি এসে দু-দণ্ড যে বিশ্রাম করবে, তারও ফুরসত মেলে না—, না বৌদি? একা একা দিন আপনার কাটে কেমন করে বলুন তো?'

বাহিরে মাছটা পড়িয়া আছে, তাড়াতাড়ি সেটাকে কুটিবার ব্যবস্থা না করিলে এখনই হয়তো কাকে মুখ দিবে, তাই সে সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া একরকম ছুটিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। মুখে কিছুই বলিতে পারিল না।

ব্যাপারটা যে সুকুমার বুঝিল না তাহা নয়, কথাটা বলা হয়তো তাহার উচিত হয় নাই, তাই সে কিয়ৎক্ষণ জানালার বাহিরে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু তাহার নীরবতাও বীণার ভালো লাগিল না। মাছ কোটা শেষ করিয়া হঠাৎ এক সময়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'অমন চুপ করে বসে রইলে যে ঠাকুরপো?'

হাসিয়া সুকুমার বলিল, 'ঝগড়া করব আপনার সঙ্গে?'

বীণাও হাসিল। বলিল, 'করো না। পারবে?'

বলিয়াই সে আর জবাবের অপেক্ষা না করিয়াই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

আহারাদির পর খানিকটা বিশ্রাম করিয়া সুকুমার বলিল, 'যাই একটু স্টেশনে বেড়িয়ে আসি।'

বীণা বলিল, 'এসো। খাঁচার ভেতর কাল থেকে বাস করে জীবন বোধহয় তোমার হাঁপিয়ে উঠেছে।'

সুকুমার তাহার বৌদির দিকে তাকাইয়া মৃদু একটুখানি হাসিল মাত্র।

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলে যে?'

সুকুমার বলিল, 'আমার যদি এই একদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে, আপনার তাহলে আট বছরে কি হওয়া উচিত?'

তাচ্ছিল্যভরে বীণা বলিল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমি মেয়েমানুষ, আমাদের উপায় কি!'
বলিয়াই ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বেশি দেরি কোরো না, আমি চা তৈরি করে রাখব।'

দেরি অবশ্য বেশি সে করে নাই, ফিরিয়া যখন আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজার কড়া নাড়িবামাত্র হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে লইয়া বীণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।
দেখা গেল, বীণা বেশ করিয়া গা ধুইয়া ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়াছে, ভালো একখানি শাড়ি পরিয়াছে, জামা গায়ে দিয়াছে, পায়ে লাল টকটকে আলতা, হাতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি, জামা কাপড় হইতে ভুরভুর করিয়া সস্তা একটা এসেন্সের উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছে।
কিন্তু মানাইয়াছে চমৎকার। হঠাৎ দেখিলে দু-দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে হয়।
সুকুমার বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! এ যে তোমায় দেখছি আর চিনতে পারা যাচ্ছে না বৌদি!'
সলজ্জ একটু হাসিয়া বীণা বলিল, 'কেন? অপরাধ?'
সুকুমার বলিল, 'অপরাধ নয় বৌদি, ছাইচাপা আগুনের যেমন ছাই উড়ে গেলে আগুন বেরিয়ে পড়ে, তোমারও দেখছি আজ তাই হয়েছে। কাল থেকে দেখছিলাম চুলগুলো উস্কোখুস্কো, ময়লা একখানা কাপড়, পায়ে আলতা ছিল না—সত্যি বৌদি, আজ আপনাকে একেবারে নূতন মানুষ বলে বোধ হচ্ছে।'
বীণা বলিল, 'তোমারও যে দেখছি মাথা খারাপ হল ঠাকুরপো, আমার রূপ নিয়ে কবিত্ব করতে গিয়ে 'আপনি' 'তুমি'তে যে গুলিয়ে ফেললে।'
সুকুমার বলিল, 'তা হোক বৌদি, আপনাকে 'আপনি' না হয় নাই বললাম, কিন্তু সত্যি বলছি বৌদি, তোমায় আজ ভারী ভালো দেখাচ্ছে। দেখো তো পায়ে আলতা না পরলে মেয়েদের কখনও মানায়! আজ তোমার ও পায়ের ওপর প্রণাম করতেও সুখ!'
বীণা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।
'বাঃ হাসছো যে বৌদি? আমি কি মিছে বললাম?'
'না, সে জন্ম হাসিনি, তুমি আলতার কথা বললে, তাই হঠাৎ হেসে ফেললাম।

বাক্স খুলে দেখি—আলতা নেই। সে যে আজ ক-বছর ধরে নেই কে জানে! তখন কি করলাম জানো? ঐ দেখো।' বলিয়া বীণা আঙুল বাড়াইয়া মেঝের উপর যে জিনিসগুলি দেখাইয়া দিল সুকুমার সেগুলি চিনিতে পারিল না। বলিল, 'কি ওগুলো?'

বীণা বুঝাইয়া বলিল, 'আমাদের ঐ ইঁদারার পাশে কতকগুলো ফণী-মনসার গাছ আছে দেখেছো? ঐ গাছের ওগুলো ফুল কি ফল জানিনে ভাই, ছোট-বেলায় আমরা ঐ দিয়ে আলতা পরতাম। আজও হঠাৎ আলতা পরার সখ হতেই লছমিকে ডেকে ছুরি দিয়ে ঐগুলো কেটে আনালাম। ভারী বিশ্রী কাঁটা, হাতে একবার ফুটলে আর সহজে বেরোতে চায় না, তাই খুব সাবধানে বেছে বেছে ঐগুলো টিপে টিপে লাল লাল রস নিংড়ে আলতা যখন আমি পরছিলাম তখন তুমি দরজায় কড়া নাড়লে। অতি কষ্টে হাসি চেপে তোমায় আমি দরজা খুলে দিলাম—দাঁড়াও, ওগুলো ফেলে দিই।'

বলিয়া সেই ফণী-মনসার ফলগুলো মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া বীণা হাসিতে হাসিতে জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, 'এতেই এমনি, তা না জানি সত্যিকারের আলতা পরলে…'

হাত নাড়িয়া বীণা বলিল, 'হয়েছে।' বলিয়াই একবার হাসিল।

বলিল, 'নাঃ এত প্রশংসা যখন করলে, তখন তোমায় এক পেয়ালা চা আমায় দেখছি এনে দিতেই হল। উনোন আমার ধরে গেছে, বেশি দেরি হবে না, বোসো।'

বলিয়া বীণা চা তৈরি করিতে গেল।

রান্নার কাছেই সুকুমার সেইখানে বসিয়া বসিয়াই বলিল, 'প্রশংসা নয় বৌদি, সাজলে তোমায় সত্যি বড়ো সুন্দর দেখায়।'

রান্নাঘর হইতে জবাব আসিল, 'কিন্তু তাতে তো কিছু লাভ হবে না ঠাকুরপো, তুমি এবার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে বিয়ে করো। মেয়ে দেখবার ভারটা না হয় আমার হাতেই দিও।'

লজ্জায় সুকুমার চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

সেইদিন রাত্রেই সুকুমারকে মানিকগঞ্জে যাইতে হইবে। না গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

সুকুমার বলিল, 'তোমায় ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না বৌদি। সে-কথা

না বললেও বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছো। আচ্ছা—ফেরবার পথে যদি পারি তো না হয় আর একবার……'

'এসো' কথাটা বীণার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না। সুকুমার যে এত শীঘ্র হঠাৎ আবার চলিয়া যাইবে তাহা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

হরিপদ ইহারই মধ্যে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাঁকিয়া বলিল, 'তুই তবে আয় সুকুমার, আমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই।'

'যাই।' বলিয়া সুটকেসটা তুলিয়া লইয়া হরিপদর পিছু পিছু সুকুমারও বাহির হইয়া গেল।

বীণার বাড়ির পাশ দিয়া যে গাড়ি পার হইয়া যায় এ দু-দিন বীণা সে-কথা ভুলিয়াই ছিল, আজ এই অতিথিটি চলিয়া যাইবামাত্র দৃষ্টি তাহার আবার সেইদিকে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল।

মানিকগঞ্জ যাইবার গাড়ি পার হইল প্রায় আধঘণ্টা পরে। গাড়ির আরোহীদের মধ্যে ছিল সুকুমার জানালার পথে তাকাইয়া, আর সেই ক্ষুদ্র গৃহের বাতায়ন পার্শ্বে বীণা ছিল তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, আকাশে ছিল অজস্র জ্যোৎস্না, গাড়িতে ছিল আলো, অথচ কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বীণার অস্থির চঞ্চল দুটি চক্ষু-তারকার সম্মুখ দিয়া সশব্দে ট্রেনখানা পার হইয়া গেল।

শূন্য গৃহ আবার তেমনি খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

আবার সেই একঘেয়ে একটানা জীবন।

দু-তিন দিন পরে আবার সুকুমারের ফিরিবার কথা।

বীণা জানালার কাছে বসিয়া বসিয়া ট্রেন দেখে আর ভাবে, আর দিন গুণে।

জানালার বাহিরে ধরিত্রীর যে ভগ্নাংশটুকু তাহার চোখের সুমুখে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিভাত হইয়া আছে, চোখ বুজিলেই যে দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষে হুবহু ছবির মতো ভাসিয়া উঠে, সেটুকু দেখিয়া দেখিয়া এখন তাহার এমন হইয়াছে যে, সে না দেখিয়াও বলিয়া দিতে পারে—লাইনের ধারে একটি হেলানো পলাশগাছের নিচে একটি উই-এর ঢিপি, পাশেই ছোট্ট একটি ডোবায় বারো মাস জল জমিয়া থাকে, তাহারই এক কোণে একটি রক্ত সাপলার ঝাড়, লাল রঙের দুইটি শালুক সেখানে রোজই ফুটিয়া থাকিতে দেখে, ঝোপের ভিতর একটি ডাহুক

দম্পতি বোধকরি তাহাদের বাসা বাঁধিয়াছে। দিনের বেলায় তাহারা কোথায় থাকে কে জানে, সন্ধ্যা হইলেই ডাহুক দুইটি তাহাদের সন্তান সন্ততি লইয়া ঐ সাপলা ঝোঁপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বীণা জানে, সুমুখে বীণার মাঠের তিনটা মাঠ বাদ দিয়া চতুর্থ মাঠের আলটা বাঁধা। দূরে একটা পুকুরের পাড়ে পঁচিশটি তালের গাছ, দক্ষিণ দিক হইতে পাঁচটা গাছের পর যে ফাঁকটুকু আছে দিনের সূর্য সেইখানে গিয়া পৌছিলেই তাহার রঙ হয় লাল—বীণা তখন বুঝিতে পারে, সূর্যাস্ত হইতে আর দেরি নাই।

কিন্তু আজকাল আর ও-সবের দিকে তাহার নজর যেন কম, আজকাল সে দেখে শুধু মানিকগঞ্জ হইতে আসিবার ট্রেন। ট্রেনের জানালার পথে আরোহীদের মধ্যে সুকুমারের অনুসন্ধান করে। নিরাশ হইয়া শেষে চুপ করিয়া বসে। বহুদূর হইতে শব্দ শুনিয়া সে ঠিক বলিয়া দিতে পারে—মালগাড়ি কি প্যাসেঞ্জার।

দু-দিন যায়, তিন দিন যায়, চার দিনের দিন—তখনও সে আশা ছাড়ে না, মনে হয় সুকুমার আসিবে।

কিন্তু দিনের পর দিন পার হইয়া শেষ সপ্তাহ পার হইয়া গেল। সুকুমার আসিল না।

বীণা ভাবে, বিবাহ না করুক, ছেলেটি বেশ ভালো ছেলে, কয়লার কারবার করিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করে। যে মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে সে হয়তো তপস্যা করিতেছে। নিজের রোজগার ছাড়িয়া দিয়া এখানে তাহার এমনই বা কি আকর্ষণ যে, বসিয়া বসিয়া দু-দিন গল্প করিয়া যাইবে। আসিতে সে পারে না, আর কেনই বা আসিবে, আর সেই বা নিতান্ত স্বার্থপরের মতো তাহার আসিবার কথাই বা ভাবে কেন?

হরিপদর জামাটা বড়ো ময়লা হইয়াছিল, বীণাকে সেদিন সে ডাকিয়া বলিল, 'জামাটায় আজ একটু সাবান দিয়ে দিয়ো তো।'

সাবান দিবার জন্য জামাটা সে উঠানে লইয়া যাইতেছিল, পকেটে কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্য একটা পকেটে হাত ঢুকাইতেই ভারীমতো কি একটা বস্তু তাহার হাতে ঠেকিল—'এটা কি গো?'

জিনিসটা বাহির করিয়া বীণা দেখিল—লাল কাগজের বাক্সয় মোড়া তরল আলতার শিশি। জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা, এটা তুমি পেলে কোথায়?'

আহারাদির পর হরিপদ একবার গড়াইয়া লইতেছিল, বলিল, 'দেখলে, কিরকম

মনের ভুল। আজ চার দিন ধরে তোমায় বলব বলব করেও ভুলে গেছি। সুকুমার সেদিন রাত্রের ট্রেনে মানিকগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরছিল, গাড়ি থেকে আমায় ডেকে সেদিন তোমার জন্যে ঐ আলতার শিশিটে দিয়ে গেছে। এত করে বললাম তা কিছুতেই নামল না, বললে, বড়ো জরুরী কাজ আছে দাদা, আজ আসি।'

অনেকক্ষণ ধরিয়া আলতার শিশিটি বীণা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে লাগিল। খুলিয়া দেখিল, চমৎকার আলতা! রক্তের মতো লাল!

* * * *

তাহার পর দেড় বৎসর পার হইয়াছে। সুকুমার আর আসে নাই। হরিপদর আরও চার টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

তখন বসন্ত কাল। পলাশের ঝোপে, লাইনের ধারে, যেখানে সেখানে যখন তখন কোকিল ডাকিতে শুরু করিয়াছে। এমনি দিনে হরিপদর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিল।

বদলি হইয়াছে প্রকাণ্ড এক জংশন স্টেশনে। সেখান হইতে বেশি দূরে নয়। বীণার মামার বাড়ির কাছেই।

কিন্তু হইলে কি হয়, বীণার যেন এখন আর সে উৎসাহ নাই। গত তিন-চার মাস তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। অত রূপ তাহার এই অল্পদিনের মধ্যেই কেমন যেন ম্লান হইয়া গেছে।

বাসার জিনিসপত্র রামধনিয়া বাঁধা-ছাঁদা করিয়া দিল। লছমি আসিয়া চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। যে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য বীণা একদিন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরের পর সে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বীণার চোখে জল আসিল।

জংশন স্টেশনের চমৎকার কোয়ার্টার। বাড়িগুলাও বড়ো, উঠানে জলের কল, স্নান করিবার ঘর, চৌবাচ্চা, ইলেকট্রিকের আলো। চারিদিকে লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, সাহেব মেম—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোটখাট শহরের মতো জায়গা। লাল ফুলে ভরা প্রকাণ্ড একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ দরজার সুমুখে একেবারে তাহাদের উঠানের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

হরিপদ হাসিয়া বলে, 'কেমন? হয়েছে তো এবার?'

বীণাও ম্লান একটুখানি হাসে। ঘাড় নাড়িয়া বলে, হ্যাঁ।

হরিপদ বলে, 'ভালোই হল। এখানে এসে শরীরটা তোমার সারবে এবার। রেলের একজন খুব বড়ো ডাক্তার আছে, কালই একবার ডেকে দেখাব ভাবছি।'

বীণা বলে, 'না গো না আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। এমনিই সেরে যাবে।'

কিন্তু সারে না। স্নান করিতে গেলেই গায়ে জল ঠেকিবামাত্র শরীরটা তাহার কেমন যেন শির শির করিয়া ওঠে, স্পষ্ট জ্বরও হয় না, অথচ ভিতরে ভিতরে দিন দিন দুর্বল হইয়া যায়, তাহাতেই কোনোরকমে নিজের হাতেই সংসারের কাজকর্ম করে, স্নানও করে, ভাতও খায়—অথচ মুখ ফুটিয়া স্বামীকে কোনোদিন কোনোও কথাই বলে না।

বলে না তো বলে না, হরিপদও নিজের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, ডাক্তার আনিবার কথা সে ভুলিয়া গেছে।

এখানে আসিয়া অবধি হরিপদর প্রায়ই রাত্রে 'ডিউটি' পড়ে, দিনের বেলা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

সেদিন সে অমনি ঘুমাইতেছে, রান্না সারিয়া হরিপদকে স্নান করিবার জন্য উঠাইতে গিয়া বীণা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

বলিল, 'ওগো আমার জ্বর এল।'

লেপের পর লেপ চাপা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়াও হরিপদ বীণার কাঁপুনি আর থামাইতে পারে না।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের তলা হইতে বীণা বলিল, 'ওগো তুমি রাত জেগেছো, যাও স্নান করো গে, ক'রে নিজেই চারটি হেঁসেল থেকে—কি আর করবে লক্ষ্মীটি .....'

বলিয়া লেপের তলায় হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া হরিপদর হাতখানা বীণা তাহার আগুনের মতো গরম হাত দিয়া ধরিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে কান্না হরিপদ দেখিতে পাইল না।

'দাঁড়াও, আজই ডাক্তার আনছি।' বলিয়া সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া গেল।

নিজেই ভাত বাড়িয়া খাইয়া হরিপদ ফিরিয়া আসিতেই বীণা জিজ্ঞাসা করিল, "খেলে? ভালো করে খেয়েছো তো? কাঁসার সেই বড়ো বাটিতে মাছের ঝোল ছিল, আর কলাই-করা সেই সাদা রঙের—'

কথাটা হরিপদ তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না, বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই

খেয়েছি। তুমি একটুখানি চুপ করে ঘুমোও দেখি। আমি ডাক্তার ডেকে আনি।'

বীণা তাহার মুখের ঢাকা খুলিয়া বলিল, 'না, তুমি যেও না। ডাক্তার ডাকতে হয়—এরপর ডেকো।'

এই বলিয়া সে একদৃষ্টে তাহার স্বামীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে তুমি ঘুমোও। তোমায় আবার রাত জাগতে হবে।'

বীণাকে জল খাওয়াইয়া হরিপদ সত্যই ঘুমাইল।

বৈকালে ঘুম ভাঙিতেই দেখে, বীণা বসিয়া বসিয়া একটা ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে। হরিপদ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'ও কি! ও কি হচ্ছে?'

বীণা হাসিয়া বলিল, 'জ্বর আমার অনেকক্ষণ সেরে গেছে।'

হরিপদ বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'পাগল হলে না কি?'

বীণা তাহার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখো গায়ে হাত দিয়ে।'

হরিপদ তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, সত্যই তাই। জ্বর তাহার ছাড়িয়া গেছে।

বীণা বলিল, 'বড়ো খিদে পেয়েছে। কি খাই বলো দেখি?'

হরিপদ উঠিয়া দাঁড়াইল। জামা গায়ে দিয়া বলিল, 'দাঁড়াও, আগে ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকি।'

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, 'ম্যালেরিয়া পুরনো জ্বর, ও অমনি আসে আর যায়। খেতে দিন, কিন্তু একবার চেঞ্জে পাঠাতে পারলে ভালো হয়।'

হরিপদ খানিক ভাবিয়া বলিল, 'চেঞ্জে? পাড়াগাঁয়ে পাঠালে চলে?'

ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'চলে।'

বলিয়া তিনি ঔষধের প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন।

ঔষধ চলিতে লাগিল।

জ্বর অমনি আসে আর যায়। হরিপদ বুঝাইয়া বলে, 'দেখো, আমি কিছুদিন না হয় হোটেলেই খাই, আমার কোনোও কষ্ট হবে না। তুমি যাও দিন কতক মামীমার কাছেই থেকে এসো গে, কেমন?'

বীণা বলে, 'না গো না আমার কিচ্ছু হবে না, আমি বেশ আছি।'

হরিপদ রাগ করিয়া বলে, 'তোমার সঙ্গে কে পারবে বলো! বেশ থাকো, এমনি করে জ্বর আসুক আর অনাচার অত্যাচার করো, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকবে, এখন হোটেলে খেতে দিচ্ছো না, তখন আমায় নিজে রেঁধে খেতে হবে।'

বীণা হাসিয়া বলে, 'মরি মরি, নিজে রেঁধে খাবার লোকটি কেমন! তখন তুমি আর একটা বিয়ে করবে।'

হরিপদ আর জবাব দেয় না। রাগ করিয়া নীরবে বসিয়া থাকে।

বীণা তাহার রাগ ভাঙাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। বলে, 'না গো না, রাগ করলে? না না, বিয়ে তুমি করবে না তা আমি জানি। তোমার বিয়ে করবার সময় কোথায়?'

এমনি করিয়া রাগ-অভিমানের পালা চলিতে চলিতে বীণাকে একদিন রাজী হইতে হইল। বলিল, 'আচ্ছা তবে তাই, আমায় দিয়েই এসো বাপু, শরীরটা না হয় সারিয়েই আসি। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

বীণা বলিল, 'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলো—ওগো না ছি! হোটেলে আবার মানুষে খায়! তার চেয়ে এক কাজ করো, এখানে একটা রাঁধুনী বামুন পাওয়া যায় না?'

হরিপদ বলিল, 'আচ্ছা তাই না হয় একটা বামুন-টামুন দেখে বাড়িতে রান্না করিয়েই খাব।'

বীণা বলিল, 'খাব নয়। তোমায় আমি খুব ভালো করে চিনি। পকেটে আলতার শিশি রেখে যে চার দিন ভুলে যায়···বামুন তুমি একটা নিয়ে এসো ডেকে। তাকে আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, দু-দিন রান্না করুক, আমি দেখি— তারপর···'

ব্রাহ্মণ এক ছোকরাকে পাওয়া গেল। নাম যতীন। সেখান হইতে ক্রোশ-খানেক দূরের একটা গ্রামে তাহার বাড়ি। রাঁধে ভালো। কাজকর্মও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বীণা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর স্বামীকে তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া ঠিক সময়ে স্নানাহার করিবার শপথ করাইয়া জানাইল

যে, সে যাইতেছে বটে কিন্তু মোটেই সেখানে বেশি দিন থাকিতে পারিবে না, চিঠি লিখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে। বলিল, 'বাক্স আমি নিয়ে যাব না। দু-চারখানা কাপড় জামা তোমার ঐ টিনের হাতবাক্সটাতে যা ধরে তাই নিয়েই আমি চললাম। তারপর দরকার হয়—মামীমা দেবেন, সেজন্য ভেবো না।'

দিন কয়েক পরে একটি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া হরিপদ তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসিল।

বাপের বাড়ি কাছেই, কিন্তু সেখানে তাহার মাও নাই, বাবাও নাই, মামার বাড়িতেই ছেলেবেলা হইতে মানুষ, তাই তাহাকে তাহার মামীমার কাছে রাখিয়া আসা ছাড়া আর উপায় কি।

বীণার চিঠি আসে—সে বেশ ভালোই আছে। জ্বর এক আধটু মাঝে মাঝে আসে বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, আসে আর যায়।

চিঠি পড়িয়া হরিপদ খুশি হয়। আহা, এতদিনের সাধ তাহার—বদলি হইয়া যদিই বা সে জংশন স্টেশনে আসিল, আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে সুখে বাস করিতে পায় নাই, এইবার সে সারিয়া আসিয়া আবার সেই আগের মতোই হাসিয়া খেলিয়া কাজ করিয়া বেড়াইবে।

কিন্তু দুনিয়ার বিধাতা বুঝি হরিপদর চেয়েও নিষ্ঠুর। তাহারই মতো অন্ধ!

এক মাস পার হইতে না হইতেই বীণার মামীমার কাছ হইতে এক চিঠি আসিল। বীণার যেমন জ্বর হইত তেমনি জ্বর আসিতেছে, দিন চার-পাঁচ আগে জ্বরটা একটু বেশি করিয়াই আসিয়াছে, এখনও বন্ধ হয় নাই, কাল রাত্রে একটু বিকারের মতো হইয়াছিল, ভুল বকিতে বকিতে হঠাৎ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেছে, জ্ঞান রহিয়াছে কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। তুমি বাবা একবার আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র আসিও।'

চিঠিখানি পাইবামাত্র হরিপদর মাথা ঘুরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়া ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া এক শিশি ঔষধ লইয়া হরিপদ ট্রেনে চড়িয়া বসিল।

গ্রামে ঢুকিতে বুকখানা তাহার অজানা আতঙ্কে দুর দুর করিতেছিল, তবু সে গ্রামে ঢুকিল। লোকজনের মুখের পানে তাকাইতে তাহার ভরসা হইল না। কোনোরকমে মুখ নিচু করিয়া মামীমার ঘরের দরজার কাছে গিয়া

দাঁড়াইতেই দেখা গেল মামীমা নিজেই দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিপদকে দেখিবামাত্র তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে মামীমা বলিলেন, 'হয়ে গেছে বাবা, বীণি চলে গেছে।' আর কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। বলিবার প্রয়োজনও ছিল না। হরিপদ তখন মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইতেছে, ঠোঁট দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

এমন অকস্মাৎ সে যে চলিয়া যাইবে কে জানে।

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। বীণার ঔষধের শিশিটা সেইখানেই কাত হইয়া পড়িয়া রহিল।

দেখা গেল, শবদাহের জন্য গ্রামের লোকজন আসিয়া উঠানে জড়ো হইয়াছে। সুমুখে ঘরের মেঝের উপর বীণার মৃতদেহ আপাদ-মস্তক সাদা চাদর দিয়া ঢাকা।

চাদরখানা সরাইয়া দিয়া উন্মাদের মতো হরিপদ তাহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

মামীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'যাবার সময় কিছু বলে গেল না বাবা, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।'

কথাটা শুনিয়া হরিপদর কান্না যেন আরও বাড়িয়া গেল। বীণার সেই অর্ধমুদ্রিত ঘোলাটে দুইটি চক্ষুর পানে তাকাইতে গিয়াও সে আর তাকাইতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার মোচড় খাইয়া হু হু করিয়া উঠিতেই সে মামীমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আসতে সে চায়নি মামীমা, আমি ওকে জোর করে পাঠিয়েছিলাম।'

নদীতীরের শ্মশানে বীণার মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে চোখের সুমুখে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

হরিপদকে মামীমা বারবার করিয়া শ্মশান হইতে বাড়ি ফিরিতে বলিয়াছিলেন, শবযাত্রীরাও বারে বারে তাহাকে গ্রামে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ কাহারও কথা শুনিল না। অবস্থা তখন তাহার ঠিক পাগলের মতো। বীণার হাতের আটগাছি সোনার চুড়ি ও কানের দুলটি লইয়া ভিজা কাপড় পরিয়া ভিজা জামাটা কাঁধে ফেলিয়া নদীতীরের পথের উপর

দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। পুরোহিত তাহার পিছনে পিছনে কিছুদূর ছুটিয়া আসিয়া কাঁচা মাটির একটা ঢেলার মধ্যে খানিকটা চিতাভস্ম ও বীণার অস্থি কয়টি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'পারো তো এইটি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ো বুঝলে? দিতে হয়।'

মাটির ঢেলাটি হরিপদ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল।

ট্রেনে চড়িয়া হরিপদ যখন তাহার নির্দিষ্ট স্টেশনে নামিয়া বাসার দিকে চলিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রেল লাইনের উপর দিয়া প্রকাণ্ড একটা সেতু পার হইতে হয়। তাহার উপর দিয়া হরিপদ ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে এই স্টেশনে কয়েকবার মালগাড়ি হইতে প্রচুর জিনিসপত্র চুরি যায়, তাই এখন এখানে বহুদূর পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা। আলোগুলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে লোহার লাইন, আর তার, আর গাড়ি। অদূরে 'লোকোশেড'। কালো কালো প্রকাণ্ড দানবের মতো ইঞ্জিনগুলা হুম হুম করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ওদিকে ইলেকট্রিকের ইঞ্জিন ঘর, ওদিকে কারখানা, ওদিকে যন্ত্র, ওদিকে কল। শুধু লোহা আর ইস্পাত, শুধু স্টীম আর আগুন! হরিপদর আপিসটা দেখা যাইতেছিল। কলের মতো লোকগুলা সেখানে কাজ করিতেছে। মনে হইল, সে নিজেও ঐ কলকারখানার সামিল। যন্ত্রের মতো পরের ইঙ্গিতে সেও তাহার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের যাত্রাপথে অন্ধের মতো হাঁটিয়া চলিয়াছে। ছুটি নাই, অবসর নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—মৃত্যুপথযাত্রী বীণাকে একটুখানি দেখিবার অবসর পর্যন্ত নাই। বীণার কথা মনে হইতেই তাহার চোখের সুমুখে যেন হু হু করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল—নদীতীরের সেই শ্মশান আর সেই চিতা। আর সেই ধূম, সেই আগুন, আর সেই নিঃসাড় নিস্পন্দ বীণার মৃতদেহ।...হাতে তাহারই অস্থি!

ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া হরিপদ সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলা দিয়া তাহার কোয়ার্টারের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কোয়ার্টার। এইখান হইতেই বীণাকে সে জোর করিয়া মামীমার কাছে রাখিয়া আসিয়াছিল। ঘরের বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছে। দেখিল,—যতীন ছোকরাটি বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। হরিপদ তাহাকে আর জাগাইল না। ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। ভিজা কাপড় প্রায় শুকাইয়া গেছে। জামাটা

কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিতে গিয়া ঠক করিয়া কিসের যেন শব্দ হইল। হাত দিয়া দেখিল, বীণার চুড়ি। বীণার চুড়ি ও দুল সে বীণার বাক্সেই রাখিয়া দিবে ভাবিয়া খাটের নিচে বালিসের তলা হইতে তাহার চাবির তোড়াটি বাহির করিয়া সে বাক্স খুলিল। বীণার সেই বাক্স। তাহারই নিজের হাতের সাজানো জিনিস। কিন্তু একি! থাকে থাকে সাজানো কাপড় জামা সব যেন লাল। মনে হইল সব যেন রক্তে ছোপানো। হরিপদ তাহার চোখ দুইটা ভালো করিয়া রগড়াইয়া লইল, দেখিল, না, চোখের ভুল নয়, সত্যই তাই। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড় জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল বাক্সের এক কোণে সযত্নে রক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সে আলতার শিশিটি। ভাঙিয়া কোন্ সময় সমস্ত আলতা গড়াইয়া পড়িয়াছে।

কয়েকটি কাপড়ের তলায় দেখিল, তাহারই দেওয়া রেল কোম্পানির একটি সাদা খাতা। খাতার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া চিঠির মতো কি যেন লেখা হইয়াছে, কাগজগুলি হরিপদ তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। বীণার হাতের লেখা কয়েকখানি চিঠি। কিন্তু চিঠির অধিকাংশ অক্ষর লাল আলতার দাগে অস্পষ্ট। একখানি চিঠির কিয়দংশ সে পড়িতে লাগিল। লেখা আছে—

'ভাই ঠাকুরপো—' তাহার পর অনেকগুলি অক্ষর কাটা! তাহার পর লিখিয়াছে, 'তোমাকে যে চিঠি দেবো কিন্তু ঠিকানা জানি না যে!'

সে চিঠিখানার আর কিছু পড়িবার উপায় নাই।

আর একখানি চিঠি! আগাগোড়া সবই লাল, মাঝখানে মাত্র কয়েক লাইন ...'সাজিলে আমাকে ভালো দেখায়। তুমি যে আমায় আলতা পরিয়া ভালো করিয়া সাজিতে বলিলে, কিন্তু কাহার জন্য সাজিব ভাই? কে দেখিবে? তোমার দাদা কাজের লোক। চব্বিশ ঘণ্টা সে তাহার কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকে। তাহার কি আর দেখিবার অবসর আছে ছাই!......'

হরিপদর হাত হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাগজগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথার ভিতরটা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার দুই মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে মনে হইল যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লাল রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! চারিদিকে অজস্র ইঞ্জিন আর ধোঁয়া, কল আর কারখানা, টেলিগ্রাফের তার আর যন্ত্রের শব্দ!......ওদিকে হুইশিল বাজিল, এদিকে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রামধনিয়ার চিৎকার, লছমির ঝগড়া......

টেলিগ্রাফ আসিয়াছে……বীণার অসুখ, বীণা রাগ করিয়াছে, বীণা চলিয়া যাইবে! সত্যই তো! তাহার অবসর কোথায়! তাহার অবসর কোথায়!…

কোয়ার্টারের মাঠে যাত্রা শুনিয়া যতীন এমন ঘুম ঘুমাইয়াছে যে, উঠিল যখন তখন প্রভাত হইয়া গেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, দরজা খোলা, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, বাবু কোন্ সময় আসিয়াছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিতেই দেখে, বাবুর খালি গা, খালি পা, বাক্স খোলা, বাক্সর জিনিসপত্র ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো, আর তাহারই মাঝখানে বাবু তাহার বাক্সের ডালির উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।
আর…পাশের বাড়ির সাদা রঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থিপিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলা করিতেছে।

ফার্স্ট বুক ও চিত্রাঙ্গদা (১৯০১—) ॥ মনোজ বসু
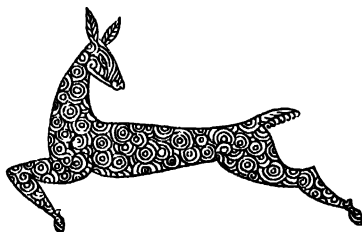
রামোত্তম রায় মহাশয়ের সেজ ছেলে ননী তিন বছরে তেরোখানি ফার্স্ট বুক ছিঁড়িল, কিন্তু ঘোড়ার গল্প ছাড়াইতে পারিল না।

ব্যাপারটা আর কোনোক্রমে অবহেলা করা চলে না। অতএব পশু মাস্টারের ডাক পড়িল।

পশুপতির নামডাক যেমন বেশি, দরও তেমন কিছু বেশি। তা হউক। ছেলে আকাটমূর্খ হইয়া থাকে, সে জায়গায় দু-একটা টাকার কম-বেশি এমন কিছু বড়ো কথা নয়।

সাব্যস্ত হইল, আট টাকা মাহিনা, তাছাড়া রায় মহাশয়ের বাড়িতেই পশুপতি খাইবে, থাকিবে। পড়াইতে হইবে ফার্স্ট বুক, শিশুশিক্ষা, সরল পাটীগণিত— সকালে এক ঘণ্টা, সন্ধ্যার পর দু-ঘণ্টা মাত্র।

বাহির বাড়ির কাছারি-ঘরের পাশে ছোট্ট সংকীর্ণ ঘরখানিতে চুন ও সুরকি বোঝাই থাকিত, উহা পরিষ্কৃত হইয়া একপাশে পড়িল তক্তপোশ আর একপাশে একটি টেবিল ও ছোট বেঞ্চি একখানি।

পড়াশুনা বিপুল বেগে আরম্ভ হইল।

লোকে যে বলে, পশু মাস্টার গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিতে পারে—তাহা মোটেই মিথ্যা নয়। ছয় মাস না যাইতেই ননী শিশুশিক্ষা ছাড়াইয়া বোধোদয় ধরিল, পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক শুরু হইয়া গিয়াছে, ফার্স্ট বুকও শেষ হইবার বড়ো বেশি দেরি নাই।

আশ্বিন মাস, দেবীপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি।

অন্যান্যবার মহালয়ার সঙ্গেই স্কুল বন্ধ হইয়া যায়। এবার বছর বড়ো খারাপ, ছেলেরা মাহিনাপত্র মোটে দিতেছে না, তাই দেরি পড়িয়া যাইতেছে।

সকাল হইতে আকাশ মেঘলা। স্নান সম্বন্ধে বারো মাসই পশুপতি একটু বেশি

সাবধান হইয়া চলে ; এমন বাদলার দিনে তো আরোই। খাওয়াদাওয়া সারিয়া স্কুলের পথে পা বাড়াইয়াছে এমন সময়ে পিওন একখানা চিঠি দিয়া গেল।

খামের চিঠি। তাকাইয়া দেখিয়া পশুপতি পকেটে রাখিয়া দিল। খামের চিঠি হইলে কি হয়, স্কুলমাস্টারের নামে আসিয়াছে—অতএব ভিতরে এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা না পড়া পর্যন্ত প্রাণ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে থাকে। এমনই আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা-লেখা খাম পশুপতির নামে বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে। বিবাহের পর প্রথম বছর তিন-চারের কথা ছাড়িয়া দিলে পরবর্তী সকল চিঠির সুর একটি মাত্র। খাম না ছিঁড়িয়া পত্রের মর্ম স্বচ্ছন্দে আগে হইতে বলিয়া দেওয়া যায় যে প্রভাসিনী সংসার খরচের টাকা চাহিয়াছে।

স্কুলে গিয়া স্থির হইয়া বসিতে-না-বসিতে ঘণ্টা বাজিল।

প্রথমে অঙ্কের ক্লাস। ক্লাসে ঢুকিয়াই প্রকাণ্ড একটা জটিল ভগ্নাংশ বোর্ডে লিখিয়া পশুপতি হুংকার দিল—খাতা বের কর্—টুকে নে। বলাটা অধিকন্তু, সকল ছেলে ইহা জানে এবং প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তারপর বোর্ডের উপর নক্ষত্রগতিতে অঙ্কের ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইল। পশুপতি কষিয়া যাইতেছে, মুছিতেছে, আবার কষিতেছে। জোর-কদমে-চলা ঘোড়ার খুরের মতো খটাখট খটাখট ক্রমাগত খড়ির আওয়াজ, তাছাড়া সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ক্লাসের মধ্যে যেন কোনো ছেলে নাই, কিংবা থাকিলেও হয়তো একেবারে মরিয়া আছে। প্রকাণ্ড খড়ির তাল দেখিতে দেখিতে জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হইয়া গেল। ছেলেরা একটা অঙ্কের মাঝামাঝি লিখিতে লিখিতে তাকাইয়া দেখে কোন্ ফাঁকে সেটা শেষ হইয়া আর একটি শুরু হইয়াছে ; দ্বিতীয়টি না লিখিতে সেটা মুছিয়া তৃতীয় একটা আরম্ভ হয় এবং সেটা ধরিবার উপক্রম করিতে করিতে পরেরটি শেষ হইয়া যায়। গায়ে তাহার নীল খদ্দরের জামা। ইহারই মধ্যে যখন একটু ফাঁক পায়, পকেট হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া এক টিপ নাকে গুঁজিয়া দেয়, তারপর নাকের বাহিরের নস্য ঝাড়িয়া হাতখানা জামার উপর ঘষিয়া সাফ করিয়া আরম্ভ করে—শেষ হল? ফের দিচ্ছি আর গোটা আষ্টেক—

এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকের মুখে পশু মাস্টারের এত নামডাক শুধু শুধু হয় নাই, সে তিলার্ধ ফাঁকি দেয় না।

চারিটা ক্লাস পড়াইবার পর টিফিনের ঘণ্টা বাজিলে পশুপতি বাহির হইয়া আসিল। তখন নস্য ও খড়ির গুঁড়ায় জামার নীল রঙ ধূসর হইয়া গিয়াছে। সিঁড়ির নিচে জানালাহীন ঘরখানিতে ক্লাস বসানো যায় না। ইনস্পেক্টর মানা করিয়া গিয়াছে, সেখানে বসিলে ছেলেদের স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া যাইবে। সেইটি মাস্টারদের বসিবার ঘর। ইতিমধ্যেই সকলে আসিযা জুটিয়াছেন। হুঁকা গোটা পাঁচ-সাত—কোনোটার গলায় কড়ি-বাঁধা, কোনোটায় কেবলমাত্র রাঙাসুতা, একটি নলচের উপর আবার ছুরি দিয়া গর্ত করিয়া লেখা হইয়াছে ‘মা’ অর্থাৎ মাহিষ্যের হুঁকা। নিজ নিজ জাতি বিবেচনা করিয়া মাস্টারেরা উহার এক একটি তুলিয়া লইলেন। যাঁহাদের ভাগ্যে হুঁকা জোটে নাই তাঁহারা অনুকল্পে বিড়ি ধরাইলেন। ধোঁয়ায় ধোঁযায় ছোট ঘরখানি অন্ধকার। রসালাপ ও প্রচণ্ড হাসি ক্রমশ জমিয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে আশঙ্কা হয়, বুঝি-বা অত আনন্দের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া বহুকালের পুরানো ছাদ ভাঙিয়া-চুরিয়া সকলের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।

কিন্তু স্কুলের জন্মকাল হইতে এমনি আটত্রিশ বছর চলিয়া আসিতেছে, ছাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই।

উহারই মধ্যে একটা কোণে বসিয়া পশুপতি খামখানা খুলিল। খুলিতেই আসল চিঠিখানা ছাড়া আর এক টুকরা কাগজ উড়িয়া মেঝেয় গিয়া পড়িল। তুলিয়া দেখে—অবাক কাণ্ড! ইহা হইল কি করিয়া।

এই সেদিন মাত্র যে খোকাকে ধরিয়া ধরিয়া অ-আ লেখাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, এরই মধ্যে ছেলে নিজের হাতে পত্র লিখিয়াছে। কাহাকে দিয়া কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ কাটিযা লইয়াছে, সেই ফাঁকের মধ্যে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিয়াছে—

বাবা, আমি পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছি। ছবির বই আনিবে। ইতি।

—কমল।

একবার, দুইবার, তিনবার সে পড়িল। লেখা যেমনই হউক, অক্ষরের ছাঁদ কিন্তু বেশ—বড়ো হইলে খোকার হাতের লেখা ভারী সুন্দর হইবে! পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এই ছেলে আবার বড়ো হইবে, তাহার দুঃখ ঘুচাইবে, বিশ্বাস তো হয় না! পর পর আরও তিনটি এমনি বয়সে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।…ভাবিতে ভাবিতে সে কেমন একটু উন্মনা হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে খোকার চিঠি খামে পুরিয়া বাহির করিল প্রভাসিনী যেখানি লিখিয়াছে।

ছোট ছোট অক্ষরের সারি চলিয়াছে যেন সারবন্দী পিপীলিকা। বিস্তর দরকারী কথা, সাংসারিক অনটন, ধান-চালের বাজার দর, গোয়ালের ফুটা চাল দিয়া জল পড়িতেছে, তারিণী মুখুজ্যে বাস্তভিটার খাজনার জন্য রোজ একবার তাগাদা করিয়া যায়—ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া শেষকালে আসিয়া ঠেকিয়াছে কয়েকটি অত্যাবশ্যক জিনিসের ফর্দ—ছুটিতে বাড়ি যাইবার মুখে খুলনা হইতে অতি অবশ্য অবশ্য সেগুলি কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে, ভুল না হয়।

পশুপতি ফর্দখানির উপর আর একবার চোখ বুলাইল, তারপর পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া পাশে দাম ধরিতে লাগিল।

কি ভাগ্য যে এতক্ষণ কাহারও নজরে পড়ে নাই। এইবার রসিক পণ্ডিত দেখিতে পাইল এবং ইশারা করিয়া সকলকে কাণ্ডটা দেখাইল। তারপর হঠাৎ ভারী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল—পশুভায়া, করেছ কি? হাটের মধ্যে প্রেমপত্তোর বার করতে হয়? ঢাকো—শিগগির ঢাকো, সব দেখে নিলে—

পশুপতি আপনার মনে ছিল, তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়া মুখ তুলিল।

হাসি চাপিয়া অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো রসিক কহিল—ঐ নকুড়চন্দোরবাবুর কাণ্ড, আড়চোখে দেখছিলেন।

নকুড়চন্দ্র বসিয়াছিলেন ঘরের বিপরীত কোণে। বুড়া মানুষ, কাহারও স্ত্রীর চিঠি চুরি করিয়া দেখিবার মতো বয়স তাহার নাই। পশুপতি বুঝিল, ইহাদের সুদৃষ্টি যখন পড়িয়াছে এখানে বসিয়া আর কিছু হইবে না। উঠিয়া পড়িল।

মন্মথ গরাই অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল—মিছে কথা পশুপতিবাবু, কেউ দেখছে না। আপনি বসুন, বসুন। পণ্ডিত মশায়ের অন্যায়, ভদ্রলোকের পাঠে বাধা দিলেন। আপনি এই আমার পাশে এসে বসুন।...গিন্নী কি পাঠ দিয়েছেন সেইটে একবার পড়ে শোনাতে হবে কিন্তু—

পশুপতি কোনোদিন এই সব রসিকতায় যোগ দেয় না। আজ তাহার কি হইয়াছে, বলিল—এই কথা? তা শুনুন না—বলিয়া চিঠির উপর দৃষ্টি দিয়া মিছামিছি বলিতে লাগিল—প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়রঞ্জন,—আর সব ও-পাতায় আছে, হল তো! পথ ছাড়ুন মন্মথবাবু—বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। রসিক কহিতে লাগিল—দেখলে? তোমরা তর্ক করতে, পশুপতি হাসতে জানে না—দেখলে তো? অন্যদিন বাড়ির চিঠি পেলে মাথায়

হাত দিয়ে বসে, আজ যেন নবযৌবন পেয়েছে। ওহে মন্মথ, আজকের চিঠিতে কি আছে একবার দেখতে পারো চুরি-চামারি করে?

ঘরের বাহির হইয়াই কিন্তু পশুপতির হাসি নিবিয়া গিয়া ভাবনা ধরিল—পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে প্রভাসিনীর শাড়ি, খোকার জামা, জিরামরিচ, পানে খাইবার চুন দু-সের, এক কৌটা বার্লি, বালতি এবং ছবির বই—এতগুলি কি করিয়া কুলাইয়া উঠে?

তখন ছেলের দল হাসিয়া খেলিয়া চেঁচাইয়া লাফাইয়া স্কুলের উঠানটি মাত করিয়া ফেলিয়াছে। পশু মাস্টারকে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্তভাবে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। কিন্তু পশুপতির কোনো দিকে নজর নাই, সে ভাবিতেছে—স্কুলে পঁচিশ টাকা বলিয়া তাহাকে সহি করিতে হয়, কিন্তু আসল মাহিনা পনের টাকা। চিঠিতে ঐ যে তারিণী মুখুজ্যের তাগাদার কথা লিখিয়াছে, এবার বাড়ি গেলে মুখুজ্যের খাজনা অন্তত টাকা তিন-চার না দিলে রক্ষা নাই। আবার অগ্রহায়ণে নূতন ধান-চাল উঠিবে, চাষীদের সহিত ঠিকঠাক করিয়া এখনই অগ্রিম কিছু দিয়া আসিতে হইবে, না হইলে পরে দেখিয়া শুনিয়া কে কিনিয়া দিবে? অতএব স্কুলের মাহিনার এক পয়সা খরচ করিলে হইবে না। ভরসা কেবল রামোত্তমের বাড়ির আটটি টাকা। তাহা হইতে বাড়ি যাইবার রেল স্টীমারের ভাড়া দুই টাকা চৌদ্দ আনা বাদ দিলে দাঁড়ায় পাঁচ টাকা দু-আনা। সমস্ত পূজার বাজার ওই পাঁচ টাকা দু-আনার মধ্যে।

হেডমাস্টার কোন্ দিক্ দিয়া হঠাৎ কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন—সেক্রেটারির অর্ডার এসেছে, বন্ধ শনিবারে। ছেলেদের এখন কিছু বলবেন না, খালি ভয় দেখাবেন—কালকের মধ্যে যদি মাইনে সব শোধ না করে তবে একদম ছুটি হবে না। মাইনে-পত্তোর আদায় যদি না হয়, বুঝতে পারছেন তো?

ছুটির পর পশুপতি ও বুড়া নকুড়চন্দ্র পাকা রাস্তার পথ ধরিল। নকুড় কহিলেন—বন্ধ তাহলে শনিবার ঠিক? শনিবারই রওনা হচ্ছ পশুবাবু?

সে কথার জবাব না দিয়া পশুপতি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা নকুড়বাবু, ছবির বই একখানার দাম কত?

—কি বই তা বলো আগে। ছবির বই কি এক রকম? দু-টাকার তিন-টাকার আছে, আবার বিনি পয়সাতেও হয়।

পশুপতি কাছে আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বিনি পয়সায় কি রকম? বিনি পয়সায় ছবির বই দেয় না কি? কি বই?

নকুড় কহিলেন—ক্যাটালগ। ছেলে ভুলানো ব্যাপার তো? একখানা কবিরাজী ক্যাটালগ নিয়ে যেও। এই ধরো হাঁপানী-সংহারক তৈল—পাশে দিব্যি ছবি, একটা লোক ধুঁকছে—কোলের উপর বালিশ—পাশে বউ তেল মালিশ করছে। ছেলেকে দেখিয়ে দিও।

যুক্তি পশুপতির পছন্দ হইল না, হাসি পাইল। কমলকে দেখেন নাই তো। সে যে বানান করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে, তাহার কাছে চালাকি চলিবে না। কহিল—না, তাতে কাজ নেই—একখানা ছবির বই, সত্যি-সত্যি ছবির বইয়ের দাম কত পড়বে? দু-টাকা তিন টাকা ওসব বড়মানুষী কথা ছেড়ে দিন, খুব কমের মধ্যে—যার কমে আর হয় না, কত লাগবে?

নকুড় কহিলেন—বোধহয় গণ্ডা চারেক পয়সা নেবে, কিনিনি কখনও। মাস্টারির পয়সা—মুখে রক্ত-ওঠানো পয়সা। ওরকম বাজে খরচ করলে চলে?

পশুপতি তখন ফর্দ বাহির করিয়া আর একবার পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল—আর, পাথুরে চুন দু-সের?

নকুড় কহিলেন—তিন আনা।

এবারে নকুড়ের হাতে কমলের চিঠিটুকু দিল। কহিল—মজাটা দেখুন মশাই, ছেলে আবার চিঠি লিখেছে—ফরমায়েশটা দেখুন পড়ে একবার। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর বড়ো ফর্দখানি দেখাইয়া বলিল—বড়ো সমস্যায় পড়েছি, একটা সৎযুক্তি দিন তো নকুড়বাবু। পুঁজি মোটে পাঁচ টাকা দু-আনা—ফর্দের কোন্ কোন্‌টা বাদ দিই?

দেখি—বলিয়া নকুড় চশমা বাহির করিয়া নাকের উপর পরিলেন। তারপর বিশেষ প্রণিধান করিয়া বলিলেন—ছেলেপুলের ঘর, দুধ মেলে না বোধহয়—তাই বার্লির কথা লিখেছে, ওটা নিয়ে যেও। তা জিরে মরিচ চুন-টুন সব বাদ দাও। ছবির বই পয়সা দিয়ে কিনে কি হবে? যা বললাম, পারো তো একখানা ক্যাটালগ নিয়ে যেও। তোমরা বোঝো না—ছেলেপিলে যখন আবদার করে মোটে আস্কারা দিতে নেই। তাদের শিখিয়ে দিতে হয়, এক আধলাও যাতে বাজে খরচ না করে। গোড়া থেকে মিতব্যয়িতা শিখুক, তবে তো মানুষ হবে—

মনে কেমন কেমন লাগে বটে, কিন্তু মোটের উপর নকুড়ের কথাটা ঠিক। পশুপতির স্মরণ হইল, সেও ক্লাসের একখানি বাংলা বহিতে সেদিন পড়াইতেছিল—'অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। হে শিশুগণ, তোমরা মিতব্যয়ী হইতে অভ্যাস করিবে। তাহা হইলে জীবনে কদাপি দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না...' এমনি অনেক ভালো ভালো কথা। ছবির বই, জিরামরিচ ও চুন কিনিয়া কাজ নাই। তবে, বালতি, বার্লি ও কাপড় জামা কিনিয়া লইলেই চলিবে।

নকুড় কহিতে লাগিলেন—তিল কুড়িয়ে তাল! হিসেব করে দেখো তো ভায়া, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কত পয়সা অপব্যয় করেছি। সেইগুলো যদি জমানো থাকত তবে আজ দুঃখ কিসের? বাঙালী জাত দুঃখ পায় কি সাধে?

পশুপতি আর কথা না কহিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

গ্রামের মধ্যে কয়েক বাড়ি দেবীর ঘটস্থাপনা হইয়াছে। বড়ো মধুর সানাই বাজিতেছে। পশুপতির কানে নূতন লাগিল, এমন বাজনা সে অনেক দিন শোনে নাই। হঠাৎ সে হাসিয়া উঠিল, বলিল—কথা যা বললেন নকুড়বাবু, ঠিক কথা। আমরা কি হিসেব করে চলি? আমাকে আজ দেখছেন এইরকম—সখ করে আমিই একবার একখানা বই কিনি—সেও এক রকম ছবির বই, স্কুল কলেজে পড়ায় না।—দাম পাঁচ টাকা পুরো।

নকুড় শিহরিয়া উঠিলেন—পাঁচ টাকার বাজে বই, বলো কি?

—হুঁ, পাঁচ টাকা। তখন কি আমার এই দশা? বাবা বেঁচে। পায়ে পাম্প-শু, মাথায় টেরি। কলকাতায় বোর্ডিঙে থেকে পড়তাম। মাসে মাসে টাকা আসে। ফুর্তি কত? বইখানার নাম চিত্রাঙ্গদা—সেই যে অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা পড়েননি?

নকুড় কহিলেন—পড়িনি আবার, কতবার পড়েছি। বলো যে মহাভারত। আজকাল সেই মহাভারত বিকুচ্ছে এগারো সিকেয়।

পশুপতি কহিল—মহাভারত নয়, তাহলে বুঝতাম বই পড়ে পরকালের কিছু কাজ হবে। এমনি একখানা পদ্যের বই, পাতায় পাতায় ছবি। রাতদিনই তাই পড়ে পড়ে মুখস্থ করতাম। এখন একটা লাইনও মনে নেই।

পশুপতির নির্বুদ্ধিতার গল্প শুনিয়া নকুড় আর কথা বলিতে পারিলেন না। মহাভারত রামায়ণ নয়, মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের অনুমোদিত স্কুল বা কলেজ-পাঠ্য বই নয়, এমন বই লোকে পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়া পড়ে।

সেই সব দিনের অবিবেচনার কথা ভাবিয়া পশুপতির অনুতাপ হইতেছিল। বলিল—তাও কি বইটা আছে? জানা নেই, শোনা নেই—পরস্পর একটা মেয়ে—নির্বিচারে দামী বইটা তার হাতে তুলে দিলাম। কী বোকাই যে ছিলাম তখন! ও—আপনি তো এসে পড়েছেন একেবারে—আচ্ছা!

নকুড় বামদিকের বাঁশতলার সরু পথে নামিয়া পড়িলেন। সামনেই তাঁহার বাড়ি। কহিলেন—কাল আবার দেখা হবে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যাও পশুবাবু, চারদিকে থমথমা থেয়ে আছে, বিষ্টি নামবে এক্ষুনি।

তখন সত্য সত্যই চারিদিক নিষ্কম্প, বাতাস আদৌ নাই, গাছের পাতাটি নড়িতেছে না। মাথার উপরে অতি ব্যস্ত আকাশ মেঘের উপর মেঘ সাজাইয়া নিঃশব্দে আয়োজন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

আজ পাঁচ টাকার মধ্যে সমস্ত পূজার বাজার সারিতে হইতেছে, আর বহু বৎসর পূর্বে একদিন ওই দামের একখানি নূতন বই নিতান্ত সখ করিয়া বিসর্জন দিয়াছিল, মনে একবিন্দু ক্ষোভ হয় নাই—চলিতে চলিতে কতকাল পরে পশুপতির সেই কথা মনে হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সে বাড়ি ফিরিতেছিল, অন্তরভরা আশা ও উল্লাস, হাতে চিত্রাঙ্গদা।

বনগাঁর পর দু-তিনটা স্টেশন ছাড়াইয়া—সে স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নয়—তবু থামিল। ইঞ্জিনের কোথায় কি কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। যাত্রীরা অনেকে নামিয়া পড়িল।

প্ল্যাটফর্মের উপরে দক্ষিণ দিকটায় জোড়া পাকুড় গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার গোড়ায় স্টেশনের মরিচা-ধরা ওজনের কলটি। পাকুড় গাছের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দিব্য পা ছড়াইয়া কলটির ওপর বসিয়া পশুপতি চিত্রাঙ্গদা খুলিয়া পড়িতে বসিল। লাইনের ওপারে অনেক দূরে সূর্য অস্ত যায়। কুয়ায় কলসী ভরিয়া আল-পথে গ্রামে ফিরিতে ফিরতে বৌ-ঝিরা তাকাইয়া তাকাইয়া রেলগাড়ি দেখিতেছিল।

পশুপতি একমনে পড়িয়া চলিয়াছে। ঠিক মনে নাই, বোধ করি অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রথম পরিচয়ের মুখটা—খাসা জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় সে অনুভব করিল, জোড়া গাছের পিছনে কেহ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে চিত্রাঙ্গদা আসিবার তো সম্ভাবনা নাই। পশুপতি ভাবিল, হয় পানিপাঁড়ে কি পয়েণ্টস্‌ম্যান, নয় তো ছাগলে গাছের পাতা খাইতে আসিয়াছে। অতএব

না ফিরিয়া পাতা উল্টাইতে যাইতেছে, এমন সময় কাঁচের চুড়ি বাজিয়া উঠিল।

তাকাইয়া দেখে, বছর আষ্টেকের একটি মেয়ে, মুখখানার চারিপাশে কালো কালো চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইল, মেয়েটির বড়ো বড়ো চোখ দুটির উপর লেখা রহিয়াছে, সে ওই পাতার ছবিগুলি ভালো করিয়া দেখিবে। আপিস-ঘরে টেলিগ্রাফের কল টক্ টক্ করিয়া বাজিয়া যাইতেছিল এবং লাইনের উপরে ইঞ্জিন একটানা শব্দ করিতেছিল—ইস্ স্ স্। আজ পশুপতি ভাবিতেছে, সে সব নিছক পাগলামি, সেদিন কিন্তু সত্য সত্যই তাহার মনের মধ্যে এরূপ একটা ভাবাবেগ জমিয়া আসিয়াছিল যেন সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ডও তাহার গতিবেগ থামাইয়া ম্লান অপরাহ্ণ আলোয় মেয়েটির লুব্ধ ভীরু চোখ দুটিকে সমীহ করিয়া প্ল্যাটফর্মের ধারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল—খুকী, ছবি দেখবে? দেখো না কেমন খাসা খাসা সব ছবি।

অনুরোধের অপেক্ষামাত্র। তৎক্ষণাৎ মেয়েটি সেই মরিচা-ধরা ওজন-যন্ত্রের উপর বিনাদ্বিধায় পশুপতির পাশে বসিয়া পড়িল।

পশুপতি ছবির মানে বলিয়া দিতেছিল, সে নিজেও পশুপতির পাণ্ডিত্যের মর্যাদা না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বানান করিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় ঘণ্টা দিল। ইঞ্জিন ঠিক হইয়াছে—এইবার ছাড়িবে। পশুপতির মনে হইল, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করিয়া ইঞ্জিন ঠিক হইয়া গেল। মেয়েটির মুখখানিও হঠাৎ কেমন হইয়া গেল—তাহার ছবি দেখা তখনও শেষ হয় নাই সে কথা মোটে না ভাবিয়া রেলগাড়ি তার সুদীর্ঘ জঠরে ছবির বই-সমেত মানুষটি লইয়া এখনি গুড় গুড় করিয়া বিলের মধ্যে দৌড়াইবে—বোধকরি এইরূপ ভাবনায়। বইখানি মুড়িয়া নিজেই সে পশুপতির হাতে দিল, কোনো কথা বলিল না।

পশুপতি সেই সময় করিয়া বসিল প্রকাণ্ড বে-হিসাবী কাজ। সেই চিত্রাঙ্গদা তাহার ডুরে শাড়ির উপর রাখিয়া বলিল—এই বই তুমি রেখে দাও—ছবি দেখো আর বড়ো হলে পড়ে দেখো। নূতন বই—প্রায় আনকোরা, পাঁচ টাকা দিয়া কিনিয়াছিল। কেবল নিজের নামটি ছাড়া কালির আঁচড় পড়ে নাই। কাহাকে দিল তাহার পরিচয়ও জানে না—হয়তো কোনো রেলবাবুর

মেয়ে কিংবা যাত্রীদের কেহ অথবা নিকটবর্তী গ্রামবাসিনীও হইতে পারে।

* * *

রামোত্তম রায়ের বাড়ি রাস্তার ঠিক পাশেই। রোয়াকে উঠিয়া পশুপতি ডাকিল —ও ননী, এক গ্লাস জল দিয়ে যাও তো বাবা।

ননী জল দিয়া গেল। তাকের উপরে কাগজের ঠোঙায় একপয়সার করিয়া বাতাসা কেনা থাকে। তাহার দুইখানি গালের মধ্যে ফেলিয়া ঢক ঢক করিয়া সমস্ত জল খাইয়া পরম পরিতৃপ্তিতে কহিল—আঃ—

ইহাই নিত্যকার বৈকালিক জলযোগ।

তারপর এক ছিলিম তামাক খাইয়া চোখ বুজিয়া সে অনেকক্ষণ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিল ; সঙ্গে সঙ্গে বাতাস। রোয়াকের গোড়া হইতে একেবারে বড়ো রাস্তা অবধি উঠানের উপর দুই সারি সুপারি গাছ। গাছগুলি যেন মাথা ভাঙাভাঙি করিয়া মরিতেছে। জল গড়াইয়া উঠান ভাসাইয়া কলকল শব্দে রাস্তার নর্দমায় গিয়া পড়িতে লাগিল। কি মনে করিয়া পশুপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জামার পকেট হইতে কমলের পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমে চারিদিক আরও আঁধার করিয়া আসিল, আর নজর চলে না।

রাস্তার ঠিক ওপার হইতে ধানভরা সবুজ সুবিস্তীর্ণ বিলের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরপারে অতি অস্পষ্ট খেজুর ও নারিকেল বন। সেইদিকে চাহিয়া পশুপতির মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ঐ নারিকেল গাছের ছায়ায় গ্রামের মধ্যে চাষীদের ঘরবাড়ি। বৃষ্টি ও অন্ধকারে বাড়ি দেখা যাইতেছে না, অতি ক্ষীণ এক একটা আলো কেবল নজরে পড়ে। গ্রামটি ছাড়াইলে তারপর হয়তো আবার বিল। এমনি কত গ্রাম, কত খাল-বিল কত বাঁয়োবেঁকি, কচি পাতা ও নাম-না-জানা বড়ো বড়ো গাঙ পার হইয়া শেষকালে আসিবে তাহার গ্রামের পাশের পশর নদী। ভাঁটা সরিয়া গেলে আজকাল চরের উপর বাঁধের ধারে ধারে শরতের মেঘভাঙা রৌদ্রে সেখানে বড়ো বড়ো কুমীর শুইয়া থাকে। বাবলা গাছে হলদে-পাখি ডাকে। কমল মিহি সুরে অবিকল পাখির ডাকের নকল করিতে পারে—বউ সরষে কোট, বউ—এমন দুষ্ট হইয়াছে কমলটা!

তাহাদের গ্রামের ঘাটে স্টীমার আসিয়া লাগে সন্ধ্যার পর। ঘাটের কাছেই বাড়ি, অন্ধকার সাবেককালের আম-বাগান এবং নাটা ও বেতের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়া সরু পথ। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকার মতো একটি অতিশয় ছোট্ট আলো দূরে—বহুদূরে—পশুপতির স্তিমিত দৃষ্টির অগ্রে ঐ যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আলো ছোট হইলে কি হয়, পশুপতি স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আচ্ছা, তাহাদের গ্রামেও কি এইরকম ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে? এই রকম অন্ধকার আকাশ, মেঘের ডাক? হয়তো এসব কিছুই নয়। হয়তো সে দেশে এখন আকাশভরা তারা এবং প্রভাসিনী এতক্ষণ রান্নার জোগাড় করিতে আলো লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিতেছে। আর চারদিন পরে পশুপতি সেই অপূর্ব শীতল ছায়াচ্ছন্ন উঠানে গিয়া দাঁড়াইবে। খোকা?—সোনা মানিক। খোকন তখন কি করিতেছে? পড়িতেছে বোধহয়—

পশুপতি ভাবিতে লাগিল, সে যেন পশর নদীর পারে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া উঠিয়াছে; কমল শোবার ঘরে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্ত করিতেছিল, বাপের সাড়া পাইয়া উঠানের উপর দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিল। এমন ছুটিতেছে বুঝি বা সে পড়িয়া যায়। আস্তে আয়, ওরে পাগলা একটু দেখে শুনে —অন্ধকারে হোঁচট্ খাবি, অত দৌড়ুসনি—

ঘনান্ধকার দুর্যোগের মধ্যে বহুদূর হইতে কমল আসিয়া যেন দুই হাত উঁচু করিয়া ন্যুব্জদেহ অকালবৃদ্ধ স্কুল মাস্টারের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।......

রামোত্তম এতক্ষণ কাছারি-ঘরে কি কাজকর্ম করিতেছিলেন। এইবার বাড়ির মধ্যে চলিলেন। পশুপতিকে বলিলেন—মাস্টার মশায়, আপনিও চলুন—বাদলা রাত্তিরে সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়ুন আর কি। এই বৃষ্টিতে আপনার ছাত্তোর আর আসবে না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পশুপতি সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। আলো নিবাইয়া দিল।

শুইয়া শুইয়া শুনিতে লাগিল, ঝড় দালানের দেওয়ালে যেন উন্মত্ত ঐরাবতের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে, রুদ্ধ দরজা-জানলা খড় খড় করিয়া ঝাঁকাইতেছে, আকাশ চিরিয়া মেঘের ডাক, ছাদের নল হইতে ছড়ছড় করিয়া জল পড়ার শব্দ......সমস্ত মিলিয়া ঝটিকাক্ষুব্ধ নিশীথিনীর একটানা অস্পষ্ট চাপা আর্তনাদের মতো শোনাইতেছে।

পশুপতি আরাম করিয়া কাঁথা টানিয়া গায়ে দিল।

সেই অবিরল বাতাস ও বৃষ্টিধ্বনির মধ্যে পশুপতি শুনিতে লাগিল, গুনগুন গুনগুন করিয়া কমল পড়া মুখস্থ করিতেছে। কিন্তু কণ্ঠ কখনও উচ্চে উঠিতেছে, কখনও ক্ষীণ, ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া সুরের রেশটুকু মাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেছে। তন্দ্রাঘোরে আঁধার আম-বাগানের মধ্যে দিয়া বাড়িমুখো যাইতে যাইতে সে শুনিতে লাগিল। মনে হইল, ঘরের দাওয়ায় কাঁখের পুঁটলি নামাইয়া সে যেন ডাকিতেছে—কই গো কোথায় সব ?

খোকা আসিয়া সর্বাগ্রে পুঁটুলি লইয়া খুলিয়া ফেলিল। জিনিসপত্র একটা একটা করিয়া সরাইয়া রাখিতেছে, কি খুঁজিতেছে পশুপতি তাহা জানে। ম্লান মুখে কমল প্রশ্ন করিল—বাবা, আমার ছবির বই ?

পশুপতি উত্তর দিল—সোনা মানিক আমার, বই তো আনতে পারিনি। না না, আনলে আনতে পারতাম, ইচ্ছে করেই আনিনি। অপব্যয় করতে নেই। বুঝলি খোকা, পয়সাকড়ি খুব বুঝেসুঝে খরচ করতে হয়। তাহলে পরে আর দুঃখ পাবিনে।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া বসিল। অবোধ বালকের অভিমানাহত মুখখানির স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কতক্ষণ পরে পশু মাস্টার ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। প্রাণপণ বলে বারংবার কে যেন দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। ঝড়ের বেগ আরও বাড়িয়াছে বুঝি। এ কী প্রলয়ংকর কাণ্ড, দরজা সত্য সত্যই চুরমার করিয়া ফেলিবে না কি ?

অন্ধকার ঘর। পশুপতির বোধ হইল, বাহির হইতে কে যেন ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইতেছে—দুয়োর খুলুন—দুয়োর খুলুন—

তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নাই। তাহার সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। ঝটিকা-মথিত দুর্যোগ আঁধার বর্ষা-নিশীথ। নির্জন সুখসুপ্ত গ্রামের একপাশে, দিগন্ত-বিসারী বিলের প্রান্তে রামোত্তম রায়ের বাহির বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া কে অমন আর্তকণ্ঠে বারংবার দরজা খুলিয়া দিতে বলে।

শিকলের ঝনঝনানি অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। নিশ্চয়ই মানুষ! পশুপতি উঠিয়া খিল খুলিয়া দিতেই কবাট দুইখানি দড়াম করিয়া দেওয়ালে লাগিল এবং ঝড়ের বেগেই যেন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল একটি পুরুষ, পিছনে এক নারী।

মেয়েটির হাতের চুড়ি ঝিন-ঝিন করিয়া ঈষৎ বাজিয়া উঠিল এবং কাপড়-চোপড় হইতে অতি কোমল মৃদু সুগন্ধ আসিয়া পশুপতি মাস্টারের ঘর ভরিয়া গেল।

পুরুষ লোকটি আগাইয়া আসিতে গিয়া তক্তপোশে ঘা খাইল। পশুপতি কহিল,—দাঁড়ান আলো জ্বালি।

হ্যারিকেন জ্বালিয়া দেখে স্বাস্থ্য ও যৌবন-লাবণ্যে দুজনেই ঝলমল করিতেছে। মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসে নাই, চৌকাঠের ওধারে ছাদের নলের নিচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরম শান্তভাবে ভিজিতেছিল, মুখভরা হাসি। দেখিয়া যুবক ব্যস্ত হইয়া কহিল—অ্যাঁ, ও কি হচ্ছে লীলা, একি পাগলামি তোমার? ইচ্ছে করে ভিজছ দুপুর রাত্রে?

সেখান হইতে সরিয়া বধূ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক আরও চটিয়া কহিল—বড্ড স্ফূর্তি না? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, আমি যত মানা করি তুমি মজা পেয়ে যাও যেন।

আঙুল তুলিয়া লীলা চুপি-চুপি তর্জন করিয়া কহিল—চুপ! তারপর ভিতরে ঢুকিল। ফিস ফিস করিয়া কহিল—বাবারে বাবা, তোমার শাসনের জ্বালায় যাই কোথায়? সেই তো কাপড় ছাড়তে হবে, তা একটুখানি নেয়ে নিলাম—বলিয়া আঁচল তুলিয়া মুখে দিল, বোধ করি তাহার হাসি পশুপতি দেখিতে পায় সেইজন্য।

থাকগে—আর একটা কথাও বলব না, মরে গেলেও না—বলিয়া যুবক গুম হইয়া রইল। পরক্ষণে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ডাকিল—তুই কতক্ষণ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে ভিজবি, এখানে এনে রাখ্।

উহাদের চাকর এতক্ষণ বাক্স মাথায় করিয়া রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়াছিল, ঘরের মধ্যে আসিয়া বাক্স নামাইয়া দিল।

যুবক কহিল, যদি ইচ্ছে হয় তবে দয়া করে বাক্সটা খুলে শিগগির ভিজে কাপড়চোপড়গুলো বদলানো হোক, আর ইচ্ছে যদি না হয় তবে এক্ষুনি ফিরে মোটরে যাওয়া যাক। আমি আর কাউকে কিছু বলছিনে।

মেয়েটির হাসিমুখ আঁধার হইল, হেঁট হইয়া বাক্স খুলিতে লাগিল।

কাণ্ড দেখিয়া পশুপতি একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এত রাত্রে এই তরুণ দম্পতি কোথা হইতে আসিল এবং আসিয়া নিঃসংকোচে পশুপতির ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই অমনি রাগারাগি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ

ইহাদের মধ্যে কথা বলিবার ফাঁকই পাইতেছিল না, এইবার বলিল—আপনারা তবে কাপড় ছাড়ুন, আমি লোকটাকে নিয়ে কাছারি-ঘরে বসিগে।

যুবক যেন এইমাত্র পশুপতিকে দেখিতে পাইল। কহিল—কাপড়টা ছেড়ে আমিও যাচ্ছি। বড্ড কষ্ট দিলাম আপনাকে।...আমি এ বাড়িতে আরও অনেকবার এসেছি, রামোত্তমবাবু আমার পিসেমশাই হন। আপনাকে এর আগে দেখিনি। একটু আলাপ-টালাপ করব—তা মশাই কাণ্ডটা দেখলেন তো? সেদিন অসুখ থেকে উঠেছে, কচি খুকী নয়—একটু যদি বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে! একেবারে আস্তো পাগল।

লীলা মুখ রাঙা করিয়া একবার স্বামীর দিকে তাকাইল। তারপর রাগ করিয়া খুব জোরে জোরে ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়চোপড় নামাইয়া ছড়াইয়া মেঝেয় রাখিতে লাগিল। কাপড়ের সঙ্গে আতরের শিশি ঠক করিয়া পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল।

পশুপতি ও চাকরটি ততক্ষণ কাছারি-ঘরে গিয়া বসিয়াছে।

যুবক কহিল—গেছে তো? তক্ষুনি জানি। আস্তো শিশিটা—এক ফোঁটাও খরচ হয়নি।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে লীলা কহিল—আর বোকো না; তোমার আতর আমি কিনে দেব—কালই। তারপর কথা যেন কান্নায় ভিজিয়া আসিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল—অজানা জায়গায় এসে লোকজনের সামনে কেবলি বকাবকি—কেন?—কিসের এত? আমি বৃষ্টি লাগাব, খুব করব, অসুখ করে যাই মরে যাব—তোমার কি?

পাশাপাশি দুটি ঘর। কলহের প্রতি কথাটি পশুপতির কানে যাইতেছিল।

স্বামী উত্তর করিল—আমার আর কি—আমি তো আর কারও কেউ নই। ঘাট হয়েছে—আর কোনোদিন কিছু বলব না।

কিছুক্ষণ আর কথাবার্তা নাই। খুটখাট আওয়াজ, বাক্সের ভিতরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হইতেছে।

লীলা বলিতে লাগিল—মোটরের হুড উড়িয়ে যে ভিজিয়ে দিয়ে গেল তাতে কিছু দোষ হয় না, আর আমি একটুখানি বাইরে দাঁড়িয়েছি অমনি কত কথা—আস্তো পাগল—হেনো-তেনো—কেন, কি জন্যে বলবে?

অন্যপক্ষের সাড়া নাই।

পুনরায় বধূর কণ্ঠস্বর—ভিজতে আমার বড্ডো ভালো লাগে। ছেলেবেলায় এই

নিয়ে মার কাছে কত বকুনি খেয়েছি। তা বকবে যদি তুমি আমায় আড়ালে বকলে না কেন? অজানা অচেনা কোথাকার কে-একজন তার সামনে…ওগো, তুমি কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

স্বামী বলিল—না, বলব না তো। কেউ মরলে আমার কিছু আসে যায় না যখন—বেশ তো—আমি যখন পর—

বধূ কহিল—কতদিন তো সাবধান হয়ে আছি। ছড়ছড় করে জল পড়ছে দেখে আজকে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হল—। আমি আর করব না—কোনো দিনও না। ওগো, তুমি আমায় মাপ করো—সত্যি—করব না।

স্বামীর কণ্ঠ অভিমানে কাঁপিতে লাগিল, বলিল—কথায় কথায় তুমি মরতে চাও—কেন? কি জন্যে? আমি কি করেছি তোমার?

বধূ কহিল—না, মরব না।

—দিব্যি করো গা ছুঁয়ে যে কক্ষনো না—কোনোদিনও না—

স্বামীকে খুশি করিতে বধূ দিব্য করিল, সে কোনোদিন মরিবে না।

আরও খানিকক্ষণ পরে যুবক কাছারি-ঘরে ঢুকিল। পশুপতি কহিল—হয়ে গেছে? এবার চলুন বাড়ির মধ্যে, আমি আলো দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

যুবক কহিল—আজ্ঞে না। এক্ষুনি চলে যাব। সকালে পিসেমশাইকে বলবেন, জাগুলগাছির সুরেশ এসেছিল। থাকলাম না বলে চটে যাবেন—

পশুপতি বলিল—তবে আর কি। আত্মীয়ের বাড়ি এসে পড়েছেন যখন দয়া করে—

সুরেশ বলিল—দয়া করে নয় মশায়, দায়ে পড়ে। ফাল্গুন মাসে ওঁর টাইফয়েড হয়, একত্রিশ দিন যমে-মানুষে টানাটানি করে কোনো গতিকে প্রাণটুকু নিয়ে চেঞ্জে পালিয়েছিলাম। সেই গেছলাম আর আজ এই ফিরছি। স্টেশনে নেমে বৃষ্টি-বাদলা দেখে বললাম—কাজ নেই লীলা, রাতটুকু ওয়েটিং-রুমে কাটানো যাক। তা একেবারে নাছোড়বান্দা—বলে, মোটরে হুড দেওয়া রয়েছে—এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না, ঝড় বাতাসের মধ্যে ছুটতে খুব আমোদ লাগে। শুনেছেন কখনও মশায়, ভূ-ভারিতে এমন ধারা? এদেশের ট্যাক্সি—ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে বাতাসে হুড গেল উল্টে। ভিজে একেবারে জবজবে। এখানে উঠতে কি চায়? ভিজে কাপড় বদলাতে একরকম জেদ করে নিয়ে এলাম।

পশুপতি কহিল—বেশ তো, ওঁদের সঙ্গে দেখাটেখা করে অন্তত রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাবেন।

সুরেশ বলিল—বলছেন কাকে? ওদিকে একেবারে তৈরি। এরই মধ্যে দু-দু-বার দরজার উপর ঠকঠক হয়ে গেছে—শোনেননি? বিষ্টি বোধহয় ধরে গেল এইবার। আচ্ছা নমস্কার, খুব বিব্রত করে গেলাম—

তরুণ-তরুণী পাশাপাশি গুঞ্জন করিতে করিতে এবং তাহাদের পিছনে চাকরটি ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করিয়া রাস্তার উপরের মোটরে গিয়া উঠিল।

তারপর সেই রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি পশুপতি মাস্টার আর ঘুমাইতে পারিল না। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তারা উঠিয়াছে, আকাশ পরিষ্কার রমণীয়। শিশি ভাঙিয়া ঘরময় আতর ছড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার উগ্র মধুর মাদক সুবাসে পশুপতির মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজনা বাজিতে লাগিল। এই ঘর তৈয়ারী হইবার পর বরাবর চুন-সুরকিই পড়িয়াছিল, এই প্রথম আতর পড়িয়াছে এবং বোধ করি দুর্যোগের রাত্রে বিপন্ন তরুণ-দম্পতি কয়েক মুহূর্তের জন্য আসিয়া আতরের সহিত তাহাদের কলহের গুঞ্জন রাখিয়া গিয়াছে।

হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া পশুপতি প্রভাসিনীর চিঠিখানি গভীর মনোযোগের সহিত আর একবার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে সমস্ত অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। একটা সোহাগের কথা নাই, অথচ সমস্ত চিঠি ভরিয়া সংসারের প্রতি ও তাহাদের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা ছড়ানো রহিয়াছে। কোনো দিন সে এসব ভাবিয়া দেখে নাই।

জানালা খুলিয়া দিয়া অনেকক্ষণ একাগ্রে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে পশুপতির মন চলিয়া গেল আবার সেই বহুদূরবর্তী পশর নদীর পারে তাহার নিজের বাড়িতে…এবং সেখান হইতে চলিয়া গেল আরও দূরে, প্রায় বিশ বছরের ওপারে বিস্মৃতির দেশে—যেদিন প্রভাসিনীকে বিবাহ করিয়া গ্রামে ঢুকিয়া সর্বপ্রথমে ঠাকরুণতলায় জোড়ে প্রণাম করিয়াছিল… তারপর কত নির্জন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মধুর স্মৃতি—ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালে চুরি করিয়া চোখাচোখি—সুপ্তিমগ্ন জ্যোৎস্না রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া কাটানো—ভোর হইলে বউকে তুলিয়া দিয়া নিজে আবার পাশ ফিরিয়া শোওয়া…

এখন আর সে-সব কথা কিছু মনে পড়ে না, পৃথিবীতে কিন্তু তেমনি দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রি আসিয়া থাকে; পৃথিবীর লোকে গান গায়, কবিতা পড়ে, প্রেয়সীর কানে ভালবাসার কথা গুঞ্জন করে, আকাশে নক্ষত্র অচঞ্চল দীপ্তিতে ফুটিয়া থাকে, তারার আলোকে নারিকেল পাতা ঝিলমিল করিয়া দোলে। পশুপতি

সে-সময় সংসারের অনটনের কথা ভাবে, জ্যামিতির আঁক কষে, নয়তো ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে জানালা আঁটিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অকস্মাৎ তাহার বোধ হইল, চিত্রাঙ্গদার ভুলিয়া যাওয়া লাইনগুলি তাহার মনে পড়িতেছে। ছেলেমানুষের মতো মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া সে গুনগুন করিতে লাগিল। এখনও ঠিক মনে পড়ে নাই···মনে হইল, এমনি করিয়া রাত্রি জাগিয়া আরো বহুক্ষণ অবধি যদি সে বসিয়া ভাবিতে পারে সমস্ত কবিতাগুলি তাহার মনে পড়িয়া যাইবে।

তারপর হঠাৎ একটি অদ্ভুত রকমের বিশ্বাস তাহার মনে চাপিয়া বসিল। বহুকাল আগে একদিন স্টেশনে যে-মেয়েটির হাতে সচিত্র চিত্রাঙ্গদা তুলিয়া দিয়াছিল, সে-ই আজ আসিয়াছিল—এই বধূটি···লীলা, এই যেন সেই মুখ। ইহা যে কত অসম্ভব, সেই মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে এতদিনে নিশ্চিত তার যৌবন পার হইয়া গিয়াছে, এসব কথা পশুপতি একবারও ভাবিতে পারিল না। বারংবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ট্রাঙ্কে এই বধূটির কাপড়চোপড় ছিল, আতর ছিল, সকলের নিচে ছিল সেই চিত্রাঙ্গদা—পাঁচ টাকা দামের। লীলা আতরের শিশি ভাঙিয়াছে, কে জানে হয়তো চিত্রাঙ্গদাও এই ঘরের মেঝেয় ফেলিয়া গিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে এখনি পাওয়া যাইবে—কিংবা থাকগে এখন খোঁজাখুঁজি, কাল সকালে···

পরদিন পশুপতির ঘুম ভাঙিতে বেলা হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখে ইতিমধ্যে ননী আসিয়াছে। বেঞ্চের উপর বসিয়া চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া সে ফার্স্ট বুকের পড়া তৈরি করিতেছে—

> One night when the wind was high a small bird flew into my room······

একদিন রাত্রিবেলা যখন বাতাস প্রবল হইয়াছিল, একটি ছোট পাখি আমার ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসিয়াছিল···

শুনিতে শুনিতে পশুপতি আবার চোখ বুজিল। ঘরের মধ্যে উড়িয়া-আসা ছোট্ট একটি পাখির কল্পনা করিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, রোদ উঠিয়া গিয়াছে, পাখির ভাবনা ভাবিবার সময় আর নাই। এখনই হয়তো রামোত্তম ছেলের পড়ার তদারক করিতে আসিবেন। উঠিয়া বসিয়া হুংকার দিল—বানান করে করে পড়—

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২—) ॥ অতি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কখনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নিচু রাস্তায় বাসখানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট-দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত! আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলোজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়াইয়া, ঝুলিয়া এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলি। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহযাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার সিকি, কাহারো দু-আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দুখানা এত পুষ্ট অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কিনা মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠামো সুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি। ধাক্কা না দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি? —পথের পাশেই গভীর নালা। বোধকরি কেহই বাঁচিত না। মুখ তুলিতেই

বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কী সর্বনাশ! কোম্পানি তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—নো চান্স! যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোনো রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয় 'No change'—অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধহয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর-ব্যূহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুঁতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনই চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত, আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নিচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধকরি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয় বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ি, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্রস্তর খণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরত করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাংলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্য মসৃণ দুখানি বাহু ক্রমশ-সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা।

ওঃ, তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু একি। মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোনো অলংকার নাই কেন? বাংলাদেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরিবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোশাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, দু-একখানা সোনার অলংকার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দুখানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলংকার না পায় এমন মেয়ে বাংলাদেশে বিরল, ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোনো অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, অলংকারগুলা কোনো আসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে এমন কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলই মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলংকারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ স্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মানিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয় স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড়ো কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মানিবাসের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলংকারের ইতিহাস বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলংকারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলংকারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু আসন্ন অস্ত আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্রসহায় অনন্য অলংকার সেই শূন্য মণিবন্ধ, কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দুটি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল

কোথায় ? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন ? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে ? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে ! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্প-সামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরি করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কখনো তারা ভিড়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশ-পথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথে 'ক্যাম্পফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য ; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতার নাম একসঙ্গে করলাম বটে, এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেননি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক ; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে দুইয়ের মিলন ; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিঁড়ে মিলিত দুই আবার হয়ে যায়—এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ পুরুষ আধ ; বিবাহের হোমানলে দুই আধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না ;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে !

অমিত-শমিতার বিবাহ হল। কিন্তু অমনিতে হয়নি। প্রজাপতি অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে

তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা ; একালের বোতল বললো, দেখোই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপস হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটা একবার খোঁজ খবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেন্দুবাবুর গ্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষে। তারিণীচরণের চিঠি এল—শমিতারা জাতের এক আধ ধাপে নিচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার মতো—কারণ গুটিতে স্বর্ণসূত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌঁছবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না, বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্যে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফর্মাল প্রটেস্ট' জানালেন, অথচ তার ভাষা এমন হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অনুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হল, যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈতপাঠে পরিণত হল। মেয়েদের সময় ধার্য হল সকালে ; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারোটার কাছ ঘেঁষে রইল একটা দেখা-শোনার দিগন্ত।

অমিত শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈতসাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এল এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না। বাস্তব থেকে উৎপাটিত-মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ুজীবীরূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইল—কলেজের গণ্ডি পার হতে পারলে আবার শিক্ষা জগতের পরলোক অর্থাৎ পোস্ট গ্রাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে। সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হলও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমান্তেই তাদের সম্বন্ধে

প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখত প্রেমের একান্তে একগুচ্ছ মেয়ে —সকলকে একসঙ্গে চোখে পড়ত অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়ত না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্রপরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখিটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখিটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের 'ফেল করা' ছাত্র! তারপরে অমিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভব করল। মাঝে মনে হত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ওদিকটা শূন্য —সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তখন তাকে রহস্যে বলে দিত যে, অমিত একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাস, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ—বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডোরে শমিতাকে দেখতে পেল। চমকে উঠল, সে যেন এক আবিষ্কার।—আমেরিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেন চমকে উঠেছিলেন! অমিতের মনে হল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হল না। তার পর দিন ক্লাসে শমিতা এল, অমিতের মনে হল—ক্লাস যে শুধু হৃদ্য হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হল। এতদিনে সে জনতা ভেদ করে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেল। এবারে সে অস্ত্রপরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হল।

তারপরে এল তারা পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগল তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই বা কি হত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়। বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোনো প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেত, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু

স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে। সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মার মূল্য এখন শূন্য। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন করে কিভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি বলেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুশিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তাঁর কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটল। অমিত সামান্য একটা চাকুরি পেল আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা শুরু করল—কখনো বা দুঃখের কালো পাথার ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসির অজস্রতায় আর কখনো বা পঙ্কিল আবর্তনের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইল না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তার পত্র এল। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীন কালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃ-স্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দুবাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

চিঠি পড়ে শমিতা বলল—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বলল—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি। সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ যোগাড় করে নিলে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে

পাঠাতে লাগল। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোনোদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হল।
শমিতা বলে—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, ঐ টাকা থেকে পাঠালে চলবে।
অমিত বলে—ও টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।
অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুশি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও দিতে পারত, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখল। একটা না একটা উপলক্ষ করে তিনি টাকার দাবি চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগল। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণসূত্রে টান দিচ্ছেন আর হাসছেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ করে নিজে পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

০০ দুই ০০

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কিনা ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।
সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত আপিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়াল। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না!
অমিত বললে,—কিন্তু চাকরি না করলে চলবে কি করে?
শমিতা বললো,—তুমি চলে গেলে আমার চলে কি সুখ?
শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথাকোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।
তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?
শমিতা শুধু বললো,—সে আমি দেখবো, মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যাগ্রহণ করতে বাধ্য হল; শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন। তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্যেই তো ওর পুরো নাম রাজ-যক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষই একটি ছোটখাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক-জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষ্মাবাস-গুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দুবাবুর উত্তর এল কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তাঁর মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়, ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো বলে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা পড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না।

অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কি না? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি করে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেল, মহা সত্য কথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন করে চলে সে প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিল, তার সঙ্গে মায়ের টাকা যুক্ত হয়ে একরকম করে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে —অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানত ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করল। বলল—শমি, একটা ভালো চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেষ্টা করে দেখো না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছলছল করে উঠল, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন করে তবে ঐ প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখছিল? দেখছিল সকালবেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা পরে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদবিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখল, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না!

অমিত ভাবল, এখন তার বৃথা পৌরুষের গর্ব করে কি হবে? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হয়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বললে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে? আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে কষ্ট সুস্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকরি করা হল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

০০ তিন ০০

এই রকমে সুখে-দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত বসে ছিল না। ঐ অন্ধ রোগ-বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোনো সম্বন্ধ নেই। তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহ-দয়া-মায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধ নিরপেক্ষতায় নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়। নিরন্তর তারা মানুষের ফুসফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌঁছবার নিশ্চিততম

সরলতম একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমতাহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ, মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোনো কালে তাদের মিলিত হবার সম্ভাবনা নেই। তারপরে হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে দুইয়েরই চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হয়ে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরল। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্তি করে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুলল না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হবে। তাছাড়া ভাবল—আর কতদিনই বা। এ-কটা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হল না। ও ভাবলো—এ-কটা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হয়ে থাক। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহংকারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষ্মাবাসে ভর্তি হলে শমিতা রোজ বিকেলে দেখা করতে যায়। অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভালো লাগে না। বুঝতে পারে যে তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মতো বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই কথাটা তুলে বসল—জানো, আমি স্কুলে একটা চাকরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্যেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হয়েছে, তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বললে—এখন তো সারাদিন বসে থাকা, একা একা ভালো লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোনো রকমে ভুলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করল? কি জানি, হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে আসছে তা অমিতের চোখ এড়াতে পারল না। সে দেখছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে দেখত, সবই বুঝত, তবু চুপ করে থাকত, কারণ চুপ করে থাকা ছাড়া আর যা করবে, তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে অনেকক্ষণ ধরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত—সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য—সে প্রার্থনা করত মরবার। শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে। যে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছামৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেদিকে শমিতার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার খেয়াল হল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার করে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখত। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি। আজ হঠাৎ দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমনভাবে বলল—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা, তাতে আবার সন্ধ্যে হয়ে যায়, দিনকাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি ?

অমিত শুধু বলল, ভালোই করেছ। সে রাত্রি অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করল—হে সুখ-দুঃখের দাতা, যে একই সঙ্গে মানুষের বুকে আত্মবিস্মৃত প্রেম আর যক্ষ্মার বীজাণু বিতরণ করে রেখেছে, তোমার কাছে কি প্রার্থনা করতে হয় জানি নে। সে প্রার্থনার কতটুকু তুমি গ্রহণ করো, কতখানি বর্জন করো তাও জানি নে। তবু এ বিশ্বাস আছে, সুখের প্রার্থনার চেয়ে দুঃখের প্রার্থনা তুমি হয়তো দ্রুত হস্তে মঞ্জুর করে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ঐ চুড়ির ক-গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও প্রভু! তারপরে তার মনে হল, এ প্রার্থনা কি তার সুখের নয় ? এ অবস্থায় একমাত্র সুখ যা সম্ভব, তাই তো সে চেয়েছে। সর্বদুঃখের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন ? দুঃখের ছদ্মবেশে এই সুখটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় করে নিতে পারবে ? আর যদি শমির চুড়ি নিঃশেষ হবার পরেও তার জীবনান্ত না ঘটে, তখন কি হবে ? সে শঙ্কিত সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারল না। ঘুমিয়ে পড়ল।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হল না। ঘুম না হওয়া তার নূতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নূতন আনন্দের। সে ঘরে থেকে উল্লাসে পায়চারি করে ফিরতে লাগল—আমি মিথ্যা কথা বলেছি—আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্যে আগেও বলেছে—কিন্তু আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি যদি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকত তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন আনন্দ দ্বিগুণিত হয়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যাভাষণের আনন্দ প্রণয়ের বিদ্যুৎ শিখার মতো তার আসন্ন বৈধব্যের শুভ্রশূন্যতার প্রান্ত বেষ্টন করে চিরায়ুষ্মতীর রঙিন পাড় অঙ্কিত করে দিল।

এর পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুখ-দুঃখের বিধাতা, সুখের চেয়ে দুঃখ

দিতে যিনি অধিকতর তৎপর, তিনি অন্তত একবারের জন্যেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনান্ত ঘটল।

সেদিন শমিতা যখন এল—তার হাতে একখানাও চুড়ি নেই। সেদিন সকালেই শেষ চুড়ি ক-খানা বেচে যক্ষ্মাবাসের আগামী মাসের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুলল। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাস'-এর কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দুজন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘটতে পারত। যাক্, কোনো বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলাম—আর নয়। তখনি চুড়ি ক-গাছা খুলে তুলে রেখে দিলাম, কেমন ভালো করিনি ?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন খসে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিঁদুরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোনো দিকপ্রান্তে রাখল না। এতদিনে শমিতার নব নব মিথ্যাভাষণের শেষ আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসের কর্তৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে—

> শমি,
>
> তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলংকারগুলো। তুমি এম-এ পাস করেছ, কোনো রকমে তোমার চলে যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চললাম।

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি পড়ে ভাবল তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেননি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা বেশি সুখী হত না। হয়তো হত—নিশ্চয় করে কে পরের মনের কথা বলতে পারে!

যুবনাশ্ব (১৯০২—) ॥ কালনেমি
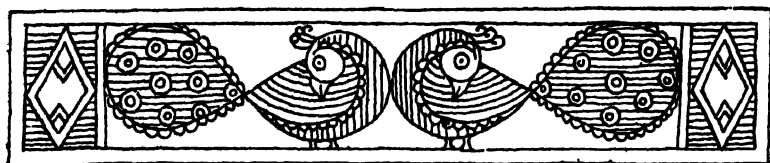
জোয়ান মরদ ডাকু যখন রেলে পা কাটা পড়ে কাজের বার হয়ে গেল, তখন এই এত বড়ো দুনিয়া তাকে বেঁচে থাকবার কোনো পথই বাতলাতে পারল না।

অনেক ঘোরা-ফেরার পর শেষকালে সে সোমত্ত স্ত্রীকে নিয়ে পটলডাঙার ভিখিরিপাড়ায় এসে খুঁটি গাড়ল। সেখানকার বাসিন্দারা স্থান দিতে তাকে কোনো আপত্তিই করল না, কিন্তু ওই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা বরদাস্ত করতে আদপেই রাজী হল না। বললে, থাকবি থাক। কিন্তু ইস্তিরী-ফিস্তিরী ক্যানো বাবা! এখেনে ও-সব চলবে না, মুড়ি মিছরির একদর হেতায়!

শুনে ডাকুর মন এই শেষ আশ্রয়ের ওপরও বিমুখ হয়ে উঠল। বলল, শুনছিস তো ময়না? এরপর—

ময়না বলল, আর কোথায় যাবি তবে? আজ দু-মাস তো সমস্ত পিরতিমী ঘুরে বেড়ালি, ঠাঁই পেলি কোথাও? মাথা গোঁজবার কুঁড়ে যখন মিলেচে একটা তখন আর তোকে টো-টো করে বেড়াতে দিচ্চিনে। আমার কতা? কি করবে ওরা আমার! সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

ডাকু বলল, সব বুঝলাম, কিন্তু শুনলি তো! একে ওরা দলে ভারী, তার ওপর—

—থাম তুই! দলে ভারী! আমার কাটারি থাকতে ওই মড়ার দলকে ভয় করি আমি?

স্ত্রীর শান্ত, অনশনক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে দো-মনা ভাবে ডাকু বলল, থাক তবে। কিন্তু—

—আর কিন্তু করিস্ নে তুই—

তারা থেকে গেল।

কিন্তু তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটুকু অটুট রেখে তারাও তেমনি দলের সাথে মিশে উঠতে পারল না।
মেশবার জন্যে ব্যস্ততাও তাদের বিশেষ ছিল না। ময়না ভোরে উঠে ডাকুকে নিয়ে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসত। তারপর দলের সাথে পথে বেরিয়ে পড়ত। দুপুরে স্বামীকে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে সন্ধ্যের আগেই আবার রেখে আসত। রাত বারোটা-একটায় তাকে নিয়ে এসে দুজনে শুয়ে পড়ত। রোজকার রোজ এমনি কাটত। কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা করবার সুবিধেও তাদের হত না, ইচ্ছেও করত না। নিজেরটা নিয়েই নিজেরা থাকত।
হরিমতীর ঘরের রতনা একদিন সন্ধ্যের সময়ে অনেকের সামনেই ময়নাকে জড়িয়ে ধরেছিল, ও-পাড়ায় এসব নতুন ব্যাপার নয়, হামেশা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক দু-সেকেণ্ড পরে যা ঘটল, তার সাথে পরিচয় কারোই ছিল না। দু-হাতে নাক চেপে ধরে ভুঁয়ে পড়ে রতন গোঙাতে শুরু করল। ময়না কাপড়-চোপড় ঠিক করে গম্ভীরভাবে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।
রসিকতার জের স্বরূপ নাক দিয়ে পোয়াটাক রক্ত বেরিয়ে যাবার পর রতন উঠে বসল।
পটলা বলল, হয়েছিল কি রে? একটা মাগীর হাতে ম্যাড়া বনে গেলি?
কাতরাতে কাতরাতে রতন বলল, এমন আচমকা ঘুষি চালালে মাইরি, তাল রাখতে পারলুম না! আর একেবারে নাকের ঠিক ডগাটায়—উঃ—
একটা বছর আটেকের মেয়ে বলল, থাক থাক—আর কতা কোসনে! অমন ষাঁড়ের মতো মরদ—লজ্জা করে না!
তার দিকে একবার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রতনা বলল, আচ্ছা বাবা, এক মাগে শীত পালায় না, আমিও দেকে নেব! ও শালীর ড্যামাক না ভাঙতে পারি তো—
পটলা বলল, থাক, হয়েচে, একন ঘরে যা তো, নাক যে রক্তারক্তি হয়ে গেছে।
তীব্র দৃষ্টিতে ময়নার ঘরের দিকে তাকিয়ে রতন টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকল।
যে যার গর্তে ডুব মারল।

এর মধ্যে ময়নার এক ছেলে হল। ছেলে নিয়ে সে এমন মেতে উঠল যে,

সবারই কাছে বেজায় বেখাপ্পা ঠেকতে লাগল। দিনরাত যত্ন-আত্তি, নাওয়ানো-খাওয়ানো কত কি? স্বামী স্ত্রী দুজনেই রোজগারে বেরোনো ছেড়ে দিল। পুঁজিপাটা যা ছিল, তাই ভেঙে খাওয়া চলতে লাগল।
খেঁদি-পিসীর দলে যে এটা খাপ খাবে না, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, কোনো সম্পর্কেরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রতি সোমত্ত মেয়েরই ফি বছর ছেলে হত, একটি বছরও কামাই পড়ত না। কিন্তু ওই হওয়া পর্যন্তই। তারপর, সে সব শিশুদের ধর্মের নামে ছেড়ে দেওয়া হত, দেখবার শোনবার কেউই থাকত না। বেশির ভাগই মরত, যারা হঠাৎ বেঁচে যেত তারা আর দশজনের মতো বন্ধনহীন ভাবে বেড়ে উঠত। বাপ-মার ঠিক-ঠিকানা কেউ জানত না, তারা জানত, দলের প্রত্যেকেই যেমন একা, তারাও তেমনি।
মেয়েগুলোকে বয়স হওয়ামাত্র নেবুতলার মতন সব জায়গায় চালান করা হত। দলের এ একটা মস্ত আয়, ছেলেগুলো পকেটকাটা থেকে হাতে খড়ি পেত। এই সেখানকার নিয়ম।

এ-হেন জায়গায় ময়না যখন তার ছেলে নিয়ে ঢলাঢলি শুরু করল, তখন সবায়ের কাছেই সেটা বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা বলে মনে হল।
খেঁদি বললে, ঘেন্না ধরালে। একি ভদ্দরনোকের ঘর নাকি লো? সোমত্ত মাগী, কোতায় দু-পয়সা রোজগারের চেষ্টা দেকবি, তা না, সোয়ামী সোয়ামী করেই গেল! আবার একটা কাঁটা খসেচে তো কি নাগিয়েচে ছাকো না! বলি, তু মরলে ওকি তোর ছেরাদ করবে?
ময়না শুনত সবই, কিন্তু গায়ে মাখত না।
ছেলে মাস দু-আড়াইয়ের হলে তারা আবার রোজগারে বেরোতে শুরু করল।
বুড়ি হরিমতীর ময়নার ওপর একটু টান ছিল, সেই থাকত ছেলের পাহারায়। একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে রাস্তার মোড়ে ডাকুকে রেখে ফিরে আসছে। আস্তানার গেদর ভেতরে পা দিতেই রতন এসে তার পথ আটকে দাঁড়াল।
—কি বাবা, বড়ো যে তেজ ফলিয়েছিলে সে-দিন!
তাড়ির গন্ধে চারিদিক ভরে গেল।
ময়না বলল, পথ ছাড়—

—ফোঁস কেউটের ছা কম নয় তার হাঁ—মাইরি, ছুবলে দিয়ো না যেন! আজও কি ঘুষি চালাবে নাকি—, বলে সে ডাকল, পটলা—

ময়না তাকিয়ে দেখল, সামনের ঘরটা থেকে আরো দুজন নেমে এল। তার ভয় হল। কিন্তু সে ভাব চেপে সে বলল, কি চাস তোরা, শুনি?

—হুঁ বাবা, পতে এসো! গুটি গুটি ওই ঘরটিতে ঢুকে পড়ো তো যাদু, না বেইজ্জত হবার সক আছে?

তীব্র দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে-কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে ময়না বলল, আচ্চা, একটু সবুর কর্‌ না তোরা! ছেলেটাকে ছের্ড়ে এইচি ঢেরখন, এক পাক তাকে দেখেই আমি চলে আসব।

পটলা বলল, যেতে দাও, যেতে দাও, ছেলে দিয়ে কি হবে? ছেলে আর দেকতে হবে না! বেঁচে থাকলে অমন কত ছেলে হবে,—ছেলের দুঃখু কি বাবা!

রতন জড়িত স্বরে ছড়া কাটল—

আমার সাগর-পারের ময়না
শিকলি বাঁধা রয় না!
দেবো চাঁদির গয়না,
যাবার কতা কয় না!

ছিঃ মানিক, অমন কতা কইতে আচে?

ময়না দেখল মহা বিপদ। একমাত্র সম্বল ছুরিখানা, তাও ঘরে রয়েছে। খালি হাতে তিনটে পশুর সাথে লড়া তো সম্ভব নয়।

এ-ধার ও-ধার তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সে ছুট দিল। পটলা দৌড়ে গিয়ে তার কাপড় চেপে ধরল। কাপড় ছেড়ে দিয়ে সে আবার ছুটতে যেতেই রতন গিয়ে তার ওপর চেপে পড়ল।

—ভেল্কি দেখাবার আর ঠাঁই পেলে না ধন! চলো দিকি একন সুড় সুড় করে, কত ভেল্কি জানো ওই ঘরের ভিতর দ্যাকাবে চলো—

ময়না ঝাপটা-ঝাপটি কাকুতি-মিনতি অনেক করল। কিন্তু খিদে আর পশু-লালসা ছাড়া যাদের আর সমস্ত বৃত্তিই মরে গেছে, মিনতিতে তাদের মন ভিজবে কেন?

তিনজনে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। ডাকু পথের ধারে বসে হয়রান হয়ে উঠেছে। ময়নার আসতে এত দেরি তো কোনোদিনই হয় না।

আরো খানিকক্ষণ বসে অস্থির হয়ে শেষে সে লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একাই টিকোতে-টিকোতে আস্তানার দিকে চলল।

সেখানে পৌছেই সে দেখল, মহা হৈ চৈ বেধে গেছে। সামনেই একটা ঘরে অনেক লোক মিলে জটলা করছে। সে আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে দাঁড়াল।

খেঁদি বলেছিল, তা এতে আর দোষের কি হয়েছে বাছা! রতনাকে তো ছুঁড়ীরা পছন্দই করে। তোমার যেমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব!

ময়না এক কোণে এলিয়ে পড়েছিল। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো; চোখ দু-ইঞ্চি বসে গেছে।

খেঁদি বলল, একানে পড়ে থেকে আর কি করবে বাছা, ঘরে যাও। ডাকু কিছু অবুঝ নয়, সে এলে বুঝবে। তাও বলি, যেকানকার যা নিয়ম, তা মানতে হবে তো? পেট চালাবার জন্যে পতেই বেরুতে হচ্চে যকন, তকন কি আর সোয়ামী ইস্তিরী ওসব ভড়ং চলে? ভদ্দরলোকি করতে হলে তার ঠাঁই আলাদা।

ঠিক ধরতে না পারলেও ডাকু মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝল। সে নিঃশব্দে নেমে নিজের ঘরে চলে গেল।

খানিক পরে, ময়না ঘরে আসতেই সে বলল, তু কিছু ভাবিসনে ময়না, দোষ আমারি!

ময়না বলল, তু একটা বিহিত করবিনে! এমনি করে—

দু-হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ডাকু উঠে তার কাছে এগিয়ে এসে বসল। একটু চুপ করে থেকে তাকে বুকে সাপটে ধরে লালসাজড়িতস্বরে বলল, তা হোক গে,—থাকতেই হবে যকন হেতায়, তকন কি হবে ঘাঁটিয়ে!—আয় তুই—

ময়না অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল।

তার মুখে মরমীর দরদের ছাপ একটুও নেই, আছে কেবল তপ্ত ভুখের জ্বালা। মত্ত পশুর মতো দু-চোখ জ্বলছে।

—রতনা তো? আর কেউ ছেল? বলে ডাকু তাকে কোলের ওপর টানতেই সে গা-ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর এক হাতে চোখের জল মুছে আরেক হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

অস্ফুট শুষ্ক গলায় ডাকু বলল, কোতা চললি ময়না?

—রতনার কাছে—

সে চলতে শুরু করল।

যেতে যেতে সে শুনতে পেল ডাকু বলছে, দোহাই তোর, একটি বার আসিস রেতে—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩—) ॥ নুরবানু
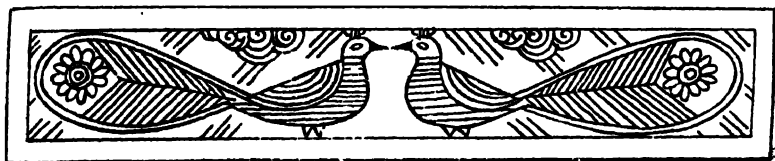
কুরমান হাটে কাঁচের চুড়ি কিনতে এসেছে।

মেজাজ খুব খারাপ। গা এখনো কশ-কশ করছে। তবু এ-দোকান থেকে ও-দোকানে সে ঘোরাঘুরি করে। সোনালী কিনবে না বেগুনী কিনবে চট করে ঠাওর করতে পারে না।

অন্যদিন হাটে এসে তামাক কিনত, লঙ্কা-পেঁয়াজ কিনত, তিত-পুঁটি বা ঘুসো চিংড়ি। আজ তাকে কাঁচের চুড়ি কিনতে হচ্ছে। কিনতে হচ্ছে চুলের ফিতে।

চুড়ির সোয়া তিন আঙুল জোখা। চুড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে-ঢুকিয়ে দেখে কুরমান। জোখা মেলে তো রঙ পছন্দ হয় না, রঙ মনে ধরে তো জোখায় গরমিল।

নুরবানুর কাঁচের চুড়ি সে আজ ভেঙে দিয়ে এসেছে। ফিতে ধরে টানতে গিয়ে খুলে দিয়েছে চুলের খোঁপা। চোট-জখম লেগেছে হয়তো এখানে-ওখানে।

জমি-জায়গা নেই, কর-কবুলত নেই, বর্গায় চাষ করে কুরমান। তাও লাঙল কিনে আনতে হয় পরের থেকে। ধান যা-ও হয়েছিল গত সন, পাখিতে খেয়ে নিয়েছে, খেয়ে নিয়েছে ইঁদুরে। এ বছর গাছ হয়েছে তো শিষ হয়নি। ডোবা জমি, নোনা কাটে না ভালো করে। যা ধান হয়েছে দলামলা করে মনিবের খাস খামারে তুলে দিয়ে আসতে হবে। সে পাবে মোটে তিন ভাগের এক ভাগ।

বড়ো দুর্বল অবস্থা তাদের। না আছে থান না আছে থিত। তাই কুরমানের একার খাটনিতে চলে না। নুরবানুকেও কাজ করতে হয়।

নুরবানু মনিবের বাড়িতে ধান ভানে, পাট গুটোয়, কাঁথা-কাপড় কাচে, জল

টানে। আর মনিব গিন্নীর খেজমত করে। চুল বাছে, গা খোঁটে, তেল মাখে। ভালো-মন্দ খেতে পায় মাঝে-মাঝে। দরমা পায় চার টাকা।
কিন্তু শান্তি নেই। মনিব উকিলদ্দি দফাদার, নুরবানুকে অন্যায় চোখে দেখেছে।
প্রথম দিনেই নালিশ করেছিল নুরবানুঃ 'মুনিব আমাকে অন্যায় চোখে দেখে।'
'কেন কি করে?'
'খুক খুক করে কাশে, বাঁকা চোখে তাকায়, আমোদ-সামোদ করে কথা কয়।'
'তুই ওর ধারাধারি যাসনে কোনোদিন।'
'না, আমি ঘোমটা টেনে চলে যাই দূর দিয়ে।'
কিন্তু দফাদার তাতে ক্ষান্ত হয়নি। একদিন নুরবানুর হাত চেপে ধরল।
সেদিনও কাঁদতে কাঁদতে নুরবানু বললে, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময়ে খামচে দিয়েছে।
রাগে শরীরের রগগুলো টান হয়ে উঠল কুরমানের। বললে, 'তুই সামনে গেছিলি কেন?'
'কে বললে? যাইনি তো সামনে।'
'সামনে যাসনি তো হাত চেপে ধরে কি করে?'
'আমি ছিলাম ঢেঁকি-ঘরে। ও ঘরে ঢুকে বললে, বীজ আছে ক-কাটি? আমি পালিয়ে যাচ্ছি পাছ-দুয়ার দিয়ে, ও খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।'
তবু সেদিনও সে মারেনি নুরবানুকে। নিজের অদৃষ্টকেই দোষ দিয়েছিল। আশ্চর্য গরিবের বউ-এর কি একটু ছুরৎও থাকতে পারবে না? গরিব বলে স্ত্রীর বেলায়ও কি তাদের অনুভব আর উপভোগের মাত্রাটা নামিয়ে আনতে হবে?
'খবরদার, সামনে যাবি না ওর। ওরা জোরমন্ত লোক, থানা-পুলিস সব ওদের হাতে, ওদের অনেকদূর দিয়ে আমাদের হাঁটা চলা। কাজ কাম সেরে ঝপ করে চলে আসবি।'
কিন্তু আজ ওর হাত-ভরা কাঁচের চুড়ি। ফিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনি পাকানো।
হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল নুরবানু, কুরমানের মুখের চেহারা দেখে ঝিম মেরে গেল।

'এসব কোত্থেকে ?'

'মুনিব গিন্নী দিয়েছে।'

কিন্তু জিগগেস করি, পয়সা কার ? এ সাজানোর পেছনে কার চোখের সায় রয়েছে লুকিয়ে ? আজ কাঁচের চুড়ি, কাল আংটি-চুংটি। নোনা জমি এমনি করেই আস্তে আস্তে মিঠেন করে তুলবে। হাত ধরেছিল, ধরবে এবার গলা জড়িয়ে।

'খুলে ফ্যাল শিগগির।' গর্জে উঠল কুরমান।

সাজবার ভারী সখ নুরবানুর। একটু সে হয়তো টাল মাটাল করেছিল, কুরমান হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। পট পট করে ভেঙে গেল কতগুলি। হেঁচকা টান মারল খোঁপায়। একটা কুণ্ডলী-পাকানো সাপ কিলবিল করে উঠল।

ডুকরে কেঁদে উঠল নুরবানু। চুড়ির ধারে জায়গায়-জায়গায় হাত কেটে গিয়েছে। চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত।

ঘরের পুরুষের এমন দুর্দান্ত চেহারা দেখেনি সে আর কোনোদিন। বাবা, ভয় করে। দরকার নেই তার চুড়ি-খাড়ুতে, কিষাণের বউ সে, ঠুঁটো পাথর হয়ে থাকবে। সাধ-আমোদে তার দরকার কি।

কিন্তু একি! হাটের থেকে তার জন্যে চুড়ি নিয়ে এসেছে কুরমান। লঙ্কা-পেঁয়াজ তামাক-টিকে না এনে। লজ্জায় গলে যেতে লাগল নুরবানু।

পাঁচ আঙুলের মুখ একসঙ্গে ছুঁচলো করে চেপে ধরে কুরমান। টিপে-টিপে আস্তে আস্তে চুড়ি পরিয়ে দেয়। হঠাৎ রাগে মাথা ঘুরে গিয়েছিল তার। নইলে এমন যার তুকতুকে হাত তার গায়ে সে হাত তোলে কি করে ?

'তুমি কেন মিছিমিছি বাজে খরচ করতে গেলে ? এদিকে তোমার একটা ভালো গামছা নেই লুঙ্গিটা ছিঁড়ে গেছে।'

'যাক সব ছিঁড়ে-ফেড়ে। তুই শুধু একবারটি হাস আমার মুখের দিকে চেয়ে।'

পিঠে চুলগুলি খোলা পড়ে আছে ভুর করে।

'তোর চুল বাঁধা দেখিনি কোনোদিন—'

আজ শুধু দেখে না কুরমান, শোনেও। শোনে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির ঠুন-ঠুন।

উকিলদ্দির বাড়িতে তবু না গেলেই নয় নুরবানুর। চারটে টাকা কি কম ?

কম কি এক বেলার খোরাকি ? ধান-পান যদি পায় ভবিষ্যৎ, তাই কি অগ্রাহ্য করবার ?

কিন্তু সেদিন নুরবানু উকিলদ্দির বাড়ি থেকে নতুন শাড়ি পরে এল। ফলসা রঙের শাড়ি। নুররানুর বর্ণ যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

'এ শাড়ি এল কোত্থেকে ?' বর্শার মুখের মতো চোখা হয়ে উঠল কুরমান।

'আজ যে ঈদ খেয়াল নেই তোমার ? ঈদের দিনে মুনিব-গিন্নী দিয়েছে শাড়িখানা।'

ঈদের দিন হলেও নরম পড়ল না কুরমান। ফিরনি—পায়েসের ছিঁটে-ফোঁটাও নেই, নতুন একখানা গামছা হয় না, ঈদ কোথায় ?

না, নরম পড়ল না কুরমান। শাড়ির প্রত্যেকটি সুতোয় দেখতে পাচ্ছে সে উকিলদ্দির ঘোলা চোখ, ঘষা জিভ। ফাঁই ফাঁই করে সে শাড়িটা ছিঁড়ে ফেলল।

এবার আর সে হাটে গেল না পালটা শাড়ি কিনে আনতে। পয়সা নেই, ইচ্ছেও নেই। ক্ষুদ্দুর চাষা, তার বউয়ের আবার সাইবানী হবার সখ কেন ? চট মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে না সে ঘরের কোণে ?

সত্যি, এত সাজ তার পক্ষে অসাজন্ত ছিল। বুঝতে দেরি হয় না নুরবানুর। কিন্তু তখন কি সে বুঝতে পেরেছে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে সাপ রয়েছে লুকিয়ে ? গা বেয়ে বেয়ে শেষকালে বুকের মধ্যে ছোবল মারবে ? নুরবানু তার কালো ফুলের ছাপ-মারা কালো শাড়িই পরে এবার। তার রাতের এ নিরিবিলি শান্তির মতোই এ শাড়িখানা। তাই ঘুমের স্রোতে স্বচ্ছন্দে চলে আসতে পারে সে স্বামীর স্পর্শের ঘেরের মধ্যে। ফলসা রঙের শাড়িটার জন্যে তার এতটুকুও কষ্ট নেই।

কুরমান কাজ থেকে ছাড়িয়ে আনল নুরবানুকে। নিয়ে এল পর্দার হেপাজতে। উপাসে-তিয়াসে কাটবে তবু পাপের পথের পাশ দিয়ে হাঁটবে না। দারিদ্র্য লাগুক গায়ে, তবু অধর্ম যেন না লাগে। অদিন এলেও যেন না অমানুষ বনে যায়।

কিন্তু উকিলদ্দি ছিনে-জোঁক ; বয়স হয়েছে কিন্তু বিবেচনা নেই।

ধান কাটতে মাঠে গিয়েছে কুরমান। লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটবার দিন এখন। পা টিপে টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। কানের জন্যে ঝুমকো, পায়ের জন্যে পঞ্চম, গলার জন্যে দানাকবজ নিয়ে এসেছে গড়িয়ে।

বললে, 'কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।'

বেরিয়ে আসতে নুরবানুর চক্ষু স্থির। রূপোর জেওর দেখে নয়, চোখের উপরে বাঘ দেখে।

অনেক ভয়-ডর নুরবানুর। এক নম্বর মালেক, দুই নম্বর মুনিব। তিন নম্বর দফাদার। চার নম্বর একটা মাংসখেকো জানোয়ার।

'চলে যান এখান থেকে।' চোখে মুখে আঁচ ফুটিয়ে ঝাপসা গলায় বললে নুরবানু।

'তোমার জন্যে লবেজান হয়ে আছি। এই দেখো, জেওর এনেছি গড়িয়ে।'

'দরকার নেই। আপনি চলে যান। নইলে সোর তুলব এখুনি।'

কিন্তু সোর তুলবার আগেই কুরমান এসে হাজির।

রোদে সে তেতে-পুড়ে এসেছে, চোখে ঘোলা পড়েছে বোধ হয়। নইলে দেখছে সে কী তার বাড়ির উঠোনে? উকিলদ্দির হাতে রূপোর গয়না আর নুরবানুর চোখে খুশির ঝলকানি, কত না জানি ঠাট্টা-বটকেরা, কত না জানি হাসির বুজরুকি। রঙ-সঙ আমোদ-বিনোদ। এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের শর্ত।

মাথায় খুন চেপে গেল কুরমানের, চারপাশে চেয়ে দেখল সে অসহায়ের মতো। দেখল ধানের আঁটির সঙ্গে কাঁচি সে ফেলে এসেছে মাঠে।

'এখানে কেন?'

ধানাই-পানাই করতে লাগল উকিলদ্দি। শেষকালে বললে, 'লক্ষ্মীবিলাস ধান কাটতে গিয়েছিস কিনা দেখতে এসেছিলাম।'

'তা মাঠে না গিয়ে আমার বাড়ির অন্দরে কেন?'

'বেশ করেছি। সমস্ত জায়গা-জমি সদর-অন্দর আমার, আমার যেখানে খুশি আমি যাব আসব।'

কুরমান হঠাৎ উকিলদ্দির দাড়ি চেপে ধরল। লাগল ঝটাপটি, ধস্তাধ্বস্তি। উকিলদ্দির হাতে যে লাঠি ছিল দেখেনি কুরমান। তা ছাড়া কুরমান আধ-পেটা খাওয়া চাষা, জোর-জেল্লা নেই শরীরে সেটাও সে বিচার করে দেখেনি। উকিলদ্দি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে তো দিলই, তুলে নিল লাঠিগাছটা।

কুরমানকে দেখেই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নুরবানু। এখন মারমুখো লাঠি দেখে বেরিয়ে এল সে হন্ত-দন্ত হয়ে, শিকরে পাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল

উকিলদ্দির উপর। লাঠিটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল জোর করে। মুঠো আলগা করতে পারে না। শুধু শুরু হয় লাটপাট।

কি চোখে দেখল ব্যাপারটা কে জানে কুরমানের রক্তের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল। এক ঝটকায় টেনে আনতে গেল নুরবানুকে চুলের ঝুঁটি ধরে: 'তুই, তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস পর্দার বাইরে? কেন পর-পুরুষের সঙ্গে জাপটাজাপটি শুরু করে দিয়েছিস?' উকিলদ্দিকে রেখে মারতে গেল সে নুরবানুকে।

আর যেমনি এল এগিয়ে, হাতের নাগালের মধ্যে, অমনি উকিলদ্দির লাঠি পড়ল কুরমানের মাথায়। মনে হল নুরবানুই যেন লাঠি মারলে। মনে হল কুরমানের মারের থেকে উকিলদ্দিকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই জোটপাট। উকিলদ্দির গায়ে পড়ে তাই এত সাধ্য-সাধনা।

কুরমান দিশেহারার মতো চেঁচিয়ে উঠল: 'এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক—বাইন।'

ব্যস, উথল-পাথল বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। সব নিশ্চুপ, নিঃশেষ হয়ে গেল।

রাগ ভুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল কুরমান। হাজার লাঠি পড়লেও এমন চোট লাগত না। আঁধার দেখতে লাগল চারিদিক।

নুরবানুর সেই রাগরাঙা মুখ ফুসমন্তরে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল। ফকির-ফতুরের মতো তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে। আর মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিয়ে চাপা সুখে হাসতে লাগল উকিলদ্দি।

লোক জমতে শুরু করল আস্তে-আস্তে।

কুরমান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। বললে নুরবানুকে, 'ও কিছু হয়নি, চলে যা ঘরের মধ্যে।'

সত্যিই যেন কিছু হয়নি এমনি ভাবেই আঁচল গুটিয়ে নুরবানু চলে গেল ঘরের মধ্যে, ঘরের বউএর মতো।

কিছু হয়নি বললেই আর হয় না। আস্তে আস্তে বসে গেল দশ-সালিশ। তালাক-দেওয়া স্ত্রী এখন আলগা-আলগোছ মেয়েলোক। তার উপর আর পূর্ব স্বামীর এক্তিয়ার নেই। এক কথায় অমনি আর তাকে সে ঘরে তুলতে পারে না। বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি। অমন হারামি সমাজ বরদাস্ত করতে পারে না।

উকিলদ্দি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

'রাগের মাথায় ফস করে কথা বেরিয়ে গেছে মুখের থেকে, অমনি আমার ইস্ত্রি পর হয়ে যাবে?' কুরমান কেঁদে উঠল।

পর বলে পর! এপার থেকে ওপার! একবার যখন বিয়ে ছাড়ার ফারখৎ জারি করেছে তখন আর উপায় নেই। ঘুড়ি কাটা পড়লে নাটাই গুটিয়ে কি ঘুড়িকে ধরে আনা যায়?

'মুখের কথাটাই বড়ো হবে? মন দেখবে না কেউ?'

মুখের জবানের দাম কি কম? রঙ-তামাসা করে বললেও তালাক তালাক। আর এ-তো জল-জীয়স্ত রাগের কথা, গলা দরাজ করে দিন-দুপুরে তালাক দেওয়া।

'আর দস্তুরমতো সাক্ষী রেখে।' ফোড়ন দিল উকিলদ্দি।

'এখন উপায়? নুরবানুকে আমি ফিরে পাব না?'

এক উপায় আছে। দশ-সালিশ বসল ফরমান দিতে। ইদ্দতের পর কেউ যদি নুরবানুকে বিয়ে করে তালাক দেয় তবেই ফের কুরমান নিকে করতে পারে তাকে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কে বিয়ে করবে? কুরমানকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে কে বিয়ে করবে নুরবানুকে?

আর কে! দাড়িতে হাত বুলুতে-বুলুতে উকিলদ্দি বললে, 'আমি বিয়ে করব।'

কিন্তু বিয়ে করেই তক্ষুনি-তক্ষুনি তালাক দিতে হবে। কথার খেলাপ করলে চলবে না। দশ-সালিশের হুকুম মানতে হবে। এর মধ্যে আছে খাদেম-ইমাম, মোল্লা-মুনশী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মানী-গুণী লোক সব। এদেরকে অমান্য করা যাবে না।

একটু যেন বল পেল কুরমান। কিন্তু তার বাড়িতে থাকতে পারবে না আর নুরবানু। বিয়ানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়েছেলে? পাশ-গাঁয়ে তার এক চাচা আছে, বেচারী নাচার, সেখানে সে থাকবে। ইদ্দতের তিন মাস।

এক কাপড়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল নুরবানু। যেন কুরমানকে গোর দেওয়া হয়েছে। পুঁতে রেখেছে মাটির নিচে।

তাছাড়া আর কি? কুরমানের হাতের নাগালের মধ্যে দিয়ে চলে গেল, তবু হাত বাড়িয়ে তাকে সে ধরে রাখতে পারল না।

সামান্য কটা মুখের কথা এমনি করে সব নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে এ কে জানত! কুরমানের নিজের রাগ নিজেকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে।

দাউলে হয়ে কুরমান চলে গেল দক্ষিণে। নুরবানু ছাড়া তার আর ঘর-দুয়ার কি! ঘরের উইয়ে খাওয়া পাটখড়ির বেড়া ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, তেমনি ভেঙে-ভেঙে পড়ছে তার বুকের পাঁজরা। চলে গেছে দক্ষিণে, কিন্তু মন কেবল উত্তরে ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

ধান কাটা সারা হয়ে গেছে, নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে কুরমান। গাঁয়ের হালট ধরে নিজের বাড়িতে। ঘরের ঝাঁপ খোলে। কোথায় নুরবানু। চৈতী মাঠের মতো বুকের ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু রাত করে লুকিয়ে একদিন আসে নুরবানু। যেন খুব একটা অন্যায় করেছে এমনি চেহারায়। কুরমানের থেকে অনেক দূরে সরে বসে আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদে।

কুরমান বুঝি ঝাঁপিয়ে ধরতে চায় নুরবানুকে। ইচ্ছে করে কোলের কাছে বসিয়ে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে দেয়।

নুরবানু বলে, 'না। এখনো হালাল হইনি। ইদ্দত কাবার হয়নি। হয়নি ফিরতি বিয়ে, ফিরতি তালাক।'

বলে 'তোমাকে শুধু একবার দেখতে এলাম। বড়ো মন কেমন করে।'

বড়ো কাহিল হয়ে গেছে নুরবানু। বড়ো মন-মরা। গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। জোর-জলুস মুছে গেছে গা থেকে।

এটা-ওটা একটু-আধটু গোছগাছ করে দেয় নুরবানু। ঘরের মধ্যে নড়ে-চড়ে।

'তোকে কি আর ফিরে পাব নুরু?'

'নিশ্চয়ই পাবে। দশ-সালিশের বৈঠকে চুক্তি হয়েছে, কড়ায় ক্রান্তিতে সব আদায়-উশুল হয়ে যাবে। চোখ বুঝে এক ডুবে মাঝখানের এই কয়েকটা দিন শুধু কাটিয়ে দেয়া।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? ও তোকে আর ছাড়বে না। একবার কলমা পড়া হয়ে গেলেই ও ওর মুখে কুলুপ এঁটে দেবে। বলবে, দেব না তালাক।'

'ইস?' নুরবানু ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল: 'দশ-সালিশ ওকে ছাড়বে কেন?'

'না ছাড়লেই বা কি, ও পষ্ট গরকবুল করবে। এ নিয়ে তো আর আদালত চলবে না। বলবে, কার সাধ্য জোর করে আমাকে দিয়ে তালাক দেওয়ায়।'

'ইস্, করুক দেখি তো এমন বেইমানি।' আবার ফোঁস করে ওঠে নুরবানু: 'বেতমিজকে তখন বিষ খাইয়ে শেষ করব। ওর বিষয়ের অংশ নিয়ে এসে সাদি করব তোমাকে।'

নুরবানুর চোখে কত বিশ্বাস আর স্নেহ।

'গা-টা তেতো-তেতো করছে, জ্বর হবে বোধ হয়।'

গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল নুরবানু। হাত গুটিয়ে নিল ঝট করে। অমন সোনার অঙ্গ স্পর্শ করার তার অধিকার নেই।

একেক দিন গহিন রাতে কুরমান যায় নুরবানুর ঘরের দরজায়। নুরবানুর চোখে ঘুম নেই। বেড়ার ফাঁকে চোখ দিয়ে বসে থাকে।

বলে, 'কেন পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছ ? লোকে যে চোর বলবে। চৌকিদার দেখলে চালান দেবে।'

'কবে আসবি ?'

'দফাদার লোক নিয়ে এসেছিল। আসছে জুম্মাবার কলমা পড়বে। তারপরেই তালাক আদায় করে নেব ঠিক। এখন বাড়ি যাও।'

কোথায় বাড়ি! কুরমানের ইচ্ছে করে পাখিটাকে বুকের উমে করে উড়াল দিয়ে চলে যায় কোথাও! কোথায় তা কে জানে ? যেখানে এত প্যাচ-ঘোঁচ নেই, যেখানে শুধু দেদার মাঠ দেদার আসমান।

শিগগির বাড়ি যাও, কুরমান চোর, কুরমান পরপুরুষ।

জুম্মাবারে বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু, কই, শনিবারে তো তালাক নিয়ে চলে এল না নুরবানু।

যা সে ভেবে রেখেছে তাই হবে। একবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে উকিলদ্দি আর ছেড়ে দেবে না নুরবানুকে। গলা টিপে ধরলেও তার মুখ থেকে বার করানো যাবে না ঐ তিন অক্ষরের তিন কথা। বলবে, মরণ ছাড়া আর কারুর সাধ্য নেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। কুরমান খোঁজ নিতে গেল। দাবিদারের মতো নয়, দেনদারের মতো।

উকিলদ্দি বললে, 'আমার কোনো কসুর নেই। বিয়ে হয়েছে তবু নুরবানু এখনো ইস্ত্রী হচ্ছে না। ইস্ত্রী না হলে তালাক হয় কি করে ?'

যতসব ফাঁকিজুঁকি কথা। তার আসল মতলব হচ্ছে নুরবানুকে রেখে দেবে কবজার মধ্যে। রাখবে অষ্টঘড়ির বাঁদী করে।

কুরমান দশ-সালিশ বসাল। জানাল তার ফরিয়াদ।

ডাকো উকিলদ্দিকে। জবাব কি তার ? কেন এখনো ছাড়ছে না নুরবানুকে ? কেন এজাহার খেলাপ করছে ?

উকিলদ্দি বললে, বিয়েই এখনো সিদ্ধ হয়নি, ফলন্ত-পাকন্ত হয়নি। এখনো

মাটির গাঁথনিই আছে, হয়নি পাকাপোক্ত। বিয়ে হয়েছে অথচ এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে নুরবানু। ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। শুতে আসছে না দরজায় খিল দিয়ে। ও ভেবেছে কলমা পড়ার পরেই বুঝি ও তালাকের কাবিল হল। তাই রয়েছে অমন কাঠ হয়ে, বিমুখ হয়ে। এমনি যদি থাকে, তবে কাঁটান-ছিঁড়েন হতে পারে কি করে?

সত্যিই তো। দশ-সালিশ রায় দিলে। স্বামীর সঙ্গে একরাত্রিও যদি সংসার না করে তবে বিয়ে জায়েজ হয় কি করে? বিয়ে পোক্ত না হলে তালাক চলে না। হালাল হওয়া চলে না নুরবানুর।

উপায় নেই, হালাল হতে হবে নুরবানুকে। তালাক মেনে নিতে হবে ভিক্ষুকের মতো।

ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল নুরবানু।

পরদিন ভোরে পাখিপাখলা ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই উকিলদ্দি নুরবানুকে তালাক দিল।

বিকেলের রোদ উঠোনটুকু থেকে যাই যাই করছে, নুরবানু চলে কুরমানের বাড়িতে। কুরমান বসে আছে দাওয়ার উপর। হাতের মধ্যে হুঁকো ধরা কিন্তু কলকেতে আগুন নেই। কখন যে নিবে গেছে কে জানে। চেয়ে আছে—শুনা মাঠের মতো চাউনি। গায়ের বাঁধন সব ঢিলে হয়ে গেছে, ধস ভেঙে পড়েছে জীবনের। ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়ির মতো চেহারা।

যেন চিনি অথচ চিনি না, এমনি চোখে কুরমান তাকাল নুরবানুর দিকে। তার চোখে গত রাতের সুর্মা টানা, ঠোঁটে পান-খাওয়ার শুকনো দাগ। সমস্ত গায়ে যেন ফুর্তির আতর মাখা। পরনে একটা জামরঙের নতুন শাড়ি। পরলে-পরলে যেন খুশির জলের স্রোত।

সে জল বড়ো ঘোলা। লেগেছে কাদা মাটির ময়লা। পচা দামের জঞ্জাল। মড়ার মাংসের গন্ধ।

সে জলে আর স্নান করা যায় না।

'ইদ্দত আমি এখানেই কাবার করব। দিন হলেই মোল্লা ডেকে কলমা পড়িয়ে নাও তাড়াতাড়ি।' নুরবানু ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নেবা হুঁকোয় টান মারতে মারতে কুরমান বললে, 'না। আমার নিকে-সাদিতে আর মন নেই। তুই ফিরে যা দফাদারের বাড়িতে।'

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩—) ॥ অকাল বসন্ত
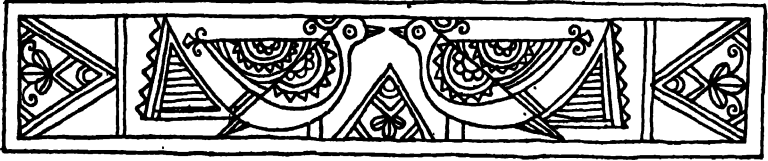
বোস সাহেব তৃতীয়বার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে বিমান পুরীর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আই-সি-এস। বছর খানেক হল বিলেত থেকে মেম বিয়ে করে ফিরেছে।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র মেয়ে করুণার বিয়ে হয়েছে মাস চারেক হল। সে থাকে টাটানগরে। সেখানে তার স্বামী কি একটা বড়ো চাকরি করেন।

বোস সাহেব নিজে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেন। বয়স সবে ষাট পেরিয়েছে। বছর চারেক আগেও ভালো টেনিস খেলোয়াড় বলে নাম ছিল। এখনও খেলেন। কিন্তু আর তেমন সুবিধা হয় না। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে তাঁর কোমরের পরিধি দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। সেজন্যে খেলতে অসুবিধা হয়।

আশ্চর্য মানুষ এই বোস সাহেব। মনের মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। হৃদয়ের দ্বার তাঁর সকল সময়ই অবারিত। বয়সের ব্যবধান মানেন না। দিনের বেলা অল্প একটু অর্গল যদি বা থাকে সন্ধ্যার পরে দোতালার দক্ষিণের খোলা বারান্দায় মদের গ্লাসের সামনে বসলে তাও আর থাকে না। তখন 'মানুষ আমার ভাই, তিন ভুবন আমার স্বদেশ'। ছেলে মেয়ে এবং জামাইএর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক সেও ঠিক পিতাপুত্রের নয়, বন্ধুত্ব।

সুতরাং বিবাহের বাঞ্ছা মনে জাগতেই তিনি অকপটে তাদের লিখে জানালেন।

খবরটি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ছেলে, মেয়ে ও জামাইএর কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। তারা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

বিমান তার স্ত্রীকে ডেকে বললে, শুনছ এলেন, বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

তার হাতের মধ্যে চিঠিখানা তখনও কাঁপছিল।

ওঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন এল। বিমানের কম্পিত হাতের দিকে না চেয়েই বললে, তাই নাকি ? কবে ? আমরা সবাই যাচ্ছি তো ?
তার চোখে মুখে খুশি যেন উপচে উঠল। বিমান গম্ভীর ভাবে বললে, ছিঃ এলেন ! বাবার বিয়ে, একি ঠাট্টার কথা !
এলেন থতমত খেয়ে বললে, এদেশেও বুড়োরা বিয়ে করে তো।
—করে। কিন্তু তা নিন্দনীয়। বাবা বিয়ে করবেন কি ? বড়ো বড়ো ছেলে মেয়ে রয়েছে। দু-দিন পরে নাতি-নাতনী হবে।
বলে এলেনের দিকে চেয়ে চোখ মটকালো। লজ্জায় এলেনের শ্বেত পদ্মের মতো মুখ এক ঝলক রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো।
তাড়াতাড়ি বিমানের পাশে বিমানের গা ঘেঁষে বসে বললে, কিন্তু বাবা যদি বিয়ে করতে চান, তোমরা কি করে আটকাতে পারো বলো ?
—যে করে হোক, আটকাতেই হবে। আমি ভাবছি……বিমান একটু থেমে এলেনের দিকে চাইলে।
এলেন জিজ্ঞাসা করলে, কি ভাবছো বলো ?
বিমান সোফা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কিছুই ভাবতে পারছি না। মোট কথা, বাবার সঙ্গে একটা কথা হওয়া দরকার। সামনের ছুটিতে আমি নিজে একবার কলকাতায় যেতে পারি। কিন্তু সব চেয়ে ভালো হয়, যদি ওঁকেই এখানে আনা যায়।
একটু পরে বললে, সেই সঙ্গে করুণাকেও। তার কথা বাবা কোনোদিন ঠেলতে পারেন না।
মতলবটা মাথায় আসতেই বিমান উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, দাঁড়াও এখুনি দুখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিই।
বলেই বিমান লেখবার ঘরে চলে গেল।
টেলিগ্রাম দুখানা পাঠিয়ে মিনিট পনেরো পরে সে বসবার ঘরে ফিরে এল।
এলেন তখন বাইরের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কি যেন ভাবছিল।
বাঁ হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে বিমান বললে, কি ভাবছো ?
এলেন একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, কিছুই ভাবিনি।
—তুমি যেন এই বিয়েতে বাধা দিতে চাও না, মনে হচ্ছে।
—সত্যি।
—কেন চাও না ?

এলেন গম্ভীর হয়ে বললে, দেখো, বুড়ো মানুষদের আমরা চিনি না। তাঁদের মনের কথাও জানি না। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাবার ছেলেমি করার বয়স পেরিয়ে গেছে, অভিজ্ঞতাও অনেক হয়েছে, তাহলে কেন বাধা দোব?

বিস্ময়ে বিমানের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

এলেন বলতে লাগলো:

—তুমি জিগ্যেস করলে, কি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কি জানো? ভাবছিলাম, ভালবাসা শুধু আমাদের বয়সেরই একচেটিয়া কি না। কিন্তু জবাব পেলাম না।

—কার কাছ থেকে?

—নিজের মনের কাছ থেকে।

বিমান অসহিষ্ণুভাবে বললে, কিন্তু আমাদের সমাজে ব্যাপারটা যে কতখানি হাস্যকর সেকি তুমি ধারণা করতে পারছ না?

এলেন শান্তভাবে বললে, না। সেই জন্যেই তোমাকে বাধা দিতে পারছি না। চুপ করে রয়েছি।

—করুণা খবর পেয়েছে কিনা কে জানে?

—তুমি তাকেও টেলিগ্রাম করলে না?

হাই তুলে বিমান বললে, করলাম তো। এখানে আসতে লিখেছি। দেখি, কি জবাব দেয়।

করুণা কিন্তু আগেই খবর পেয়েছিল, বিমানের সঙ্গেই। স্বামী তখন আপিসে। করুণা সমস্ত বিকেলটা ছটফট করে কাটালে। কী সর্বনেশে চিঠি। বনবিলাস না আসা পর্যন্ত সে এই চিঠির মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবে না।

বনবিলাস আসতেই করুণা তাকে পোশাক ছাড়বারও ফুরসুত দিলে না। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, শুনছো, শুনছো, বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

—বাঁচা গেল। অনেকদিন পরে একটা বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে।

বনবিলাস কোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে রাখলো।

—বাবার বিয়ে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ?

—করুণার বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে টপ টপ করে দু-ফোঁটা জল পড়লো।

বিব্রত হয়ে বনবিলাস বললে, ঠাট্টা আমি করছি না, তুমি করছ?

—আমি করছি? করুণার জল ভরা চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো।

—না তো কি? বাবা বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এ কথা তো তুমিই বললে।
—সে তো সত্যি কথা। এই দেখো বাবার চিঠি। করুণা বাবার চিঠিখানা বনবিলাসকে দিলে।
বনবিলাসের বাঁ হাতটা তখনও টাইএর উপর। কিন্তু টাই আর খোলা হল না। পাশের চেয়ারে বসে পড়ে এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে গেল।
তারপর বললে, বাবা রসিকতা করেননি তো? তিনি তা পারেন।
জোরে-জোরে মাথা নেড়ে করুণা বললে, কখ্খনো না। বাবা না লিখলেও আমি ঠিক বুঝতে পারছি, এ নিশ্চয় সেই সুচরিতা মিত্তিরের কাণ্ড।
—তিনি কে?
—কোথাকার ইন্সপেক্ট্রেস অফ স্কুল্স্। আমাদের বাড়ির পাশেই বাড়ি করেছেন। মা বেঁচে থাকতেই আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা ছিল। এখন আরও বেড়েছে।
—তুমি জানতে?
—জানতাম। কিন্তু এরকম ভাবিনি। তাহলে কি ঢুকতে দিতাম! করুণার চোখে একটা হিংস্র আগুন জ্বলে উঠলো।
বনবিলাস হাসলে। একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম লোক?
—ম-মন্দ নয়।
স্পষ্টাস্পষ্টি ভালো বলতে করুণার বাধলো।
—তবে আর কেন? লাগিয়ে দাও।
তপ্ত কড়ায় ফেলা মাছের মতো করুণা যেন জ্বলে উঠলো। বললে, লাগাব। কি জানো? আগুন! আমি কালই কলকাতা যাচ্ছি।
—কালই! সর্বনাশ! এই রাগের মাথায় যেও না। বরং পরশু যেও। শনিবার আছে, আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।
—তুমি পরশুই এসো। কিন্তু আমাকে আর থাকতে বোলো না। মন আমার ভয়ানক খারাপ। রাত্রে গাড়ি থাকলে আজ রাত্রেই চলে যেতাম।
করুণার মনের অবস্থা সেই রকমই।
তবু কালকেই তার যাওয়া হল না। বাঁধা-ছাঁদা সব তৈরি। বিকেল ছটায় গাড়ি। একটু পরে টিকিট এবং বার্থ রিজার্ভেশনের জন্যে লোক যাবে স্টেশনে। এমন সময় বিমানের টেলিগ্রাম এল।
বনবিলাস এসে বললে, তাহলে আজ থাক। আমিও বরং এই সুযোগে

ক-দিনের ছুটি নিই। দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমরা যতক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি কান্নাকাটি করবে, আমি ততক্ষণ সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারাবার চেষ্টা করব।

বনবিলাস এমনিতেই বিশালকায়। বাঙালীর ঘরে সাধারণত এ রকম স্বাস্থ্য বড়ো একটা দেখা যায় না।

সুতরাং স্বামীর শরীর সারাবার কথায় করুণা হেসে ফেললে। তারও ইচ্ছা বনবিলাসের সঙ্গেই যায় কিন্তু।

করুণা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ছুটি পেতে কত দেরি হবে ?

—কিছুমাত্র দেরি হবে না। শনিবার আমরা বেরুতে পারব।

—ঠিক তো ?

—নিশ্চয়। ম্যাজিস্ট্রেটের দৌড়টা আমাকে দেখতেই হবে।

—দৌড় কিসের ?

—বুঝতে পারলে না। শ্বশুর মশায়ের বিয়ের কথা শুনে তোমরা সবাই হৈ হৈ করে কলকাতা যেতে পারতে ? সেখানে বৃদ্ধ তাঁর নিজের দুর্গে সমাসীন। কাছে রয়েছে প্রধান সেনাপতি সুচরিতা মিত্তির। যাকে বলে 'Bearding the lion in his own den'—বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। আর এ হচ্ছে, বৃদ্ধকে তাঁর নিজের দুর্গ থেকে অরক্ষিত, নিরস্ত্র অবস্থায় নিজের কোটে বার করে এনে চাপ দেওয়া। বুঝলে ?

করুণা বিজয়ানন্দে উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলো।

বললে, তাই তো! আমি তো এত কথা ভাবিনি। কিন্তু তুমিও যাচ্ছ তো ?

—নিশ্চয়। শনিবার সন্ধ্যায়।

কিন্তু যাঁর বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র তিনি তখন শয্যাগত।

দিন তিনেক আগে টেনিস খেলতে গিয়ে বোস সাহেব ডান পা মচকে বাড়ি ফেরেন। সেই থেকে শয্যাগত। দু-দিন তো উঠতেই পারেননি। আজ উঠে বসেছেন এবং একটু একটু হাঁটবার চেষ্টা করছেন!

তখন আষাঢ়ের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু ক্ষান্ত বর্ষণ মেঘের উপর রঙের সমারোহ শেষ হয়নি।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় একটা টিপয়ের উপর পা তুলে দিয়ে একটা ইজিচেয়ারে

বোস সাহেব শুয়ে ছিলেন। মার্বেল পাথরের মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে সুচরিতা তাঁর পায়ে কি একটা ঔষধ পেণ্ট করে দিচ্ছিলেন।

সুচরিতার মাথার কাঁচা-পাকা চুলের দিকে চাইলে সন্দেহ হয়, তাঁর বয়স হয়তো পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর মুখ, চোখ এবং নাতি-স্থূল দেহের গড়নের দিকে চাইলে সে ভুল ঘোচে। তখন মনে হয়, বয়স পঞ্চাশের এই দিকেই হবে।

একমনে হেঁট হয়ে তিনি পেণ্ট করছিলেন। আরামে বোস সাহেবের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখ বন্ধ করে অসাড়ে তিনি ইজি-চেয়ারে শুয়ে ছিলেন।

পেণ্ট শেষ করে সুচরিতা তাঁর দিকে চাইলেন।

কী মুখ!

প্রশস্ত ললাটে, নিমীলিত নেত্রে, মাথার বিরল পাকাচুলে রক্ত মেঘের আভা এসে পড়েছে।

কী মুখের ডৌল! বৃদ্ধের এই রূপ আর কারও চোখে হয়তো পড়বে না। কিন্তু সুচরিতা এই রূপের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। চোখ যেন আর ফেরাতে পারে না। ধীরে ধীরে বোস সাহেব চোখ মেলতেই লজ্জিত সুচরিতা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

ঈষৎ হেসে ডান হাতখানি বোস সাহেব সুচরিতার মাথায় স্পর্শ করলেন। সে স্পর্শে তিনি যেন শিউরে উঠলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বোধ হচ্ছে?

—একটু ভালো।

—তার মানে অনেকখানি খারাপ।

বোস সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন।

তারপরে বললেন, বসো। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। পাশের কুশন-দেওয়া মোড়ায় বসে সুচরিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বোস সাহেবের দিকে চাইলেন।

বোস সাহেব একটু থেমে গলাটা ঝেড়ে বললেন, বিমান একটা টেলিগ্রাম করেছে।

সুচরিতা নিঃশব্দে তেমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

বোস সাহেব বললেন, আমাকে পুরী যাবার জন্যে লিখেছে। কেন, কে জানে?

বোধ করি শরীরের জন্তে। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না লিখেছিলাম। কিন্তু এই ভাঙা পায়ে কি এখন যেতে পারব? পা অবশ্য অনেকটা সেরে আসছে। কাল-পরশু হয়তো মোটামুটি হাঁটতে পারব। তবু……

পশ্চিমের দিগন্ত থেকে বর্ণচ্ছটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। সেই দিকে চেয়ে বোস সাহেব অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ স্থচরিতার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন।

তাঁর মুখে কুটিল হাস্তরেখা ফুটে উঠেছে। বোস সাহেব থমকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি হাসছ যে?

—না, হাসিনি। বোধ হয় তোমার শরীরের জন্তেই টেলিগ্রাম করেছে। তাই হবে।

বিব্রত ভাবে বোস সাহেব বললেন, তা না তো তুমি কি মনে করো?

স্থচরিতা এবারে উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি না বক্তৃতায় হাইকোর্ট কাঁপিয়ে থাকো? জটিল মামলা জলের মতো সোজা, আর সোজা মামলা দুশ্ছেদ্য জটিল করে তোলো?

বোস সাহেব সবিনয়ে বললেন, সে বদনাম আমার আছে স্থচরিতা। নইলে মক্কেল টাকা দিত না।

—তুমি কি এই টেলিগ্রামের অর্থ সত্যিই বুঝতে পারছ না?

—যা বুঝেছি সে তো তোমায় বললাম।

স্থচরিতা অবাক হয়ে ওঁর শান্ত মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

তারপরে ওঁর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, সংসারে অনেক লোক দেখলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না।

—ঠাট্টা করছ?

স্থচরিতা গম্ভীর ভাবে বললেন, ঠাট্টা নয়। সাধারণ মানুষ থেকে তুমি অতুলনীয়। যতই তোমাকে দেখছি, ততই এই ধারণা আরও দৃঢ় হচ্ছে।

তারপরে কথাটা ফেরাবার জন্তে তাড়াতাড়ি বললেন, তাহলে কবে যাচ্ছ তুমি?

—তুমি বলে দাও।

স্থচরিতা একটু ভেবে বললেন, বিমান যখন লিখেছে তখন তোমার বেশি দেরি করা উচিত নয়। আমি বলি, তুমি সোমবারে যাও বরং। আমি এখনই

সরকার মশাইকে বলে দিচ্ছি, তিনি কালকে গিয়ে তোমার বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করবেন। ঝগড়ু তোমার সঙ্গে যাবে।

—আর তুমি? তুমি যাবে না?

সুচরিতার মুখে কিসের যেন একটা কালো ছায়া পড়লো। কিন্তু এক মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে সামলে নিলেন। তারপরে সহজ কণ্ঠে বললেন, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। ঝগড়ু সঙ্গে থাকলে, আমার মনে হয়, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না।

বোস সাহেব চুপ করে রইলেন।

সোমবার সকালে সুচরিতা একবার বোস সাহেবের খবর নিতে এলেন। পায়ের ব্যথা বোস সাহেবের অনেকখানি সেরে গেছে। নেই বললেই হয়। পুরী যাবার উৎসাহে তাঁকে অনেকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দেখে সুচরিতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

সুচরিতা বুঝতে পেরেছিলেন, বোস সাহেবের ইচ্ছা তিনি সুদ্ধ তাঁর সঙ্গে যান। কিন্তু এও তিনি বুঝেছিলেন, বর্তমানে সে যে সম্ভব নয়—সেকথা বোস সাহেবকে বোঝানো অসম্ভব! সুতরাং সে চেষ্টা তিনি করেননি। কিন্তু যাবার সময় এই জন্যে বোস সাহেবের যে ক্ষোভ রয়ে গেল, সে কথা ভেবে তিনি মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বোস সাহেবের উৎসাহ এবং স্ফূর্তি দেখে সে অস্বস্তি অনেকখানি দূর হল।

বোস সাহেব সুচরিতাকে দেখেই উৎসাহের সঙ্গে বললেন, এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। দেখো তো সব জিনিস নেওয়া হল কিনা?

—তোমার গোছানো সব হয়নি এখনও?

—হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে। এখন তুমি একবার দেখে পাস করে দিলেই হয়।

ঝগড়ু বাঁধা-ছাঁদা করছিল।

সুচরিতা তার দিকে চেয়ে বললেন, টেনিস র‍্যাকেটটা খুলে দে তো। ওটা যাবে না।

বোস সাহেব ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, ওটা নিয়ে যেতে দেবে না? বৌমা খুব ভালো টেনিস খেলেন। ইচ্ছা ছিল……

—ইচ্ছা এখন থাক। ওই খোঁড়া পায়ে এখন কিছুদিন খেলা হবে না। মশারিটা নিয়েছিস্ ঝগড়ু ?

ঝগড়ু জিভ কেটে উপরে ছুটছিল। তাকে থামিয়ে সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধগুলো নিয়েছিস তো ?

ঝগড়ু বললে, সেগুলো নিয়েছি মাসীমা।

—আচ্ছা, তা হলে মশারিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। দাঁড়া আমিও যাচ্ছি। উপরের ঘরটা দেখলে বোঝা যাবে, কি নিয়েছিস আর কি নিসনি।

উপরে ঘরের চারিদিকে সুচরিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন। না, আর কিছু ঝগড়ুর ভুল হয়েছে বলে মনে হল না।

সুচরিতা নেমে আসছেন, এমন সময় ঝগড়ু বললে, সাহেব তো যাচ্ছেন মাসীমা, কিন্তু কাল রাত্তিরে ওঁর একটু জ্বর হয়েছিল।

—সে কি রে ?

—হ্যাঁ। আপনাকে জানাতে বিশেষ করে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হল, আপনাকে জানানো দরকার।

বোস সাহেবের অসুখের খবর এত লোক থাকতে সুচরিতাকে জানানো ঝগড়ু দরকার মনে করেছে। এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত অন্য সময় হলে হয়তো সুচরিতার দৃষ্টি এড়াত না। একটু হয়তো তিনি লজ্জাও পেতেন। কিন্তু অসুখের খবরে তিনি লজ্জার অবসর পেলেন না।

বললেন, কই—আমি তো টের পেলাম না।

ঝগড়ু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, এখনও একটু জ্বর আছে বোধ হয়।

নিচে এসেই সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শরীরটা শুকনো দেখাচ্ছে কেন ? জ্বর নয় তো ?

—না, না। জ্বর কিসের ? ঝগড়ু বলেছে বুঝি ?

বাঁ হাতের উলটো পিঠে বোস সাহেবের ললাট স্পর্শ করে সুচরিতা বললেন, গাটা একটু গরমই বোধ হচ্ছে যেন। ঝগড়ু, থার্মোমিটারটা দে তো বাবা।

দেখা গেল, জ্বর একটু আছে, ৯৯এর কাছাকাছি।

বোস সাহেব বললেন, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। দুপুর নাগাদ ও আর থাকবে না। তারপরে পুরীর মতো জায়গা—

সুচরিতা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। বোস সাহেব বোঝাতে

লাগলেন, নিরানব্বুইটা আসলে জ্বরই নয়। ওটুকু উত্তাপ নানা কারণেই ওঠে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুচরিতা বললেন, সরকার মশাইকে খবর দে তো ঝগড়ু। বল্ এখনি স্টেশনে গিয়ে আর একখানা টিকিট কিনে আনতে। বার্থ পাওয়া যায় ভালোই, না যায় যে কোনো ক্লাসের একখানা টিকিট। আর তুই আমার সঙ্গে একবার আয়। বিশেষ কিছু আনতে হবে না। একটা সুটকেস, আর একটা বেডিং।

বোস সাহেব লাফিয়ে উঠলেন।

বললেন, তুমি যাবে?

—না গিয়ে উপায় কি? তুমি তো সহজ লোক নও। আমার মুখ না হাসিয়ে ছাড়বে কেন?

বোস সাহেব এ খোঁচা গায়েই মাখলেন না। বললেন, ভাগ্যিস, একটু জ্বরের মতো হয়েছিল!

এমন করে বললেন যে, ঝগড়ুটা পর্যন্ত হাসি চাপবার জন্যে পালালো।

স্টেশনে বোস সাহেবদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ওরা দলকে দল সবাই এসেছিল।

বোস সাহেব ট্রেন থেকে নামলেন। মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। লজ্জা অথবা কুণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। ওরা অবাক হয়ে গেল। এমন কি একটু দমেই গেল। কিন্তু উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল না। বোস সাহেবকে বগল-দাবা করে ওরা মোটরে নিয়ে গিয়ে তুললো। চাকরটাকে বলে গেল, মালপত্র নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি করে আসতে।

এক রাশ পোঁটলা পুঁটলির মধ্যে ঝগড়ুকে নিয়ে সুচরিতা সেই প্ল্যাটফর্মে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। বিমানের চাকর ও আর্দালী মালপত্রগুলো ঘোড়ার গাড়িতে তোলবার জন্যে টানাটানি করতে লাগলো। সুচরিতা সেদিকে চেয়েও দেখলেন না। অকস্মাৎ যেন তিনি পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন।

—মা!

ঝগড়ু তাঁকে মা বলে না, মাসীমা বলে। এই প্রথম তাঁকে মা বলে ডাকলে। তার সুরে জেদের জবরদস্তি।

—মা !

স্থচরিতা বিহ্বলের মতো চাইলেন।

ঝগড়ু বললে, পুরী আমার চেনা জায়গা মা। অনুমতি করেন তো, আমরা দুজনে একটা হোটেলে গিয়ে উঠি।

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে। ঝগড়ুর কথাগুলো পর্যন্ত। ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না। অন্যমনস্কভাবে স্থচরিতা শুধু প্রতিধ্বনি করলেন—হোটেলে !

ওদের কাছেই শ্বেতবসনা একটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে ওরা দেখতে পায়নি। হোটেলের নাম শুনে তিনি এগিয়ে এলেন। গাড়ির জানলার আলো তাঁর মুখে এসে পড়তেই ঝগড়ু সসম্ভ্রমে সেলাম করলে।

মূর্তি স্থচরিতার সামনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বললে, আমি মিসেস বোস। আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। আস্থন আপনি।

ওর কণ্ঠস্বরে স্থচরিতা সমবেদনার আভাস পেলেন। কে জানে, ঠিক চিনতে পারলেন কিনা। ওর প্রসারিত ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে একটুক্ষণ কি যেন তিনি ভাবলেন। কিংবা হয়তো কিছুই ভাবলেন না। প্রথম আঘাতে ভাববার শক্তিই তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মুখে বললেন, আমায় যেতে বলছো ? চলো।

বাইরে একখানা ট্যাক্সি ছিল। ওঁরা দুজনে তাইতে উঠলেন। এতক্ষণে ঝগড়ুর মুখ প্রসন্ন হল। সেও ওদের পিছনে এসে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল।

সেই রাত্রে বোস সাহেবের জ্বর খুব বাড়লো।

রাত্রে তিনি একাই ছিলেন। স্থতরাং রাত্রে আর কেউ টের পায়নি। সকালে ঝগড়ু ওদের চায়ের টেবিলে খবরটা এনে দিলে।

বিমান ও তার স্ত্রী, করুণা ও তার স্বামী এবং স্থচরিতা সমুদ্রের দিকের বারান্দায় একটা গোল টিপয়ের চারদিকে বেতের চেয়ারে বসে বোস সাহেবের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। স্থচরিতার সঙ্গে করুণার আগেই আলাপ ছিল। এলেনের সঙ্গে স্টেশন থেকে আসবার সময় পথে কিছু আলাপ হয়েছিল। রাত্রে আর বিশেষ কথা হয়নি। স্থচরিতা এবং বোস সাহেব ক্লান্ত ছিলেন। ওরা নিজের নিজের শোবার ঘরে এক এক পেয়ালা কফি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে সকালেই আলাপের পর্ব শুরু হয়েছিল।

কিন্তু তাকে ঠিক রসালাপ বলা চলে না।

বিবাহের ব্যাপার নিয়ে প্রথম সুযোগেই যে তাঁর উপর আক্রমণ আরম্ভ হবে, সে তিনি গোড়া থেকেই অনুমান করেছিলেন। এবং সে জন্যে প্রস্তুত হয়েই চায়ের টেবিলে এসে যোগ দিয়েছিলেন। আক্রমণটা যে all out হবে তাতেও তাঁর সন্দেহ ছিল না। সতর্ক হয়েই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কেবল প্রথম আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আরম্ভ হবে, সেইটেই তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না।

করুণা তাঁর বিশেষ চেনা এবং স্নেহের পাত্রী। সুতরাং তার উপর তাঁর কিছু ভরসা ছিল। অথচ প্রথম আক্রমণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দিক থেকেই শুরু হল।

করুণা বললে, এই বয়সে বাবা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আপনারা কিছু শুনেছেন মাসীমা?

কাড়া-নাকড়া বাজিয়ে ধুম-ধামের আক্রমণ নয়। যেন হাঙরের আক্রমণ, দাঁত বসছে, কিন্তু বেদনা নেই।

সুচরিতা মৃদু হেসে বললেন, কিছু-কিছু শুনেছি বই কি মা।

—এ কি ঠিক হচ্ছে? আপনাদের কি বাধা দেওয়া উচিত ছিল না?

—আমার পক্ষে যতখানি বাধা দেওয়া উচিত, তা দিয়েছিলাম মা। কিন্তু সঙ্গত অসঙ্গতর প্রশ্ন যদি তোলো, তাহলে বলব, সে কথা তোমরা তুলতে পারো, আমি পারি না।

সুচরিতার জবাব দেবার ভঙ্গিতে শুধু করুণা নয়, সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই অপ্রীতিকর আলোচনা ওঠার সময় থেকেই এলেন অস্বস্তি বোধ করছিল। ইতিমধ্যে ঝগড়ু এসে বোস সাহেবের জ্বরের সংবাদ দিতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—জ্বর? খুব বেশি জ্বর? কখন থেকে জ্বর হয়েছে?

ওরা সবাই উঠতে যাচ্ছিল। সুচরিতা ঝগড়ুকে শান্তভাবে বললে, সাহেবকে জিগ্যেস করো তাঁর চা তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দোব কিনা আর বোলো আমরা চা খেয়েই আসছি।

আশ্বস্ত ভাবে ওরা বসলো।

কিন্তু সেই অস্বস্তিকর বিয়ের প্রসঙ্গ আর উঠলো না—সকলের মন তখন বোস সাহেবের অসুখের দিকেই ঝুঁকেছে। ওরা নীরবে চা খেয়ে বোস সাহেবের

ঘরে গেল। কেবল সুচরিতা একপ্রান্তে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন।• কেন যে তিনি ওদের সঙ্গে বোস সাহেবের ঘরে গেলেন না, তা তিনিই জানেন। ওরাও কেউ তাঁকে ডাকবার প্রয়োজন বোধ করলে না।

বোস সাহেবের জ্বর নিতান্ত কম নয়,—একশোর একটু বেশি। বিমান ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে কতকগুলি জরুরী কাজ সেরে নেবার জন্যে তার আপিস-ঘরে গিয়ে বসলো।

করুণা ও বনবিলাস সমুদ্রস্নানে বেরিয়ে পড়লো।

এলেন তার সাংসারিক কাজগুলো একবার তদারক করে ধীরে ধীরে এসে সুচরিতার কাছে বসলো।

বললে, জ্বর একশোর উপর।

খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই সুচরিতা বললেন, জানি। রাত্রে দুই পর্যন্ত উঠেছিল।

—আপনি কি রাত্রে টেম্পারেচার নিয়েছিলেন ?

রাত্রের কথা বলেই সুচরিতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেটা কাটিয়ে শান্তভাবে বললেন, ওখান থেকে অল্প জ্বর নিয়েই বেরিয়েছিলেন। সমস্ত রাস্তায় সেটুকু ছাড়েনি। আমার কেমন ভয় হচ্ছিল, ট্রেনের ধকলে রাত্রে জ্বরটা বাড়তেও পারে। তাই একবার টেম্পারেচার নিয়েছিলাম।

এলেন নিঃশব্দে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, ডাক্তার ডাকতে লোক গেছে। আশা করা যায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন।

সুচরিতা আপন মনে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। তারপর এলেনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে টেনিস খেলবার জন্যে উনি র‍্যাকেট নিয়ে বেরুচ্ছিলেন। আমিই সেটা খুলে রেখে দি। এখন শুয়ে শুয়ে টেনিস খেলছেন।

দুজনেই হাসলো।

এলেন বললে, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব ?

সুচরিতা হেসে বললে,—না করলেই চলবে না ?

মিনতির সুরে এলেন বললে, একটি কথা শুধু। আপনি এখানে এলেন কেন ?

—বুঝতে পারছ না ? ওঁর জ্বর, না এসে আমার উপায় ছিল ? একে ভাঙা

পা, তার উপর জ্বর। এত তাড়াতাড়ি উনি আসেন আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তোমাদের দেখবার জন্যে উনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন দেখে বাধা দিইনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন, এখানে আমার অসম্মানের যে কোনো ত্রুটি হবে না, সে আমি জানতাম। কিন্তু তারই বা উপায় কি বলো?

এলেন ব্যাকুলভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। সুচরিতা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমি জানি, তুমি এজন্য খুব লজ্জিত। কিন্তু তুমি কি করবে? তুমি কি করতে পারো? আমি বুঝতে পারছি তুমি অসহায়। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস কোরো, এ বিয়েতে আমি যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু, কিছুতেই ওঁকে নিরস্ত করতে পারিনি। হাতের খবরের কাগজগুলো মেঝেয় ফেলে দিয়ে উত্তেজিতভাবে সুচরিতা বলতে লাগলেন, বাধা দেওয়ার কথাই তো! যাকে বিয়ের বয়স বলে, সে ওঁর কিংবা আমার কারও নেই। ছেলে-পুলে, ঘর সংসারের উচ্চাশাও নেই। তবে আবার বিয়ে কেন? কিন্তু উনি কিছুতেই শুনবেন না।

এলেন নিঃশব্দে সাগ্রহে শুনে যেতে লাগলো—কেন শুনবেন না, সে তোমরা বুঝবে না। উনিও বোঝাতে পারবেন না। বোঝবার ইচ্ছা যদি থাকে, ওঁর প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে তোমাদের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে।

এলেন তাড়াতাড়ি ওঁর একখানা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন, আমাকে কিছুই বলতে হবে না, মা। আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিয়েছি। কিন্তু সবাই কি তা বুঝবে?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সুচরিতা বললে, তাও জানি। বুঝবে না। তাদের নিন্দা উপহাস ক্রোধ আমাদের সইতেই হবে। সে যদি না পারি তবে কিসের ভালবাসা? কিন্তু চলো। ডাক্তার এলেন মনে হচ্ছে।

সাতদিন সাতরাত্রি জ্বর ভোগের পর কাল ভোরে বোস সাহেবের জ্বর ছেড়েছে। সুচরিতা চায়ের টেবিলে আসেননি। তাঁর চা বোস সাহেবের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চায়ের টেবিলে করুণা বললে, কাল আমরা যাচ্ছি দাদা!

—কালকে? সে কি হয়? বাবা আর একটু সেরে উঠুন।

বনবিলাস বললে, আর ভয়ের তো কিছু নেই। আমার ছুটিও যে ফুরিয়েছে।

এলেন বললে, আবার কবে আসছ বলো? এবারে কোনো যত্নই তোমাদের হল না।

—তার দরকার ছিল না বৌদি। শুধু ভেবে দেখুন, উনি না থাকলে আমাদের আরও কত কষ্ট হত।

ক-দিন থেকে 'উনি' বলতে সবাই সুচরিতাকেই বুঝছে। এলেন বললে, এরকম শুশ্রূষা আমি চোখে কখনও দেখিনি! সাতদিন সাতরাত্রি ওই এক চেয়ারে উনি ঠায় বসে।

বনবিলাস বললে, সেই কথাই ভাবছি, বৌদি। পুরীর সমুদ্র আর ওঁর এই সেবা সব সময় আমার মনে জেগে থাকবে।

একটুখানি টোস্ট দাঁতে কামড়ে নিয়ে করুণা বললে, ওঁর সব ভালো, কেবল ওই বেহায়াপনা ছাড়া। গিয়ে দেখি, আঁচলে করে বাপির মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে এতটুকু লজ্জা পেলেন না। এ বয়সে অতখানি ভালো নয়। যে বয়সের যা।

বনবিলাস হেসে বললে, চাঁদে কলঙ্কের মতো ওটুকু ত্রুটি থাক না করুণা।

করুণা হাতের চামচটা প্লেটে ঘষতে ঘষতে বললে, বেশ, তা যেন রইল। কিন্তু এ বয়সে বিয়ে করার কোনো মানে হয়?

এলেন উত্তর দিলে, হয়তো হয়। অন্তত ওদের মুখের দিকে চেয়ে আমি তো এর মানে পেয়েছি। যৌবন নেই, দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে,—তবু একজনকে নইলে আর একজনের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠছে, এযে কত বড়ো কথা ভেবে দেখেছ করুণা?

ব্যঙ্গভরে করুণা বললে, ও। তুমি তাহলে এ বিয়ের পক্ষেই?

এলেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

বললে, আমি পক্ষেই থাকি আর বিপক্ষেই থাকি তাতে কিছুই যায় আসে না করুণা। তুমি কি এখনো বোঝোনি, এ বিয়েতে বাধা দেবার ক্ষমতা কারও নেই?

করুণা বললে, বুঝেছি। কিন্তু যাবার আগে আমরা এইটুকু ওঁদের জানিয়ে দিয়ে যাব যে, এই অন্যায়ে আমাদের সম্মতি নেই।

এলেন উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলেন, অন্যায়? ন্যায় অন্যায়ের শেষ কথা কি তোমার জানা হয়ে গেছে?

করুণার হাত ধরে হঠাৎ এলেন হিড় হিড় করে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে

গেল। বোস সাহেবের ঘরের বাইরে পর্দার আড়ালে তাকে দাঁড় করিয়ে পর্দাটা একটু ফাঁক করে ফিস্ ফিস্ করে এলেন বললে, একে তুমি অন্যায় বলো ?

করুণা দেখলে :

বোস সাহেবের খাটের পাশে একখানা ইজি চেয়ারে সুচরিতা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর মাথার কাঁচা পাকা চুল বিশৃঙ্খল। চোখের কোলে কালি পড়েছে। শ্রান্ত, শুষ্ক মুখ. শুধু ঠোঁটের ফাঁকে গভীর প্রশান্তি।

সেই মুখের দিকে চেয়ে করুণাও থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—) ॥ জনৈক কাপুরুষের কাহিনী
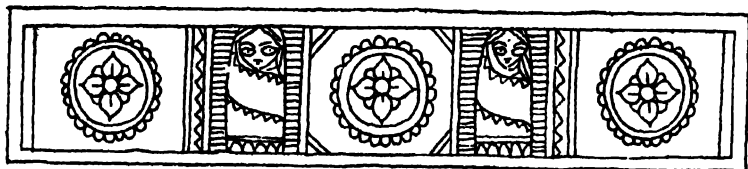
সকালবেলা করুণা নিজে হাতেই চা নিয়ে এল।

চায়ের আনুষঙ্গিকের বহর দেখে না হেসে পারলাম না, বললাম—"তোমাদের এদেশী জলহাওয়া ভালো হতে পারে, কিন্তু আমার জীর্ণ করবার ক্ষমতাটা এখনো স্বদেশী আছে—এই দু-দিনে তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।"

উত্তরে শুধু একটু হেসে প্লেটগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে করুণা চলে যাবার উপক্রম করতে আবার ডেকে বললাম—"তুমি কি আমার সঙ্গে লৌকিকতা শুরু করে দিলে নাকি? বিমলবাবু লৌকিকতা করলে না-হয় বুঝতাম, কিন্তু—"

কথার মাঝখানেই করুণা বললে—"বিমলবাবুর হয়েই যদি করি—দোষ আছে কি?"—তারপর হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালা সামনে ঠাণ্ডা হতে লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

না, করুণার ব্যবহারটা মোটেই ভালো লাগছে না, একথা নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে আর বাধা নেই।

করুণা নাটকীয় একটা-কিছু করে বসবে তা অবশ্য আশা করিনি। আশা কেন, সেটা রীতিমতো আশঙ্কার বিষয়ই ছিল। গোড়ায় তার সহজ স্বাভাবিকতায় তাই বুঝি আশ্বস্তই বোধ করেছি। কিন্তু মনের কোনো গোপন কোণে আহত অহংকার তারপর ধীরে ধীরে সাড়া দিতে শুরু করেছে। মনে হয়েছে, এতটা হবার বুঝি দরকার ছিল না। সূর্য অস্ত গেছে যাক্ কিন্তু তার বিলম্বিত রঙ পশ্চিমের মেঘে একটু লেগে থাকলে ক্ষতি কি ছিল!

নাটকীয় না হয়ে করুণা অতিমাত্রায় কঠিন ও সংযত হয়ে উঠলে বুঝি সবচেয়ে খুশি হতাম। ধরা দেবার ভয়ে তার সেই সযত্ন সাবধানতায় আমার আত্মাভিমান সবচেয়ে বোধহয় তৃপ্ত হত।

কিন্তু করুণা নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা কঠিন ঔদাসীন্য—দুই-এর কোনো দিক দিয়েই গেল না।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না, অনায়াসে এই কথাই ভাবতে পারতাম। এবং তাই ভাবাই ছিল উচিত। সত্যিই করুণার সঙ্গে দেখা হবার কোনো আশা বা আকাঙ্ক্ষা আমার তো ছিল না! তার সঙ্গে দেখা হবার কথাও নয়। বিশাল পৃথিবীর জনতায় এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে আমরা হারিয়ে গেছলাম যে কোনো দিন আবার পরস্পরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল অভাবিত।

কিন্তু সেই অভাবিত ব্যাপার যখন ঘটলো তখন দেখলাম, করুণাকে অনায়াসে ভুলে গেছি যখন মনে করেছি তখনও সে আমায় ভুলতে পারে না—মনের এ গোপন গর্বটুকু ত্যাগ করতে পারিনি।

এ রকম একটা গর্ব থাকা খুব অস্বাভাবিক বোধহয় নয়।

সে-সব দিনের কথা একেবারে ভোলা তো যায় না! বিশেষ করে সেই একটি বিকেল। সারাদিন বাইরে অবিশ্রান্তভাবেই বৃষ্টি পড়েছে, ইচ্ছে থাকলেও কোথাও আর বার হওয়া হয়নি। বিকেলে চাকর এসে খবর দিলে একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছে।

এই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি মেয়ে! প্রথমটা সত্যিই একটু বিমূঢ় হয়ে গেছলাম। চাকরের সঙ্গে করুণা যখন ঘরে এসে ঢুকল তখনও আমার মুখের বিস্ময় নিশ্চয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

চাকর চলে যাবার পর করুণা কাছে এগিয়ে এসে বললে—

"খুব আশ্চর্য হয়েছ না?"

"তা একটু হয়েছি, কিন্তু তুমি যে একেবারে ভিজে গেছ!"—আমি সত্যই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

করুণা কাছের একটা চেয়ারে বসে বললে—"বৃষ্টিতে বেরুলে ভিজতেই হয়, তোমার ব্যস্ত হতে হবে না।"

তারপর হেসে উঠে বললে—"ব্যস্ত হয়ে করবেই বা কি! তোমাদের এ নারী-বিবর্জিত রাজ্যে মেয়েদের পোশাক পাবে কোথায়? সখের থিয়েটার পার্টি তো নিশ্চয়ই তোমাদের নেই!"

একটু ভেবে বললাম—"ওপরে দশ নম্বরে একজনেরা আছেন—স্বামী-স্ত্রী!"

করুণা আবার হাসলো—"তাঁদের কাছে শাড়ি ব্লাউজ চাইতে যাবে? কি বলে চাইবে?"

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে—"তার চেয়ে ভিজে কাপড়েই আমি বেশ আছি। আমার অসুখ করবে না, ভয় নেই।"

অগত্যা তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমি কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে আবার বললে—"ভাবছো, এমনভাবে এখানে আসার মানে কি? কেমন?"

এবারও কোনো উত্তর দিলাম না। করুণা খানিকক্ষণের জন্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মনে হল। তারপর সম্পূর্ণ রূপান্তর। এই দুর্বার আবেগ সে এতক্ষণ জোর করে ধরে রেখেছিল বুঝলাম।

একেবারে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ব্যাকুল স্বরে বললে—

"আমায় পাটনায় নিয়ে যাচ্ছে। মামা কাল চিঠি দিয়েছেন।"

বুঝতে কিছু পারলাম না এমন নয়। তবুও বেদনাময় সত্যটা যতক্ষণ সম্ভব অস্বীকার করে বললাম—"তোমাদের কলেজের তো ছুটি হচ্ছে?"

করুণা আরো ব্যাকুল স্বরে বললে—"না না, তা নয়। তুমি বুঝতে পারছ না। এখানে আমায় আর রাখবে না; এই যাওয়া আমার শেষ।"

তার ঠাণ্ডা একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। হ্যাঁ, বেদনা সেদিন আমার হৃদয়েও ছিল, কিন্তু করুণার উদ্বেল আবেগের তুলনায় সে বুঝি কিছু নয়। আমার ভালবাসার মধ্যে সে-উদ্দামতা ছিল না যা ভাগ্যের বাধার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ করতে পারে।

কিন্তু করুণা খানিক বাদে অশ্রুসজল মুখ তুলে দৃঢ়স্বরে বললে—"আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না। কেন যাবো?"

কি উত্তর এ-কথার দেবো ভেবে পেলাম না। মনের গভীরতায় হয়তো সেইদিনই তার এ-বিদ্রোহে আমার সায় ছিল না। তখনই আমি জানতাম যে এ-বিদ্রোহ নিষ্ফল।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় বললাম—"তুমি যা মনে করছ তা তো নাও হতে পারে করুণা; তুমি হয়তো মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ।"

করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠল—"না, না, আমি জানি; জোর করে তাঁরা আমায় সেখানে বন্দী করে রাখতে চান। তাঁদের ধারণা, এ-সব ছেলেমানুষী সারাবার তাই অব্যর্থ ওষুধ।"

করুণা একটু তিক্ত হাসি হাসলো।

তারপর বললে—"আমি কলেজে যাবার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। এখানে এসে তোমায় অসুবিধায় ফেলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু না এসে যে উপায়

নেই, পিসিমার বাড়িতে তোমার যাওয়া তো প্রায় বন্ধ হয়েছে। সেখানে এসব কথা তোমায় জানাতেও পারতাম না।"

একটু থেমে করুণা আবার অস্থির হয়ে উঠল আবেগে—সত্যি কি আমায় নিয়ে যাবে জোর করে! কিছুই আমরা করতে পারব না?

সেদিন কি আশ্বাস, কি সান্ত্বনা দিয়ে করুণাকে তার পিসিমার বাড়ি রেখে এসেছিলাম, তার বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মনে যত বড়োই ব্যথা পেয়ে থাকি না, কিছুই তারপর করতে পারিনি এটা ঠিক।

করুণাকে তার মামারা জোর করে কিনা জানি না, তারপর পাটনায় নিয়ে গেছেন; যাবার আগে দেখা করবার সুযোগও মেলেনি আমাদের।

নিমন্ত্রিত অবশ্য হইনি, কিন্তু একদিন কোথা থেকে করুণার বিয়ে হয়ে যাওয়ার সংবাদও কানে এসেছে। নির্লিপ্ত নির্বিকার মনে সে-সংবাদ শুনেছি এমন কথা বলতে পারব না, কিন্তু আজ বিশ্লেষণ করে দেখে বুঝতে পারি এ-সংবাদ পাবার পর কয়েকটি দিন ও রাত যে আমার কাছে হতাশায় ধূসর হয়ে গেছে, তা প্রধানত করুণার দুঃখের কথা ভেবে। ভালবেসে না পাওয়ার ব্যর্থতা সেদিন নিজের দিক দিয়ে নয়, করুণার দিক দিয়েই উপলব্ধি করেছি, এবং সেই উপলব্ধির বেদনায় নিজের আত্মপ্রসাদ কিছু মেশানো ছিল কিনা তা বোঝবার শক্তি তখন ছিল না।

করুণার স্মৃতি যখন ম্লান হয়ে এসেছে তখনও মনের কোন্ গোপন কোণে এ বিশ্বাস বুঝি ছিল যে আমি ভুললেও সে কোনোদিন ভুলতে পারবে না!

সে-বিশ্বাসে রূঢ় আঘাত পাওয়ার পরই মনের যে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া শুরু হল তাতে নিজের কাছেই নিজে কেমন একটু লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু তবু আত্মসংযম করতে পারলাম না।

করুণা খানিক বাদে যখন আমার ঘরে এল তখন আমার আচরণে ও কথায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চেষ্টা করলে হয়তো সেও লক্ষ্য করতে পারতো।

করুণা খাবার প্লেটটার দিকে চেয়ে বললে—"একি!. কিছুই যে খাওনি!"

পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে আঁটতে তার দিকে ফিরে চাইলাম; একটু হেসে বললাম—"লৌকিকতার বদলে লৌকিকতাই করতে হয় যে: দুর্ভিক্ষপীড়িতের মতো প্লেট সাফ্ করে ফেললে তুমি ভাবতে কি?"

"তুমি এখনো সেই এক কথা ধরে বসে আছো!"—করুণার স্বর একটু যেন ক্ষুণ্ণ।

"এক কথা ধরে বসে থাকা আমার একটা দুর্বলতা করুণা, এখনও এটা শোধরালো না।"—আমার স্বর বেশ গাঢ়।

করুণা অন্যদিকে ফিরে খাবার প্লেটটা সরিয়ে রাখছিল, তার মুখ দেখতে পেলাম না। কিন্তু যে উত্তর সে দিলে তাতে সহজ কৌতুক ছাড়া আর কিছুরই আভাস নেই।

"আর সব দুর্বলতা তাহলে শুধরে ফেলেছ!"—আমার দিকে ফিরে করুণা আবার বললে—"একি, এরই মধ্যে বেরুচ্ছ নাকি?"

"হাঁ, গাড়িটার কতদূর কি হল একবার দেখতে তো হয়!"

"তুমি দেখলেই তো সেটা তাড়াতাড়ি মেরামত হয়ে যাবে না। উনি তো খোঁজ নিয়ে আসবেন বলেছেন। ওঁর ফিরতে আর দেরি নেই। তোমায় থাকতেই বলে গেছেন।"

"সুতরাং ততক্ষণ তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে বলছ?"—হেসে বলবার চেষ্টা করলাম।

সকৌতুক মুখভঙ্গি করে করুণা বললে—"তা করতে পারো।"

আমার স্বর আপনা থেকে তখন বুঝি গাঢ় হয়ে এসেছে—"অনায়াসে বলে ফেললে যে করুণা!"

"এমন কি একটা কঠিন কথা যে অনায়াসে বলা যায় না?"—করুণার মুখে একাধারে হাসি ও বিস্ময়।

"এমন-কিছু কঠিন নয় করুণা? সত্যি বলছো? আমার সঙ্গে একা বসে গল্প করতে তোমার ভয় করে না? আমার যে নিজেকে এখনো ভয় করে।"

"তোমার মাথাটি বেশ খারাপ হয়েছে দেখছি।"—বলে হেসে আমায় বেশ একটু অপ্রস্তুত করে করুণা এবার বেরিয়ে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে আবার বললে—"তুমি কিন্তু যেও না, আমি এখুনি আসছি।"

কিন্তু অনেকক্ষণ করুণা তারপর আর আসে না। ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে মনের মধ্যে কী একটা জ্বালা অনুভব করি। সেটা আমার নিজের না করুণার বিরুদ্ধে বোঝা শক্ত। হয়তো সেটা নিয়তির বিরুদ্ধে।

কী দরকার ছিল এমন করে আবার তার সঙ্গে দেখা হবার! দেখা হওয়াটা দৈবের আয়োজিত পরিহাস ছাড়া আর কি?

ক-দিন ছুটি পেয়ে মোটরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কাল রাত্রে এই শহরের মাঝখানে এসে যখন তার কল হঠাৎ বিগড়ে গেছল তখন জঙ্গলের

পথে না হয়ে একটা ভদ্রগোছের শহরের মধ্যে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদই দিয়েছিলাম। ভবিষ্যৎটা তখন জানতে পারলে বোধহয় জঙ্গলের পথটাই শ্রেয় মনে করতাম।

একে রাত্রিকাল, তায় অচেনা শহর। ডাকবাংলো ও স্টেশনের ওয়েটিংরুম থেকে দরিদ্রতম হোটেল পর্যন্ত টাঙ্গা করে ঘুরে আশ্রয় না পেয়ে শেষে যে কারখানাতে মোটর মেরামত করতে দিয়েছিলাম সেখানেই ফিরে গেছলাম হতাশ হয়ে। সেখানেই বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়। কাছাকাছি একটা কয়লার খনিতে তিনি কাজ করেন। সেখানকার কি প্রয়োজনে এ-কারখানায় এসেছিলেন। প্রবাসে বিপন্ন বাঙালীর সাহায্যে তিনি নিজে থেকেই অগ্রসর হয়ে তাঁর বাড়িতে রাত্রি কাটাবার প্রস্তাব করেছিলেন। সামান্য একটু আপত্তি হয়তো করেছিলাম, কিন্তু তিনি তা শোনেননি।

শহরের নির্জন এক প্রান্তে বিমলবাবুর বাড়ি। সেখানে পৌছে দেখা গেছল সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে বিমলবাবু বলেছিলেন—"আজ আমার আসবার কথা ছিল না কিনা! চাকর ব্যাটারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে!"

খানিকক্ষণ পরে একটি মহিলাই লণ্ঠন হাতে এসে বাইরের দরজা খুলে নিদ্রা জড়িত স্বরে বলেছিলেন—"বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি যে বলে গেছলে আজ আসবে না!"

বিমলবাবু হেসে বলেছিলেন—"বরাতে একটা পরোপকারের পুণ্য ছিল, তাই বোধহয় আসার সুবিধে হয়ে গেল। আমি না এলে এই ভদ্রলোক একটু বিপদেই পড়তেন বোধহয় অজানা শহরে!"

করুণা এইবার আমায় দেখতে পেয়েছিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে সরে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বিমলবাবু তখনও বলে চলেছেন—"তুমি চাকরগুলোকে ডেকে দাও, বাইরের ঘরটা খুলে একটা বিছানা ঠিক করে দিক। ভদ্রলোকের একটু কষ্ট হবে—"

হঠাৎ তাঁকে করুণার কথায় সবিস্ময়ে থেমে যেতে হয়েছে।

করুণা হেসে বলেছে—"বিদেশ-বিভুঁয়ে একটু কষ্ট হলই বা ভদ্রলোকের!"

বিমলবাবু অবাক হয়ে আমাদের দুজনের মুখের দিকে চেয়েছেন—"তার মানে! এঁকে তুমি চেনো নাকি!"

"তা একটু চিনি বৈকি!"—করুণা হেসে উঠেছে।

"কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যটা কিসের! তোমার অচেনা বলে আমার চেনা হতে নেই! তোমার সঙ্গে তো মাত্র তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তার আগে কুড়ি বছর আমি সলিটারি সেলে ছিলাম মনে করো!"

বিমলবাবু হেসে ফেলে বলেছেন—"কিন্তু ভদ্রলোককে বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের দাম্পত্য জীবনের নমুনাটা নাই দেখালে।"

করুণা গম্ভীর হবার ভান করে বলেছে—"ও, আমি শুধু ঝগড়া করি এই তুমি বোঝাতে চাও!"

এবার একটা-কিছু বলা উচিত বলেই হাসবার চেষ্টা করে কথা বলেছি—"ব্যবসাই পেশা বিমলবাবু, নমুনা দেখে আমি ভুলি না।"

এতদিন বাদে করুণার প্রথম আলাপের ধরনে তখনই মনে কোথায় আমার একটা খট্‌কা লেগেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন নিজেই বেরিয়ে পড়ব কি না ভাবছি তখন করুণা এল। সাজ-পোশাকের পরিবর্তন দেখে যা বলতে যাচ্ছিলাম নিজে থেকেই তার উত্তর দিয়ে সে বললে—"একটু বাইরে যেতে হবে। আসবে আমার সঙ্গে?"

চাদরটা আলনা থেকে তুলে নিয়ে বললাম—"শুধু আদেশের অপেক্ষা! কিন্তু কোথায় যাচ্ছ?"

"বাজার করতে।"—বলে করুণা হাসলে।

"বাজার করতে!"—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি তো প্রায়ই যাই।"—সে হেসে বললে—"এখানে 'চেঞ্জার' ছাড়া বাসিন্দাদের মেয়েরা বড়ো একটা নিজেরা বাজারে যান না বটে, কিন্তু আমি ও-সব মানি না; উনি না থাকলে আমি নিজেই চাকর নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

"কিন্তু বিমলবাবু তো আজ আছেন!"

"ও, তোমায় বুঝি বলা হয়নি! উনি খবর পাঠিয়েছেন আজ আসতে পারবেন না, হঠাৎ বিশেষ জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন।"

করুণা বেশ সহজভাবেই কথাটা বলে গেল। কিন্তু আমি রাস্তার মাঝেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম—"তা হলে?"

"তা হলে আর ভাবনা কিসের! উনি না থাকলে কি তোমার যত্ন হবে না!"
করুণার চোখে মুখে কৌতুকের দুষ্টু হাসি!

"তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করলে আমায় একাই এগিয়ে যেতে হবে।"

অগত্যা নীরবে তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হল। এদিকের পথটা বেশ নির্জন। দূরে দূরে দু-একটা বাড়ি। তারও অনেকগুলি খালি পড়ে আছে। রাস্তায় লোক নেই বললেই হয়।

খানিকদূর নীরবে চলার পর প্রশ্ন না করে পারলাম না—"বিমলবাবু আজ রাত্রে ফিরবেন তো?"

"বোধহয় না। এখন দু-চার দিন হয়তো সেখানে থাকতে হবে।"

আবার নীরবে অনেকটা পথ পার হয়ে গেলাম। করুণা কয়েকবার আমার দিকে ফিরে তাকাবার পর হেসে বললে—"কি ভাবছো অত গম্ভীরভাবে?"

"ভাবছি আজই আমায় চলে যেতে হবে।"

"তোমার গাড়ি তো আজকের মধ্যে মেরামত হয়ে উঠবে না।"

"গাড়ি এরা পরে পাঠিয়ে দেবেখন। আমি ট্রেনেই যাবো।"

"এত ব্যস্ত কেন? তোমার এখানে ভয় কিসের?"

রাস্তার মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়লাম—"বলেছি তো ভয় আমার নিজেকে। নিজেকে আমি বিশ্বাস করি না।"

করুণা এবার বেশ জোরেই হেসে উঠল—"না-ই বা করলে, তাতে কারুর তো কোনো ক্ষতি নেই!"

না, এ বুঝি আর সওয়া যায় না। হঠাৎ সমস্ত সংযম হারিয়ে তার হাতটা ধরে ফেললাম—"ক্ষতি যদি তোমারই হয়..."

করুণা হাত ছাড়িয়ে নিল না। কিন্তু পরিহাসের হাসিতে আমার সমস্ত আবেগকে নিষ্ঠুরভাবে হাল্‌কা করে দিয়ে বললে—"কেমন করে হবে? আমি তো নিজেকে বিশ্বাস করি!"

করুণার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—"সে বিশ্বাস এখনো কি ভেঙে চুর হয়ে যেতে পারে না করুণা? সমস্ত নোঙর ছিঁড়ে তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ঢেউ কি আসতে পারে না?"

করুণার চোখে সেই দুর্বোধ সকৌতুক হাসি—"কি জানি, পরীক্ষা অবশ্য হয়নি।"

তারপর' কি বলতাম ঠিক জানি না, কিন্তু রাস্তা এবার জনবহুল হয়ে এসেছে। বাধ্য হয়েই চুপ করে গেলাম।

সকালবেলা বাইরে বার হবার পোশাকে করুণার একরূপ দেখেছিলাম। দুপুর-বেলা ষোড়শোপচার আহারের আয়োজনের আসনের সামনে বসে তার আর একরূপ দেখলাম। একটি সাদা সেমিজের ওপর লাল চওড়া কস্তাপাড় শাড়ি পরে আধ-ঘোমটার পাশ দিয়ে ভিজে এলোচুল পিঠে এলিয়ে সে কাছে এসে বসলো। এমন আশ্চর্য তাকে কোনোদিন লাগেনি।

পাখাটা নাড়তে নাড়তে হেসে সে বললে—"কি দেখছো? কখন দেখোনি নাকি!"

"মনে হচ্ছে সত্যি কখনও দেখিনি!"

"তা হতে পারে!"—বলে সে অদ্ভুতভাবে হাসলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, আমার বাজার করা দেখে কি ভাবছিলে বলো তো?"

"এই কথাই ভাবছিলাম যে তুমি আমার কাছে একটা নতুন আবিষ্কার!"

"তাই নাকি, কিন্তু, দোহাই, বেচারা কলম্বাসের দাবিটুকু উড়িয়ে দিও না।"

"কলম্বাসেরও আগেকার দাবি যদি থাকে?"

"দাবি থাকলেও দলিল নেই তো!"—নিজের রসিকতায় করুণা নিজেই হেসে মাত করে দিলে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ খেয়ে যাবার পর বললাম—"দলিলের দাম সকলের কাছে নেই! ও তুচ্ছ জিনিস অনায়াসে পুড়িয়ে ফেলা যায়।"

এবার করুণা হাসলো না। আমার মুখের দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে—"তোমায় মিষ্টি দেওয়া হয়নি," বলে হঠাৎ উঠে গেল।

তারপর মিষ্টি করুণা নিয়ে এল না, নিয়ে এল ঠাকুর।

কিন্তু খানিক বাদে ঘরে সে নিজেই পান নিয়ে এল এবং হঠাৎ বলে বসলো—"তুমি আজ সন্ধ্যের গাড়িতেই তাহলে যাচ্ছ?"

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আমারই মনের ভুল, না তার মুখে একটা অস্ফুট অস্থিরতার ছায়া?

বললাম—"বেশ, তাই যাবো।"

"বেশ তাই যাবো মানে? আমি যেন তোমায় জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি! আমি তো তোমায় থাকতেই বলছি, তুমি নিজেই তো যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলে তখন।"

গলার ঝাঁঝটা এবার লুকোবার নয়।

হেসে বললাম—"আমি কি তোমায় দোষ দিচ্ছি? আমার সত্যিই না গেলে নয়!"

একটু যেন লজ্জিত হয়ে করুণা হাসবার চেষ্টা করে বললে—"তা জানি, এমন জায়গায় তোমার মন টেঁকে? কিন্তু শোনো, সন্ধ্যায় ঐ একটি ছাড়া আর গাড়ি নেই তা জানো তো? ঠিক সাড়ে ছটায়, মনে থাকে যেন।"

গাড়ির সময় আমার মনে রাখবার প্রয়োজন ছিল না। বিকেল না হতেই জিনিসপত্র বাঁধিয়ে, আমার মোটরের কারখানায় খবর দিতে পাঠিয়ে, স্টেশনে যাবার গাড়ি ডাকিয়ে করুণা নিজেই সব বন্দোবস্ত করে ফেললে এবং স্টেশনে যাবার পনেরো মিনিটের পথ যেতে পাছে কোনো গোলমাল হয় বলে এক ঘণ্টা আগে আমায় গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

এতক্ষণ আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু বলবার অবসর তার মেলেনি।

বাড়ি থেকে টাঙ্গায় ওঠবার সময় সে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—"তুমি আমায় কি ভাবছো কে জানে! যেন তোমায় বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি মনে হচ্ছে, না?"

"সেইটুকু ভেবেই যা কিছু সান্ত্বনা!"

করুণা হেসে উঠল—"সান্ত্বনাটা এত সস্তা হলে আর সত্যিকার কিছু মেলে!"

টাঙ্গাওয়ালার গাড়ি চালানোর শব্দে তার হাসির রেশ মিলিয়ে গেল।

এ-গল্পের শেষ ঐখানেই হলে ভালো হত, কিন্তু তা হল কই!

স্টেশনে যখন পৌছলাম তখনও ট্রেনের অনেক দেরি। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে এদিক-ওদিক অকারণে ঘুরে বেড়িয়েও সময় কাটাতে না পেরে তখন বই-এর স্টলে এসে দাঁড়িয়ে কি কেনা যায় ভাবছি। হঠাৎ পাশে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম।

"একি! করুণা, তুমি এখানে?"

ম্লান একটু হেসে বললে—"এই এলাম!"

স্টেশনের শেডের আবছা আলোর দরুন, না সত্যিই করুণাকে কেমন দুর্বল দেখাচ্ছে।

স্টল থেকে একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না করুণা, হঠাৎ স্টেশনে আসার মানে?"

করুণা আবার হাসলো, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে—"দলিল পুড়িয়ে দিয়ে এলাম।"

খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ব্যাকুলভাবে বললাম—"কি বলছো করুণা!"

"খুব অসম্ভব কি কিছু বলছি? সব নোঙর ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো ঢেউ কি আসে না কখনো?" করুণার স্বর ক্রমশ যেন গাঢ় হয়ে উঠল।

আমার বুকের একেবারে কাছে এগিয়ে এসে চোখের দিকে চোখ তুলে সে বললে—"তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না? যাবে না নিয়ে, বলো?"

অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লাম—"আমি……তোমায় নিয়ে……"

"কোথায় যাবে ভাবছো? যেখানে খুশি!"

কোনো কথা এবার আর মুখ দিয়ে বেরুল না। মনের ভেতর শুধু একটা অস্থির আলোড়ন অনুভব করছি।

"তোমায় অনেক অসুবিধা, অনেক লাঞ্ছনা সইতে হবে জানি, কিন্তু আমিও তো তারই জন্যে প্রস্তুত হয়ে সমস্ত লজ্জা, নিন্দা মাথায় নিয়ে এসেছি!"

করুণা কাতরভাবে মুখের দিকে চেয়ে আছে। কী বলব? কী এখন বলতে পারি! নির্বোধের মতো আমিই তার রুদ্ধ বন্যার বাঁধ খুলে দিয়েছি, এখন তাকে কেমন করে ফিরিয়ে দেব?

"কিন্তু সব কথা তুমি বোধ হয় ভালো করে ভেবে দেখোনি, করুণা। যে ঝড় এবার উঠবে তা কি তুমি পারবে সইতে? তার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো আমরা পরস্পরকেই একদিন ঘৃণা করতে শুরু করব।"

করুণা তখনও আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কিন্তু ধীরে ধীরে—অত্যন্ত ধীরে ধীরে তার সমস্ত মুখ যেন বিদ্রূপের হাসিতে ভরে উঠল।

"তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আর একটু হলেই নোঙর উপড়ে গেছল আর কি!"—করুণা এবার সশব্দেই হেসে উঠল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সমস্তই কি তবে আমাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে অভিনয়!

করুণা সহজভাবে বললে—"যাও, ট্রেন আসবার ঘণ্টা পড়েছে। আমার ট্রেনেরও বোধহয় দেরি নেই।"

"তোমার ট্রেন!"

"পিসিমারা কলকাতা থেকে আসছেন। তাঁরা বাড়ি চেনেন না। উনিও নেই, তাই নিজেই এলাম নিয়ে যেতে। শুনে খুব হতাশ হলে বুঝি?"

কোনো কথা আর না বলে ও-ধারের প্লাটফর্মে যাবার জন্যে ওভারব্রিজের দিকে অগ্রসর হলাম। করুণাকে শেষ যখন দেখতে পেলাম তখন স্টলের বইগুলোর দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে।

সত্যিই পিসিমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সে কি স্টেশনে এসেছিল?

জীবনে কোনোদিন সে-কথা জানা যাবে না।
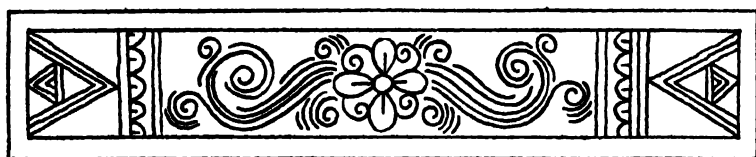
০০ এক ০০

সেদিন নয়নমোহনের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। এসেছিলেন এক বিয়ের বাড়িতে বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত। দেখা হতেই দু-হাত ধরে বললেন, "মনে পড়ে?"

আমি তাঁর দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললুম, "না, মনে পড়বে কেন? মনে পড়ার তো কারণ নেই? মনে পড়ার তো কথা নয়?"

তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। "ইচ্ছা ছিল তোমার ওখানে উঠতে। কিন্তু জানোই তো বরযাত্রীরা স্বাধীন নয়। এসেছি একটা দলের সঙ্গে দলচর হয়ে। সেই জন্যে—"

"সেই জন্যে একখানা চিঠি লিখেও জানাতে নেই যে আসবার কথা আছে ময়মনসিংহে। না, নয়নদা, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। মনে পড়বে যদি তুমি এখনো আমার ওখানে ওঠো।"

"না ভাই! এ যাত্রা নয়। এরপরে আবার যদি কোনো দিন আসা হয় তো নিশ্চয়। এবার আমাকে মাফ করতে হবে। বুঝলে?"

তাঁর কণ্ঠস্বরের কারুণ্য আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করলুম না, শুধু একবার চা খেতে ডাকলুম। তিনি রাজী হলেন। পরের দিন চা খেতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে একবার কি বলেছিলে মনে আছে?"

বিশ বছর পরে দেখা। কী করে আমার মনে থাকবে কী বলেছিলুম কবে। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, মনে নেই।

"বলেছিলে, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ!"

"তাই নাকি! কই, আমার তো মনে নেই।"

"তোমার মনে থাকার কারণ নেই, আমার মনে থাকার কারণ আছে। তাই সেদিন ভাবছিলুম, তোমার কথাই অবশেষে সত্য হল কবি।"

তিনি আমাকে কবি বলে ডাকতেন।

"কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হত।" তিনি সেই নিশ্বাসে বললেন—"এ যা হল তা আরো মর্মান্তিক।"

আমি জানতুম নয়নদার বিয়ের গল্প। জানতুম না তার পরিণতি। নয়নদার বিয়েতে আমি বরযাত্রী হয়েছিলুম, কবিতা লিখে ছাপিয়েছিলুম। বোধহয় বৌদির রূপ দর্শন করে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দেননি, যাকে দেননি সেও রূপবতী কবির চোখে।

আমি তো রিয়ালিস্ট নই, হলে সাফ কথা শুনিয়ে দিতুম নিষ্ঠুরভাবে, কিন্তু যাঁর বিয়ে, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। রূঢ় বাস্তব তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। বিয়ের পরে তিনি আমাদের কারো কারো কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, "ভাই, এ যে পোড়া কাঠ!" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন. "দাঁত বার করা, নাক চাপা, এযে করালী!"

নয়নমোহনের নিজের মত ছিল না, তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন আত্মঘাতী হবেন। কিন্তু তাঁর দাদারা তাঁর মাকে বুঝিয়েছিলেন যে ডিক্রিদারের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে ডিক্রিদারের দুহিতাকে বধূ করতেই হবে! মা বললেন, "সম্পত্তি যদি যায় তো কে তোকে সুন্দর মেয়ে দেবে? কী দেখে? তখন তো সেই কালো মেয়েই বিয়ে করতে হবে। দেখিস আমার কথা ফলে কি না ফলে।"

এর উত্তরে নয়নদা বলেছিলেন, "তা কেন হবে? আমি যদি বিয়ে না করি?"

"শোনো কথা! যদি বিয়ে না করি। তা কি কখনো হয়! বিয়ে না করলে তোকে রেঁধে খাওয়াবে কে?"

নয়নদার ঠাকুমা তখনো বেঁচে। তিনিই নাতির নাম রেখেছিলেন নয়নমণি। নয়নমণি থেকে বিবর্তনসূত্রে নয়নমোহন। বুড়ী বললেন, "তোর বাপও বলত বিয়ে করব না, সন্ন্যেসী হব। কী বলে ওকে, ওই যে কী আনন্দ? বেবাক আনন্দ। বাপ বিয়ে না করলে তুই হতিস কী করে? বল্ আমাকে। বল্।"

বৌদিদিরা বললেন, "দেখছো তো আমাদের দশা। রূপ থেকেও নেই, কেননা রূপো নেই। গয়না পর্যন্ত বন্ধক। আসল জিনিস হল টাকা। তোমার শ্বশুরের তা আছে। এমন পাত্রী হাতছাড়া করতে নেই। করলে তোমায় বলব লক্ষ্মীছাড়া।"

নয়নমোহন বাড়ির অবস্থা জানতেন না। বৌদিদিদের কথায় হুঁশ হল। তিনি ছিলেন রিয়ালিস্ট, তাই শেষ পর্যন্ত মত দিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তো দেননি। অন্তর কেন তা মানবে! সেইজন্যে বিয়ের পরের দিন তাঁর কাঁদুনি। এবং সেই উপলক্ষে আমাদের সান্ত্বনাবাণী।

আমরা যারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলুম, আমরা জানতুম এ বিবাহে তিনি সুখী হবেন না। হতে পারেন না। কারণ আর সব বিষয়ে বাস্তববাদী হলেও বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁর পরম কাম্য ছিল তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী। কখনো কাউকে ভালবেসেছিলেন কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু যাকে তিনি ভালবাসবেন সে কেমন হবে তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

বিয়ের পরে রসিকতা করে কে একজন তাঁকে বলেছিল, "তুমিই জিতলে। যা চেয়েছিলে অবিকল তাই পেলে। তন্বী মানে রোগা, শ্যামা মানে কালো, শিখরিদশনা মানে পাহাড়ের মতো দাঁত, আর পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মানে ফাটা তেলাকুচার মতো ঠোঁট দুটির মাঝখানে অনেকটা ফাঁক!"

নয়নদা বেচারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ও-কথা শুনে। তার সবচেয়ে মনে লেগেছিল আরেকজনের বক্রোক্তি, "নয়ন, তুমি তো এখন চোখে অন্ধকার দেখছ!"

আমরা তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করি, নইলে তিনি হয়তো বিকৃতিবশত কিছু একটা করে বসতেন। আমি যে ঠিক কী কথা বলেছিলুম আমার মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল দেখছি।

"তোমার কথাই অবশেষে সত্য হল," তিনি বললেন, "কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হত। এ যা হল তা আরো মর্মান্তিক।"

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে, নয়নদা? খারাপ কিছু নয় তো?"

"না। খারাপ কিছু নয়। সমূহ কুশল।"

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু নিরস্ত হলুম না। জানতে চাইলুম, "তা হলে আরো মর্মান্তিক কেন?"

তিনি বললেন, "শোনো তা হলে।"

০০ দুই ০০

সত্যেন দত্তের একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ মনে পড়ে?

"অতি বড়ো অভাগা যে আমি একটা
আমি কিনা পেয়ে গেলুম মনি ব্যাগটা।"

বিয়ের পরে আমার মনোভাব ধীরে ধীরে দাঁড়াল ঐ জাপানীটির মতো। আর কিছু না পাই টাকার থলি তো পেয়েছি। এই বা ক-জন পায়! জীবিকার জন্যে আমাকে পরের চাকরি করতে হবে না, স্বাধীন ব্যবসাতে মূলধনের অভাব হবে না, ব্যবসায় ফেল মারলেও সংসার অচল হবে না, লক্ষ্মী হলেন অচলা, একি কম কথা। এত যে দুশ্চিন্তা ছিল এম-এ-পাস করে তারপরে কি করব, কোথায় স্থিতি পাব, সব দুশ্চিন্তা জল হয়ে গেল! সমবয়সীদের কেউ কেউ এখনো স্থিতি পায়নি, খবর রাখো বোধহয়। বিশ বৎসর পরেও তাদের জীবনযাত্রা অস্থির। আর আমি সব দিক থেকে গুছিয়ে নিয়েছি। স্বাস্থ্য আমার এত ভালো যে একদিনও অনিদ্রা হয় না। আর তোমার তো শুনি কোনোদিনই সুনিদ্রা হয় না। তুমি কৃপার পাত্র। কালো মেয়ে বিয়ে করলে ভালো থাকতে।

জানো তো আমাদের কেমন খানদানী বংশ। আগেকার দিনে সুন্দর মেয়ে আমরা লুট করে বিয়ে করতুম। তারপরে কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে সুন্দর মেয়ে ঘরে আনি। বর্ণ কৌলীন্য যখন উঠে গেল তখন কাঞ্চন কৌলীন্য আমাদের ঐ কাজে লাগল। আমরা পণ নিতুম না, যৌতুক নামে মাত্র নিতুম, কিন্তু বৌ আনতুম সুন্দরী দেখে। এর ব্যতিক্রম যে হত না তা নয়। কিন্তু এমন কোনো নিয়ম আছে কি—যার নিপাতন নেই? তা বলে আমার নিজের বেলা ব্যতিক্রম হবে এ আমি কল্পনা করিনি। আমার দাদারা সুন্দরী বিয়ে করেছেন। আমার ধারণা ছিল আমারও জন্মস্বত্ব সুন্দরী ভার্যা। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, সম্পত্তি যদি মর্টগেজ করে না যেতেন, তা হলে এ অঘটন ঘটত না, বংশের ব্যতিক্রম হয়ে নাম হাসাতুম না।

তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমার মতো ভাগ্যবান বন্ধুদের সবাইকেই হিংসা করি। যেদিন তোমার বিয়ের খবর পড়ি, সেদিন যেন বুকে শেল বাজল। বিশ বছর দেখা হয়নি বলে আশ্চর্য হচ্ছ। এ জীবনে যে দেখা হল এইটেই আশ্চর্য। তুমি জিতেছ, আমি হেরেছি। তোমার সঙ্গে কোন্ মুখ নিয়ে দেখা করতুম। আমারি মতো যারা দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরে দু-বছরে একবার। কেউ কেউ আবার এমন হতভাগা যে সেই জাপানী বেচারার মতো মনিব্যাগটা তুলে নিয়ে দেখে—

"ট্রামগাড়ি চাপা পড়া ব্যাঙ্ চ্যাপটা।"

গোপেনকে মনে আছে তোমার? আবগারী সুপারিন্‌টেনডেণ্ট হয়েছে এখন। গোপেন আমাকে রামপ্রসাদী গান গেয়ে শোনাত। বলত, কালো ভুবন আলো। তেমনি তার সাজা পেতে হল নিজেকে, বিয়ে হল কালো মেয়ের সঙ্গে। আশা করেছিল শ্বশুর তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে যাবেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে দিয়ে গেলেন আরো কয়েকটি কৃষ্ণকলির অভিভাবকত্ব।

গোপেন কিন্তু আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছিল। তাকে বলতুম, আচ্ছা, কালো না হয় আলো, কিন্তু খাঁদা কি করে টিকলো হবে? সে বলত চীন দেশে খাঁদা নাকের উপর তিন হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হয়ে আসছে, ও দেশের রামপ্রসাদী গান কালী ভক্তির নয় খাঁদী ভক্তির। তা যেন হল, কিন্তু দাঁত বার করা কি সহ্য হয়? যেন খেতে আসছে! গোপেন বলত, এর উত্তর দিয়ে গেছেন জয়দেব কবি। বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী। খেতে আসছেন না, বলতে আসছেন যে—তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমার প্রিয়া। বচনের উল্লাসে জ্যোৎস্নার মতো ফুটে উঠেছে শুভ্রকান্তি দর্শন।

মানুষের বাইরেটা কিছু নয়, ভিতরটাই আসল। রূপ কিছু নয়, গুণই প্রধান। এ কথা আমি কত লোকের মুখে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি, মুখ ফুটে বলেওছি। কিন্তু সান্ত্বনা পাইনি, রূপের স্বাদ কি গুণে মেটে? রূপ ক্ষণকালের, গুণ চিরকালের। তা বলে ক্ষণপ্রভার মূল্য কিছু কম? যখন শুনতুম বৌটি বড়ো গুণের তখন খুশি হতুম খুবই, কিন্তু তার চেয়েও খুশি হতুম যদি শুনতুম চোখ দুটি তো বেশ। গুণের প্রশংসা যত শুনতুম রূপের সুখ্যাতি তার সিকির সিকিও নয়। রাগ ধরত যখনই ওরা বলত বৌ-মানুষের রূপের প্রয়োজন

নেই। রূপের প্রয়োজন নাকি রূপোপজীবিনীর। তবে বৌদিদের আনা হয়েছিল কী দেখে? তাঁদের রূপবন্দনায় পঞ্চমুখ যাঁরা তাঁরাই আবার রূপের অসারতা ঘোষণা করতেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত তোমার উক্তি। রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন। সবাইকে দিয়েছেন তো কৃষ্ণাকেও দিয়েছেন! তা হলে আমার চোখে পড়ে না কেন? লোকের চোখে পড়ে না কেন? এর উত্তর, দেখবার চোখ তিনি সবাইকে দেননি। আমাকে দেননি, লোকেদেরও দেননি। কৃষ্ণার রূপ আছে, আমাদেরই চোখ নেই। একি সত্য? অনেক ভেবেছি, কিন্তু সত্য বলে মনে নিতে পারিনি। ধরে নিয়েছি এটা একটা স্তোকবাক্য। একথা বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা জানিয়েছ। ওটা তোমার বন্ধুকৃত্য। কিন্তু বন্ধুতা নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য নয়। তোমার বিয়ের পরে মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে পরিহাস করে ওকথা বলেছিলে। ওটা তোমার শ্লেষ। কিছুকাল তোমার ওপর বিরূপ হয়েছিলুম। তোমাকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখে মাসিক-পত্রে পাঠিয়েছিলুম। তারা ছাপল না, ভাগ্যিস ছাপেনি। ক্রমে আমার প্রতীতি হল যে রূপবোধ একটা সংস্কার। জনম অবধি আমি রূপ নিরীক্ষণ করেছি, সেইজন্যে কৃষ্ণাকে মনে হচ্ছে কুরূপ। ধরো যদি শিশুকাল থেকে কুরূপ নিরীক্ষণ করতুম তা হলে কি কৃষ্ণাকে মনে হত কুরূপ? না, তা হলে তাকে মনে হত আর সকলের অনুরূপ। এই প্রতীতির পরে আমি একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হতে চাইলুম। কেন, সে কথা খুলে বললুম না, বৌদিদিদের মুখদর্শন করে তারপর কৃষ্ণার মুখদর্শন করলে কৃষ্ণাকে কুরূপ দেখাবেই। এর একমাত্র প্রতিকার বৌদিদিদের মুখ দর্শন না করা। যে বাড়িতে কেবল কৃষ্ণাই একমাত্র নারী সে বাড়িতে সুরূপ কুরূপের বৈষম্য নেই। দেখলুম কৃষ্ণাকে আমার তত খারাপ লাগছে না। তার চোখদুটি সত্যই সুন্দর। তার প্রোফাইলের ফোটো নিয়ে দেখা গেল মন্দ মানায় না। রূপ বলতে আমরা শুধু গায়ের রঙ আর মুখের সৌষ্ঠব বুঝি। কিন্তু এতে অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। কৃষ্ণা ক্ষীণমধ্যা, এখানে তার জিত। সে সুকেশী, এখানে তার জিত। তার তনুরেখা বঙ্কিম ও সুমিত, এখানে তার জিত। তার গড়ন মাংসল নয়, দীঘল, এখানে তার জিত। তার হাতের আঙুল পায়ের পাতা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, এখানে তার জিত। এভাবে বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণার জিত

অনেক বিষয়ে। কিন্তু সৌন্দর্য তো বিশ্লেষণ করবার বস্তু নয়। আর আমিও নই সম্পূর্ণ নিরাসক্ত সমালোচক। ও যদি আমার না হয়ে পরের হত, আমি ওকে রূপের পরীক্ষায় পাস মার্ক দিতুম। কিন্তু আমার হয়েই বেচারা ফেল করেছে। এইটেই মর্মান্তিক।

একটি ছেলে একটি মেয়ে হবার পর আমি বাইরের বারান্দায় পৃথক শয্যা পাতলুম। কৃষ্ণা ভেবেছিল দু-দিনের বৈরাগ্য। একটু হেসেছিল। কিন্তু মাসের পর মাস কাটে, আমার সংকল্পের পরিবর্তন হয় না। আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছিলুম। ওদিকে কৃষ্ণার মনে দোটানা, সে একা শুয়ে শান্তি পায় না। একদিন শেষ রাত্রে সে এল আমার কাছে, এসে লুটিয়ে পড়ল। তার কণ্ঠে দুর্জয় ক্রন্দন। ধরা গলায় বলল, "তুমি কি আর আমার সঙ্গে শোবে না?"

তাকে অনেক বোঝালুম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, শেষে রাগ করে বললুম, "আমি কোথাও চলে যাব, হিমালয়ে কি পণ্ডিচেরিতে।"

শুনে সে কেঁদে আকুল। পরের দিন জেদ ধরল, "আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, এ বাড়িতে যেই আসে সেই জানতে চায় আলাদা বিছানা কেন। লজ্জায় মারা যাই।"

বাপের বাড়ি থেকে কয়েক মাস পরে আপনিই ফিরে এল। বাপের বাড়িতেও সকলে জানতে চায় আলাদা থাকার কারণ কী। লজ্জায় বাঁচে না। একদিন আমাকে মিনতি করে বলল, "অন্তত এক বিছানায় শোও। মাঝখানে থাকুক ছেলেমেয়ে। লোকলজ্জা থেকে বাঁচাও।"

তাই হল, কিন্তু ইতিমধ্যে দুজনের মনে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে আর বুজল না। এ যেন নেহাত একটা লোক-দেখানো সেতুবন্ধ। সকলে জানল আমরা একটি সুখী সম্ভ্রান্ত দম্পতি। আমরা জানলুম যে আমাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। অশ্রুজলের সাগর।

ভগবানকে ডেকে কত বলেছি, প্রভু, ওকে একটি দিনের জন্যে রূপবতী করো, দিনের আলোর মতো রূপ দাও। চিত্রাঙ্গদাকে দিয়েছিলে একটি বছরের জন্যে, কৃষ্ণাকে দাও একটি দিনের জন্যে।

০ ০ তিন ০ ০

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় নয়নমোহন চমকে উঠলেন।

"তোমার ওটা কি ঘড়ি না ঘোড়া হে!"
আমি বললুম, "ও ঘড়ি ফাস্ট চলছে।"
"কিন্তু আমার আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। আমরা আজ রাত্রের ট্রেনে যাচ্ছি। যেটা দশটায় ছাড়ে।"
"আর একটা দিন," আমি অনুরোধ করলুম, "এখানে থেকে গেলে পারতে, তোমার তো চাকরি নেই।"
"চাকরি নেই, কিন্তু যা আছে তা চাকরির বাড়া, মজদুররা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে, এখন গিয়ে তাদের মানভঞ্জন করতে হবে।"
এর পরে তিনি তাঁর কাহিনীরই খেই ধরলেন।

০ ০ চার ০ ০

কৃষ্ণা জানত যে তার রূপের অভাব আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছে, সেই জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত রূপের অভাব নিজের গুণ দিয়ে পূরণ করতে। অন্য কেউ হলে স্নো পাউডার মেখে সঙ সাজত, নানা রঙের শাড়ি ব্লাউজ পরে প্রজাপতি বন্‌ত। কিন্তু সাজ-পোশাকের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না বলে তারও লক্ষ্য ছিল না কোনোদিন। তার লক্ষ্য ছিল গুণের উপর। সে তার লক্ষ্যভেদ করেছিল। কিন্তু তবু আমার মন পায়নি। এর কারণ—রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। রূপের অভাব রূপ দিয়েই পূরণ করতে হয়। তা যে পেরেছে সে অসাধ্যসাধন করেছে। এই অসাধ্যসাধনে কৃষ্ণার সাধনা ছিল না। অন্য কোনো সাধনা এর স্থান নিতে পারে না। তাই তার গুণের সাধনা আমাকে জয় করেনি। উমার তপস্যা শিবের মতো বিরূপাক্ষের জন্যে। আমার মতো সুরূপাক্ষের জন্যে নয়। আমার নয়ন যদি সায় না দেয় তো মন সায় দেয় না। মন যদি সায় না দেয় তো দেহ সায় দিতে চায় না। গুণ দিয়ে কি বিকার দূর করা যায়?
আমি যে বিকার বোধ করি এ-কথা তাকে মুখ ফুটে বলিনি, সে বুদ্ধিমতী, নিজেই বুঝে নিয়েছিল, তাই একদিন আমাকে বলেছিল, "তুমি আর একটি বিয়ে করো, বা যেখানে ইচ্ছা যাও। এমন করে ক-দিন চালাবে?"
এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, "পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনে। যেমন চলছে চলুক।"

বস্তুত আমার একদণ্ড ফুরসত ছিল না। দিন রাত কাজ আর কাজ। হোসিয়ারীর কারখানা খুলেছিলুম, দেখাশোনা করতে হত আমাকেই, স্লীপিং পার্টনার আমার তিন সম্বন্ধী, ওয়ার্কিং পার্টনার আমি। কখন খাই, কখন শুই, কিছুই ঠিক নেই। শুধু এই ঠিক যে বছরের শেষে লাভ দেখাতে হবে। লাভ যদি দেখাতে না পারি তো সম্বন্ধীরা টাকা তুলে নেবেন। তখন আমি মূলধন পাব কোথায়? লাভ আমাকে দেখাতেই হবে।

কৃষ্ণা যখন উপলব্ধি করল যে তার গুণের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, রূপের সাধনাও সুদূরপরাহত, তখন আমাকে একা রেখেই ছেলেমেয়ে সমেত দার্জিলিং চলে গেল। সেখানেই তারা লেখাপড়া শিখবে ও মানুষ হবে। আমি দুঃখিত হলুম, কিন্তু বাধা দিলুম না। ওর একটা পরিবর্তন দরকার। কে জানে হয়তো শীতের দেশে বাস করে রঙটা এক পোঁচ ফরসা হতে পারে। যথালাভ।

অকস্মাৎ স্বাধীনতা পেয়ে আমার অবস্থাটা হল বৈপ্লবিক। যেমন হতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের। কী যে করি স্বাধীনতা নিয়ে, বহুকালের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে, বঞ্চিত জ্বালা নিয়ে—কী যে করি! কী যে করি!

তুমি শুনে অবাক হবে যে—কিছুই করলুম না। তার কারণ, যাই করতে যাই তাই মনে হয় তুচ্ছ। মনে হয় এমন কিছু করা উচিত, যা কেউ কোনো দিন করেনি। যা উচ্চাদপি উচ্চ। তেমন কিছুর নাগাল পেলে হয়। কাব্যের নায়িকারা হোসিয়ারী কল পরিদর্শন করতে এলে হয়, ট্রয়ের হেলেন, বৃন্দাবনের রাধা, ইরানের লয়লা, চিতোরের পদ্মিনী—কোথায় দেখা পাই এঁদের? কেউ কি এঁরা পথ ভুলে বক্তিয়ারপুর আসবেন না?

তোমার মনে আছে কিনা জানিনে, কলেজে আমার প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন আর প্রিয় কবিতা ছিল—"সুন্দরী নারীদের স্বপ্ন"। অবশ্য আরো প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস, কিন্তু টেনিসন একটু বিশেষ অর্থে প্রিয়—ঐ "সুন্দরী নারীদের" জন্যেই। হায়! এত যে তাঁদের নাম জপ করলুম, রূপ ধ্যান করলুন, তবু তো তাঁদের কারো করুণা হল না। যেন লাইনে ট্রেন দাঁড়ালেই আমার মনে হত এই ট্রেনেই তিনি এসেছেন, এসে আমাকে খুঁজছেন। সব কাজ ফেলে স্টেশনে ছুটে যেতুম, গিয়ে নিরাশ হতুম। লোকে বলাবলি করত, কি ট্রেনেই এঁর জানানা আসছেন। বাউণ্ডা হয়েছেন! আমি কিন্তু ওসব গায়ে মাখতুম না, নিরাশ হলেও, যেতুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন থেকে নামছেন ট্রয় দেশের হেলেন নয়, বৃন্দাবনের রাধা নয়, দার্জিলিং-এর কৃষ্ণা। ছেলেমেয়েদের দার্জিলিং-এর বোর্ডিং স্কুলে রেখে এসেছেন, সেখানে তারা সুখে আছে। আমার না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে একথা ভেবে তাঁর অস্বস্তি বোধ হল, তাই চলে এলেন। যাক্, আমাকে বাঁচালেন। লোকে স্বীকার করল, না লোকটা বাউরা নয়। আর আমিও স্বীকার করলুম যে স্বাধীনতার ঝক্কি পোষায় না। তার চেয়ে স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্টই মিষ্টি!

কিন্তু মোচার ঘণ্ট এবার মিষ্টি লাগল না। দেখা গেল কৃষ্ণা কেবল চিঠি লিখছে বসে। ধরে নিলুম ছেলেমেয়েদের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, চিঠি লিখে মনের ভার হালকা করছে, কিন্তু প্রতিদিন ওর নামে একই মানুষের লেখা খামে-বন্ধ চিঠি আসতে দেখে সন্দেহ জাগল, কার হাতের লেখা এসব, মেয়েলী হাতের কি না! কয়েকবার ইতস্তত করে ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করলুম তাকে। সে বিনা বাক্যে উত্তর দিল চিঠিগুলো আমার সামনে রেখে। বিস্ময়! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! উর্দু ভাষায় একজন উদীয়মান কবি দার্জিলিং-এ বসে গজল লিখছেন। সাকী বলে যাঁকে সম্বোধন করেছেন সে আমারই কৃষ্ণা! সাকীর কাছে নিত্য নূতন গজল আসছে স্বাক্ষরিত হয়ে। প্রেরণাও ফুরোয় না, গজলও ফুরোয় না। বলা বাহুল্য উর্দু আমরা দুজনেই জানতুম। আমিই শিখিয়েছিলুম কৃষ্ণাকে। স্বয়ং শিখেছিলুম মুসলমান বন্ধুদের কাছে। সে বিদ্যা যে এভাবে কাজে লাগবে কল্পনা করিনি। হতভম্ব হলুম, কবির নাম হাফিজ দিয়ে আরম্ভ। তাঁকে তাই হাফিজ বলে উল্লেখ করব।

হাফিজ নাকি পতঙ্গের মতো রওশনের রূপমুগ্ধ। রূপের বর্ণনা যা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে আবিষ্কার। এত রূপ যে আমার অগোচরে ছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারিনে। কারণ, কবি যা লিখেছেন তা পরিহাসের সুরে নয়। তবে কি এ-কথা সত্য যে আমার চোখে যে রূপহীনা অন্যের চোখে সে রূপসী? একি কখনো সত্য যে কু-রূপা বলে কেউ নেই, ওটা দৃষ্টিভ্রম? বা চোখের ধাঁধা?

তখন আমার মনে পড়ল তোমার উক্তি। ভগবান রূপ সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ। এই উর্দু কবি একজন শিল্পী। ইনি তাই কৃষ্ণার রূপ দেখে

রওশনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হায়, আমিও যদি শিল্পী হতে পারতুম! আমার শিল্প রচনার দৌড় বক্তিয়ারপুরের গণেশ মার্কা গেঞ্জি ও হনুমান মার্কা মোজা। এই চোখে ভগবানের দেওয়া রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চোখ দুটোকে বদলে নেওয়া চাই ভাবলুম, কিছুদিন হনুমান ও গণেশের ধ্যান ছেড়ে গৌরীশঙ্কর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা অবলোকন করব। স্ত্রীকে বললুম, "চলো, আমরা দার্জিলিং যাই। দেখে আসি, টুবলুকে—টুটুকে।"

আহ! কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে দু-চোখ জুড়িয়ে গেল! কী করে তার বর্ণনা দেব! আমি তো কবি নই। কিন্তু এও আমি বুঝতে পারিনে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো নারী থাকতে কৃষ্ণার মতো নারী কী করে বন্দনা পায়! কবিদের কি সত্যিকার সৌন্দর্যবোধ আছে! আমার তো মনে হয় না।

হাফিজকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। জরিদার শেরওয়ানী ও চুড়িদার পায়জামা পরে তিনি এলেন, শুনলুম তিনি নবাব ঘরানা। মুর্শিদাবাদে বাড়ি। পরের মুখে নিজের স্ত্রীর রূপ বর্ণনা তো শোনোনি? তুমি কী করে বুঝবে আমার ব্যথা। আমার যা লাগছিল—আমিই জানি। শুধালুম, "আচ্ছা একি তবে সবি সত্য হে আমার স্ত্রীর ভক্ত......" মনে আছে তো রবীন্দ্রনাথের সেই কৌতুকের কবিতাটি? "চিরভক্ত"কে "স্ত্রীর ভক্ত" করেছি।

কবি বললেন, "কাব্যের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। যেমন চিত্রের সত্য ফোটোগ্রাফের সত্য এক নয়। এও সত্য, আবার সেও সত্য।"

কৃষ্ণা সেখানে ছিল না, থাকলে হয়তো আঘাত পেত। কেননা তার ইতি-মধ্যে ধারণা জন্মেছিল সে যথার্থ ই সুন্দরী। দুই অর্থে—কাব্যে ও জীবনে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে নয়নদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে অভয় দিলুম যে ট্রেন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। তখন তিনি পুর্বানুবৃত্তি করলেন:

দার্জিলিঙে আমার চোখ খুলে গেল। দেখলুম কৃষ্ণার গায়ের রঙ এক পোঁচ ফর্সা হয়নি বটে, কিন্তু রঙ ধরেছে ভিতরে! সে যেন এতদিন পরে আপনাকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে—সে সুন্দরী। সাতাশ কি আটাশ বছর বয়সে যদি কোনো মেয়ে প্রথম আবিষ্কার করে সে সুন্দরী, তাহলে তার সেই আবিষ্কার তাকে বিপ্লবের আস্বাদন দেয়। এ যেন একটা অগাস্ট বিপ্লব। হিংসার ক্ষমতা নেই বলে দীর্ঘকাল অহিংসা অনুশীলন করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল আমরা হিংসার ক্ষমতা রাখি। দেখছো তো দেশ কেমন রক্তপিপাসায় অধীর হয়ে উঠেছে।

যতক্ষণ না একটা আণবিক বোমা কলকাতায় কি বম্বেতে পড়ছে ততক্ষণ এ পিপাসার ক্ষান্তি নেই।

কৃষ্ণাকে নিয়ে আমার দশা হয় মহাত্মার মতো। কী করে তাকে বোঝাই যে তার আবিষ্কারটা কাব্যের সত্য, জীবনের সত্য নয়। যে এ কথা বোঝাতে পারত সে হাফিজ। হাফিজ ক্রমে দুর্লভ হল, তার চিঠিও এক সময় বন্ধ হল। কিন্তু ক্ষতি যা করে গেল তার জের চলতে থাকল। কৃষ্ণা বিশ্বাস করল হাফিজের জবানবন্দী সাচ্চা, আমার জবানবন্দী ঝুটা। আমি তাকে এগারো বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছি। আমি প্রবঞ্চক। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায় না, আমিও কেমন যেন অপরাধী বোধ করি নিজেকে। একে তো আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, মানসিক সম্বন্ধেও ভাঙন ধরল। দার্জিলিং থেকে একসঙ্গেই ফিরি। আমি প্রস্তাব করেছিলুম, সে যদি দার্জিলিঙে একা থাকতে চায় তো পারে থাকতে। সে নাকচ করল। বোধহয় লোকনিন্দার ভয়ে। বক্তিয়ারপুরে ফিরে আমি আমার কাজকর্মে ডুব মারলুম। আর সে চলল উজান বেয়ে। বয়স তার দিন দিন কমতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাটায় আয়নার সামনে। চুল বাঁধে, চুল খোলে, আবার বাঁধে। শাড়ি পরে, শাড়ি ছাড়ে, আবার পরে। সাজ পোশাকের বাহার ছিল না, শুরু হল। স্নো পাউডার মেখে জুতো পালিশের মতো চেহারা হল। তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই, যার টাকা আছে সে যদি দু-হাতে ওড়ায় তো আমার কী! কিন্তু মাঝখানে ছেলেমেয়ে না শোওয়ায় সে একেবারে আমার কোলে এসে শোয়। আশা করে—আমি তার রূপ দেখে ভুলব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলিনি যে তা নয়, কিন্তু সেটা আমার নিজের দুর্বলতা, তার মাদকতা নয়। সে কিন্তু ধরে নেয় যে তার মধ্যে অপূর্ব মোহিনী শক্তির সঞ্চার হয়েছে। অমনি মোহিনী শক্তির অনুশীলনে রত হয়। এদিকে আমি বিকারবোধে অস্থির। কী করে পরিহার করব ভেবে পাইনে।

আর একটি সন্তান হল, এটি ছেলে। খুব খুশি হলুম দুজনে। আমি বললুম, “আর কেন! এখন থেকে পূর্ব ব্যবস্থা বহাল হোক।” সে কিছু বলে না, মুচকি হাসে। ছেলের জন্যে ছোট্ট একটি বেবি কট কেনা হল। ছেলেটি সেইখানে শোয়। আর আমি প্রতি রাতে রবীন্দ্রনাথের সেই শোচনীয় পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করি—

"রে মোহিনী রে নিঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী।"

অগত্যা পণ্ডিচেরির কথা বলাবলি করতে হল। হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করতে পারি আভাসে ইঙ্গিতে জানালুম। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে ও কথা। আমার হোসিয়ারী ফাঁপতে ফাঁপতে টেক্সটাইলের আকার ধারণ করেছিল। কটন মিলের উদ্যোগ আয়োজনে জীবনটা মধুর হয়েছিল। রূপ না হয় পাইনি। কিন্তু রূপো তো পেয়েছি অঢেল অজস্র। রূপের মায়া আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু রূপোর মায়া? দেখা গেল কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনের আকর্ষণ কম নয়। থেকে গেলুম কাঞ্চনের টানে। কৃষ্ণা কিন্তু ঠাওরাল কামিনীর টানে। তার মুখে হাসি আর ধরে না। মোহিনী শক্তির জয়। সেই হাড়িকাঠ থেকে উদ্ধারের উপায় নাই দেখে গুরু ডেকে এনে মন্ত্র নিলুম গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের। কৃষ্ণাকে সাধলুম, 'তুমিও নাও।' তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। কী যে হল তার জানিনে, যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করে বেড়ায় আহারনিদ্রা ভুলে। রাত্রে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসি, বন্ধ করে রাখি। চিকিৎসকের পরামর্শে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ আবার পাতাতে যাই। ফল হল উলটো। কাতর সুরে বলে, তুমি বাপের বয়সী, তুমি মাননীয় বৃদ্ধ, তোমার কি শোভা পায় এ অধর্ম! আমি নাকি তার বাপের বয়সী! হে হরি! আমি নাকি মাননীয় বৃদ্ধ! হে ঈশ্বর!......

নয়নদা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, "পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার নামে রটায় আমি নাকি তাকে সুন্দরী তরুণী পেয়ে তার উপর বলপ্রয়োগ করি! বুড়ো বয়সে আমার নাকি ভীমরতি হয়েছে!...... ও হো হো!...আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না ভায়া। বেলডাঙায় আমাদের দু-নম্বর মিলটা তৈরি হয়ে গেলেই আমি চোখ বুজব।...সবাই বলছে ওকে পাগলা গারদে পাঠাতে। কিন্তু সেটা হবে যথার্থ অধর্ম। না, সে আমি পারব না। কিন্তু এও আমার অসহনীয়। আমার মান গেল, আমি হেয় হয়ে গেলুম লোকচক্ষে।"

আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে দিলুম সেকালের মতো। এক হস্টেলে এক ঘরে

বাস করতুম আমরা। রাত কেটে যেত সুন্দরী নারীদের স্বপ্নে। নয়নদার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল সুন্দরী নারী তাঁর ভাগ্যে অবধারিত। সেটা তাঁর জন্মস্বত্ব। জন্মস্বত্বের খণ্ডন হল দেখে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন বিশ বছর আগে। চোখ মুছিয়ে ছিলুম আমরা কয়েকজন বয়স্য।

সান্ত্বনাচ্ছলে সেবার বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। এবার কী বলব? বলার আছে কী?

তবু বললুম, "নয়নদা, তুমি কবিদের মতো মিথ্যেবাদী নও বলেই এরকম ঘটল। মিথ্যা বললে না কেন হাফিজের মতো? গজল লিখলে না কেন উর্দু বাংলা যে কোনো ভাষায়? লিখিয়ে নিলে না কেন তোমার মিলের বিজ্ঞাপন বিভাগের সাহিত্যিকদের দিয়ে? এখনো সময় আছে হয়তো।"

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫—) ॥ প্রেমের বি-চিত্র গতি
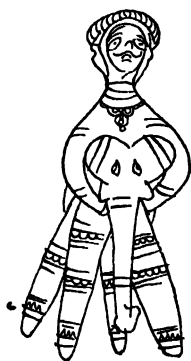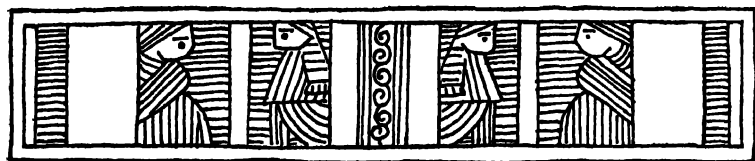
মহীতোষের আজ হল কী?

সকলের প্রতি একটা সকৃপ দৃষ্টি, কেমন একটা 'বৎস, বর প্রার্থনা করো'—গোছের বিজাতীয় দয়ালুতা বিশ্বজনীন বাৎসল্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে সর্বদাই তার মুখে লাগানো থাকত—কিন্তু সেগুলো আজ তার যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে না কেন?

কী হল মহীতোষের?

কফি হাউসের সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে ওকে পাকড়াও করলাম: "কী হে! হয়েছে কী তোমার?"

শূন্যগর্ভ কফির পেয়ালার ভেতর থেকে মহীতোষের জবাব এল: "মেয়েরা—ছোঃ! মেয়েদের কথা আর বোলো না!"

"কেন, কেন, মেয়েদের প্রতি ছোঁ মারবার মতো কী হল তোমার হঠাৎ?" অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি।

কফির পেয়ালার আড়াল থেকে মুখ বার করে—শেষ চুমুকটি নিঃশেষ করে—ধীরে ধীরে বিশদ করল মহীতোষ: "শুনলে তুমি দুঃখিত হবে বন্ধু, আমার আর বিনীতার মধ্যে আর—আর বাক্যালাপ নেই। বাতচিত চিরতরে বন্ধ। এমন সব বস্তু দিবালোকে প্রকাশ লাভ করেছে যাদের দিবালোকে প্রকাশ লাভ করার বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না।"

"বিনীতা বুঝি সুষমার খবর জানতে পেরেছে কোনো গতিকে?" আমি সন্দেহ জ্ঞাপন করি।

"ধরেছ ঠিক।" মুখ ভার করে বলল মহীতোষ, "কিন্তু আমি এর হেস্ত নেস্ত না করে ছাড়ব না, তুমি দেখে নিও। ঐ বরেন হতভাগাকে দেখে নেব আমি। একদিন রাত্রে অলিগলির মধ্যে অন্ধকারে পেলেই হয়। এই কব্জির

কয়েক ঘুষিতে ওর ঐ বিচ্ছিরি চেহারা এমন বদলে দেব যে চাই কি—তার চোটে—তার ফলে হয়তো ও দেখতে ভালোই হয়ে যেতে পারে।” মহীতোষের মুখ আরো ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

“বরেন? বরেনই বুঝি এই কাণ্ড করেছে? বেফাঁস করে দিয়েছে সব?” আমি আরো বিস্তৃতরূপে জানতে চাই: “—একেবারে বেবাক?”

“হ্যাঁ, বরেনই বাধিয়েছে। ও হতভাগার নিজেরই একটু টান রয়েছে কিনা সুষমার ওপর। এবং সুযোগ পেয়ে—! আমারই বোকামি! বিনীতার প্রেমপত্র বাহাদুরি করে ওর কাছে পড়তে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল। মানুষের ভেতরেও দু-মুখো সাপ থাকে তখন জানতাম না তো!”

“দু-দিকেই ছোবল মেরেছে বুঝি? সুষমাকেও বাগিয়েছে আর এদিকে বিনীতাকেও ভাগিয়েছে? না—নাকি—আবার বিনীতারও প্রেমে পড়বার চেষ্টা করেছে সেই সঙ্গে?”

“সুষমার আর আমার—আমাদের ভেতরকার সমস্ত ব্যাপার চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে বিনীতাকে। তার ফলে—তার ফলে—” তৎ-পরবর্তী শোচনীয় ফলাফল মহীতোষ নিজের ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না।

“তার ফলে—অর্থাৎ তোমার এবং বিনীতার মাঝখানে সুষমা এসে পড়ার ফলে, তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে সুষমা ছিল তা তিরোহিত হয়েছে। অর্থাৎ কিনা, সুষমা এসেছে বটে, কিন্তু সুষমা আর নেই। এই তো?” আমিই তার হয়ে, কতটা পেরে উঠি জানিনে, ব্যক্ত করার চেষ্টা করি।

“—তার ফলে এই চিঠি দেখো—বিনীতার চিঠি!” মহীতোষ একখানা চিঠি আমার চোখের উপর মেলে ধরে, “পড়লে তুমি বিস্মিত হবে।”

চিঠিটা আমি দেখি না, না দেখেই ওর অন্তর্গত বিসুবিয়সকে দেখতে পাই—
—বিসুবিয়সের আভ্যন্তরীণ লাভাপ্রবাহ পর্যন্ত আমার নজরে পড়ে।

“বিস্মিত হবার কিছু নেই।” বলি শুধু।

“কিছু নেই? বলো কী তুমি?” মহীতোষ বলতে গিয়ে যেন শিউরে ওঠে: “বিনীতার মতো মেয়ে—অমন চমৎকার মেয়ে—নেপথ্য থেকে লেখা অমন একটা বাজে চিঠিতে বিশ্বাস করা কি ওর ঠিক হয়েছে?”

“মেয়েরা ঐরকমই।” আমি জানাই; “বিনীতা মেয়ে তো? আর মেয়েরা এই ধরনের অভিযোগে আস্থা স্থাপন করতে দেরি করে না। এর জন্যে একেবারে চরম দণ্ড দিতেও তাদের দ্বিধা নেই।”

সান্ত্বনাদানের ছলেই বলি বটে, ও কিন্তু শান্ত হবার নয়। গুমরে গুমরে ওঠে আরো।

"বিনীতা আর সব মেয়ে সমান?" মহীতোষ অনুযোগ করে; "এক হল সব?"

"এ ব্যাপারে অন্তত। এহেন ব্যাপারে অন্তত বিনীতাও এক মুহূর্তে দুর্বিনীতা হয়ে ওঠে, এরকম দেখা গেছে।"

একটার পর একটা, দৃষ্টান্তস্থল যত উদাহরণ যুগিয়ে আমার ভূয়োদর্শনের প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করতে যাই, ও কিন্তু কর্ণপাত করে না। বাধা দিয়ে বলে: "ওসব ভুয়ো কথা রাখো। দর্শনের কথা থাক—এখন করি কী, তাই বলো! বিনীতার সঙ্গে দেখা হলে কী বলব সেই কথাই আমি ভাবছি।"

"তবে এই যে বললে তোমাদের বাক্যালাপ বন্ধ? বাতচিত ইত্যাদি সব খতম হয়ে গিয়েছে—তাই বললে না?"

"আমি তো বন্ধ করিনি। ঐ আর কথা বলবে না বলে দিয়েছে। আরো বলেছে যে এমন কতগুলো কথা সে আমাকে বলতে চায় যা ও চিঠিতে লিখে উঠতে পারল না। সে-সব কথা যে কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষেই লেখনীর মুখে ব্যক্ত করা নাকি অসম্ভব। রোববার দিন ওদের বাড়িতে যেতে লিখেছে আমাকে।"

"যাবে, তার আর কি? গিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করবে। স্রেফ অস্বীকার এছাড়া তোমার আর তো কোনো রাস্তা দেখি না।"

"উঁহু, কিস্‌সু হয় না ওতে। দারোগা আর মেয়েদের কাছে অস্বীকার করে কোনো ফল হয় না। কী করে বলা যায় না, শেষ পর্যন্ত ওরা স্বীকার করিয়ে ছাড়ে।" বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে মহীতোষ।

দার্শনিকবৃত্তি ওর না থাকলেও, ওর বাক্যে দর্শন বৃত্তান্তের পরিচয় পেয়ে চমকে উঠতে হয়। মহীতোষের এ আবার কি নতুন নিদর্শন? এতটা বিচক্ষণতার প্রত্যাশা ওর কাছে কোনোদিন আমার ছিল না।

"তাহলে—তাহলে আর কী করবে।" আমিও নিরাশ হয়ে পড়ি: "যাক, এর থেকে, অবলা সরলা কুমারীর সঙ্গে ছলনা করা যে কত খারাপ এই শিক্ষা তোমার হবে। সেইটেই লাভ।"

"কী বলব বন্ধু! যদি সশরীরে এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে আর ভুলেও কক্ষনো সুষমার দিকে দৃক্‌পাত করছিনে—বিনীতার

পায়েই বিনীত হয়ে থাকব সারা জীবন। হলফ করে বলছি, তুমি বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু কথা হচ্ছে, জলজ্যান্ত এই দাবানল থেকে উদ্ধার পাব বলে আমার তো মনে হয় না।"

সমস্যাটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই আর ও বিকৃত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"পেয়েছি! পাওয়া গেছে।" ককিয়ে উঠি আমি: "তুমি এক কাজ করো। সুষমাকে তোমার পিসিমা কিংবা দিদিমার সগোত্র বলে চালিয়ে দাও। ঐ একমাত্র উপায়। বলো গে যে—উনি খুব বুড়োসুড়ো মানুষ—ওঁকে দেখলে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ে—আর সেই কারণেই ওঁকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না।"

"উঁহু, সুষমা মোটেই বুড়োসুড়ো নয়। তাছাড়া ওকে দেখলে মার কথা আমার মনেই পড়ে না।" মহীতোষের বিবেকে বাধে—"মিথ্যে কথা বলা হবে যে?"

"তাহলে—তাহলে আর কী হবে।" আমি হতাশ হয়ে বলি: "প্রেম আর সত্যবাদিতা একসঙ্গে বজায় রাখা যায় না। পাশাপাশি ওদের চালানো দায়।"

"আচ্ছা, বলো শুনি?" মহীতোষ একটু একটু করে উৎসুক হয়। "পরিষ্কার করে বলো দেখি?"

"সুষমাকে তোমার মা বলে মনে না হলেও বিনীতার তো তা মনে করতে বাধা নেই? তুমি করবে কি, মাতৃতুল্য বলে ওর কাছে জাহির করবার সময়ে, সুষমার একটা ফোটো যাতে তোমার পকেট থেকে হঠাৎ ওর সামনে পড়ে যায় তার ব্যবস্থা করবে।" ওকে আমি বাতলাই: "আর ফোটোটা যাতে ওর নজরে পড়ে নজর রাখবে সেদিকে।"

"প্রাণ থাকতে নয়।" মহীতোষ একেবারে মরিয়া।

"শোনো আগে! অশীতিপর হলেই ভালো হয়, নেহাত না পাও ষষ্টিবর্ষীয়া কোনো আধবুড়ীর একটা ফোটো যোগাড় করা তোমার পক্ষে খুব শক্ত হবে না নিশ্চয়ই? পাড়াতুতো কোনো মাসীর ছবি পাড়াটে মাসতুতো ভাইয়ের কাছ থেকে বাগাতে পারবে না? সেই ফোটোর ওপরে, "স্নেহের শ্রীমান্ মহীতোষকে, আশীর্বাদিকা শ্রীমতী সুষমা দেব্যা" এই কথাগুলি আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে—ঐ কথাগুলিই বা ঐজাতীয় কিছু, বুঝেছ?"

না বুঝেও মহীতোষ সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে।

"তারপর, বিনীতা ঐ ফোটো কুড়িয়ে নেবে—এবং তোমার সত্যবাদিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে। হুবহু দেখতে পাবে। আর মুহূর্তের মধ্যে তার অমূলক সন্দেহ কোথায় উড়ে যাবে! অকারণে তোমার মতো একনিষ্ঠ প্রেমিককে অবিশ্বাস করার জন্তে সে সবিনয়ে তোমার ক্ষমাভিক্ষা করবে। পুনর্বিনীতাকে ফিরে পাবে পুনরায়!...এই প্ল্যানটা তোমার কেমন লাগে?"

"এই বোয়!" মহীতোষ তার জবাব দেয়: "এই বাবুকে এক কাপ কফি দাও।"

"কবে দেখা করছ ওর সঙ্গে?" গরম কফির এক ঢোঁক গিলে আমি জানতে চাই।

"এই রোববারই।"

"ভালোই। এর মধ্যে কারো একটা ক্যামেরা ধার করে পাড়ার প্রৌঢ়াদের তাড়া করে বেড়াও। বঁড়শি হাতে বর্ষীয়সীদের পিছু পিছু ফিরতে থাকো। না--তাই বা কেন? আমাদের মণ্টুর কাছে গাদা গাদা ফোটো রয়েছে—তার দিদিমার ফোটো। নানান পোজের। চকোলেট কি লজেঞ্চুস কিছু দিয়ে ওর একটা ফোটোর ওপর ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেই তো হয়। ছেলে-মানুষের লেখা আর মেয়েমানুষের লেখা প্রায় একাকার—মানে সেকেলে মেয়ের আর একেলে ছেলের দেবাক্ষর হুবহু এক—তাই নয় কি!"

"হুঁ।" মহীতোষ ঘাড় নাড়ে। "কেবল হাতের লেখাতেই না, কার্যতও। মেয়েদের ছেলেমানুষী দেখে দেখে তাই আমার ধারণা হয়েছে!"

"বেশ। কিন্তু মনে থাকে যেন এর পরে সুষমার সঙ্গে আর কোনো ব্যাপারে তুমি নেই?"

"খুব সম্ভব, আর না। আবার? তাছাড়া আমি সে সুযোগ পেলে তো? বরেন সে ছেলেই নয়! কোনো দিকে কোনো ফাঁক রাখবার ছেলে কি সে? সুষমার কথা সে বিনীতাকে বলেছে, আর বিনীতার কথা সে সুষমাকে বলেছে, আবার বিনীতার কথা যে সুষমাকে বলেছে এ কথা সে বিনীতাকে বলেছে এবং সুষমার কথাও সে যে বিনীতার কাছে বলেছে একথা—"

"হয়েছে, হয়েছে, বুঝতে পেরেছি।" আমি অতি কষ্টে ওর বাক্যের পারম্পর্য ভেদ করে বেরুই: "আর বলতে হবে না।" বাক্চক্রব্যূহের পাকচক্রের বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ি।

"আবার ফের গোলমালের মধ্যে ? তুমি বলছ কী বন্ধু ? এ জীবনে আর নয়। এর পর থেকে, ভবিষ্যতে, একনিষ্ঠার সরল সরু পথ ছাড়া আর অন্য পথ আমার নেই।" ও বলে।

পৃথিবীর অসংখ্য বিপথগামীর একজনকেও যে পঙ্কোদ্ধার করতে পেরেছি, এই আনন্দ নিয়ে সোমবার দিন সমস্ত কাজ ফেলে যথাসময়ে কফি হাউসে হাজির হলাম। প্রথম দর্শনেই ওকে সহাস্য দেখব, বিশ্বব্যাপী প্রসন্ন ঔদার্যের কারুকার্য মুখে নিয়ে পৃথিবীর সকলের প্রতি অপার্থিব অপত্যস্নেহে খচিত হয়ে, অনায়াসলব্ধ এই সংসারের যাবতীয় দুঃখকষ্টকে আবার সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে, অকাতরেই করছে, এই রকমটাই দেখতে পাব, স্বভাবতই এই প্রত্যাশা নিয়ে গেছি। কিন্তু না! দেখলাম, হাউসের নির্জন প্রান্তে, কফির পাত্র হাতে, নিজেকে কোণঠাসা করে নিঃসঙ্গ সে বসে রয়েছে—এবং মহীতোষের মুখে সেই আগের অসন্তোষ!

"কী হে খবর কী ? মিটে গেছে তো সব ?" তাকে ম্রিয়মাণ দেখে আমিই প্রশ্নবাণ ছাড়লাম।

"তুমি শুনে দুঃখিত হবে বন্ধু", ম্লানমুখে আস্তে আস্তে সে প্রচার করল: "বিনীতার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ—খতম। চিরদিনের মতোই বন্ধ এবার।"

"অ্যাঁ ? সে কী হে ? ফোটোর ব্যাপারটায় সুবিধে হল না বুঝি ?"

"হয়েছিল। হয়েছিল কিছুদূর! আমার দোষেই গড়বড় হয়ে গেল শেষটায়। বিনীতা তো আর বোকা মেয়ে না, দুই আর দুই যোগ করে চার বার করা তার পক্ষে শক্ত নয় তো তেমন।" মহীতোষ আধ মাইল চওড়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দেয়: "আমারই অবিমৃষ্যকারিতা। তোমার ভাষায় অবিমিশ্রকারিতাও বলতে পারো।"

"এর মধ্যে অবিমৃষ্যকারিতা আসছে কোত্থেকে ?" আমি অবাক হই।

"দুটো ফোটোই আমি এক পকেটে রেখেছিলাম কিনা। আর দুটোই পকেট থেকে একসঙ্গে পড়ে গেল।"

"দুটো ফোটো এক সঙ্গে রাখার কী মানে ? একই মেয়ের দুই ফোটো ?"

"তোমার মনে তবু তো একটা প্রশ্ন জেগেছে—কিন্তু বিনীতা! সেই ফোটো দুখানা দেখে আর একটি কথাও না। কোনো কৈফিয়ত—কেন—কী বৃত্তান্ত

জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক—আমার দিকে চাইল না পর্যন্ত। বোমার মতো মুখখানা করে, না ফেটেই, হাউইয়ের মতো শূন্যে উড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ!—"

"কেন, মণ্টুর দিদিমা কি তার চেনাজানার মধ্যে নাকি?" আমি সন্দিগ্ধ হলাম: "ধরা পড়ে গেলে বুঝি?"

"তা নয়। ধরা পড়লাম বটে, তবে সেদিক থেকে না। যেমনি না সেই ফোটো দুটো দেখল সে—দুটোই সেই বিশ্রী প্রবৃদ্ধা মাতামহীর এবং তার একটাতে লেখা 'কল্যাণীয় শ্রীমান মহীতোষকে ইতি আশীর্বাদিকা শ্রীমতী সুষমা দেব্যা' আর অপরটায়—"

"হ্যাঁ?"

"অপরটায় 'কল্যাণীয় শ্রীমান মহীতোষকে ইতি আশীর্বাদিকা শ্রীমতী বিনীতা দেব্যা'—"

"কিন্তু—কেন? এই অপরটার তোমার কি দরকার ছিল শুনি?"

"সুষমা সেন সেটিকে মাটি থেকে কুড়োবেন সেই জন্যেই।" মহীতোষ জানায়: "কেন আবার?"

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬—) ॥ অপরিচিতা

পিকাডিলি সার্কাসের বিখ্যাত কন্দর্পমূর্তিটির নিচে অপেক্ষা করছিলাম দত্তর জন্য এক রাত্রে। করোনেশনের আরও এক সপ্তাহ দেরি আছে। কিন্তু এখনই চেনা লণ্ডনকে আর চিনবার উপায় নেই। ভিড়ের ঠেলায় পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে থাকা দায়।··বছর চারেক থেকে দত্ত বিলাতে আছে; তবু এখনও এতটুকু সময়ের জ্ঞান হল না! মন বিরক্ত হয়ে উঠেছে তার উপর। এসেই হয়তো বলবে, এক বান্ধবী তাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছিল না, নেহাত আমাকে কথা দিয়েছিল বলে একরকম জোর করে চলে এল; কাল আবার এর জন্য অভিমান ভাঙানোর পালা আছে।······আরও কত কথা। রোজ শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে এসব। এক এক সময় সন্দেহ হয় যে মিছে কথা বলছে। আবার পর মুহূর্তে মনে হয় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কি কেউ এত বিশদ ও সুনিশ্চিত বিবরণ দিতে পারে তার বিভিন্ন প্রেমের পাত্রীর! দত্ত বড়োলোকের ছেলে। ব্যারিস্টারির ছাত্র। চার বছর আগে এসেছে বিলাতে, কিন্তু সব পরীক্ষাগুলো পাস করা তার হয়ে ওঠেনি। যে কোনো গল্পই আরম্ভ করো না তার সঙ্গে, সে তার মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ আর প্রেমের রাজ্যে নিজের দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী এনে ফেলবেই ফেলবে। আমি যতদূর বুঝেছি, প্রেমে বিজয়লাভ বলতে সে বোঝে একজন সদ্যপরিচিত মহিলার সঙ্গে রেস্তোরাঁয় অনেকক্ষণ বসে খাওয়া এবং তারপর সময় থাকলে, বড়ো রাস্তার উপর দিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ানো। এই নিয়েই তার এত লম্বা লম্বা গল্প, এত লম্ফ ঝম্ফ। তবু একথা অস্বীকার করতে পারব না যে, তার এই সব গল্প আমার খারাপ লাগে না আজকাল। এত ঝাড়া হাত-পা ইংলণ্ডে আসবার পর আর কখনও হইনি। পড়াশোনার চাপ নেই মাথার উপর। যে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য এদেশে আসা তা পেয়ে গিয়েছি। পরীক্ষায়

ভালো করবার পর বিবেক একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে মিছে কথা বলে টাকা আনিয়ে থেকে গিয়েছিলাম করোনেশন দেখবার জন্য। প্রায় তিন বছর এদেশে হল। কিন্তু এতদিন পড়াশোনার দায়িত্ব মাথায় থাকায়, এ দেশকে উপভোগ করতে পেরেছি খুবই কম। লোকজনের সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আলাপ জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি, লোকজনের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি ছাড়া অন্য কোনোও ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা আমার হয়নি। নাচতে জানি না, খেলাধুলোয় রুচি নেই, বড়োলোকের ছেলে নই, আমার মতো লোক নতুন আলাপ জমাবার সুযোগ পাবে কি করে এদেশে! সাধে কি আর দত্তদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছি ইদানীং! আমার মতো আনাড়ীকে, তালিম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটু চালাক-চতুর করে দেবার জন্য, তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যে তার সবজান্তা ভাবটাকে স্বীকার করে নেয়, তাকেই দত্ত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেয়। আমার চেয়ে এক বছর আগে বিলাতে আসবার দাবিতে, সে নিজেকে সব বিষয়ে অনেক উঁচুতে মনে করে। আমিও নির্বিরোধে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই বলেই সে আমার উপর এত সদয়।······দত্তর এখনও আসবার নাম নেই!······একখানি খবরের কাগজ কিনলাম। করোরেশনের হিড়িকে আর কিছু না হোক, আলোর জলুস বেড়েছে ; কাগজ পড়তে কোনো কষ্ট নেই।······ বড়ো বড়ো অক্ষরে—করোনেশন!······করোনেশন!······করোনেশন! কাগজে করোনেশন ছাড়া আর অন্য কোনো খবর নেই!······"স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড়ো কর্তাদের ভিতর করোনেশনের মরশুমে লণ্ডনে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার জন্য বিশদ আলোচনা।"

"টিলবেরি ডকে অস্ট্রেলিয়া হইতে করোনেশন উপলক্ষে আগত পুলিস দলের সহিত আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার। দুর্বৃত্তদের করোনেশনের সময় মোটেই সুবিধা হইবে না।"

"পুলিসের ধারণা যে কানাডার দাগী হীরা-চোর রবার্টসন সম্ভবত করোনেশন উপলক্ষে ইংলণ্ডে আসিয়াছে······!"

"দেরি করে ফেললাম না কি? লিজা কিছুতেই······" দত্ত এসে গেল তাহলে। তাকিয়ে দেখি সে ঘড়ি দেখছে। লিজার গল্প এখনই শেষ করে লাভ নেই।······

"না না দেরি আর কি। আমিও তো এই আসছি। চলো।"

সম্মুখেই 'কর্নার হাউস' রেস্তোরাঁয় আমাদের খাবার কথা ছিল। খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

"নতুন স্যুট তয়ের করালে যে দেখছি!"

"হ্যাঁ, দেশে যাওয়ার আগে একবার করিয়ে নেওয়া গেল।"

"বুঝেছি বুঝেছি দাদা, করোনেশনের মরশুমে কাজে লাগবে। ঠিকই করেছ। অপরিচিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে হলে ভালো দরজী-বাড়ির স্যুটই হচ্ছে প্রারম্ভিক পাসপোর্ট এদেশে।"

"না না, সেজন্য পোশাক তয়ের করাইনি। আর আমার মতো চেহারায় যত দামী স্যুটই পরি না কেন, কোনো মেয়ে ফিরেও তাকাবে না।"

"এ তোমার ভুল ধারণা। ভালো পোশাক লোকের চেহারা বদলে দিতে পারে। খেঁদি-পেঁচিকে রানীর পোশাক পরিয়ে দাও, দেখবে ঠিক রানী রানী দেখতে লাগছে। তবে হ্যাঁ, ভালো দরজী-বাড়ির সেলাই হওয়া চাই। এদেশে থাকতে থাকতে এমন হয়ে গিয়েছে আজকাল যে পোশাকের কাটছাঁট সেলাই-এর ভালো-মন্দ দেখা মাত্র বুঝতে পারি। তুমি করালেই যদি, তবে আর একটু বেশি খরচ করে একটা ভালো দোকান থেকে করালে না কেন?"

আমার জামার ভিতরে 'অস্টিন রিড'-এর দোকানের নাম লেখা আছে। নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি খরচ করে ঐ ভালো দোকানটির থেকে জামা তয়ের করিয়েছি। ইচ্ছা হল দত্তকে সেই লেখাটা দেখিয়ে দিই। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তাহলে আজকে রাত্রের গল্প আর হয়তো ভালো করে জমবে না। বরঞ্চ ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দিকটা বাড়িয়ে বললেই সে খুশি হবে বেশি। তাই তার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বললাম, "আমি যেদিন প্রথম লণ্ডনে আসি সেদিনও এই 'কর্নার হাউস' রেস্তোরাঁয় খেতে এসেছিলাম। একটা 'Lancashire Hot Pot' নিয়ে কী অপ্রস্তুত! পাত্রটি নাড়িচাড়ি উবুড় করি। কিছুতেই ভিতরের মাল বার হয় না। সবাই তাকিয়ে আমার টেবিলের দিকে। ময়দা না কি দিয়ে যেন মুখটা আঁটা থাকে না সেটিকে কেটে যে ভিতরের তরকারি বার করতে হয়, তা কি তখন জানি?"

"এখনও যে তখনকার চেয়ে বিশেষ বেশি জেনেছ এদের সম্বন্ধে তা ভেবো না। এখানকার কোনো নামজাদা হোটেলে তো একদিনও খাওনি বোধ হয়?"

তার ভাবখানা যে ভালো হোটেলে খেতেই সে অভ্যস্ত। নেহাত আমার

খাতিরে আজ এই সস্তা রেস্তোরাঁয় ছুকে ফেলা রুটিন ডিশ খাওয়ার জন্য এসেছে।

"বলছ ঠিকই। ভালো হোটেলে খাওয়ার রেস্ত কোথায় পাব। দেশে কাত্যায়নী কেবিনে চা খাওয়া অভ্যাস ছিল। এখানে তাই এই সস্তা রেস্তোরাঁর জাঁক-জমকেই আজও হকচকিয়ে যাই। ঐ শোনো হোটেলের মিউজিক! যে রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলারা পিয়ানো বাজিয়ে শোনান, তাকে কি আমি বাজে হোটেল বলে ভাবতে পারি?"

"এখানকার এই তৃতীয় শ্রেণীর পিয়ানোর গৎগুলোকে আর মিউজিক বোলো না! আর প্রত্যেকবার বাজানোর পর পিয়ানিস্ট মহিলাটি অপেরার সেরা নর্তকীর ধরনে কি রকম করে সকলকে ঝুঁকে কুর্নিশ করেন হাততালি পাবার জন্য লক্ষ্য করেছ?"

"ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে শুধু আমরা কেন, এই রেস্তোরাঁর প্রত্যেক খদ্দেরই হাসে। অথচ মজা দেখেছ প্রত্যেকেই যথাসময়ে হাততালিও দিতে ভোলে না। অদ্ভুত এই ইংরেজ জাতটা! আমি তো এদের মতিগতি কিছুই বুঝতে পারলাম না তিন বছরেও।"

"ও সব কি আর বইয়ে লেখা থাকে: ওসব চেষ্টা করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিখতে হয়।"

"আমাদের প্রোফেসার বলেছিলেন যে, আসল ইংরেজ-চরিত্র দেখতে হয় যুদ্ধের সময় আর করোনেশনের সময়। যুদ্ধের সময়ের ইংলণ্ড দেখবার সুযোগ না হয় হয়নি। কিন্তু করোনেশনের সময়ের ইংলণ্ড তো দেখছি। ইংরাজদের মধ্যে নূতনত্ব তো কিছু চোখে পড়ছে না, শুধু রাস্তার ভিড় খানিকটা বেড়েছে আগের থেকে।"

"তোমার প্রোফেসার ভেবেছিলেন বোধ হয় যে তুমি করোনেশনের সময় এখানে থাকবে না; তাই খানিকটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। যে দেশে রাজা-রানী আছে, সেখানেই লোকে করোনেশনের সময় হুজুগে মাতে। এর মধ্যে ইংরেজ জার্মান কিছু নেই! তুমি বলছ রাস্তায় লোক বেড়েছে। আমার তো ভাই নজরে পড়ে না। আজকের ভিড় দেখে বলছ তো? পিকাডিলি সার্কাসে প্রতি শনিবারেই এই রকম ভিড হয়। বরঞ্চ আজকে একটু কম মনে হল। করোনেশন হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যার একটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।"

এই রে! একটু বিরক্ত বিরক্ত ভাব যেন দত্তর! কি আবার বেফাঁস বলে ফেললাম? তার চেয়ে বেশি জানি এমন কোনো কথা বলেছি বোধ হয়! সামলে নেবার জন্য বলতে হল—"পিকাডিলি সার্কাস অঞ্চলে আমার যাওয়া আসা এতকাল কম ছিল কিনা সেইজন্য এর আগে হয়তো ভালো করে লক্ষ্য করিনি এখানকার লোকজনের ভিড়। এই রেস্তোরাঁয় প্রথমদিনই আর এক কাণ্ড করেছিলাম, শোনো বলি। খেয়ে দেয়ে বার হবার সময় দেখি দরোয়ান আমাকে যেতে দেবার জন্য দরজা ফাঁক করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে আসবার পর বুঝি যে, সে দরোয়ান নয়। আমারই মতো একজন খদ্দের। আমারই জন্য ভদ্রতা দেখিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। ধন্যবাদও দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের এই দু-একটা কাণ্ড থেকেই বোধ হয় পিকাডিলি সার্কাসের দিকটা এড়িয়ে চলবার একটা চেষ্টা ছিল, আমার অবচেতন মনে।"

"তুমি যে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে চলে যাচ্ছ! সাবধান! থিয়োরি শিখতে শিখতেই তোমাদের জীবন কেটে গেল! কাজে খাটাতে না পারলে শুকনো মনোবিজ্ঞান শিখে লাভ কি? ইংরেজদের সাইকোলজি শুনবে? স্বাভাবিক ইংরেজ অস্বাভাবিক মানুষ। এই অমানুষ জাতটা মানুষ হয় সপ্তাহে একদিন —শনিবার সন্ধ্যায়। আজ একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগছে না? শুধু পাকশালা, নাচঘর, সিনেমা, থিয়েটার আজ ভরা তা নয়, শনিবারে সমাজ একটু রাশ আলগা দেওয়ায়, আসল ইংরেজ ফুটে বার হয় নকলের মধ্য থেকে। বলছিলাম না যে করোনেশনের সময়ের ইংরেজ, শনিবারের রাতের ইংরেজের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। কথাটা হয়তো ঠিক হয়নি। পরিবর্ধিত ও অমার্জিত সংস্করণ বলাই ঠিক হবে। আর এক কথা। আমার বদ্ধমূল ধারণা কি জানো? জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় মেয়েদের মধ্যে। চেহারা আর পোশাকের কথা বাদ দিলে পুরুষ সব দেশে মোটামুটি একই রকম। কিন্তু মেয়েরা তা নয়। কোথাও মেয়েরা দেখবে কেঁদে জেতে, কোথাও হেসে। কোথাও ঠাণ্ডা বরফ, কোথাও গরম আগুন; কোথাও গম্ভীর, কোথাও চটুলা; কোথাও দেহসর্বস্ব, কোথাও ভাবপ্রবণ; কোথাও দেখবে তোমাকে খাইয়ে খুশি করতে চায়, কোথাও তোমার পয়সায় খেয়ে তোমাকে খুশি করতে চায়। আমি তো যে কোনো দেশে গিয়ে, মেয়েদের শুধু চলার ভঙ্গি দেখে বলে দিতে পারি, সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি কি। চোখের চাউনি দেখতে পেলে তো কথাই নেই।"

"বোরকা পরা থাকলে কি করবে ? সেখানে না দেখতে পাবে চোখের বিজুলি, না বুঝতে পারবে চলার ভঙ্গি ঢিলে আলখাল্লার মধ্য দিয়ে ?"

"বোরকা-পরা মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জানবার আছেই বা কি ? বোরকাই সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তুমি হঠাৎ বোরকার কথা তুললে কেন ? আমায় ঠাট্টা করে নাকি ? সত্যিই মেয়েদের চোখের চাউনির ভাষা আমি বুঝতে পারি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?"

"না না, সে কথা কে বলছে ! মনের ছাপ চোখে পড়ে বই কি ? মেয়েদের চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে জেনেই তো, তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি।"

"শিখে যাবে হে। এই করোনেশনের সপ্তাহেই সব চাউনির ভাষা পড়তে শিখে যাবে। 'বিলোল কটাক্ষ' কথা দুটো বইয়ে পড়েছ তো ? কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি কারও চাউনি দেখে চিনতে পারবে না সেটা বিলোল কটাক্ষ, না অন্য কিছু। যতই অভিধান দেখে তার মানে খুঁজে বার করো না কেন। সারা জীবনের পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় যে লোকে বেশি শিখতে পারে, এ তোমায় আমি হাতেনাতে দেখিয়ে দেব। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের কথা হচ্ছিল না ? পাঁজি দেখে যেমন আমরা আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করি, ওদেরও সেই রকম গোছেরই ব্যাপার। শনিবার ছাড়া রোজই অশ্লেষা মঘার পালা, নীতিবাগীশদের যাত্রা নাস্তি। মহাশনিবার হচ্ছে করোনেশান; একেবারে চূড়ামণি যোগের ব্যাপার। লোকাচার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ওরা প্রত্যেকে সেই সময় এক-খানি করে সাময়িক ছাড়পত্র পায়—একেবারে travel as you like টিকিট। এই জিনিসই তোমার প্রোফেসার বলেছিলেন ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। করোনেশনের হুল্লোড়ের মধ্যে এ ক-দিন নিজেকে ডুবিয়ে দাও। করোনেশনের আবহাওয়া প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে একেবারে আপন করে ফেলো। করোনেশনের উদ্দাম আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ো। তবে না ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবে। বুঝবে যে এরাও জীবনের স্বাদ নিতে জানে। ভয় কোরো না। সংকোচের কারণ নেই। শুচিবাইগ্রস্তা ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে বসবার সপ্তাহও সে-যুগের লম্বা জুলফিওয়ালা ইংরেজরা যেমনভাবে উদ্‌যাপন করেছিল, আজ তাঁর নাতির-নাতনীর যুগে তার চেয়ে অনুদারভাবে এ যজ্ঞ সমাধা হবে না। এই সপ্তাহের স্মৃতি তোমার জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।"

দস্তুরমতো লেকচার দেওয়া আরম্ভ করেছে দত্ত, আমার ভয় ভাঙানোর জন্য। গত কয় মিনিটের মধ্যে করোনেশনের সম্বন্ধে তার মত বদলেছে। আমি এতে আশ্চর্য হইনি। তার মতের নড়চড় হয় না ততক্ষণ, ঠিক যতক্ষণ তুমি তার কথায় প্রতিবাদ করছ। আমি যে অকুণ্ঠভাবে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিয়েছি, এ বিষয়ে দত্তর আর সন্দেহ নেই। সেই জন্য তার অপদার্থ শিষ্যকে উপদেশ দেবার প্রেরণা পাচ্ছে সে।—কানে ভেসে আসছে তার কথার স্রোত।······এখন চলছে একটি ইংরেজি কবিতার কয়েকটি লাইন।—নীরস জীবন নিয়ে বিরাট ওকগাছ কতকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু তাতে লাভ কি? লিলি বাঁচে মোটে একদিন—সৌন্দর্যের রসে ভরপুর জীবন। বসন্তের ঐ একদিনই যথেষ্ট।······তবে মিশতে হবে ওদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।······এক এক জায়গার আলাপ করবার নিয়ম এক এক রকম। নাচঘরে যে নিয়ম কার্যকরী রাস্তায় সে নিয়ম অচল। হাইড পার্কে উপবিষ্টা মহিলার সঙ্গে প্রথম আলাপের কৌশল কখনও রেস্তোরাঁয় আহাররতা মহিলার বেলা চলতে পারে না। যত খারাপ ডিশই দিক, এই সব সস্তা হোটেলের একটা মস্ত গুণ যে এখানে যারা খেতে আসে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ। এদের অধিকাংশই প্রেম করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব সব শনিবারে। এই করোনেশনের বাজারে তো কথাই নেই। তবু এদের মধ্যে থেকেও মেয়ে চিনে বার করতে হয়। সে চোখ থাকা চাই। চাউনির ভাষা বোঝবার চোখ।···বুঝতে শেখো, জানতে শেখো, চিনতে শেখো।

বহুদূরে হলঘরের কোনার দিকের একটি টেবিল দেখিয়ে দত্ত বলল—"ঐ যে দুটি মহিলা দেখছ, ওঁদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।"

দত্তের লেকচার একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এখন আর শুধু ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ নয়—একেবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম মহিলা দুটিকে ভালো করে লক্ষ্য করবার জন্য। একজনের পোশাক সবুজ রঙের; আর একজনের গোলাপী।···মহিলা দুজন মৃদু হাসতে হাসতে গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে।···খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকের টেবিলের লোকজন আড়চোখে দেখে নিচ্ছেন, নিজেদের হাসিগল্পের খোরাকের জন্য বোধহয়। হাবভাবে এখানকার অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য আমার কিছুই নজরে পড়ল না।

দত্তকে জিজ্ঞাসা করি, "কি করে বুঝলে ?"

এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল সে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষের দিকে গোয়েন্দা যে রকম করে নিজের যুক্তির শৃঙ্খলের বলয়গুলো এক এক করে তুলে ধরে পাঠকদের সম্মুখে সেইরকমভাবে দত্ত আরম্ভ করে।

"প্রথমত বেশভূষা দেখে।"

এই পয়েণ্টটি এত সংক্ষেপে সেরে দিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করবারও সুযোগ পেলাম না, বেশভূষার মধ্যে বিশেষত্ব কি দেখলে ? পোশাকের রঙের মধ্যেই কিছু আছে নাকি ? কে জানে !

"দ্বিতীয়ত, ওদের খাবারের ডিশগুলো লক্ষ্য করেছিলে ? সস্তায় পেট ভরানোর চেষ্টা। গরিব। তা না হলে এখানে আসবেই বা কেন ! একটু একটু করে খাচ্ছে, ছোট ছেলেপিলেদের মতো। যাতে অনেকক্ষণ ধরে স্বাদ পাওয়া যায়। গরিবরা মনের দিক থেকে উদার হয়।"

"বেশি খিদে নেই বোধহয়। খিদে থাকলে তবে তো গোগ্রাসে গিলবে।"

"যা বলছি শোনো। জানবার ইচ্ছে থাকলে বাজে তর্ক কোরো না। অন্তত এখন নয়। ওতে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেব আমি পরে।…ঐ ! ঐ ! তাকিয়েছে ! তাকিয়েছে !…তাকাচ্ছে আমাদের দিকে ! এইভাবে তাকানোটাই আসল ! অব্যর্থ লক্ষণ।"

সত্যিই সবুজ পোশাক পরা মহিলাটি আবার যেন এদিকে তাকালেন মনে হল।…কি যেন বলছেন ফিসফিস করে সঙ্গিনীকে।…দুজনেই প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়েছেন।…ঠিকই তাকিয়েছেন। আর কোনো সন্দেহ নেই !…দত্তর চোখ আছে।

"হাঁ, মুখার্জী তোমাকে আর একটা কথা সেদিন বলেছিলাম মনে আছে বোধহয় ? এসব ক্ষেত্রে দুই সংখ্যাটি বড়ো পয়মন্ত, বড়ো ভালো। ওরা দুজন আছে। প্রেমিকরা একা বার হওয়া শোভন মনে করেন না। দুজন একসঙ্গে বার হলে নানান দিক দিয়ে সুবিধা। সে সব তোমাকে সেদিন বলেইছি। ওরা খোঁজেও দুই বন্ধুকে ! নইলে দুয়ে দুয়ে চার মিলবে কি করে ? তোমাকেও বলে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ যদি করতে চাও, তবে খবদ্দার একা বেরিয়ো না। আবার তিনজনও থাকবে না। সুবিধা আছে হে, সুবিধা আছে এতে ; চালাক লোকের পক্ষে একটি ইশারাই যথেষ্ট। একদিনে রঙরুটকে কতটুকুই বা শেখানো যায়।…"

দত্তর কথা মনে বসছে। মেয়েটি এদিকে তাকানোর পর আর দত্তর গল্পকে অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

"দুজন থাকার এক মস্ত সুবিধে—একজন বসে থাকতে পারে, আর একজন উঠে যেতে পারে বাইরে।" দত্তর কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

"আর কত পরিষ্কার করে বোঝাই? মার্জিত সমাজে কি মেয়েরা—ওগো আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাই গো বলে সাইন বোর্ড লাগিয়ে বসে থাকবে?"

ব্যাপার আমার পক্ষে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল দেখছি! তবু বাঁচোয়া যে হঠাৎ হাততালির শব্দে দত্ত আর কথা বলতে পারছে না। পিয়ানো এই মুহূর্তে থেমেছে। পিয়ানিস্ট ভদ্রমহিলা সম্মুখে ঝুঁকে কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে হতাশ না করবার জন্য সকলেই হাততালি দিচ্ছে। এখানকার বাঁধা খদ্দেররা এরই প্রতীক্ষায় ছিল এতক্ষণ, প্রাণ খুলে হেসে নেবার জন্য। দূরের টেবিলের সেই সবুজ আর গোলাপী পোশাক পরা মহিলা দুটির উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁরাও হাততালি দিতে দিতে হাসছেন।... চারিদিকের লোকজনের মুখের দিকে দেখছেন।...এইবার আমাদের দিকেও নিশ্চয়ই তাকাবেন। লক্ষ্য করতে হবে সেই সময় তাঁদের চাউনির ভঙ্গি।... অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশায় মন মেতে উঠেছে।...প্রাণপণ শক্তিতে হাততালির ঐকতানে যোগ দিয়েছি হাসতে হাসতে—তাকিয়েছেন! ঐ তাকাচ্ছেন সবুজ পোশাক পরা মহিলা আমারই দিকে! শুধু আমার দিকে! দত্তর দিকে নয়। ঘরভরা এত লোকের মধ্যে আর কারো দিকে নয়! এ এক নতুন উদ্দীপনা। দ্বিগুণ উৎসাহে হাততালি দিচ্ছি।

যখন থামলাম, দেখি আমার একার হাততালিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক আমার দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, সেই সবুজ পোশাক পরা মহিলাকে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন।...ঠিক সবুজপরীর মতো দেখতে লাগছে ওঁকে।

"এই!"

দত্ত জুতোর ঠোকর মেরে আমায় সাবধান করে দিল। সে খুশি হয়েছে তার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ হওয়ায়। আরও বেশি খুশি হয়েছে শিষ্যের পরিবর্তন দেখে।

সে কি সোজা পরিবর্তন! এক নম্বরের চালিয়াত ভেবে যে দত্তর কাছে ঘেঁষতাম না এক মাস আগে পর্যন্ত, তারই কাছে সত্যেন দত্তর 'সবুজ পরী' কবিতার দু-লাইন আউড়ে দিলাম এখন। সবুজ ছাড়া আর সব রঙ পৃথিবীতে নিরর্থক, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। দত্ত চোখের চাউনির ভাষা বোঝে। আমার চোখে যে সবুজের নেশা লেগেছে একথা বুঝতে তার দেরি হয়নি।

সবুজপরী ঘড়ি দেখলেন।......আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন। আমার সাহস বেড়েছে, তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম না। চোখাচোখি হতে তিনি সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে কি যেন বললেন। দুজনেই হাসছেন! ফিকে সবুজ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরের ঐ কোণটি। গোলাপীর পাশে সবুজ যে এত সুন্দর মানায় তা আগে জানতাম না। সবুজ পাতার মধ্যে গোলাপ ফুল দেখতে ভালো লাগে চিরকাল! কিন্তু তখন যে নজর থাকে গোলাপী রঙের ফুলটির দিকে। সবুজের দিকে কে তাকায়?

দত্ত উপদেশ দিচ্ছে—"দেখেছ! বলেছিলাম না! ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছে কে আগে উঠবে। আজকের এমন আলাপের সুযোগ নষ্ট হতে দিও না! মন তৈরি করে ফেলো! নার্ভাস হবার কিছুই নেই। কি বলে কথা আরম্ভ করবে সেটা আগে থেকে ভেবে রেখো। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেলে বলবে "মাপ করবেন। যা ভিড় করোনেশনের মরশুমে!" না হয় দেশলাই আছে কি না খোঁজ নিতে পারো মহিলাটির কাছে। তোমার পক্ষে বোধহয় সহজ হবে বলা "ভারী সুন্দর রাতটা!" ভাব দেখাবে যে কথাটি কাউকে উদ্দেশ না করেই বলা। তারপর মুখে হাসি এনে মেয়েটির দিকে তাকাবে। মেয়েটি অবধারিত হেসে তোমার কথার সমর্থন করবে। ব্যস! তারপরেই আরম্ভ করবে গল্প। এত খুঁটিনাটি কি কাউকে মুখস্থ করে শিখিয়ে দেওয়া যায়?"

আর শেখানোর দরকারও ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি। দত্ত ঠিক বলেছে। কথার আরম্ভটাই আসল। পরের কথাগুলো আপনিই মুখে জোগাবে।

সবুজপরী হাত ঘড়িতে আর একবার সময় দেখে নিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

"মুখার্জী ওঠো!"

দত্ত এ কথা বলবার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম।...পান্নার দ্যুতি ছড়াতে

ছড়াতে সবুজপরী এগিয়ে চলেছেন দরজার দিকে। যেমন করে হোক তাঁর কাছে পৌছতে হবে। আর দ্বিধা করবার অবকাশ নেই। একখানা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম প্রথমেই। কে কি ভাবল সে কথা ভাববার সময় নেই আমার এখন! একটি সবুজ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবী মুছে গিয়েছে আমার চোখের সম্মুখ থেকে। এখন যদি উনি সত্যিকার সবুজপরী হয়ে উড়েও যান ডানা মেলে তবুও তার পিছু নিতে হবে! কার সাধ্য আমাকে আটকায়! সবুজপরী দরজা দিয়ে বাইরে বেরুলেন। এখন প্রত্যেক সেকেণ্ডের মূল্য আছে আমার কাছে। প্রায় ছুটে চলেছি। আমার আগের ভদ্রলোকটি বার হবার সময় দরজাটি খুলে ধরে দাঁড়ালেন, খোলা কপাটের চার্জ আমার হাতে সঁপে দেবার জন্যে।...

"ধন্যবাদ।"

দরোয়ান বলে ভুল না করলেও, আজও সেই লণ্ডনে প্রথম দিনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। ভদ্রলোকটির মুখখানি কেমন হয়ে গিয়েছিল দেখবার সময় পাইনি।...সবুজপরী পেভমেণ্টের উপর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছেন। এমন সময় হনহন করে চলবার দরকার কি? এইটাই নিয়ম না তো? একটা খুব জরুরী কাজের ভান দেখাতে চান বোধহয়। তাকে ধরতে হলে আমার দৌড়ানো ছাড়া উপায় নেই!...ছুটতে আরম্ভ করেছি হন্তদন্ত হয়ে। ...তিনি কন্দর্পমূর্তিটির পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিককার পেভমেণ্টে উঠলেন।... আমিও প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তাঁর কাছে। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েছি শেষ মুহূর্তে। হাঁটুর কাছে কি রকম যেন অসাড় অসাড় ভাব। কি বলে কথা আরম্ভ করা যায় ভেবে ঠিক করতে পারছি না।...দেশলাই চাওয়া ঠিক হবে না।...

...তাঁর পাশে পৌঁছে গিয়েছি আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না! মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম—"ভারী সুন্দর রাতটি!"

নজর আমার তার মুখের দিকে। সবুজপরী অবাক হয়ে তাকিয়েছেন।...অল্প হাসি হাসি মুখ, হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, সত্যিই আজ রাতটি অতি সুন্দর।...তাঁর চাউনির ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছি, দত্তর নির্দেশ মতো।...তিনি চিনতে চেষ্টা করছেন আমায়। প্রশ্ন করছেন। আমার কাছ থেকে বোধ হয় অন্য কথা আশা করেছিলেন। সলজ্জ আরক্তিম মুখে ও চাউনি খাপ খাচ্ছে না। একটা কিছু বলতে হয় এখন।

"মাপ করবেন; যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে চলুন কোথাও বসে কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে খাওয়া যাক একটু কিছু।"

এতক্ষণে তিনি যেন বুঝলেন আগাগোড়া ব্যাপারটা। কাঠিন্যের আভাস পড়ল কেন দৃষ্টিতে? দত্তর শেখানো সব হিসাব গুলিয়ে দিয়ে সবুজপরী জবাব দিলেন—"আমি দুঃখিত। আমার এখন বিশেষ কাজ আছে।"

গলার স্বর বেশ শান্ত ও সংযত।

দত্ত এর আগে আমায় আর একদিন বুঝিয়েছেন, অনেক সময় এদের "না" মানেই "হ্যাঁ"। তাই নয় তো?

"আচ্ছা কাল বিকেলে আপনার যদি সময় হয়······"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সবুজপরী বললেন—"না দুঃখিত। কালও আমার কাজ আছে।"

এবারে গলার স্বর দৃঢ়তর। চোখে বিরক্তির আভাস সুস্পষ্ট। ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসি আনবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা আছে।···একটা মাকড়শা কিংবা শুঁয়োপোকাকে দেখছেন যেন তিনি?···

আর ভুল বুঝবার অবকাশ মোটেই নেই। এক মিনিটের অভিজ্ঞতায় মেয়েমানুষের চোখের ভাষা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার কাছে। সে দৃষ্টি বলতে চায়—নেহাত তুমি বিদেশী ছাত্র বলে পুলিস ডাকছি না, নইলে তোমার মতো লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

ধরণী দ্বিধা হও!···আমার নিজের চোখের চাউনি কোথায় লুকোই, তা সুদ্ধ ভেবে ঠিক করতে পারছি না লজ্জায়!

কিন্তু মহিলাটি ভদ্র। মনের উষ্মা কথাবার্তায় প্রকাশ না পেয়ে যায়, এ বিষয়ে শিক্ষা আছে, অধিকাংশ ইংরেজের মতো। আমার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিজের গন্তব্যের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। ফুট ছয়েক লম্বা দুজন লোক দু-দিক থেকে এসে আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে! ছিল কোথায় এরা? এরা কি ঐ মহিলাটির প্রণয়ী, না নিকট-আত্মীয়। না আমার আস্পর্ধা দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে দুজন পথচারী ইংরেজ আমায় উচিত শিক্ষা দেবার জন্য? ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এখন কি করা উচিত সে কথা ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার লুপ্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে মারামারি করবার কথা ভাবাও যায় না।

ও জিনিস কোনোকালেই আমার আসে না। পুলিস ডাকবার সাহস নেই, নিজের বিবেক পরিষ্কার নয় বলে। এখনই লোক জড়ো হয়ে যাবে আমাকে ঘিরে! এরা যখন আমায় ধরেছে, তখন কি আর ঘা কতক না দিয়েই ছাড়বে! সিনেমায় দেখেছি ঝগড়ার সময় ইংরেজরা আমাদের মতো চড়চাপড় মারে না, ঘুষি মারে; নাকে, মুখে, চিবুকে! নিজের মুখখানিকে আসন্ন আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য, অজ্ঞাতে হাত উঁচুতে তুলবার চেষ্টা করতেই সেই দুজনে আমার দু-কাঁধে হাত রাখল। ছাঁত করে মনে পড়ল, লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে পুলিস যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তখন একজন ডান বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাতটি চালিয়ে দেয়, আর একজন দেয় বাঁ বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাত। দুজন দু-পাশে, মার্চ করবার তালে চলেছে দুর্বৃত্তকে ধরে নিয়ে, এ দৃশ্য বহুবার দেখেছি। এরা তো দেখি তা-ই করছে! কলোনির পুলিস? দুজনেই লণ্ডন পুলিসের মতো লম্বা! সেই রকমই দৃঢ় অথচ সংযত এদের ভাব। মাথার উপর এখন যদি এদের বাজও পড়ে, তবু এরা নিজেদের কর্তব্য করতে ভুলবে না! কালকের কাগজে পড়েছিলাম যে, করোনেশনের সপ্তাহে প্রতি রাস্তায় সাদা-পোশাক-পরা পুলিসের লোক থাকবে, দুর্বৃত্তদের ঠাণ্ডা করবার জন্য। তবে তো এরা ঠিকই সাদা পোশাক পরা পুলিস! ভয়ে ঘেমে উঠেছি। বেশ জোরেই তারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ঐ ভদ্রমহিলাটিকে কি বলছিলে?"

এরা নিশ্চয়ই সব দেখেছে। কোনো জবাব জোগায় না আমার মুখে।

"আমি—অ্যাঁ—আমি বলছিলাম যে…" কথা খুঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা আর আমায় করতে হল না। সবুজপরী অল্প কিছু দূর মাত্র গিয়েছিলেন। তিনি থমকে ফিরে দাঁড়ালেন। বোধ হয় কানে গিয়েছে এখানকার পুলিসের কথাবার্তা। এই দিকেই যেন এগিয়ে আসছেন! আর রক্ষা নেই। এতক্ষণে ষোলো কলা পূর্ণ হল। আমার দুঃসাহসের কথা হয়তো অতিরঞ্জিত করেই বলবেন পুলিসের কাছে। এখনই পেনি কাগজের ফোটোগ্রাফার আমার ছবি তুলে নেবে! আর কাল সকালের কাগজেই পিকাডিলি-সার্কাসে ভারতীয় দুর্বৃত্তের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়ে যাবে! ভারতবর্ষের কাগজেও বেরতে পারে! ভারতীয় হাই কমিশনারই হয়তো বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন। এত বড়ো বিপদে আমি জীবনে পড়িনি এর আগে!

সবুজপরীর মুখে হাসি! তবে কি এদের মধ্যে একজন তাঁর প্রণয়ী? সবুজপরী

খানিক দূর থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা কাল তিনটের সময় তোমায় আমি ফোন করব। বুঝলে? এখন আসি; আবার কাল ফোনে জানাবো, কখন তোমার বাড়িতে যাব।"

অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার সম্মুখের লোক দুই জনের মধ্যে কাউকে বলছেন বুঝি। তা তো নয়! উনি বললেন আমাকেই! আমার নাম ধাম কিছুই তো উনি জানেন না! আমার বাড়ির ফোন নম্বর উনি পাবেন কি করে?...মুহূর্তের বিস্ময়। তারপরেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা আমার কাছে। উনি লোকদুটিকে শুনিয়ে দিলেন যে, আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে আগের থেকে। এ না করলে আজ আমার নিস্তার ছিল না।

সেই লম্বা চওড়া জোয়ান দুজন অবাক হয়েছে আমার চেয়েও বেশি। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। সবুজপুরীর কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাত নামিয়ে নিয়েছে, আমার গায়ের থেকে। ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে, পালাবার পথ খুঁজছে তখন তারা।...অপরিচিতা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রঙ বেরঙের আলো পড়েছে অন্ধ কন্দর্পমূর্তিটির গায়ে!

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭) ॥ হরপার্বতী সংবাদ
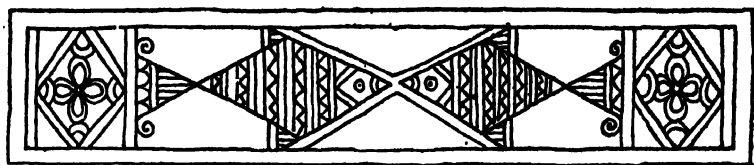
মাথার চুলের রাশির মধ্যে দাড়া চিরুনিখানা টানতে টানতে নন্দিতা বললে, বলেছিলাম না তখন? এখন শুনতে পাচ্ছ তো?

টেব্‌লের কাগজপত্রের উপর কলমটা রেখে মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয় বললে, শুনিনি কিছু, অত গোলমাল কিসের?

জানো না? আদর দেবার বেলায় তখন তো দশখানা হাত বার করবে। আমি তখনই জানি কপালে দুঃখ আছে। এখন সামলাও!

আরে কি হল তাই আগে শুনি?

হবে আমার শ্রাদ্ধ। ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে বড়ো বড়ো কান দুখানা পেতে শোনো গে।

সুপ্রিয় হেসে বললে, বড়ো কান আমার না তোমার?

রাগ করে নন্দিতা বললে, আচ্ছা, আমার না হয় বড়ো কান আমি গাধা। আর তুমি? দাঁত বের করে হাসছ যে বড়ো? দাঁত নয়, দাঁতাল।

সকাল বেলাতেই ঝগড়া আরম্ভ করলে তো? তবু শুনতে পেলুম না বাইরে গোলমালটা কিসের।—সুপ্রিয় বললে, আরে শোনো, চলে যেয়ো না—আচ্ছা গাধার কান নয়, ইঁদুরের কান,—হয়েছে তো? এবার শোনো।

এলো খোঁপা পিছন দিকে ফিরিয়ে নন্দিতা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। খরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, রাতের জানোয়ার দিনে হয় মানুষ, কেমন?

হাসিমুখে সুপ্রিয় বললে, আরেকটু কাছে এসো। ঝগড়াও করবে অথচ হাতের নাগালের বাইরেও থাকবে এ আমার অসহ্য। এসো বলছি হাতের কাছে।

মুখ দেখলে ঘেন্না করে।—বলে মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নন্দিতা চলে গেল।

কিন্তু পড়াশুনোয় সুপ্রিয়র আর মনোযোগ দেওয়া হল না। বাইরের গোলমাল

তখনও থামেনি। উঠে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছুই নয়। তার বেবি কুকুরটা এমন একটা গণ্ডগোল প্রায়ই বাধিয়ে বসে। কুকুরটা আজকাল ভারী দুষ্টু হয়েছে।

শৈশব থেকে এখানে সে মানুষ, আদরে ও যত্নে লালিত, এখন তার চেহারায় ভঙ্গিতে ও কণ্ঠে এসেছে তারুণ্য, রোখটা বেড়ে গেছে। এই পাড়ায় সে কাকে যেন তেড়ে গিয়েছিল, সে বাড়ির কর্তা গিয়েছেন ক্ষেপে। বলছেন: পুলিসে খবর দিয়ে এখুনি ফাইন করাতে পারি, তা জানো? ওদের জানিয়ে দিয়ো, বড়োমানুষি ফলাতে হয় ভবানীপুর ছেড়ে বালিগঞ্জে যাক্, এদিকে ওসব চলবে না। আমরা হালদার পাড়ার ছেলে, অমন ঢের ঢের চালাকি দেখেছি।

সুপ্রিয় বললে, তথাস্তু।

মুখ ফিরিয়ে নন্দিতা বললে, নির্লজ্জ তুমি।

কেন নির্লজ্জ? যেতে বলছে বালিগঞ্জে, তাই যাব।

সুপ্রিয় বললে, হালদার পাড়ায় যে কুকুর মার খায়, বালিগঞ্জে গিয়ে সে মাথায় চড়ে বসে। জানোয়ারের ওপর মমতা আধুনিক কালচারের লক্ষণ। তুমিই তো সেদিন বলেছিলে, জানোয়ার থেকেই মানুষ না মানুষ থেকেই জানোয়ার?

ওরে, এই কেষ্ট?

আজ্ঞে বাবু?

ওপরে আয়।

চাকরটা উপরে উঠে এল। নন্দিতা মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, হতভাগা তোকে না বলেছি দিনের বেলা বেবিকে বেঁধে রাখবি?

ভীষণ অভিযোগ জানিয়ে কেষ্ট বললে, তাই তো রেখেছিলুম মা, কিন্তু শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে।

সুপ্রিয় বললে, ওদের বাড়ির লোককে কামড়াতে গিয়েছিল, না রে?

আজ্ঞে না বাবু, ও লোকটা আকাট মিথ্যুক। আমাদের বেবির সঙ্গে অন্য কুকুরের ঝগড়া বেধেছিল, ওনার ছেলে মারলে ঢিল, তাই কেবল একটু গোঁ গোঁ করেছিল!

নন্দিতা বললে, অন্য কুকুরের সঙ্গে যদি ঝগড়া করে, তুই দরজা বন্ধ করে রাখিসনে কেন?

রাখি বৈ কি মা—কেষ্ট বললে, তবুও সেদিন ছুটে বেরিয়ে গেল অত বড়ো পাঁচিল ডিঙিয়ে। কী গায়ে জোর। মাদী কুকুররা বাঁধা থাকতে চায় না।

থাম, নিজের কাজে যা—বলে নন্দিতা তার আগেই নিচে নেমে গেল।
সুপ্রিয় ততক্ষণে গা ঢাকা দিয়েছে।
একটু পরেই বেবির দীর্ঘ আর্তনাদে আবার সুপ্রিয়র শান্তি ভঙ্গ হল। পড়াশুনো রেখে নিচে নেমে গিয়ে দেখলো, চেরীগাছের ছড়িটা হাতে নিয়ে কোমর বেঁধে নন্দিতা বেবিকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করেছে।
সুপ্রিয় দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতখানা ধরে ফেললে।—আরে কি হচ্ছে? অত মারলে মরে যাবে যে?
মরুক, ওকে আমি খুন করব।
সে কি, ও যে অবলা!
ছাড়ো বলছি—
না।
তুমি ওকে অত আস্কারা দাও কেন?
অবলা যে!
ফিক করে নন্দিতা হেসে ফেললে। কুকুরটা এই সুযোগে ল্যাজটা গুটিয়ে কাঠের বাক্সর পাশে গিয়ে লুকিয়ে কোঁ কোঁ করে কাঁদতে লাগল।
হাসিমুখে নন্দিতা বললে, ছড়িগাছা এখনও হাতে আছে, সাবধান বলছি।
মুখ টিপে সুপ্রিয় বললে, সাবধানেই তো আছি। আমি মার খেয়ে মরে গেলে কানে হীরের দুল পরতে পারবে তো?
ছড়িগাছা ফেলে দিয়ে নন্দিতা বললে, তাই বলে তোমার কুকুর পাড়ার লোককে কামড়ে আসবে?
আর যারা ঘরের লোককে কামড়ায়?
মুখ ফিরিয়ে বিদ্যুদ্বেগে নন্দিতা ছড়িগাছা হাতে তুলে নেবার চেষ্টা করতেই সুপ্রিয় সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।
নন্দিতা ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আমি কামড়াই কেমন? হীরের দুলের ধাপ্পা তুমি আর কত কাল চালাবে শুনি?—এই বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।
সুপ্রিয় হাসছিল। দুজনের ভিতরকার এই অদ্ভুত আর অহেতুক সংঘাতটা প্রায় নিত্য দিনের। এখানে সম্প্রীতির অভাব বলে ভুল ঘটতে পারে, কিন্তু অন্তত ওদের দুজনের মধ্যে সে ভুল ঘটেনি। সুপ্রিয় কাগজপত্রের মধ্যে মুখ রেখে চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল করে হাসছিল। কুকুর কেন, সামান্য

ব্যবহারিক খুঁটিনাটি নিয়েও ওদের বিবাদ চলে। এই যেমন ধরো সেদিন সুপ্রিয় নিজেই আরম্ভ করলে, শীঘ্র বলো, কেন ছিঁড়ে গেছে জামার বোতাম?

বোতামটা অবশ্য ধোপার বাড়ি থেকেই ছিঁড়ে এসেছে।

কিন্তু নন্দিতা বলে, আমিই ছিঁড়েছি, বেশ করেছি।

এর ক্ষতিপূরণ?

ওঃ গবর্নর এলেন শাসন করতে! যাও, বেরোও।

বাঁকা চোখে চেয়ে সুপ্রিয় বলে, মনে রেখো, আমি যদি পায়ে রাখি তবেই তুমি দাসী।

ঝংকার দিয়ে নন্দিতা বলে, ওরে চরিত্রহীন, দাসীর সঙ্গে কোনো ভদ্রলোক—

হঠাৎ সুপ্রিয় দার্শনিক হয়ে ওঠে,—তাই তো ভাবছি, ঠিকই বলেছ। আমি ভাবি চতুরা স্ত্রীলোকের কী অদ্ভুত ইন্দ্রজাল!

আমি চতুরা—?—নন্দিতা বলে, ভিক্ষে চাইতো কে পেছনে পেছনে এসে? সাবধান কিন্তু সুপ্রিয়, আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব বলছি।

মুখের হাসি টিপে সুপ্রিয় বলে, আচ্ছা, দাও ভেঙে, দেখি তোমার হাঁড়িতে আর কি কি 'সন্দেশ' আছে। আমিও তখন বলব, হে সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, একটি বিষধর উর্ণনাভের জালে একটি নিরুপায় মক্ষিকা আবদ্ধ হয়েছিল। একটি অদ্ভুত চক্রান্তে সে বন্দী!

মুখখানা বিকৃত করে নন্দিতা বলে, মক্ষিকাই বটে, আঁস্তাকুড়ের মাছি।

থুড়ি।—সুপ্রিয় বলে, মক্ষিকা নয়, ভ্রমর। আর সেই ভ্রমরের পাখার গুঞ্জনে বসন্তরাগ শুনে রক্তগোলাপ মাথা দুলিয়ে উঠত।

অমনি নন্দিতা হেসে ফেলে, আমি মাথা দোলাতুম? কী মিথ্যেবাদী তুমি? কবিতা লিখে পাঠাত কে শুনি?

পুরনো কথাটা সুপ্রিয় স্মরণ করিয়ে দেয়, কবিতার সুখ্যাতি করত কে শুনি?

নন্দিতা বলে, স্বপ্নকন্যার রূপের প্রশংসা করোনি তুমি? আমরণ উপবাসের ভয় দেখিয়েছিল কে?

উত্তরটা তখনই সুপ্রিয় জুগিয়ে দেয়, হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী। কবির কোঁকড়া চুল আর কালো চোখের তারার কে জানিয়েছিল সুখ্যাত গোপনে?

নিজের চেহারার কী গর্ব! বেহায়া!

—বলে তখন নন্দিতা রণে ভঙ্গ দেয়।

আগে নতুন ঘরকন্নায় সুপ্রিয়র মন বসতে চায়নি। আগে মনে হয়নি তাকে ভাবতে হবে বাজার খরচের কথা, তেল-নুনের খবর, চাকর-বামুনের মাইনে। এ যেন তার কাছে একটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা। নন্দিতাকে সে বরাবর জানিয়ে এসেছে আকাশের চেহারাটা উজ্জ্বল নীল আর লোয়ার সার্কুলার রোডের রাত্রির দৃশ্যটা হেমন্তের কুয়াশা আর স্তিমিত আলোকস্তম্ভ মিলিয়ে একটা স্বপ্নজড়ানো রহস্য পথ। নন্দিতার চুলের অরণ্যে নববর্ষার যেন ঘনঘটা, আর মুখে শরতের সোনার রৌদ্র ঝলোমলো, আর আঁচলে উচ্ছ্বসিত চৈত্র পূর্ণিমার দোলা। আগে সুপ্রিয় ঘুমিয়ে পড়তো নিবিড় তন্দ্রায় মোটরের মধ্যে নন্দিতাকে ঘিরে, রবারের চাকায় জড়িয়ে যেত কলকাতা শহর পাকে পাকে, ঘন আলিঙ্গনে যেত মিলিয়ে রেড রোড আর চৌরঙ্গীর পাতালপথ। আশ্চর্য সেই অতিপরিচিত অপরিচয় কথা বললে যেন ধ্যান ভেঙে যেত। ঘুমের রসে টস টস করছে কণ্ঠস্বর—যেন দূরের কোন্ এক তপোবনে তপস্বীর মৃদু স্তবগান।

দেওদারের স্তব্ধ বিশাল ছায়ায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চক্ষে সুপ্রিয় বললে, ঘোমটা দাও মাথায়।

না।—নন্দিতা আদরে জড়িয়ে বললে, আড়াল করতে পারবো না তোমাকে।

আড়াল খুলে আবিষ্কার করে নেব।

লজ্জা করে যে তোমার সামনে ঘোমটা দিতে।

কেন ?

আগে থেকেই তো দেখে নিয়েছ। আড়ালে রাখার আর আছে কি ?

শীতের মধ্যাহ্নে দেওদারের নিভৃত স্তব্ধ ছায়ায় দাঁড়িয়ে নন্দিতা আবার বললে, নতুন বউ আসে ঘোমটা দিয়ে, সেইজন্য তাকে খুঁজে বার করতে হয়।

সুপ্রিয় বললে, হল না। বরকে যতই জানতে থাকে ততই ঘোমটা খোলে মেয়েরা।

বিয়ের পরেও নন্দিতা ঘোমটা দিল না, সিঁথির সিন্দুর লুকিয়ে রাখল একপাশে চুলের ঘন অন্ধকারে—অরণ্যের গভীরে যেমন গোপনে থাকে অগ্নিশিখা। এটা কেমনতরো ? নন্দিতা বললে, আমাদের তরুণ কৌমার্যকে জাগিয়ে রাখব দুজনের সামনে চিরনূতন করে।

রাখিপূর্ণিমার রাত্রে ওরা স্টীমারে চলেছিল বদরতলা পেরিয়ে। আকাশের এক পারে শরতের চন্দ্র, অন্য পারে মেঘের মন্দ্র। সুপ্রিয় বললে, পারবে ?

তার হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে নন্দিতা নতমুখে বললে, বোধ হয় পারব না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো প্রতিজ্ঞাই থাকে না।

সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর সেই চন্দ্রবরণ নদীর উল্লোলে উচ্ছ্বসিত দোলায় দুলে উঠল। অনাদি আর অনন্তকাল তার সেই আবেগের মুহূর্তের উপরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। বললে, নন্দিতা, ভুলতে ইচ্ছা করে না আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের উল্লাসের দোলা, আমার বুকের রক্তে যখন কবিত লিখে-ছিলুম আর তুমি সেই রক্তে দুই চরণ রাঙিয়ে এসে দাঁড়ালে।

স্টীমার সেদিন যেন জীবন-মরণ বিদীর্ণ করে চলেছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে অথৈ অজানায়।

সুপ্রিয়র চমক ভাঙলো। এর মধ্যে কখন বেবি নিচে থেকে এসে তার পায়ের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। সেদিনটা নেই বটে, কিন্তু এখন এসেছে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি। প্রথম প্রবাহটার সেই খরবেগ এখন মন্থর, জীবনযাত্রাটা দুই দিকে এখন বিস্তৃত, গভীর হয়েছে বলেই উপরটা প্রশান্ত, প্রথম অবস্থাটা চঞ্চল ছিল বলেই দিশাহারা, এখন লক্ষ্যটা স্থির, তাই নিরুদ্বেগ।

চুড়ির আওয়াজে সুপ্রিয় মুখ ফিরিয়ে তাকালো। নন্দিতা ঘরে এসে দাঁড়িয়ে বললে, পায়ের তলায় এসে বুঝি ঢুকেছে? ওকে আমি তাড়াবো।

সুপ্রিয় বললে, তাড়ালে যাবে কোথায় বেচারা!

কুকুরের নেশা নিয়ে তোমাকে আমি থাকতে দেব না।

তুমি ছাড়া বুঝি আমার আর কোনো নেশা থাকতে নেই?

না।—বলে নন্দিতা কাছে এল। সুপ্রিয়র গলাটা তার চুড়িভরা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর মুখ রেখে বললে, তোমার আর কোনো নেশা আমার বরদাস্ত হয় না।

সুপ্রিয় বললে, কেন বলো তো?

শুনলে তুমি আস্পর্ধা পাবে তাই বলতে ইচ্ছা করে না।

আচ্ছা বলো, অভয় দিচ্ছি।

নন্দিতা বললে, সহজে তো পাইনি, পেয়েছি অনেক দুঃখে, তাই কেবলি হারাবার ভয়। তুমি আর কিছুতে মন দিতে পাবে না।

সে কি ঈশ্বর চিন্তাও নয়?—সুপ্রিয়র চাহনিতে ভীষণ বিস্ময়।

নন্দিতা তার মুখখানা টিপে ধরে বললে, নাস্তিকের মুখে ঈশ্বরের নাম শোনাও পাপ। আর বলবে?...বলবে আর?

আঃ ছাড়ো ছাড়ো, সতী নারীর চুড়ির ঘায়ে মুখখানা কেটে গেল বুঝি।

বেবি এইবার কোনো আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কা করে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। সুপ্রিয় বললে, ওর সঙ্গে তোমার একটা আড়ি আছে।

হেসে নন্দিতা বললে, ও আমার চোখের বালি। ঐ যে বেরিয়ে গেল, এ বেলায় আর বাড়ি ঢুকবে না।

সুপ্রিয় তার কোমরে বাঁ হাতখানা জড়িয়ে বললে, সংসারের সঙ্গে তুমি মানাতে পারো না, তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাও তাই না?

অমনি গোঁজামিল দিচ্ছ, কেমন?—নন্দিতা বললে, ঠিক উল্টো, তোমাকে বাগ মানাতে পারিনে ঘরকন্নায়, তাই এত ঠোকাঠুকি। এই যে সকালবেলা থেকে বসে রইলে, করলে কি বলো দেখি?

করতে তো বলোনি?

বলে না দিলে বুঝতে পারো না? বাজার হল কোত্থেকে, রান্না হল কি দিয়ে? না হয় জানলুম চাকর-বামুন আছে কিন্তু খোঁজ-খবর রাখা?

সুপ্রিয় বললে, এও আমাকে করতে হবে? বিয়েটা ফিরিয়ে নাও নন্দিতা, এসব আমি পারবো না। বলো কি, বাজারের হিসেব? মুদির ফর্দ? গয়লার পাওনা?

একখানা চেয়ারেই দুজনে ঠেসাঠেসি করে বসল, নন্দিতা হেসে বললে, ধোপার খাতা, বাড়িভাড়া, ঘুঁটে-কয়লা—তাছাড়া ডাক্তারি, মনিহারী, স্যাকরা, আরো কত কি।

আমাকে মুক্তি দাও, নন্দিতা। এসব আমি পারব না।

নন্দিতা স্বামীর গায়ে মুখখানা বুলিয়ে বললে, আরো রইল। ব্যাঙ্কের জমাখরচ, পোস্টাপিসের খাতা, ইনসিওরেন্স পলিসি, পাটকলের শেয়ার, তোমার বাড়ির খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, সব ছাড়িয়ে তোমার চাকরি।

ব্যাকুল হয়ে সুপ্রিয় বললে, সবই ঠিক কিন্তু আমি কী অপরাধ করেছি? বিয়ে ফিরিয়ে নাও, নন্দিতা। বিয়ে আমি করিনি, ঘরকন্না আমি মানিনে। আমাকে ছেড়ে দাও, কেঁদে বাঁচি।

নন্দিতা তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, তখন মনে ছিল না?

কখন গো?

দেবদারুর ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?

সুপ্রিয় বললে, তখন কে জানত তোমাকে পাওয়া মানে এতখানি উৎপীড়ন মাথা পেতে নেওয়া ? হাঁ, প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলুম, মহারানীর সকল দায়িত্ব আমি বহন করব।

তবে ?—নন্দিতা প্রশ্ন করলে।

দাঁড়াও, তখন গয়লা-মুদি-ধোপা-কয়লাওয়ালা কেউ গিয়ে দাঁড়ায়নি। তোমার প্রেমে মজতে গিয়ে তোমার ঐ বর্বর সন্তানদলের বীভৎস আক্রমণ আমাকে সইতে হবে এমন কথা তো হয়নি ?

নন্দিতা বললে, তবে না হয় চলো পালিয়ে যাই কোথাও ?

যেখানেই পালাব তোমাকে নিয়ে, সঙ্গে থাকবে এই গোলকধাঁধা আর এই প্যারাফারনালিয়া। আর যাবেই বা কোথায় তুমি তোমার এই শরীরে ?

স্বামীর কাঁধের ওপর মাথা রেখে নন্দিতা বললে, সব গুলিয়ে দিলে তুমি। কিসে কি হল আমিও ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সুপ্রিয় বললে, পারবে আর কিছুদিন পরে। আমি কিন্তু বলে রাখছি নন্দিতা, হয় বিয়ে ফিরিয়ে নাও আর নয়তো তোমার সন্তানদলের ছোঁয়াচ থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো। বিয়ে মানে দায়িত্ব, কিন্তু দায়িত্ব মানে ভদ্রজীবনের ওপর অত্যাচার নয়। টাকাকড়ি ঘরকন্না সবই তোমার আর তুমি কেবল আমার,—এই শর্ত।

নন্দিতা তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, তুমি কি সিরিয়াস ?

হাফ সিরিয়াস। কারণ মনের কথা হেসে না বললে তোমার দরবারে আবেদনটা পৌছবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিতা বললে, কোনো শর্তে আমি সংসার করতে পারব না। তোমার যা খুশি তাই করো।

সুপ্রিয় বললে, এই অত্যাচার সইতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যু ঘটে ?

ঝংকার দিয়ে নন্দিতা বললে, তবে তোমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। এই বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেলা এগারোটার পর সুপ্রিয় খেয়ে দেয়ে আপিস বেরোলো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রবল উৎসাহে নন্দিতা ঘরের কাজে মন দিয়েছে। চাকরটাকে বললে, ওপরে আয় একবার আমার সঙ্গে—এই বলে সে কোমর বেঁধে একটা প্রবল তাড়নায় কাজে লেগে গেল। নতুন করে ভাবতে সেও জানে। মেয়েদের সৃষ্টিশক্তি নেই, এমন মতবাদ যাদের, নন্দিতা তাদের প্রতিবাদ। নন্দিতার

অত্যধিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি ডাক্তারের নিষেধ। কিন্তু আজ তাকে বাগ মানানো যাবে না। স্বামীর মনের প্রবাহটা আবিল হলে স্ত্রীর পক্ষে দুর্দিন কিনা নন্দিতার জানবার দরকার নেই। কিন্তু পুরুষকে ঠিক বুঝতে না পারলেই নারীর মনে জমে ওঠে আশঙ্কা, তখন চুম্বন-আলিঙ্গনের আতিশয্যটাও নির্ভুল নিরাপদ বলে মনে হয় না। পুরুষের প্রাণের চিন্তাধারার সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে না পারলে মেয়েদের স্বস্তি নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল অতিশয় পরিশ্রমে নন্দিতার কপালে চুলের আঙটগুলি বেয়ে কোমল কয়েকটি ঘামের ধারা নেমে এসেছে গাল বেয়ে। মুখে ললিত রক্তাভা, যেন ভিতর থেকে প্রভাতের তরুণ সূর্যোদয়ের আভাস। কিন্তু আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সবগুলিই ঘামের ফোঁটা নয়, টলটলে অশ্রুর ধারাও নেমে এসেছে তার সঙ্গে। বিড়ম্বিত জীবন তার নয়, কিন্তু এতদিন পরে আজ যেন একটা আকস্মিক ঝাপটায় মনে হচ্ছে, সর্বস্বান্ত হয়েও একজনকে আজও পরিপূর্ণ পাওয়া যায়নি, জটিল রহস্যের আঁকাবাঁকা পথে এখনও রইল সে অনেক দূরে, হয়তো ঘোমটা সরিয়ে ধীরে ধীরে তাকে আবিষ্কার করলেই পাওয়া সহজ হত। সংশয়ের দ্বন্দ্বে আর বুঝতে না পারার অনুতাপে নিরুপায় নন্দিতার মনে কেমন যেন একটা আসন্ন ভূমিকম্পের থরো থরো কম্পন এপার থেকে ওপার পর্যন্ত শঙ্কায় আকুল করে তুলেছে। ওদের ভালবাসার আগডালে সুগন্ধ ফুল ধরেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃত্তিকার নিচে মূল এখনও গভীরে নামেনি। ফুল ফোটার চেয়ে শিকড়ের দিকে কোনো নজর নেই।

সন্ধ্যার সময় সুপ্রিয় ফিরে এল। সে আসে একটা সমারোহ সঙ্গে নিয়ে। মোটা টাকা মাইনে পায়, কিন্তু রোজ রোজ নতুন নতুন মোটরে চড়বার লোভে সে দামী ট্যাক্সী চড়ে আসে—মোটর আজো কেনেনি। সঙ্গে আসে মনিহারি, ব্যাঙ্কের খাতাপত্র, চৌরঙ্গী গ্রীলের খাবার, নিউ মার্কেটের ফুল—কোনো কোনো-দিন মুখরোচক অসাময়িক দামী আনাজ-তরকারি।

গাড়ি থেকে নেমে এসেই স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। আজ কি ভুল করে সে অন্য বাড়ি ঢুকেছে?

কাছে এসে নন্দিতা বললে, দেখছ কি বোকার মতন? এই বলে মাথার টুপিটা খুলে নিলে।

সুপ্রিয় শুধু বললে, হতবুদ্ধি!

অমন হাঁ করে থাকলে আমি কিন্তু সব টান মেরে খুলে ফেলব।

আজ তার কপাল থেকে সিঁথির ভিতর অবধি সুদীর্ঘ বিস্তৃত সিন্দুররেখা।
পরনে গঙ্গারঙের রেশমী রাঙাপাড় শাড়ি, আঁচলে চাবির গোছা, মাথায় ঘোমটা।
সুপ্রিয় রাঁধুনী বামুন আর চাকরটাকে লুকিয়ে নন্দিতাকে কাছে টেনে নিল।
বললে, নতুন কিনা, তাই ভালো লাগছে।
নন্দিতা বললে, আজ কিন্তু তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।
সে কি, গাড়ি আনলুম যে তোমার জন্যে! তুমিই তো বেড়াতে যাবার জন্য পাগল, আমাকেই তো তুমি তিষ্ঠতে দাও না।
না, চলো ছাদে বেড়াবে, আজ পূর্ণিমা।
গাড়ি ফিরে গেল। ঠিক বোঝা গেল না—নতুন করে মিলনের আনন্দ, অথবা আজ অভিনব উপায়ে পরস্পরকে জানার আগ্রহ? রমণীর বেশ ছেড়ে আজ হঠাৎ গৃহলক্ষ্মীর ছদ্মবেশ কেন?
গলা ধরাধরি করে উপরে উঠে গিয়ে সুপ্রিয় বলল, রস ঢেলে দিয়ে আজ মাতাল করবে, না অমৃত ঢেলে ঘুম পাড়াবে, নন্দনবাসিনী?
সুপ্রিয়র বোতাম খোলা কোটটা মুখের উপর টেনে নন্দিতা বললে, রসটা ছেঁকে নিলেই অমৃত।
সঙ্গীত না সুভাষণ?
দুটো মিলিয়ে যা হয়—কবিতা! ঘরে চলো।
ঘরে ঢুকে সুপ্রিয় অবাক হয়ে গেল। যে ঘরে সকালবেলা সে ছিল, এ ঘর সে নয়। তার চকচকে চোখের তারা চারিদিক থেকে ঠিকরে পড়তে লাগল। যা ছিল তা সবই আছে, কিন্তু ভিন্ন চেহারায়, ভিন্ন ভঙ্গিতে। পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে নয়, প্রাণ বৈচিত্র্যটাই যেন সজীব। এ দেয়ালের ছবি ও দেয়ালে, এধারের খাট ওধারে, নতুন হয়ে এসেছে ফুলদানি, চায়না গ্লাস ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণে, মখমলের জাজিমে রেশমী তাকিয়া, পোর্ট্রেটগুলোর বদলে ল্যাণ্ডস্কেপ এসে সমস্ত ঘরখানার ভিতরে কল্পনার একটা অসীম ব্যাপ্তি এনে দিয়েছে।
পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে অন্য ঘরে নন্দিতা স্বামীকে নিয়ে গেল। এ আবার নতুন জগৎ। এধারে সোফা আর ইজিচেয়ারের সেট, ওধারে পিয়ানো। দেয়ালের গায়ে গায়ে বইয়ের আলমারি, কোণে কোণে পিতল আর পাথরের পুতুল, মাঝখানে কাঁচের টেব্‌লের উপর চীনা আর তিব্বতী কিউরিয়ো, জানলার স্ক্রীনগুলিতে সুন্দর কারুকলা চিত্রিত।
সুপ্রিয় বললে, পেলে কোথায় এত!

নন্দিতা বললে, সবই ছিল।
দেখতে পাইনি তো?
চোখ ছিল না তোমার। এসো, এবার কাপড় ছাড়বে।
শোবার ঘরে এনে সুপ্রিয়কে খাটের উপর বসিয়ে নন্দিতা তার পায়ের জুতো আর মোজা খুলে নিলে। ঠাকুর খাবার নিয়ে এল হাতে করে। কচুরি, নিমকি আর সন্দেশ দেখে সুপ্রিয় বললে, কিরকম যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। হঠাৎ আজকে এমন রাজোচিত আতিথেয়তা আরম্ভ হল কেন—ব্যাপারটা কি বলো তো ঠাকুর?
ঠাকুর টিপাইয়ের উপর খাবার আর জল রেখে যাবার সময় বললে, সবই মা তৈরি করেছেন।
লক্ষণ ভালো নয়। যুদ্ধের চেয়ে সন্ধির চেহারা দেখলেই আমার ভয় করে।
কেন?—নন্দিতা হাসিমুখে প্রশ্ন করলে।
মনে হয় তখন বুঝি তোমাকে আর চিনতে পাচ্ছিনে।
ঝগড়া করে কী হবে?
সুপ্রিয় বললে, এতেও আমার দুশ্চিন্তা। তুমি চুপ করে থাকলেই মনে হবে দূরে সরে যাচ্ছ। তোমার মুখ বন্ধ হলেই আমার হবে পরাজয়। আমি সীতাও চাইনে, দ্রৌপদীও নয়, আমি চাই সুভদ্রাকে। আমার হাতে ধনুর্বাণ, তার হাতে অশ্ববল্গা!
হয়েছে। এবার 'বীরের তনুতে লহ তনু।' এই বলে উঠে নন্দিতা হাত ধুয়ে স্বামীর মুখে একখানা কচুরি পুরে দিল, তারপর সুপ্রিয়ের কোমরের বোতামগুলি খুলে ট্রাউজার ছাড়িয়ে নিয়ে ধুতিখানা জড়িয়ে দিতে লাগল।

*　　*　　*　　*　　*

মাস পাঁচেক পরে অত্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে সুপ্রিয় সেদিন সন্ধ্যার সময় হাসপাতালে খবর নিতে এল। ডাক্তার হাসিমুখে বললেন, কেবিনে যান, আপনার স্ত্রী ভালো আছেন।
মুখের উপরকার অস্বস্তির ছায়া আনন্দে রূপান্তরিত হল। সুপ্রিয় সোজা দোতলায় উঠে গিয়ে সাত নম্বর কেবিনে ঢুকল। নার্স নমস্কার জানিয়ে বললে, সন্দেশ আনুন।
সুপ্রিয় হাসল, তারপর আড়ষ্ট পা দুখানা টেনে নন্দিতার কাছে এসে দাঁড়াল। আজ আবার স্ত্রীর সঙ্গে তার নতুন করে পরিচয়। লজ্জা নয়, কিন্তু আনন্দের

অসহনীয় অস্বস্তিতে নন্দিতা বালিশে মুখ লুকিয়ে রইল; মিনিট দুই পরে দেখা গেল, তার নাক বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পাশের নবজাত সুন্দর শিশুর ছোট বালিশটিও ভিজে গেছে।

নার্স বাইরে গেল। মাথার কাছে বসে রুমাল দিয়ে সুপ্রিয় নন্দিতার চোখ মুছিয়ে দিল। হাতখানা একটু কাঁপল। রমণী রূপান্তরিতা জননীতে—আজ তাকে যোগ্য সম্ভ্রম না দিলে আর চলবে না। সুপ্রিয়ের হাতখানা আবার সন্তর্পণে ফিরে এল। কিন্তু অশ্রু কেন আজ? হয়তো নন্দিতার সেই জীবনটা এবার মুছে গেল—সেই দেওদারের ছায়াপথ, প্রিয় সান্নিধ্যে সেই অপরূপ জ্যোৎস্নার অবগাহন, চৌরঙ্গীর আবেশ-বিহ্বল স্বপ্নলোক, তরুণ কৌমার্যের মালঞ্চে বাসকশয্যা। সেই জীবনের বিচ্ছেদ-বেদনা আর এই নূতন জীবনের আনন্দ—হয়তো এই অশ্রুতে তার বিচিত্র সংমিশ্রণও ছিল।

সুপ্রিয় নতমস্তকে নূতন শিশুটির দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে নন্দিতা বললে, বাড়ির খবর কি? ঠাকুর চাকর আছে তো?

আছে।

ঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া হয়?

হ্যাঁ।

ভাঁড়ারের চাবিটা নিজের কাছে রাখো তো?

হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে নন্দিতা বললে, কুকুরটার খোঁজ পেলে কিছু?

নিশ্বাস ফেলে সুপ্রিয় সজাগ হয়ে বললে, হ্যাঁ, দশ বারো দিন পরে কাল সকালে দেখি, আমাদের বার বাড়ির সিঁড়ির তলায়।

পোড়ামুখী ছিল কোথায় এ ক-দিন?

সুপ্রিয় হেসে বললে, আরে সেই কথাই তো বলছি। তোমার ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। চেহারা দেখে সন্দেহ হল, সিঁড়ির তলায় ঢুকে দেখি বেবির তিনটে বাচ্চা হয়েছে।

অ্যাঁ?

বাচ্চা গো। একটা নয়, তিন তিনটে। আর তাকে তাড়াতে তোমার মন উঠবে না দেখো। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বাচ্চাগুলো!

নন্দিতা মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে পড়ে রইল।

অমরেন্দ্র ঘোষ (১৯০৭—) ॥ বাঁদী

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু জল, বর্ষার ঘোলাটে ফোঁপানি, মাথায় ফেনার ফুল। এই আছে, এই নেই, আবার ছড়িয়ে পড়ল সহস্র সহস্র। যেমন ঝাপ্‌টা, তেমনি ঢেউ, তেমনি জন্মাচ্ছে রাশি রাশি ফুল। আকাশের দিকে স্তবকে স্তবকে ঠেলে উঠছে। বুঝি বা অভিনন্দন জানাচ্ছে মৌসুমী কালো মেঘকে।

অমাবস্যার দুর্দান্ত ভাটা। নদী তরঙ্গ ঠেলে চলেছে দক্ষিণে, সমুদ্র-সঙ্গমে। যে কখনও কানে শোনেনি, সে এ নদীর শব্দ, শোষানি, ঢেউয়ের মাতন দূর থেকে কল্পনাই করতে পারবে না। পূর্ব বাংলার মানচিত্রে যে সরুসরু নীল শিরার মতো পদ্মা-মেঘনার শাখা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে, এ নদী তাদের একটি ভগিনী অথবা বেহায়া ননদ। নামটিও চমৎকার —ঠাকুরঝিতলার গাঙ।

পায়রা নদীর সবচেয়ে চওড়া বাঁকটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, যেখানে পঁচিশ ত্রিশ হাজার মনী মহাজনী ভরাগুলোকেও (বড়ো নৌকা) দেখায় ছোট ছোট শিশু পারাবতের মতো, সেইখানেই দেখা ঠাকুরঝির সঙ্গে। শুধু বেহায়াপনা, কুটিল হাস্য। ভয়ে শিউরে ওঠে নৌকা যাত্রী। পৃথিবীতে কি কোথাও কূল আছে? স্থল আছে মানুষের স্বেচ্ছাবিহারের? বর্ষাকাল হলে তো কথা নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, শুধু অবিশ্রান্ত আতঙ্ক। একটানা গর্জন ঠাকুরঝির যদিও বা কখনও থামে, প্রমত্তা হয়ে ওঠে পায়রা। উল্লাসে লোভানি, লাফানি ঠেলে দেয় আকাশে। ঢেউয়ের মাথা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার আভের টুকরা। আবার তা মিলিয়ে যায় দেখতে দেখতে।

২. আজ

এমনি একটা বর্ষার দিনে ঠাকুরঝিতলার ভিতরে এক গঞ্জে একখানা আটমাল্লাই পান্সী বাঁধা। যাবে পায়রা নদীর একটু পাশ কাটিয়ে কোনোও এক জমিদারী

মহলে। জমিদার সুলেমান সাহেব নৌকায় খাস কামরায়। সঙ্গে তার এক তরুণী বিবি। বোধ হয় সপ্তম পক্ষের। বিবি এবং সাহেবের তদ্‌বির তদারকের জন্য একজন বাঁদীও এসেছে নায়ে। সেও বিবির তুলের তুল দেখতে। অবস্থা সাজ সাজসজ্জায় বৈগুণ্য না থাকলে কে যে বিবি. আর কে যে বাঁদী তা বোঝা কঠিন হত। দুজনারই দাঁতের সুমুখের পঙক্তি হীরার মতো। বিবির গালে তিল আছে, বাঁদীর গালের সে অভাব পূর্ণ করেছে ছোট্ট একটি টোল। হাসি তো মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। তবে বিবি ও বাঁদীর হাসিতে পার্থক্য আছে প্রচুর। একজন হাসে খুশিতে, আর একজন খুশি করতে। আরও বৈষম্য আছে চাল-চলনে। একজন যখন আইনত দাবি করে শয্যা, আর একজন তখন আশঙ্কায় রাত্রি জাগে কখন হয় ধর্ষিতা। সুলেমান মদ্যপ অসংযমী।

ঠাকুরঝিতলার গাঙের প্রায় এক বাঁক ওপরে একটা ছোট খালের মধ্যে কয়েক-খানা লম্বা ধরনের ডিঙি বৈঠা পুঁতে 'পারা' করে রেখেছে একদল ডাকু। তাদের নায়ের পাটাতনের তলে সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ারগুলি গোছানো—রামদা, ল্যাজা, পাকা বাঁশের পোক্ত লাঠি। সড়কি এবং ঢালও আছে গণ্ডারের চর্মের। মাঝিগিরি করে পেট ভরে না। এই তিন পুরুষ তো গত হল বান্দা খেটে জসিমের। সে-ই 'খোজারু' সেজে খোঁজ দিয়েছে সুলেমান সাহেবের গতিবিধির।

ডাকুরা বড্ড ফাঁপরে পড়েছে। সুলেমান সাহেব নাও খুলছেন না। ওরাও কিছু করতে পারছে না। পায়রা নদীর পাশাপাশি না হলে তো কোনোও জুত করার উপায় নেই। ওরা সাধারণ ধান-কাটা কৃষাণদের মতোই রেঁধে বেড়ে খাওয়ার অভিনয় করছে। আর গালাগালি দিচ্ছে খোদাকে। বর্ষাকালে বাড়িতেও উপোস, খাটতে নেমেও তাই। শিকার ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

ওদের ইচ্ছা করে নদীর মাতলামি একেবারে থামিয়ে দিতে—ঠাণ্ডা করে দিতে সেই শীতের গাঙের মতো। যেন শীতল-পাটি বিছানো। কিন্তু গরিব যতই দুঃসাহসিক কাজে নামুক—তাদের ইচ্ছা মতোই তো আর জমিদার নাও খুলবেন না।

বাঁদীর নাম আমিনা। সে এক ফাঁকে রসুই-খোপে এসে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাও খুলবা কখন মিঞা ?'

'যখন তোমার গাঙে ডুইবা মরার ইচ্ছা হইবে, কইও।'

'ওমা কয় কি! আমি মরুম ক্যান পানিতে ডুইবা—বুড়া হইছ তুমিই মরো।'

'তয় গাঙের দিকে না চাইয়া কথা কও ক্যান? দেখো না আসমান-জমিন একাকার—ক্যাবল মাথা-ভাঙা ঢেউ।'

তা আমিনা দেখেছে। তবু ভাবছে, যত সত্বর কাছারী-বাড়ি দশজনের ভিতর যেতে পারে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। কি কুক্ষণে, কি বুঝে যে তার মা এই নায়ে তাকে তুলে দিয়েছিল!

আমিনা সবে মাত্র উনিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও কৌমার্য তার অক্ষত। সে প্রভুদের সমস্ত মহিমাই জানে, তাই একান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।

আমিনা চেয়ে দেখল, কেমন জলের ঢলক খেলছে মাঝ দরিয়ায়। তারপর খানিকটা দূরে সে কী উন্মত্ত আস্ফালন! পায়রা নদী আর ঠাকুরঝি যেন গিলে খেয়েছে সমস্ত সবুজ তীর ও তট। অনেকক্ষণ চাইলে মাথা ঘুরে যায়। কূলহীন ঝোড়ো সমুদ্র সে কখনও দেখেনি, কিন্তু এই বর্ষার কালো মেঘের পটভূমিতে যে গেরুয়া জলরাশি দেখতে পায়, তার চেয়ে যে ভয়ংকর কিছু আছে পৃথিবীতে সে তা ভাবতেই পারে না।

তবু বিমূঢ়ের মতো সে খানিক বাদে মাঝিকে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'নাও খোলবা না?'

মাঝি বিরক্ত হয়ে বলে, 'না। তোমার মতো পাগল তো দেখি নাই এ জিন্দায়!'

প্রকৃতির খেয়াল-খুশি মানুষের অনুমানের বাইরে। অনিচ্ছুক মাঝিকেও হঠাৎ গাঙের দিকে চেয়ে নাও খোলার হুকুম জারি করতে হয়। 'সামাল, সামাল, বান আইছে ঠাকুরঝির বুক ভাইঙা। লঙর খোল, পারা তোল ইব্রাহিম, জসিম, কেরামত।'

সবাই মিলে লঙর-কাছি গোছায় আর ডাক ছাড়ে, 'বদর, বদর।' শিন্নি মানত করে পাঁচ পীরের দরগায়। খোদা, ওদের যেন জান না যায়—ইজ্জৎ যেন বাঁচে বুড়ো মাঝির। সে জীবনে এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও।

আমিনা দেখল যে, ঠাকুরঝি পাগল হয়েছে, আর তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে বেসামাল ঢেউ। সে কি তার তড়পানি!

নৌকা মাঝ দরিয়ায় আনা সম্ভব না হলেও কয়েক রশি ভিতরের দিকে এসে অপেক্ষা করতে লাগল বানের ঢেউয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। এ-সময়

না কি পাড়ে থাকা নিতান্ত বিপজ্জনক। তোড়ের ধাক্কায়, পাড়ের ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে ওর চেয়েও হাজার গুণ শক্ত নৌকা।

আমিনা খাস-কামরায় এসে লক্ষ্য করল যে, বিবি সাহেব জড়িয়ে ধরেছে সুলেমান সাহেবকে। 'কই যান, বড়ো ডর করে আমার।'

'তা বইলা পেত্নীর মতো ভয় করতে পারবা না। চুপ কইরা বইসা আল্লার নাম করো।'

আমিনা মনে মনে একটু না হেসে থাকতে পারল না। দায় ঠেকলে মাতালের মুখ দিয়েও বড়ো বড়ো কথা বের হয়। কিন্তু তাতে মন ভিজল না তো বিবি সাহেবার।

আমিনা নৌকার খাস-কামরার একটা নকৃসি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বানের ডাক ক্রমে কাছে এল।

যখন ঠাকুরঝির দু-পাড় ছাপিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বান, তখন কি জানি কি ভেবে মাঝি হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল পান্‌সীখানা। মুখোমুখি বানের ধাক্কা না নিয়ে, বানের উদ্দাম গতিকে আয়ত্তে আনল নায়ের পিছনের দিকে তুফান বাঁধিয়ে। ভেসে চলল পান্‌সী—উল্কার মতো এগিয়ে চলল উত্তরে। পায়রা রইল অনেক দূরে পড়ে।

নায়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এল প্রায় সাড়ে তিন বাঁক ওপরে গিয়ে। তার মানেই হচ্ছে প্রায় চার-পাঁচ ক্রোশ।

এতখানি পথ আসতে কতটুকুই বা সময় লাগল! কিন্তু বেলা যে পড়ে এল। নিকটে কোনোও মনুষ্য-বসতি নেই। থাকলেও তার বাসিন্দারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভয় আছে ডাকাতি রাহাজানির।

'কি করবা রহমত?' মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন সুলেমান।

'হুজুর এইখানেই লঙর ফেলুম। হাজারটা হাতীতে হাওদা লাগাইয়া টানলেও এই উজানে নাও পিছাইবে না। গঞ্জে ফিরুম ভাট্টা হইলে।'

'কিন্তু...'

আমিনা বুঝল মদ ফুরিয়েছে। যাক, বেশ হয়েছে।

আমিনার বাপ ও মা তেমন সুন্দর ছিল না। তেমন কেন মোটেই নয়। কিন্তু তাদের ঔরসে কি করে জন্মাল এ স্বর্ণলতা? উদাহরণ দেখাতে গেলেই বলতে হবে, এ যেন বাদশাজাদী। উদাহরণ বস্তুটি কোনো সময়েই সত্য নয়, তবে

একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু আমিনার বেলা এটা ছিল নিছক সত্য। ওর পিতা ও মাতার মধ্যে একটা আইনসম্মত সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর, কিন্তু তা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী। হুজুর-বংশ মাঝে মাঝে নদীর উঠতি চরো জমির মতো জবর-দখল করে ভোগ করতেন।

পুরুষটাকে খাটিয়ে নেওয়া হত যতদূর নেওয়া সম্ভব, আর মেয়েলোকটাকে তার সারা দিনমানের ক্লান্তির পর করা হত অতর্কিতে ভোগের সামগ্রী। কোর্মা-পোলাউ-এর মুখে কিছু টক-চাটনির তো দরকার।

এমনই একটা টক-চাটনির পরিণতি আমিনা।

তা হোক, তবু সে সুন্দর, মায়া হয় দেখলে—আর জ্বালা হয় সমস্ত তলিয়ে ভাবলে।

ধাক্কায় ধাক্কায়, অশিক্ষায় অপব্যবহারে আমিনার মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে যে চোখে দেখতে পেত না, তা নয়—অন্ধ হয়েছিল তার মনের চোখ। তাই সে সুলেমান সাহেবের খাস বাঁদী করে দিয়েছিল মেয়েকে। বলেছিল, 'নয়া শাদি হইলে কত কান্দে, শ্যাষ বাপের ঘরের কথা ভুইলা যায়। বছর অন্তর একবার আসে কি আসে না। তুই যে আজ কান্দিস আমিনা, কাইলই হয়তো যাবি এ বুড়ী মায়েরে ভুইলা। কত দেখলাম, আমার বয়স হইল দেড় কুড়ি।' ধারাপাতের ওপর সামান্য একটু অধিকার না থাকলেও বুড়ী অশ্রু বিসর্জন করে কি যেন এক সুমহান্ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায়। এবং তা সে বাধ্য হয়ে সৃষ্টি করল নিজেই। কুড়াল দিয়ে অনেকেই কোপ মারে কিন্তু যে নিজের পায়ে কোনো দিন আঘাত করেনি, সে বুঝতেই পারবে না আমিনার মার মর্মব্যথা।

আমিনা খানিকটা মন-মরা হয়ে নায়ে উঠে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে মাকে ভুলবে না কিছুতেই। আর এর জন্য প্রতিজ্ঞার কি-ই বা প্রয়োজন? তার চারিদিকে যে বিপন্না এক বুড়ী মায়ের অশ্রুসজল মুখখানা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! যত বার সে চোখ মুচছে কেবল দেখছে ঐ একই ছবি। নদী, জল একাকার।

সন্ধ্যার একটু পরেই টিমিয়ে এল পুবো হাওয়া। জলের শোবানি গর্জানিও সেই সঙ্গে কমে এল। বাতি জ্বলল প্রত্যেক কামরায়। রান্না-বান্নার জোগাড় হল, হাতিয়ার নিয়ে হুঁশিয়ার রয়ে রইল পাইক পাঁচজন।

'আমিনা একটু সরাব দে।'

'বোতল খালি হুজুর।'

বোতলের মালিক তা জানতেন ভালো করেই। তবু কেন যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোদের আর খেয়াল হইবে কবে। এখন পানি ঢাল বোতলে।'

সুরাগন্ধী জল এল রূপার গ্লাসে। তাও কতকটা সুরার সামিল। বোতল ছিল অনেকগুলোই খালি। কিন্তু তেমন ক্রিয়া হল না। তবু কিছুটা বেসামাল ভাব দেখাতে লাগলেন সুলেমান সাহেব।

'যদি এখন আইসা ডাকাইতে ধরে আমাগো?'

নতুন বিবি একেবারে কাতর হয়ে পড়ে। 'খোদার কসম চুপ করেন।'

'যদি চায় তোমারে?'

'আল্লা গো!' আর্তনাদ শোনা যায় বামা-কণ্ঠের।

নয়া বিবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পাশবিক আমোদ উপভোগ করেন সুলেমান।

এই সূত্রে একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে আমিনার।

সুলেমানের মা এক বাটি দুধ রেখেছিল এক দিন জ্বাল দিয়ে। বাড়ির পাশের এক উদ্বাস্তু কৃষাণের বিড়াল এসে খেয়ে গেল সেই দুধ। পরদিন ওত পেতে রইলেন সুলেমানের মা একখানা বঁটি হাতে করে। শীর্ণ বিড়ালটা আর কাছে ঘেঁষল না। দূরে বসে মেঁউ মেঁউ করতে লাগল। তখন বদ-মেজাজী সুলেমানের মার মাথায় একটা অদ্ভুত নেশা চাপল। তিনি ভিন্ন ঘরের জানালা গলিয়ে খানিকটা গরম ফ্যান ছিটকে দিলেন বিড়ালটার গায়। বিড়ালটা চকিতে সামলে নিল—কিন্তু গরম তাপের ভয়ে সে আর্তনাদ করে পালাল।

শৈশবে আমিনা যা প্রত্যক্ষ করেছে, এখনও তার তা ঠিক মনে আছে।

সুলেমান আবার বলতে লাগলেন, 'চিল্লাও ক্যান? একটু রস-তামাশাও বোঝো না। ডাকুর হাতেই যদি দিমু, তবে শাদি করলাম কেন সখ কইরা?'

নয়া বিবি কথা বলে না। যেন তার বিশ্বাস ফিরে আসছে না।

'তুই কি কও আমিনা? এতগুলো বৌ থাকতে আঁবার শাদি করলাম ক্যান? কি, জবাব দে, ডর নাই—দিল-খোলা কথা ক'।'

আমিনা প্রভুর চোখের দিকে বারেক তাকিয়ে বলে, 'খুশি হইলে আপনারা তো হুজুর কুকুর-ছাও কেনেন।'

'কি হারামজাদী, যত বড় মুখ-না তত বড়ো কথা! বন্দুকডা কই, আমার জোনালাডা?'

এ স্থলেমান সাহেবের ঠাট্টা না সত্যি মেজাজ, বোঝা গেল না। অর্থাৎ কিনা বুঝতে সময় দিল না, সত্যিকারের ডাকুর দল। তারা 'মার-মার' করে ঘিরে ধরল পান্‌সী। মুখে তাদের মুখোশের মতো কাপড় জড়ানো।

বন্দুকে টোটা ভরলেন স্থলেমান সাহেব। সামান্য নেশার ঝোঁক তিনি কাটিয়ে উঠে বাদশাহী মেজাজে খাড়া হলেন। শেরের মতো পা ফেলে ফেলে বাইরে বের হলেন; কামরার ভিতর রইল বাঁদী ও নতুন বিবি। কিন্তু শের ফেউ বনে গেল উপোসী ডাকুর সংখ্যা ও হিম্মত দেখে। এর মধ্যেই তারা মাঝি-মাল্লাদের কাবু করেছে হাত-পা বেঁধে। খোজারু জসিমের পাত্তা নেই।

'তোমরা কি চাও?'

'টাকা।'

স্থলেমান সাহেব কয়েক তাড়া নোট ছুঁড়ে দিলেন।

'আর কি?'

'গয়না।'

একটা সোনার অলংকার বোঝাই বাক্স ঠেলে দিলেন স্থলেমান।

'এখন আবার কি চাও—খাড়াইয়া রইছ যে?'

'আজ্ঞা গয়না পরবে কেডা?'

স্থলেমান সাহেব চিন্তিত হলেন। বলে কি এরা?

'ভাবেন কি হুজুর, আপনার কত বিবি আছে, এই নতুনডিরে মেহেরবানী কইরা খয়রাত দেন।'

'তা হইবে না।'

পূর্বের মতোই ছোকরা সর্দার উত্তর দেয়, 'এ তো পাঠার ইচ্ছায় ল্যাজে কোপ না। ডাকাইতের খাতায় নাম লেখাইয়া, লুটের সেরা মাল ফেইলা যামু না। গয়না হুজুর, পরবে কে? ময়না না হইলে খাঁচায় বইসা নাচবে কে?'

স্থলেমান আর বাক-বিতণ্ডা না করে ভিতরে চলে যান এবং উজ্জল মশালের আলোকে যার চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ডাকাতের হাতে তুলে দেন, তাকে দেখে হকচকিয়ে যায় ডাকুর দল। এ কি বেহেস্তের পরী?

কিন্তু নৌকায় নিয়ে গিয়ে তার মুখ বাঁধতে হয়। হাত-পা বাঁধার প্রয়োজন হয় না—চারদিকে জল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের নৌকাগুলো মিলিয়ে যায় উড়ন্ত পাখির মতো অন্ধকারে।

সুলেমান দাঁতে দাঁত ঘষেন রাগে দুঃখে অপমানে।

নৌকাগুলো চলতে চলতে এক স্থানে এসে থেমে পড়ে। নদী নয়—ঠাকুরঝির উজান বাঁক শেষ হয়েছে এই কিছুক্ষণ—নদীর সামিল খাল। যেমন নির্জন, তেমনি ঘিঞ্জি গাছপালা, লতা-বেতসে দু-পাড় ঠাসা। বড়ো-ছোট সব গাছই একাকার—শুধু নিবিড় ঘন কালি। জোনাকি জ্বলছে হীরার মতো। পোকা-মাকড়, বন্য জন্তু ছাড়া অন্য কিছু যে এখানে আছে, তা ভাবাই যায় না।

লুণ্ঠনের সমস্ত সামগ্রী ভাগ হয়ে গেল। শুধু কিছু টাকা গচ্ছিত রইল ছোকরা সর্দারের হাতে মামলা-মকর্দ্দমার ব্যয়ের আশঙ্কায়। অন্যত্র অনেক ঠকাঠকি হয়, কেউ গোপন করে সোনার হার, কেউবা টাকাকড়ি—কিন্তু রমজানের দলে সে সব হওয়ার জো নেই। তাই অল্প বয়স হলেও রমজানকে ভক্তি-বিশ্বাস করে বয়স্ক ডাকুরা।

একটি মাত্র বিবি, অনেক দিন পরে পাওয়া গেছে, কেউ আর সেদিকে নজর করল না। সেরা মাল সর্দারের ভাগে থাক। ও নিয়ে কি ঝামেলা কম। যদি বাধ্য না হয় তবে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হবে অত্যন্ত ধৈর্যশীলকেও। কোথায় গুম্ করে রাখা—আবার কে দেখে, কার কাছে ফাঁস করে দেয় যত গোপন তথ্য। সেই জন্য সুন্দরী হলেও দায়িত্বের বোঝা রইল, যে বোঝা বইতে পারবে তার কাঁধে।

'মিঞা, সেলাম—দেখা হইবে পরশু বিহানে ঠাকুরঝিতলার হাটে।'

'সেলাম, থাইক সাবধানে। সুলেমান সাহেব কিন্তু সহজ মুনিষ্য না।'

আপাতত কিছু লাভ হলেও ওরা একটা গুরুতর আশঙ্কা নিয়ে যে যার বাড়ির দিকে নাও খুলল।

জনহীন জংলা খালের পাড়ে নিবিড় অন্ধকারে একটি অপরিচিতা নারী ও একটি পুরুষ একখানা ছোট্ট নায়ে রয়ে গেল—যাদের ভিতর কোনোও প্রেম নেই, পরিচয় নেই, শুধু সাপে-নেউলে সম্বন্ধ।

ধৃতা বিবি ভাবছে: আর কি, এখন দেবে মুরগীর মতো গলায় ছুরি বসিয়ে—বিসমিল্লা বলে।

ডাকুর সর্দার স্থির করেছে: ও ছাড়া পেলে দেবে ফাঁসি কাঠে যে-কোনো উপায়ে লটকে।

পুবো-হাওয়া একটু কমেছিল, আবার বেড়ে এল। সঙ্গে বর্ষা। এখন আরও

নিবিড় সোঁতা খাল দরকার। এত মেহনতের পর আর এ জল সহ্য হয় না। রমজান বৈঠা তুলল। ঐ অন্ধকারেই একটা সোঁতা খালে গিয়ে ঢুকল।

এক পশলা বৃষ্টি ঝরে আকাশটা একটু পরিষ্কার হল।

কেন জানি একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল রমজানের।

একটা মালা দিয়ে নায়ের জল ফেলতে ফেলতে ডাকু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি বিবি ?'

কি যেন জবাব এল কিন্তু বোঝা গেল না। মুখের কথা কাপড়ে জড়িয়ে গেল।

ডাকু বিবির মুখের বাঁধন খুলে দিল। ভয় কি ? যাবে কোথায় এই আঁধারে জল-ঝড়-কাদায় ?

'এক গেলাস পানি খামু।'

এত জল ঝরল তবু তৃষ্ণা! মমতা হল ডাকুর। কেন একে বেঁধে রেখেছে এতক্ষণ ?

'গেলাস তো নাই।' একটু লজ্জা বোধ করল ডাকু।

'আচি ভইরাই দেন।'

ডাকু এক মালা জল দিল নদী থেকে তুলে। 'খাও।'

জল খাওয়া শেষ হলে রমজান ফের জিজ্ঞাসা করল, 'বিবি তোমার নাম ?'

'আ-মি-না।' তিনটি অক্ষর একটু ভাগ করে টেনে টেনে বলল বিবি।

'তুমি না ? কও কি তুমি না ?'

একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাল ডাকু।

'আমি বিবি না—বান্দী, আমার নাম আমিনা। আপনারে ঠকাইছে মিঞা।'

'সত্য না কি ?'

'দেখেন এখন নোটগুলা জাল কি না—ছাহেব বড়ো ধড়িবাজ।'

আরও গোটা তিনেক কাঠি জ্বেলে ভালো করে আমিনার মুখখানা দেখে রমজান বলল, 'না তা পারে নাই।'

প্রগলভা আমিনার চোখের পাতা সন্নত হয়ে এল। এ তো ডাকুর ভাষা, ডাকুর দৃষ্টি নয়। আমিনা জাত-বাঁদী। প্রেমের বেসাতি করার ওদের বড়ো একটা সুযোগ হয় না। কিন্তু বেসাতি করে ঠকতে জিততে এমন কি মরতেও দেখেছে অনেককে।

আবার দমকা পুবো-হাওয়া এল। এল জলের ঝাপটা যেমন আসা উচিত। রমজান উঠে নাও সামলাতে গেল। আমিনা বসে রইল খানিকটা শুকনো জায়গা

খালি করে দিয়ে। রমজান তো আর বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবে না। ছই-য়ের ভিতর এসে বসবে কোথায় ?
'কিছু খাবা না ?'
এ কি আপ্যায়ন! গলায় তো ছুরি দিল না।
'আছে কি ?'
'পানি-পান্তা।'
'সেই সকালের ? ও আমাগো মুখে রোচে না।'
রমজান হাসে। 'তুমি সত্যই বান্দী। ক্যাবল বান্দী না বেহায়া। কোনোও নয়া বিবির এমন মুরদ হইত না রমজান সর্দারের সাথে মসকরা করতে। তুমি তাজ্জব কইরা দিলা। কি, কিছু খাবা না কি ?'
আমিনা চুপ করে থাকে।
রমজান একটা লম্ফ জ্বালায়। বাতাসের ভয়ে আড়াল করে রাখে একখানা পাটাতনের তক্তা দিয়ে। গলুই খোপ থেকে একটা মেটে বাসনে ভাত তোলে সযত্নে। 'কি, খাবা না কি চারডি—আমার কিন্তু প্যাট জ্বইলা যায়।'
ভাতের পরিমাণের দিকে একবার 'তাকিয়ে আমিনা বলে, 'আমি খাইছি সাঁঝের ওক্তে।'
'ভালো…আমার দোষ নাই কিন্তু… ।'
'না,—না—এখন তাড়াতাড়ি খাইয়া লম্ফটা নিভান গুণমন্ত।'
কথাটা ঠিক। রমজান গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত।
আর আমিনাও এতক্ষণ বাদে উজ্জ্বল আলোকের সুযোগ পেয়ে কি যেন গিলতে থাকে দু-চোখ ভরে।
রমজান যত সত্বর সম্ভব খেয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিল এক ফুঁতে। আমিনা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বসল। কী লোভনীয় স্বপ্ন দেখছিল তা সে-ই জানে। রামদা ও ল্যাজার সুতীক্ষ্ণ ফলার কাছে বসে, এক আসন্ন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা চলে ?
তবু আমিনা ভাবছিল: ডাকুর সঙ্গে কি ভাব হয় না ? কেমন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ। আবার কত নরম মন। যেন কেয়া কাঁটার ভিতর বাদলা ভিজা সুগন্ধ।
'বিবিজান খাইলা না তো ঘেন্না কইরা, এখন শুইবা না ?'
'ঘুম আইলে তো।'
'আইবে ক্যামনে ? খালি প্যাটে কি নিদ আসে ? তখন কইলাম খাইতে অরুচি

জন্মিল—এখন কেমন ঠেকে ? তোমার লগে আমিও পারুম না শিথানে মাথা দিতে।'

'যদি মিঞা আমি ঘুমের ভান কইরা চুপচাপ থাকি চক্ষু বুইজা ?'

'ভান করতে চাও, ভান--কার কাছে ? ল্যাজা দেখছ নি ?' সত্যই ল্যাজার ডগার একটা খোঁচা দেয় রমজান আমিনার গায়।

'উঃ! মা গো!' শিউরে উঠে আমিনা সরে বসে।

'বেল্লিকের মতো চিল্লাইও না, অত জোরে দাগা দেই নাই। দেখি একখান হাত দাও।' আমিনার একখানা হাত জোর করে টেনে এনে রমজান পীড়ন করতে লাগল। 'আমার নিদ্ আইছে, যদি পালাও তয় মতিচুর কইরা ছাড়ুম।'

নির্বাক্ আতঙ্ক ও বিস্ময়ে আমিনা চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদেই নাকের ডাক শোনা গেল রমজানের।

বন্দিনী আমিনার বড়ো ইচ্ছা হল পালাবার। সে ঝটিতি হাত ছাড়িয়ে নেবে। ভাবল লাফিয়ে পড়বে, তার পর দুরন্ত সাঁতার।

কিন্তু কোন্ কূলে গিয়ে উঠবে সে ? এক পাড়ে মদ্যপ সুলেমান—অন্য পাড়ে ক্রোধান্ধ রামদা হাতে এক ডাকুর সর্দার। নাম রমজান। রমজানের মধ্যে তবু সে ইতিমধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছে একফালি কোমল উজ্জ্বল চাঁদ, কিন্তু সুলেমানের ভিতর তো শুধু অন্ধকার—দোজকের কালি। আমিনা কিছু স্থির করতে পারে না।

তার আবার লিপ্সা হয় পলায়নের। এ যেন একটা অন্ধ সংস্কার।—সত্য নয়, অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কি করে পালাবে ?

ঘুমিয়েই তো পড়েছে রমজান। নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে একটানা। যদি ভান হয় ? আমিনা যে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছিল, এ যদি তাই হয় ? পরীক্ষা করে দেখতে চায় বন্দিনীকে ?

পরীক্ষা নয়, সত্যই মুক্তি—দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়েছে ডাকুর। আমিনা উঠবে—উঠে অন্তত খাল-পাড়ের জংলা ঝাড়ে আত্মগোপন করবে ?…কিন্তু সুলেমানের মূর্তি দেখা যায়। আমিনা তার শাড়িতে জড়িয়ে একেবারে পড়ে গেল রমজানের গায়ের ওপর।

ছিঃ! ছিঃ! সে করল কি ?

'ভাবছ কি বিবিজান—' ডাকু দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তার চঞ্চলা প্রগলভা শিকার। 'চালাকি করতে চাও আমার সাথে ?'

আমিনা দুরু-দুরু বুকে মিথ্যা কথা বলল গুটিকয়েক, 'আমি তো পালাই নাই মিঞা।'

'তবে চুপ কইরা থাকো।'

ভয়ে লজ্জায় চুপ করেই রইল আমিনা। অন্ধকারে, নির্জনে নীরবে সাজা খাটল একটু পূর্বের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। কিন্তু কেন জানি ভালোই লাগল—স্বাদ পেল অগাধ। আনন্দ পেল অপূর্ব।

একটা অসহ্য পুলকে ব্যথায় সারা রাত ঘুমোতে পারল না আমিনা। রমজানের চোখেও ঘুম এল না। কত দুশ্চিন্তার ভিতরও কি যেন অনাস্বাদিত সুখ পেয়েছিল সে।

দুজনে ধীরে ধীরে কথা হল অনেক। যে ভারসাম্য নির্দেশের কাঁটাটা দোদুল দুলছিল দুজনার মধ্যে তা একটা কেন্দ্রে এসে স্থির হয়েছে। একজন অপরকে সাহস করছে ভরসা করতে। আমিনা যতটুকু পরিচয় পেয়েছে রমজানের, তাতে বুঝেছে যে, রমজান নিতান্তই ডাকু নয় এবং রমজানও বুঝেছে যে, আমিনাও একান্তই বাঁদী নয়। ওরা উভয়ে ঘোলা জলে পড়েছে কি যেন চক্রান্তে।

'বাড়ি যাইবেন না?'

'যামু তো—কিন্তু একটু সবুর করো।'

'ফয়জরের তারা যে দেখা যায় আসমানে।'

'কইলা কি—ভোর হইছে!' রমজান উঠে বসে। আবছা আলোতে একটা আতঙ্ক-বিহ্বল ছায়া দেখা যায় তার মুখে। যে দিনের আলোর জন্য জগৎ উন্মুখ, সেই আলোর ভয়ে যেন রমজান অস্থির।

'অমন করেন ক্যান মিঞা? কি হইছে?'

'কিছু না। দেখলাম যে বিহানের আর কত বাকি। এখনও দেরি আছে ঘড়ি খানেক।'

'বাড়ি যাইবেন কখন?'

'যামু তো—কিন্তু এখন আর সময় নাই যে।'

'তয় থাকবেন কই?'

'এই খালেরই চৌদ্দ বাঁক উপরে এক জঙ্গলে। চলো, দেইখো কোনোও কষ্ট হইবে না।'

'না হইলেই ভালো। কিন্তু—'

'তা যদি গোছল করতে হয়, এইখানেই সাইরা লও।'

'আপনে একটু আবডালে যান।'
রমজান কূলে উঠে অদৃশ্য হয়ে রইল।
স্নান সেরে আমিনা নায়ে গিয়ে একখানা শাড়ি পরল বেশ দামী। এবার আর তফাত রইল না বিবির সঙ্গে। রূপ তো ছিল তার অসামান্যই।
'ভাগ্যে আমি শাড়ি আনছিলাম ক-খানা, না হইলে পরতা কি?'
'দিতেনই যা হউক যোগাড় কইরা। মাইয়া লোকের সরম আব্রুর ভার তো পুরুষ মানুষের উপর।'
'আমি কি তোমার পুরুষ মানুষ?'
'জানি না।' একটা ঝামটা মারে আমিনা।
'কিছু জানো না, কিন্তু রইলা তো বুকে শুইয়া।'
'এখন দেইখা শুইনা পথ চলেন—যেন উছাট খান না মধ্যে পথে। বেইল হইল যে।'
নাও ঠেলতে ঠেলতে রমজান সোঁতা খালের আগার দিকে এগিয়ে চলে। 'উছাট খাওয়া আমার তোমার হাতে না আমিনা।'
'তয় কার হাতে মিঞা? -যত মুশ্‌কিল তত আসান। খোদার বিচার এক-তরফা না।'
একটা ব্যঙ্গ হাসি হাসে রমজান।
আমিনা দুঃখিত হয়।
কিন্তু চলন্ত নৌকা ঠিকই চলে এগিয়ে। প্রগতি অব্যাহত চিরদিন।
রমজান বার বার শাড়িপরা আমিনার দিকে তাকায়। কি যে রমজান ভাবে, কি যে সে দেখে তা যেন বুঝেও বোঝে না আমিনা। কিন্তু গৌরব অনুভব করে মনে মনে। এতদিন জমিদার-বাড়ির সংস্পর্শে থেকে সে যে আনন্দ না পেয়েছে, তার সহস্র গুণ আনন্দ উপভোগ করে এই ছোট্ট নায়ের ভিতর বসে। স্মরণ হয় মার কথা। দিন আসুক, সুযোগ আসুক, সে সমস্তই দেখাবে মাকে। কিন্তু সেদিন কি আসবে তার নসিবে? বুড়ো মা, ক্ষমতাপন্ন জামাইএর ঘরে চারটি সুখের অন্ন খেয়ে ধীরে-সুস্থে বয়স পেয়ে কি চোখ বুঁজবে? এত আশঙ্কার মধ্যে এ যে আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে ধরার কল্পনা।
কি ভাবছে আমিনা? এ কি স্বপ্ন দেখছে সে দিনের বেলা জেগে জেগে?
'মুখখানা কালা কইরা বইসা রইছ ক্যান? ক্ষিধা পাইছে বুঝি খুব?'
'না।'

'ভাঁড়াও ক্যান ?'

'না গো না।'

'তয় বুঝি মনে পড়ছে মায়ের কথা ?'

এবার সজল হয়ে ওঠে আমিনার চোখের পাতা।

'বোঝলাম বোঝলাম, আমরা তোমাগো কেও না। তা মিথ্যা কি সাচ্চাই তো মা। দশ মাস দশ দিন···তা তো সত্যই।' রমজানের প্রচ্ছন্ন হিংসাটা একেবারে এমন ভাবে প্রকাশ পায়—যেন পলাতক বালকের হাত থেকে একটা কৌটার ঢাকনি খুলে পড়ে গেল খানিকটা মিষ্টি সামগ্রী।

আমিনা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে থাকে।

একটা অতি নির্জন স্থানে গাছপালার নিচে এসে নৌকা থামে। সোঁতা খাল এখানে একেবারেই সরু হয়ে গেছে। এপার-ওপার ডিঙিয়ে পারাপার হওয়া যায় অনায়াসে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে মানুষ কখনও এখানে আসতেই পারে না।

কূলে উঠে কয়েকটা পাকা পেঁপে ও জামরুল নিয়ে এল রমজান। ওগুলো রেখে সে আবার গেল কূলে। এবার নিয়ে এল ঝুনো নারকেল দুটো পেড়ে। যত তাড়াতাড়ি আসা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে ফিরে এল।

'আপনে মিঞা কি বান্দর ? গাছে ওঠলেনই বা কখন আর পাইড়া আনলেনই বা কখন ?'

'সে কথা শুইনো পরে—আগে খাইয়া লও।'

দুজনে একত্র হয়ে ফলগুলো পেট ভরে খায়। আমিনা একেবারে তৃপ্ত হয়ে গেছে।

'বিবিজান আমার মুখের দিকে একটু চাও।'

এমন করে অনুরোধ করলে আমিনার মতো প্রগলভারও চোখের পাতা বুজে আসে, গলার স্বর যায় বন্ধ হয়ে। সে তাকাতেও পারে না, কিংবা কিছু বলতেও পারে না।

'কই বিবিজান চাইয়া দেখবা না ? সত্যই কি আমি বান্দরের লাখান দেখতে ? মুখটা কি আমার তোমার মতোই লবণ-পোড়া ?' গভীর আবেগে রমজান একটা চুমো খায়।

আমিনা সব্রীড়া কটাক্ষে তাকায়। কোনোও জবাব দেয় না। কিন্তু এক সময় ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ছলে বলে, 'লবণ-পোড়া ছালুন না চাখলেই হয়।'

যেন শুনেও শোনেনি রমজান, 'কি কইলা কি?' আবার সে সাগ্রহে চেখে দেখে নুন-কটা ব্যঞ্জন।
'সাধে কয় ডাকাইত? পুলিস ডাকমু?'
আবার জড়িয়ে ধরে রমজান। 'ডাকো না?
আমিনা তার গায়ে এলিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন যাইবেন মিঞা বাড়ি?'
'যামু তো, কিন্তু...'
আমিনা যে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তবু তার ঔৎসুক্য হয় অত্যন্ত। কেমন ঘর, কেমন দুয়ার কেমনই বা মিঞার পাড়া-পড়শী? প্রিয়জনের নিকট-পরিচয় আমিনা পেয়েছে, এখন সে জানতে চায় তার পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলের মধ্যে সে শিকড় মেলে দেবে—টবের গাছের আশা হয়েছে অভিনব।
বন্যার হাওয়া একটু থমকে ছিল, আবার তা পুব কোণ ঠেলে বইতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কালো জলো-মেঘ। দিনের আলো পড়ল ঢাকা; দুজনে সারা দিনটা কাটিয়ে দিল নায়ের ভিতর।
রাত্রির আঁধারে জল-বৃষ্টি মাথায় করে নৌকা খুলল রমজান।
'কই যান?'
'বাড়ি।'
তাড়াতাড়ি গলুই-র দিকে ছুটে আসতে চায় আমিনা।
'তুমি জলে ভিইজো না।'
'এ তো ইলশাগুড়ি।'
'তয় বইস। মানা করলে তো শোনবা না।'
প্রায় আধ প্রহর বাদে নৌকা এসে রমজানের গাঁয়ের কাছে থামে।
'কথা কইও না আমিনা, পুলিস থাকতে পারে ওত পাইতা? তোমার পরনের শাড়িখানা বদলাও। যদি ধরা পড়ো, তোমার সাহেব সনাক্ত করে।'
'ভালো কইছেন, আমিনা তার বান্দী! বিবির শাড়িও তো অদল-বদল হইতে পারে! ভয় আপনার, আপনে হুঁশিয়ার হইয়া চলেন।'
এত বুদ্ধি আমিনার! রমজান বিস্মিত হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে এই অন্ধকারেও মুখখানা একবার তুলে ধরে দেখতে।
হাওয়া আসে, মেঘ সরে যায়—মাঝে মাঝে তারা দেখা যায় আকাশে।
জল থৈ-থৈ করছে চারদিকে। খাল, মাঠ, গ্রাম একাকার। শুধু ব্যাঙ আর

পোকা-মাকড়ের ডাক, মধ্যে মধ্যে গাছপালাকে আশ্রয় করে জলছে জোনাকি।

আমিনা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'এ সব কু-কাম করেন ক্যান মিঞা ?'

অতি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু জবাব দেয় না রমজান।

বাড়ির কাছে এসে রমজান কান খাড়া করে কি যেন শোনে। তার পর খানিকটা এগিয়ে যায়।

'যদি আমারে ধরতে আসে কেও, আমি কিন্তু পানিতে ডুব দিমু—যদি না উঠি ভাইবো না, তোমার ভয় কি, তুমি তো হইবা সাক্ষী।'

ধক করে উঠল আমিনার বুকটা। এত আগ্রহ করে বাড়ি এসে লাভ হল কি ? কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই।

'এই তো আমার বাড়ি।'

'ঘর কই ?'

'পোড়াইয়া দেছে। ঐ দেখো না আধপোড়া ভিজাচাল ভাইঙা-চুইরা পইড়া রইছে।'

'এমন ডাকাইত কেডা—ও মিঞা এমন ডাকু কে ?'

'তোমার মনিব সুলেমান সাহেব, আমারও মনিব আমিনা। বড়ো জমিদার, সে কিন্তু এই গরিবেরে চেনে না।'

রমজান অতি সংক্ষেপে এখানে একটি গল্প বলে। গল্প নয়, সত্য ইতিহাস।

সুলেমান সাহেবের জমিদারী অনেকগুলো ডিহিতে বিভক্ত। তারই একটা ডিহির মধ্যে রমজানদের বাস। খাজনা ঠিক সময় আদায় না দিতে পারায় কারুরই নেই একখানি ফসলের জমি। দৈব-দুর্বিপাক কিংবা অজন্মার দরুন খাজনা না দিতে পারা যদি অপরাধ হয়, তবে সে অপরাধের জন্য দায়ী যারা তারা ওদের পিতা-পিতামহ। কিন্তু ষোল আনী ভোগটা ভুগছে রমজানেরা। ভূমিহীন কৃষাণ, পেশার অভাবে হয়েছে ডাকু। চুরি-চামারী করে আর পেট ভরে না।

আমিনা চুপ করে শুনল—বুঝল সব ঠাণ্ডা মস্তকে। সে তার নসিব-ভরা দেখতে পেল অথৈ পানি। তার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করল না ওখানে।

'মিঞা নাও খোলেন।'

'কোথায় যাবা ?'

'যেদিকে দুই চক্ষু যায়—কিন্তু এখানে আর না। কলিজা আমার জইলা যায়।'

'পুলিস, পুলিস যে আছে ওতে-ওতে।'

'তাতে হইছে কি? নাকের উপর এক হাত পানিও যা চৌদ্দ হাতও তাই। আপনারে লইয়া ভাঁটি দিমু ঠাকুরঝিতলার একেবারে শ্যাষ সীমায়—সমুদ্দুরের চরে।'

'কি আশায়?'

অতি সাধারণ বাঁদী এক রহস্যময়ী নারীর মতো হাসে।

'কি আশায় আমিনা?'

এবারও রমজান অন্ধকারে শুধু হাসি শুনতে পায়। 'তুমি যে ক্যাবল হাসো?'

'হাসি আপনার রকম-সকম দেইখা। পুরুষমানুষ হাতে টাকা আছে, গায় হিম্মৎ আছে—নয়া চর বন্দেজ লইয়া ঘর বাঁধবেন, ধান রুইবেন, ভাবনা কি?'

খুশি হয়ে রমজান জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি করবা?'

'আমি ক্যাবল কান্দুম।'

'ক্যান আমিনা, এ কথা কও ক্যান?'

'আমি তো বেহালা, আপনে তো ছড়ি, হামেশা ঘা দিলে আর কি করুম!'

'তোমাগো কি হামেশা আমরা জ্বালাই? সারা দিনের হাড়ভাঙা মেহনতের পর একটু বাজাই—তা সইবা না ক্যান?'

'মিঞা এটুক বোঝলেন না—ক্যাবল দুঃখেই কি মানুষ কান্দে? অতি সুখেও আসে চৌক্ষে পানি।'

নৌকা সোঁতা খাল বেয়ে গাঙের মুখে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। বাড়িতে দাঁড়াবার স্থান নেই, নায়ে থাকারও উপায় নেই—এখন ওরা আশ্রয় নেবে কোথায়? যদি দিনটা গতকল্যের মতোও মেঘলা থাকত! বন্যাটাও হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সূর্য উঠছে তার সবগুলো আলোর পেখম মেলে। নদী ঠাণ্ডা, কিন্তু ওদিকে যে এগুতে সাহস হচ্ছে না। নিকটেই গঞ্জ—পুলিস এসে নিশ্চয়ই হানা দিয়েছে আজ।

সারা দিনটা ওরা আত্মগোপন করে রইল সেই পূর্বের সোঁতা খালের মাথায়। ফল-মূল খেও যেমন সংগ্রহ করা যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমিনা এক অদ্ভুত সজ্জায় সাজল। আলুলায়িত কুন্তল বাঁধল উঁচু খোঁপা করে। একখানা কম দামী ছাপার শাড়ি পরল নতুন ঢঙে ফেরতা দিয়ে। গায়ের জামা খুলে ফেলে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে নিল বুকে বেশ আঁটো-সাঁটো করে। দু-একখানা ছোট হাতিয়ার ছাড়া বড়োগুলো ফেলে দিল জলে।

রমজানকে বলে নায়ের ছই কেটে করল অর্ধেক। এক গোছা রজনীগন্ধা যোগাড় করে খোঁপায় গুঁজে দিল একটু হেলিয়ে।

রমজান বলল, 'বাঃ চেনাই তো যায় না তোমারে। তারপর—'

'আপনার ডর কি, আপনে তো সাথেই রইছেন। চুপ কইরা শুইয়া থাকেন পাটাতনের তলে।'

নৌকা যখন ছোট খাল ছাড়িয়ে বড়ো গাঙে এসে পড়ল, তখন এক হাতে কৃত্রিম লতা-বঁড়শির সুতো ছাড়ার ভান করতে লাগল আমিনা, অন্য হাতে তার বৈঠা। সুমুখে গঞ্জ…বড়ো বড়ো কোষ নৌকা দেখে বোঝা গেল জেলার চুনো-পুঁটি অফিসাররাই কেবল আসেনি, বড়ো বড়ো ঢাউসগুলোও জড়ো হয়েছে।

একটি সামান্য বাঁদীর জন্য কত মাথা ব্যথা এবং কর্তব্য-জ্ঞান সুলেমান সাহেবের! কিন্তু কী আশ্চর্য, সে বাঁদী এ সমস্ত গুণের মর্যাদা বুঝল না। চলল ফাঁকি দিয়ে একখানা গেঁয়ো গানের গমক তুলে। ঠাকুরঝির জল-স্থল উতরোল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কাঁপছে যেন ঐ সুরে :—

খসম খসম আমার আইলা না
কদু (লাউ) গাছে ধরছে যে কদু
ছালুন চাইখা গেলা না…
(খসম খসম আমার আইলা না)

একখানা চৌকিদারের নাও থেকে প্রশ্ন হয়, কে যায় ?

আমিনা নাও থেকে জবাব দেয় জেলেনীদের ঢঙে, 'এক নাইয়া জাইলার ঝি— নাম আসমানী।' টর্চ জ্বলে দু-তিনটা—সত্যই তো, খোঁপায় ফুল, হাতে বঁড়শি, নাও-এ বেদের মেয়েই বটে!

দু-দিন বাদে সমুদ্দুরের চরে যাদের দেখা যায় তারা রমজান ও আমিনা নয়— মহব্বৎ ও মেহেদী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮—১৯৫৬) ॥ শৈলজ শিলা
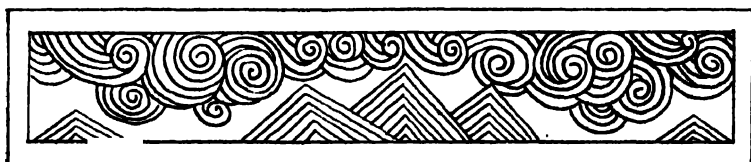
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিধবা মাসীর খোসামোদ করা। মাসী মরিল। সুতরাং জীবনটা উদ্দেশ্যহীন হইয়া গেল।

উদ্দেশ্যহীন জীবনটা নিয়া কি যে করিব ভাবিয়া পাই না।

বন্ধুবান্ধবের কুপরামর্শে একদা সুপ্রভাতে মেয়ে দেখিতে গিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলাম। মেয়ে অবশ্য সুন্দরী, ফিরিঙ্গী স্কুলের প্রবেশিকা ক্লাসেও পড়ে, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তো?—হবু বরের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া আতঙ্কে মুখ কালো করিবার কি তার অধিকার? সারাদিন রাগে গজগজ করিলাম এবং পাশের বাড়ির কালো মেয়েটাকেই বিবাহ করিব স্থির করিয়া বিকালে ছাদে উঠিলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র মুচকি হাসিয়া মেয়েটা তৎক্ষণাৎ নিচে চলিয়া গেল।

কবে যেন মাদুর পাতিয়া ছাদে শুইয়াছিলাম, কয়েক দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাদুরটা ছাদের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে। মস্ত একটা হাই তুলিয়া ইহার উপরেই চিত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অপরাহ্ণের ঐ চকচকে আকাশটা যে আয়না নয় এজন্য কত জন্ম ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম কে জানে।

আকাশে উঠিয়া পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সাঁতার দিতে থাকিলে কোথাও গিয়া পৌছানো যায় কিনা এমনি একটা অবাস্তব চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম;—স্বপ্ন দেখিলাম পাহাড়ের। তরুহীন শষ্পহীন ধূসরবর্ণ রাক্ষসের মতো গাদাগাদি করিয়া রাখা পাহাড়গুলির চাপে স্বপ্নেই আমার উপত্যকার প্রেম গুঁড়া হইয়া গেল। তিনদিন বাদে পিঠে বোঁচকা বাঁধিয়া চলিয়া গেলাম দার্জিলিং এবং একদা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখিয়া সূর্যের উদ্দেশেই কয়েক দিনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ইহাতে আমার যে কি শাস্তি হইল শুনিলে আপনাদের চোখে জল আসিবে। এক ঘণ্টার ভিতরে সূর্যদেব কোন্ দিকে উঠেন তাহা তো ভুলিয়া গেলামই, পাক খাইতে খাইতে আমি নিজে কোন্ দিকে চলিলাম তাহার পর্যন্ত কিছু স্থিরতা রহিল না। নিজেকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া একটা খাড়াইএর উপর তুলিয়া কোন্ দিকে নামিলে যে হাত-পা ভাঙিয়াও প্রাণটা বজায় রাখা যাইবে, ঠিক করিতে পারি না, যেদিক দিয়া উঠিয়াছি, সেদিকে নামার কথা ভাবিলেও হৃদকম্প হয়। হাত আর হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, মাস্‌লগুলি ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিল, এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যেন পৃথিবীর ঘূর্ণিত গতি প্রত্যক্ষ করিতেছি!

অবশেষে একবার যখন হাত ফসকাইয়া কুড়ি ফিট আন্দাজ গড়াইয়া একটা গাছের গুঁড়িতে আটকাইয়া গেলাম, তখন আর উঠিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া মনে মনে বলিলাম, থাক যথেষ্ট হইয়াছে। সেইখানে শুইয়া শুইয়া পকেট হইতে বিস্কুটের গুঁড়া বাহির করিয়া মুখে পুরিতে লাগিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভাবিলাম, একেবারে শুকনা শিলার গায়ে এই গাছটা গজানো না জানি কোন্ নিষ্ঠুর দেবতার কীর্তি। ঐ তো তলা দেখা যাইতেছে, গড়াইয়া পড়িলেই হইত! জীবনের উদ্দেশ্যটা তাহা হইলে কিছু কিছু বোঝা যাইত নিশ্চয়।

ঘণ্টাখানেক ঝিমাইবার পর উঠিবার চেষ্টা করিলাম। কোনো মতে গাছটা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপরের দিকে চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিলাম নিজের ইচ্ছায় যেটুকু নামি নাই শত ইচ্ছা করিলেও সেটুকু আর উঠিতে পারিব না। নানাবিধ কসরতের সাহায্যে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই নিচে নামিয়া পড়িলাম।

সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই দেখি, চমৎকার! ত্রিশগজ তফাতে পাহাড়ী উনানে একটা ভাতের হাঁড়ি চাপানো রহিয়াছে এবং নিকটে যে রাঁধুনী বসিয়া আছেন তিনি নিঃসন্দেহে বাঙালী ভদ্রলোক।

মাতালের মতো হেলিয়া দুলিয়া নিকটে গেলাম। প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি এখানে?'

ভদ্রলোকের মুখ আমসির মতো শুকাইয়া গেল! বলিলেন, 'আজ্ঞে, আপনাকে তো চিনলাম না?'

হাসিয়া বলিলাম, 'এখানেই জীবন কাটিয়েছেন নাকি? মানুষ দেখেননি

কখনো? আমি আপনার মতোই মানুষ। এত জায়গা থাকতে এখানে এসে ভাত রাঁধছেন কেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পাবার জন্য বুঝি এখানে শুভাগমন করেছেন?'

ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আমার বড়ো বিপদ মশাই।'

'সে আমারো' বলিয়া বসিলাম। নিকটবর্তী গুহাটায় চোখ পড়িল উনানের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া।

'বাঃ বাঃ এ যে দেখছি গুহা! আপনি ওখানে তপস্যা করেন নাকি? পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ করেছেন?'

'আজ্ঞে না। বিপদ তো ঐখানে।'

শুনিয়া ভদ্রলোকের আপত্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গুহায় উঁকি দিলাম। একটি যুবতী মেয়ে মাদুরে শুইয়া বেদনায় কাতরাইতেছে।

ভড়কাইয়া লোকটির কাছে ফিরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলাম, 'এ যে বিষম কাণ্ড মশাই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর ছেলে হচ্ছে।'

'হচ্ছে নাকি?' বলিয়া আমি প্রকাণ্ড একটা হাঁ করিয়া ফেলিলাম এবং বহুক্ষণ অবধি সে হাঁ বন্ধ করিতে খেয়াল হইল না।

যত দুর্গম পথ দিয়াই আমি আসিয়া থাকি, এখানে আসিবার একটা সুগম পথও আছে দেখা গেল। এই পথ দিয়া প্রত্যহ দু-বেলা পাঁচ ছয় মাইল চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবার ভারটা আমার উপরেই পড়িল। ভদ্রলোকটি দেখিলাম বেজায় কুঁড়ে। দু-বেলা রান্না করেন, খান আর গুহামুখে মস্ত একটা পাথরে ঠেস দিয়া বসিয়া চুপচাপ আকাশ-পাতাল ভাবেন। একেবারেই অকর্মণ্য।

গুহা আলো করা একটি মেয়ে হইয়াছে। ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদে চুক চুক করিয়া দুধ খায় আর চোখ বুজিয়া ঘুমায়। আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি।

বলি, 'লোকজন ডেকে এবার লোকালয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যাক, কি বলেন মশাই?'

লোক ডাকার কথা শুনিলে লোকটা কেমন কাঁদো কাঁদো হইয়া যায়, শহরে ইহাদের বিপদের কথা প্রচার করিব বলিলে একেবারে কাঁদিয়া ফেলে।

স্ত্রী তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দশ ঘণ্টা কাঁদিয়াই কাটায়। ভিতরে কিছু গোলমাল আছে বুঝতে পারি, মেয়েটার চুলপাড় শাড়ি আর সিঁদুরহীন সিঁথি দেখিয়া সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়! স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'আঁতুড়ে কি সিঁদুর পরতে আছে?' স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

বড়োই জটিল ব্যাপার। নকল দুঃস্বপ্নের মতো।

দিন দশেক বাদে কিন্তু সব সরল হইয়া গেল। খাদ্য ও দুগ্ধের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, ফিরিয়া দেখি কচি মেয়েটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছে, মা-বাপ কাহারো চিহ্ন পর্যন্ত নাই! মেয়েটার কাছে একটা চিঠি পড়িয়াছিল। যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি ভীষণ। আমার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া নাম-ধাম না দিয়া লোকটি রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে। যুবতীটি নাকি লোকটির স্ত্রী নয়, বালবিধবা কন্যারত্ন।

পাপটাকে যাহাতে গুহাতেই মরিতে দিয়া পলাইয়া গিয়া জগতের কল্যাণ করি শেষের দিকে এরূপ একটা অনুরোধও জানানো হইয়াছে।

খুকিকে কোনো প্রকারে একটু দুধ খাওয়াইয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। অনুপস্থিত বিধবাটি এবং তাহার বাপের উদ্দেশে আমার গালাগালি শুনিয়া গুহার পাথরগুলিও বোধহয় সেদিন লজ্জা পাইয়াছিল।

পনেরো বছর পরে ভূমিকম্প!

বাৎসল্যের সিমেণ্ট দিয়া যৌবনের শক্ত গারদ করিয়াছিলাম, তাহা ফাটিয়া একেবারে চৌচির!

মেয়েটা গুহা আলো করিয়া জন্মিয়াছিল, এখন আমার বাড়িটা এমন আলো করিয়াছে যে, এই প্রৌঢ় বয়সে মাঝে মাঝে চোখে অন্ধকার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

এক রাশি কালো চুল পিঠে জড়াইয়া ফর্সা একখানি কাপড় পরিয়া চঞ্চলপদে সারাদিন চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার পর আলোর সামনে পড়িতে বসিয়া ছটফট করে, আমি চাহিয়া দেখি আর তারিফ করি। মেয়েটা যে এত সুন্দর এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াই, ওর ঐ টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব-গঠন তনু আমাকে সেইখানে আটকাইয়া রাখে।

রাতদুপুরে তার ঘরের দরজায় টোকা দিয়া অদ্ভুত গলায় ডাকি, 'শিলা!'

সে অবশ্য ঘুমাইয়া থাকে, সাড়া দেয় না, আমার মুখের ডাকে আমারই ভবিষ্যৎ ভূতটা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, অকস্মাৎ এমন আতঙ্ক হয় যে বলিবার নয়। নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় শুইয়া পড়ি। অন্ধকারে হাতড়াইয়া চুরুট দেশলাই খুঁজিয়া নিয়া তাড়াতাড়ি চুরুট ধরাইয়া টানিতে গিয়া কাশিতে আরম্ভ করিয়া দিই। কাশিতে কাশিতে হাসি পায়, আমার হাসির শব্দে অন্ধকার যেন নড়িয়া ওঠে, বাড়িটা যেন বিরক্তিতে একবার একটু কাঁপে, আমার গা যেন ছমছম করে। গলা চাপিয়া হাসি থামাইতে গিয়া গোঁ গোঁ শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া নিয়া আমি উঠিয়া বসি।

খোলা জানালায় শব্দ হয়, 'দাদু!'

'কিরে শিলা?'

'আমার ভয় করছে দাদু। কে যেন হা হা করে হাসছিল।'

শুনিয়া শিহরিয়া উঠি। চৌকির প্রান্তটা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলি, 'ভয় আবার কিসের? ঘুমোগে যা।'

'আমি তোমার ঘরে শোব দাদু, দরজা খোলো।'

মেয়েটা বলে কি! এই নিস্তব্ধ রাত্রি, অনুভূতিতে ঘা-মারা এই গাঢ় অন্ধকার, অর্ধোন্মাদ এই নিদ্রাহীন তৃষিত প্রৌঢ়, এঘরে শুইতে চায় ও কোন্ হিসাবে? রাতদুপুরে জ্বালাতন করিতে নিষেধ করিয়া এমন জোরে ধমক দিয়া উঠি যে নিজেরই চমক লাগে!

মিনিটখানেক ঘড়িটার টিকটিক শব্দ ছাড়া সব স্তব্ধ হইয়া থাকে, তারপর শুনিতে পাই অবাধ্য মেয়েটা জানালা ছাড়িয়া এক পাও নড়ে নাই, অধিকন্তু ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলি, ভূত আর আমার ভয়ে শিলা ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না, দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া জানালার নিচে বসিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া আমার হৃদয় হিম হইয়া যায় এবং আমি স্পষ্ট অনুভব করি সেখানে অতনুর মূর্ছা হইয়াছে।

ওঘর হইতে বিছানা টানিয়া আনিয়া নিজেই শয্যা রচনা করিয়া দিই। চোখ মুছাইয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া দিতেই শিলা নীরবে গিয়া শুইয়া পড়ে।

আমি ক্ষণকাল বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকি। খানিক দূরে তেতালা বাড়িটার মাথা ডিঙাইয়া গিয়া বড়ো বড়ো কয়েকটা তারার সংবাদ নিয়া ফিরিয়া আসার

পূর্বেই জলীয় কুয়াশায় আমার দু-চোখ আত্মহারা হইয়া যায়। ভিজা স্যাঁতসেঁতে তাহার আর্তি।

পাড়া প্রতিবেশীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, 'এবার নাতনীর বিয়ে দাও। অমন টুকটুকে নাতনী তোমার।'

নাতনী টুকটুকে বলিয়া নয়, আমার টুকটুকে নাতনী বলিয়া ইহাদের বিস্ময় যেন বেশি! শুনিলে রাগে গা জ্বলিয়া যায়। আমার তিলোত্তমা বৌ থাকা যেন অসম্ভব! আমার সুন্দরী মেয়ে যেন ছিল না! টুকটুকে নাতনী যেন আমার থাকিতে নাই!

বলি, 'আমার নাতনীর বিয়ের ভাবনা আমিই ভেবে উঠতে পারব মিত্তির মশায়।'

সান্যাল বলে, 'তা অত ভাবাভাবির দরকার কি? তুমি নিজেই বিয়ে করে ফেলো না হে! পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এমন শক্ত সমর্থ দাদু—নাতনী তোমার বর্তে যাবে।'

খুশি হইয়া সান্যালের পিঠ চাপড়াইয়া বলি, 'তা মন্দ বলোনি সান্যাল! আমিও মাঝে মাঝে ঐ কথাই ভাবি। একটা বেরসিক ছোঁড়ার হাতে ওকে দিতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।'

ইহাদের ভিতর চাটুজ্যে লোকটা অতি বদ। বলে, 'না না এ ঠাট্টার কথা নয়। মেয়েটি ডাগর হয়েছে, এবার বিয়ে দেওয়া কর্তব্য। আমাদের এই ভূপেনের সঙ্গে সম্বন্ধ করো না?'

ভূপেন ছোঁড়া পাড়ার হৃদয় ডাক্তারের পুত্র এবং পাড়ার মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে সুপাত্র। অন্দরে ঢুকিতে দিই না, তবু নিত্য আমাদের এই আড্ডায় হাজির হয়। বোধহয় পান জল দিবার জন্য শিলা যে বাহিরে আসে সেই সময় তাহাকে দেখিবার লোভে। চাটুজ্যের কথায় ছোঁড়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়া ফেলি এবার হইতে পানজল দিবার বরাতটা চাকরের উপরেই থাকিবে।

মুখুজ্যে চাটুজ্যে অপেক্ষাও পাজী। স্মিতমুখে ভূপেনের দিকে চাহিয়া বলে, 'বড়ো ভালো ছেলে, বড়ো ভালো ছেলে। পাড়ার সবগুলি ছেলে এরকম হলে—'

ঠিক এমনি সময়ে পান নিয়া ঘরে ঢুকিয়া শিলা প্রশংসাগুলি সব শোনে। ইচ্ছা

হয় মেয়েটাকে অন্দরে ছুঁড়িয়া দিয়া লাঠি নিয়া সকলকে মোড় পর্যন্ত তাড়াইয়া নিয়া যাই আর ভূপেনের মাথায় বসাইয়া দিই সেই লাঠি। পুলিসের হাত এড়াইয়া শিলাকে নিয়া তার সেই আঁতুড়ের গুহাতে চিরকাল লুকাইয়া থাকি। সেই অপরিসর গুহায় ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া রাত কাটানোর সমর্থন পাইলে আমি কি না করিতে পারি ?

সকলকে বিদায় দিয়া ভিতরে গিয়াই শিলাকে বলি, 'বিয়ে করবি শিলা ?' সে মাথা নাড়িয়া বলে, 'না দাদু বিয়ে আমি করব না।'

'তবে কি করবি ?'

'তোমার কাছে থাকব।'

'তা থাকিস। কিন্তু চিরকাল নাতনী হয়েই থাকবি ? বৌ হয়ে থাক না।'

'দূর ছোটলোক।' বলিয়া সে হাসে।

তাহার মুখ হইতে যে দৃষ্টি সরাইতে পারি না, তাহা এমনি মুখর যে চক্ষু মার্জনার ছলে ঢাকিয়া দিতে হয়। আপসোস করিয়া মরি যে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া ওর দাদু হইয়া স্নেহ শিখাইয়াছি, স্বামী হইয়া প্রেম শিখাই নাই। আজ তাহা হইলে—

চিন্তাটা বড়ো জটিল। আমার স্নেহের পুত্তলী আমাকে এমনভাবে ঠকাইবে কে তাহা ভাবিতে পারিয়াছিল ?

ইচ্ছা হয় জন্মের কাহিনী শুনাইয়া মেয়েটাকে ভাঙিয়া দিই। উহার মুখের নিষ্পাপ সরলতা ঘুচিয়া গিয়া আমার পথ পরিষ্কার হোক।

'মার কথা শুনবি শিলা ?'

'বলো দাদু।'

আমি বলিতে আরম্ভ করি। গুহার আবছা আলোয় শিলার জন্মকথা। কিন্তু যতবারই বলি আসল বক্তব্যটা গোপন থাকিয়া যায়, শেষ করি একটা মিথ্যা বলিয়া। অযত্নে অচিকিৎসায় ঠাণ্ডায় না-দেখা মার শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী শুনিয়া শিলার চোখ দিয়া জল পড়ে।

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বদমাইশ তো কোনোদিন ছিলাম না, পারিব কেন। অন্যায় করিবার অক্ষমতায় আত্মপ্রসাদ জন্মে, যথালাভ মনে করিয়া তাহাতেই খুশি থাকিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু পারিলাম না। শিলাকে চুম্বন করিবার মতো অবস্থাটা কিছুকালের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়া গেল। কেমন করিয়া গেল তাহা এত বেশি সূক্ষ্ম যে ভাষায় মোটা

ইঙ্গিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার দুঃখে কলম ছুঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শিলার বয়স আর পনেরো নাই, ষোলো হইয়াছে।

কিছুকাল হইতেই দেখিতেছি সে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কী এক না-জানা ভয়ে চোখ দুটি চঞ্চল। মুখ যেন বর্ষণহীন শ্রাবণের আকাশ, ক্রমাগতই কালো কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। সকালবেলা আমি টাকা-পয়সার হিসাব নিয়া ব্যস্ত থাকি, মুখ তুলিতেই দেখি একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ মুখভঙ্গি করিয়া সে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আমাকে চাহিতে দেখিলে সরিয়া যায়।

আমার হিসাব যায় গুলাইয়া, ডাকি, 'শিলা শোন্।'

আমি ডাকিলেই শিলা দুড়দাড় ছুটিয়া আসিত, এখন এমন মন্থর গতিতে আসে যেন পদে পদে পা বাধিয়া যাইতেছে। খানিক তফাতে থাকিয়াই বলে, 'কি দাদু ?'

'কাছে আয়।'

শিলা কাছে আসে না, আসিতে থাকে। নাগালের মধ্যে আসিলেই খপ করিয়া তার হাতে ধরিয়া পাশে বসাইয়া দিই। বলি, 'তুই বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে, শিলা।'

শিলা জোর করিয়া একটু হাসে। বলি, 'আমাকে তুই ভালবাসিস, শিলা ?'

পরম আশ্বস্ত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'বাসি দাদু। ঘামাচি মেরে দেব বুঝি ?'

সুতরাং ঐখানেই থামিতে হয়, যদিও সে থামার অর্থ ই নেপথ্যে অগ্রসর হওয়া। বলি, 'ঘামাচি কই রে ? আমার আর ঘামাচি হয় না। দু-বেলা কত সাবান মাখি তা জানিস ?'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া শিলা বাঁচে এবং ইঁহার পর কয়েক দিন ধরিয়া সে আগের মতো হাসিখুশি হইয়া কাটায়। এই পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক পরিবর্তনটাকে তাহার নিকটেও স্পষ্টতর করিয়া তোলে। তাহার শঙ্কা-সংকোচহীন জীবন প্রবাহ আবার অবাধে বহিতেছে দেখিয়া আমিও এদিকে ঝিমাইয়া পড়ি। হাই তুলিয়া মোড়ামুড়ি দিয়া ও মেয়েটার নারীত্ব যে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, ইহা আমার ভালো লাগে না।

আবার আমার অজস্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের পীড়ন চলে। হাসিখুশি মিলাইয়া গিয়া তাহার কপোল হয় পাণ্ডুর, চোখ করে ছলছল।

এমনিভাবে দিন যায়, অবশেষে একদিন বর্ষা-ব্যাকুল দ্বিপ্রহরে আমার এই পুরু তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ ঠোঁট দিয়া শিলার হাসিখুশি চিরকালের জন্য মুছিয়া নিলাম। মনে করিয়াছিলাম ঘুমাইয়া আছে, কিন্তু দেখিলাম ধরা পড়িয়া গিয়াছি।

'কি দাদু?' বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কত কথাই বলিতে পারিতাম। দাদামশাই নাতনীর ঠোঁটে চুম্বন করিয়াছে, ইহার কত সঙ্গত ব্যাখ্যাই ছিল। চুম্বন যে লভ রাইট-এর সভ্য সংস্করণ এ কথা আজও যে জানে না দুই-চারিটা সস্নেহ বাণী বলিয়া কত সহজেই তাহাকে ভোলানো যাইত। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া আমি দিলাম ছুট!

ছুটিয়া রাস্তায় পড়িয়া হন হন করিয়া পুরা দুই মাইল হাঁটিয়া থামিলাম। পথের ধারে একটা নির্জন গাছতলায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম আর কত ঘণ্টা পরে বাড়ি ফেরা চলিবে।

হঠাৎ খেয়াল হইল একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক দুই হাতের ভিতরে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখে কি যেন খুঁজিতেছেন। ভালো করিয়া নজর করিতে চিনিলাম।

'আপনি যে! এখনো বেঁচে আছেন দেখছি। বলি, এবারও বিপদ নাকি? এ কিন্তু লোকালয় মশাই!'

'আজ্ঞে বিপদ নয়। সে বেঁচে আছে? বলুন, সে বেঁচে আছে?'

মাথা নাড়িয়া শূন্যে তুড়ি দিয়া বলিলাম, 'বাঁচে কি? আপনিই বলুন। মৃত্যুই যে পৃথিবীতে একমাত্র সত্য! আপনি আমি বেঁচে আছি এটাই আশ্চর্য। আহা, ওখানে বসবেন না মশাই!'

লোকটা মাথায় হাত দিয়া পথেই বসিতে যাইতেছিল, আমার অনুরোধে বসিল না। বলিল, 'মেয়েটা পনেরো বছর ধরে পাগল হয়ে আছে, আপনাকে সেই থেকে খুঁজছি। দুর্গা দুর্গা, সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল।'

বলিলাম, 'তাই হয়। ওজন্য দুঃখ করবেন না। ষোলো বছর পরিশ্রম করে প্রিয়ার মন খুঁজে পেলাম না, আপনার তো মানুষ খোঁজার তুচ্ছ পরিশ্রম।'

লোকটাকে ফাঁকি দিবার জন্য নানা রাস্তা ঘুরিয়া বাড়ি ফিরিলাম। দেখি, শিলা আমার জন্য ময়দা মাখিতেছে। মুখখানি তার যেমন বিষণ্ণ তেমনি শান্ত।

একগাল হাসিয়া বলিলাম, 'আমি ভাবলাম তুই রাগ করেছিস, শিলা।'
সে মুখ কালো করিয়া বলিল, 'খেতে দিচ্ছ, পরতে দিচ্ছ, রাগ আর কী করে করি দাদু।'
আপনারা শুনিলেন? খাইতে পরিতে দিই বলিয়া আমি যেন কত জোর খাটাই। জোর খাটাইতে পারিলে আমার ভাবনা কি ছিল বলুন তো?
উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আধঘণ্টা পরে ক্ষুধার তাগাদায় শিলাকে তাগাদা দিতে নিচে নামিয়া দেখি, সে তখনো লুচি ভাজিতেছে আর সলজ্জে অদূরে দাঁড়ানো ভূপেনের প্রশ্নের জবাব দিতেছে। আমি বাড়ি না থাকিলে আমাকে ডাকিতে আসিয়া ছোঁড়া সদর হইতে শিলার সঙ্গে দুই-চার মিনিট কথা কহিয়া যায় সম্প্রতি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে একেবারে অন্দরে চড়াও হওয়া!
আমাকে দেখিয়া দুজনেই খাসা লজ্জা পাইল। আমতা আমতা করিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, দাদু।'
'তা আমাকে ডাকলেই হত।' বলিয়া সটান বৈঠকখানায় চলিয়া গেলাম। এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতও কি ছোঁড়া বুঝিতে চায়! হাঁক দিয়া বাইরে ডাকিয়া আনিলাম, তবে শিলার সঙ্গে তার গল্প ফুরাইল। বেহায়া!
'কি কথা বলতে চাও শুনি? চটপট বলো।'
মুখ লাল করিয়া কোনোমতে কথাটা বলিতেই চটিয়া উঠিলাম—'বটে! তা বিয়ে করে ওকে খাওয়াবে কি শুনি? এম-এ ডিগ্রির ডিপ্লোমাখানা?'
ছোঁড়া যে ইতিমধ্যে সাড়ে তিনশো টাকার চাকরি বাগাইয়া আট-ঘাট বাঁধিয়া আসিয়াছে, আমি কি সে সংবাদ রাখি? প্রথমটা বেশ ভড়কাইয়া গেলাম, কিন্তু মুহূর্তে সামলাইয়া নিয়া বলিলাম, 'তা হোক, তোমার সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব না।'
'কেন দাদু?'
'সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব কেন হে বাপু! বাঁধা আছে এইটুকু শুনে রাখো।' বলিয়া আমি ফের রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম।

দিন চারেকের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া শিলাকে বলিলাম, 'তল্পি বাঁধ শিলা, এখানকার বাস তুলতে হল।'
শিলা সজলচোখে বলিল, 'কেন দাদু? বেশ তো আছি এখানে?'

বেশ থাক আর যাই থাক, পরের দিন জিনিসপত্র সব গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শিলাকে ভিতরে বসাইলাম। কিছু ফেলিয়া গেলাম কি না দেখিতে পাঁচ মিনিটের জন্য বাড়ির ভিতরে গিয়াছি, ইহার মধ্যে ভূপেন আসিয়া গাড়ির সামনে দাঁড়াইয়াছে।

শুষ্ক হাসিয়া বলিলাম, 'ভূপেন যে! আমরা তো চললাম।'

'একটা কথা শুনুন দাদু' বলিয়া সে আমাকে একান্তে নিয়া গেল।

'কোথায় যাচ্ছেন? শিলাও জানে না বললে।'

হাসিয়া বলিলাম, 'কোথায় যে যাচ্ছি আমিও জানি না হে! কোনো গুহা-টুহায় আশ্রয় নেব ভাবছি।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ভূপেন বলিল, 'আপনার মত কি কোনোদিন বদলাবে না, দাদু? এ বিয়ে না হলে আপনার নাতনীও অসুখী হবে।'

গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'দেখো বাপু কবি, তোমায় একটা সৎ উপদেশ দিই। শুধু কাব্যচর্চা করে জীবনটা মাটি কোরো না। জীবনে আরও ঢের বড়ো বড়ো সাধনার সুযোগ আছে।' বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। আমার সামনেই শিলা যতক্ষণ দেখা গেল ভূপেনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

হে পাঠক হে পাঠিকা, কৈফিয়ত আমি দিব না। শুধু কয়েকটা কথা বলি। শিলাকে নিয়া আমি যে আদিকাব্য রচনা করিতে চাই, ত্যাগের কাব্য তার চেয়ে বড়ো একথা মানা আমার পক্ষে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভূপেনের হাতে শিলাকে সঁপিয়া দিয়া আমি শূন্য ঘরে বুক চাপড়াইলে আপনারা খুবই খুশি হন, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ? কেনই বা শিলাকে আমি ছাড়িব! বিলাইয়া দিবার জন্যে এতকষ্টে এত যত্নে আমি ওকে মানুষ করি নাই। গুহায় ফেলিয়া আসিলে ও বাঁচিত না। আমি ওর প্রাণ রক্ষা করিয়াছি। আমার চেয়ে ভূপেনের অধিকার বেশি কেমন করিয়া? আপনারা ন্যায়বিচার করিবেন।

আপনারা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শিলাকে আমি ভালবাসি। আমার যেমন প্রকৃতি আমার ভালবাসাও তেমনি। দেড়শো কোটি মানুষের মধ্যে আমি যেমন মিথ্যা নই, আমার এই ভালবাসাও তেমনি মিথ্যা নয়।

আমার এ প্রেম যেন গোড়া ঘেঁষিয়া কাটা তরুর মতো—শাখা নাই, কিশলয় নাই, পাতা নাই, ফুল নাই, শুধু আছে মাটির উপরে শক্ত গুঁড়ি আর মাটির নিচে সরস সতেজ মূল, যাহার রস সঞ্চয় কেবল নিজেকে পুষ্ট করিবার জন্যই।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় আমি যে আমার বিশাল লোমশ বুকে দুই হাতের হাতুড়ি দিয়া কচি মেয়েটাকে ছেঁচিতে চাই ইহার মধ্যে আমিও নাই শিলাও নাই, আছে শুধু অনাদি অনন্ত শাশ্বত প্রেম, পশু-পাখি মানুষকে আশ্রয় করিয়াও যে প্রেম চিরকাল নিজের সমগ্রতা বজায় রাখিয়াছে। আমি আর শিলা তো শুধু ক্রীড়নক। দু-দিন পরে আমরা যখন শূন্যে মিশাইব এ প্রেম তখনো পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবে।

তাছাড়া শিলার পবিত্রতায় আমার শ্রদ্ধা নাই। ওর বিধবা মাকে আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারি না। তার সেই শুভ্রবাসা শীর্ণা-ক্রন্দসী মাতা আমার মনে একটা স্পষ্ট প্রেরণার মতো জাগিয়া আছে। দুই হাতে অন্ধকার ঠেলার মতো, সেই কলঙ্কিনী মাতার কন্যা আমার প্রেমেরই যোগ্য এই অন্ধ যুক্তি আমি ঠেলিয়া দিতে পারি না।

পশ্চিমে একটা শহরের প্রান্তে নিরালা বাগান বাড়িতে শিলাকে নিয়া নীড় বাঁধিয়াছি। রোমান্স একেবারে রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে।

আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হইয়া শিলা আমার তেমনি সেবা করিতেছে। পরিহাস করিলে হাসে না, মিষ্টি কথা বলিলে শ্রান্ত চোখ তুলিয়া তাকায়, হাত ধরিয়া সোহাগ করিতে গেলে কাগজের মতো সাদা আর পাথরের মতো শক্ত হইয়া ওঠে।

ইঙ্গিতে বলি, 'বেঁচে থাকতে হলে সবই চাই, শিলা।'

সে বলে, 'মরাটাও তো কঠিন নয় দাদু!'

তা বটে। বলি, 'তবু যার অন্যথা নেই তাকে মানতে হয়।'

সে বলে, 'জানি। কিন্তু মানার পথটা আমি তোমার কাছে শিখব না দাদু। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে আমি কি করে বাইরে যাই বলো তো?'

দিনের ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়াইয়াছে। রাত্রির ব্যাপারটা অন্যরূপ। বাহিরে কোনোদিন জ্যোৎস্না থাকে, কোনোদিন থাকে না, কোনোদিন বৃষ্টি পড়ে, কোনোদিন পড়ে না। দুই হাতে বুক চাপিয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি। ঘুম আসে না, আসিবে না জানি, সেজন্য ভাবিও না। কিন্তু ঘরের বাতাস যেন নিশ্বাসের পক্ষে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা দিয়া কে যেন আমাকে জীবন্ত কবর দিয়াছে মনে হয়।

তারপর এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া শিলার দরজা ঠেলিয়া বলি, 'তোর আজকাল ভয় করে না কেন, শিলা?'

'চব্বিশ ঘণ্টাই তো ভয় করে দাদু।'

'তবে দরজা খোল। ভয় মিটিয়ে নে।'

শিলা কঠিনস্বরে বলে, 'ঘুমোও গে যাও, দাদু। এমন যদি করো, যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব।'

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া শুইয়া পড়ি। শৈলে যার জন্ম শিলা যার নাম সে শিলার মতো শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া ওঠে।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮—) ॥ আমরা তিনজন
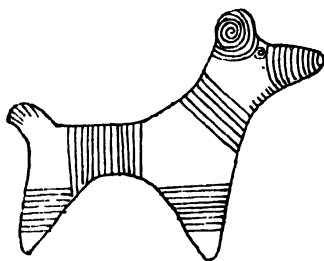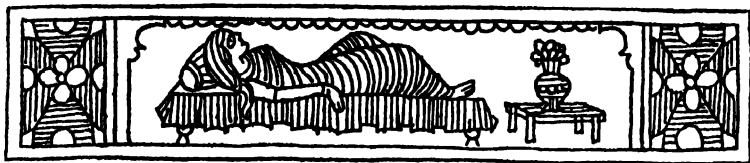
আমরা তিনজনে একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম: আমি আর অসিত আর হিতাংশু। ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে ঢাকা সকাল।

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিল তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার পেনসন-পাওয়া সবজজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড়ো রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থে তা-ই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা লম্বা চোরকাঁটা ছাওয়া মাঠ ভরে গেল, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হল না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিল পুরানা পল্টনে। বাকিটা ছিল এবড়ো-খেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি জলে গা-ডোবানো হলদে হলদে সবুজ রঙের ব্যাঙ আর নধর সবুজ ভিজে ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা দুপুর।

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সব সময়ে—যতটা এবং যতক্ষণ থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকত, 'বিকাশ! বিকা—শ! আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম, দেখতাম অসিত সাইকেলে বসে আছে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধরে যেত আমার! হিতাংশুকে ডাকতে হত না, দাঁড়িয়ে থাকত তাদের বাগানের ছোট ফটকের ধারে, কি বসে থাকত বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে

চেপে চলে যেত পাকা সড়ক ধরে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, আমি আর হিতাংশু ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধরে, হাওয়ায় গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কাটলেট খেতে, কোনোদিন শহরের একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চীনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হল না—চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি ওটা, কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক; কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হয়ে লম্বা লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের সোফায় শুয়ে বসে, ছোটছোট তারা ফুটেছে আকাশে, চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করেছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতো না—আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হত বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিল না, অসিতের উপরেও না, দুজনে বসে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি চুপি দু-একটা কথা বলেই সে চলে যেত।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম। আবার তিনজন একসঙ্গে অন্য একজনের প্রেমে পড়লাম। সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো-সাতাশ সনে।

নাম তার অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন, কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই বা হবে কেন। ভদ্রলোক বাড়িতে প্যাণ্ট পরে থাকেন, আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে বলে ভুল হয়—আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলবো। সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় বসে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে-মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ;—সেই ঢাকায় সুদূর সাতাশ সনে, কোনো-একটি মেয়েকে চোখে দেখা যখন সহজ ছিল না, যখন বন্ধ গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিল আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে আমরা দেখতে পাই এক-একদিন এক

এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়বো না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্তু বের করেছিলাম আমি। রোজ সই করে পাউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটি নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার করে লেখা। অন্তরা দে। একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে, খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরি করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি অন্তরা?'

'কার—' কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বলল, 'বোধহয়।'

অসিত বলল, 'সুন্দর নাম!'

'ডাকে তরু বলে।'

তরু! এই ঢাকা শহরেই দু-তিন শো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হল, এবং আমি বুঝলাম অসিতেরও মনে হল, যে সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা যাকে নিয়ে বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, ওদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বলল, 'অন্তরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো!' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভিতরটা কেমন দমে গেল।

'আমি হলে অন্তরাই ডাকতাম।'

কী সাহস! কী দুঃসাহস! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধরে! ঈস! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হয়ে উঠল, বেশ চোখা চোখা কয়েকটা কথা মনে মনে গোছাচ্ছি, ফস করে অসিত বলে উঠল, 'আমিও তা-ই।'

বিশ্বাসঘাতক!

এ রকম ছোট ছোট ঝগড়া প্রায়ই হত আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হতে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিল তাতেই বেশি মানিয়েছিল, না কালকের বেগনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়েছিল তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিল না চুল ছিল খোলা; বিকেলে বারান্দায় বসে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিল না আঁক কষছিল

—এমনি সব বিষয় নিয়ে চেঁচামেচি করে আমরা গলা ফাটাতুম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হত যে কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত : ওর মুখের সঙ্গে মোনা লিসার মিল কি খুব বেশি, না অল্প একটু, না কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনা লিসার ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি : হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরল কথাটা—'ওর মুখ অনেকটা মোনা লিসার মতো।' তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি ; তবে একটা সুবিধা এই হল যে আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হয়ে গেল মোনা লিসা। অন্তরাতে যতই সুর ঝরুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা শুধু আমরা জানি, আর কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি', আর হিতাংশুও একটু লাল হয়ে যেত, 'যাঃ!' যার মানে হচ্ছে যে সেটা হলেও হতে পারে। আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলত আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এসব কিছু না, শুধুই কথা, কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার একটু পরে তিনজনে ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ করে সাইকেলের উপরে কী-রকম কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম সাইকেল থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা, 'উঃ' বলে সে নেমে পড়ল, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় কে একজন বলে উঠলেন, 'Take care, young man!' তাকিয়ে দেখি, ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী—আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে, তার মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

'Really you must'—বলতে বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন।—'Oh it's you! কেশববাবুর ছেলে!'

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

'আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব সময়। বন্ধু বুঝি?

বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওঁরা চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। একটু পরে অসিত বলল, 'কী কাণ্ড! হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে, না?'

'না তো! ঘাবড়াবো কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—'

'কোনোদিন তো এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা একেবারে ওঁদের সামনে—'

'বেশ তো! হয়েছে কী? কারো গায়েও পড়িনি, পড়েও যাইনি, হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে—'

'না, না, তুমি ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আর বিকাশ তো—'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'চুপ করো, ভালো লাগে না!'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিল', অসিত তবু ছাড়ল না। (ও বলতে কাকে বোঝায় তা বোধহয় না-বললেও চলে।)

'হেসেছিল তো বয়ে গেল!' চিৎকার করল হিতাংশু, কিন্তু সে চিৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে বিকাশ? ঠিক মোনা লিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দু-দিন আধ-মরা হয়ে রইলাম, সাত দিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগল, 'চলো না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।'

'পাগল!'

'পাগল কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে! বললেন না?'

ক্রমে ক্রমে. হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মাল যে দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো খুশি হবেন তিনি, না গেলে দুঃখিত হবেন—এমন কি তাঁকে অসম্মানই করা হবে তাতে। তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য ক্রমশই আমরা বেশিরকম ব্যস্ত হতে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি, 'আজ', রোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক।' কোনোদিন দেখি

ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ারে ; কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটর গাড়ি দাঁড়ানো, তার মানে শহরের একমাত্র ব্যারিস্টার দাস সাহেব বেড়াতে এসেছেন। আর কোনোদিন বা চুপচাপ দেখে ধরে নিই ওঁরা বাড়ি নেই। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব একা বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারী সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের যতটা নয় ততটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার, একটু ঠেলাঠেলি ফিসফিসানি হয়, আর শেষ পর্যন্ত তারা-কুটির ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা অন্যদিকে চলে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কেন, আর এ নিয়ে এত ভাববারই বা কি আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না? আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাব, বসব, আলাপ করব, চলে আসব—ব্যস!

সেদিন আকাশে মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে মনে হল ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকল অসিত, লম্বা, ফর্সা, সুশ্রী, তারপর হিতাংশু, গম্ভীর চশমা-পরা ভদ্রলোক মাফিক, আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকব কিনা, কাকে ডাকব, কী বলে ডাকব, এই সব আমরা যতক্ষণ ধরে ভাবছি ততক্ষণে পর্দা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধরে বললেন, 'Yes?'

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হল। 'আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—'

আবছা আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। 'ও তোমরা! তা……'

অসিত আবার বলল, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ,……' একটু কেশে—'এসো, এসো তোমরা', পর্দা তুলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিলে, খুব লাগল আমার, কিন্তু চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর উপায় কী। আমাদের কাদা-মাখা-মাখা স্যাণ্ডেলে ঝকঝকে মেঝে নোংরা

করে করে এগিয়ে গেলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় বসে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে বসে আছে আমাদের মোনা লিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'সুমি, এই আমাদের পুরানা পল্টনের থ্রী মাস্কেটিঅর্স। এটি কেশববাবুর ছেলে, আর এরা……'

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিল, 'এর নাম অসিত, আর এই হচ্ছে বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদু স্বরে বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা? বেশ রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ বসে পড়লাম তিনজনে। মিসেস দে ডাক দিলেন, 'তরু!'

মোনা লিসা চোখ তুলল।

'এঁরা আমাদের প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।'

মোনা লিসা বই রেখে উঠল, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়াল, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি করে মাথা নোয়াল একটু, তারপর আবার চেয়ারে বসে বই খুলে চোখ নিচু করল।

আমার মনে হল আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে, আমাদের সকলের চাইতে খবর রাখে বেশি, চটপট কথা বলতেও পারে; আর হিতাংশু—সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তাছাড়া এই তারা-কুটির তো তোদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা একটু ওরা দুজনেই বলল, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কি বলব ভেবেও পেলাম না, বলতেও ভরসা হল না, পাছে আমার বাঙাল টান বেরিয়ে পড়ে। মোনা লিসাকে দেখবার ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে পাগল করে দিচ্ছিল আমাকে, কিন্তু কিছুতেই কি একবারও চোখ তুলতে পারলাম!

ইলেকট্রিসিটি না-থাকলে জীবন কী রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, রমনার দৃশ্য কত সুন্দর, এ-সব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমরা কি কলেজে পড়ো?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বলল, 'হিতাংশু পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাঃ, বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠল, 'বাবা, কীটস কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন?'

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো?'

অসিত ফস করে বলল, 'বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে—বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনা লিসার চোখও আমার উপর পড়ল। হাত ঘেমে উঠল আমার, কানের ভিতর যেন পিঁ পিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধ কতটুকু সময়? পনেরো মিনিট? কুড়ি মিনিট? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগল, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর করেই দুটো ছাতা দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না করে ও থাকতেই পারে না—বলে উঠল, 'কী চমৎকার ওঁরা!'

'সত্যি! চমৎকার!' হিতাংশু সায় দিল সঙ্গে সঙ্গে।

আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিল না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বলল, 'কিন্তু জুতোগুলো বাইরে ছেড়ে গেলেই পারতাম আমরা। আর হিতাংশু, তুমি আবার আজ হোঁচট খেলে।'

'কখন?'

'ঘরে ঢুকতে গিয়ে।'

'যাঃ!'

'যাঃ আবার কি। আর ঘরে ঢুকে নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!' একটু চুপ করে থাকল হিতাংশু, তারপর হঠাৎ বলল, 'কিন্তু যখন ……যখন মোনা লিসা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল……'

অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম এবং অন্ধকারেই বোঝা গেল যে তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কি না জরদ্গবের মতো বসেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওরা

আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি বর্বর, খাস কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখ রক্ষা করতে পারল না।

কী যে মন খারাপ হল, কী আর বলব।

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরত দিতে। চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসাল, তারপর······তারপর মোনা লিসাই এল ঘরে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম, একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা'·· 'ও মা! এর জন্য আবার···বসুন···।' মনে মনে এইরকম ভেবে গিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হল একটু অন্যরকম। চাকর এসে ছাতাটি নিয়ে ভিতরে চলে গেল, আর ফিরে এল না, কেউই এল না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ফিরে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

না, না। ঐ সুন্দর করে সাজানো ঘর, যেখানে সাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝকঝক করে, আর কোণের চেয়ারে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি কোনো এক নীল মলাটের আশ্চর্য বইয়ের পাতা ওল্টায়—সেখানে জায়গা নেই আমাদের! কিন্তু তাতে কী। মোনা লিসা—মোনা লিসাই।

ঝমঝম করে বর্ষা নামল পুরানা পল্টনে, মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ঢাকা দুরু দুরু দুপুর, নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধরে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পরে প্রথম যেদিন রোদ উঠল, সেদিন বাইরে এসে দেখি শহরের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারের মোটর গাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো!'

তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না হয়েও ব্যক্ত হল। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীরমুখে বলল, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ।'

'কার?'

'ওরই অসুখ।'

'ওর অসুখ!'

'ওর!'

সেদিনও বড়ো ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু-বেলাই। আমরা কি একবার যেতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম

রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভিতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস দে, এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বলল, 'আমাদের ডেকেছেন মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি মরে গেলেও ওসব পারি না।

মিসেস দে বললেন, 'তরুর অসুখ।' তাঁর কণ্ঠস্বর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিল।

'কী অসুখ?'

'টাইফয়েড!' ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ করে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত বলে উঠল, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব করে দেব।'

'পারবে, পারবে তোমরা? দেখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার'…বলতে বলতে চোখে তাঁর জল এল।

মোনা লিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না, কী ভালো আমাদের লেগেছিল, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সে সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জলে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়েছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধরে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামল না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিস যান; ফিরে এসে রোগীর ঘরে উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজিচেয়ারে; তোমার মা-র সারাদিন পায়ের পাতা দাঁড়ায় না, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন, আর সারা রাত পালা করে করে জেগে থাকি আমরা, কখনো একসঙ্গে দুজনে, কচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগার সুখ আমিই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বারবার, সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দু-মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশবার যাচ্ছে, দশবার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকলো তার গায়ে, কোনোদিন

রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটল বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে আসতে দুটো বেজে গেল তার, এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বারবার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোট ছোট ছড়ানো টুকরো দু-হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই বলে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুরঘুর করি তোমার মা-র কাছে-কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচার লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে করে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকায় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না, মোনা লিসা কোনোদিন জানবে না।

সারাদিন, সারারাত মোনা লিসা মূর্ছিতের মতো পড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে মাঝে—এত ক্ষীণ স্বর যে কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে কটি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন করে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দুজনকে বলাই চাই ; কখনো হঠাৎ একটু অবসর হলে তিনজনে বসে সেই কথা কটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিনজন কৃপণ সারা পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে, বন্ধ ঘরে অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে 'উঃ', সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে গেছে ; যদি বলেছে 'জল', তাতে যেন জলের সমস্ত তরলতা ছলছল করে উঠেছে আমাদের মনে।

একরাত্রে, হিতাংশু বাড়ি গেছে আর অসিত বারান্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেয়ালের গায়ে ছায়া কাঁপছে বড়ো-বড়ো, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে ঐ আলোটুকু আর যেন পারছে না ; আমিও পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম, আমায় হাত-পা কেটে কেটে টুকরো করে দিল, মোমের মতোই গলে যাচ্ছে আমার শরীর, যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি, লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে ডুবতে মনে হল, মোনা লিসা, তুমিও কি এমনি করেই যুদ্ধ করছ মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছ, কেমন করে আছ! মনে হতেই ঘুম ছুটল, সোজা হয়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে, সেই ক্ষীণ আলোয়

কাঁপা কাঁপা ছায়ায়, রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? তুমি কি বেঁচে উঠবে? কোনো উত্তর নেই। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? উত্তর নেই। তুমি ঘুমিয়েছ, না জেগে আছ? উত্তর নেই। তবু আমি তাকিয়ে থাকলাম, মনে হল এর উত্তর আমি পাবই, পাব তোমারই মুখে, তোমার মুখের কোনো একটি ভঙ্গিতে, হয়তো—কে জানে—তোমার কণ্ঠেরই কোনো একটি কথায়। আর, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আস্তে আস্তে চোখ তোমার খুলে গেল, মস্ত বড়ো হল, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হল আমার মুখের উপর। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো, 'কে?'

আমি তাড়াতাড়ি আইসব্যাগ চেপে ধরলাম মাথায়।

'কে তুমি?'

'আমি।'

'তুমি কে?'

'আমি বিকাশ।'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন না রাত্রি?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না?'

'হবে। আর দেরি নেই।'

'দেরি নেই? আমার ঘুম পাচ্ছে, বিকাশ।'

আমি তার কপালে আমার বরফ-ঠাণ্ডা হাত রাখলাম।

'আঃ, খুব ভালো লাগছে আমার।'

আমি বললাম, 'ঘুমোও।'

'তুমি চলে যাবে না তো?'

'না।'

'যাবে না তো?'

'না।'

'আমি তাহলে ঘুমুই, কেমন?'

নিশ্বাস উঠল আমার ভিতর থেকে, নিশ্বাসের স্বরে বললাম—'ঘুমোও, ঘুমোও, আমি জেগে আছি, কোনো ভয় নেই।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাকল। ভোর হল।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক, একলা আমার। এই একটা

কথা ওদের দুজনকে বলিনি, হয়তো ওদেরও এমন কিছু আছে যা আমি জানি না, আর কেউ জানে না। তুমি, মোনা লিসা, তুমিও জানলে না, জানবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন তুমি ভালো হলে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হয়ে পড়লাম। আর তুমি ভাত-টাত খাবার দিন পনেরো পরে যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, সেদিন আমার-অন্তত মনে হল যে এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওএল পার্টি।

কিন্তু তা-ই বা কেন? এখনো আমরা যেতে পারি, বসতে পারি কাছে, গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি তাকে, সে ক্লান্ত হলে পিঠের বালিশটা দিতে পারি ঠিক করে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে সাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে ফাঁকে নীলের মেলা, এই করে-করে আশ্বিন যেই এল ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে রাঁচি। বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ করে নারানগঞ্জের স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।

ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিঙ ধরে দাঁড়ানো মোনা লিসার ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হল তখন আমাদের মনে পড়ল যে ওঁদের রাঁচির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। আমার ইচ্ছা করছিল বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হল না।

অসিত বলল, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে', একটু হতাশভাবেই বলল হিতাংশু।

'কেন লিখবে না, না-লেখার কী আছে।'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এল না। এল হিতাংশুর বাবার নামে মনি-অর্ডার। বাড়ি ভাড়ার টাকা। তা-ই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে আমরা চিঠি লিখব স্থির করলাম। ও লেখেনি বলে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাব, এটা কোনোরকম যুক্তি বলেই মনে হল না আমাদের। অসুখ থেকে উঠে গেছে, হয়তো এখনো ভালো করে শরীর সারেনি—কেমন আছে, সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠ লিখব কী? আপনি লিখব, না তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই বা এ পর্যন্ত বলেছি আমরা —এতখানি কথা নিশ্চয়ই বলিনি যার জোরে কালির আঁচড়ে জলজলে একটা

তুমি লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া কী লিখবই বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরিয়ে গেল। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে কতই তো লেখা যায়—কিন্তু মোনা লিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধরে জটলা করেও কোনো মীমাংসা যখন হল না, তখন ওরা আমাকেই বলল চিঠিখানা রচনা করে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখি, তাই।

সে রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে-ঘামতে আমি লিখে ফেললাম:

স্নচরিতাসু,

ভেবেছিলাম একখানা চিঠি আসবে, চিঠি এল না। ভাবতে ভাবতে একুশ দিন কেটে গেল। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জলত কিনা রোজ সন্ধ্যায়।

বসে বসে রাঁচির ছবি দেখছি আমরা। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের রাস্তা, কালো কালো সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেল—আর যেন কখনো অসুখ না করে।

কারো কোনো অসুখ না করেও এমন কি হয় না যে আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি, শুয়ে-বসে আর সময় কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু কাজ তবু জুটবে আমাদের।

মাসিমা মেসোমশায়কে প্রণাম।

আপনি তুমি দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজল। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে ফাঁকে এই কটি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিঝিকি রোদ্দুর। বারবার পড়লাম; মনে হল বেশ হয়েছে, আবার মনে হল ছি ছি, ছিঁড়ে ফেলি এখুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল করে নিলাম, আর পরদিন তিনজনে বসিয়ে দিলাম যে যার নাম-সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম ডাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চার দিন, পাঁচ দিন···আচ্ছা ছ-দিন: না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু একটু শীত; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটল; চিঠি নেই।

চিঠি এল শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা। অনেকটা এইরকম।

কল্যাণীয়েষু,

হিতাংশু, অসিত, বিকাশ, তোমরা তিনজনে আমাদের বিজয়ার আশীর্বাদ জেনো। আমাদের রাঁচির মেয়াদ শেষ হল, শিগগিরই ফিরব। ইতিমধ্যে হিতাংশু, তুমি যদি আমাদের ঘরগুলি খুলিয়ে তোমাদের চাকর দিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখো তাহলে বড়ো ভালো হয়। চাবি তোমার বাবার কাছে।

আশা করি ভালো আছ সকলে। তরুর শরীর এখন বেশ ভালো হয়েছে, মাঝে মাঝে সে তোমাদের কথা বলে। ইতি

তোমাদের মাসিমা

মাঝে মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি! পোস্টকার্ডটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না যে চিঠিটি পৌঁচেছিল। কী হল চিঠির? কিন্তু সে-কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যেই তারা-কুটিরের একতলাকে আমরা এমন করে ফেললাম যে মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েক দিন পরে আর একটি পোস্টকার্ড: 'রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।' শুধু স্টেশনে! আমরা ছুটলাম নারানগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনা লিসাকে, কচি পাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রঙ, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দূরে থাকলাম, হিতাংশু ছুটোছুটি করে বরফ লেমনেড কিনতে লাগল, আর অসিত কুলিকে ঠেলে দিয়ে বড়ো বড়ো বাক্স বিছানা হাঁই হাঁই করে তুলতে লাগল গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ গাড়িতেই এসো।'

'না, না, সে কী কথা, আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে এসো না'—বলে দে-সাহেব অসিতের পিঠের উপর হাত রাখলেন।

নারানগঞ্জ থেকে ঢাকা: মনে হল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিটের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা করে আমরা বসলাম বাক্স বিছানার উপর, তাতে একটা সুবিধে

এই হল যে একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম মোনা লিসা খুশি, ওর মা খুশি, বাবা খুশি, দেখতে দেখতে আমরাও খুশিতে ভরে গেলাম; এতদিন যা বাধো বাধো ছিল তা সহজ হল, এতদিন যা ইচ্ছা ছিল তা মূর্ত হল—রীতিমতো কলরব করতে করতে চললাম আমরা, এত বড়ো রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশির বেগেই চলেছে। মোনা লিসা নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগল আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেশনের কাছাকাছি, কোনো এক ঝরনার বর্ণনা দিচ্ছে সে, হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে?'

'তোমাদের চিঠি না তোমার চিঠি?'

আমি একটু লাল হয়ে বললাম, 'জবাব দাওনি যে?'

'এতক্ষণ ধরে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরো দেব।'

মিথ্যা বলেনি মোনা লিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেল আমাদের। আমরা তিনজন আমরা চারজন হয়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছ, আর-একবার খাটতে হবে। উনতিরিশে অঘ্রান ওর বিয়ে।'

উনতিরিশে! আর দশ দিন পরে!

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনা লিসা, এ কী শুনছি!'

ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী? কী বললে?'

গোপন নামটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী। মরিয়া হলে মানুষের যে সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা আগে আমি কখনো করিনি—বেগনি-বেগনি কালো রঙের ওর চোখ, এক ফোঁটা হীরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনা লিসা।'

'মোনা লিসা। সে আবার কে?'

'মোনা লিসা তোমারই নাম', বলল অসিত। 'জানো না?'

'সে কী!'

হিতাংশু বলল, 'আর-কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা তো—' কৌতুকের রঙ লাগল ওর মুখে, মিলিয়ে গেল, পলকের জন্য ছায়া পড়ল সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেল মুখের উপর

দিয়ে। একটু তাকিয়ে রইল, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামল একবার।

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদেরও একটু যেন মন-খারাপ হল, কিন্তু তখনই তা উড়িয়ে দিল হাসির হাওয়া, আমাদের কথায় লাগলো ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কি শুনছি ? মোনা লিসা, কী শুনছি ?'

'কি শুনছ বলো তো ?' বলে আঁচলে মুখ চেপে খিল খিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

বর এল বিয়ের দু-দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্সা, ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি সুগন্ধে মন যেন পাখি হয়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বারবার বলতে লাগলো, 'হীরেনবাবু কী সুন্দর দেখতে !'

অসিত জুড়লো, 'ধুতির পাড়টা !'

'পা দুটো !' বলে উঠলো হিতাংশু। 'অমন ফর্সা পা না-হলে কি আর ও রকম ধুতি মানায় !'

আমি ফস করে বললাম, 'যা-ই বলো, ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা।'

'কী বোকা-বোকা !' অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোলো না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে-করে বিয়ের অনেক আগেই সে গলা ভেঙে বসে আছে। রেগে-যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে বললো, 'এমন সুন্দর দেখেছ কখনো !'

'মোনা লিসার মতো তো নয় !' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয় কখনো ! খুব মানিয়েছে দুজনে। চমৎকার !' বলে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ করে কোথায় যেন চলে গেল। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন সানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষ রাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিল তখন—মোনা লিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু করে আলোর বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে-আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এল

আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, সানাইয়ের সুরে চোখ ভরে-ভরে উঠলো জলে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে, শুনতে পেলাম বিয়ে-বাড়ির সাড়াশব্দ, শাঁখের ফুঁ ;—কাছে গেলাম। মনে হল একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ভোর—এই আশ্চর্য অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে সানাইয়ের সুর ঝরলো, আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল মাঠে-মাঠে গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর-একবার ভোর হল।

সেদিন অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিস-ফিসে হল, এত ব্যস্ত সে, আমাকে যেন চেনেই না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা দোতলায় দূতের কাজ করতে করতে সে স্যাণ্ডেল ক্ষয়েই ফেললো, আমি একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্য করার চেষ্টা করলাম সারাদিন ভরে কিন্তু আমার নিজের মনে হল না বিশেষ-কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাত পাক ঘোরাবার সময় যখন এল, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুললো, দু-হাতে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ও সাত পাক ঘুরলো, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর বনে গেলাম, তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যেবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা করতে কেউ পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হল তুলনায়—আমারও আর মনে হল না যে তাঁর ঠোঁটের কাছটা একটু বোকা-বোকা। এমন কি আমি চেষ্টা করতে লাগলাম তাঁর মতো করে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে ; ওরা দুজনও তাই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেল আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দুজনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলিনি।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'দেখো তো ভাই, তরু গেল কোথায়।'

'ডেকে আনবো?' বলে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে মোনা লিসা চুল আঁচড়াচ্ছে; আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম। হঠাৎ কেমন নতুন লাগলো তাকে, একটু অন্য রকম, সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন-একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে—হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারের না—আমার মনে হল এই সমস্ত মিলিত গন্ধের যেটা নির্যাস, সেটাই ভর করেছে মোনা লিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী?'

'কিছু না—' সঙ্গে-সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়ল, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার কথাটা যেন শুনতেই পেল না মোনা লিসা; নিশ্চিন্তে চুলই আঁচড়াতে লাগল।

'শুনছ না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী। উনি ডাকলেই যেতে হবে?'

'বাঃ—!'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো—'আর কী—চলেই তো যাব শিগগির।'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায় গিয়ে—ঢাকা কি একটা জায়গা!'

'ঢাকা খুব ভালো।' ঘাড় বেঁকিয়ে বাইরের দিকে তাকালো একটু, শীতের দুপুরের সবুজ-সোনালী মাঠের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই আবার বললো, 'তোমরা আমাকে মনে রাখবে বিকাশ?'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আর কথা না! চলো এখন!'

'দেখছ না চুল আঁচড়াচ্ছি! বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।'

কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনা লিসা উঠলো,

তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। এসেই বললাম, 'তারপর? সেই লোকটার কী হল, হীরেনবাবু?'

কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলার উৎসাহ দেখি মিইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনা লিসা চেয়ারে বসে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগলো।

আমি পীড়াপীড়ি করলাম, 'বলুন না কী হল!'

'এখন থাক।'

আমি খাটে বসে একটি ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি। ভারী মজার বই।'

হীরেনবাবু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আর একটি বই টেনে নিয়ে বললেন, 'এ-বইটাও ভারী মজার। এক কাজ করো তুমি—এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে পড়ে ফেলো, আমি চট করে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?' বলতে বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

আর কথা না বলে আস্তে বেরিয়ে এলাম আমি, পিঠ দিয়ে অনুভব করলাম ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও বসেছিল, ঠিক সেখানটায় বসে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আস্তে আঙুল চালাতে লাগলাম, বার-বার, বার-বার।

আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এল, পেছলো আর একটা, একটা দিন শুধু; তারপর চলে গেল।

চিঠি এল এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে। তিনজনের হয়ে জবাব লিখলাম আমি, একটু লম্বাই হল, সেই সঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠলাম না। চিঠি বন্ধ হয়ে গেল শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম, দেখতে-দেখতে খাতা ভরে উঠলো।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওরা আসানসোল বেড়িয়ে এল। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত কমে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর একটু গরম পড়লেই ওরা চলে যাবে দার্জিলিং।

না-দেখা দার্জিলিঙের ছবি দেখতে লাগলাম মনে মনে, কিন্তু সে ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে! এখানে! ঢাকায়! দার্জিলিঙের কী হল?

আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে মাসিমা বললেন, 'শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।'

'কী? অসুখ করেছে আবার?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভালো নেই আর কি', মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগলো। খারাপ লাগলো মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখও না—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, যেন খুশিই হয়েছেন খবর পেয়ে। রীতিমতো রাগ হল মনে মনে।

ওরা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির হলাম। মোনা লিসা সোফায় বসে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরিয়েছেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।

'কেমন আছো মোনা লিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম ফুর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটি মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে একবার মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ করে বললো, 'এই—'

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, 'তোমাদের কী খবর?'

তারপর আস্তে আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগলো, আর সিগারেটের টিনটা মুখে তুলতে লাগলো ঘন-ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যস্তভাবে বললেন, 'তরু, এখন কেমন আছ?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বলল, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশ আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছ দেখছি। তরু তো এদিকে'—হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর?'

'হয়নি কিছু, তবে……'

তবে কী? ওর কি এমন সাংঘাতিক কোনো অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না? আর ও যেন কেমন হয়ে গেছে, যেন আধ-মরা, আস্তে কথা বলে, একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকে, হাসি পেলে ভালো করে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে বিয়ের পর মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের মোনা লিসার নাকি এই হল।

ছোট একটি প্লেট হাতে করে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে দেখো তো।'

'কী মা?'

'দেখো না'—বলে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।

'না, না, আর না,' মোনা লিসার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম আমরা, মন খুবই বিষণ্ন। হঠাৎ অসিত বললো, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিল সিগারেটের টিনে।'

'যাঃ!' আমি আঁতকে উঠলাম।

'সত্যি! আমি দেখলাম!'

হিতাংশু বললো, 'তাহলে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বললো, 'ওর ছেলে হবে।'

শুনে হিতাংশুটা খুক খুক করে হেসে উঠলো। 'হাসছ কেন?' আমি রেগে গেলাম—'হাসবার কী আছে এতে?'

অসিত বললো, 'ঐ জন্যই তো আচার এনে দিলেন মাসিমা! এ রকম হলে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো!' রাগে আমি গর্জে উঠলাম।

হল কী তোমার?' অসিত, যেন সকৌতুকে, আমার দিকে তাকালো।

'যাও! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।'

ওদের ত্যাগ করে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলাশেষের আলোয় একটা বই খুলে পড়তে বসে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু-দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হল: হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?'

'না না, আমি যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হল। অসিত সাইকেলে উঠল—স্টেশনে যাবে সে। হিতাংশু গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে আসবেন আবার ?'

'আসবো……তোমরা দেখো ওকে,' বলে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু-হু করে উঠলো।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কী রকম ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ শো আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে! ঘোড়ার গাড়ি আর অসিতের সাইকেল, ছোট হতে-হতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হল ; আমি আর হিতাংশু ভিতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনা লিসা ফুলে-ফুলে কাঁদছে।

'মোনা লিসা!'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—'

'এরপর ওঁকে আর যেতেই দেব না আমরা!'

'আর না—আর কেঁদো না, মোনা লিসা, তোমার পায়ে পড়ি।'

থামলো না কান্না। আমি মেঝেতে ওর কাছে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে গুনগুন করে বলতে লাগলাম, 'আর না আর কাঁদে না, একটু থামো, একটু চুপ করো, মোনা লিসা!' বলতে বলতে হঠাৎ গলা ভেঙে গিয়ে আমিও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

একটু পরে মোনা লিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই—কাঁদছ কেন ? বোকা!' আমি দু-হাতে মুখ ঢেকে থাকলাম, আমাকে চুল ধরে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, 'পুরুষ মানুষ—কাঁদতে লজ্জা করে না! থামো এক্ষুনি!'

আমি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে তাকালাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধরে একটু-একটু কাঁপলো, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, কখনো মন-খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিস ওর খেতে ইচ্ছে করে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা জোগাড় করে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চলে যাবে, জানা কথা ; কবে আবার নতুন ইচ্ছে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর

যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে তা হলে তো কথাই নেই—আহ্লাদে আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হলেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক করে দেবেন বলেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতিবারে মোনালিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমরা চুপ করে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিন মাস পরে। ততদিনে ওর শরীর অনেকটা সেরেছে, খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারী হয়েছে একটু। এবারে দিন দশেক থাকলেন তিনি, তারপর পুজোর সময় এসে এক মাস কাটালেন।

ততদিনে ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আসছেন ঘনঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয় কিছুই উপকার হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই ;—চোখে কালি পড়েছে, দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হয়ে যায়। আমরা কাছে কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাতপাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসি ঠাট্টায় ভোলাতে চাই—কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম পারলে বেশ হত।'

অসিত হো-হো করে হেসে উঠলো।—'আর যা-ই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না।'

লাল হয়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বলল, 'কী কষ্ট, সত্যি! সারা রাত নাকি পায়চারি করে—ঘুমোতে পারে না, শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বলল, 'হবে না! দেখতে কী রকম হয়েছে, দেখেছ!'

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, 'কী-রকম আবার হবে! সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা—'

আর-এক পর্দা গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

সত্যি তা-ই, আমার চোখে সত্যি তা-ই দেখলাম। দিন যত কাটলো ততই ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখলাম আমি, ওর সমস্ত শরীর এক অসহ্য সৌন্দর্যে ভরপুর হয়ে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না বলে পারলাম না

সে-কথা। আগের বছর যে দিনে ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিল, যেদিন রেলগাড়ির একটি ছোট কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধরে গিয়েছিল, ঠিক সেই রকম একটি প্রথম শীতের আমেজ-লাগা দিনে ও হঠাৎ বললো, 'বিকাশ, তোমার হয়েছে কী বলো তো? বড্ড আজকাল তাকিয়ে থাকো আমার দিকে!'

আমি একটুও লজ্জিত না-হয়ে জবাব দিলাম, 'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছ কিনা তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না?'

'এখনকার মতো না।'

'তা-ই বুঝি?' মোনা লিসা ভুরু কুঁচকে বাইরে মাঠের দিকে তাকালো। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সত্যি আমাকে ভালবাসো তোমরা। কিন্তু ও-রকম করে আর তাকিয়ো না, ভারী অসুবিধে লাগে আমার।...ঈস, কী রোদ!'

আমি উঠে সামনের জানলাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিল ভাঁজ করা, খুলে গায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছো, না?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা দুটির উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চলে গেলেন কেন?'

'বারে। ওঁর বুঝি কাজকর্ম নেই?'

'কবে আসবেন আবার?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিল যাবার—আমার মোটে ভালো লাগে না!'

'হয়েছে, হয়েছে—আর সর্দারি করতে হবে না,' বলে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। বোজা চোখেই বলে নিল, 'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং বলবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে। মনে মনে বললাম—কার কাছে বললাম জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হল ও হয়তো এতক্ষণে ছটফট করছে কষ্টে, উঠে

পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার, আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এখুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে ? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য ? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই ? ভাবতে-ভাবতে ঘুম ছুটলো চোখের, কবিতার লাইন মনে এল, উঠে বসতেই চোখে পড়লো ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্না ফুটেছে বাইরে, আমার জানলা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির, স্বপ্নের মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে বসে-বসে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হতে লাগলো এ-রকম, আমার রাত্রি থেকে ঘুম প্রায় চলে গেল। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে সঙ্গে, আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাবো ওকে—এ-কথা ভাবতে ভাবতে দেবতা মনে হল নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর-সুন্দর সব কথা এল যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে—রাত তখন দুটো প্রায়—লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেল। শুনলাম বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ, বিকা—শ।' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা গলার ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দুজন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে রাত্রে তখনো চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত সেটা। আকাশ ছিল তারায় ঝকঝকে তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রে, মাঠের মধ্যে, টিপটিপ বুকে।

'কি, অসিত ? হিতাশু, কী খবর ?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধহয়,' কথা বলল হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে ?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে ?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ সাদা হয়ে

গেছে, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এ ক-দিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম, হাসিঠাট্টা ঘোরাঘুরি কমে গিয়েছিল আমাদের, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধরে যে মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার সম্বন্ধে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলাম। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোট গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করিনি, কোনোও কথাও বলিনি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচু গলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জীর কাছে—একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেল অসিত। আমি আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই বসে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকল, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিন থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না ; ওর ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না ঃ শুধু বাইরে বসে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হল, চলল বাকি রাত ভরে, চলল তার পরের দিন। ভোর হতেই চড়া মাশুলের টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, আর তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে-পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন, পরিশ্রম, প্রার্থনা—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়—কী হচ্ছে, কী হল, কী হবে, এ সব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া আর কোনো কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করেন না, আর দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারাটির তলায় একজন কুঁকড়োনো বুড়ো মানুষ যে লুকিয়ে ছিল তা কে জানত! কে জানত আকাশের নীল নরম

ঘোমটার তলায় এই কান্না লুকিয়ে আছে! আর আমাদের কি আর-কিছু নেই, আর কিছু করবার নেই, শুধু কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া?

দুপুরের আগেই বিকেল হয়ে গেল সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারী হয়েছে, হঠাৎ যেন পৃথিবীর বুক চিরে চিৎকার উঠল একটা। উঠল, পড়ল, আবার উঠল আকাশের দিকে, আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হল না; আবার উঠল চিৎকার, যেন প্রতিমার সামনে ছাগ-শিশুর আর্তরব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে চলে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে, কিন্তু যতদূর যাই সে-শব্দ সঙ্গে চলে আমাদের, মাতা পৃথিবীর আদিম কান্না এটা, এ থেকে নিস্তার কোথায়?

ফিরে গেলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউয়ের পর ঢেউ, ফাঁকে ফাঁকে ডাক্তারের মোটা গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি। কিন্তু পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে তারা ছিল মাথার উপর নেমে এল পশ্চিমে, যে তারা ছিল চোখের বাইরে উঠে এল দিগন্তের উপরে, পুবের কালো ফিকে হল, ছোট ছোট অনেক তারা মুছে গিয়ে মস্ত সবুজ একলা একটি তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল সেখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, সেই অলৌকিক লগ্ন, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিন, যখন আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে, অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটিমাত্র ভেসে চলা আলো-জ্বলা নৌকায়। অন্তত এক মুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিল আজ কি আবার এল সেই মুহূর্ত?

অসিত ফিসফিস করে বলল, 'কী হল?'

হিতাংশু বলল, 'কই, না!'

'সব যেন চুপ?'

'তাই তো।'

'যাব একবার ভিতরে?' অসিত উঠে দাঁড়াল, কিন্তু গেল না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরাঙা আলোয় দেখলাম তাঁর ঠোঁট নড়ে উঠল, এমন স্থির হয়ে আমরা তাকিয়েছিলাম আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে তাঁর কথাটা আমরা কানে না শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম:

'এসো তোমরা, ওকে দেখবে।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করল, রাশি রাশি ফুল নিয়ে এল কোথা থেকে, আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজালো, শুধু সাজালো, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে রইল ওরা দুজন। আরো অনেকে এল কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে বলে বাদ পড়লাম, পিছন পিছন হেঁটে চললাম একা একা। ঠিক একা একাও নয়, কারণ ততক্ষণে হীরেনবাবু এসে পৌঁচেছেন, গাড়ির কাপড়ে জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে পাশে।

হীরেনবাবু পরের পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, দে-সাহেব চলে গেলেন বদলি হয়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করল ওদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এল, পুরানা পল্টনে আরো অনেক বাড়ি উঠল, ইলেকট্রিক আলো জ্বলল। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিল তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী-একটা অসুখ করে হঠাৎ মরে গেল। হিতাংশু এম, এস-সি পাস করে জার্মানিতে গেল পড়তে আর ফিরল না, সেখানকারই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতলো, এখন এই যুদ্ধের পরে কেমন আছে, কোথায় আছে কে জানে। আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ শো সাতাশে কি আটাশে নয়, সে সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে একটু হাওয়া—সেই মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি,—সেই তুমি! মোনা লিসা, আমি ছাডা আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯—) ॥ গুণ্ঠনবতী

পেয়ারার জেলিটা এনামেলের গামলা থেকে কাঠের চামচ দিয়ে তুলে তুলে কাঁচের জারের মধ্যে ভরবার সময়, নিবেদিতার মুখে যে প্রসন্ন পরিতৃপ্তির আভা ফুটে ওঠে, সেটুকু দেখবার মতো।

অবশ্য এ থেকে একথা মনে করবার হেতু নেই, নিবেদিতা পেয়ারার জেলির ভীষণ ভক্ত! নিবেদিতার দিকে তেমন করে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, থালাভর্তি বড়ি রোদে দেবার সময়, ভাঁড়ারের শিশিবোতলগুলি ঝেড়ে মুছে চকচকে করবার সময়, কি ধবধবে ওয়াড়গুলি বালিশে পরাবার সময়, নিবেদিতার মুখে লেগে থাকে এমনি পরিতৃপ্ত প্রসন্নতা।

আবার সেই মুখই বিরক্তিকুঞ্চিত হয়ে উঠতে মুহূর্ত দেরি লাগে না, যদি চোখে পড়ে যায়, স্বামী অথবা পুত্তুর কেউ, জুতো জোড়াটা খুলে যেখানে রাখবার সেখানে না রেখে ইঞ্চি কয়েক তফাতে রেখেছেন, অথবা চাকর ছোঁড়াটা কুটনোর খোসাগুলো বাড়ির বাইরে ফেলে না এসে উঠোনেই ফেলেছে।

পরিপাটি আর পরিচ্ছন্নতা, নিবেদিতার জীবনে একমাত্র সাধনা।

ছোট্ট সংসার। আর এই সংসারটি গড়ে তোলবার সমস্ত কৃতিত্বই নিবেদিতার।

এর প্রত্যেকটি তুচ্ছতম জিনিসেও নিবেদিতার হাতের স্পর্শ।

বছর পনেরো বয়সে নিবেদিতার যখন বিয়ে হয়েছিল, স্বামী সত্যশরণ তখন নাবালক বললেই চলে। বিধবা মায়ের অঞ্চলনিধি মামার বাড়িতে মানুষ। 'মায়ের কষ্ট কমাবো' এই সাধু সংকল্পটুকু ছাড়া তখন আর বেশি কিছু বস্তুর সঞ্চার হয়নি তাঁর মনে। কুড়ি বছর বয়সে বি-এ পাস করেই ঢুকে পড়েছিলেন এক সওদাগরী আপিসে এবং সেই সামান্য উপার্জনের ভরসাতেই বিয়ে করতে দ্বিধা করেননি, মায়ের সাধ মেটাতে।

অবিশ্যি নিবেদিতাই বা এমন কি অসামান্য ঘরের মেয়ে? কেরানী বাপের ঘরে নেহাত হেলাফেলায় জীবন কেটেছে ছেলেবেলায়। বছর আষ্টেক বয়স থেকে ছোট ছোট দু-তিনটি ভাই বোনের প্রায় সবটুকু দায়িত্বই তার ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল, মায়ের সময় অভাবের অজুহাতে।

'অজুহাত'-বলাটা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়, কিন্তু মূল-অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অন্য মন্তব্য করবে। যাক সে কথা, সে জীবন নিবেদিতা ভুলে গিয়েছেন।

মামাশ্বশুর বাড়িতে বছর তিন-চার ধরে যে পরগাছা জীবন যাপন করতে হয়েছে, সে জীবনও ভুলেছেন। এখন নিবেদিতার নিজের সংসার। নিজের রচনা।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর থেকে সত্যশরণকে অবিরত একরকম উত্ত্যক্ত করেই বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি সেই বহু পরিবারের বেড়াজাল থেকে।

ভীরু সত্যশরণ প্রথমে দিশেহারা হয়েছিলেন, নিবেদিতার এই দুঃসাহসে। নিশ্চিত ভেবে রেখেছিলেন, আবার লজ্জার মাথা খেয়ে ফিরে আসতে হবে মামার বাড়ির জটিল সংসারচক্রের মধ্যে।

কারণ নিজে আলাদা একটা সংসার করা সম্ভব, এ ধারণাই তাঁর ছিল না। ভেবেছিলেন, "আচ্ছা বেশ। জব্দ হোক কিছু।"

কিন্তু তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। যেমন তেমন করে শুধু 'সংসারই' করেননি, সে সংসারকে ছবির মতো করে সাজিয়েছেন। ফিটফাট ছিমছাম পরিপাটি সুন্দর।

অথচ নিজের জেদে আলাদা হয়ে এসেছেন, এই অপরাধের দায়িত্বে স্বামীকে কখনো এতটুকু ঝক্কির ভার দেননি। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে সত্যশরণ টেরও পাননি কখনো, খোঁজও নেননি। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে ছিলেন নিবেদিতার হাতে।

অবিশ্যি জীবনকে বেশি জটিল করেও তোলেননি তাঁরা।

ছোট্ট সংসার, চাহিদা পরিমিত।

একটি মেয়ে তাকে বিয়ে দিয়েছেন বছর চার-পাঁচ আগে। কৃতী জামাই, দূরে থাকে, কদাচিৎ আসে। তাতে দুঃখ নেই নিবেদিতার, মেয়ে সুখে আছে এই ভালো।

এই বিয়েটাও তো নিবেদিতারই অশেষ চেষ্টার পুরস্কার!

সত্যশরণের সাধ্য ছিল এমন একটি জামাই যোগাড় করবার?

আর একটি সন্তান, ছেলে গৌতম।
তার জন্যে যথাসময় যথোপযুক্ত খাওয়া-পরার যোগান দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। নিজের ধারে কেটে যাচ্ছে সে। টকাটক করে এগিয়ে এগিয়ে সাধারণ ছেলেদের চাইতে বেশ কিছু কম বয়সেই এম-এ পড়ছে এখন। তাকে গড়বার জন্যে নিবেদিতাকে আর কিছু করতে হবে না।
এত দিনে যেন যুদ্ধের প্রয়োজন ফুরিয়েছে নিবেদিতার।
জীবনে এসেছে একটা স্তিমিত শান্তি।
এখন শুধু মসৃণ পথটায় চাকাটাকে গড়িয়ে দেওয়া। অথচ নিবেদিতা আজও যেন ফুরিয়ে যাননি। তাই অটুট স্বাস্থ্য আর অক্লান্ত মন নিয়ে তিনি দৈনন্দিন কাজগুলিই করে তুলছেন অফুরন্ত।
ফর্সা বিছানা আরও ফর্সা করছেন, ঝাড়া ঘর আবার ঝাড়ছেন। স্বামী পুত্র আর ভৃত্য এই তিনটি প্রাণীকে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় অহরহ টিকটিক করছেন।
বড়ি দিচ্ছেন, আচার করছেন, নতুন নতুন খাবার শিখছেন বই কাগজ রেডিও থেকে।
সত্যশরণ যার নাম দিয়েছেন 'বাতিক'।

কি একটা কাজে বাড়ির ভিতরে এসে সত্যশরণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে বললেন—আবার কি হচ্ছে আজ? নতুন কি বাতিক?
—নতুন নয় পুরনো—নিবেদিতা হাসলেন—কী চমৎকার সোনার মতো রঙটা হয়েছে দেখো?···পেয়ারাগুলো ভালো ছিল।
বরাবরই এই রকম 'স্বর্ণবর্ণের' জেলি বানিয়ে থাকেন নিবেদিতা, তবু প্রত্যেকবারই যেন নিজের কৃতিত্বে মুগ্ধ হন, পুলকিত হন। সব বিষয়েই এইরকম। প্রায় প্রত্যেক হপ্তাতেই সত্যশরণকে শুনতে হয়, বিছানাটা কী ফর্সা হয়েছে দেখেছো। তোমার ধোপার চেয়ে ভালো।
সত্যশরণ যদি অজ্ঞতাবশত ছোকরা চাকরটার প্রশংসা করে বসেন এর জন্যে, হেসে গড়িয়ে পড়েন নিবেদিতা। বলেন—ওই আনন্দেই থাকো। ফটকের বাবার সাধ্যি আছে, একটাও ওয়াড় এরকম ফর্সা করবার। শ্রীমতী নিবেদিতা দেবী, বুঝলে?
সত্যশরণ বললেন—বামনী-ধোপানী একটু উঁচুদরের হবে বৈকি।

প্রায় এই এক ধরনেরই কথা। একই ধরনের হাস্য পরিহাস।

আলাপে আলোচনায় বৈচিত্র্যের স্বাদ আনবার যোগ্যতা, সাধাসিধে মানুষ সত্যশরণের নেই।

নিবেদিতার ছিল কি না, সে সন্ধান করছে কে? আত্মীয়-স্বজন যারা আছে, সবই ওই 'এক গোয়ালের'।

গৌতমের স্কুল-কলেজ নিয়ে একটু কথাবার্তা কইতে ইচ্ছে করে নিবেদিতার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সারাদিন সে কি করলো, কার সঙ্গে মিশলো এই সব।

বিচারকের ভঙ্গিতে নয়, সুহৃদের ভঙ্গিতে।

কিন্তু বড়ো গম্ভীর ছেলে গৌতম। ওর সঙ্গে গল্প বেশি এগোয় না।

তাই মনের কাজ যত ফুরোচ্ছে নিবেদিতার, হাতের কাজ তত বাড়ছে।... কে জানে মনটা ফুরিয়ে যায়নি বলেই হয়তো, এই তার প্রকাশ।

সত্যশরণ নিবেদিতার কথায় আর একদফা হাসলেন। বললেন—নিজের সোনার বর্ণ কালি করে এত সোনালী-সোনালী জেলি করে আর কি হবে? এত খাবে কে?

—কি যে বলো? এটুকু ফুরোতে ক-দিন? বোতলে মনে হয় অনেক বুঝি। গেলবারে তো আরো বেশি করেছিলাম।

দাম্পত্য আলাপের সীমানা প্রায় এই পর্যন্ত।

হয়তো ঠিক এইভাবেই বাকি জীবনটা কেটে যেত নিবেদিতার। হয়তো নতুনের মধ্যে, চল্লিশ পার হতেই গুরুমন্ত্র নিয়ে, কিছু কিছু পুজো-আর্চা করে বয়সের আর আচরণের সমতা রাখতেন! ভারসাম্য ঠিক রাখতেন ইহকাল আর পরকালের।...

...হয়তো আরও কিছুদিন পরে—ছেলের বিয়ে দিয়ে, বৌকে সুশিক্ষা দেবার মহৎ প্রেরণায় আর একটু খিটখিটে হতেন, আর আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যেতেন, যদি না—

হ্যাঁ, যদি না এবারে পুজোর সময় পুরী বেড়াতে আসতেন নিবেদিতা।

বেড়াতে আসাটাও অবশ্য নিবেদিতার চেষ্টার ফল।

সত্যশরণ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র অসুবিধের ফিরিস্তি তুলে তুলে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন, হল না।

নিবেদিতা উত্তর করলেন—আজন্মকাল তো সুবিধে সুব্যবস্থাই করে এলাম,

দেখি না অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদটা কি।···একটা প্রধান সুবিধে তো পাচ্ছো, বাড়ির। সব সময় পাবে?

গৌতম গম্ভীর ছেলে, প্রস্তাবটা যতক্ষণ না তার কাছ অবধি এল, কথা কয়নি। এখন বললে—আমার পড়ার ক্ষতি হবে। ভেবে রেখেছি—এই ছুটিটায়—

নিবেদিতা বললেন—ওখানেই বা তোকে পড়তে মানা করছে কে? বইপত্তর নিয়ে চল?

—সে কি করে হবে? আমি আর অন্য একটা ছেলে একজন প্রফেসরের বাড়ি গিয়ে তাঁর সাহায্য নেব ঠিক হয়েছে—

নিবেদিতা ঈষৎ আহত হয়ে বললেন—এত সব ঠিক করে ফেলেছিস, কই কিছু বলিসনি তো?

গৌতম অল্প হেসে বললে—এতে আর বলবার কি আছে? মাইনে তো লাগবে না!

নিবেদিতা স্বামীর কাছে এসে বললেন—তবে ও থাক। পুরুষ মানুষ, ছেলে মানুষ, জীবনে কত সুযোগ আসবে। আমি যাবোই।

'আমি' অর্থে 'আমরা'।

সত্যশরণ ছেলের আপত্তি শুনে আশা করেছিলেন, যাওয়া স্থগিত হবার এই একটা মোক্ষম কারণ পাওয়া গেছে।

অবাক্ হয়ে গেলেন নিবেদিতার সংকল্পে।

বললেন—ও থাকবে? খাবে কি?

—ফট্‌কে থাকবে, যা পারবে করবে, দুজনে খাবে। চারজনেই যাওয়া হবে ভেবে রেখেছিলাম, তা যখন হল না, করা যাবে কি? ফট্‌কে ছোঁড়ার কপালে নেই।

সত্যশরণ হতাশ হয়ে নিজেকে নিয়তির হাতেই সঁপে দিলেন।

ক-দিন পরে বেশ একটি প্রকাণ্ড লটবহর আর তার সঙ্গে স্বামীটিকে নিয়ে পুরী এলেন নিবেদিতা।

যদিও স্বামীকে আগে ভয় দেখিয়ে রেখেছিলেন, অসুবিধে অব্যবস্থার স্বাদ পরীক্ষা করতেই যাচ্ছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 'ব্যবস্থা' আর 'সুবিধের' সামনে 'অ' বসাবার কোনো অবসরই রাখেননি নিবেদিতা। নিজের বাক্তিকেই রাখেননি।

অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকবে, এ সহ্যশক্তি নিবেদিতার প্রকৃতিতেই নেই। বিশেষ করে সত্যশরণের ব্যাপারে।

তবু এখানে এসে হঠাৎ যেন বদলে গেলেন নিবেদিতা।
যেন বয়সের একটা মোটা অংশ হারিয়ে ফেললেন।
নিবেদিতা সময়ের জ্ঞান ভুলে ঝিনুক সংগ্রহ করবেন, বালির গাদায় পা ডুবিয়ে চলৎশক্তিহীনের ভূমিকায় হেসে কুটি কুটি হবেন, একটু নির্জনতার সুযোগ পেলেই ছুটোছুটি খেলবেন।
সত্যশরণ বলেন—এখানে এসে খুকি হয়ে গেলে যে!
সত্যিই বটে।
শুধু বয়স বলেই নয়, গম্ভীর স্বভাব ছেলে গৌতম বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে নিবেদিতার নিজের স্বভাবের ওপর যে একটা গাম্ভীর্যের 'কোটিং' পড়ে আসছিল, সেটা যেন এখানের এই উদ্দাম সাগরে হাওয়ায় ছিঁড়ে খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে।
সত্যশরণ ঠিক যেন নাগাল পান না।
একটু যেন বিপর্যস্ত হন।
'ক্ষেত্তরের' কাঁসা ভালো বলে, বাসন কেনবার জন্যে যে বেশ একটি মোটা অঙ্কের টাকা আলাদা করে এনেছিলেন নিবেদিতা, তার সদ্ব্যবহার করবার 'চাড়' কই?···দোকান বাজারের দিকেও তো যেতে চান না। বেড়ানো মানেই এই সমুদ্রতীর। এই 'বালির বৃন্দাবন' কি এতও ভালো লাগে নিবেদিতার?

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল, তবু নিবেদিতা ঝিনুক কুড়োতেই ব্যস্ত।
সত্যশরণের হাতে একটা থলি, আর নিবেদিতা ছোট-বড়ো মাঝারি নানা আকারের ঝিনুক নির্বিচারে সংগ্রহ করছেন আর থলি বোঝাই করছেন।
সত্যশরণ এক সময় একটু অধৈর্য হয়ে বললেন—আচ্ছা, পাগলের মতো কেবল তো কুড়িয়েই যাচ্ছ, এত ঝিনুক কি হবে?
—কি হবে?···হেসে উঠলেন নিবেদিতা, বললেন—হবে আবার কি? যাবার দিনে আবার সমুদ্রের জিনিস সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যাবো।

সত্যশরণ তো দিশেহারা। বললেন—এই এতদিন ধরে এত কষ্ট করে কুড়োলে, ফেলে দেবে?
—কুড়োলাম বলে ওই বস্তাভর্তি ঝিনুক বয়ে নিয়ে যাব না কি কলকাতায়?
—তাহলে এত বোঝাই করলে কেন?
—কেন?…নিবেদিতা হাতের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন—কলকাতা ছেড়ে পুরীতেই বা এলাম কেন?
—আর হবে না, অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে না। চলো—
হঠাৎ পিছন থেকে একটি গম্ভীর অথচ সকৌতুক কণ্ঠ বলে ওঠে—বিনা অনুমতিতে কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। সমুদ্রতটকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে যাবেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন নাকি?
দুজনেই চমকে তাকান।
সৌম্যকান্তি মাঝারি বয়সের একটি ভদ্রলোক।
মাথায় কিছু পরিমাণ টাক, চোখে কালো শেলের চশমা। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাঞ্জাবি। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে যেন বিশেষ একটা স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে সব কিছুর ওপর।
ফিরে দাঁড়িয়ে তিনজনের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হয়। এবং নবাগত ভদ্রলোকই আবার কথা বললেন—দিন চারেক হল এসেছি, আর দু-বেলাই চোখে পড়ছে আপনার অদম্য অধ্যবসায়। সরকারী দপ্তরে খোঁজ নিয়ে রেখেছেন, ঝিনুকের ওপর ট্যাক্স আছে কি-না?
এবারে সত্যশরণই নিবেদিতার হয়ে উত্তর দেন—তার দরকার নেই। উনি স্থির করে রেখেছেন, যাবার দিনে সমুদ্রের সম্পত্তি সমুদ্রেই ফেরত দিয়ে যাবেন।
শুনে ভদ্রলোক যেন একটু সচকিত হলেন।
কণ্ঠে ফুটলো তার আভাস। বললেন—তাই নাকি? কিন্তু কেন বলুন তো?
এবারে সোজাসুজি নিবেদিতাই উত্তর দিলেন। বললেন—মন্দ কি? খুশিটা রইল, দায়টা রইল না।
ভদ্রলোক বললেন—তা বেশ। আপনার পরিকল্পনাটি নতুন, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা চলে।
সত্যশরণ বললেন—বেশ তো, চলুন না আমাদের বাসায়? দু-দণ্ড বসে বসে ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা যা কিছু সব হবে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—কোথায় আপনার বাসা?

—এই তো একটুখানি।

—বালিভাঙা 'একটুখানি'?

সত্যশরণও হাসেন—তা যা বলেছেন! বালির রাস্তা বেজায় জোচ্চোর। আধমাইল দূর থেকে মনে হয়—ওই যে, ওই তো সামনেই।...আপনি কোথায়?

ভদ্রলোক একটা বিখ্যাত হোটেলের নাম উল্লেখ করলেন।

—আরে! ও তো আমাদের বাসার কাছেই! দেখেননি, 'তীর্থকুটির'? তবে আর কি চলুন এগোনো যাক।...গরিবের কুঁড়েয় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে তারপর স্বস্থানে যাবেন।...আমরা মশাই কলকাতার লোক, যেখানেই যাই দু-দিনে হাঁপিয়ে উঠি।

—সমুদ্রের ধারে এসে আপনি হাঁপিয়ে উঠছেন? বলেন কি? বিজ্ঞানকে যে উড়িয়ে দিতে চান দেখছি।...

চমৎকার হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

হাসিটি সত্যিই ভারী সুন্দর খোলামেলা।

নিবেদিতা স্বামীর এই কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে মনে মনে অস্বস্তিবোধ না করে পারেন না।...রাস্তায় দেখা হয়েছে, বাঙালী বাঙালীর সঙ্গে দুটো কথা কয়েছো, মিটে-গেল ল্যাঠা!...তাকে আবার ডেকেডুকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া কেন?

স্বামীকে উদ্দেশ করে বলতে যান—'তুমি তো বেশ লোক? উনি হয়তো এইমাত্র বেরিয়েছেন, হয়তো বেড়ানো শেষ হয়নি, ধরে নিয়ে যাচ্ছো মানে? ...কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—কি জানি, তাঁর অনিচ্ছে ভাবটা যদি ধরা পড়ে যায়। বরং উল্টো কথাই বলেন! বলেন—ওঁর কথা বাদ দিন। উনি ফি হাত বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করে ছাড়েন। কিন্তু হাঁপিয়ে না উঠলেও 'বন্ধুলাভ' যোগটাকে নষ্ট হতে দেব কেন?

এই কথাটা বলেই বরং সন্তুষ্ট হন নিবেদিতা। বেশ ঝরঝরে কথাগুলো বলা গেল।

ভদ্রলোক বলেন—সেটা উভয় পক্ষে।...কিন্তু এটা তো আপনার নীতির সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।

নিবেদিতা অবাক হন। তাঁর আবার কি নীতি!

অন্ধকার হয়ে গেছে, মুখের ভাব দেখা যাচ্ছে না আর, তবু ভদ্রলোক বোধ করি

ভাবটা অনুমান করে বললেন—খুশির খেসারতে দায় পোহানো তো আপনার নীতি নয়?
—ওঃ তাই। তা দায়টা কিসের? বন্ধুর জন্যে তো ট্যাক্স লাগে না।
—কিন্তু চা লাগে। দেখবেন শেষে খাল কেটে কুমীর আনলেন।
বেশ লাগে সত্যশরণের এই সব সরস কথাবার্তা।
নিজে তিনি মোটেই আলাপপটু নন, কিন্তু হাস্য-পরিহাস আলাপ-সালাপ ভালবাসেন খুব। আর মুগ্ধ হন নিবেদিতার অকুণ্ঠ পটুতায়।
এটা আজ বলে নয়, বরাবরের ব্যবস্থা।
বাড়িতে অতিথি-কুটুম্ব, জামাই-বেহাই, মেয়ে-পুরুষ যেই আসুক অভ্যর্থনার দায় নিবেদিতার। নিজের কাজ কামাই করে তাঁদের মান রক্ষা করতে হবে বসে বসে নিবেদিতাকেই।
সত্যশরণ অপটু। গৌতম অনিচ্ছুক।
সত্যিই পারেনও নিবেদিতা, যার সঙ্গে যেমন।

ভদ্রলোক সেদিন এলেন বটে, তবে বসলেন না।
আগামী দিনের জন্যে চায়ের নেমন্তন্ন পাতিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন,—বাড়ি তো চিনে নিলাম, আর ঠেকায় কে।
বিদ্যুতালোকে স্পষ্ট করে আর একবার দেখা গেল মানুষটাকে।
মাঝারি বয়স, হয়তো নিবেদিতার চাইতে দু-এক বছরের বড়ো, হয়তো বা তাও নয়, কান্তিতে সৌম্যভাব আছে, তার জন্যে দেখায় কিছু বেশি।
কিন্তু প্রকৃতি ভারী সরল।
গম্ভীর গলা, কিন্তু ভাষায় সরস কৌতুকের হীরকধার।
পথে আসতে আসতে পরিচয় জানাজানি হয়ে গেছে।
ভদ্রলোক এক বেসরকারী কলেজের প্রফেসর, বিয়ে-টিয়ে করেননি, সখের মধ্যে বছরে দুটো বড়ো ছুটিতে কাছে-পিঠে একটু বেড়াতে আসা, নেশার মধ্যে অধ্যয়ন। যে বই ভালো লাগে দশবার পড়েন, যে দেশ ভালো লাগে পাঁচবার যান।
পুরীতে এসেছেন এই নিয়ে বার চারেক।
শুনে নিবেদিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছেন—কেন বলুন তো? ভারতবর্ষের আর সব দেশরা কি অপরাধ করলো?

প্রফেসর হেসেছিলেন—বছরে দুটো করে দেশ দেখলেই কি ভারতবর্ষের সব দেশ ফুরিয়ে উঠতে পারবো ?

—তবু মোটামুটি ভালো ভালো জায়গাগুলো তো দেখা হয়ে যাবে ?

—তখন আবার মনে হবে 'কি আর হল, পৃথিবীতে কত কত ভালো ভালো জায়গা অদেখা রয়ে গেল !'

সত্যশরণ বোধ করি আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার বাসনায়, প্রফেসরের এ কথার পিঠে বলে উঠেছিলেন—তার চাইতে মশায় ও আশার গোড়ায় ছাই দেওয়াই ভালো কি বলেন ?

এঁদের বাসা থেকে নেমে হোটেলের দিকে যাবার পথে আবার কিছুটা এগিয়ে দিতে এলেন এঁরা, পরদিনের জন্যে পুনঃপুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

প্রফেসর বললেন—আপনারা তো মাত্র দুজনেই আছেন দেখছি। আমি আবার 'তৃতীয় ব্যক্তি' হয়ে কারুর অভিশাপ কুড়োবো না তো ?

বলে হাসিমুখে তাকালেন নিবেদিতার দিকে।

নিবেদিতার কিছু বলবার আগেই সত্যশরণ বোধ করি 'কর্তার' দায়িত্ববোধে তাড়াতাড়ি বললেন—না, না, সে কি ? সে আপনি কিছু মনে করবেন না। উনি লোক খুব ভালো !

—তাই নাকি ? আপনি তো তাহলে ভাগ্যবান !

প্রফেসরের অবাধ হাস্যে মুখরিত হয়ে উঠলো নির্জন বেলাভূমি।

নিবেদিতা ভাবলেন—রোসো, বাড়ি ফিরে দেখাচ্ছি মজা।

যেখানে সেখানে বোকার মতো এক একটা কথা না বললেই নয় ?

'বাসায় ফিরেই' বলবার আর দেরি সইল না নিবেদিতার, পথেই তর্জন শুরু করলেন—তোমার ও কী একটা কিম্ভূত কথা হল ?

—কেন ? কেন ? কোন্‌টা গো ?

—'উনি খুব লোক ভালো'—স্বামীর নকল করে বলে উঠলেন নিবেদিতা—কী চমৎকার ! ভদ্রলোক কি রকম হাসলেন ?

সত্যশরণ মাথা চুলকে বললেন—বাঃ ! হাসির কি আছে ? ভালোকে ভালো বলবো না ?

—না বলবে না ! কোনো কথার যদি ছিরি-ছাঁদ থাকে তোমার। হুট করে

ওকে ডেকে আনবারই বা কি দরকার ছিল? বেশ আছি দুজনে; আবার ও এসে উৎপাত করুক?

সত্যশরণ অসহায়ভাবে বলেন—আহা বুঝছো না, ভদ্রলোক নিজে যেচে আলাপ করলেন,—আমাদের দিক থেকে একটু আগ্রহ দেখানো উচিত নয় কি?

—সমুদ্রের হাওয়ায় তোমার উচিতবোধের জ্ঞানটা হঠাৎ খুলে গেল দেখছি যে? ওসব বালাই তো ছিল না কখনো!

—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা—তা তোমাকে তো তখন বিশেষ অসন্তুষ্ট মনে হল না বাবু? এখন এত রেগে যাচ্ছ কেন?

—সাধে বলি, তোমার বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে। তুমি যাকে ভদ্রতা করে 'আসুন মশাই' করছো, আমি যদি তাকে একটু খাতির না দেখাই, ভাববে কি লোকটা?...ওকি হচ্ছে?

গা থেকে পাঞ্জাবিটা খুলে সেটাকে বারান্দায় টাঙানো দড়িতে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন সত্যশরণ। পুরীর বিশ্রামহীন ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না কিছুতেই। ব্যর্থ হয়ে লণ্ডভণ্ড জামাটা নিবেদিতার হাতে ফেলে দিয়ে বলেন—অসম্ভব! হবে না। পুরীর আর সব ভালো, এই দিনরাত্তির ঝড়টা অসহ্য বাবা!

নিবেদিতা সেই দড়িতেই সুকৌশলে জামাটা ছড়িয়ে দিয়ে গলার হারে আটকানো সেফ্‌টিপিনের গোছা থেকে গোটা দুই লাগিয়ে আটকে এসে বলেন—আমার তো এই জন্যেই এত ভালো লাগে। ঝড় ঝড়।...সারাদিন সারারাত ঝড় বইছে, যেমন সমুদ্র তেমনি বাতাস, বিরামহীন বিশ্রামহীন!

—এখানে এসে কবি হয়ে গেলে দেখছি—বলে হাত মুখ ধুতে যান সত্যশরণ।

......সত্যি বলতে নিবেদিতার এই নতুন রূপ তেমন যেন ভালো লাগে না সত্যশরণের। একটু যেন অস্বস্তিকর, হয়তো বা একটু ভীতিকরও। ঝড় ভালো লাগে, শুনলেই যেন গা ছমছম করে।...আসল কথা—'জগতে শুধু প্রিয়া আর আমি'—এমন নিঃসঙ্গ অবস্থা জন্মে কখনো আসেনি সত্যশরণের। ঠিক ম্যানেজ করতে পারছেন না।

রাগ হয় গৌতমের ওপর।

এলেই পারতো ছেলেটা। ফটিকটাও আসতে পারতো তাহলে। সংসারটা সংসারের মতো লাগতো!...একেবারে নিছক একলা! একটি যদি বা সদালাপী

লোক জুটলো, দুটো কথা কয়ে বাঁচা যাবে, তাও নিবেদিতার পছন্দ নয়, আশ্চর্য!

শুধু স্ত্রীর সঙ্গে গল্প?

কতক্ষণ করা যায়?

ভদ্রলোকের নাম যতীশ্বর মুখার্জি।

বাড়িতে মা আছেন, আছেন দুই দাদা-বৌদি। নিজে বিয়ে করেননি। হাল্কা জীবন, আছেন ভালো। বই-টই নিয়েই থাকতে ভালবাসেন বটে, তবু মজলিসীও বলা যায়। এক কথায়, যে কোনো ধরনের লোকের সঙ্গেই জমিয়ে নিতে পারেন।

বুদ্ধিমান লোক।

এঁদের সঙ্গে এই সামান্য আলাপেই অবস্থাটা অনুমান করে নেন। মনে মনে ভাবেন, গিন্নীটি তো বেশ চৌকস, আহা বেচারা কর্তা! বোকা সোকা ভালো মানুষ! যেতে হবে কাল।

ঝড় ঝড়!

না ঠিক ঝড় বলা চলে না, ঝোড়ো হাওয়া। মুঠো মুঠো বালি উড়ছে···ভিজে ভিজে নোনা বালি।···জমা হচ্ছে—চুলে, কাপড়ে, ঘরের কোণে কোণে।··· দড়িতে ঝোলানো সত্যশরণের জামাটা তোলা হয়নি। ওটা যেন শূন্যে মাথা কুটে কুটে মরছে।···

বারান্দাটা থেকে সমুদ্র দেখা যায় না, দেখা যায় ছাতে উঠলে। এখান থেকে শুধু গর্জন! অন্তহীন শ্রান্তিহীন!

রাতটা বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের, আকাশে শুধু তারা।

সন্ধ্যে থেকে পড়ে থাকা ইজিচেয়ারটাতে এসে বসলেন নিবেদিতা।···কে জানে কত রাত···দুটো? আড়াইটে?

বেশ লাগছে এভাবে চুপচাপ একা পড়ে থাকতে।

অভ্যস্ত জীবন থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য!

নিজেকে যেন কলকাতার সেই পরিচিত নিবেদিতা বলে মনেই হয় না।···

বসে থাকতে থাকতে গা শিরশির করছে, শীত ধরে গেল প্রায়, তবু যেন

উঠে যাবার তাড়া নেই। শুধু আঁচলটা একটু ভালো করে টেনে গায়ে ঢাকা দিলেন।

কে জানে কেন কিছুতেই ঘুম আসছে না।

নিজেরই আশ্চর্য লাগছে নিবেদিতার।

কলকাতার বাড়িতে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারতেন মাঝরাত্রে উঠে খোলা আকাশের নিচে জেগে জেগে চুপচাপ বসে আছেন নিবেদিতা?

ওখানে সমুদ্র নেই, বাতাস তো আছে?

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কা খেতে খেতে যে বাতাস ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্রহীন নীরবতার দেশে। এক একটা বৈশাখী সন্ধ্যায় কি আশ্বিনের রাতে সেই বাতাস তো সমুদ্রের গর্জনই বয়ে নিয়ে আসে।···সমুদ্রের মতোই উন্মাদ বেদনায় মাথা কুটতে থাকে সারারাত সারাদিন। ঝোড়ো হাওয়ার সেই পাগলামি তো বহুবার দেখেছেন নিবেদিতা।

কই নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি তো।

এমন করে হারিয়ে ফেলেননি তো নিজেকে!

তেমন-তেমন এলোমেলো দিনে তিনি ছেলেমেয়েকে কাশি হবার ভয় দেখিয়ে শাসিয়েছেন, হাতা-গলা ঢাকা মোটাসোটা জামা পরতে বাধ্য করিয়েছেন।···

দিনে রাত্রে সাধ্যপক্ষে ঘরের জানলা দরজা খুলে রাখতে দেননি, পাছে ধুলো এসে ঘর নোংরা হয়। ধুলো-ভীতির এই অদ্ভুত বাতিকে কতদিন ঝগড়াই হয়ে গেছে সত্যশরণের সঙ্গে।

অথচ এখানে সর্বত্র ভিজে ভিজে নোনা বালি।

নিবেদিতার যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কিন্তু নিবেদিতা কে?

বহুদিন আগে যে ছোট একটা ফ্রক-পরা মেয়ে ছিঁচ্‌কাদুনে ভাইবোনের কান্না সামলাতে, মাঝে মাঝে নিজেই কেঁদে ফেলতো, সেই কি?

নাকি বহু পরিবারের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া অবগুণ্ঠনবতী যে বধূটি অবিরত পরের মন জুগিয়ে দিন কাটাতো আর অহরহ ভবিষ্যতের রঙিন ছবি আঁকতো, তারই নাম নিবেদিতা?

আর এই যে আপন পরিমণ্ডলে দীপ্ত উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির সচেতন মহিমময়ী নিবেদিতা? অনেকের ভয় অনেকের সম্ভ্রম আর অনেকের ঈর্ষার পাত্র হয়ে বিরাজ করছেন!

নিবেদিতা যাকে যথার্থ 'নিবেদিতা' বলে মেনে এসেছেন এতদিন, তিনি ছাড়াও আর কোথাও আর কেউ আছে নাকি, 'নিবেদিতা' যার নাম ?

সে কি ছিল ?

সে কি নতুন জন্ম নিল ?

তাহার চেহারাটা আবার কি রকম ?

মানুষ নাকি বারবার জন্মায়, বারবার মরে। দেহান্তের নীতি মেনে মেনে তার এই জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল রচিত।

কিন্তু দেহান্ত না হয়েও একই দেহে কি বার বার মৃত্যু ঘটে না মানুষের ? বার বার নবজন্ম লাভ হয় না ?

প্রতি মুহূর্তেই মরছে মানুষ, প্রতি মুহূর্তেই ফের জন্মাচ্ছে নতুন মূর্তি নিয়ে। সেই অনেকগুলো জন্মমৃত্যুর সমষ্টিতে গড়া মানুষকে কি করে তবে 'এক' বলা যায় ?…কি করে সবসময় চিনতে পারা যাবে তাকে ?

* * *

—একি তুমি কখন উঠে এসে এই ঝোড়ো হাওয়ার মুখে বসে আছ ?

ডেক্ চেয়ারটার পাশে সত্যশরণ এসে দাঁড়ালেন।

শিথিল ভঙ্গি ত্যাগ করে নিবেদিতা উঠে বসলেন।

বললেন—এই তো একটু আগে। তুমি এমনি এসে হাজির হয়েছো ? কি ভাবলে, তোমাকে ফেলে কোথাও উধাও হয়েছি ?

—হ্যাঁ ভাবলাম তাই ! সেই ভয়েই তো ছুটে বেরোলাম খুঁজতে। চলো চলো, খুব হাওয়া খাওয়া হয়েছে—

—যাও না তুমি, যাচ্ছি। না কি বসবে একটু ?

—রক্ষে করো, ঘরেই যা কাণ্ড। আলনা থেকে কাপড়গুলো সমস্ত ঘরের মেঝেয় জমা হয়েছে, আর তোমার ওই টেবিল-ঢাকার কোণটা ক্রমাগত একভাবে উড়ে উড়ে পায়ায় ধাক্কা খাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে কে যেন চটি পরে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।…অনেকক্ষণ জেগেছি আমি।…তোমারই হাওয়া খেতে খেতে সময়ের জ্ঞান নেই !

নিবেদিতা উঠলেন।

বললেন, শোওগে তুমি, আমি চেয়ারটা আর তোমার জামাটা তুলে রেখে যাচ্ছি।

—আরে, জামাটা এখনো রয়েছে ? কী আশ্চর্য ! পিনের খোঁচা লেগে ছিঁড়লো না তো ?

—ছিঁড়ে থাকে তো আপদ গেছে। ওটা তো তোমার সেই কাঁধবড়ো পাঞ্জাবিটা ?

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফিরে এসেছেন নিবেদিতা। অভ্যস্ত পটুতায় এক সেকেণ্ডে চেয়ারটা তুলে, জামাটা খুলে নামিয়ে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

সত্যশরণ বললেন—এখানে এসে তুমি যেন কী রকম বদলে গেছো।

নিবেদিতা হাসলেন—বদলানোই তো উচিত, চেঞ্জ মানে কি তাহলে ? এত টাকা খরচ করে আসার উদ্দেশ্য কি তবে ?

সকালবেলা চায়ের সঙ্গে অনুপানের আয়োজনটা একটু বেশি করা হল, নিমন্ত্রিত অতিথির খাতিরে।

যত্ন করে এটা ওটা তৈরি করলেন নিবেদিতা।

একসময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললেন—তোমার অতিথি আর এসেছে ! কাল ভদ্রতার খাতিরে বললো 'আসবো আসবো' ! আমার শুধু শুধু কর্মভোগ !

—বাঃ সে কি, অত করে বলা হল ! উনি নিজেও তো—এমন কিছু বেলা হয়নি এখনো, আসবেন ঠিক।

—রাত্রে দেখা, বাড়ি বুঝতে পারবেন তো ? আমার তো এখানে রাস্তাটাস্তা গুলিয়ে যায়।

—তোমার কথা বাদ দাও। শুনলে তো, ভদ্রলোক চারবার এসেছেন।…কি কি করলে ?

—হাতী ঘোড়া অনেক কিছু। তোমার যেমন ! সমাজ সংসার ছেড়ে দু-দিন গায়ে হাওয়া লাগাতে এলাম, এখানেও তো যতসব ঝামেলা জোটাচ্ছো।

সত্যশরণ একটু আহত হন।

নিবেদিতা যে সত্যিই বিরক্ত হবেন এটা তিনি মোটেই আশঙ্কা করেননি। লোককে খাওয়াতে টাওয়াতে তো খুবই ভালবাসেন নিবেদিতা।

একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সহসা দেখলেন একটু অনুপম উজ্জ্বল আভায় যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে নিবেদিতার বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখ, দুই হাত কপালে তুলে

কলকণ্ঠে কাকে সংবর্ধনা করছেন—এই যে আসুন! এতক্ষণ ভীষণ নিন্দে করছিলাম আপনার!

নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলেন সত্যশরণ।

ওঃ তাই। এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলেন নিবেদিতা!

সত্যি ভারী সুন্দর লোক যতীশ্বর।

খাওয়া নিয়ে এমন একটা আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়, এ জানা ছিল না নিবেদিতার!

জীবনে অনেক রান্না রেঁধেছেন, অনেক শৌখিন খাবার তৈরি করে করে লোক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন, ভালো রান্নার খ্যাতি যে নিবেদিতার না আছে তা নয়, মামাতো দেওর আর ননদাই তো কত হৈ-চৈ করে আমোদ করে খেয়ে যায় তাঁর বাড়িতে, কিন্তু কই, এমন মার্জিত সভ্য সরস প্রশংসা কে কবে করেছে?

জানে কে?

ওরা সবাই যেন কেমন স্থূল!

যতীশ্বর বলেন—এসেছেন তো চেঞ্জে, এত সব যোগাড়-যন্তর করলেন কি করে বলুন তো?

নিবেদিতা লজ্জিত মুখে বলেন—কি আবার এত যোগাড়-যন্তর দেখলেন আপনি?

—কি যে, তা কি আমিই জানি ছাই? এসবে অনেক কিছু লাগে তাই জানি। তাহলে একটা 'ঘরের কথা' বলি আপনাকে। আমি বরাবর একা-একাই বেরোই, একবার মেজদার সখ হল, সপরিবারে আমার সঙ্গ নেবেন।…বেশ চলো! বেশি কোথাও নয় হাতের গোড়ায় ঘাটশিলায়। আমার এক ছাত্রের বাড়ি আছে, মালি গোছের লোকও পাওয়া যাবে একটা, খুব আনন্দ!… গোছগাছের ধুম দেখে কে! এই স্টোভ আসছে, এই ইকমিক কুকার আসছে, একগাদা বাসনই কিনে ফেললেন মেজদা, কাঁচের অ্যালুমিনিয়ামের এনামেলের! হরেক রকম শিশি বোতল কৌটো।…শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম—মেজদা, করছো কি বলো তো? সারা কলকাতাটা তুলে নিয়ে যেতে চাও নাকি?

মেজদা বললেন—তুই বুঝিস না, মেয়েরা মোটে অগোছ-অবিলি দেখতে পারে না। তোর মেজবৌদির ফর্দ! একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সব সুশৃঙ্খল চাই।

ভাবলাম তা বটে! মেয়েদের ব্যাপার 'বুঝি' এ দাবি করতে পারি না। আর 'একটু এদিক-ওদিক' হলে যে কী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে তাও জানি না। যাক খুব সুশৃঙ্খলে কাটানো যাবে এই আনন্দেই আছি!…প্রথম রাত থেকে শুরু হল শৃঙ্খলার নমুনা!…

আশ্বিনের শেষ, কলকাতায় গরম, বাইরে ঠাণ্ডা পড়েছে কিছু কিছু, বিশেষ রাত্রে। ছেলে দুটোকে শুইয়ে মেজদা বললেন—এদের গায়ে একটা করে চাদর টাদর ঢাকা দিয়ে যাও, ঠাণ্ডা আছে।

মেজবৌদি অবাক হয়ে বললেন—গায়ে দেবার চাদর? সে কোথায় পাব? বাড়তি চাদর তো কিছু আনিনি?…মেজদা বললেন—বেশ করেছো! নিজের শাড়ি ডজন তিনেক এনেছো তো?…বলাই বাহুল্য ভদ্রমহিলা ক্ষেপে উঠলেন—

নিবেদিতা বলেন—শাড়ির খোঁটা দিলে কোন্ ভদ্রমহিলাই বা না ক্ষেপেন?

—হুঁ, তিনি তখন শুরু করলেন—সিমলে পাহাড়ে আসছি না—কি করে জানবো যে লেপকম্বল সুদ্ধু আনা উচিত ছিল! আমি তো তবু বুদ্ধি করে ওদের ছোট সোয়েটারগুলো এনেছি, ভাবলাম ভোরে বেড়াতে যাবে! এত ভেবে, এত গুছিয়ে আনলাম!

আমার সঙ্গে চাদর-টাদর থাকেই দু-একটা বেশি, সে মোহাড়াটা কোনোরকমে মিটলো!…পরদিন ভোরে আবার! কর্তা-গিন্নীতে উচ্চ প্রেমালাপ চলছে দেখে খোঁজ নিলাম, কী ব্যাপার! না, সাবান, টুথপেস্ট, আরশি, চিরুনি আর মেজদার শেভিংসেট্‌টা আসেনি।

—যাঃ এ আপনি বানাচ্ছেন। এসব আবার ভোলে না কি মানুষ?—নিবেদিতা বলেন।

—কী মুশ্‌কিল! বানাবো কেন? মেজবৌদিই কি জানেন না এসব ভুলতে নেই? পাছে কিছু ভুল হয়ে যায় বলে, ছোট যে অ্যাটাচি কেস্‌টায় 'ছিষ্টি' গুছিয়ে নিয়েছিলেন, সেইটাই খালি ভুলে গেছেন।

যাক সে ঝোঁকটাও কাটলো। মেজদা বললেন—এক কাজ করো, দুটো স্টোভই জ্বালা যাক্, আমি চা-টা করে নিচ্ছি, তুমি দু-চারখানা লুচি আলুভাজা করে

ফেলো, খেয়ে দেয়ে বেড়াতে বেরোনো হোক···এসে তখন তাড়াতাড়ি করে সেরে নেওয়া যাবে।···কিচ্ছু না মাংস আর ভাত, কি বলিস যতী?

বললাম 'এনাফ'!···পাশের ঘর থেকে স্টোভ জ্বালার শব্দ শোঁ শোঁ পাচ্ছি, দুটো স্টোভ একসঙ্গে, প্রায় এই সমুদ্র গর্জনের কাছাকাছি, হঠাৎ সে গর্জন ছাপিয়ে সেই—'দাম্পত্য প্রেমালাপ!'···

শুনলাম 'লুচি হবে না? চাকি বেলুন আসেনি?'

খিদে পেলে মেজদার জ্ঞান থাকে না, বিষম চটেছেন তখন, চিৎকার করছেন—দশদিন ধরে কি ঘোড়ার ডিম গোছালে তবে? আমার পকেট তো ফর্সা হয়ে গেল 'হ্যানো চাই' 'ত্যানো চাই'এর জ্বালায়। বিদেশে এসে রান্না খাওয়া করতে হলে একটা চাকি বেলুন চাই এ জ্ঞান নেই?

মহা মুশ্‌কিল! এ জিনিস তো আমার স্যুটকেস হাতড়ে মিলবে না! অগত্যা ছেলেদের জন্যে আনা দু-টিন বিস্কুটের একটিন তক্ষুনি সদ্ব্যবহার করা গেল পাঁচজনে মিলে।···ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। নাটক আরও জমে উঠলো দুপুরবেলা! বেড়িয়ে ফিরে ছেলে দুটো হৈ-চৈ লাগিয়েছে খিদে বলে, মেজদার অবস্থাও তদ্রূপ।···ফেরবার সময় আমাদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আলু পেঁয়াজ আর মাংস নিয়ে এসেছেন কোঁচার কাপড়ে করে···কথা হল আগামী কাল থেকে বাজার করবার জন্যে একটা থলি নিয়ে বেড়াতে বেরোনো হবে।

মেজদা মহোৎসাহে লেগে লাগলেন রান্নায়।

···বৌদি দুটো বঁটি এনেছেন দেখে মহা প্রশংসা।

নিবেদিতা হেসে বললেন—আপনি এত মজা করে বলতে পারেন। বঁটি আবার দুটো কেন? দুজনে কুটনো কুটবেন?

—আহা তা কেন! একটায় ফল কাটা হবে।···কিছুক্ষণ পরেই 'আবার, আবার সেই কামান গর্জন'। তখন আবার ভরা দুপুর! রাত্রের ঠাণ্ডার লেশও নেই। আর পারলাম না, উঠে গিয়ে বললাম—মেজদা, করছো কি? খিদে বাড়াবার এ এক নতুন পদ্ধতি নাকি? কত চেঁচাচ্ছো?

মেজদা বললেন—চেঁচাবো না? তুই বলিস কি? সমস্ত নিজে ঠিকঠাক করে মাংসটা চাপিয়ে যেই গরম মসলা চেয়েছি, তোর বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লো! বলে কিনা—'গরম মসলা! গরম মসলা আবার কে আনতে গেছে!'···শোন, শোন তুই!···

মেজাজ ঠাণ্ডা করতে হেসে বললাম—গরম মসলা না দিলে মাংস রাঁধা চলবে না, এরকম কোনো আইন আছে ? রেঁধেই দেখো না।…

'তেমন রান্না আমি রাঁধি না। ইচ্ছে হয় ও রাঁধুক।' বলে মেজদা গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

—উঃ, সেই রোদ্দুরে গরম মসলার জন্যে যা ছুটোছুটি।

—বলেন কি ? আপনি ছুটলেন ?

—বাঃ, তাছাড়া উপায়। গাঁইয়া দেশ, পাওয়াই যায় না সহজে। মালি ব্যাটা সেই ইস্তক আমাকে সমানে 'গরম মসলা বাবু' বলে ডাকতো।

সত্যশরণ মহানন্দে মিটিমিটি হাসছিলেন এতক্ষণ, এইবার মহোৎসাহে বলে ওঠেন —আর ইনি ? এঁর ব্যবস্থা যদি দেখেন। আপনি মাঝরাত্রে এসে বাঘের দুধ চেয়ে দেখবেন, ঠকাতে পারবেন না।

—থামো তো তুমি—ঝংকার দিয়ে ওঠেন নিবেদিতা—কথার একটু মাত্রা রেখো।

সত্যশরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েও জোর বজায় রাখতে বলেন—বাঃ, মিছে বলেছি কিছু ? ট্রেন থেকে নেমে মাথা ধরার সময় কি হল ?…ব্যাপার কি জানেন মশাই, আমার একটা বিশ্রী ধাত, একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি 'আধকপালে' ধরে বসে আছে, সময় অসময় নেই, হলেই হল। আমার মা বলতেন রক্তচন্দন, বরাবর তাই লাগাই, সেরেও যায়। তাজ্জব বনে গেলাম মশাই, সেদিন দেখি ইনি বাসায় নেমেই রক্তচন্দন ঘষে এনে হাজির।…তখনো ট্রেনের কাপড় বদলানো হয়নি।

…চকচকে দাঁতে আলোর মতো হেসে ওঠেন যতীশ্বর।—যত শুনছি ততই আপনার সৌভাগ্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হচ্ছি, সত্যশরণবাবু।

—ছেলেটার আক্কেল দেখছো ? সেই একখানা চিঠি ঠেকিয়েই ব্যাস্, বাবুর কর্তব্য সারা হয়ে গেছে।

নিবেদিতা হাতের বইখানা মুড়ে চমকে তাকালেন—চিঠি ? কই কে দিলে ?

সত্যশরণ হো হো করে হেসে ওঠেন—তুমি যে সেই 'কাদের সাপ'এর মতো করলে। চিঠি দিলে আবার কে। দিলে না বলেই তো রাগ করছি। বলছি গৌতমবাবুর আক্কেলের কথা।…হয়েছে আর কি, খাওয়া দাওয়ার তো খুব কষ্ট হচ্ছে ? তাতেই রাগ অভিমান হয়েছে বাবুর।

নিবেদিতা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে যান। সত্যশরণের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছেলের আক্কেলের নিন্দে করতেও পারেন না, পারেন না ছেলের পক্ষ অবলম্বন করতে।

স্বামীর মনস্তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারছেন, ছেলের জন্যে মন কেমন করছে। কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ভেবে তাঁর নিজের যা কষ্ট হচ্ছে, সেইটাই, 'রাগ অভিমানে'র নামে ছেলের দিকেই চাপাতে চাইছেন।

আশ্চর্য! এ মন-কেমনটা নিবেদিতার না হয়ে হল সত্যশরণের?

কই, নিবেদিতার এই ক-দিন ক-বার তেমন স্পষ্ট করে মনে পড়েছে গৌতমের কথা? ক-বার মনে পড়েছে কলকাতার কথা?···আনাড়ি ফটিক কি রাঁধছে না রাঁধছে, ঘর সংসার কত অপরিষ্কার করছে, এসব ভেবে তেমন অস্থির হয়েছেন কোনোদিন?···

প্রথমটা অবশ্য ছেলের ওপর তাঁর নিজের অভিমানটাই ছিল প্রবল। জন্মে কক্ষনো কোথাও যাওয়া হয় না, এবারে সত্যশরণের এক বন্ধুর দৌলতে এই বাড়িটা পাওয়া গেল বলেই অত সাধ হয়েছিল নিবেদিতার, স্বামী-পুত্র নিয়ে কাটিয়ে যাবেন কিছুদিন। সেই সাধে বাদ সাধলো ছেলে।

কিন্তু তাই বলে তিনি মা হয়ে সেই অভিমানটাকে বড়ো করে রেখে দেবেন? ছেলের জন্যে মন কেমন করবে না? তাকে কষ্ট অসুবিধের মধ্যে ফেলে রেখে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে থাকবেন?

নিবেদিতার প্রকৃতি তো এরকম হবার কথা নয়।

নিবেদিতাকে মৌন দেখে সত্যশরণ ফের বলেন—ক-দিন হল এসেছি আমরা?

সে কথা মনে আছে নিবেদিতার।

দেখেছেন সেদিন, কী দ্রুতগতিতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে! যেন কোথা দিয়ে ···কোন্ স্বপ্নের ঘোরে।

—এসেছি আজ এই তেইশ দিন।

—এতদিন ফটিকের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে পড়ার বাসনা ঘুচে গেছে বাছাধনের কি বলো?

ছেলের কথাই একটু কইতে চান সত্যশরণ। 'নিন্দাচ্ছলে স্তুতির' মতো।

—তা ভেবো না! সে ছেলে নয় তোমার। ভাঙবে তো মচকাবে না!

অন্য আর একটা জগৎ থেকে এ জগতে নেমে আসেন নিবেদিতা।

সত্যশরণ বললেন—এক কাজ করলে হয় না? ওকে বিশেষ 'ইয়ে' করে একটা চিঠি লিখে দিই, চলে আসুক। ছুটির শেষ ক-টা দিন এখানে কাটিয়ে সকলে মিলে একসঙ্গে—

নিবেদিতা সহসা কঠিন স্বরে রায় দেন—না, আমাদেরই ফেরার চেষ্টা হোক। আর থাকবার দরকার কি?

থতমত খেয়ে যান সত্যশরণ, বুঝতে পারেন না এ কাঠিন্য কার ওপর। স্বামীর ওপর? ছেলের ওপর? কিন্তু কেন? ছেলের ওপর যা রাগ অভিমান হয়েছিল, তার চিহ্ন তো কই এখানে এসে বোঝাই যায়নি। 'দরকার কি', এ কথার অর্থ আছে?

আসবারই বা কি দরকার পড়েছিল তবে?

চেষ্টাচরিত্র করে পুজোর ছুটির সঙ্গে আরো একমাস ছুটি নেবার দরকার কি ছিল?

কিন্তু ভয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না।

আজকাল যেন মাঝে মাঝে নিবেদিতাকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

কিন্তু নিবেদিতা নিজেই কি বুঝতে পারবেন, এ কাঠিন্য তাঁর, নিজেরই ওপর। হঠাৎ কোথায় যেন নিজের একটা ত্রুটি ধরা পড়ে গেছে, এ তারই গ্লানি।

এসে পর্যন্ত তিনিই বা কি এমন অস্থির হয়ে চিঠি লিখেছেন গৌতমকে? প্রবাসী কন্যাকে তো দেনইনি একখানাও।

সত্যশরণের সঙ্গে যতীশ্বরের পরিচয় হবার পর থেকে একটা অলিখিত আইন হয়ে গিয়েছিল, বেড়াতে বেরোবার সময় যতীশ্বর প্রথমে ওঁদের বাড়ি এসে হাজির হবেন, এসে চা খাবেন, অতঃপর তিনজনে একসঙ্গে বেরোনো হবে।

অথচ এটা এমন কিছু ন্যায্য আইন নয়।

যতীশ্বরও যদি সস্ত্রীক হতেন দৃশ্যটা শোভন হত। কিন্তু একটি দম্পতি-যুগলের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বেখাপ্পা নয় কি? যতীশ্বর দু-একদিনের পরই এ ব্যবস্থাকে এড়াতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, পেরে ওঠেন নি। পারেননি ওদেরই আগ্রহাতিশয্যে।

এত আগ্রহ দেখান সত্যশরণ!

কারণটা এই—সংসারী সামাজিক মানুষ সত্যশরণ, পরিচিত পরিবেশ, আপিসের অভ্যস্ত কাজ, সহকর্মীদের সাহচর্য—সব কিছু ছেড়ে এসে, উদভ্রান্ত

কেবলমাত্র স্ত্রীর সান্নিধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেন। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গল্প আলোচনার যা সব পরিচিত বিষয়বস্তু ছিল, এখানে তার অনেক কিছুই নেই। যাও বা আছে, নিবেদিতার যেন তাতে মনের যোগ নেই।...

এমন ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আশীর্বাদের মতো।

হ্যাঁ, সত্যশরণ যতীশ্বরকে আশ্রয় ধরেছেন।

তাঁর আকিঞ্চন এড়ানো শক্ত।

আর নিবেদিতা ?

সে-ই তো এক অদ্ভুত রহস্য!

নিবেদিতা যেন একটা অভাবিত সংশয়ের রূপ ধরে যতীশ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যতীশ্বরের সঙ্গলাভেচ্ছায় সত্যশরণ যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, নিবেদিতা তো তার শতাংশের একাংশ করেন না। বরং অনেক সময় স্বামীর কথার প্রতিবাদই করেন। যতীশ্বরের সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন তুলে, স্বামীকে নিবৃত্ত করবারই প্রয়াস পান। কিন্তু ? সেটাই কি সব ?

যতীশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার চোখে মুখে যে আলো জ্বলে ওঠে, সে কি লক্ষ্যের বাইরে থাকবার মতো ? সত্যশরণের মতো 'উদোমাদা' লোকের চোখে যদিও বা না ঠেকে, যতীশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমানা থেকে কি করে আত্মগোপন করবে সে জিনিস ?

মুখের প্রতিবাদের সঙ্গে চোখের অনুনয়ের ভাষার যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

যতীশ্বর অবাক্ হন, অবিশ্বাস করেন, নিজের ধারণাকে সম্পূর্ণ 'ভুল' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। যতীশ্বরের প্রতি নিবেদিতার অসতর্ক মুগ্ধ-দৃষ্টি সত্যকে ধরা পড়িয়ে দেয়।

অভাবিত সংশয় নিশ্চিত মীমাংসার মূর্তি ধরে বিপন্ন করে তুলতে চায় যতীশ্বরকে।

কিন্তু—একি সম্ভব ?

একি সম্ভব ?

কী অস্বস্তিকর চিন্তা!

ভাবতে ইচ্ছে করে, অথচ ভাবলে লজ্জা করে। নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা

করে। মনে হয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেল নাকি, তা নইলে মনে এমন সন্দেহেরও উদয় হয় ? এমন একটা অসম্ভব অবাস্তব সন্দেহ !

বরং ওদের সঙ্গে যখন ঘোরাফেরা করেন, গল্প করেন, তর্ক করেন, তখন চিন্তাটা এমন পেয়ে বসে না। সন্দেহটা হাস্যকর মনে হয়।

কিন্তু ফিরে এলে ?

একা হলে ?

তখন—তখন আর নিবেদিতার বয়সের মর্যাদা ভালো করে মনে পড়ে না। মনে পড়ে না গৃহিণী নিবেদিতাকে। মনে পড়ে না—এই সেদিন সত্যশরণের সঙ্গে কথায় কথায় বয়সের হিসেবে প্রমাণ হয়ে গেছে, নিবেদিতার চাইতে যতীশ্বর নাকি মাস কয়েকের ছোট।

মনে হয় নিবেদিতাই যেন একটি ছোট মেয়ে মাত্র !

দীর্ঘ অবিবাহিত জীবনে এমন বিপন্ন অবস্থায় কখনো পড়েননি যতীশ্বর ! এমন বিব্রত বোধ করেননি কোনো দিন।

ভাবেন এড়াতে চেষ্টা করবেন, হয় কই ?

দু-বেলা কে যেন লক্ষ আকর্ষণে ওই একটি দিকে টানতে থাকে। না গিয়ে উপায় থাকে না। প্রত্যেক দিন মনে করেন 'আচ্ছা আজই শেষ, তারপর কোনো অজুহাত দেখিয়ে' কিন্তু পরদিনই হয়তো—না গেলেই চলে না ! হয়তো—সেদিন নতুন কোনো একটা জায়গায় যাবার হিড়িক ওঠে। সে দায়িত্ব যেন যতীশ্বরেরই।

সত্যশরণ তো চির নাবালক, যতীশ্বরের সঙ্গে আলাপ না হলে, নেহাত ওই 'জগন্নাথ' ছাড়া 'দ্রষ্টব্য' বলতে আর কিছু দেখা হয়ে উঠতো না কি ওঁদের ? অজানা জায়গায় যাবার কথা উঠলেই যে সত্যশরণের ভাবনার আর শেষ থাকে না।

অথচ ভারী তো জায়গা পুরী !

দ্রষ্টব্য বলতে যা কিছু সবই তো হাতের কাছে ছড়ানো আছে।...দুর্গমও নয়, দুঃসাধ্যও নয় !...

পুরীতে যা সত্যি 'দেখবার জিনিস' সে তো যে কোনো একটা জায়গায় বালির গাদায় বসে পড়লে দেখা যায়। তার জন্যে ছুটোছুটি করবার নেই, হাঁপাহাঁপি করবার নেই, টিকিট কাটতে হয় না, প্রণামী দিতে হয় না।...সেই বিরাট

মহান দেবতার, সময়ের একটু এদিক ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবার ভয় নেই, 'ভোগ' নেই, 'শয়ান' নেই। আছে শুধু অনন্তকালের নিত্য আরতি!

তবু তাঁকে ফেলে দেখতে যেতে হয়—'সিদ্ধ বকুল', 'গৌরাঙ্গের ছেঁড়া কাঁথা'!

না দেখলে লোকে বলবে কি?

গালে হাত দিয়ে 'হাঁ' হয়ে যাবে যে!

* * *

সে সব 'ছেঁড়া কাথা' মঠ মন্দির ইত্যাদির ব্যাপার প্রায় সবই মিটেছে। এখন নিবেদিতার বায়না এতদূর এসে কোণারক না দেখে গেলে জীবনই মিথ্যে।

শুনে সত্যশরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে!

কোণারকের পথে যে ঝোপে-ঝোপে বাঘ আর খোপে-খাপে ডাকাত লুকিয়ে থাকে এবং সুবিধে পেলেই 'ঝুপ' করে ঘাড়ে এসে পড়ে, এ খবর রাখেন না নিবেদিতা?

পুরী এসেছো, বেশ করেছো! জগন্নাথ দেখো, সমুদ্রস্নান করো, দুখানা কটকী শাড়ি হল, দু-পাঁচখানা 'ক্ষেত্তরকাঁসা'র বাসন কেনো, এখানে ওখানে বেড়াও, আবার কি!

ফিরে ফিরতি পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধো, ব্যস্।

তা নয়, একি দুঃসাহসিক সাধ?

এ সব শুনে নিবেদিতা প্রশ্ন করেছেন—সেকাল থেকে একাল অবধি যত লোক 'কোণারক' নামক বিজন অরণ্যের পথে যাত্রা করেছে, তাদের সকলেরই সে যাত্রা বাঘের দাঁতে কিংবা ডাকাতের হাতে 'মহাযাত্রা'য় পরিণত হয়েছে কিনা।

কর্তা-গিন্নীর এই তর্কের মাঝখানে এসে উদয় হলেন যতীশ্বর। হৈ-হৈ করে উঠলেন সত্যশরণ—এই যে ভায়া এসে গেছো! বলি, তুমি তো কালকে—পথের মাঝখানে পটকাটি ফেলে দিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে? এদিকে সে পটকা ফেটে আমার যে জীবন সংশয়!

সরস বাকপটু যতীশ্বরের সঙ্গে বেশ একটু রসালো করে কথা কইবার ইচ্ছেয়, চেষ্টাচরিত্র করে এরকম ঠাট্টা-তামাশা করতে শিখেছেন সত্যশরণ আজকাল।

যতীশ্বর সচকিতে একবার দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা

অনুমান করতে পারেন।—কারণ কোণারকের কথা তিনিই তুলে গেছেন কাল।
যাই হোক সত্যশরণের কথায় তিনি সহাস্যে বলেন—কেন কি হল?
—হল আর কি, সেই কোণারক। কাল থেকে মাথায় ঘুরছে। ঘুম নেই রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে উঠে দেখি ঠায় জানলায় বসে।
নিবেদিতা অপ্রতিভ বিরক্তিতে বলেন—হ্যাঁ মাঝরাতে জানলায় বসেছিলাম কোণারকের চিন্তায়। এমন বাজে বাজে কথা বলো।
—আচ্ছা তবে, খামোকা ঘুম হচ্ছিল না কেন?
—হচ্ছিল না—হচ্ছিল না। তোমার মতো কুম্ভকর্ণ তো সকলে নয় যে, বালিশে মাথা ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে।
যতীশ্বর হেসে বলেন,—তা যেতে বাধাটাই বা কি? ওখানে হোটেলের বহু লোক যাচ্ছে। প্রায় রোজই তো একটা-না-একটা দল তৈরি হচ্ছে।
—যে যায় যাকগে ভায়া, আমার ওসব তেমন সুবিধে মনে হয় না। নাহক্ সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা। আরে বাবা পৃথিবীতে দেখবার জিনিস কত রয়েছে ক-টা দেখছি?
যতীশ্বর মৃদুহাস্যে বলেন—আমারও অবশ্য আপনার সঙ্গে মতের খুব বেশি তফাত নেই, তবে—
তবে? আমার ঘরে হুজুগটি তুলে দিয়ে মজা দেখবার তালেই মত বদলাচ্ছিলে, কেমন? নিজের রসিকতায় নিজেই খুব হাসতে থাকেন সত্যশরণ।
নিবেদিতা যতীশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলেন—খুব তো বলছেন এখন। সেদিন যে বললেন—দু-বার গেছেন কোণারকে?
—এই, দলে পড়ে আর কি।
—ইস তবে যে বলছিলেন—অদ্ভুত ভালো লাগে আপনার?
—বলে ফেলেছিলাম বুঝি? সে এমন কিছু নয়।...আসল কথা কি জানেন—
সত্যশরণ বললেন—ওঃ এবার তোমরা 'আসল কথায়' নামছো? তাহলে তো আগে চায়ের ব্যবস্থাটা করতে হয় গো। গলা ভিজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করাই ভালো।...তর্ক শুরু হলে তো ঘণ্টা কেটে যাবে। তোমার তো তর্ক পেলে আর—
নিবেদিতা বললেন—বেশ, আজ আমি চুপ।
যতীশ্বর সহসা একবার নিবেদিতার মুখের দিকে তাকান। তারপর মৃদু হেসে

শান্ত গলায় বলেন—সেটা সহ্য হবে না।...সমুদ্র যদি হঠাৎ আশ্বাস দেয় 'আচ্ছা চুপ করছি'—সইবে আপনার?

নিবেদিতার মুখটা এক সেকেণ্ডের জন্যে কেমন বিবর্ণ দেখায়, মনে হয় উত্তর যোগাবে না, পরক্ষণেই কিন্তু হেসে উত্তর দেন—ওঃ তার মানে—ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে আমার কথা—সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে তুলনীয় কেমন?

সেটা উনিই ভালো বলবেন—'গর্জনে'র স্বাদটা যিনি বিলক্ষণ পান।...বলে যতীশ্বর সকৌতুকে সত্যশরণের দিকে তাকান।

সত্যশরণ পিঠের গেঞ্জিটা উল্টে তুলে, পিঠটা দেওয়ালে ঘষে চুলকোতে চুলকোতে বলেন—ওসব কথার উত্তর কি আর আমার কাছে আছে রে ভায়া? তুমি হলে প্রফেসর মানুষ, লেকচার করা পেশা, আর ইনি তো—স্রেফ নাটক-নভেল পড়া বিদ্যের জোরেই তোমাকেও হার মানান।...আমি বেচারা তোমাদের অর্ধেক কথার মর্মই বুঝতে পারি না! কী যে হেঁয়ালির ভাষা এখনকার?

নিবেদিতা হঠাৎ কলহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—ওই শুনুন প্রফেসর মশাই, দেখুন! এই এক তিনকেলে বুড়োর হাতে পড়ে জীবনটাই মাটি হল আমার।

সত্যশরণ প্রীতহাস্যে বলেন—আর নিজে যেন একেবারে একালিনী। কোন্ কালে জন্মেছ?

—'সেকেলে' 'একেলে' নির্ণয় করতে কি আর শুধু সাল-তারিখ দেখলেই হয়? ওর আলাদা হিসেব আছে বুঝলে?...কি বলেন প্রফেসর মশাই?

সত্যশরণ হতাশ ভঙ্গিতে বলেন—ওই দেখো ভায়া, আবার হেঁয়ালি! কিন্তু তুমিই বা এত কথা কবে শিখলে, তাও তো ভেবে পাইনে। সমুদ্দুরের খোলা হাওয়ায় মাথাটা যেন আরো বেশি খুলে গেছে তোমার।...মাঝে মাঝে মনে হয় দশ বছর বয়স কমে গেল নাকি!

বাইরের লোকের সামনে কোন্ কথা কতটুকু চালানো যায়, আর কোথায় সীমারেখা টানতে হয় সে জ্ঞান বেচারা সত্যশরণের নেহাতই কম।

নিবেদিতা ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন—হয়েছে, থামো। আর কথা খুঁজে পেলে না।...আসল কথায় আসুন দিকি প্রফেসর মশাই।...কোণারকে যাওয়ার কি হবে? এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যেতে রাজী না হন, আমরাই যাই চলুন। বাঘে খায়, আমাদেরই খাবে।...'বাসে'র ব্যবস্থাটা কি? মাথা পিছু কত করে ভাড়া?

বহু বাক-বিনিময়ের শেষে যাওয়ার ব্যবস্থাই পাকা হয়।

সত্যশরণও অবশ্য শেষ পর্যন্ত যেতে রাজী হন।

যদিও নিবেদিতা খুব জোর তলবে বলেন—কেন তোমার যাওয়ার দরকারটা কি? কেউ তো সাধছে না! না যাবে, নিজেই ঠকবে। আর যদি আমরা বাঘের পেটে যাই, তখন প্রমাণ হবে জিতেছো তুমিই।

সত্যশরণ গম্ভীর ভাবে বলেন—অলক্ষণের কথা নিয়ে বারবার ঠাট্টা করতে নেই।...বেশ ভায়া, ও একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলো। আজ পর্যন্ত তো দেখলাম না কখনো, যেটি ধরবেন, সেটি না করে ছাড়বেন।...আচ্ছা তোমরা কথাটা সম্পূর্ণ পাকা করে ফেলো, আমি একটু ঘুরে আসছি।

নিবেদিতা বলে ওঠেন—কোথায় আবার এখন ঘুরতে যাবে?

—না না, ঘুরে ঘুরে বেড়াতে যাচ্ছি না কোথাও। একটু দোকানে যাব।

—দোকানে? যতীশ্বর বলেন—বেশ তো রাত হয়ে গেছে এখন আবার—কোন্ দোকানে? চলুন আমিও উঠি।

—আরে না না, কোথায় রাত। বোসো না। আমি এই এলাম বলে। যাবো আর আসবো।

—ব্যাপারটা কি?

—এই এখানে এক ব্যাটা উড়ের পানের দোকান আছে, বেড়ে পান সাজে। গোটাকতক নিয়ে এসে জমিয়ে বসি।

হঠাৎ যতীশ্বর বলেন—বৌদির চাইতে ভালো পান সাজে আপনার উড়ে?

'বৌদি' শব্দটা এই প্রথম ব্যবহার করেন যতীশ্বর। সত্যশরণের কানে শব্দটা নতুন ঠেকে কি না কে জানে, তিনি আপন তালেই চটিটা পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন—বলা উচিত নয়, উনি চটে যাবেন। তবে—এ আর এক ধরনের বেশ মজার স্বাদ! কি যে 'গুণ্ডি-মুণ্ডি' দেয় ব্যাটারা!

সত্যশরণ চলে যেতেই নিবেদিতা দ্রুত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন—হঠাৎ নতুন সম্বোধন কেন?

—কই? যতীশ্বর যেন অন্যমনস্ক—ওঃ 'বৌদি' বললাম তাই...ভালোই তো, কথা বলার সুবিধে।

—এতদিন বুঝি সব অসুবিধে পোহাচ্ছিলেন?

—আহা, তা কে বলছে—বাক্‌পটু যতীশ্বরকেও একা একা এভাবে কেমন একটু নার্ভাস দেখায়। সত্যশরণের যদি কোনো বিবেচনা থাকে!

নিবেদিতা অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলেন—নিজেকে একটা সম্বন্ধের সূত্রে বেঁধে ফেলতে না পারলে বুঝি নির্ভয় হতে পারছেন না ?···শুধু বন্ধুত্ব থাকা একেবারে অসম্ভব ?

যতীশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—'অসম্ভব' শব্দটার সত্যিই কোনো অর্থ আছে কি না কে জানে। হয়তো নেই।···কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আপনাদের যে সম্বোধনের ঠিক কিছু সুবিধে নেই। 'মিসেস অমুক' বলতেও খারাপ লাগে।

—নাই-বা কিছু বললেন!

—কেন বিশেষ একটা ডাকে আপত্তি কি আপনার ?

—নাঃ আপত্তি আর কি!

—কথার সুরে তো মনে হচ্ছে যথেষ্ট আপত্তি।···বেশ ওটা বাতিল। বলুন কি বলবো ? 'মিসেস' দিয়ে পরের নামে না চালিয়ে, নিজের নামে 'দেবী' বললেই হয়। কিন্তু আমি তো আপনার নামই জানি না—

—নাম জানেন না! আশ্চর্য!

আশ্চর্যটা অস্ফুট!

কিন্তু কেনই বা এটা এমন আশ্চর্য মনে হল নিবেদিতার! জানাটা কি অবশ্য কর্তব্য ছিল যতীশ্বরের ?

যতীশ্বর বলেন,—নাম জানবার সুবিধে পেলাম কবে ?···উনি তো 'ওগো শুনছো' দিয়েই কাজ সারেন।

—আপনিও তাই 'বৌদি-টৌদি' যা হয় দিয়ে কাজ সারছিলেন, কেমন ? কাজ সারা নিয়ে কথা!

—তাছাড়া আর বেশি দাবি করবার ভরসা পাচ্ছি কোথায় বলুন ?

কথা বলার জন্যেই কথা বলা।

তলোয়ারের ফলকের মাঝখান থেকে পিছলে পড়ে সে কথা, ধারালো আগার কাছ পর্যন্ত যেতে সাহস করে না।

—নাম জানতে চাওয়াটা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ বলে দোষ ধরবেন ?

—জেনে লাভ কি ?

—লাভ লোকসানের হিসেব ছাড়া, আর কোনো কিছু থাকতে নেই ?···ভাবি অনেক সময় কি ধরনের নাম হওয়া সম্ভব আপনার।···মানে আর কি, কি মানায় ? সাহস করে জিগ্যেস করতে পারি না।
—এতে আর সাহসের প্রশ্ন কেন ?···আমার নাম নিবেদিতা!

এলোমেলো বাতাসের কামাই নেই একতিল! উড়ছে কপালের চুল···উড়ছে শাড়ির কোণ!···সমুদ্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু···কল্লোল!
নিচে রাস্তায় সত্যশরণকে আসতে দেখা গেল। ঢিলে-ঢালা চেহারা, গেঞ্জি মাত্র গায়ে।
—কি হে প্রফেসর কাজের কথায় কতদূর এগোলে ?
প্রফেসর উত্তর দেবার আগেই উত্তর দেন নিবেদিতা।
বলেন—সে কথা তো পাকা! আমার ইচ্ছেই শেষ কথা!
—তা আর আমি জানি না! ধরেছো যখন! এই ছোকরাই আমার মাথা খেলো!···আমার ঘরের গিন্নীটিকে, কি বলে যে তোমাদের ওই 'তরুণী' করে ছাড়লো!

* * *

কোণারকে যাওয়ার জন্যে এত তর্ক এত চেষ্টা, সব পড়লো চাপা। বাক্স-বিছানা বাঁধা শুরু হয়ে গেল নিবেদিতাদের।
গৌতমের চিঠি এসেছে, ফটিকের জ্বর, আর স্টোভ জ্বালতে গৌতম নিজে হাত পুড়িয়েছে।···'তোমরা চলে এসো', কি 'আমার কষ্ট হচ্ছে' একথা বলেনি। কলকাতার এটা ওটা খবরের মধ্যে সাধারণ একটা খবর হিসেবেই চালিয়ে দিয়েছে।
কিন্তু তার জন্যে অভিমান মা বাপের সাজে না। 'তোমাদের আমার প্রয়োজন' একথা দূরে থাক, ছেলেরা যদি স্পষ্ট বলে তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই তবু অসময়ে স্থির থাকতে পারে মা-বাপ ?
চিঠিখানা উল্টেপাল্টে বার দুই পড়ে নিবেদিতা মুখ তুলে বললেন—তুমি যে বললে, 'গৌতম যেতে লিখেছে', কই ?
—ওই হল—সত্যশরণ বললেন—ওর নামই ওর বলা! ছেলেটিকে চেনো তো ? মান খুইয়ে বলবে—'তোমরা এসো' ?
—মান খোয়াবার দায়টা সর্বদা আমাদের দিকেই থাকা উচিত, কেমন ?

—কী মুশকিল, তুমি আবার কি 'আলতাবড়ি' বকতে শুরু করলে? ফটুকের জ্বর, ও হাত পুড়িয়ে বসে আছে, শুনে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকতে পারবে?

—কই আর পারছি? যাচ্ছিই তো!

যতীশ্বর আর একবার জানান দিতে এসেছিলেন 'বাসের' ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। পরদিন খুব ভোরে ছাড়বে। প্রায় শেষ রাত্রেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

এসে দেখলেন খোলা স্যুটকেসের সামনে চুপ করে বসে আছেন নিবেদিতা। সত্যশরণ বাড়ি নেই। সদর দরজা, সিঁড়ির দরজা সব খোলা হাঁ হাঁ করছে।

হাসতে হাসতে বলে উঠলেন—কি ব্যাপার! চোরেদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল কেন? মনে হচ্ছে যথাসর্বস্ব তাদের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত।

নিবেদিতা সাড়া পেয়ে ফিরে তাকালেন। মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বললেন—ওঃ আপনি! উনি এইমাত্র বেরোলেন।

দরজা খুলে রাখার কৈফিয়ত এটুকু, ওইতেই সারেন নিবেদিতা। মনে হচ্ছে নিতান্ত ক্লান্ত, বেশি কথা বলার স্পৃহা নেই।

যতীশ্বর এদিক ওদিক তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেন—এ কি, এত সব ছড়িয়েছেন কেন? বাসা বদলাবেন নাকি?

—বাসা নয়, দেশটাই! কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

—ফিরে যাচ্ছেন!······

—হ্যাঁ।

—কবে?

—আজই রাত্রে!

মিনিটখানেক স্তব্ধতা!

যতীশ্বর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন—এত হঠাৎ?

—জীবনে সবই তো একদিন হঠাৎ ঘটে যায়, প্রফেসর মশাই। মৃদু হাসলেন নিবেদিতা।

—কিন্তু কেন?

বুকটা দুর দুর করে যতীশ্বরের। পুরুষের বুক হলেও করে।···সত্যশরণ কি কিছু সন্দেহ করেছেন?

নিবেদিতাকে কোণারকে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে যতীশ্বর কি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন? তাই শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কিন্তু কেন?

—গৌতমের চিঠি এসেছে।…চাকরের অসুখ, নিজে লুচি ভাজতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছ নাকি—

—ওঃ এই কথা।

বুকের স্পন্দন কিছুটা স্বাভাবিক হয় যতীশ্বরের। তার জায়গায় আসে হতাশা। বলেন—তা একেবারে আজকেই। বেশি পুড়িয়েছে নাকি?

—লেখেনি স্পষ্ট করে। কিন্তু—আজ আর কাল। যেতেই যখন হবে, ও নিয়ে আর তর্ক করিনি।

না, মানে বলছিলাম—কোণারক ঘুরে এসে পরশু রাত্রের গাড়িতে যেতে পারতেন।

—সে হয় না।

হঠাৎ বিশেষ ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠেন যতীশ্বর—কেন হয় না? একটা দিনে আর এমন কি এসে যাবে? আপনি যাবেন ভেবে কাল থেকে—

—কি 'কাল থেকে'?

—না, না, সে কিছু নয়। বলছি—একটা দিনের তফাতে কি এসে যাবে?

—এসে যাবে না কিছুই হয়তো। তবুও হয় না।

—একেবারে অসম্ভব?

—একেবারে অসম্ভব। আপনার ওই আলা-ভোলা দাদাটির কাছে সব কিছুতে প্রশ্রয় আছে, নেই শুধু মাতৃস্নেহের ত্রুটির!

* * *

—হয়তো জীবনে আর পুরী আসবেন না?

—আশা করি না।

—পুরীর কথা একেবারেই ভুলে যাবেন হয়তো।

—অসম্ভব কি? মানুষ কি না পারে?…বলেই একটু হেসে ওঠেন নিবেদিতা—একটু ভুল বলেছি, বলা উচিত ছিল—'মেয়েমানুষে কি না পারে?'…যাক আপনি কবে ফিরছেন তাই বলুন।

—কে বলতে পারে আজই কিনা।

নিবেদিতা শঙ্কিত ভাবে বলেন—সে কি?

—কেন গেলে দোষ আছে?

নিবেদিতা শুষ্ক হাস্যে বলেন—দোষের কথা হচ্ছে না। কিন্তু যাবেন কেন? আপনার তো কোনো কারণ আসেনি।

যতীশ্বর চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে স্থির স্বরে বলেন—

—যদি বলি 'এসেছে'।

—নাঃ, আপনি যেন ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠছেন—নিবেদিতা চঞ্চলভাবে উঠে দাঁড়ান, দ্রুতভঙ্গিতে বলেন—না না, সে ভারী বিশ্রী দেখতে লাগবে। আজকেই হঠাৎ যাবেন কেন?

—বারণ করছেন?

—কী মুশকিল, আমার অনুমতি নিয়েই আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে নাকি? আপনিও হঠাৎ আজকে গেলে দেখতে কেমন অদ্ভুত লাগবে মনে হচ্ছে তাই বলছি।

এই পর্যন্ত বলতেই পিছন থেকে সত্যশরণের দরাজ গলার সম্বোধন শোনা যায়—ভায়া এখানে? আর আমি তোমাকে হোটেলে গিয়ে খুঁজে এলাম।

যতীশ্বর সচকিতে বলেন—খুঁজে এলেন? কেন?

—বাঃ, এই নতুন খবরটি দিতে, আবার কি। কাণ্ড শোনোনি?

যতীশ্বর কি উত্তর দিতেন কে জানে, কিন্তু যতীশ্বরকে স্তম্ভিত আর বাকস্ফূর্তি-রহিত করে দিয়ে নিবেদিতা স্বচ্ছন্দে বলে ওঠেন—হয়েছে, তোমার নতুন খবরের বড়াই ঘুচে গেছে।…যতীশ্বরবাবুর অসময়ে আবির্ভাবের কারণ কি শুনবে?…উনি বলতে এসেছেন—কাল আর ওনার কোণারকে যাওয়া হল না, আজকেই রাত্রের ট্রেনে কলকাতা রওনা দিচ্ছেন।

—সে কি!

—আর সে কি! আমিও শুনে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। বলি—কি রে বাবা! এ যেন আমরা নজরবন্দী আসামী, আর উনি গোয়েন্দা পুলিস! আশ্চর্য যোগাযোগ বটে!

সত্যশরণ গায়ের ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে বললেন—তা বেশ হল ভালো! কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি? স্ত্রী পুত্র কিছুই তো কোথাও রেখে আসোনি? কার কি হল?

যতীশ্বর অনেক কষ্টে বলেন—কলেজ বোর্ডের একটা মিটিং আছে কাল। আজই মোটে খবর পেলাম।

নিবেদিতা ঝপ ঝপ করে হাতের কাজ সারতে সারতে বলেন—সাধে কি আর বলে 'ভক্তের বোঝা ভগবান বন'।…একা এই সব লটবহর সামলে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছবে কি করে, সব কিছু গুছিয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠবে কি করে ভেবে

আকুল হচ্ছিলে, ভগবান সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন।...আপনি এক কাজ করুন যতীশ্বরবাবু, ওবেলা আপনার যা কিছু যৎকিঞ্চিৎ মালপত্র আছে নিয়ে এখানে চলে আসুন, এখান থেকে এক সঙ্গেই—

সত্যশরণ সানন্দে সায় দেন—হ্যাঁ হ্যাঁ! ঠিক ঠিক! সেই বেশ হবে।... গিন্নীটি আমার কি রকম চালাক দেখছো তো ভায়া, নিজের সুবিধেটির বেলায় জ্ঞান টনটনে!

সত্যিই ভেবে আকুল হচ্ছিলেন সত্যশরণ।

সেই আকুলতার দায়েই ছুটে গিয়েছিলেন যতীশ্বরের খোঁজে, স্টেশনে তুলে দিতে যাবার কথা বলতে! এ তো আরো ভালো হল!

গিন্নীটির টনটনে জ্ঞানের পরিচয়ে উৎফুল্ল সত্যশরণ যাত্রাকালে নিজে এক অজ্ঞানের মতো প্রস্তাব করে বসেন।

বললেন—টিকিটের টাকা, মালপত্র আর নিবেদিতাকে নিয়ে যতীশ্বর আগে রওনা হয়ে যান, সত্যশরণ বাড়িতে তালা লাগিয়ে তালার চাবিটা মালিকের কে এক আত্মীয় আছেন 'চটক পাহাড়ে', সেখানে পৌঁছে দিয়ে সোজা যাবেন স্টেশনে।

খুবই সোজা হিসেব!

যতীশ্বর অসহায়ভাবে বলেন—সে আত্মীয়ের বাড়ি কোথায়? বুঝিয়ে দিন না, আমি নয় চাবিটা দিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ গাড়িতে—

—আরে না না, সে ঠিক হবে না। আমাদের ব্যবহারের জন্যে ওরা চৌকি, শতরঞ্চি, বালতি, তোলা উনুন অনেক কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিল, তার জন্যে একটু ধন্যবাদ দিয়ে আসি। এমন আকস্মিক যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না। ভেবেছিলাম—ভদ্রলোককে একদিন ডেকে এনে আপ্যায়িত করা যাবে। সে আর হল না।...গাড়ির জন্যে ভেবো না। হেঁটে আমি যাচ্ছি না। একখানা সাইকেল রিক্শা ধরে নিয়ে—তুমি কিন্তু এগিয়ে পড়ো এইবার।...কই গো, নাও চটপট! তোমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে তো তালা লাগাবো!

ইশারায় স্বামীকে একটু আড়ালে ডেকে নিবেদিতা বিপন্নভাবে বলেন—আচ্ছা, তোমার সাধারণ বুদ্ধিটা এত কম কেন বলো তো? এরকম প্রস্তাব করতে গেলে কেন?

সত্যশরণ উদ্বিগ্নভাবে বলেন—কি রকম প্রস্তাব?
—এই, যতীশ্বরবাবুর ঘাড়ে 'নির্জীব' 'সজীব' সবকিছু পোঁটলা-পুঁটলি চাপিয়ে দিয়ে নিজে দিব্যি ঝাড়া হাত-পা হয়ে—
সত্যশরণ একগাল হেসে বলেন—ওঃ, এই কথা! সে তুমি কিছু ভেবো না। প্রফেসর কিছু মনে করবে না। ছেলেটা খুব ভালো!
—'ভালো' হয়ে তো ভদ্রলোকের ভারী সুবিধে হচ্ছে দেখছি! কিন্তু 'ইয়ে' এটা কি দেখতেই বেশ ভালো হবে?...একা আমি ওঁর সঙ্গে গটগট করে চলে যাব—তুমি আলাদা যাবে—বেশ শোভন হবে?
সত্যশরণ হা হা করে হেসে ওঠেন—হরি বলো! এই ভাবনায় অস্থির হচ্ছো? কচি খুকি! বলুক না কেউ কিছু, কার ঘাড়ে ক-টা মাথা?
—বলবার লোক এখানে বসে নেই কেউ।...কিন্তু...ধরো আমিই যদি ওর সঙ্গে পালাই।..
দ্রুত নিশ্বাস পড়তে থাকে নিবেদিতার।...মুখের রঙ অস্বাভাবিক লাল হয়ে ওঠে।
—তা পালিও! তবে, গিয়ে কিন্তু ঠিকানাটা দিও।
কোনো দিকে লক্ষ্যহীন সত্যশরণ আর একদফা হাসতে থাকেন।

*　　　*　　　*

নিবেদিতার মুখ কিন্তু বিরক্তি-কুঞ্চিত হয়েই থাকে।
যেন স্বামীর এই ছেলেমানুষী অবিবেচনায় বিব্রত বোধ করছেন। কিন্তু সেই বিরক্তির ছায়ার তলায় তলায় জ্বলতে থাকে নাকি একটা খুশির আভা! যে আভা বিকশিত হয়ে ওঠে কিশোরী মেয়ের মুখে প্রত্যাশিত সম্ভাবনায়?
বাড়ি থেকে স্টেশনে যাওয়ার পথে পরমায়ু কতটুকুই বা? মোটরে বড়ো জোর মিনিট আষ্টেক!...
কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই কি সমস্ত পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে না?...
'ওলট-পালট' কেন, পৃথিবীটা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, যদি মহাসমুদ্র উন্মাদ আলোড়নে জেগে ওঠে!
আট মিনিট সময় কি কম?

কিংবা হয়তো কমই।
সাহস সঞ্চয় করতেই যে অর্ধেক সময় কেটে যায়।

চলন্ত গাড়ির উত্তাল হাওয়ার মাঝখানে মৃদু নিশ্বাসের মতো ক-টি কথা উচ্চারিত হয়—আমার জীবনে এমন ভয়ংকর মুহূর্ত আর কখনো আসেনি!
ভয়ংকর!
কার পক্ষে ভয়ংকর!
নিবেদিতা যেন সচেতন হয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখেন। গাড়ি বোঝাই হয়ে আছে গৃহস্থালির নানা সরঞ্জামে!…ওই ঘটি বাটি বাক্স বিছানাগুলোর মধ্যে থেকেই কি শক্তি সংগ্রহ করতে চাইছেন নিবেদিতা?
কে জানে কি!
হাসতেই তো দেখা যাচ্ছে তাঁকে।
—'ভয়ংকর' না বলে শোচনীয় বলুন? কর্তাগিন্নী দুজনে মিলে কেমন জব্দটি করা গেল! উঃ, তখন কিন্তু ভারী মজা লাগছিল। আপনি বোধ হয় আমার চালাকি দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন?…একেবারে আপনার যাওয়া পাকা করে নিয়ে তবে আর কাজ!…বলছি আর ভাবছি—এই বুঝি ফাঁস করে দেন, এই বুঝি বলে বসেন—'কই আজই কলকাতায় ফিরছি একথা তো বলতে আসিনি আমি।'…খুব বাঁচিয়েছেন!
যতীশ্বর রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—তখন বলিনি, তখন বাঁচিয়েছি। এখন আর বাঁচাবো না, এখন বলছি—কেন আমাকে দিয়ে বলালেন ওকথা?…বলুন কেন যাবো আমি? নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের স্বাধীনতা হারিয়ে কেন আমার এই অসহায় আত্মসমর্পণ? আমাকে এমন করে টেনে নিয়ে গিয়ে কী লাভ আপনার?
নিবেদিতা জানলার বাইরে তাকিয়ে মুখ না ফিরিয়েই শুকনো গলায় বলেন—বাঃ, লাভ নেই? এই তো দেখছেন কত সুবিধে হল। ভাবলাম—যেতেনই তো দু-চার দিন পরে, না হয় এক সঙ্গেই যাওয়া হোক।…বলেছিলেনও তো একবার যেন—
সহসা স্থির শান্ত ভদ্র অধ্যাপক একটা বেখাপ্পা কাজ করে বসেন।
জানলার দিকে ফেরানো নিবেদিতার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলে বসেন—কেন বলেছিলাম ওকথা, কেন যে, তোমার যাবার সঙ্গে

সঙ্গেই এখানে টেঁকা অসম্ভব হবে মনে হয়েছিল, এ বোঝবার ক্ষমতা কি তোমার নেই, নিবেদিতা ?

কাজটা কি বড়ো বেশি দুঃসাহসিক হল ?

কিন্তু দুঃসাহসিক কিসে ?···

'তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে,
পলকে দেখেছি কতবার ।'

আপন হৃদয়-আলোকে নিবেদিতার হৃদয় কি ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাননি যতীশ্বর ? যে আলো নিবেদিতাই নিজের হাতে জ্বালিয়েছেন।

কেন দুঃসাহসিক ?

যতীশ্বরের নিস্তরঙ্গ কৌমার জীবনে যে জাগিয়েছে এই অজানা অনুভূতির আবেগ, কেন তাকেই সইতে হবে না সেই আবেগের ধাক্কা ?

কিন্তু ওকি, সে আবেগের ধাক্কায় কেঁপে উঠলেন কই নিবেদিতা ? হেসে উঠলেন যে ! আহত অপদস্থ যতীশ্বরকে হাসির ছুরিতে টুকরো টুকরো করে কাটতে কাটতে বলছেন—এ আবার কি ছেলেমানুষী রোগে ধরলো আপনাকে ? মাটি করেছে !

—নিবেদিতা, দোহাই তোমার ! হেসো না এমন করে—

—আরে, আরে, কী কাণ্ড ! না হাসিয়ে ছাড়লেন কই আপনি ?···

আস্তে আস্তে যতীশ্বরের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেন নিবেদিতা।

ছাড়িয়ে নেওয়া ভিন্ন উপায় কি ?

না ছাড়ালে যে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়।

অসতর্ক হয়ে গৃহিণী নিবেদিতার অন্তরালবর্তিনী সত্যিকারের নিবেদিতাকে প্রকাশ করে ফেললে তাঁর নিজেরই যে সব মাটি।···

গৌরব সম্ভ্রম পদমর্যাদা বিশ্বস্ততা !

কিন্তু সত্যিকারের সেই নিবেদিতা কি আর কোথাও কোনোখানে বেঁচে থাকবে এরপর ? বরাবর যে চেতনার আড়াল থেকে সংসারী নিবেদিতাকে দিয়ে এসেছে অফুরন্ত শক্তির যোগান !

হয়তো এর পরে নিবেদিতার রান্নাঘরে আশ্রয় নেবে ঝুলকালি তেল,···হয়তো ভাঁড়ারের শিশি বোতলে পড়বে ধুলোর আস্তরণ···হয়তো নিবেদিতার

বালিশের ওয়াড়ে তেলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে…উদাস অবসাদের অবসরে।…

যে কর্মভার এতদিন নুড়ি পাথরের মতো অনায়াসে ঠেলে এসেছেন নিবেদিতা, হয়তো সেই ভার 'পাহাড়ের ভার' হয়ে উঠবে তাঁর কাছে।

সহসা ফুরিয়ে যাবেন নিবেদিতা!

তবু কিছুই প্রকাশ করা চলবে না। অবগুণ্ঠনখানা সামলাতে হবে প্রাণপণে।

জীবনের যত কিছু চাকচিক্য সবই তো ওই অবগুণ্ঠনের ওপরে জলের রঙ দিয়ে আঁকা।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯—) ॥ জতুগৃহ
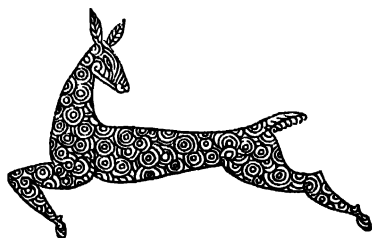
এত রাত্রে এটা কোন্ ট্রেন? এই শীতার্ত বাতাস, অন্ধকার আর ধোঁয়া ধোঁয়া বৃষ্টির মধ্যে যে ট্রেনটা ক্লান্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রাজপুর জংশনের প্ল্যাটফর্মের গায়ে লাগলো?

খুব সম্ভব গঙ্গার ঘাটের দিক থেকেই ট্রেনটা এসেছে। এখনো অদূর গঙ্গার বুকে সেই স্টিমারের চিমনি বাঁশির শব্দ বাজছে, যে স্টিমারটা একদল যাত্রীকে কিছুক্ষণ আগে এপারের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে একটু হালকা হয়ে আর হাঁপ ছেড়ে আবার ওপারে চলে যাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে বয়টা একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। টেবিল চেয়ার বেঞ্চ আর আয়নাটার ওপর ঝট্‌পট্ তোয়ালে চালিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন করে ফেলে। জমাদার এসে রুমের টুকিটাকি আবর্জনা বড়ো ঝাড়ুর এক টানে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ঘাটের ট্রেনটা ছোট হলেও এবং যাত্রীর সংখ্যা কম হলেও ফাস্ট ক্লাসের যাত্রী দু-একজন তার মধ্যে পাওয়াই যায়। হয়তো কাটিহারের কোনো চিনি-কলের মহাজন, অথবা দার্জিলিং-ফেরত কোনো চা-বাগানের সাহেব, এই ধরনের কুলীন শ্রেণীর যাত্রীও থাকেন, শুধু সাঁওতাল কুলির দলই নয়।

কিন্তু যাঁরা এই ক্লান্ত ট্রেন থেকে নেমে ব্যস্তভাবে এসে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিলেন, তাঁদের সঙ্গে চিনিকল অথবা চা-বাগানের কোনো সম্পর্ক নেই।

কুলির মাথায় বাক্স বেডিং চাপিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে তর্ তর্ করে হেঁটে ওয়েটিং রুমে প্রথম এসে ঢুকলেন এক বাঙালী মহিলা। গায়ে কাশ্মীরী পশমে তৈরি একটা মেয়েলী আলস্টার, কানে ইহুদী প্যাটার্নের ছোট ফিরোজার দুল, খোঁপা বিলিতী ধাঁচে ফাঁপানো।

তারপরেই যিনি এসে ঢুকলেন, তাঁরও সঙ্গে কুলি, আর তেমনি বাক্স বেডিঙের বহর। চোখে চশমা, গায়ে শাল, দেশী পরিচ্ছদে ভূষিত এক বাঙালী ভদ্রলোক।
এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা, একই ট্রেনের যাত্রী হয়ে এক ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিয়েছেন। এই মাত্র সম্পর্ক, যদি নেহাতই একে সম্পর্ক বলা যায়। ইনি হয়তো ঘণ্টা দুয়েক, আর উনি হয়তো ঘণ্টা তিনেক পথপ্রান্তের এই শিবিরে ট্রেনের প্রতীক্ষায় থাকবেন, তারপর চলে যাবেন যাঁর যাঁর পথে।
কিন্তু আশ্চর্য, ঘরে ঢোকামাত্র দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে চমকে ওঠেন। তারপরেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকেন! দুজনে যেন অপ্রস্তুত ও লজ্জিত, বিরক্ত ও বিড়ম্বিত, এবং ভীতও বলতে পারা যায়। যেন কাঠগড়া থেকে পালানো ফেরারী আসামীর মতো বহুদিন পরে এবং নতুন করে এক আদালত ঘরের মধ্যে দুজনে এসে পড়েছেন। মাধুরী রায়ের আলস্টারে কুচি কুচি জলের ফোঁটা নিঃশব্দে চিক্-চিক্ করে। শতদল দত্ত জলে-ভেজা চশমার কাঁচ মুছে নিতে ভুলে যায়।
এটা রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুম, আদালত ঘর নয়, জজ নেই, উকিল নেই, সাক্ষী নেই, সারি সারি সাজানো কতকগুলি নিষ্পলক লোকচক্ষু নেই। প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে, স্বীকৃতি বা স্বাক্ষর আদায় করতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। তবু এই নিভৃত সান্নিধ্যই দুজনের কাছে বড়ো বেশি দুঃসহ বলে মনে হয়। সরে পড়তে পারলে ভালো, সরে যাওয়াই উচিত।
শতদল দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাক দেয়—কুলি।
মাধুরীর জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে এই বেঞ্চের ওপর। শতদলের জিনিসপত্র স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে ঐ টেবিলটার ওপর।
এক্ষুনি জিনিসপত্র আবার কুলির মাথায় চাপিয়ে শতদল দত্তকে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়, তা সে জানে না। শুধু অদৃশ্য লজ্জায় অভিভূত এই ওয়েটিং রুম ছেড়ে অন্য কোথাও হয়তো ঐ মুসাফিরখানায়, যেখানে এরকম আলো নেই, আসবাবও নেই, কিন্তু অতীতের এক অস্পষ্ট ছায়াকে এত জীবন্ত মূর্তিতে মুখোমুখি দেখে বিব্রত হওয়ার শঙ্কাও সেখানে নেই। শতদলের ডাকে সাড়া দিয়ে কুলিদের কেউ এল না, এল ওয়েটিং রুমের বয়।
—হুজুর।
বয়কে উত্তর দিতে হবে। শতদল দত্ত আর একবার দরজা পর্যন্ত পায়চারি

করে এগিয়ে যায়, বাইরে উঁকি দিয়ে তাকায়, গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপ্টা মুখে এসে লাগে। ফিরে এসে আবার টেবিলটার পাশে দাঁড়ায়, যেন নিজেরই চিন্তার ভেতর পায়চারি করে উত্তর সন্ধান করছে শতদল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে থাকে শতদল, বোধহয় এতক্ষণে নিজের মনের অবস্থাটার ওপরেই রাগ করে একটু শক্ত হয়ে উঠেছে শতদলের মন। এভাবে বিচলিত হওয়ার কোনো অর্থ নেই। ওয়েটিং রুমের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রীকে দেখে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ, একটা অর্থহীন দুর্বলতার কাছে হার মেনে যাওয়া।

বয় বলে—ফরমাইশ করুন হুজুর।

বেশ স্বচ্ছন্দভাবে শতদল দত্ত টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে, স্বচ্ছন্দস্বরে বয়কে নির্দেশ দেয়—চা নিয়ে এসো।

আর ওদিকে, কাশ্মীরী পশমের আল্স্টার গা থেকে নামিয়ে মাধুরী রায় বেঞ্চের ওপর রাখে। জিনিসপত্রগুলি সরিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে বেঞ্চের উপরেই চুপ করে বসে থাকে মাধুরী।

শতদল দত্ত আর মাধুরী রায়। দুজন ট্রেন-যাত্রী মাত্র, রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুমে বসে থাকে ট্রেনের প্রতীক্ষায়। এ ছাড়া দুজনের মধ্যে আজ আর কোনো সম্পর্ক নেই।

শুধু আজ নয়, আজ প্রায় পাঁচ বছর হল দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার আগে ছিল, সেও প্রায় একটানা সাত বছর ধরে। সম্পর্কের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল প্রায় বারো বছর অতীতে, যে অতীতে মাধুরী মিত্র নামে দেখতে বড়ো সুন্দর এক অনূঢ়া তরুণী শতদলের মেজবৌদির বান্ধবী মাত্র ছিল। আর স্থানটা ছিল ঘাটশিলা, সময়টা ফাল্গুন, মধুক্রমের বীথিকায় যখন সৌরভের উৎসব জাগে। তারই মধ্যে আকস্মিক এক অপরাহ্ণের আলোকে শুধু একটি বেড়াতে যাবার ঘটনা, তাই তো মাধুরী মিত্রের সঙ্গে শতদল দত্তের সম্পর্কের আরম্ভ।

এক বছরের পরিচয়েই দুজনে দুজনকে যে খুবই বেশি ভালবেসেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে ভালবাসা আইনমতো রেজিস্টারীও করা হয়, তার মধ্যেও কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু বিয়ের পর সাতটি বছর পার হতে না হতে মাধুরী দত্ত আর শতদল দত্তের মধ্যে সে ভালবাসার জোর আর রইল না। তাই আবার দুজনেই স্বেচ্ছায় এবং আইনমতো আদালতের শরণ নিল, রেজিস্টারী করা সম্পর্ক বাতিল করে দিয়ে দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

কে জানে কেমন করে যেন দুজনেই বুঝতে পেরেছিল, ভালবাসার জোর আর নেই। মনের দিক থেকে দুজনে দুজনের কাছে যখন পর হয়েই গেল, তখন লোকচক্ষুর সম্মুখে অনর্থক আর থিয়েটারের স্বামী-স্ত্রীর মতো দাম্পত্যের অভিনয় না করে দুজনেই দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিল। কেউ কাউকে বাধা দিল না।

ফাল্গুনের মধুক্রমের সৌরভে যে প্রেমের আবির্ভাব, মাত্র সাতটি নতুন ফাল্গুনও তার গায়ে সহ্য হল না। এত জোর ভালবাসার পর বিয়ে, তবু বিয়ের পর ভালবাসার জোরটুকুই ভেঙে যায় কি করে ?

তাও দুজনেই বাস্তব আর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখেই বুঝেছিল, একদিন এই ঘরে বসে একমনে বই পড়ছিল মাধুরী, আর ও-ঘরে একা একা নিজের হাতেই কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বাক্সে ভরছিল শতদল। এক সপ্তাহের জন্য ভুবনেশ্বর থাকতে হবে, প্রত্নবিভাগের একটা সার্ভে তদারকের জন্য। শতদলের রওনা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাধুরী একবার এসে চোখের দেখা দিয়েও যেতে পারলো না। সেদিনই মনে হয়েছিল শতদলের, এই যে পৌষের প্রভাতে জানালা দিয়ে এত আলো ঘরের ভেতর এসে লুটিয়ে পড়েছে, নিতান্ত অর্থহীন, কোনো প্রয়োজন ছিল না।

পৌষের সকাল বেলাটাই শুধু অন্যায় করেনি। সেই বছরেই চৈত্রের একটা রবিবারের বিকালবেলাও ভয়ানক এক বিদ্রূপ করে দিয়ে চলে গেল। প্রতি রবিবারের মতো সাজসজ্জা করে বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল মাধুরী, এই ঘরে। আর পাশের ঘরেই গভীর মনোযোগ দিয়ে চালুক্য স্টাইলের মন্দিরভিত্তির একটা স্কেচ আঁকছিল শতদল, বেড়াতে যাবার কথা একটি বারের জন্যও তার মনে হল না, কোনো সাড়াও দিল না। জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মাধুরীর শুধু মনে হয়েছিল, অস্তাচলের মেঘে এই ক্ষণিকের রক্তিমা নিতান্ত অর্থহীন, একটা অলক্ষুণে ইঙ্গিত, আর একটু পরেই তো সব অন্ধকারে কালো হয়ে যাবে। এই ছলনার খেলা আর না করে সূর্যটা যদি একটু তাড়াতাড়ি ডুবে যায়, তবেই ভালো।

একে একে এইরকম আরও সব লক্ষণ দেখে দুজনেই বুঝেছিল, ভালবাসা আর নেই। কিংবা ভালবাসা ছিল না বলেই এই সব লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিচ্ছিল। কে জানে কোন্‌টা সত্য। হয়তো চেষ্টা করলে দুজনেই জানতে পারতো, হয়তো জেনেছিল, হয়তো জানেনি। যাই হোক, জানা না-জানার

ব্যাপারে কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না। হয় দুজনে জেনে-শুনেই চুপ করেছিল, কিংবা দুজনে ইচ্ছে করেই জানতে চেষ্টা করেনি।

এও হতে পারে, দুজনেই নতুন করে আর গোপন করে কোনো নতুন জনের ভালবাসায় পড়েছিল। তাই মিথ্যে হয়ে গেল ঘাটশিলার পুরাতন ফাল্গুন। কিংবা সে ফাল্গুন নিজেই সৌরভহীন হয়ে গিয়েছিল, তারই বেদনা দুজনকেই নিয়ে চলে গেল দুই দিকে। দুই নতুন হৃদয়ের সন্ধানে। দুই নতুন মিলন লগ্নের কাছে। একজনকে হেমন্তের একটি সন্ধ্যায়, আর একজনকে একটি আষাঢ়ের পূর্ণিমায়। যা-ই হোক না কেন দুজনের মনে সেজন্য আর কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না। হয় দুজনেই ভুল করেছে, নয় দুজনেই ঠিক করেছে। কেউ কাউকে দোষ দিতে পারে না।

কেউ কাউকে দোষ দেয়ওনি। ঘৃণা করেছিল, মার্জনা করতে পারেনি দুজনেই দুজনকে। কিন্তু মনে মনে। যেদিন এই মনের বিদ্রোহ মনের মধ্যে পুষে রাখা দুঃসহ হয়ে উঠলো, সেদিন থেকেই সরে গেল দুজনেই। কেউ কাউকে অভিযোগ আর অপবাদের আঘাত না দিয়ে ভদ্রভাবে আদালতে আবেদন করে সাত বছরের সম্পর্ক নিঃশেষে চুকিয়ে দিল।

ছাড়াছাড়ি হবার পর, বছর দেড়েক যেতে না যেতেই শতদল শুনেছিল মাধুরী বিয়ে করেছে অনাদি রায় নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে। মাধুরী খবরের কাগজে পড়েছিল, অধ্যাপক শতদল দত্ত আবার বিয়ে করেছে। নব জীবনসঙ্গিনীর নাম সুধাকণা, কলকাতারই একটা সেলাই স্কুলের টিচার।

এই নতুন দুটি বিয়েও নিশ্চয় দেখে-শুনে ভালবাসার বিয়ে। যে যাই বলুক, মাধুরী জানে, অনাদি রায়কে স্বামীরূপে পেয়ে সে সুখী হয়েছে। বাইরে থেকে না জেনে শুনে যে যতই আজে-বাজে মন্তব্য করুক না কেন, শতদলও জানে, সুধাকে পেয়ে সে সুখী হয়েছে।

তাই আজ রাজপুর জংশনের এই ওয়েটিং রুমে, এই শীতার্ত মাঝরাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্তগুলির মধ্যে মাধুরী রায় আর শতদল দত্তের মনে অতীতের সম্পর্ক নিয়ে এসব প্রশ্ন আর গবেষণা নিতান্ত অবান্তর ও নিষ্প্রয়োজন। সে ইতিহাস ভালো ভাবেই শেষ করে দিয়ে ওরা দুজনেই একেবারে ভিন্ন হয়ে গেছে।

অতীতের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা ছিল বর্তমানের।

এমন করে একটা অযথা সময়ে পথের প্রতীক্ষা-ঘরে সেই দুটি জীবনেরই মুখো-

মুখি সান্নিধ্য দেখা দেয় কেন, যারা প্রতিদিন মুখোমুখি হবার অধিকার আদালতের সাহায্যে পাঁচ বছর আগেই নিয়ম-বহির্ভূত করে দিয়েছে? এই আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন একটা বিদ্রূপের ষড়যন্ত্র। যেমন অবৈধ তেমনি দুঃসহ। ঘটনাটাকে তাই যেন মন থেকে কেউ ক্ষমা করতে পারে না, অথচ আপত্তি বা প্রতিবাদ করারও কোনো যুক্তি নেই। মাধুরী না হয়ে আর শতদল না হয়ে, যদি অন্য কোনো মহিলা যাত্রী ও পুরুষ যাত্রী এভাবে এই প্রতীক্ষাগৃহে আজ আশ্রয় নিত, এ ধরনের অস্বস্তি নিশ্চয় কারও হত না। বরং স্বাভাবিকভাবে দু-একটা সাধারণ সৌজন্যের ভাষায় দুজনের পক্ষে আলাপ করাও সম্ভব হত, কিন্তু মাধুরী রায় আর শতদল দত্ত, পরস্ত্রী আর পর-পুরুষ, কোনো সম্পর্ক নেই, তবু মনভরা সংকোচ আর অস্বস্তি নিয়ে ওয়েটিং রুমের নিঃশব্দতার মধ্যে অসহায়ভাবে যেন বন্দী হয়ে বসে থাকে।

এই নির্বাক স্তব্ধতার মধ্যে শতদল দত্তের ভারাক্রান্ত মন কখন্ যে ডুবে গিয়েছিল, তন্দ্রার মতো একটা ক্লান্তিহরণ আরামে দুই চোখ বুঁজে গিয়েছিল, তা সে বুঝতে পারেনি। চোখ খুলে প্রথমেই বুঝতে পারে এটা ওয়েটিং রুম। একটু দূরেই বেঞ্চের ওপর বসে রয়েছে মাধুরী, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে, কৌতূহলহীন এবং নিষ্পলক এক জোড়া চোখের দৃষ্টি।

শতদল কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল না। তার দু-চোখে একটা লুকিয়ে দেখার কৌতূহল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কী এমন দেখবার আছে? আর, নতুন করেই বা দেখবার কী আছে?

আছে। এমন মেঘ রঙের ক্রেপের শাড়ি তো কোনো দিন পরেনি মাধুরী, আর শাড়ির আঁচল এত লম্বা করে লুটিয়ে দিতেও মাধুরীকে কোনোদিন দেখেনি শতদল। বেড়াতে যাবার সময় মাধুরীকে অবশ্য পরতে হত তাঁতের শাড়ি, ঢাকাই বা অন্য কিছু, চলতে গেলে যে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফিস্-ফিস্ করে অদ্ভুত এক শব্দের স্বর শিহরিত হয়। আঁচলে অবশ্যই মাখতে হত এক ফোঁটা হাস্নুা-হানার আরক। এইভাবে স্বর ও সৌরভ হয়ে শতদলের পাশে চলতে হত মাধুরীকে, নইলে শতদলের মন তৃপ্ত হত না। সেই স্বর আর সৌরভের কোনো অবশেষ আজ আর নেই। মাধুরী বসে আছে এক নতুন শিল্পীর রুচি দিয়ে গড়া মূর্তির মতো, নতুন রঙে আর সাজে। এমন করে সন্তর্পণে অনধিকারীর অবৈধ লোভ নিয়ে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে কোনোদিন মাধুরীকে দেখেনি শতদল। আজ দেখতে পায়, আর বুঝতে পারে, এ মূর্তি সে মূর্তি নয়। একেবারে

নতুন, আর বেশ একটু কঠিন, ইঞ্জিনিয়ার অনাদি রায়ের স্ত্রী মাধুরী রায়।

অবান্তর চিন্তা আর অস্বস্তি থেকে মুক্তি পায় শতদল। বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই এবার নিজের প্রয়োজনের দিকে মন দেয়। ছোট একটা চামড়ার বাক্স খুলে তোয়ালে আর সাবান বের করে। হোল্ড-অল খুলে তার ভেতর থেকে একটা বালিশ আর চাদর বের করে অর্ধশয়ান লম্বা চেয়ারটার ওপর রাখে।

শতদলের দিকে তাকিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না মাধুরীর। সে তাকিয়ে ছিল আয়নায় প্রতিবিম্বিত শতদলের দিকে। ইচ্ছে করে নয়, আয়নাতে শতদলকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, তাই। এবং ইচ্ছে না থাকলেও লুকিয়ে দেখার এই লোভটুকু সামলাতে পারেনি মাধুরী।

আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় মাধুরী, বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই কাজ করছে শতদল। হাতঘড়িটাকে খুলে নিয়ে একবার দম দিয়ে টেবিলের ওপর রাখে শতদল। মাধুরী বুঝতে পারে, এ ঘড়িটা সেই ঘড়ি নয়। ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও কালো চামড়ার, যে কালো রঙ কোনোদিন পছন্দ করতো না মাধুরী। এবং মাধুরীর রুচির সম্মান রেখে শতদলও কোনোদিন কালো ব্যাণ্ড পরতো না। আরও চোখে পড়ে আংটিটা নতুন। বালিশের ঢাকার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে, রঙীন আর ফুল-তোলা। মাধুরীই তো জানে, সাদা প্লেন আর মোলায়েম কাপড়ের ঢাকা ছাড়া এসব রঙ-চঙ আর কাজ-করা জিনিস কোনোদিন পছন্দ করতো না শতদল। বুঝতে পারে মাধুরী, সেলাই স্কুলের টিচার সুধা ভালো করেই সব বদলে দিয়েছে।

সাবান আর তোয়ালে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে গেল শতদল। আয়নার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার টেবিলের ওপরেই ছড়ানো শতদলের সংসার সামগ্রীর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে মাধুরী। এতক্ষণে যেন প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে।

কিন্তু এমন কি বহুমূল্য নিদর্শন দেখার জন্য মাধুরীর দৃষ্টি টেবিলের ওপর ছড়ানো জিনিসপত্রের মধ্যে তল্লাশি করে ফিরছে, তা বোধহয় সে নিজেই জানে না। অনেকক্ষণ ধরে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছুই দেখলো মাধুরী। সবই নতুন, পাঁচ বছর আগের কোনো স্মৃতির চিহ্ন নেই। এমন কৌতূহল না হওয়াই উচিত ছিল।

এখন একবার আয়নার দিকে তাকালে দেখতে পেত মাধুরী, তুলির টানের

মতো আঁকা তার ভুরু দুটি যেন একটা ঈর্ষার স্পর্শে শিউরে সর্পিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আয়নার দিকে নয়, দৃষ্টি ছিল সোজাসুজি শতদলের জিনিসপত্রগুলির দিকে। তিন তিনটে বাক্স খোলা পড়ে রয়েছে, ঘড়ি মনিব্যাগ ও চশমাটা টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে, ছাই রঙের ফ্লানেলের জামাটা ব্র্যাকেটে দুলছে, জামার বুকে সোনার বোতামগুলো আলোয় চিক্‌চিক্ করছে। নিঃসম্পর্কিতা এক মহিলার সম্মুখে সব ফেলে রেখে চলে গেছে ভদ্রলোক। চুরি হয়ে যেতে পারে, সে ভয় নেই। ভদ্রলোকের এই বিশ্বাসটা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অস্বাভাবিক মাধুরীর আচরণ। এত সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে শতদলের জিনিসপত্র পাহারা দিতে তো কেউ তাকে বলেনি।

শতদল আবার ঘরে ঢুকতেই মাধুরী আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

হোক না আয়নার বুকে আঁকা একটা ছবি, চোখ পড়া মাত্র এইবার একটু স্পষ্ট করেই বুঝতে পারে মাধুরী শতদল আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সেলাই স্কুলের মাস্টারনীর এদিকে বিশেষ কিছু যত্ন নেই বলেই মনে হয়। হোক্ না পাঁচ বছরের অদেখা, আজও দেখে বুঝতে পারে মাধুরী, খুব খিদে না পেলে শতদলের মুখটা ঠিক এরকম শুক্‌নো দেখাতো না।

মাধুরীর অনুমান মিথ্যে নয়। শতদল একটা টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবারের বাটিগুলি বের করে টেবিলের ওপর রাখে। খেতে বসে। হাত তুলতে গিয়েই কি ভেবে হাত নামিয়ে নেয়। ঘরের কোণে রাখা জলের কুঁজোটার দিকে একটা গেলাস হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় শতদল।

দৃশ্যটা মাধুরীর চোখে আঘাতের মতো বেজে উঠবে, কল্পনা করতে পারেনি মাধুরী এবং তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেল। আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা শতদলের দিকে হঠাৎ ক্ষুব্ধভাবে তাকায় মাধুরী। মাধুরীর এই চকিত গ্রীবাভঙ্গি, মৃদু ভ্রূকুটি আর চোখের কুপিত দৃষ্টি তার এতক্ষণের গম্ভীরতার চেয়ে ঢের বেশি স্বাভাবিক দেখায়।

মাধুরী বলে—ওকি হচ্ছে!

আকস্মিক প্রশ্নে শতদল একটু চমকে উঠেই মাধুরীর দিকে তাকায়।

মাধুরী আবার বলে—একটা মুখের কথা বললে এমন ভয়ানক দোষের কিছু হত না।

শতদলের গম্ভীর মুখ হঠাৎ সুস্মিত হয়ে ওঠে। হেসে হেসেই বলে—না, দোষ আর কি?

মাধুরী উঠে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে আসে। নিস্তব্ধ ওয়েটিং রুমের দুঃসহ মুহূর্ত-গুলির পেষণ থেকে যেন তার আত্মা এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে। শতদলের স্বচ্ছন্দ হাসির শব্দে মাধুরীর ক্লিষ্ট মনের গাম্ভীর্য ভেঙে যায়। শতদলের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে হাসিমুখেই বলে—তুমি বসো।

এটা ওয়েটিং রুম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ি নয়, আর মাধুরীর জন্মদিনের উৎসবও আজ নয়, যেদিন উৎসবের সোরগোল থেকে শতদলকে এমনই একটি ঘরের নিভৃতে নিয়ে গিয়ে সেই যে জীবনে-প্রথম নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করে খাইয়েছিল মাধুরী।

কুঁজো থেকে জল ঢেলে নিয়ে গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে খাবারগুলো একটা ডিশের মধ্যে সাজিয়ে দিতে থাকে মাধুরী। কাঁচের গেলাসে আর মাধুরীর হাতের চুড়িতে অসাবধানে সংঘাত লাগে, শব্দ হয়, পাঁচ বছর আগের নিস্তব্ধ অতীত সে নিক্কণে যেন চমকে জেগে ওঠে। দুই ট্রেনযাত্রী নয়, দেখে মনে হবে, ওরা এই সংসারেই দুটি সহজীবনযাত্রী, আর সে জীবনযাত্রায় কোনো খুঁত আছে বলে তো মনে হয় না। মাধুরীর হাতের আঙুলগুলি দেখতে যদিও একটু রোগা রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু খাবারগুলোকে সেই রকমই আলগোছে যেন চিমটি দিয়ে তোলে, সেই পুরনো অভ্যাস। শতদলের পাশেই প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী; নিস্তব্ধ ঘরে মাধুরীর ছোট ছোট নিশ্বাসের শব্দ মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট করেই শোনা যায়। আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে গিয়ে শতদলের একটা হাতের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করে না মাধুরী। এমন বিসদৃশ বা অপার্থিব কিছু নয় যে লক্ষ্য করতেই হবে।

—সবই দেখছি বাজারের তৈরি খাবার।

মাধুরীর কথার মধ্যে একটা আপত্তির আভাস ছিল যার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না শতদলের। বাজারের তৈরি খাবারের বিরুদ্ধে, মাধুরীর মনে যে চিরন্তন বিদ্রোহ আছে, তা শতদলের অজানা নয়। তাই যেন দোষ স্খালনের মতোই স্বরে সংকুচিত ভাবে বলে—হ্যাঁ, কাটিহার বাজারে এগুলি কিনেছিলাম।

মাধুরী—যাচ্ছ কোথায়?

শতদল—কলকাতায়।

মাধুরী—তুমি কি এখন কলকাতাতেই…

শতদল—হ্যাঁ। তুমি?

এ কথাগুলি না উঠলেই বোধহয় ভালো ছিল। হাত কাঁপে, কাজের স্বাচ্ছন্দ্য

হারায় মাধুরী। শতদলের প্রশ্নে যেন নিজের পরিচয় হঠাৎ মনে পড়ে গেছে মাধুরীর। কুণ্ঠিতভাবে একটু তফাতে সরে গিয়ে মৃদুস্বরে মাধুরী উত্তর দেয় —রাজগীর।

এই পর্যন্ত এসেই প্রসঙ্গ ফুরিয়ে যায়। আর প্রশ্ন করে জানবার মতো কিছু নেই। একজন কলকাতা, আর একজন রাজগীর। দুজন দুই ট্রেনযাত্রী মাত্র। আর এক ট্রেন নয়, এক লাইনের ট্রেনও নয়। তবু মনের ভুলে দুজনে যেন বড়ো কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল। যা নিতান্ত অশোভন ও অসঙ্গত, তাই দিয়ে দুজনে যেন কিছুক্ষণের মতো বড়ো শোভন ও সঙ্গত হয়ে উঠেছিল।

হয়তো কোনো প্রসঙ্গ না পেয়েই শতদল বলে—তোমাকে তাহলে বোধহয় পাটনার ট্রেন ধরতে হবে ?

—হ্যাঁ। তুমি খেয়ে নাও।

এক নিশ্বাসে যেন জোর করে কোনোমতে কথাগুলি উচ্চারণ করেই মাধুরী সরে যায়। সত্যিই তো, পাটনার ট্রেনেই তাকে চলে যেতে হবে, চিরকালের মতো এখানে বসে থাকবার জন্য সে আসেনি। নিজের হাতঘড়িটার দিকে সন্ত্রস্ত-ভাবে তাকায় মাধুরী ; তারপর আবার আগের মতোই বেঞ্চটার ওপর গিয়ে বসে থাকে।

খাবারগুলো শতদলের সম্মুখে সাজানো, কাঁচের গেলাসের গায়ে বিদ্যুতের বাতিটার আলো ঝল্‌কায়, জলটাকে তরল আগুনের মতো মনে হয়। আবার বোধহয় অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়েছে শতদল। কিন্তু বড়ো শ্লেষ, বড়ো জ্বালা আছে এ লজ্জায়। সব জেনেশুনেও হঠাৎ লোভের ভুলে এক প্রহেলিকার মায়াকে কেন সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল শতদল ?

ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শতদল, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে লম্বা চেয়ারের ওপর শুয়ে পড়ে, সিগারেট ধরায়।

খাবার খেতে পারলো না শতদল। কিন্তু কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর আজ নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনো চেষ্টাও করে না শতদল।

ওয়েটিং রুম আবার ওয়েটিং রুম হয়ে ওঠে। দুই সম্পর্কহীন অনাত্মীয়, ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনের দুই যাত্রী প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুনছে। কিন্তু ট্রেনও আসে না, তৃতীয় কোনো যাত্রীও এসে এ ঘরে প্রবেশ করে না। আসে বয়, হাতে একটি ট্রে, তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো। একটি টি-পট, একটি দুধের জার, একটি চিনির পাত্র, কিন্তু পেয়ালা দুটি।

টেবিলের ওপর ট্রে-সমেত চায়ের সরঞ্জাম রেখে বয় চলে যায়। তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি তুলে চায়ের পাত্রের দিকে একবার তাকায় শতদল, কিন্তু পরমুহূর্তে যেন একটা বাধা পেয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

ট্রের ওপর দুটি চায়ের পেয়ালা। কী ভয়ানক বিদ্রূপ! কোন্ বুদ্ধিতে বয়টা দুটি পেয়ালা দিয়ে গেল কে জানে? সে-রকম কোনো নির্দেশ বয়কে তো দেয়নি শতদল।

চা-খাওয়াও আর সম্ভব হল না।

সোজাসুজি তাকিয়ে না দেখুক, মাধুরী যেন মনের চোখ দিয়ে স্পষ্ট করেই দেখতে পাচ্ছে, খাবার স্পর্শ করছে না শতদল, চা-ও বোধহয় খাবে না। বয়টা এক নম্বরের মুখ্যু, চা-টা যদি ঢেলে দিয়ে যেত, তবে ভদ্রলোক বোধহয় এরকম কুণ্ঠিত হয়ে বসে থাকতেন না। কিন্তু এত কুণ্ঠাই বা কেন? এ তো আর মধুপুর নয়, সেজমামার বাসা নয়, আর সেই বড়োদিনের ছুটির দিনটাও নয়।

বড়োদিনের ছুটিতে মধুপুরে সেজমামার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল শতদল আর মাধুরী। প্রথম দিনেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল, অনেকটা এই রকমই নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতো চা না খেয়ে সারা সকালটা বাগানের একটা ঝাউগাছের নিচে চেয়ার টেনে বসে রইল শতদল। প্রতিবাদের কারণ, বাড়িতে এত লোক থাকতে, আর সবার ওপর মাধুরী থাকতেও শতদলকে চা দিয়ে গেল বাড়ির চাকর! রহস্যটা যখন ধরা পড়লো, বাড়িসুদ্ধ লোক লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি বকুনি খেল মাধুরী। মামীমা বকলেন, সেজমামা বকলেন, এমন কি স্বল্পভাষী বড়দাও বললেন—যখন জানিস যে তুই নিজের হাতে চা না এনে দিলে শতদল অসন্তুষ্ট হয়, তখন…।

কিন্তু এটা ওয়েটিং রুম, সেজমামার বাসা নয়। অভিমানী স্বামীর মতো এমন মুখ ঘুরিয়ে এভাবে পড়ে থাকা আজ আর শতদলকে একটুও মানায় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এই বিসদৃশ অভিমানের আবেদন ওয়েটিং রুমের অন্তর যেন স্পর্শ করে। রঙ্গমঞ্চের একটি নাটকাঙ্কের দৃশ্যের মতো কৃত্রিম হয়েও ঘটনাটা সত্যি সত্যি মান-অভিমানের দাবি নিয়েই যেন প্রাণময় হয়ে ওঠে। মাধুরীকে এখানে ধমক দিয়ে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার কেউ নেই, তবু নিজের মনের গভীরেই কান পেতে যেন শুনতে পেয়েছে মাধুরী, কেউ যেন তাকে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

—খাবার খাচ্ছ না কেন ?

বড়ো কোমল ও মৃদু অনুনয়ের সুর ছিল মাধুরীর কথায়।

শতদল শান্তভাবেই উত্তর দেয়—না, এত রাত্রে এসব আর খাব না।

—তবে শুধু চা খাও।

—হ্যাঁ, চা অবশ্য খেতে পারি।...তুমি খাবে না ?

মাধুরীর মুখে হাসির ছায়া পড়ে।—আমার কি চা খাবার কথা ছিল ?

শতদল লজ্জিতভাবে হাসে—তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু বয়টা যখন ভুল করে দুটো পেয়ালা দিয়েই গেছে, তখন...।

—তখন এক পেয়ালা চা আমার খাওয়াই উচিত, এই তো ?

মাধুরীর কথার মধ্যে কোনো সংকোচ বা জড়তা ছিল না। হেসে হেসেই কথা-গুলি বলতে পারে মাধুরী।

শতদল বলে—আমি তো তাই মনে করি, বয়টার আর কি দোষ বলো ?

মাধুরী—না, বয়কে আর দোষ দিয়ে লাভ কি ?

দুজনেই হঠাৎ আবার মতো গম্ভীর হয়। সত্যিই তো, বয়কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মাধুরীর কথাগুলির মধ্যে কেমন একটা আক্ষেপের সুর যেন মিশে আছে। বোধহয় বলতে চায় মাধুরী, বয়টার দোষ হবে কেন, দোষ অদৃষ্টের, নইলে আজ পাঁচ বছর পরে এমন একটা বিশ্রী রাত্রিতে একটা ওয়েটিং রুমের চক্রান্তে পড়ে কেন এভাবে অপ্রস্তুত হতে হবে ?

হয় আর চুপ করে বসে থাকার শক্তি ছিল না, নয় ইচ্ছে করেই এই ওয়েটিং রুমের চক্রান্তে আত্মসমর্পণ করতে চায় মাধুরী। উঠে দাঁড়ায়, টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে, চা তৈরি করে সেই হাতে, সেই নিপুণতা দিয়ে, স্বচ্ছন্দে ও সাগ্রহে।

শতদলও ওঠে, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে টেবিলের কাছে নিজের চেয়ারের পাশে রাখে। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলে—বোসো।

মাধুরী আপত্তি করে না। আপত্তি করার মতো জেদগুলিকে আর মনের মধ্যে খুঁজে পায় না। রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুম দুই অনাত্মীয় নরনারীর মনের ভুলে ধীরে ধীরে দম্পতির নিভৃত নীড়ের মতো আবেগময় হয়ে উঠছে বুঝতে পারলেও কেউ আর ঘটনাকে বাধা দিতে চায় না। শতদলের পাশের চেয়ারে বসে পড়ে মাধুরী।

চায়ে চুমুক দিয়েই একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে শতদল। শুধু চায়ের আস্বাদ

পেয়ে নিশ্চয় নয়, চায়ের সঙ্গে মাধুরীর হাতের স্পর্শ মিশেছে, তৃষ্ণা মিটে যাবারই কথা।

শতদল হাসিমুখে বলে—তোমার গম্ভীর ভাব দেখে সত্যিই এতক্ষণ বড়ো অস্বস্তি হচ্ছিল।

মাধুরীও হাসে—তোমার তো অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু আমার যা হচ্ছিল তা আমিই জানি।

শতদল—ভয় করছিল বুঝি ?

মাধবী মাথা হেঁট করে—হঁ্যা।

শতদল—ছি, ভয় করবার কি আছে ?

হাসতে হাসতে আলাপটা শুরু হয়েও শেষদিকে কথাগুলি কেমন এক করুণতার ভারে নুয়ে পড়ে। মাধুরীর কথাগুলি বেদনাময় স্বীকৃতির মতো, শতদলের কথায় আশ্বাসের নিবিড়তা। সে অতীত অতীত হয়েই গেছে, আজ আর ভয় করবার কি আছে ?

মানুষ মরে যাবার পর যেমন তার বিষয় মমতা দিয়ে বিচার করা সহজ হয়ে ওঠে, আর ভুলগুলি ভুলে গিয়ে গুণগুলিকে বড়ো করে ভাবতে ইচ্ছে করে, শতদল আর মাধুরী বোধহয় তেমনি করেই আজ তাদের মৃত অতীতকে মমতা দিয়ে বিচার করতে পারছে। অতীতের সেই ভয় ঘৃণা ও সংশয়ের ইতিহাস যেন নিজেরই জ্বালায় ভস্ম হয়ে সংসারের বাতাসে হারিয়ে গেছে চিরতরে। আজ শুধু মনে হয়, সেই অতীত যেন সাত বছরের একটি রাত্রির আকাশ, তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল ছোটবড়ো কত তারা, কত মধুর ও স্নিগ্ধ তার আভা। সে আকাশ একেবারে হারিয়ে গেছে, ভাবতে কষ্ট হয়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, ফিরে পেতে ইচ্ছে করে বৈকি।

শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধুরী বলে—তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ।

শতদল—তুমি নিজে কি হয়েছ ?

চায়ের পেয়ালাটা হাতে ধরে রেখেছিল মাধুরী। সেই দিকে তাকিয়ে শতদল অনুযোগের সুরে বলে—আঙুলগুলোর এ দশা হয়েছে কেন ?

মাধুরী—কি হয়েছে ?

শতদল—কী বিশ্রী রকমের সরু সরু হয়ে গেছে।

মাধুরী লজ্জিতভাবে হাসে, আঁচলের আড়ালে হাতটা লুকিয়ে ফেলতে চায়।

কিন্তু শতদল যেন এক দুঃসহ লোভের ভুলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মাধুরীর হাতটা টেনে নিয়ে দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে। মাধুরী আপত্তি করে না।

এ বড়ো অদ্ভুত! সাত বছরের যে জীবনকুঞ্জ একেবারে বাতিল হয়ে গেছে, আজ এতদিন পরে দেখা যায়, বাতিল হয়ে গেছে তার কাঁটাগুলি, ছায়াগুলি নয়।

একটা অজানা সত্য যেন আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে শতদল। মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার মুখটি কিন্তু সেই রকমই আছে মাধুরী, একটুও বদলায়নি।

বদলে গেছে সব, শুধু সেই মুখটি বদলায়নি। বাতিল হয়ে গেছে সব, শুধু সেই ভালবাসার মুখটি বাতিল হয়ে যায়নি। এও কি সম্ভব? হয় চোখের ছলনা, নয় কল্পনার বিভ্রম।

সব ছলনা ও বিভ্রমকে মিথ্যে করে দিয়ে মাধুরীর সারা মুখে নিবিড় এক লজ্জার ছায়া রক্তাভ হয়ে ওঠে। প্রথম ভালবাসার সম্ভাষণে চঞ্চলিতচিত অনূঢ়া মেয়ের মুখের মতো নয়, বাসরকক্ষে প্রথম পরিচিত ব্রীড়ানত বধূর মুখের মতো নয়, দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীর সম্মুখে সমাদরধন্য নারীর মুখের মতোই।

প্রণয়কুঞ্জ নয়, বাসরকক্ষ নয়, দম্পতির গৃহনিভৃতি নয়, রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুম। তবু শতদল আর মাধুরী, দুই ট্রেনযাত্রী বসেছিল পাশাপাশি যেন এই-ভাবেই তারা চিরকালের সংসারে সহযাত্রী হয়ে আছে। কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি।

চা খাওয়া শেষ হয়। মাধুরী জিজ্ঞাসা করে—কাকাবাবু এখন কোথায় আছেন?

শতদল—তিনি দেরাদুনে বাড়ি করেছেন এবং সেখানেই আছেন।

মাধুরী—পুঁটি কোথায়?

শতদল—পুঁটির বিয়ে হয়ে গেছে, সেই রমেশের সঙ্গে। দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে ভালোই একটা চাকরি পেয়েছে রমেশ।

মাধুরীর হাতটা বড়ো শক্ত করে ধরেছিল শতদল। যেন পাঁচ বছর অতীতের এক পলাতক মায়াকে অনেক সন্ধানের পর এতদিনে কাছে পেয়েছে। দু-হাত দিয়ে ধরে রেখেছে তার একটি হাত, যেন আবার হারিয়ে না যায়।

—তুমি বিশ্বাস করো, মাধুরী?

—কি?

—তোমাকে আমি ভুলিনি, ভুলতে পারা যায় না।

—বিশ্বাস না করার কি আছে, চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

—কিন্তু তুমি ?

—কি ?

—তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে ?

দু-চোখ বন্ধ করে মাধুরী, যেন চারিদিকের বাস্তব সংসারের লোকচক্ষুগুলিকে অন্ধ করে দিয়ে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। মাধুরীর মাথাটা শতদলের বুকের কাছে একটু ঝুঁকে পড়ে, দু-চোখের কোণে ছোট ছোট মুক্তা কণিকার মতো দুটি সজলতার বিন্দু জেগে ওঠে।

দু-হাতে জড়িয়ে মাধুরীর মাথাটা বুকের ওপর টেনে নেয় শতদল—বলতেই হবে মাধুরী, আমি না শুনে ছাড়ব না।

ঝং···ঝন্ ঝন্ ঝন্, ওয়েটিং রুমের বাইরের জগতে একটা অতি বাস্তব ও অতি নিষ্ঠুর শব্দ হঠাৎ চমকে উঠে। প্রবল উল্লাসে বেজে উঠেছে লোহার ঘণ্টা, আসছে আর একটি ট্রেন।

ছটফট করে উঠল মাধুরী, যেন একটা আগুনের জ্বালা হঠাৎ দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছে। শতদলের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় মাধুরী। বাইরে শীতার্ত রাত্রির স্তব্ধতা চমকে দিয়ে বাইরে ঘণ্টা বাজছিল। ঘরের ভেতর আয়নাটাও কাঁপছিল। যেন দুটি জীবনের হঠাৎ দুঃসাহসের ব্যভিচার সইতে না পেয়ে ওয়েটিং রুমটাই আর্তনাদ করে উঠেছে। ধুলিয়ান আপ প্যাসেঞ্জার এসে পড়েছে, ছুটোছুটির সাড়া পড়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

—এই ট্রেনেই তো ওর আসবার কথা!

উদ্‌ভ্রান্তের মতো কথাগুলি বলতে বলতে দরজার দিকে ছুটে যায় মাধুরী।

তৃতীয় যাত্রী এসে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করে। মাধুরীকে দেখতে পেয়েই তার সারা মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে, যেন এই অমাবৃত রাত্রির পথে এক নিঃসঙ্গ পথিক এতক্ষণ পরে পান্থশালার আলোক দেখতে পেয়েছে, মাধুরী রায়ের স্বামী অনাদি রায়।

মাধুরীর মুখও পুলকিত হয়ে উঠেছে দেখা যায়, কিন্তু তখনো যেন একটু বিষণ্ণতার স্পর্শ লেগেছিল, ক্লান্ত প্রদীপের আলোকে যেমন একটু ধোঁয়ার ভাব থাকে।

অনাদি রায় কিন্তু তাতেই বিচলিত হয়ে ওঠেন। মাধুরীর কাছে এগিয়ে এসে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন—শরীর-টরীর ভালো বোধ করছ তো ?

—হ্যাঁ, ভালোই আছি।

—অনেকক্ষণ ধরে একা একা বসে থাকতে হয়েছে, না?

—হ্যাঁ।

—কি করবো বলো? ট্রেনগুলো যে রকম বেটাইমে চলছে, নইলে দু-ঘণ্টা আগেই পৌঁছে যেতাম।

অনাদি রায় উৎসাহের সঙ্গে একটা বেডিং খুলতে আরম্ভ করলেন। মাধুরী আপত্তি করে—থাক, ওসব খোলামেলা করে লাভ নেই।

—তুমি একটু শুয়ে নাও মাধুরী, রেস্ট পেলে শরীর ভালো বোধ করবে।

—থাক, আর কতক্ষণই বা।

অনাদি রায়ের উৎসাহ কিন্তু থামে না। বাক্স খুলে একটা মির্জাপুরী আলোয়ান বের করলেন। দু-ভাঁজ করে নিজের হাতেই আলোয়ানটা মাধুরীর গায়ে পরিপাটি করে জড়িয়ে দিলেন।

এতক্ষণে চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে বসে দেখছিল শতদল। একটা প্রহসনের দৃশ্য, নির্মম ও অশোভন। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকা আর সম্ভব হল না। একবার ব্যস্ত হয়ে উঠে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে শতদল। ফিরে এসে জিনিসপত্রগুলি একবার অকারণ টানাটানি করে। যেন একটা শাস্তির কারাগারে বন্দী হয়ে শতদলের অন্তরাত্মা ছটফট করছে। যেন পৃথিবী হাতড়ে একটু সুস্থির হবার মতো ঠাঁই অথবা পালিয়ে যাবার পথ খুঁজতে থাকে শতদল।

দৃশ্যটা সত্যিই সহ্য হয় না। মির্জাপুরী আলোয়ান যেন মাধুরীর পথশ্রমক্লান্ত আত্মাকে শত অনুরাগে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। অনাদি রায় নামে এই সজ্জন, কী গরবে গরীয়ান হয়ে বসে আছেন হাসিমুখে। আর ঐ মাধুরী, যেন পৌরাণিক কিংবদন্তীর এক বিচিত্রচিত্তা নায়িকা, মালা হাতে নিয়ে স্বয়ংবরার অভিনয় মাত্র করে, কিন্তু বরমাল্য দান করে তারি গলায় যে তাকে লুঠ করে রথে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে। এক ভগ্নবাহু প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো সকল পরাভবের দীনতা নিয়ে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে শতদল। সহ্য করতে কষ্ট হয়।

চলে গেলেই তো হয়, কেন বসে বসে এত জ্বালা সহ্য করে শতদল?

যেতে পারে না একটি লোভের জন্য। মাধুরীর কাছ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা শুনে যাবার লোভ।

কিন্তু এই লোভই বা কেন?

মাধুরী তাকে ভুলতে পারেনি মাত্র এইটুকু সত্য মাধুরীর মুখ থেকে শুনে যেতে পারলেই জয়ীর আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারবে শতদল।

কিন্তু এ আবার কোন্ ধরনের আনন্দ?

তা জানে না শতদল। শুধু মাধুরীর পরম শান্ত ছায়াটার দিকে অপলক চোখে তৃষ্ণার্তের মতো তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে শতদলের চোখ, ইহজীবনে এই উত্তর শুনে যাবার আর সুযোগ হবে কিনা সন্দেহ।

না, শতদলের চোখের ভুল নয়। দেখতে পেয়েছে শতদল, মাধুরী তার আলস্টার তুলে নিয়ে গায়ে দিচ্ছে। সত্যই পালিয়ে যাবার জন্য হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মাধুরীর ছায়া।

অনাদি রায়ও ঘড়ি দেখলেন, বোধহয় ট্রেনের টাইম হয়ে এসেছে। কুলিও পৌঁছে গেল, হাঁ, পাটনার ট্রেন আসছে।

স্বামী অনাদি রায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল স্ত্রী মাধুরী রায়। কুলিরা চটপট জিনিসপত্রগুলি মাথায় চাপিয়ে দাঁড়াল। রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুমকে শূন্য করে দিয়ে ওরা এখনই চলে যাবে। শতদলের মনে হয়, মাধুরী যেন যাবার আগে এক জতুগৃহের গায়ে আগুনের জ্বালা লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ছে।

সাত বছরের আকাশ কি নিতান্ত মিথ্যা? তাকে কি ভুলতে পারা যায়? ছিন্ন করে দিলেই কি ভিন্ন করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর আর দিয়ে যাবে না মাধুরী, উত্তর দেবার আর কোনো সুযোগও নেই।

কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে এই ঘরের দুয়ার পার হয়ে চলে গেলেই ভালো ছিল, কিন্তু ঠিক সেভাবে চলে যেতে পারল না মাধুরী। কুলিরা চলে গেল, অনাদি রায়ও দরজা পার হয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, কিন্তু দরজার কাছ পর্যন্ত এসেই মাধুরী যেন চরম অন্তর্ধানের আগে এই জতুগৃহের জন্যই একটা অলীক মমতার টানে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। শতদলের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই বিদায় চায়—যাই।

শতদল হাসতে চেষ্টা করেও পারল না। অনেকগুলি অভিমান আর দাবি একসঙ্গে এলোমেলোভাবে তার কথায় ফুটে উঠতে চাইছিল। কিন্তু এত কথা বলার সময় আর কই? শুধু সেই একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে চরম জানা জেনে নিতে চায় শতদল।

—যাচ্ছ, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিয়ে গেলে না, মাধুরী?

হাসি মুছে যায়, বিস্মিতভাবেই তাকিয়ে মাধুরী প্রশ্ন করে—কিসের প্রশ্ন ?
শতদল বলে—সত্যি, ভুলে গেছ ?
উত্তর দেয় না মাধুরী। ভুলেই গেছে বোধহয়। সাত বছরের ইতিহাস ভুলতে পারেনি যে মাধুরী, সাত মিনিট আগের কথা সে কি ভুলে গেল ? এরই মধ্যে বিশ্বসংসারের নিয়মগুলি কি এমনই উল্টে গেল যে, সব ভুলে যেতে হবে! বুঝতে পারে না শতদল।
মাধুরী বলে—যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।
শতদলের সব কৌতূহলের লোভ যেন একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙে যায়। এতক্ষণে মনে পড়ে, মাধুরীর যে একটি পরম গন্তব্য আছে, আর দেরি করতে পারে না মাধুরী। সাত বছর দেরি করিয়ে দিয়েছে শতদল, এখন আর এক মুহূর্তও মাধুরীকে দেরি করিয়ে দেবার কোনো অধিকার নেই শতদলের।
শতদল বিমর্ষভাবে বলে—বুঝেছি, তুমি উত্তর দেবে না।
মাধুরী শান্তভাবেই বলে—উত্তর দেওয়া উচিত নয়।
শতদল—কেন ?
মাধুরী—বড়ো অন্যায় প্রশ্ন।
—বুঝেছি! ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শতদল। তার অন্তরাত্মাই যেন কিসের মোহে অবুঝ হয়ে আছে, যার জন্যে বারবার শুধু বুঝতে হচ্ছে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে শতদল এক নিশ্বাসে এবং একটু রূঢ়ভাবেই বলে—যাও, কিন্তু এরকম একটা তামাশা করে যাবার কোনো দরকার ছিল না।
বড়ো তিক্ত শতদলের কথাগুলি। মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীর মুখটাও কঠিন হয়ে ওঠে, ভুরু দুটো যেন একটা কঠোর ভঙ্গিতে কুঁকড়ে থাকে। চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকে মাধুরী। কিন্তু পরমুহূর্তে আগের মতোই আবার হাস্যময় হয়ে ওঠে। বোধহয় সেই অলীক মমতার টানেই এই জতুগৃহকে যাবার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে নয়, একটু বুঝিয়ে দিয়ে আর হাসিয়ে দিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মাধুরী।
হাতঘড়ির দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে মাধুরী বলে—একবার সুধাকে নিয়ে রাজগীরে বেড়াতে এসো।
শতদল অপ্রস্তুতভাবে তাকায়—কেন ?
মাধুরী হাসে—কেন আবার কি। ইচ্ছা করলেই তো আসতে পারো।
—তারপর ?

—তারপর তোমরা দুজনে যেদিন বিদায় নেবে, আমি এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব।

—কেন ?

—আমাকে একটা তামাশা দেখাবার সুযোগ তোমরাও পাবে, এইমাত্র।

—তাতে তোমার লাভ ?

মাধুরী হেসে ফেলে—লাভ কিছু নয়, হয়তো তোমার মতো এই রকমই মিছি-মিছি রাগ করে কতগুলি বাজে কথা বলব।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে শতদল। তারপরেই বলে ওঠে—বুঝলাম।

তারপরেই হেসে ফেলে শতদল।

কথাটা বেশ জোরে উচ্চারণ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসতে থাকে শতদল। এই বাজে কথার অভিমান আর দাবিগুলি যেন নিজের স্বরূপ এতক্ষণে চিনতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠছে। এতক্ষণে সত্যিই বুঝতে পেরেছে শতদল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে থাকে এবং দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে শতদল, মাধুরী চলে গেল।

জতুগৃহে আর আগুনের স্ফুলিঙ্গ লাগল না, লাগল উচ্চহাসির প্রতিধ্বনি। রাজপুর জংশনেরও যেন সুপ্তি ভেঙে গেল। আরেকটি আগন্তুক ট্রেনের নতুন হর্ষ আর কলরব ছড়িয়ে পড়ছে রাজপুর স্টেশনে। কলকাতার ট্রেনও এসে পড়েছে। এদিকের প্ল্যাটফর্মে নয়, ঐ দিকের প্ল্যাটফর্মে। কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে শতদল দত্তও ব্যস্তভাবে চলে যায়।

দু-দিকের ট্রেন দু-দিকে চলে যাবে। রাজপুর জংশনের শেষরাত্রি ক্ষণিক কলরবের পর নীরব হয়ে যাবে। এরই মধ্যে এক প্রতীক্ষা-গৃহের নিভৃতে দুই ট্রেনযাত্রীর সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে কী যে পরীক্ষা হয়ে গেল, তার সাক্ষ্য আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু এখনও আছে, যদিও দেখে কিছু বোঝা যায় না। ওয়েটিং রুমের টেবিলের ওপর একটি ট্রে, তার ওপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা। কোথা থেকে কারা দুজন এসে আর পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে এই দুটি শূন্য পেয়ালা, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়তো একেবারে ঐদিকে।

বিমল মিত্র (১৯১২—) ॥ জেনানা সংবাদ
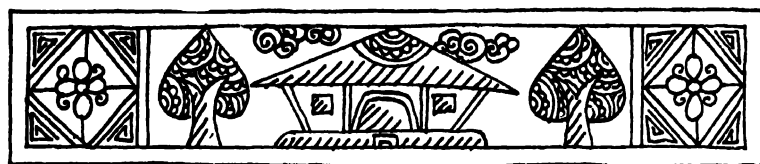
বিলাসপুরের ডি-এল-এস আপিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়ল না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী-বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠল—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালক ছেলে-মেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউ-এর ভারটা নেবে তাহলে কে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কয়েক-শো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হল।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসাবে আইডিয়াল—

টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনী বললে—আমি তাহলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তাহলে আমাকে আর আজীবন আইবুড়ো থাকতে হত না।

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা বড়ো ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধি। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানত। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন—আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনোও অজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোনো

ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে। মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দু-পাশে মাথা হেলাতে লাগলেন, বললেন—তাহলে বলুন না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালীর মেয়ের কঙ্কাল—

পাশের হলে বিলিয়ার্ড খেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইনস্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন্-এর ওপর দু-দলের ব্যাড্মিণ্টন খেলা চলছে। আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু ঠুংরি গান চলছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধহয় ওয়ান্-ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে মেল লেট। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিম্‌টিমে ল্যাম্প জ্বেলে সার সার টাঙাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না মেটা সাহেব—

গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই, রেললাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পিতে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিক পুরুষ হিসাবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশন মাস্টার মুদেলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও মনসুন্ আরম্ভ হল না। গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তাছাড়া বেঙ্গলে কখনও যাইনি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিঙে এসেছিলেন।

টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনী বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী…

গুরুবচন মেটা বললেন—তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জব্বলপুরে—

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে তো ভুল করবেন।

মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালী নই, বাংলাদেশে কখনও যাইনি—তারপর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ।

টি-আই বুড়ো অ্যান্টনী বললে—তা হোক, বলুন মিঃ মেটা—ভেরি ইন্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশ-বাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায় তো তার প্রধান কারণ হল বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনোও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং—তারপর—বুড়ো অ্যান্টনী বললে।

—তবে একটা কন্‌ডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করব তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তাতে আপনারা রাজী?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরিজি প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন্-এ ব্যাডমিণ্টন খেলা বন্ধ হল। কাট্‌নি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধহয় পেণ্ড্রারোডের পথে অমরকাণ্টাক-এর রেঞ্জ-এর গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পুবদিকে প্ল্যাট-ফর্মের ওপর গোস রোটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্ল্যাটফর্মের তালগাছ প্রমাণ লাইট পোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা—আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড়ো বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়িটাতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালি ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গোণ্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেকশনগুলো—আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌গত্‌পুরি, বীণা, এলাহাবাদ-কাটনি—সাতদিন আটদিন পরে হয়তো একদিন বাড়িই

এলাম—আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ্ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালি ব্যবসা আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন্ শিকার করা··

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার জুটো ডবল ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা ষোলো বোরের··· আর আমি নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর ফিফ্‌টি—

যখনি 'টুরে' যেতাম···ওটা থাকত সঙ্গে। কখনো কখনো তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেবে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হল বাঘ মারবার জন্যে —উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোন্ সেখানে এসে মিশেছে— জায়গাটা বাঘশিকারের পক্ষে আইডিয়াল···বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি আর পেণ্ড্রারোডের ঠাকুরসাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী—আর আমাদের 'কিল'টা রাখা হল ঠিক···

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ-গল্প তো শিকার-কাহিনী নয়, এ গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি—

আপনারা হাওবাগ্ স্টেশন দেখেছেন? স্টেশনে নেবে সোজা পুবদিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোটবড়ো অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে রাস্তাটা বি-এন্-আর-এর মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ-মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি···এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজীরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও তল্লাটে অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়িটাতে, আর তারপর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আর-এর জমিতে বিরাট বিরাট আম গাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিমমুখো 'শিয়ালকোট্ লজ'—আমার বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলায় একটা ভাড়াটে এল। এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে

বড়ো একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূর। তারপর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্শা করতে হবে। বাজার হাট সব দূরে। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরও অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি। কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাসের ভাড়া অ্যাডভান্সও দিয়ে দিলে। রসিদটার নিচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়ি ভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব সিং বললেন—স্বামীনাথন! বাঙালী 'সারনেম' তো অমন শুনিনি কখনও ব্রাদার—

সোনপার সাহেব বললে—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফের কাছে শুনেছি……বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেমগুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফের একজন কাজিন ছিল তার সারনেম 'গোস'—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—তা কেন—স্বামীনাথন কখনও কোনো বাঙালীর সারনেম হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনী বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েন্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হল তার হাজব্যাণ্ডের সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে। বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান—

টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনী বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং……আমাদের ডি-এল-এস্ আপিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তারপর—তারপর—

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হল—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম—কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা। একদিন কি দু-দিন মাত্র দেখেছি ওদের—তা-ও দু-এক সেকেণ্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয়নি। আর আমি বাড়িতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে যে-দশ-বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক একদিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান

ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাংলা গান—গানটার একটা লাইন আমার এখনও মনে আছে—পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের গান—'হে নাটারাজ—হে নাটারাজ'—

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইতো—বেঙ্গলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তারপর শুনুন—গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন—

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকে' গেছি কী কিনতে, দেখা হল সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়িতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ, এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাঁইবাসায় থাকতো ওর বাবা, ফরেস্ট অফিসার; ওর নাম মিস্ সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রইস্ আদমী—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও লোফারটা কে—

আমি বললাম—ও ওর হাজব্যাণ্ড—হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কি না ওর সঙ্গে বিয়ে হল—

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারী খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারী বলিয়ে, কইয়ে, নাচিয়ে, গাইয়ে। চাঁইবাসার সব লোকই নাকি ভালবাসতো সুজাতাকে। বড়োলোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ি, কখনও শেরোয়ানী, কখনও সালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দ হাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হল ভারী মজবুত গড়নের মেয়ে। ভঁইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা—

সেদিন প্রথম আলাপ হল।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্শনে, মহাসামুন্দের পি-ডব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তারপর সেটা নিয়ে গোণ্ডিয়া জংশনে ঝ্যারোগেঞ্জ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার শিয়ালকোট-

লজে এসে পৌছুলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগে আগে বুল-ডিয়ারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে আসছি। ক-দিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম— দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরি রাখে। গিয়েই এক গ্লাস খেয়ে নেব—

কিন্তু গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ সিল্কের বুটিদার শাড়ি ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার একজোড়া পা-ঢাকা চটি—দু-দিকের ব্লাউজের নিচে থেকে সমস্ত হাত দুটো মাস্‌ল্‌ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত্‌ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তারপরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরলে—বললে —ষোলো বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি—বললাম—তিন রকমই আছে যখন যেটা সুবিধে, সেইটে নিই—মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—

হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড—আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন—

—তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুলওয়ারাটা মেরেছি বাক্-শটে, যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনও এল-জি, কখনও এস-জি—

—অ্যাল্‌ফা ম্যাক্স—?

—তারও কোনোও ঠিক নেই—তবে অ্যালফা ম্যাক্সই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের উপর রেখে 'এইম' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙুলটা কাটা। দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছে,

এতোয়ারীতে মুন্‌শীজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে, আর পাঠালাম এক-তলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেই দিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হল। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এইসব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন। গোয়ারিঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্‌ মেরে এনেছে দু-তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু করেছে, বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কি না। বললে—আজ সকাল সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক' মারবার কিন্তু······আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি, সে-ও আসবে তার আগেই।

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে এই পঁচিশ বছর পরেও, কারণ অমন মাংসের রোস্ট জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না।

শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময়ে নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না। কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া গ্রীন পিজিয়নটা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন্‌ কোথায় লাগে ফাউল।

যা হোক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালী সাজে সেজেছিল। একটা পিককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট শাড়ি ফিগার-টাকে লেপটে জড়ানো আর চিতা বাঘের মতো ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নিচেয় বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের মতো কর্কশ কঠিন, কি জানি কেমন করে কেউটে সাপের ফণার মতো হাতের মাস্‌ল্‌গুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে। আমি যেতেই পর্দা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন মেটাজী—

বললাম—মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়—

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধহয় কোনো কাজে আটকে পড়েছে। সেলস্‌ম্যানের কাজ বড়ো বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম ত্বজনে।

বললাম, ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছশো টাকা মাইনে পেত—সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন মোটরের সেলস্‌ম্যানশিপ ধরেছে, এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো তা যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারে না ও এমন ঘর-কুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোনোও স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয় মিসেস স্বামীনাথন —কিন্তু ছশো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজনেসের বাজার যে রকম—

—না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কেন ?

—হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে। বলা তো যায় না—

—কেন আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল ?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না—পুরুষ মানুষ সে অমন সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও স্থইসাইড করতে গিয়েছিল—

—কেন ? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে—হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তারপর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানী আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তাছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি-সি-এস থেকে শুরু করে আই-সি-এস পর্যন্ত পাঁচ ছ-জন ক্যাণ্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর

ড্রাইভ করে রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি আসছে……আর হ্যারি ভারী তো ছশো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের অ্যাকাউন্টেন্ট—আমাকে কিনা বিয়ে কববার সাধ তার—সেন্টিমেণ্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গি হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেণ্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনোও পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম, তারপর—

খিল খিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তারপর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি কিন্তু হ্যারি অমনি ছাড়েনি আমাকে—অমন নাছোড়বান্দা পুরুষমানুষও আমি আর দুটো দেখিনি মেটাজী—এই দেখুন না—বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখলে উঁচু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার অ্যাডমায়ারাররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের জন্যে এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম, কেন?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত নটা বাজতে চললো এখনও তো হ্যারি আসছে না—

বললাম—আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে গেছে—তারপর শুরু হল ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনোদিন ভুলবো না।

খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগলো। বললাম—তারপর বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেইদিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন, কুমার আর অলকের কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুর বেলা বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর বাইক নিয়ে—আপিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি।

যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যার আগে। কিন্তু হল না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে—বড়বিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে, বিশ্রাম আর নেব

কি বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাঁইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হল এমন গড়ানে তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে —একটু বিশ্রাম করতেই হবে—সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ড বাধালে। বললাম —কোন্ কাণ্ড ?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজী নিন মেটাজী—আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে—

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা পান শেষ করলাম, তারপর বোধহয় একটা ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে—ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও কেউ না কেউ শোবার জন্যেই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করিনি কিন্তু বিপদ ঘটলো তারপর। হ্যারি বললে—আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কি করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ওরা হল মাদ্রাজী ক্রিশ্চান। আর তাছাড়া মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারি বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরাই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমার সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট……আপনাকে আর দু-স্লাইস রুটি দেব, মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বারো বোরের বন্দুকটায় এক মুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে—আপনি আর একটু কারি নিন মেটাজী, কিছুই খেলেন না দেখছি। বললাম—ও-কথা থাক, আপনি বলুন তারপর কী হল—মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে পড়েছে, কী বলেন—

বললাম—তারপর বলুন—

—তারপর আর কি—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো

একটুর জন্যে কিন্তু আমার আঙুলটা···বাইরে যেন সাইকেল রিক্শার ঘণ্টা বাজলো না মেটাজী—

মিসের স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি, এতক্ষণে বোধহয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল রিক্শায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌছবার আগেই হ্যারি না এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবার ভেবেছি, সেদিন আমার সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল না আরো অনেক পরে যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তাহলে মিসেস স্বামীনাথনও অমনভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার করলো কিনা আমারই উপস্থিতিতে।

রিক্শার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয়—

তারপর কি একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসলো। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চিৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল—

তারপর হ্যারিকে চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি। অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হল। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেডরুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বললে—চিয়ারিউ বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হল না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্যই আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হল মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক —তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনী বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং—তারপর মিস্টার মেটা—

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রানকার্ডস্ আর অলওয়েজ স্কাউণ্ড্রেলস্—ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি তো বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনও আপত্তি করেনি—বরং—

মুদেলিয়ার বললেন—তা তো করবেই না—আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কলকাতার হোটেলে পাবলিকলি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সিরিয়াস অবজেকসন টু ইট।

টি আই অ্যান্টনী বললে—চুপ করুন আপনারা—তারপর বলুন মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন। বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনি এখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুরের ইয়ার্ডে শান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। আর এই ইনস্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লী রেডিওতে এখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোনো ওস্তাদজী। মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে গেছি—রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট ছিল, আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—বাঙালী নয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—গুড ইভনিং বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে ক্রমে আরো হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না।

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান ? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগে না তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই

তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়—

বললাম—এবার তা হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি বললেন না তো—

—কী কথা ?

—ওই আপনি টের পান কিনা—

—কেন বলুন তো, আমি টের পেলেই বা—

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান্ দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হল আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না—তখন আপনি ওটা খান কেন ?

—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন—হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললে—আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছশো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মোটর গাড়ির পেটি সেলস্‌ম্যান—তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি—তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে। সুজাতা আমায় কম ভালবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ? এক রাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না। আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন একনিষ্ঠ ভালবাসার তুলনা হয় না মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ, আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যানসিকে দেখুন—ওই যে বসে আছে—

দূরের টেব্‌লে বসা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালে হ্যারি।

বললে—ওই ন্যানসিকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াব তত খাবে—এক বারও না বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—সুজাতাকে কত বলেছি খেতে কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে একশো হাত দূরে পালিয়ে যাবে। ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারী কন্‌জারভেটিব্।

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার হ্যানসির টেব্‌লে গিয়ে বসলো। কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলাম নিচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেক দিন বাইরে ছিলেন, মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যবসায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায় ?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম, বললে—সেইজন্যেই আপনাকে ডেকেছি, মেটাজী—

বললাম—হয়তো কোনোও কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক-দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না, এখন এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

—কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাব—

—এত বড়ো শহরে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে ?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে—সব জায়গায় খুঁজব—আজ একটা গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার'—আজ কয়েকশো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, তারপর এই এত রাত হল···আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদলে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক পরে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না, সালোয়ার

আর শেরোয়ানী পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোশাক আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালাধরা পোশাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়ানো বড়ো রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়সে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—জেণ্টস্ সাইকেল বলেই এই পোশাকটা পরলাম—এতে অন্য কোনোও উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে—এর চেয়েও অ্যাডভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে······আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন মেটাজী—হাসবেণ্ড যদি মনের মতো না হয় তার চেয়ে বড়ো অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তারপর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায়নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী—হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও······

'কিংসওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সির সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনোও উত্তর বেরল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। বললে—আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে পারে না—ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও

জানে আমি ওর জন্যে কী-ই না স্যাক্রিফাইস্ করেছি···হ্যারি অমন আনফেথফুল হতে পারে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না······ কিন্তু······

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হল যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে শুরু করেছে, তারপর কেউটে সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন···সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়—সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল-জি ধার দিতে পারেন, মেটাজী—

—কেন এল-জি কি করবেন ?

—আগে দিন, তারপর বলবো—একটু শিগ্‌গির করুন মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

এবার বলুন এল-জি কি করবেন ?—আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্যে আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, কিন্তু গড্ ফর্বিড্, আপনার কথা যদি সত্যিই হয় মেটাজী তখন আমি কী করবো! হ্যারিকে গুলি করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে ওকে ক্ষমা করবো কী করে মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো এই আপনাকে বলে রাখছি—ওর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তো আমি খুন করবো—হাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরি না হয়—

তারপর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হল।

বুড়ো টি-আই অ্যান্টনী বললে—স্পেলেনডিড মিস্টার মেটা—স্পেলেনডিড—তারপর—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম ট্রুথ ইজ্‌ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তা হলে—

সোনপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু; চোদ্দ বছর বয়সে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশন মাস্টার—ভাবছেন চরম স্যালভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জানলেন কী—একটু মদও খেলেন না—একদিন আপিস কামাইও করলেন না, কখনও বেনিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই—রাত অনেক হয়ে গেল······

ইনস্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেণ্ড্রারোডের দিক থেকে একটা মাল গাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বারবার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও শুরু হল না।

—তারপর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংস্‌ওয়ে' হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়তো ন্যান্‌সির সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামী-নাথনের এ কী ভয়াবহ কাণ্ড! সারাদিন হ্যারির নাওয়া-খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারাদিন। তারপরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকান দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হল—আর কোনোও দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না এক বাঙালী মেয়েরা ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা ওই দূর থেকেই যা—

সে যা হোক—সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সি সঙ্গে থাকলেই শুধু

বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছ-পাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালবাসে তেমন করে ক-জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালবাসতে পারে ?
কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাইনি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরে ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হল।

কয়েক দিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট-লজ'-এ তখন সে প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তারপর হ্যারি স্যুট্ টাই পরে সাইকেল রিক্শায় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিম্ টিম্ আলো জ্বালিয়ে সাইকেল রিকশায় চড়ে।
সেদিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে কিংসওয়েতেই পাওয়া গিয়েছিল ? ন্যান্সি কি ছিল না সঙ্গে ? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।
সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।
বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম, মেটাজী—
বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে, আপনার কথাটাই আগে বলুন—
সুজাতা বললে—তাই বলি, আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজটা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগেনি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—
বললাম—এবার আমার কথাটা বলি—সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হল সঙ্গে গেলে হত—ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালো জ্ঞান হল না মিসেস স্বামীনাথন—
সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনোওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনোও থার্ড পারসন নেই—

বললাম, আপনি কি সত্যি ও-বিষয়ে সিরিয়াস ?

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মতো মানুষ হইনি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। ওই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা আছে ওর—আর কোনোও কিছুতে নেই মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার মতো লোক নয়—কিন্তু যদি……

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে, ও বাড়ির দিকেই আসছিল। সারা দিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে বাড়িতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায়নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকি ভাড়া—একটা রসিদ সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন—

কী জানি কেন তখনও সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সির কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময়ে সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী যদি কোনোদিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে……আমার ওই বারো বোরের বন্দুকে এল-জি লোড্‌ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলে দিয়েছেন—

বললাম—না না, মাফ করবেন সুজাতা বাঈ, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখিনি—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনোও দিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আনফেথফুল হয়, তাহলে··· আপনি ব্যাচিলর মানুষ ঠিক বুঝবেন না……

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও এমনি জুন মাস, মনসুন

আরম্ভ হয়নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোনো কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি-এন-আর-এর আমবাগানের দিকে চেয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল এক গ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোনো মালগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনের বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরলো মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দুজনেই উইশ করলাম। তারপর আধ ঘণ্টাও কাটেনি হঠাৎ দেখি একটা সাইকেল রিক্‌শা আসছে আমারই 'শেয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায়নি। গেটের মধ্যে সাইকেল রিক্‌শাটা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁশ, আর সঙ্গে সেই ন্যান্‌সি, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সেও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না।......

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হল না, এখানে ন্যান্‌সিকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দুজনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিক্‌শাওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দুজনেই জানে না, কোথায় কোন্ বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্‌শাওয়ালা—

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে, ও-মেয়ে তো সে-কথা ভোলবার নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হল, এখনি একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তারপর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্' করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফের পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হল আমার। ওটা তো আমার এল-জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জিটা দিয়েছি, তাহলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জিটা বেরোয়! তারপর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার

একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধে···আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদগ্রীব হয়ে। নিচেয় ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তারপর হ্যারির, হ্যারি মদ খেলেও মনে হল যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে···গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন—থামলেন কেন মেটাজী—

বুড়ো টি-আই অ্যাণ্টনী বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হল কিনা বলুন মেটাজী আর দেরি করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি দুজনকেই মারলো, না একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চারুপানি খাওয়া বুদ্ধি মুদেলিয়ার গারু, এল-জি তো একটা শুনে আসছেন। দুজনকে মারবে কি করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা! বড়ো সমস্যায় ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটি মিটি হাসতে লাগলেন! আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না এই আমি বলে দিলাম।

টি আই বুড়ো অ্যাণ্টনী সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে—

গুরুবচন মেটা, বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে গল্প যেখানে আমি শেষ করবো, তারপরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধহয়···যা হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি···

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদগ্রীব হয়ে বারান্দায়

ছট্‌ফট্‌ করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভঁইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়তো পাগল ভাবতো, তার আসতে প্রায় একঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হলে নিচে-কার গোলমাল যেন থেমে এল। পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায় পরাজয়ের কলঙ্কে, অপমানে একেবারে থরোলি অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলে না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার একটা হাত ধরে এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়ে বললেন—দেখেছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তারপর আমাকে টানতে টান্‌তে বললে—কাম্‌ অন্‌ মেটাজী, কাম অন্‌—

আমি হতবাক হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম।

তারপর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি এর প্রতিশোধ নেব—বলে এক মুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২—) ॥ নদী ও নারী
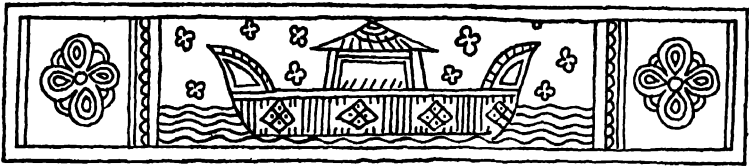
জায়গাটা সুন্দর।

রাক্ষসী পদ্মার এমন ছায়ানিবিড় শ্যামল সমতল তটরেখা সহজে চোখে পড়ে না। কথামতো তীরের প্রকাণ্ড অশত্থ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে লক্ষ্মণ মাঝি নৌকো বেঁধে ফেললে।

নির্মলা যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। ক'টা দিন একটানা নদীর উপর ভেসে ভেসে অরুচি ধরে গেছে।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে লক্ষ্মণ বললে, 'ইচ্ছে হলে দুটো দিন জিরিয়ে নাও মা—অসুবিধে নেই, এককোশ উত্তরে গঞ্জ আছে, ঐ হোথা, ওটার নাম নীল গাঁও।'

তীরে নেমে এদিকে ওদিকে একটু পায়চারি করে নির্মলা আবার এসে নৌকোয় উঠল। সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গঞ্জে যাবার। এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ। চারদিক নিঃঝুম। নির্মলার শাড়ির খসখস শব্দ ও হাতের চুড়ির আওয়াজ টের পেয়ে একটা মাছরাঙা 'ক্রিক' শব্দ করে উড়ে গেল।

নৌকোর গলির উপর বসে হুঁকো টানছিল লক্ষ্মণ। বললে, 'সইবে না, রাক্সী এও একদিন গিলে সাবাড় করে দেবে—'

ছইয়ের ভিতর গুটিসুটি বসে সুরপতি মেঘনাদ বধের পাতা উলটোচ্ছিল। নদী-তীর সম্বন্ধে নির্মলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং লক্ষ্মণের মুখে পদ্মাগর্ভে এর পরিণতি সম্ভাবনার খেদোক্তি শুনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

জায়গাটা সত্যিই মনোরম।

একদিকে জল একদিকে মাটি।

পরিব্যাপ্ত অগাধ আকাশের তলে অনন্তের স্তিমিত বিধুর সুরটি এসে কানে লাগে।

ঠিক হয়ে গেল, কাল দুপুরের পর দিন ভালো থাকলে সন্ধ্যা নাগাদ নৌকো ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু একটা জিনিস সকাল থেকে তারা লক্ষ্য করে আসছে। অদূরে কার জানি সাদা রঙের একটা বোট চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ওটায় মানুষজন আছে কিনা তাও বোঝা গেল না। বোটটা দেখতে ভারী সুন্দর।

অনুমান করে সুরপতি বলেছিল, 'সাহেব-সুবো কেউ হবে হয়তো—হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।'

গম্ভীর মুখে লক্ষ্মণ বললে, 'কাশীপুরের কুমার বাহাদুর ইদিকে প্রায়ই চরে শিকার করতে আসেন।'

শুনে নির্মলা তো প্রথমে ভয়েই অস্থির।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটে যায়।

সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার হলেও সাহেব অথবা কুমার বাহাদুরের নিশ্চয়ই দেখা পাওয়া যেত। সুতরাং ঠিক হল—বোটটা এমনি—ওতে কেউ নেই।

নদীর অপর পারে প্রকাণ্ড চর মরুভূমির মতো ধু ধু করে। কোথাও যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে এক ফালি জলের রেখা রৌদ্রে চিক চিক করে। কথা হল কাল খুব সকালে নৌকা নিয়ে চরের ওদিকটায় একবার বেড়িয়ে আসা যাবে—খুব বেশি দূরে নয় যখন।

এক ঝাঁক বালি হাঁস সোঁ সোঁ শব্দ করে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। ছুটে নৌকোর ছইয়ের বাইরে এসে নির্মলা হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল।

দুপুরবেলা।

খাওয়া-দাওয়ার পর সুরপতির আলসেমি এসেছে, একটু তন্দ্রার ভাব। হাতের মেঘনাদ বধ এক পাশে সরিয়ে রেখে কাত হবে এমন সময় নির্মলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ওগো দেখো!'

'ব্যাপার কি !' সুরপতি উঠে বসল।

নির্মলার চোখে মুখে বিস্ফারিত বিস্ময়।

সুরপতি জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে শুনি!'

'হবে আবার কি, দেখো না চেয়ে।' ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুরপতি বাইরে যাবার উপক্রম করছিল, হাত ধরে নির্মলা তাকে বসিয়ে দিল।—'এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।'

ছইয়ের গায়ে ছোট-বড়ো কয়েকটা ছিদ্র ছিল। আঙুল দিয়ে সেই দিকে ইঙ্গিত করে নির্মলা চুপি চুপি বললে, 'সাদা বোট—দেখো কাণ্ড!'

বেড়ার গায়ে সুরপতি চোখ চেয়ে রইল। নির্মলা দেখছিল আর একটা ছিদ্রপথ দিয়ে।

ব্যাপারটা দুজনের কাছে সত্যি কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল।

তেমনি, অস্ফুট অনুচ্চ গলায় নির্মলা কতক্ষণ পর প্রশ্ন করলে, 'কিছু বুঝলে?'

'না—'

'একেবারে ফ্যাশনের ফানুস!'

'তাই তো দেখছি।'

'কত বয়স হবে, উনিশ-কুড়ি?'

'ঠিক অনুমান করতে পারছিনে'—স্ত্রীর মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে ফের ছিদ্র-পথে চোখ রেখে সুরপতি বললে, 'হ্যাঁ, তার নিচে নয়, একুশ-বাইশও হতে পারে।'

'মেয়েমানুষ বঁড়শি ফেলে আবার মাছ ধরে নাকি!'

'তাতে আর দোষ কি'—বললে বটে সুরপতি, কিন্তু তার চোখেও সমস্তটা কেমন বিসদৃশ ঠেকছিল।

'বিয়ে হয়েছে? না বোধহয়।' বেড়ার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টিটা সূক্ষ্মতর করে চালিয়ে দিয়ে নির্মলা যেন আপন মনেই বললে, 'তা'লে মাথায় কাপড় থাকত।'

সুরপতি চুপ করে ভাবছিল, সম্রাজ্ঞীর মতো বোটের ছাদ আলো করে ইনি কে! কী তাঁর পরিচয়। অথচ সঙ্গে ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েটার পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি—ঘাড়ের উপর দিয়ে মাথার পিছনে খোলা আঁচলটা বাতাসে নিশানের মতো পতপত করে উড়ছিল। বেঁটে ছাতা বাঁ হাতে, রোদের দিকে তেরছা করে ধরা। বেশবিন্যাসে তিনি যে উগ্র রকমের একজন আধুনিকা সে বিষয়ে সুরপতির সন্দেহ রইল না। সুরপতি চেয়েই আছে।

পিঠে নির্মলা আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতে সোজা হয়ে বসল।
'কানে যায় না কথা, কেমন?' নির্মলার চোখে দুষ্ট হাসি।
'কি বলছ?'
'একেবারে মজে গেলে দেখছি।'
'অ, সে-কথা।' সুরপতি হাসল। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'তা মন্দ কি।'
'মন্দ আমিই বলছি নাকি'—কৃত্রিম অভিমানে নির্মলার মুখ থমথম করে ওঠে।
উঠে গিয়ে দড়িতে ঝুলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট এনে সুরপতি আবার বেড়ার ধার ঘেঁষে বসল। '—দেখো ওসব ঢের দেখেছি, যাকে বলে ফাঁপা বেলুন।'
স্বামীর কথায় নির্মলা খিলখিল করে হেসে ফেললে।
'সত্যি বলছি ওদের কেবল ঠাট আর ঠমক।' সুরপতি সিগারেট ধরাল: 'অত বড়ো ধিঙ্গি মেয়ের আবার বব্‌ড কাটা চুল, যেন কচি খুকী।'
'ঢঙ আর কি'—নির্মলা বললে।
'মেয়েমানুষের বেহায়াপনায় চোখ টাটায়।'
এবং এই নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে প্রসঙ্গটা কথায় কথায় আরো বিস্তৃত ব্যাপক করে তুলল। বস্তুত তারা কেউ আন্দাজ করে ঠিক করতে পারলে না, মেয়েটা কে।
লক্ষ্মণ সেই দুপুরবেলা তীরে উঠে কোন্ দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে।
পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে সুরপতি গা এলিয়ে দিল।
নির্মলা ঠায় বসে আছে।
বেড়ার ছিদ্র-পথে একটা চোখ তেমনি ঠেকানো। অসীম ধৈর্যসহকারে আশ্চর্য দ্বীপের মতো সেই সাদা বোটের দিকে সে তাকিয়ে দেখছিল। ইতিমধ্যে দু-বার ছাদ থেকে নেমে গিয়ে বোটের ভিতরে ঢুকে কি জানি কতক্ষণ টুকটাক করে মেয়েটা আবার উঠে এসেছে উপরে।
ক্রমে বেলা পড়ে গেল।
আকাশ ও পদ্মার প্রসারিত বক্ষ ছেয়ে নেমে এল দিনাবসানের নির্মল অবসাদ। পরপারে ধূসর বালির বিছানায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্ত-সূর্যের আভা লেগে সোনা হয়ে উঠেছে।
একটা কাণ্ড ঘটল।

বোট থেকে নেমে ডাঙায় উঠে মেয়েটা কি নিয়ে জানি একটা লোকের সঙ্গে রীতিমতো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছে।

কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা না গেলেও মেয়েটার গলার চিৎকার ওখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। হাত মুখ নেড়ে কখনো হিন্দী কখনো বাংলা, কখনো বা মিশ্রভাষার শ্রাদ্ধ করে লোকটাকে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে। একটা কথা মুখ তুলে বলবার ফুরসত পাচ্ছে না বেচারা। মেয়েটা তুবড়ি বাজির মতো ফেটে পড়ছিল।

সুরপতির মুখের দিকে নির্মলা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

'কি নিয়ে কিছু বুঝলে?'

'না—'

'একেবারে রণরঙ্গিনী!'

'আচ্ছা দজ্জাল মেয়ে।'

ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় দেখবার জন্যে ফের ছইয়ের গর্তে নির্মলা চুপি দেবার চেষ্টা করতেই সুরপতি বললে, 'থাক—ঢের হয়েছে।'

সুরপতির রুচিতে বাধে এসব। বললে, 'উনি উড়নচণ্ডী দলের একজন, বলি-নি? শুধু পথে ঘাটে—হাটে গঞ্জেও কোমর বেঁধে ওরা বাইরের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, আবার মস্করাও জানে।'

কিন্তু ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নির্মলা তবু চেয়ে রইল। কৌতূহল দমন করতে পারে না।

কতক্ষণ পর লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া গেল। মাঠ ভেঙে ওদিক দিয়েই সে আসছিল। আস্তে আস্তে বোটের সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি শুনে নিয়ে লক্ষ্মণ নৌকোয় ফিরে আসতেই নির্মলা জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে?'

'সামান্যি একটা ডিম নিয়ে।'

'লোকটা বুঝি ডিমের ব্যাপারী?'

'হ্যাঁ—সকালে দু-গণ্ডা ডিম দিয়ে গেছল, একটা নাকি পচা ছিল।'

'একটা—একটা ডিম পচা ছিল বলে এত! অমন গলা শাসানি, চোখ রাঙানি —বলিস কি রে!'

নির্মলার ভ্রূযুগল কপালে উঠে গেছে, বললে সুরপতির দিকে চেয়ে, 'শুনলে—শুনলে কাণ্ড?'

লক্ষ্মণ বললে, 'একেবারে তিরিক্ষি মেমসাহেবী মেজাজ।'

'মেজাজ বলে মেজাজ'—নির্মলা হেসে উঠল, 'মনে করেছিলুম কি না জানি রাহাজানি হয়ে গেল।'

'মেজাজ না ছাই'—উপেক্ষায় সুরপতি ঠোঁট উল্টোল, 'ঐ তো ফড়ফড়ানিটুকু সম্বল, আর আছে লোক-দেখানো ফুটুনি। বোলো না আর আমার কাছে।'

প্রসঙ্গটা তখন সেখানেই চাপা পড়ে গেল।

নৌকোয় আসবার পর থেকে ভাতের হাঙ্গামা হয় না, রুটি চলে। আটার ডেলাগুলো থালায় সাজিয়ে রেখে পাটাতনের নিচে থেকে বেলুন আর চাকতি তুলে নিয়ে নির্মলা রুটি গড়তে বসল।

পাশে বসে সুরপতি গল্প করছিল। ওদিকে গলুইয়ের উপর অন্ধকারে চুপচাপ বসে থেকে লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে ঝিমোয়, কখনও বা গুন গুন করে গান গায়, হুঁকোয় দম দেয়।

এক একটা দমকা বাতাস এসে নৌকাটা দুলিয়ে দেয়—ছইটা নড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা কাঁপতে থাকে। তীরে আঘাত লেগে জলের ছলছল শব্দ হচ্ছিল, আর ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে একটানা ডাক। নির্মলার রুটি গড়া প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ ওদিকের বোট থেকে নারী কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী আরম্ভ হল।

উৎকর্ণ হয়ে নির্মলা বললে, 'কে গান গায়?'

'আবার কে হবেন, উনিই'—সুরপতি সোজা উত্তর দিলে।

'মেয়েটা!'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। নইলে কে আর হবে।'

'এই রাতে, নৌকোয়, নদীর উপর!'—নির্মলার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল—'সাহস তো কম নয়!'

'তুমি গিয়ে মানা করে দাও না—বলে কিনা কারো মানা শুনতে বয়ে গেছে বড়ো।' সিগারেট ধরিয়ে সুরপতি বললে, 'যার যেমন রুচি—মরুক গে সারারাত চেঁচিয়ে, আমাদের কি।'

নির্মলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। অজানা অপরিচিত জায়গায় তাতে নৌকায় বসে গলার কালোয়াতি করে এ কোন্ জাতের মেয়েমানুষ। তবু যদি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত একটা কিছু হত। একেবারে সস্তা থিয়েটারী গলা।

সুরপতির কানে কানে বললে, 'আমার কিন্তু মোটেই ভালো ঠেকছে না।' ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেও সুরপতি চুপ করে রইল।
অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নির্মলা ব্যাপারটার একটা হিল্লে করতে পারলে না। গান থেমে গেলেও গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো তার কানের কাছে কিলবিল করছিল।

কথামতো পরদিন খুব সকালে লক্ষ্মণ নৌকো ছেড়ে দিল। দূরে ধূসর নীল আকাশের প্রান্তসীমায় জলের ধার ঘেঁষে একটা বড়ো তারা তখনো দপদপ করছে।
লক্ষ্মণ বললে, 'চর দেখে ফিরে আসতে এক পহর বেলা হবে খুব।'
নির্মলা বললে, 'একটু হাত চালিয়ে বৈঠা ফেলো বাপু—ফিরে এসে আবার আমার রান্না-বান্না আছে।'
ছলছল শব্দ করে একটা জেলে ডিঙি পাশ কেটে চলে গেল।
সুরপতি বললে, 'তোমার সব কিছুতেই তাড়া। রান্না-বান্না একদিনের জন্যে বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না—আপাতত চরে পৌছনো যাক—কি বলিস লক্ষ্মণ?'
লক্ষ্মণ সে কথার উত্তর দেয়নি। মৃদু হেসে শুধু মাথা নাড়ল। তার বাঁ হাতে হুঁকো। বৈঠাটা রেখে ডান হাতে হালটা তখন সে সজোরে চেপে ধরেছে। জায়গাটায় একটা পাক আছে।
খানিকক্ষণ পর সুরপতি একদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওটা বুঝি লক্ষ্মীপুর-ঝিকড়ছড়া?'
'হ্যাঁ, বদন ফকিরের দরগা ছিল ও গাঁয়ে, কত রাজ্যের লোক এসেছে ওষুধ নিতে, ফকিরের ওষুধ খেয়ে ব্যামো ভালো হয়ে গেছে।' লক্ষ্মণ পুনরায় হাতে বৈঠা তুলে নিল।
'বদন ফকির অনেক দিন মরে গেছে?'
'কবে!' লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বললে, 'সেই বাইশ বাংলায় জলে এক সন্ধ্যায় দরগাটা জলের নিচে তলিয়ে গেল আর এক সন্ধ্যায় ফকিরও চোখ বুজল —একটা গান আছে।'
গুন গুন করে লক্ষ্মণ বদন ফকিরকে নিয়ে রচিত গানের একটা কলি ভাঁজতে থাকে।

গান থামিয়ে লক্ষ্মণও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

ভয়ের কিছু নেই অবশ্য, তবু নৌকোটা তখন নদীর একেবারে মাঝখানে। চতুর্দিকে পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত বিস্ফারিত জলরাশির কলকল শব্দ। ভয়ে নির্মলার মুখ একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। সুরপতির হাতের মধ্যে নির্মলার একটা হাত। ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকো ভীষণ দুলছে, টলছে।

কোন্ দিকে যেন স্টিমারের ক্ষীণ 'ভোঁ' শোনা গেল।

লক্ষ্মণ বললে, 'গোয়ালন্দর ইস্টিমার।'

তারপর ভয়টা কেটে গেল।

দেখতে দেখতে মাঝ নদী পার হয়ে নৌকো একদিকে সরে এল।

চোখের সামনে নির্জন নিঃশব্দ বালুচর। পুবদিকে আকাশের রঙ উঠেছে গোলাপী লাল হয়ে।

তীরের বালি ঘেঁষে লক্ষ্মণ নৌকো এনে দাঁড় করালে।

সুরপতি বললে, 'চলো।'

'কোথায়!' নির্মলার চোখ বড়ো হয়ে উঠেছে।

'এই তো চর'—সুরপতি নির্মলার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল—'একটু ঘুরে দেখবে না?'

'তা তো এখান থেকেই দেখা চলে'—ফ্যাল ফ্যাল করে নির্মলা তীরের দিকে চেয়ে ঢোঁক গিলতে লাগল—'নেমে আবার দেখতে হবে নাকি!'

এবার আর সুরপতি হাসি সংবরণ করতে পারলে না, 'তাই অত তোড়জোড় করে চর দেখতে আসা—এসো, বাঘ কুমীর এখানে নেই।'

লক্ষ্মণ পূর্বেই বলেছিল চর দূর থেকে দেখতে ভালো। কথাটা সত্য। বালির উপর দিয়ে হাঁটবার সময় এমন কোনো নূতনত্ব চোখে পড়ল না। কেবল এখানে সেখানে সাদা আর কালো মাটির ছোপ। কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। আর দেখা গেল রাশি রাশি ঝিনুক, শামুক ইতস্তত ছড়ানো।

নির্মলার আঁচল ঝিনুকে ভারী হয়ে উঠল। হেসে সুরপতি বললে, 'তবু দেখছি শেষ পর্যন্ত তোমারই লাভ হল।'

কথায় কথায় তারা তখন একটা সরু নালার ধারে এসে গেছে।

মানুষের আওয়াজ পেয়ে ফরফর করে কয়েকটা বন্য হাঁস এদিকে ওদিকে উড়ে গেল। একটা হাঁস নির্মলার কান ঘেঁষে মাথার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

ঠাট্টা করে সুরপতি বললে, 'হাত বাড়িয়ে ধরলে-না কেন।'

সামনে কি যেন দেখতে পেয়ে নির্মলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুরপতিও দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্মণ এক পাও এগোচ্ছে না। নালার পাশে বালির টিবিটার উপর সকলের দৃষ্টি।

সেই মেয়েটা, হাতে বন্দুক।

চোখাচোখি হতেই বালির টিবি থেকে নেমে নিকটে এসে ঘাড় নেড়ে ছোট একটা অভিবাদন জানিয়ে উচ্চকিতে হেসে উঠল, 'আমার শিকার তাড়িয়ে দিলেন, মাত্র নিশানা ঠিক করছিলুম।'

বিমূঢ় সুরপতির মুখ দিয়ে কথা বেরনো দূরে থাকুক প্রতি-নমস্কার জানাতে গিয়ে হাত উঠল না। একপাশে দাঁড়িয়ে নির্মলা কেমন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘছন্দ নিটোল নির্ভাঁজ গড়ন, কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন।

রাইফেলটা বাঁ হাতে এনে ডান হাত দিয়ে কপালের চুল কানের ওপিঠে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অবিশ্যি কাল দু-একবার দেখেছি, ঐ নৌকো তো অশথ গাছে বাঁধা ছিল?'

সুরপতি আর নির্মলা তাকিয়েই রইল। চিবুক দু-দিকে ঈষৎ চাপা, পুরুষের মতন, একটু ধারালো, শক্ত। বললে, 'আপনারা এই সবে এলেন তো? আমি এসেছি অন্ধকার থাকতে—'

অপরিচয়ের কুণ্ঠা এ মেয়ে জানে না। কণ্ঠে রূপোলি হাসির বান ডেকে গেল, 'এসে অবধি একটা হাঁস ফেলতে পারিনি, আর পারব না আজ, রোদ চড়ে গেল।'

একবার থেমে গম্ভীর হয়ে নদীর দিকে তাকাল, ঘাড়ের রেখায় ফুটে উঠল সতেজ ভঙ্গিমা।

'আচ্ছা আসি তবে, বেলা হলে বাবু রাগ করবেন।'

চলতে গিয়ে রহস্যময়ী ফিরে দাঁড়াল, বললে সুরপতি আর নির্মলার দিকে চেয়ে—'যাবেন কিন্তু আমার বোটে দয়া করে একটিবার।'

মধ্যাহ্নের আকাশের মতন স্বচ্ছ প্রখর চাউনি। শিস দিতে দিতে বালির উপর দিয়ে তরতর করে সে চরের ওদিকটায় নেমে গেল।

ছোট ডিঙি, কেউ নেই সঙ্গে, নিজের হাতে বৈঠা ফেলে দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে ভেসে পড়ল।

দেখে নির্মলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। স্তম্ভিত ভাবটা কেটে গিয়ে সুরপতি

ফিরে এসেছে তার সহজ স্বাভাবিকতায়। ঠোঁট উল্টে গলায় অদ্ভুত একটা সুর করে বললে, 'একেবারে তয়ের হয়েছেন, অতিরিক্ত নাই পেয়ে যা হয়—আধুনিক—ছোঃ—'

হো হো শব্দ করে সুরপতি হেসে উঠল—'ঢের দেখেছি, এর এমন লেফাফা-দুরস্ত উগ্র সংস্করণটাই বুঝি অ্যাদ্দিন দেখবার বাকি ছিল।'

কাণ্ডকারখানা দেখে বেচারা লক্ষ্মণ বেকুব হয়ে গেছে।

নৌকোয় করে ফিরবার পথে নির্মলা ফিসফিস করে বললে, 'বাবুটি কে, বলে যে গেল ও?'

'হবে আর কি কেউ—দু-একজন ওঁরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করেন।' সুরপতির ঠোঁটের ফাঁকে ইঙ্গিতময় গূঢ় হাসি।

নির্মলার মনে পড়ল কাল রাতে গানের কথাটা।

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। লক্ষ্মণ ঝপাঝপ বৈঠা ফেলে। নৌকো চলেছে হেলে-দুলে। পদ্মার বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে তরঙ্গে তরঙ্গে চলেছে প্রভাত-সূর্যের কোটি বন্দনা গান।

একটা চিল সোঁ করে লক্ষ্মণের মাথা ঘেঁষে একদিকে উড়ে গেল।

সুরপতি বললে, 'আমরা আধুনিক, সুতরাং মেমের মতো মেয়েদের চুল রাখব, সিগারেট খাওয়াতে শেখাবো, তারা ঘোড়ায় চড়বে, রেস খেলবে, পুরুষ বন্ধু নিয়ে হুল্লোড় করবে—কী কাণ্ড!'

কৌতূহল মানুষের রক্তগত।

বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা যতই পোষণ করুক, বোটের ভিতরে একবার উঁকি না দিয়ে তারা থাকতে পারলে না।

ও পক্ষ থেকে আর কিছু না হোক মৌখিক শিষ্টাচারের অভাব হবে না এ তারা পূর্বাহ্নেই ধরে রেখেছিল।

বাস্তবিক হল তাই, অভ্যর্থনায় অবারিত হয়ে উঠলো মেয়েটা।

বোটের ভিতর এসে নির্মলা ও সুরপতি অবাক হয়ে গেল। ছোটোখাটো সংসার—সাজানো গোছানো, মেয়েটির চোখের তারার মতো উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন। দু-দিকের জানালায় নীল পর্দা প্রশান্তির নীল অঞ্জনের মতো ঘরের আবহাওয়াকে এনেছে নিবিড় করে। সুরপতি ও নির্মলাকে পাশাপাশি দুটো চেয়ার দিয়ে মেয়েটা ওদিকে খাটের শিয়রে গিয়ে দাঁড়াল।

পাশ ফিরে ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ রেখে মেয়েটি জোরে জোরে বললে, 'ওঁরা এসেছেন—স্বামী-স্ত্রী।'
ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এপাশে, সুরপতি ও নির্মলার দিকে মুখ করে ফিরে, শেষে শোয়া থেকে হয়তো উঠবার চেষ্টা করছিলেন, মেয়েটি তাড়াতাড়ি ধরে সাহায্য করলে। পিঠের দিকে একটা বালিশ দাঁড় করিয়ে দিলে পর ভদ্রলোক তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগলেন।
'অসুস্থ'—ইতস্তত করছিল সুরপতি কথাটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে, বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। নির্মলা চমকে উঠল।
লোকটির একটা হাত কাটা, বাঁ পা-টা হাঁটু অবধি এসে থেমে গেছে।
অত্যন্ত অস্পষ্ট, মৃদু কণ্ঠস্বর। বললেন, 'সকালবেলা নীলিমা আমাকে বলছিল—এসেছেন বড়ো সুখী হলুম—পদ্মায় বেড়াচ্ছেন বুঝি?'
উদাস, নিষ্প্রভ দুটি চক্ষু।
কথার উত্তর দেবার সহজ সৌজন্য সুরপতি ও নির্মলার লোপ পেয়ে গেছে। অসহায় পঙ্গু দেহখানার দিকে তারা তখনও বিমূঢ়ের মতো চেয়ে।
খানিকক্ষণ পর সুরপতি প্রশ্ন করলে, 'কি করে এমন হল?'
'একটা ক্রেন পড়ে'—মেয়েটিই উত্তর দিলে—'উনিশ শো তেত্রিশ ইংরেজি সেটা, আমরা ভিজাগাপট্টমে। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর ওঁকে ওখানেই প্রথম চীফ ইঞ্জিনিয়ার করে পাঠানো হয়—'
'আর সেটা আমাদের বিয়ের প্রথম বৎসর—'
উৎকর্ণ হয়েছিলেন, মাঝখানে কথাটা জুড়ে দিয়ে ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।
সুরপতি এবং নির্মলা আবার সমস্বরে অস্ফুট ধ্বনি করল।
'হ্যাঁ, তাই বলি, হয়তো আমিই তোমার জীবনে'—শূন্য, স্থির দৃষ্টিতে জানালার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে নীলিমা বললে, 'অকল্যাণ এনেছিলাম।'
'ছি—' ব্যস্ত একটু বা উত্তেজিত হয়ে ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝোঁকবার চেষ্টা করতেই নীলিমা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে সান্ত্বনা দিতে লাগল।
'না, তোমার মাঝে মাঝে ও কথাটা আমায় কী যে বাজে—'
'আচ্ছা আর বলব না।' গাঢ় গদগদ কণ্ঠস্বর।
'না, আর বোলো না।'
'সেই থেকে বুকে একটু দোষ হল। ডাক্তারের আদেশ, গ্রাম, তার চেয়েও

ভালো নদীতে গিয়ে থাকুন। আজ তিন বৎসর নৌকোয় আছি।' কথার শেষে উভয়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ক্ষীণ হাসল।

ওদিক থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল, 'পদ্মায় ভেসে বেড়ালেই কি শরীর ভালো থাকে না কেউ বেঁচে ওঠে? ওর অজস্র প্রাণশক্তি আমাকে ধরে রেখেছে।'

মেয়েটি নিরুত্তর।

সুরপতি ও নির্মলা গভীর নিশ্বাস ফেলল।

বিদায় নিয়ে উঠে আসবার সময় বোটের দরজা পর্যন্ত মেয়েটি এগিয়ে এল।

'আপনাদের পেয়ে বেশ কাটল সময়টা, উনি যদি দেখতে পেতেন আরো সুখী হতেন।'

'তার অর্থ?' সুরপতি ও নির্মলা তীব্রভাবে চমকে উঠল।

'নার্ভে চোট লেগে ওঁর চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত ধরাধরি করে সুরপতি ও নির্মলা একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই সাদা ধূসর বোটটার দিকে আর কান পেতে রইল। নারীকণ্ঠের অপূর্ব সঙ্গীত-লহরী সেখান থেকে তখন উঠে আসছিল। জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে সে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

সুশীল রায় (১৯১৫—) ॥ মধু গাউলি
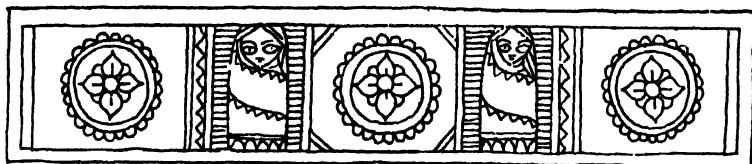
রোজ বিকেলে স্তব্ধ মালোপাড়া চমকে ওঠে। গলাটা দারুণ কর্কশ, আর তার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর। এতটুকু রস-কষ নেই। সেই গলায় সে হাঁকে বেলফুল। চেহারাটাও গলারই অনুপাতে নির্দয়। ফিরি করে বেলফুল, কিন্তু লোকটাকে দেখে মনে হয় একটা আসল কসাই।

তার বেসাতি দেখে হাসি পায়। যার ফিরি করার কথা পাঁঠার হাড, অন্তত চেহারা আর গলার সঙ্গে যা কিছুটা খাপ খায়, সে কি না হেঁকে বেড়ায় বেল-ফুল। হাতে কয়েকটা মালা ঝুলিয়ে, ঝুড়িতে খুচরো ফুল নিয়ে সে হাঁকে। বেলফুলের ঠাণ্ডা গন্ধটাও ঝাঁঝালো হয়ে ওঠার কথা। সংসর্গের সঙ্গে তাহলে সংগতি কিছুটা অন্তত থাকে।

দুপুরের ঘুমটা বিকেলের দিকে পাতলা হয়ে আসে, তখন আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায় ঘুমের আমেজ উপভোগ করি। এমন সময়—ওই গলা।

একদিন উঠে পড়লাম লাফ দিয়ে, বারান্দায় বেরিয়ে ধমক দেওয়ার মতো করে ডাকলাম, এই, এই, এদিকে এসো, ইধার আও।

লোকটা কাছে এল। তার হাতের ফুলের দিকে না তাকিয়ে তাকালাম তার মুখের দিকে। রোদের আঁচে মুখের চামড়া ভাজা-ভাজা, খোঁচাখোঁচা দাড়িতে মুখের অনেকটা জায়গা ঢাকা; চোখ-দুটো রক্তজবার মতো, চাউনিটাও খুব তেরিয়া।

বলল, লেবেন তো লিন।

আমিও তেতে গেলাম, বললাম, লেব না, তবে কি তোমার মুখ দেখার জন্য ডেকেছি?

উলটো চাপ দিয়ে বললাম, হাঁ করে তো আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছো, দর বলো।

দরাদরি করে ভাগিয়ে দিলাম লোকটাকে।

দর সুবিধেরই, কিন্তু ওকে সুবিধের মনে হল না। হাঁকই কেবল রুক্ষ নয়, তার বলার ধরনও বড়ো কাটা-কাটা। তার চোখের দিকে চেয়ে বলে দিলাম, এ ফুল পছন্দ হল না, লাল ফুল কিছু আছে—রক্তজবা?

আমার ব্যঙ্গটা বুঝে থাকবে, বলল, লাল নেই, হলদে আনতে পারি—সরষে ফুল।

ওর মেজাজ দেখে চোখে সরষে ফুলই দেখলাম মনে হল।

লোকটার গলার স্বর শুনে বিরক্ত হয়েছিলাম, ওর চেহারা দেখেও ওকে পছন্দ হয়নি; কিন্তু মেজাজ দেখে ওর সঙ্গে আলাপ করার লোভ হল। যার মেজাজ এমন গরম, সে অমন নরম ফুলের বেসাতি করে কেন—তা জানবার আগ্রহ হল।

পরদিন হাঁক শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাকলাম, এই, ইধার আও।

আমার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু ইধার না এসে উধার চলে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে গলার স্বর মোলায়েম করে নিলাম। বললাম, এই শোনো, শোনো। এদিকে এসো একবার।

ফুলের দরদস্তুর ঠিক করে কয়েকটা বেলকুঁড়ির মালা কিনলাম। দাম চুকিয়ে দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম, দেশ কোথায়?

—চিকোলি। নাগপুর।

—এখানে থাকো কোথায়?

—পবা।

সাহেববাজারের কাছাকাছি থাকি আমি। এখান থেকে পবা অনেকটা দূর। খুব কম করে মাইল চার। বড়ো বড়ো মোটা মোটা পাথর-বসানো রাস্তা সটান চলে গেছে রেল-স্টেশনের দিকে। সেই বড়ো রাস্তা থেকে সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণে—এ রাস্তাটার শেষ কোথায় জানি নে। কিন্তু পবা অনেকটা দূরে এই রাস্তারই ধারে একটা গ্রাম, এটুকু জানি। লোকটা নাকি সেখানে ডেরা বেঁধে আছে অনেকদিন হল। আগে সে বিক্রি করত আনাজ। সাহেববাজারের দিকে নাকি আসত কালে-ভদ্রে, সে যেত নওহাটায়, কখনো-কখনো বা শিবপুরের হাটে। নিজের যা ক্ষেত ছিল সেই ক্ষেতে সে ফলাত ফসল। কিন্তু দিন নাকি সমান যায় না, জোত-জমি কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, একা আর

পেরে ওঠে না শাক-সব্জি ফলফুলুড়ির তদ্‌বির করতে। এখন তাই ছোট এক টুকরো জমিতে বানিয়েছে একটা বাগিচা। জরু? না, সে-সব খতম হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন সে ফুলের কারবার করে, এতে মেহনত কম। এসব তো আর হাটে বেচা চলে না, শহুরে মানুষেই এসব কেনে। তাই পবা থেকে চার মাইল রাস্তা হেঁটে সে এসে যায় সাহেববাজারে, মালোপাড়ায়, রানী-বাজারে, ঘোড়ামারায়। সম্বল তার এখন একটা বাগিচা, আর—

বাধা দিয়ে বললাম, নাম কি কর্তার?

—মধু। মধু গাউলি।

এতক্ষণে মনের কথাটা খুলে বললাম। বললাম, ফুল ফিরি করার গলা নেই তোমার। তোমার গলাটা বিশ্রী।

মধু গাউলি হাসল। সে হাসিটায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম বেলফুলের মতো ধবধবে দুই সারি দাঁত।

আমি এখানকার আদালতের উকিল। কোর্টে রোজ যাই নে। গিয়ে লাভ নেই। পোষায় না। আদালতে একথা বলতে পারি নে, কিন্তু এখানে কথাটা অকপটে বলা চলে। মক্কেল আমার নেই আদপে। টমটম ভাড়া দিয়ে রোজ-রোজ যাওয়ার মানে হয় না। যেদিন না যাই, সেই দিনটাই লাভ—গাড়িভাড়াটা বেঁচে যায়।

মালোপাড়ায় মধুর সেই ভয়ংকর গলাটা কিছুদিন থেকে আর শোনা যায় না। আমার কথাটা তা হলে হয়তো সে বুঝেছে। প্রায় রোজই আমাকে সে কিছু খুচরো ফুল আর দু-একটা মালা দিয়ে যায়। হাঁক দেয় না, বারান্দায় উঠে জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে বলে, আছেন নাকি?

দরজা খুলে ওর হাত থেকে মালা নিয়ে নিঃশব্দেই দাম চুকিয়ে দিই। এক-একদিন দুর্ভাবনায় যে না পড়ি, এমন নয়। বাড়িতে শুয়ে থাকি হয়তো টমটম-ভাড়ার পয়সা বাঁচাবার জন্যে, হয়তো কোনো দিন নগদ পয়সাও থাকে না। কিন্তু মধুর জন্যে কিছু পয়সা মজুত রাখতেই হয়। ঘরে শুয়ে সাশ্রয় করার মতলব বানচাল হয়ে গেল। গাড়িভাড়ার পয়সাটা মধু এসে রোজ নিয়ে যায়। ফুলের বিলাসিতা করতে গিয়ে আখেরের কথা ভাবি, আর শঙ্কিত হয়ে উঠি। এইভাবেই যদি গড়িয়ে গড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিই তাহলে জীবন দানা বাঁধবে কী করে? ফুলের বিলাস পরিহার করে কাছারিটা রোজ একবার

ছুঁয়ে আসাই দরকার। আজকে সাশ্রয় করতে গেলে আগামীকাল নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে যে হয়, এ কথা তো জানাই।

তাই ছেঁড়া শার্টের উপর আলপাকার চকচকে কালো কোট চাপিয়ে বোঁটার ডগায় চুন নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে পড়লাম। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার আগ্রহ আমার মধ্যে তাহলে এসেছে—নিজেকে এইভাবে বুঝ দিলাম বটে, কিন্তু আসলে এ যে মধু গাউলির হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্যে পলায়ন—তা আমি নিজেও বুঝতে পারলাম।

জানি নে, লোকটা এসে এর মধ্যে ঘুরে গিয়েছে কি না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যের দিকে আদালত থেকে ফিরে এসে দেখি, জানালার পাশে চেয়ারে দুটি মালা পড়ে আছে। এ যে মধুর কাণ্ড, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার সঙ্গে দেখা না করে তাকে দাম দেওয়া যায় কী করে তাই ভাবছিলাম।

কথায় বলে, লেগে থাকলে মেগে খায় না। নিয়মিতভাবে দিন কয়েক কোর্টে হাজিরা দেওয়ায় কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে গেল। টাকা পাওয়া মাত্র মেজাজ দরাজ রকম হয়ে গেল, একটা টমটম ভাড়া করে ছুটলাম পবার দিকে। মধু অছিলা মাত্র, এই সুযোগে শহরের আশ-পাশটা দেখে আসাই অবশ্য আসল উদ্দেশ্য।

রাস্তার পাথরে আর টমটমের লোহা-লাগানো চাকায় শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড় করে। চাবুকের লাঠি ঘুরন্ত চাকার সঙ্গে বাজিয়ে বাজিয়ে ঘোড়াকে উৎসাহ দিচ্ছে গাড়োয়ান। মাঝে মাঝে নিজের মনের ফুর্তিতেই হেঁকে উঠছে—'চলে গাড়ি পবা-নওহাট্টা।' দু-হাতে রাশ টেনে ধরে গাড়োয়ান বলল, পবায় যাবেন কোথায়, বাবু?

বললাম, কোথাও না। বেড়াতে বেরিয়েছি, তোর গাড়িতেই ফিরে আসব। পবার সকলকেই বুঝি চিনিস?

—তা চিনি বই-কি। কট্টুকুন-বা গাঁ, আর কটাই-বা মানুষ।

বলে ফেললাম, মধুকে চিনিস? মধু গাউলি?

ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষে সে উত্তর দিল, সেই ডাকুটা, যে ফুল বেচে?

—ঠিক ধরেছিস। তার ওখানে নিয়ে চল।

গাড়োয়ান বলল, সে আমাকে দূর থেকে তার বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তফাতে অপেক্ষা করবে।

—তা কেন রে?

—ও যে ডাকু, কে না ডরায় ?

—কেন, খুন-টুন করেছে নাকি ?

গাড়োয়ান বলল, করেনি। কিন্তু করতে কতক্ষণ। ধরমদাসকে শাসিয়ে দিয়েছে।

ঝুঁকে বসে বললাম, কি জন্যে ? কি হয়েছে ?

—এক খুবসুরত মেয়ে আছে ওর। উঃ, কী রূপ। পবার রানী সে। তাকে ধরমদাস শাদি করতে চায়। এ তো বাবু সব্বাই জানে, আপনি শোনেননি বুঝি ?

শুনিনি বলে আক্ষেপই হল। আগে শোনা থাকলে মধুর কাছ থেকে সব গল্পই এতদিনে জানা হয়ে যেত। যাই হোক, গাড়ি দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। মাঠ পার হয়ে আমি মধুর ডেরার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খড়ে-ছাওয়া ছোট একটা ঘর। ঘরের এক দিকে বেড়া দেওয়া একটা বাগান।

ডাকলাম, মধু, মধু গাউলি বাড়ি আছো ?

মধু সাড়া দিল ভিতর থেকে। বেড়ার পাশ দিয়ে উঁকি দিল একটা মুখ। আমি তৈরি ছিলাম না, চমকে উঠলাম। সে মুখ সত্যি একটা মুখ যেন নয়, জীবন্ত একটি সূর্যমুখী। গাড়োয়ানের কথা তাহলে মিথ্যে নয়, পবার রানীই তো বটে। পশ্চিম-আকাশে এখন যে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়েছে, ওই সূর্যমুখী-মুখে যেন তারই পরিপূর্ণ ছায়াও দেখতে পেলাম। এক ঝলকের দেখা, কিন্তু দু-চোখ তাতেই অপলক হয়ে গেল।

মধু বেরিয়ে আসা মাত্র ধমকের সুরে বললাম, এসব আরম্ভ করেছ কি! ফুল দিয়ে এসেছ, দাম নিয়ে আসোনি।

আজ ধমক খেয়ে হেসে ফেলল মধু। এবড়োখেবড়ো দাড়ি ভর্তি মুখ, আর সেই ভয়ংকর ঠোঁটের নিচে বেলফুলের মতো ধবধবে সাদা দাঁতের সার।

ওর হাতে পয়সা গুঁজে দিয়েই চলে আসছিলাম। মধু এগিয়ে এসে বলল, থাক, আমি যাব নিয়ে আসব।

আবছা আলোয় দূরে আমার টমটম দাঁড়িয়ে। এখান থেকে ওটাকে কাঠকয়লায় আঁকা একটা ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমি এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। মধু বলল, রাঙা ফুলের কথা বলেছিলেন একদিন, সেটা দেখে যান।

থমকে দাঁড়ালাম। মধু হাঁক দিল, তুজিয়া।

বাপের ডাক শুনে ছুটে এল সে। মধু সগর্বে বলল, এই আমার মেয়ে।

রাঙা ফুল ? মনে মনে বললাম, কিন্তু একে যে এক্ষুনি হলুদ রঙের সূর্যমুখীর সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছি। নোংরা কাপড় পরনে, মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু তার মুখের রঙ আর চোখের চাহনিতে যেন ধন্য হয়ে গেছে ময়লা কাপড়খানা আর তেলহীন চুলের রুক্ষতা। সে দাঁড়িয়েছে তার বাপের গা ঘেঁষে। মনে হল, বাজে-পোড়া বটগাছের আশ্রয়ে যেন সদ্য একটা মল্লিকার চারা গজিয়ে উঠেছে। কি বলব ভেবে পেলাম না। নতুন কি বলে সুখ্যাতি করব একে। পবার রানী বলে তো অভিষিক্ত এ হয়েই গেছে।

এর পর মধু এসেছে অনেকবার। তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি। তার মেয়ের প্রসঙ্গও তুলিনি। মনে মনে ভেবেছি, চোখে যা দেখে এসেছি তা-ই লেগে থাক দু-চোখে, বেশি কিছু জানতে গেলে স্বপ্নের মতো সেই সৌন্দর্যটা হয়তো ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এক-একবার অনুশোচনাও হয়েছে। ভেবেছি না গেলেই হত পবায়। অকারণে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ আর অশান্তি এনে জড়ো করা হয়েছে। নিশ্চিন্ত আরামে নির্বিকারভাবে যেমন পড়ে থাকতাম নিজের ঘরে, তেমনি পড়ে থাকাই উচিত ছিল। আখেরের কথা ভাবতে গিয়ে এই অশান্তির দায়ে তাহলে পড়তে হত না।
সত্যি কথা বলতে কি, মধুর কন্যার কথা এখন প্রায় সব সময়ই ভাবি। ভাবি তার বাপের কথাও। এমন বাপ এমন মেয়ে পেল কোত্থেকে!
—ওর মাকে তো তবু দেখেননি বাবু। এ যদি হয় ফুল, সে ছিল তারা ; এ যদি হয় তারা, সে ছিল চাঁদিমা। চিকোলির নাম শুনেছেন, আর হরিনিয়ার ? এই দুই গাঁয়ের লোক পাগলা বনে গিয়েছিল, বাবু। দুজিয়া যদি পবার রানী, সে ছিল তবে দুনিয়ার রানী।
হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসল মধু গাউলি। অনেকক্ষণ বসে রইল সেইভাবে। মনে হল, সে যেন কাঁদছে।
দু-তিনবার ডেকেও উত্তর না পেয়ে উঠে গিয়ে তার পিঠে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললাম, এই মধু।
আমারই ভুল হয়েছে, সে কাঁদছিল না। দুই চোখ তার শুকনো, কিন্তু রক্ত-জবার মতো লাল।
—কি হল রে ?
—কুছ নেহি।

আর কোনো কথা না বলে উঠে সে চলে গেল।

মজা মন্দ না। কোথাকার একটা কে, তার জন্যে অশান্তির আর উদ্বেগের শেষ নেই। ত্মনিয়া খুঁজলে এমন কত মধুই হয়তো পাওয়া যাবে, আর এমন কত—থমকে গেলাম, না বোধহয়, এমন কত ত্মজিয়া হয়তো পাওয়া যাবে না। কেবল ত্মজিয়া নয়, সেইদিনকার সেই রক্তসন্ধ্যাটাও লেগে আছে আমার চোখে। প্রত্যহই তো পশ্চিমের আকাশে সেজেগুজে এসে দাঁড়ায় ও রক্তসন্ধ্যা, আগেও তো কত দিন কত বিচিত্র রঙের বাহার নিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে। কিন্তু পবার সন্ধ্যাটা সব সন্ধ্যাকে এভাবে ম্লান করে দিল কেন। শুধু কি সন্ধ্যাটাই, সেদিনের সেই দুই-চাকার টমটম গাড়িটাও একটা ছবির মতো লেগে আছে চোখে।

পবার পথে আবার একদিন সফরে বের হতে ইচ্ছে করে, কিন্তু মনে জোর পাই নে। আমি ছাড়া যার কথা সবাই জানে, সেই জানাজানির মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সংকোচে জড়োসড়ো হয়ে উঠি।

কেবল বেলফুল নয়, জবা জুঁই আর এক গুচ্ছ সূর্যমুখী এনে রাখল আমার টেবিলে মধু।

বললাম, আছিস কেমন ?

—ভালো।

—আর বাড়ির সকলে ?

মধু সরাসরি জবাব দিল, কে, ত্মজিয়া ? আচ্ছাই হ্যায়। লেকিন—

কি-যেন বলতে গিয়ে মধু থেমে গেল, দম নিয়ে বলল, লেকিন ওই ধরমদাস—

এ যে শোনা নাম। সোজা হয়ে বসে বললাম, সে কে ? কি হল তার ?

—কুছ নেহি।

মধু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম, বললাম, দাম, দাম নিয়ে গেলে না ?

দাম নাকি সে নেবে না। আজ এটা আমাকে ও ভেট হিসেবে দিল। নিজের গাছের ফুল, এতে তার আবার লোকসান কি। মধু হাসল। বলল, আমি ডাকু, আপ ভকিল।

আমাকে তাহলে বুঝি হাতে রাখতে চায় ? কখনো কোনো ফ্যাসাদে পড়ে গেলে আমাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল করাতে চায় ?

মধু আবার হাসল, অকপটেই বলল, জী হাঁ।
লোকটা তো চলে গেল হাসতে হাসতে। কিন্তু আমি ভয়ংকর দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম। ওর দেওয়া ফুল থেকে যে সুগন্ধ বের হচ্ছে, তাও ভালো লাগল না। অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলাম, খেয়াল হতেই দেখি, আমার হাতে সূর্যমুখীর গুচ্ছটা।

মধু নাকি বরাবর এমন ছিল না। এমন বর্বর আর এমন বীভৎস তাকে বানিয়েছে নাকি পাঁচজন মিলে। বহু দূরের সেই নাগপুর, সেখানকার সেই চিকোলি গাঁ, সেখানে ছিল তার ছোট ঘর আর ছোট সংসার, ছিল তার কয়েক ফালি চাষের ক্ষেত। চাষবাস করত দুজনে মিলে—সে আর তার জরু। কিন্তু দিন কি যেমন চাইবে তেমন চলে? সারাটা দিন ক্ষেতে খেটে ঘরে ফিরত। দুজিয়ার মা গাইত কাজরি গান, আর সে নাকি সুর বাজাতো কাঠের বাঁশিতে। সে-সব এখন খোয়াব। দুজিয়া তখন এতটুকু।
—সব ছিল, বাবু। ছিল না শুধু—মধু শূন্যে বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে বলল, ছিল না শুধু টঙ্কা। তাই রাখতে পারলাম না তার মাকে।
—সে বুঝি চলে গেল তোকে ছেড়ে?
ফোঁস করে উঠল মধু, বলল, ছেড়ে যাবার মেয়ে সে নয়। তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।
—কে?
একটু স্তব্ধ হয়ে বসে ফের শূন্যে ঝুন দিয়ে সে বলল, টঙ্কা। শেঠ গোবিন্দ। তার টাকা আছে। আমি পারব কেন? কেড়ে নিয়ে চলে গেল। শেঠজী বলে গেল, ও নাকি আমার ঘরে বেমানান।
—তোর বউ কি বলল?
—কুছ নেহি। বলতে দিল কই তাকে? সে শুধু কাঁদতে লাগল। হ্যাঁ, বলেছিল। বলেছিল, আমি যেন সবুর করি, সে ফের ফিরে আসবে। চার বরষ সবুর করেছি, ফিরতে পারেনি। তাই ঘর ছেড়েছি, ডেরা ছেড়েছি, মুলুক ছেড়েছি। ডাকু বনে গিয়েছি।
—খুন-টুন করেছিস নাকি কাউকে।
মধু বলল, না। লেকিন খুন চেপে আছে মাথায়। সাফ করব ওই ধরমদাসকে।

ফের সোজা হয়ে বসে বললাম, সে করেছে কি ?

—কুছ নেহি। শাদি করতে চায় তুজিয়াকে।

ছাঁত করে উঠল বুকের ভিতরটা, বললাম, বিয়েই যখন করতে চায়, তাতে খুন করার কি আছে?

খুন করার নাকি হেতু আছে। ধরমদাসের নাকি টঙ্কা নাই। যার টাকা নাই তাকে সে মেয়ে দেবে কেন? সে কি রাখতে পারবে, রুখতে পারবে? ছেলেটা নাকি নওহাটায় মুদির দোকান খুলেছে কিছুদিন হল। তাতে আর পায় কত?

—তোর মেয়ে যদি ভালো হয়—

মধু বলল, ওর মাও আচ্ছা ছিল, কিন্তু রুপেয়া ছিল না আমার। তাই হার হয়ে গেল।

—তবে মেয়ের বিয়ে কি দিবি নে?

—জরুর দেব। তাগত আছে টঙ্কা আছে এমন জবরদস্ত আদমি যদি পাই।

হেসে উঠলাম, বললাম, তোর মেয়ে যা দেখতে, ঢ্যাড়া পিটে দিলে লাখো লাখো লাখোপতি এসে হাজির হবে।

খুব খুশি হয়ে উঠল মধু। দাঁত বার করে হেসে ফেলল। ওই হাসির মধ্যে এক ঝলক যেন দেখতে পেলাম আসল মধুটাকে। বাইরে ওর যে চেহারা, সেটা যেন আসল চেহারা নয়। শেঠ গোবিন্দের দেওয়া একটা আবরণ মাত্র। লোকটা প্রচণ্ড ঘা তাহলে দিয়েছে মধুকে। দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে তাকে চলে আসতে হয়েছে এক অচেনা অজানা ভিনদেশে।

সে এসে এমন-একটা নির্জন ও নিরিবিলি জায়গা নাকি বেছে নিয়েছে অনেক ভেবে-চিন্তে। যেখানে অনেক টাকার মানুষ নাই, আর মানুষের টাকা নাই। যেখানে চিকোলির মতো অত মানুষের ভিড় নাই। এখানে সে তার মেয়েকে যাতে আগলে ঢেকে রাখতে পারে, এই ছিল তার ইচ্ছে। কিন্তু রেহাই কি তার আছে? পবার রাস্তা দিয়ে যে-ই যায়, সেই একবার তাকাবে তার ডেরার দিকে। তুজিয়ার নাম চারদিকে কী করে চালু হয়ে গেল, ভাবলে তার নাকি তাজ্জব লাগে।

সত্যিই তুজিয়ার নাম চালু হয়ে গেছে চারদিকে। আজকাল সাহেববাজারেও মেয়েটার রূপের সুখ্যাতি শুনছি। যারা বেশি উৎসাহী, তারা নাকি টমটম

চেপে পাখি শিকারের অছিলা করে পবার মাঠে আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। মধু গাউলির নামও ছড়াচ্ছে ক্রমশ। তার মেয়ের কাছে-ভিতে কাকপক্ষী যাতে না আসে, তার জন্যে সে নাকি হুঁশিয়ার। সে নাকি উগ্র আর রুক্ষ মূর্তি ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় চারধারে। যতই সে তার এই মূর্তি দেখিয়ে বেড়ায় ততই তার ডাকু নাম চালু হয়।

—কিন্তু বাবু, আমি কি ডাকু? ডাকু হলে কবে সাফ করে দিতাম ওই ধরমদাসকে।

ধরমদাস নাকি খুবই জ্বালাতন আরম্ভ করছে আজকাল। একটু ফাঁক পেলেই এসে বাগিচার আড়ালে দাঁড়িয়ে ইশারা করে তুজিয়াকে। তেড়ে যায় নাকি মধু। ধরমদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অমনি হাওয়া হয়ে যায় নাকি নওহাটার পথে।

মধুর কাছে গল্প শুনি, আর মনে হয় এ যেন সত্যিই একটা গল্প। তার সঙ্গে গিয়ে পবার মাঠে দাঁড়িয়ে এই তামাশা দেখার সাধ হয় এক-এক সময়। তামাশা দেখার ছল করে তার বাগানের সূর্যমুখী যদি দেখে আসা যায়, মন্দ হয় না নেহাত। কিন্তু মধু একবারও পীড়াপীড়ি করে না, টানাটানি করে না। মাঝে মাঝে আলগোছে তু-একদিন শুধু বলে তার ডেরায় একবার যেতে।

—তোর নাহয় পছন্দ না ধরমদাসকে। কিন্তু তোর মেয়ে কি বলে? তার কি মত?

মধু গুম হয়ে গেল, কোনো উত্তর দিল না।

আবার বললাম, মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিস?

মধু বলল, মেয়েও চায় ওকে, ধরমদাসকে।

পরামর্শ দেওয়ার মতো করে বললাম, তাহলে রাজী হয়ে যা। যা যার বরাতে আছে হবেই।

শক্ত হয়ে বসে মধু বলল, উঁহু। হয় না।

যা বুঝেছে, সার বুঝেছে মধু গাউলি। তার রকম দেখে মনে হচ্ছে এতটুকু কথার নড়চড় তার হবে না। শেঠ গোবিন্দ তার জীবনটাকে তাহলে কঠিন করে দিয়ে গেছে। তার নিজের কথা ভেবে না তুজিয়ার মায়ের কথা ভেবে সে এমন নির্মম হয়েছে, বোঝা যায় না। কিন্তু নির্মম সে হয়েছে। যুক্তি আছে অবশ্য মধুর। সে বলে, আজ তার মেয়ের চোখ-ছলছল দেখে সে যদি রাজী হয়ে যায় তার কথায়, তাহলে কাল তার সর্বনাশটা সে ঠেকাবে কী করে। ধরমদাসের মনও সে বুঝেছে। তবুও বুঝে-সুঝে সে আজ অবুঝ।

বললাম, ফুলের কারবার চলছে কেমন? অনেক দিন ফুলটুল আনো না। মেয়ের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তার নাকি শান্তি নেই। সে নাকি বাগান বাগিচা দেখা বন্ধ করে দিয়েছে প্রায়। রুজি-রোজগার যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্যে যেটুকু বিক্রি না করলে নয়, সেইটুকুই কেবল করে।

আবার পরামর্শ দিলাম, বললাম, ধরমদাসকে ডাকো। তাকে ভয় না দেখিয়ে একদিন এখানে নিয়ে এসো বলে-কয়ে। দেখি, সে কি বলতে চায়।

মধু আপত্তি করে বলল, হয় না। পেয়ে বসবে তাহলে। তা ছাড়া ভয় একবার ভেঙে গেলে সর্বনাশ।

—অদ্ভুত লোক বটে তুমি।

মধু মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, ঠিক বাবু, ঠিক। এমন মানুষ কখনো যেন না হন, এমন দাগা কোনো গোবিন্দ শেঠ যেন কখনো না দেয়। কারো যেন কলিজা কেউ ছিঁড়ে না নেয় এমন করে।

কেবল মালোপাড়ায় নয়, এ তল্লাটের কোথাও বেলফুলের হাঁক শোনা যাচ্ছে না অনেকদিন ধরে। লোকটা তার কলিজার চিন্তায় হয়তো মশগুল হয়ে গিয়েছে। ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দিনের ঘুম বর্জন করে অর্থ-অর্জনের অজুহাতে শুরু করেছিলাম আদালতে যাতায়াত। কিন্তু ও-পথ হয়তো আমার পথ নয়। কালে-ভদ্রে কখনো-সখনো দু-চার টাকা পেয়ে যাই বটে, কিন্তু তাতে মজুরি পোষায় না। তাই ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার এসে বিছানা নিয়েছি। আবার এসে কান পেতে শুয়ে থাকতে আরম্ভ করেছি, বেলফুলের ধ্বনি বেজে ওঠে কিনা তার প্রতীক্ষা করছি। মধুর ধ্বনিটা তো কিছুতেই আর শুনছি নে, বারান্দায় উঠে জানালা দিয়েও আর উঁকি দিচ্ছে না সে। ধরমদাসের উৎপাত তাহলে হয়তো আরো বেড়েছে, হয়তো সে খাড়া-পাহারায় নিযুক্ত আছে তার ডেরার আড়ালে।

হঠাৎ একদিন মধু এসে হাজির, বিনা নোটিশে, শুধু হাতে। জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। লাফ দিয়ে উঠে বললাম, কে? কে?

—আমি, বাবু, আমি মধু।

ভিতরে এসে সে বসল। তার রুক্ষ মুখখানা দুশ্চিন্তায় ভীষণ ভারী দেখাচ্ছে।

বললাম, খবর কি, মধু?

আশা করছিলাম, এখনি ধরমদাসের নামে অনর্গল অভিযোগ শুনব।

কিন্তু মধু বলল, তুজিয়া। তুজিয়া কথা শুনছে না কিছুতে। বেঁকে বসে আছে। মধু বলে গেল সব বিবরণ। কেন সে এতদিন ধরে ঘরের বার হতে পারে নি। কেন সে আটক হয়ে পড়েছিল তার ডেরায়। ধরমদাস নাকি ঠাণ্ডা হয়েছে। সে নাকি বুঝতে পেরেছে তুজিয়াকে পাওয়া তার বরাতে নেই। একদিন সে নাকি খপ করে ধরে ফেলেছিল ধরমকে, তাকে আচ্ছা করে বকে দিয়েছে। ধরমদাস ছেলেটা নাকি মন্দ না। দূর থেকে দেখে বোঝা যায়নি, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে নাকি ধারণাই বদলে গেছে মধু গাউলির। তুজিয়ার উপর তার যে টান, সে টানে নাকি কোনো ভেজাল নেই—মধু বুঝতে পেরেছে। কিন্তু বুঝেও তার উপায় নেই। সে তার মেয়ের সর্বনাশ করতে পারে না। মেয়ের মনের মতো লোকই যদি তার হাতে তুলে দিতে হবে, তাহলে কেন জন্মাল আগুনের মতন অমন রূপ নিয়ে?

বললাম, খুলে বলো। এখন বিপদটা কি?

—বললাম যে তুজিয়া। ছেলেটার রূপ আছে, আর তার চেয়েও বড়ো কথা, টঙ্কা আছে। কিন্তু রাজী না তুজিয়া।

মধুর কোনো কথাই বুঝতে পারলাম না। বড়োই এলোমেলো ভাবে কথাগুলি বলতে লাগল। বিরক্তই হচ্ছিলাম। বললাম, যাক গে। তোমার কথা শুনে আমার দরকার নাই।

মধু আমার দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম লাল। সে যে ভীষণ সংকটে পড়েছে, তা তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা গেল। আমার কথায় হয়তো তাপ প্রকাশ করে ফেলেছি, সে সেই টকটকে লাল চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাল খুবই অসহায়ের মতো।

বললাম, বলো।

ধরম নাকি তার দিলের পরিচয় দিয়েছে। জবর পরিচয়ই নাকি দিয়েছে ধরমদাস। সে নাকি তুজিয়াকে দিয়ে দিতে রাজী হয়েছে অন্যের হাতে। কিন্তু যার-তার হাতে নাকি সে দেবে না, সে দেবে তার আপনজনের হাতে। মধুর কাছে নিয়ে এসেছিল নাকি সে তার এক ইয়ারকে। এই টাউনেরই মোহনলালের ব্যাটা, পান্নালাল। অনেক টাকা তার—বিস্তর কাজ-কারবার। মধুর নাকি পছন্দ হয়েছে তাকে। মনে মনে যেমনটি সে ভেবে রেখেছিল, এ ছেলে নাকি ঠিক তেমনটিই। ছেলেটি ধরমদাসের দোস্ত।

মধু একটু থামল, রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, লেকিন—

বললাম, লেকিন আবার কী রে। তাহলে দিয়ে দে। মোহনলালকে সকলে চেনে। তার ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে পারিস, তাহলে তোর মেয়ের বরাতই নয়, তোরও বরাত বলতে হবে।

কিন্তু মধু আবার নিশ্বাস ফেলে বলল, লেকিন, লেকিন হুজিয়া এতে গররাজী।

—সে বলে কি?

—সে বলে ধরমদাস।

ব্যাপারটা তাহলে গুরুতর। তার মেয়ের মনে যে রং লেগেছে, তা বেলফুলের মতো সাদা ধবধবে নয়, জবার মতোই টুকটুকে রাঙা, কিংবা সেদিনের সেই সন্ধ্যামেঘের মতো রঙ-বেরঙের।

—ধরমদাসকে ঠাণ্ডা করলি, এবার মেয়েকে ঠাণ্ডা কর।

মধু উঠে দাঁড়াল, বলল, তাই করব।

আর কোনো কথা নয়, চলে গেল মধু গাউলি। সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার বুকটা কাঁপতে লাগল দুরদুর করে। ও তো একটা ডাকু। রাগের মাথায় আবার যা-তা সে করে না বসে।

কিন্তু যা-তা করে সে বসেনি। দিন কয়েক বাদে এসে বলে গেল, রাজী সে করিয়েছে। ধরমদাসকে দিয়ে সে বলিয়েছে, তবে নাকি রাজী হয়েছে তার মেয়ে।

বললাম, সাবাস মধু, সাবাস তোর গোঁ।

মধু হেসে বলল, গোঁ আমার কি দেখলেন বাবু, মেয়ের গোঁ যদি দেখতেন।

মধু গাউলির মেযের বিয়ে মোহনলালের ছেলের সঙ্গে। শহরে হুলুস্থূল পড়ে গেল। বুনো ফুল না, বনফুল নাকি নিয়ে আসছে মোহনলাল তার ছেলের জন্যে। এইবার নাকি মেয়েটার আসল রূপ খুলবে। ধুলো-ময়লায় অভাবে-অনটনে যে রূপ ছিল খানিকটা আড়াল করা, এবার চুনিপান্নার ঝকমকে সাজে সেই রূপ নাকি ঝলমল করে উঠবে।

লোকটার ফুলের বেসাতি সার্থক হল। এবার আসল ফুলের তোড়াটাই সে ভেট দিয়ে গেল এই শহরকে—বোয়ালিয়াকে।

মোহনলালের দোকানের সামনে ভিড় জমে। লোকের কৌতূহলের আর সীমা নেই।

মধু ধরে নিয়ে গেল আমাকে। বিয়ে দেখাতে হয়তো ততটা নয়, ধরমদাসের

কাণ্ড দেখাতে। সত্যি, কাণ্ডই করেছে ধরমদাস। গাছ কেটে এনে এনে পাতার ঝালর দিয়ে বড়ো বড়ো ফটক বানিয়েছে ধরম। দিন-দুই তার নাকি খাওয়া নাই, ঘুম নাই। সে মধুর বাড়ি সাজাচ্ছে। বাগানটা তার ঘরের একটা কোণে, সে বাগান সেখানেই আছে। কিন্তু পাতাবাহারের চারা এনে নওহাটার রাস্তা থেকে মধুর ঘর অবধি বড়ো মাঠটা ফেলেছে সাজিয়ে। মস্ত একটা বাগান বানিয়েছে যেন। এর আগে একবার মাত্র এসেছি এখানে। সেই একবারের দেখাতেই জায়গাটা চেনা হয়ে আছে। কিন্তু আজ তা চেনার উপায় রাখেনি ধরমদাস।

মধু ধরমদাসের তারিফ করছিল, আর মেয়ের সৌভাগ্যের জন্যে গর্ব করছিল। ওর মধ্যেই একবার বলল, ওর কলিজা ছাতু হয়ে গেছে।

—কার?

—ধরমদাসের।

মধু তাহলে ধরমদাসেরও কলিজার খবর রাখে! এত পাতাবাহারের বহর আর ঝাউগাছের ঝালর দেখে তার মধ্যে থেকেও সে-যে কলিজার খবরটা পেয়েছে, এই ঢের।

বললাম, মধু, ভুল করলে না তো?

মধু বলল, নেহি, পান্নালাল ভি শেঠ আছে।

—মেয়ের কলিজার খবর কিছু বলো। আহত সিংহকে খোঁচাই দিলাম হয়তো।

কিন্তু মধু হুংকার দিয়ে উঠল না, বলল, ঠিক হয়ে যাবে। রুপেয়া পাবে, সোনা পাবে, চাঁদি পাবে, মোহর পাবে। বিলকুল ভুলে যাবে।—ছলছল করে উঠল মধুর চোখ।

মধুর চোখ ছলছল করে উঠল কেন, হঠাৎ তা ধরতে পারলাম না। একটু পরে মনে হল, এটা বুঝি তার জীবনের অভিযোগ, কিংবা কারো উপর অভিমান।

মধুকে ওসব নিয়ে আর ওস্‌কালাম না। একমনে আমি সদ্যসাজানো মধুর বাড়ির চারদিকে তাকাতে লাগলাম। মুদির দোকান নাকি খুলেছে ধরমদাস। কিন্তু সেই মুদির মনের মধ্যেও মৌ আছে। ছক এঁকে নেয়নি, নকশা কষে নেয়নি; হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই টেনে এনে সে দিব্যি একটা বাগান বানিয়ে তুলেছে পবা-পল্লীর এই তৃণ-ঢাকা মাঠে। একদিন মধুকে সাবাস

দিয়েছিলাম মনে পড়ে, আজ ধরমদাসকে ডেকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করছে।

মধু বলল, ও খাটছে নেশার ঝোঁকে।

—সে কি রে? গাঁজা-ভাং খায় নাকি? চমকে উঠে বললাম।

মধু হাসল, বলল, ওসব নেশা নয়। তার চেয়েও বহুৎ কড়া নেশা—মহব্বত।

আড়চোখে তাকালাম মধুর দিকে। লোকটা সব বুঝছে, তবুও নরম হচ্ছে না এতটুকু, এতটুকু মচকাচ্ছে না। আশ্চর্য জিদ বটে। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে সে হয়তো দেখছে ধরমদাসের নেশার ঝোঁক। মনে মনে হয়তো দরদও জাগছে একটু-আধটু; কিন্তু তার বাত মরদের বাত—সে আর নিজের কাছে হার মানতে রাজী নয়।

সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল গ্যাসের আলো। কারবাইডের গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে গেল। ওদিকে বিয়ের আসরের দিকে আরো জোরালো বাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে দেখলাম। তিনটে হ্যাজাক আনা হয়েছে, ধরমদাস উবু হয়ে বসে আলোয় পাম্প্ দিচ্ছে। তার গায়ের সব শক্তি আজ বুঝি সে উজাড় করে দিতে চায়। ঘামে ভেজা মুখ এই আলোয় চিকচিক করছে, গলা বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

ধরমদাসের জীবনে আজ হয়তো চরম ট্র্যাজিডি। সেই ট্র্যাজিডির আঘাত চাপা দেওয়ার জন্যেই সম্ভবত তার এই প্রাণপণ উদ্যম।

ভেবেছিলাম, বিয়ে হয়ে যাবার পর ধরমদাস হয়তো কিছু-একটা কাণ্ড করে বসবে। কিন্তু আশ্চর্য, অনেক রাত্রে বিয়ে যখন সত্যিই হয়ে গেল, ওদিকে ব্যাগপাইপের হাওয়া ফুরিয়ে বাঁশির শেষ স্বরটা যখন শূন্যে মিলিয়ে গেল, তখন আমি ধরমদাসের সন্ধানে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখি পান্নালালের কানে কানে সে কথা বলছে আর ইশারা করে তার নতুন বউকে দেখিয়ে মশকরা করছে। পাতলা ওড়নার জাল ভেদ করে তুজিয়ার রূপ তখন হ্যাজাকের তেজী আলোর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে।

আশ্চর্য সহ্যগুণ বটে ছোকরার। মধুর ভাষায় বলতে গেলে—নিজের কলিজাটা উপড়ে নিয়ে সে ভেট দিয়েছে তার দোস্তকে। একেই দোস্তি বলে, না, একেই বলে মহব্বত?—মধুর এ কথার জবাব দিতে পারিনি।

মধু টাউন ছেড়ে চলে গেছে। এইখানেই এই কাহিনী শেষ হওয়ার কথা। আর তো কিছুই বলার কথাও নেই। যে টাউনে মেয়ে লাখপতির ঘরে চুনি-পান্নায়

সেজে বসে আছে, সেই টাউনে সেই মেয়ের বাপ রাস্তায়-রাস্তায় ফুল ফিরি করে বেড়াতে পারে না।

সুতরাং বোয়ালিয়া আজ বেলফুলের হাঁক শুনতে ভুলে গেছে। ক্রমশ দুজিয়ার কথাও বোয়ালিয়াবাসীর মন থেকে মুছে যায়। ধরমদাসের মন থেকেও হয়তো ঠিক এমনিভাবেই মুছে গেছে দুজিয়া।

এইখানে উপসংহার টেনে অনেক রাত্রে কাগজপত্র গোছগাছ করে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মন বেশ প্রফুল্ল বোধ হতে লাগল। এতটুকু না ফুলিয়ে বা না ফাঁপিয়ে ঘটনাটাকে যে সাজিয়ে-গুছিয়ে অবিকল লিখে ফেলা গেছে, এতে আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক। আদালতে যার কোনো পসার নেই, তার সময় কাটাবার জন্যে মধু যে এই মসলাটুকু দিয়ে গেছে চোখ বুজে সেজন্য মধুকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। মনে হল, বেশ জমে গেছে কাহিনীটা, শেষটাও হয়েছে বেশ ট্রাজিক। পাঠকের মন চট করে দখল করার উপযুক্ত ঘটনাই বটে। তৃপ্তিতে ভরে গেল মন, আত্মবিশ্বাসও এসে গেল অগাধ। মনে হল, গল্প লেখা এমন-একটা কিছু হৈহৈ-রৈরৈ ব্যাপার নয়। সংকল্পও করে ফেললাম, আদালত বাদ দিয়ে এবার এই লাইনেই সবটা মন দিতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরের দিকে হৈহৈ-রৈরৈ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তা দিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। লাফ দিয়ে উঠে বাইরে এলাম। ব্যাপার কি? মোহনলালের ছেলে পান্নালাল নাকি খুন হয়েছে।

—কোথায়? কি করে?

কেউ কিছু জানে না। আগুনের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। তাই সমস্ত শহরটাই ছুটছে একদিকে।

মুশকিলেই পড়া গেল। যে কাহিনীর উপসংহার টানা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে আবার এই টানাটানি কেন।

চোখ থেকে ঘুম রগড়ে মুছে ফেলতে ফেলতে ছুটলাম আমিও। কিন্তু মোহনলালের বাড়ির ত্রিসীমানায় পৌঁছবার উপায় নেই। লোকে লোকারণ্য, আর পুলিসের ভিড়। কেউ সঠিক কিছু বলতে পারে না। অথচ প্রত্যেকেই একটা-না-একটা বিবরণ দেয়। বেগতিক দেখে চলে এলাম।

দুপুরের দিকে একটু-একটু করে কিছু খবর পাওয়া গেল। মাঝ রাত্রে নাকি এই কাণ্ডটা ঘটেছে। দুজিয়ার বিকট চিৎকার শুনে নাকি বাড়ির লোকজনের

ঘুম ভেঙে যায়, তারা ছুটে যায় উপর-তলার ঘরে, তুজিয়া তখন নাকি ঘরময় দাপাদাপি করছে। ইতিমধ্যে একটা ছায়ামূর্তি নাকি প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। সবাই স্পষ্ট দেখেছে। রক্তমাখা ছুরিটা নাকি ঘরের মধ্যেই পড়ে ছিল।

প্রথমেই আমার মনে হল, মধুর কথা। লোকটা তো রগ-চটা, আর ডাকু বলে সকলেই তাকে জানে—ওই হয়তো করেছে এই কাণ্ড। কিন্তু অনেকদিন তো সে শহর-ছাড়া।

বিকেলের দিকে তুজিয়া একটু শান্ত হলে তার জবানবন্দী নাকি নেওয়া হয়েছে। সে কিছু গোপন করেনি, পরিষ্কারভাবে সে তার জীবনের সব ঘটনা নাকি বলে দিয়েছে অকপটে। সেই জবানবন্দীর উপর নির্ভর করে পুলিসের নাকি সন্দেহ হয়েছে ধরমদাসের উপর, সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই নওহাটায় তাকে তাই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধরমদাসের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ভড়কে গেলাম। তার মতো নিরীহের উপর যদি পুলিসের সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে আমার উপর হতেই-বা কতক্ষণ। আমিও তো জড়িয়ে পড়েছিলাম ওদের সঙ্গে। তাছাড়া যে কাহিনীটা লিখে রেখেছি তার মধ্যেও তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করা আছে যে, ওই সূর্যমুখী আমার মনেও একটু রঙের ছোপ লাগিয়েছিল। লেখাটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েছিলাম; কিন্তু মায়া হল। তাই পুরনো বইপত্রের মাঝখানে গুঁজে রেখে দিলাম।

যে আদালতের মায়া ত্যাগ করে মনকে অন্য পথে চালনা করব বলে সংকল্প করে ফেলেছিলাম, সেই আদালতই এবার আমাকে টানতে লাগল। রোজ যেতে শুরু করলাম কোর্টে। পান্নালাল খুনের মামলা চলেছে। আদালত সরগম।

সাক্ষী-সাবুদের শেষ নেই, মোহনলাল থেকে শুরু করে তার বাড়ির কনিষ্ঠতম চাকরটিকে পর্যন্ত হাজির করা হচ্ছে। যে যেটুকু জানে সে তাই বলে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে সুরাহার কোনো ইঙ্গিতই জুটছে না। পসার আমার নেই বটে, কিন্তু আইন যখন পাস করতে হয়েছে তখন তার ধারা-উপধারার সামান্য কিছু অন্তত বুঝি। আমার বুদ্ধিতে তো এ মামলার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হল না।

আসামীর কাঠগড়ায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ধরমদাস। একটা পাথরের মূর্তির

মতো। সে যেন এইসব ব্যাপারে স্তব্ধ আর বোবা হয়ে গেছে। একটা কথা বলে না, একটা আপত্তি জানায় না।

কয়েকদিন বাদে আদালতে এল পবার রানী। রূপের বন্যায় ভেসে গেল আদালত-প্রাঙ্গণ আর বিচার-গৃহ। সূর্যমুখীকে আজ দেখাচ্ছে এক অপরাজিতার মতো।

এতটুকু গলা কাঁপল না তুজিয়ার। কোনো সংকোচও তার নেই, কোনো শঙ্কাও নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গলায় সে সব কথার জবাব দিতে লাগল।

হ্যাঁ, প্রেম তার ছিল ধরমদাসের সঙ্গে। তার শাদির পরেও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হত। প্রকাশ্যেও, গোপনেও। তার উপর ধরমদাসের কেন, ধরমদাসের উপরও তার টান ছিল। এ কথা প্রকাশ করায় আজ আর তার ভয় নেই।

কোনো দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে বলে গেল তুজিয়া। জবানবন্দীতে সে যা বলেছে, আদালতের এত লোকের সামনেও সে সেই কথাই বলতে লাগল। গলা কাঁপল না।

তারা তুজনেই তুজনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পাগল হয়ে থাকত নাকি। একদিন দেখা না হলে মন-মেজাজ বিগড়ে যেত, সব আঁধার ঠেকত। পান্নালাল একটু-একটু বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে তো অনেকদিনের কথা। যেদিন ধরমদাস টের পেল যে, পান্না একটু-আধটু জেনেছে, সেই দিন থেকে ধরম বন্ধ করে দিল আসা।

—তারপর ?

তার পর কেটে গেল তু-বরষ। এবার রথের সময় পান্নার সঙ্গে সে গিয়েছিল মেলায়, শিবপুরে। সেখানে হঠাৎ ধরমের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে ধরমের চোখ নাকি ভিজে ওঠে, সে তার পাশে এসে বলে, তার জীবন নাকি ফাঁকি হয়ে গেছে, ফাঁকা হয়ে গেছে।

—তারপর ?

তার কয়েকদিন পর খুন হয়ে গেল পান্নালাল।

আদালত থেকে প্রশ্ন করা হল, কে খুন করেছে, দেখেছ তাকে ?

তুজিয়া স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, ঘাড় নেড়ে জানাল, সে দেখেছে।

—তাকে দেখলে চিনতে পারবে ?

—পারব।

মামলা প্রায় খতম হয়ে এসেছে। সারা আদালত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ডুজিয়ার শেষ কথাটার উপর। কিন্তু ধরমদাস অটল।

আদালত আঙুল দিয়ে বলল, একে চেনো?

ডুজিয়া এবার চোখ তুলল, সরাসরি তাকাল ধরমদাসের দিকে। ধরমদাস নিশ্চল, কিন্তু থরথর করে একবার মাত্র কেঁপে উঠল তার ঠোঁট দুটো।

—চিনি। ধরমদাস।

—এই তবে সেই খুনী?

ডুজিয়া একটু থামল, একটা অসহ্য আবেগে চোখ বুজে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সে বলে উঠল, নেহি, নেহি।

আশ্চর্য, পাগলা সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউ ডিঙিয়ে নদীর উজান স্রোত উপেক্ষা করে এ যেন ঘাটের পাষাণে লেগে নৌকাডুবির মতো।

সারা আদালত কিনারার প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছিল এক নিমেষের মধ্যে সকলে সদলে যেন তলিয়ে গেল।

অনেক চাপ দেওয়া হল ডুজিয়াকে। কিন্তু তার কথার নড়চড় নেই। সে খুনীকে দেখেছে বলেই সে খুনী ধরমদাসই, তা কেন। ধরমদাস তাকে চায় বলেই সে তার দোস্তকে জবাই করবে, তা কেন। খুনীকে ধরে এনে দেখিয়ে দাও, সে চিনতে পারবে; কিন্তু তার চেনা লোককে ধরে আনলেই তাকে খুনী বলে দেখিয়ে দিতে হবে, তা কেন।

বড়ো বিপদেই ফেলল সকলকে এই গাউলি মেয়ে। তার মুখ থেকে একটা কথা পেলেই ধরমদাসকে লটকে দেওয়া যায়। জেরায় জেরায় অতিষ্ঠ করে তোলা হল ডুজিয়াকে। কিন্তু তার কথার নড়চড় নেই।

ধরমদাস কাঠগড়ায় রেলিঙে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর ডুজিয়ার দিকে। মনে পড়ছিল ডুজিয়ার বিয়ের রাত্রের সেই সমারোহ, পাতাবাহারের সেই বাহার, আর হ্যাজাকের সেই তীব্র আলোর ছটা।

অগত্যা ধরমদাসকে আর ধরে রাখা যায় না। তাকে খালাসই দিতে হল।

ডুজিয়া নেমে চলে যাচ্ছিল কাঠগড়া থেকে, ধরমদাস দু-পা এগিয়ে এল তার কাছে—হয়তো কৃতজ্ঞতা জানবার জন্যে। কিন্তু তাচ্ছিল্য, ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা, ঘৃণা—কী নয়—একসঙ্গে সব ফুটে উঠল ডুজিয়ার মুখে। ধরমদাসের দিকে

অবহেলার দৃষ্টিপাত করে এগিয়ে গেল তুজিয়া। নির্মম গলায় বলল, পথ ছোড়ো।

থমকে গেল ধরমদাস। তুজিয়ার এই গলা শুনে সে যেন চমকে গেল। তবু আবার এগলো আর এক পা। অনুনয়ের স্বরে বলল, তবে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে কেন?

ব্যঙ্গের হাসি হাসল তুজিয়া, এবং হয়তো-বা বিদ্রূপেরও। সন্ধ্যার সূর্যমুখীর মতো তার মুখখানা ম্লান ও বিবর্ণ। কোনো কথা সে বলল না। মোহনলালের ঝকঝকে মোটর গাড়িতে চেপে হুশ করে চলে গেল। আদালতের বারান্দা থেকে একটা বিরাট জনতা এই দৃশ্য দেখল।

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে নেমে যাচ্ছিলাম। সিঁড়ির উপর, এ কে? মধু?

মধু উঠে দাঁড়াল, বলল, খবর শুনে সে এসেছে কয়েকদিন হল।

—কোথায় থাকো এখন? জিজ্ঞাসা করলাম।

—ডিব্রুগড়। তেল-খনিতে খাটি।

বললাম, দেখলে ব্যাপারটা?

মধু হাসল, বলল, আমার ডাকু নামটা বিককুল মুফত। ধরমদাস আছে সাচ্চা চিজ।

হঠাৎ মধুর চোখ রাঙা হয়ে উঠল জবাফুলের মতো। বলল, চলি বাবু-সাহেব।

—কোথায় চললে? ডিব্রুগড়ে?

রুখে দাঁড়াল মধু গাউলি, তার মূর্তি দেখে মনে হল তার মাথায় খুন চেপে গেছে, বলল, নেহি। চিকোলি।

প্রতিভা বসু (১৯১৫—) ॥ নিরুপমার চোখ
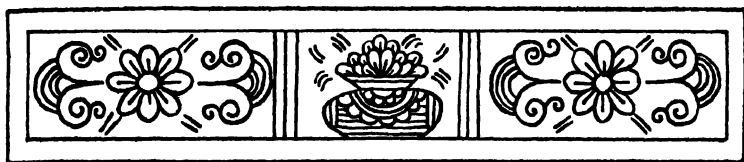
নিরুপমাকে আমি পড়াই। পড়াই আমি দু-বছর ধরে, তখন নিরুপমা ছিল চোদ্দ বছরের মেয়ে, এখন তার ষোলো। ওর ঠাকুরদা বলেন, এই সবে বারো পেরিয়ে তেরোয় পা দিল।

অতিশয় সনাতনী ভাব ওর বাপ-ঠাকুরদার। যতক্ষণ পড়াই সমস্তক্ষণ ওদের পুরনো আমলের চাকর হরিসাধন শাসক এবং প্রহরীরূপে সেখানে মোতায়েন থাকে, মাঝে মাঝে ওর কর্মহীন ঠাকুরদাও তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে আসেন নাতনীকে দেখতে। আর নিরুপমা নতমুখ আরো নত করে,তার সংকুচিত দেহ আরো কুঞ্চিত হয়। শীতে-গ্রীষ্মে তাকে পুরোহাত জামা পরতে দেখি, তাছাড়া সমস্ত শরীরকে সে শাড়ি দিয়ে এমনভাবে আবৃত করে রাখে যে একমাত্র হাতের আঙুল কটি ছাড়া আর কিছুই দেখবার উপায় নেই। মুখখানা এতই নিচু করে রাখে যে টানা ভুরুর তলায় ফোলা ফোলা দুটি চোখের পাতা আর টিকোলো নাকটিই শুধু চোখে পড়ে। অদ্ভুত মাস্টারি আমার। এরকম বোবাকে পড়ানো যে কী দুঃসাধ্যসাধন তা কেবল আমিই জানি। অনেক দিন বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছি কিন্তু মন থেকে সায় পাইনি। মাস গেলেই কুড়িটা টাকা, অতএব লজ্জাই স্ত্রীলোকের অঙ্গের ভূষণ বলে নিরুপমাকে দু-বছর যাবৎ কেবল ক্ষমাই করে আসছি। নিরুপমার ঠাকুরদা বলেন, তাঁদের নিরুর বয়স তেরো হলে কি হবে, দেখতে সে বেজায় বড়ো হয়ে গেছে, যদি ভালো ছেলে-টেলে খোঁজে থাকে—আমি মুখে বলি 'নিশ্চয় নিশ্চয়', আর মনে মনে ভাবি ঐ বোবাকে বিয়ে করতে বয়ে গেছে মানুষের। এমন অশিক্ষিত লজ্জার স্তূপ নিয়ে মানুষ করবে কী? আড় চোখে চেয়ে দেখি তার মুখের ভাব কিছু বদলাল নাকি, কিন্তু আশ্চর্য, চোখের পাতাটি পর্যন্ত তার নড়ে না।

আমার নাম বিমলানন্দ। থার্ড ইয়ারে উঠেই এই টিউশনিটা পেয়েছিলাম। বাপ অর্ধ পয়সারও মালিক করে যাননি। বিধবা মাকে নিয়ে জ্যাঠার আশ্রয়ে দিন কাটছিল। স্কলারশিপের টাকায় পড়া চলত, এই টিউশনিটা পেয়ে হাতে স্বর্গ পেলাম। নিরুপমার বাবা সদানন্দবাবু আমার বাবাকে চিনতেন এবং আমাদের বর্তমান অবস্থা জানতেন বলেই অবিশ্যি আমার ভাগ্য খুলেছিল। নচেৎ আমার মতো একজন যুবক যে তাঁদের মেয়ের মাস্টারি করছে এটা ভারী আশ্চর্য। আমি রোজ সকালে সাড়ে ছটা বাজতেই পড়াতে যাই। গেলেই সর্বপ্রথম ঠাকুরদা উঁকি দেন, তারপর আসে নিরুপমার ছোট ভাই শঙ্কর— অবশেষে হরিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত মৃদুগমনা নিরুপমা বই আর কাপড়ের স্তূপ সামলাতে সামলাতে এসে আমার উল্টো দিকের চেয়ারে বসে। লজ্জাটা ছোঁয়াচে, আমারও যেন চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করে তবু গলা-খাঁকারি দিয়ে নড়ে-চড়ে বসি। নিঃশব্দে নিরুপমা হোমওয়ার্কের খাতাটি বের করে, আর আমি সেটা টেনে নিয়ে ভুল থাকলে শুদ্ধ করি। ততক্ষণে জানি নিরুপমা ইংরেজি বইয়ের নির্দিষ্ট পাতায় চোখ ডুবিয়েছে। নির্ভুল গতিতে চলে এই নিয়ম।

আমাদের পাড়ায় একটি মেয়ে আছে। তার নাম সুমি অর্থাৎ সুমিতা। এ মেয়েটি আবার একেবারে নিরুপমার উল্টো। লজ্জা-সরমের বালাই নেই, সময় অসময়ে ছুটে ছুটে এ বাড়ি আসে, আমি নেহাত পর জেনেও আমার সঙ্গে ফাজলেমি করে, ঘুমিয়ে থাকলে মুখে চুনকালি মেখে রাখে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত করে এবং নাম ধরে ডাকে। আমি কখনো কখনো অন্যের সামনে ভারী কুণ্ঠিত বোধ করি। কিন্তু ওর সংকোচ নেই। ওর বাবার পয়সা আছে, কাজেই প্রতিপত্তিও আছে। অতএব আমার জ্যাঠাইমা আড়ালে ওকে অসভ্য মেয়ে বলে অভিহিত করেন এবং সামনে প্রশ্রয়ের সীমা থাকে না। আমার মা ওকে সত্যই ভালবাসেন। আমার এক বোন অল্প বয়সে মারা যায়, বেঁচে থাকলে অত বড়োই হত, হৃদয়ের এই দুর্বলতার সুযোগেই সুমি আরো আপন হয়ে ওঠে মার কাছে। সুমির বয়স যাই হোক, তার সরলতা ও নিঃসংকোচ দাপাদাপি সত্যিই মমতা কাড়ে। দৃষ্টিকটু হলেও অনেক সময় তাকে বকতে মায়া হয়। আমার মা বলেন যত মেয়ে তিনি আজ পর্যন্ত দেখেছেন তার মধ্যে সুমির মতো ভালো তার কাউকেই লাগেনি। এমন-কি নিজের মেয়ে থাকলেও ওর চেয়ে বেশি ভালবাসতেন কিনা সন্দেহ। আমি ঠাট্টা করে বলি নিজের মেয়েকে

না হতে পারে বৌকে নিশ্চয়ই বেশি ভালবাসবে। মা হাসেন, তারপর বলেন, কপালের কথা বলা কি যায়! সুমির বাবার বিদ্যানুরাগ আছে। কথাটা খচ করে বেঁধে মনের মধ্যে। ও, এই বুঝি মা-র মনের কথা! এক রবিবার দুপুরে নিরালা বুঝে খপ করে সুমির আঁচল টেনে বলি, 'এই সুমি'--
ভুরু কুঁচকে সুমি জবাব দেয়, 'কী ?'
জবাবটার মধ্যে একটুও যদি রস থাকত!—'সারা দুপুর এরকম ছুটোপুটি করো কেন ?'
'তাতে তোমার কী ?'
'আমার ভালো লাগে না।'
'না লাগলো তো বয়ে গেল।' সুমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যেতে চায়।
'যেও না শোনো—'
'না, আমি শুনব না।'
'কেন শুনবে না ?'
'আমার ইচ্ছে।'
'না, অত ইচ্ছে আর খাটবে না—তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে অঙ্ক কষতে বলেছেন দুপুরবেলা।'
'ঈস্'—সুমি আমার হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে।
আমি শক্ত করে চেপে রেখে বলি, 'তোমার একটুও লজ্জা নেই কেন ? আমার ছাত্রী নিরুপমা তোমার চাইতে মাত্র এক বছরের বড়ো, সে আমার কাছে দু-বছর ধরে পড়ছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সে আমার দিকে চোখ তোলেনি।'
এবার কিন্তু অত বড়ো নির্বোধ সুমিরও আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। ভারী আশ্চর্য, যত বোকাই হোক বা যত সরলই হোক মেয়েরা কখনোই অন্য মেয়ের প্রশংসা সইতে পারে না। তাই সুমির ঐ শিশু চোখেও একটু অভিমানের আভাস দেখা দেয়। বলে, 'সে-কথা আমাকে বলবার হয়েছে কী ?'
হেসে বলি, 'তাতে যদি তোমার একটু শিক্ষা হয়।'
'শিক্ষা ?'—আচম্বিতে সুমি প্রচণ্ড এক চিমটি কেটে পালিয়ে যেতে যেতে বলে, 'ওসব শিক্ষা তোমার ছাত্রীকেই শিখিও, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

মা-র পছন্দ যে একটুও ভালো না সে বিষয়ে এবার নিঃসন্দেহ হই। মা-র আসল নজর কি ঐ সুমিই, না সুমির বাপ ? মা-র মুখে অনেক দিন শুনেছি

আমাকে বিয়ে দেবেন মুরুব্বী দেখে। তাঁর আইডিয়েল মুরুব্বী বোধহয় তাহলে সুমির বাবাই। মার ঘরে গিয়ে দেখি সুমি আচার খাচ্ছে চেটে চেটে। শুনতে পাই, 'কাকিমা, কী সুন্দর আচার করো তুমি।' কাকিমা বলেন, 'আর একটু খাবি নাকি?' সুমি নিশ্চয়ই আরো চাইত। আমাকে দেখেই বলে, 'ঐ এসেছেন তোমার আদুরে ছেলে—এখানে কেন, যাও না তোমার ভালো ছাত্রীর বাড়ি।'

আমি বলি, 'মা, সুমিকে আর আচার দিও না, ওকে অবিশ্রান্ত প্রশ্রয় দাও বলেই ও আমাকে মান্য করে না।'

'আহা রে—কী আমার মান্যবরেষু!' মুখের এক অপূর্ব ভঙ্গি দেখিয়ে সে আবার আচারে মনোনিবেশ করে। মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলি।

দিন কয়েক পরে মা হঠাৎ বলেন, 'বিমল, এখন তো তুই বিয়ে করলেও পারিস।' বিস্মিত চোখে তাকাই—মা কি লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখেছেন নাকি? আমি যেখানে নিজেই পরান্নে প্রতিপালিত সেখানে আমার অন্নপুষ্ট হবার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ করা কি একান্তই পাগলামি নয়? মা-র মুখ কিন্তু হাসি হাসি। বলেন, 'কথায় কথায় তোর জ্যাঠা সুমির সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পেড়েছিলেন—সুমির বাবার আপত্তি নেই। ঐ তো একমাত্র মেয়ে, ভদ্রলোক তো টাকা দিতে অপারগ নন—তিনি ঠিক এইরকম ছেলেই চান যাকে নিজের মনমতো গড়ে নিতে পারবেন।'

মা-র কথা শুনে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে আমার। ভুরু কুঁচকে বলি, 'গড়ে নেওয়া মানে? আমি কি একটা মাটির ডেলা?'

নিতান্ত নিরুদ্বেগে মা বলেন 'এই বিলেত-টিলেত পাঠানো আর কি!'

বিলেত! আজন্মের স্বপ্ন আমার বিলেত। মনের ভাব চেপে একটু চুপ করে থেকে বলি, 'যত সব বাজে কথা তোমাদের, খেয়ে-দেয়ে কি আর কোনো কাজ পাও না?'

এবার মা রাগ করে বলেন, 'তোর ভালোর জন্যেই আমার চিন্তা তা নইলে আর কি। এ বিয়ে যদি তোর হয় তাহলে বুঝবি নিতান্তই তোর বরাত ভালো। রাজকন্যা আর রাজত্ব তোর কাছে আপনা থেকেই—'

'থাক, থাক'—মাকে আর কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে সেখান থেকে পালাই। কিন্তু কথাটা ভাববার মতো বইকি! টাকার আমার নিতান্তই

দরকার—তবু বিয়ের কথাটা আমার যেন কিছুতেই ভালো লাগে না। বাড়িতে চলছে ফিসফাস গুঞ্জন—সুমি কি জানে?

একদিন সুযোগমতো আবার ধরলুম সুমিকে। বললুম, 'এই, এখন আর রাতদিন আমাদের এখানে এসো না।'

'কেন?'

'কেন আবার কী, তুমি জানো না কিছু?'

সুমি চুপ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি বললুম, 'তোমার বাবা যে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে—'

'অসভ্য'—আচমকা ঠাস করে সে আমার পিঠে একটা চড় মেরে ছুটে পালাল। আমি আহত পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবলুম ওর হাতে শেষে মার খেয়ে মরব নাকি?

সন্ধ্যেবেলা ডাক পড়ল জ্যাঠামশায়ের ঘরে। আমাকে দেখেই বললেন, 'আমাদের সকলেরই তো খুব ইচ্ছে, এখন তুমি বললেই হয়। এতে অমত কোরো না—জীবনের সমস্ত উচ্চাশার মেরুদণ্ডই হল টাকা—আর তুমি যখন ভালো ছাত্র তখন বিলেত-ফিলেত যদি একবার ঘুরে আসতে পারো—' এর পরের কথাটি জ্যাঠামশায় ভাবভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখো গিয়ে—কালকে বোলো আমাকে।'

বলাই বাহুল্য, সুমির বাবার টাকা আমাকে লুব্ধ করল এবং মাসখানেকের মধ্যে পাকা হয়ে গেল আমাদের বিয়ে। সকলেই সুমিকে নিয়ে আমাকে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে—সকলেরই ধারণা সুমিকে আমি ভালবাসি, তাই এই বিয়ে। খুব এক রোমান্টিক ব্যাপার। আমি কিন্তু এখনো সুমিকে স্ত্রী বলে কল্পনা করে একটুও আনন্দ পাই না—আগের মতো সব সময় আসে না বটে, কিন্তু এলে আমার সঙ্গে দেখা হয়ই, একথা একবারও মনে হয় না দু-দিন বাদে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—একটু লজ্জা, একটু আনন্দ, কিছুটা নেশা সমস্ত কিছুর একটা মিশ্রণে হৃদয়কে অভিভূত করতে চেষ্টা করি, কিন্তু ওকে কাছে দেখলেই সমস্ত উবে যায়। তবে কি সুমিকে আমি পছন্দ করি না, ভালবাসি না? না, তাও নয়, আসলে সুমির সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাতে স্নেহ-মমতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রেম নেই।

যেদিন বিয়ে তার দু-দিন আগেই নিমন্ত্রণ চিঠিখানা পকেটে করে নিরুপমাকে পড়াতে গেলাম। দিন কয়েক পড়াতে আসব না একথা বলবার ইচ্ছে ছিল। পড়াশুনো শেষ করে তাকিয়ে দেখলাম হরিসাধনের নির্দিষ্ট বসবার স্থানটি শূন্য। চিঠিখানা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পকেট থেকে বের করে অনেক ইতস্তত করে বললাম, 'আপনার ঠাকুরদা কি বাড়ি নেই?'

নিরুপমা মাথা নেড়ে জানাল নেই।

'কোথায় গেছেন?'

অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব এল, 'পিসিমার বাড়ি।'

'এই চিঠিখানা'—বলে চিঠিখানা টেবিলে রাখলাম, কিছু বলতে বড়োই লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল নিরুপমা চঞ্চল হয়েছে এবং ওর শাড়ির ভিতর থেকে একখানা হাত দ্রুত বেরিয়ে এলে চিঠিখানার উপর—নিমেষে চোখ বুলিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে এমন এক দৃষ্টি নিয়ে স্থির হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল যে আমি খানিকক্ষণের জন্য ওর সেই দৃষ্টির কাছে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। এই প্রথম দেখলাম ওর চোখ। কী যে ছিল সেই চোখে আমি জানি না, কেন ও কাজ করলাম তাও জানি না। হঠাৎ নিরুপমার হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সাইকেলে ওঠবার আগে আর একবার পিছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম দুই হাতে মুখ ঢেকে ও বসে আছে শক্ত হয়ে।

তারপর আজ। এই ভোরবেলা উঠেই আমি বিমর্ষ মুখে মাকে বলেছি, 'মা, শেষ রাত্রের দিকে ভারী এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।' মা আজকাল সর্বদাই ব্যস্ত, কী কাজে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী স্বপ্ন?'

'থাক, বলব না'—

'আহা বল্ না।'

'না, শুনলে তোমার মন খারাপ হবে।'

মার কৌতূহল বেড়ে গেল। এবার বিছানায় বসে পড়ে বললেন, 'নে নে শিগগির বল্, আমার কত কাজ।'

'বাবাকে দেখলাম (একটু থামলাম এখানে), উনি বললেন, বিমল আর দু-মাস পরে তোকে এখানে পাব, কিন্তু আমার তাতে সুখ হচ্ছে না' (মার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে) 'তুই সংসারে থাকবি, সুখী হবি, সর্বোপরি তোর

দুঃখিনী মায়ের আশ্রয় হবি এই আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু যার সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে সে মেয়ের দু-মাসের মধ্যেই বৈধব্য লেখা আছে।'

'সর্বনাশ!' মার মুখ দিয়ে কথাটা ঠিক আর্তনাদের মতো বেরুলো। মুহূর্তে বাড়িতে রাষ্ট্র হয়ে গেল এই স্বপ্ন—কোথায় গেল খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, আত্মীয়-কুটুম্ব—খবর গেল সুমির বাবার কাছে—বিষম ব্যাপার এক মুহূর্তে। আমি ফাঁক বুঝে চম্পট দিয়েছি এবং সবেগে সাইকেলে চালিয়ে যাচ্ছি নিরুপমাকে পড়াতে।

এখন আপনারাই বলুন, কাজটা কি আমি খুব অন্যায় করেছি? কিন্তু নিরুপমা কেন চোখ তুলে তাকাল?

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬—) ॥ রস
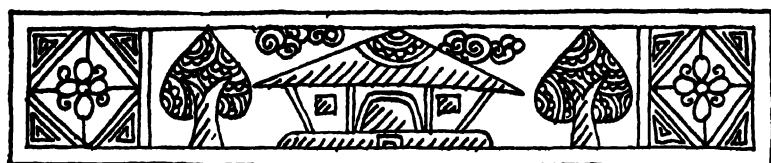
কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনেরো যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শি সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বৌ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো-পড়ো শনের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি। তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুরীর মতো চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার বাড়ির, কাজী বাড়ির বৌ-ঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চোখে।'

মুন্শীদের ছোট বৌ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেব না? অমন মানুষের চোখে ধূলা-পড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধূলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে

বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ চেহারার একটি বৌ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাত-কুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠারো-উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মারধোর করে এইসব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানু, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দার নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে! চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউখেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক-জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম শেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গতবার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছে তার। এবার আর না দেখে-শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে-আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুনাগার দু-এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশশেওড়া আর চোখউদানের আগাছার জংলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসি কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা গোঁসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'
'চলব না? শোনলানি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের।'
ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হয়েছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না?'
মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'
মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা-জহরত ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন করে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মেঞা, রাগ করলানি? শোনো শোনো।'
মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বললে, 'কি শোনব?'
এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরও একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোনো, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনাদানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'
মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।
ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'
বেচবার মতো জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙলো না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'
ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'
গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিক বাড়ি, মুখুজ্যে বাড়ি, সিকদার বাড়ি, মুনশী বাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার-পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক রস তার। মেহনত কম নয়, এক একটি করে এতগুলো গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুতসই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমত। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল। অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাঁচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোনো ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফারফা হয়ে যাবে, মরামুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাতভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এসব তত্ত্বকথা আর বিধিনিষেধও তার মুখের। রাজেকের মতো অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুতো রাজেকের হাতের ছোঁয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়ত আধ হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা হাঁড়িতে উঠত। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোনো ক্ষতি হত না,

রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু-চার জন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মতো হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মতো।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই। পুরুষমানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি যোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমত মেহনত। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু-বছর আগে বৌ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছ নাকি মাজুবিবি?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাঁপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সঙ্গে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাঁপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনেরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোলো আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাশা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটানো যায়?'

ইশারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট করে খুলে বলল মনের কথা। কোনো রকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোলো আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাশার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান, মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওন যায়। কিন্তু শত হইলেও তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মতো মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্প দিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোনো গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হালকা ঠাট্টা তামাশা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বৌ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাঠখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারী কড়া কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের

সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আসত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দু-পয়সা বেশি দরে বিক্রি হত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু-এক হাঁড়ি রস কোনোবার ভদ্রতা করে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মতো হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাস খানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু-আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাস খানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করছে সেই গুড়, যোলো আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধবুড়োদের দলের আরো করেছে দু-একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ানো যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খুবসুরৎ মুখও কারো নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হল দু-এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকি শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোনো শ্রীছাঁদ নেই, ভারী অপরিষ্কার আর অগোছালো হয়ে রয়েছে সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠোনের, লেপে-পুঁছে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরনীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছে গাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুজ্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে

দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুবাহুকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড়ো বড়ো মাটির জালা বসিয়ে সেই চালা-ঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুবাহু। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ। যোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবাহু এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পালা ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেক দিন পর মনের মতো কাজ পেয়েছে মাজুবাহু, মনের মতো মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে। বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ-আনা সের। দু-বেলা দু-বার করে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের। পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শিরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মতো পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায়নি কোনোদিন—ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মতো কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু-হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালিগুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের

সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞা সাহেব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের ?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোনায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায়নি কোথাও, কোনো জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বললে 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব, মেঞা ? তুমি তো শোনলাম নিকা কইরা নিছ রাজেক মৃধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান মেঞা সাহেব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলাল ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা ? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে !'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি !'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি করে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম। মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াব কেমনে।'

মনে এলেও মুখ ফুটে ও কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চলে গেলে

তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তাহলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইষা ঘইষা বদ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি?' মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না তো কি মিছা? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাকো আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু-মাসের বেশি সবুর করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার যোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শিকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাবচরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারী আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতি মেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে? গুড়ের সময় পিঁপড়ার মতো লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর দূর!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের। ধৈর্যও নেই।

আমের গাছে বোল ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজালো তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতোই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে। পাড়া-পড়শি বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘর-গেরস্থালি। কাছে বসো আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ-কয় মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'
মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বারো মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো-পড়ো শনের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতোই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদি বা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শিরা এসে সাড়ম্বরে সালংকারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের সুরে বলে, 'নাঃ, বৌ বৌ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বৌ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'
বুকের ভেতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।
দিন কয়েক পরে রাজেকের বড়ো ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বৌটার দশা দেখে ভারী মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বৌ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলে-মেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারী মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কম বয়সী ছুঁড়ি-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলে-মেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মতো একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থ ঘরের বৌ-ই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।
মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'
ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'
মাজুখাতুন খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ, ঐ রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।
তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'
ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান! ওসব কাম কোনো

কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান বৌ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উলটো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহলে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মতো ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত তার হাত গুনা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন উড়ান দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উড়ান দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইনষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এইরকম থাকলে হয়!'

মোতালেফ বলল, 'চোখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারী আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বৌকে। কোন্ মাছ খেতে ভালবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে কেনে সেই মাছ। ডিমটা আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারী খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আনো ক্যান্, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের, দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'
মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিনভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙাবা।'
ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙা না যে, পান খাইয়া রাঙাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধরো। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙাইয়া নেও।'
মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙা হয় না, আর একজনের পান খাওয়া ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁইক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মতো নয়। সিকদারদের মুনশীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারী খেজমত খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুনশীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘে চারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারী উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'
ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রৌদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে। কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'
নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা অন্য বাড়ির জাগ দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছড়ানো পাটের পাটখড়ি-গুলি পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে। অত কষ্ট বৌকে সে করতে দেবে না।
আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে

কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাঁচি চলে না তার। হাত বড়ো 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারী কাতর মোতালেফ। একেকদিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পারো না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'
মোতালেফ বলে, 'ধানকাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'
যেখানে যেখানে জোঁক মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের এক ভাগ। ধামায় করে পৈঁকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একবার বলে 'ভারী কষ্ট হয় বৌ, না?'
ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন। মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরেই বাড়ে। এ কাজে নামডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।
গাছ কাটবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের। সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গ রসিকতার। ধারদেনা শোধ দিতে হবে। সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মতো দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু-হাতে ঠেলে, দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু। কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্তো একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমায় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর

কোনো অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানানো চাই, সেরা আর সরেস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর। বুক কাঁপে। দু-এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনোদিন দেখেনি, কোনোকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস ফুরিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জ্বালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখমুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর। রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমতো। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনোদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝো না। এই গুড় হইছে? এই কি খরিদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে, বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে—বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খুবসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু-চার দিনের মধ্যেই কোনোরকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না।

কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মতো। খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে। পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায়

মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা। গত হাটে নিয়া দেখলাম, গেল বছরের মতো সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে। আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভেতর পুড়ে যায় মোতালেফের। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গত-বারের মতো এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ের। কেন সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়েব সুখ্যাতি করছে না তার। এত নিন্দা-মন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্য?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়াব কৌশলটা আবও বাবকয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইবা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা ঢালবাব সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ চিনছি। আব বক বক কইবো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে এক বোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটিব চালার দোবের কাছে, 'কি রকম গুড হইতেছে আইজ ফুলবানু?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোনো জবাব এল না ফুলবানুর। আরও একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়। সারে সারে গোটা পাঁচেক জালার রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ।

যা ভেবেছে ঠিক তাই। সব চেয়ে দক্ষিণ কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে।

বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে উঠল মোতালেফের. গলা চিরে চিৎকার বেরল —'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী।'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু-দিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড়চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা-সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীলরঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর।

এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী! এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারী বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দা-মন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা-জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই

ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে? একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু-দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি! দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা!
মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপস করল মোতালেফ। সেধেভজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোনো রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'
ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'
কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার তথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা। তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলে ও জানে, শোনে ও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে। গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না। কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড়ো বড়ো হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মতো যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মতো খটখট করে মন, দুপুরের রোদের মতো খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা-ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি খালি মনে হয় দুনিয়া।
একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।
'সেলাম মেঞাসাহেব।'
'আলেকম্ আসলাম্।'
মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো?' মাজুখাতুনের

কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোনো রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের তুই তিন গুড় লইয়া যান না, মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনোকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি। তুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান্ আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ। খাইয়া ত্যাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি তু-সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোঁব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজু-খাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে। 'খবরদার, ঐ মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির-নাতির করো, আমি চইলা যাব ঘর গুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'
মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারী ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেস, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দুটি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু-হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়ানৌকোয় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপটানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে।
'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'
হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে। 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান মেঞাসাব?'
মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারী শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নামগন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি কী কেলেংকারিটাই ঘটায়।
যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়ি গুনা। এখনই নামিয়া যাইতে কও। একটু কি শরম-ভরম নাই মনের? কোন্ মুখে উঠল আইসা এখানে?'
নাদির ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে, আস্তে—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইনষের বাড়ি মাইনষে আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইনষে।'
মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মেঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ করো, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজশরম নাই?'
একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক

আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে। মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহতা বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দুটি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাহেব, শোনবেননি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই কন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। কন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারদের কাছে। এ বছর এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড়ো বড়ো আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁশ হল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞা ভাই নেবে নাই।'

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬—) ॥ নাগিনী

ঠিক শেষরাতে, যখন রাতের অন্ধকারে আগামী দিনের আলোকিত প্রভাত এসে আক্রমণ করে, যখন জ্বলজ্বলে শুকতারাটা পশ্চিমাকাশের গায়ে পাণ্ডুর হয়ে মিলিয়ে যায়, ঠিক সেই সময়টাতেই ইন্দ্রকান্ত গিয়ে মহানন্দার জল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে নদীর গায়েই ঘনশ্যাম দাসের কাঠের কারখানা। টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক থেকে শুরু করে একেবারে নৌকো পর্যন্ত তার ওখানে তৈরি হয়। বৈশাখ মাস থেকে নৌকোর কাজটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কারণ তার চাহিদা তখন থেকেই আরম্ভ হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আর ফুরসত থাকে না স্থূলকায় ঘনশ্যাম দাসের। আর একসঙ্গে যে জনদশেক ছুতোর মিস্ত্রী তার ওখানে খাটে তাদের মধ্যে শিল্পী শ্রেষ্ঠের আসন পেয়েছে ইন্দ্রকান্ত। একশ থেকে হাজার মনী মহাজনী নৌকো, জেলে ডিঙি, খেয়াপারের নৌকো, বজরা, ছিপ—কোনোটাই অজানা নয় ইন্দ্রের। তাই ঘনশ্যাম তার খদ্দেরদের নির্ভয়েই বলে যে তার ওস্তাদ কারিগরের নৌকোয় চড়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে পড়লেও ডুববার ভয় নেই।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্দ্রকান্ত রোজ জাগে। তার যে বয়স তাতে তা অস্বাভাবিকই বটে তবু সে জাগে। পৃথিবীতে অনেক দিন ধরেই সে বেওয়ারিশ। মা-বাপের কথা তেমন মনে পড়ে না, যে মামার কাছে বড়ো হয়েছিল তিনিও গতায়ু। জগন্নাথপুর বলে ছোট্ট যে গ্রামটাতে তার পৈত্রিক ভিটেটা ছিল সেটা অনেক দিন ধরেই জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত। তাই ঘনশ্যাম দাসের কারখানাতেই সে থাকে। এখানে থাকার পর থেকেই এই অতি ভোরে জাগার অভ্যেসটা তার জন্মেছে।

কারখানার পেছনে, জলের ধারে, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে ইন্দ্রকান্ত বিড়ি টানছিল। ঘনশ্যাম দাসের কারখানার জন্য বহু গুঁড়ি এসে জমা হয়েছে

সেখানটায়। সেখানে বসে জলের দিকে তাকিয়ে সে বসেছিল। খুব ভালো লাগে তার এমনিভাবে বসে থাকা। অতি ক্ষীণ ধোঁয়ার মতো পাতলা কুয়াশা রয়েছে নদীর জলের ওপর। আষাঢ়ে নদী, জল খানিকটা বেড়েছে কয়েক দিন আগেকার বৃষ্টিতে। হাওয়ায় তরঙ্গ উঠেছে নদীর জলে, পেছনকার আম, জাম, আর দেবদারু গাছের পাতায় মর্মরধ্বনি উঠেছে, ঘন দুর্বা আর জংলী ঘাসে ভর্তি তীরের গায়ে এসে তরঙ্গায়িত মহানন্দা সশব্দে আছড়ে পড়ছে। অদ্ভুত লাগছিল ইন্দ্রকান্তের। রহস্যময় ও অতীন্দ্রিয় একটা জগৎ যেন আসন্ন প্রভাতের সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আর ঠিক এমনি সময়ে, দীর্ঘায়ত নদীপথের পূর্বদিকে, আধো-আলো আধো-অন্ধকারের পটভূমিতে, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো কয়েকটা নৌকোকে সে দেখতে পেল। শেষরাতের রহস্যময় অনুভূতির মাঝে ওরা হঠাৎ সাড়া জাগাল। কিসের নৌকো তা ভালোভাবে স্থির করার জন্য সে তাকাল।

ক্রমে সেই অন্ধকারটা একেবারে মিলিয়ে গেল, পুবদিকের আকাশে একটা লজ্জারুণ দীপ্তি দেখা গেল আর সেই সারিবদ্ধ নৌকোগুলো একেবারে সেখানে এসেই থামল যেখানে প্রখর ও কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ইন্দ্রকান্ত বসেছিল।

কটা নৌকো? ইন্দ্রকান্ত গুনল। এক, দুই, তিন—সবসুদ্ধ আটটা।

নৌকোর আরোহীদের দিকে তাকাল ইন্দ্রকান্ত। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, সব বয়সেরই নর-নারী আছে তাতে। দেখে বোঝা গেল না যে ওরা মুসলমান না হিন্দু, কেবল বোঝা গেল যে ওরা যাত্রী নয়। নৌকোর ভেতরকার হাঁড়িকুড়ি, উনুন, বাসন, জামা-কাপড়, বাক্স-পেঁটরা ও আরো সব নানা খুঁটিনাটি দেখে বোঝা গেল যে নৌকোই ওদের ঘরবাড়ি এবং মাটির চেয়ে জলই ওদের বেশি আপন। আরো ভালো করে তাকাল ইন্দ্রকান্ত এবং চকিতে সে বুঝতে পারল যে এই নবাগতরা যাযাবর সাপুড়ের দল—বেদে। নদীপথ দিয়ে নিজেদের সংসার নিয়েই ওরা সবটা জীবন বেড়িয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে গ্রাম আর শহরের ধারে নোঙর ফেলে, সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়, জিনিসপত্র কেনে, চুরি চামারীও করে এবং হঠাৎ একদিন নোঙর তুলে এগিয়ে যায় ওদের অন্তহীন যাত্রাপথে। প্রায় প্রতি বছরই ওদের আসতে দেখেছে ইন্দ্রকান্ত, দেখেছে নদীর ধারে ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিড়, দেখেছে সবার মধ্যে চাঞ্চল্য ও ভয় ওদের বিষয়ে এবং নিজেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে ওদের ওপর। ওরা সব দেখতে কেমন যেন অস্বাভাবিক ও বন্য, সাধারণের জীবন আর রীতিনীতির

সঙ্গে ওদের যেন কোনোখানেই কোনো মিল নেই। যে জলের ওপর বাস করে তারি মতো ভয়ংকর ও দুর্বোধ্য ওরা, আদিম জগতের অন্ধকার অরণ্যটা যেন এখনো ওদের মস্তিষ্কে কায়েমী হয়ে আছে।

সর্বপ্রথম নৌকোটা একেবারে ইন্দ্রকান্তের কাছে এসেই থামল। মাত্র চার পাঁচ হাত দূরে। তার গলুয়ের কাছে একজন বুড়ো মতো লোক বসে হুঁকো টানছিল। ঘ্যাঁচ করে নৌকোটা থামতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা জোয়ান লোক তা থেকে লাফ দিয়ে নামল, তার হাতে পাকানো মোটা দড়িতে বাঁধা নোঙর, সে নোঙরটাকে সেই গুঁড়িতেই আটকে দিল যেটার ওপর ইন্দ্রকান্ত বসেছিল।

হঠাৎ কেমন যেন রাগ হল ইন্দ্রকান্তর। রাগ করার মতো বড়ো কোনো যুক্তি না থাকলেও তার মনে হল যেন যুক্তি আছে তার রাগে। অন্তত এদের একটু ধমকে কথা বলার ঝোঁকটা সে সামলাতে পারল না। ঘনশ্যাম দাসের সেরা কারিগর সে, তার একটা অধিকার আছে কিছু বলার, যখন ঘনশ্যামের কাঠের গুঁড়ির মাঝে নোঙর ফেলছে এই হিংস্র কুখ্যাত লোকগুলো।

সেই লোকটিকে সে দাপটের সঙ্গে বলল, "এই এখানে নোঙর ফেলা চলবে না—"

লোকটা শ্বাপদের হাসি হেসে বলল, "চলবে না বললেই চলবে না, কিন্তু তবু --চলবে না কেন তাই শুনি ?"

লোকটার কথায় মনে হল যেন ওদের বাড়ি পূর্ববঙ্গের দিকে। তার পরনে লুঙ্গি, তৈলহীন রুক্ষ কেশ আর কালো চেহারা। অনেকটা দুশমনের মতো আর কি।

দাঁতে দাঁত চাপল ইন্দ্রকান্ত, তার শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, সে বলল, "চলবে না কারণ এটা আমাদের ঘাট, এ কাঠও আমাদের—"

"বটে !" সেই লোকটা শয়তানের মতো বিশ্রী হেসে বলল, "কিন্তু নোঙর তো আমি তুলছি না—"

"না ?"

"হ্যাঁ।"

ইন্দ্রকান্তের চোখ ঝল্‌সে উঠল, "তবে আমি জোর করে তুলে ফেলব—"

"বটে !"

"হ্যাঁ"—

লোকটা নিঃশব্দে তার ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো মেলে হাসতে লাগল তারপর নৌকোর ওপর একটা লাফ দিয়ে উঠে ছইয়ের ভেতর গেল।
"নোঙর তুলে ফেলো"—কর্কশকণ্ঠে বলল ইন্দ্রকান্ত।
অন্যান্য নৌকোগুলোও নোঙর ফেলবার উপক্রম করছে, তার বাসিন্দারা ছইয়ের বাইরে এসে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে ব্যাপারটা। এতগুলো চোখের সম্মিলিত দৃষ্টিতে উত্তেজনা বোধ করল ইন্দ্রকান্ত। তার রাগের স্বপক্ষে জোরালো কোনো কারণই নেই তবু সে যদি এখন পিছু হটে তাহলে এই সমস্ত লোকেরা হয়তো সম্মিলিতভাবে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠবে। কল্পনা করতেও তা অসহ্য মনে হল। সে এগিয়ে গেল, নোঙরটাতে হাত দিল টেনে তুলবার জন্য। আর ঠিক এমনি সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল।
সেই দুশমনের মতো চেহারার লোকটা নৌকোর ভেতর থেকে একটা দা হাতে ছুটে এল, নিচে নামল, তারপর বলল, "খবরদার—কেটেই ফেলব কুচি কুচি করে"—
আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হল, "খবরদার ট্যাংরা পাগ্‌লামো করিস না"—
ইন্দ্রকান্ত দেখল যে, লোকটা হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো থেমে গেল, শান্ত হয়ে গেল, তাকাল পেছন দিকে। তারি দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রকান্ত দেখল যে গলুইয়ের কাছের বুড়োটার পাশে একটি কুড়ি-একুশ বছরের যুবতী এসে দাঁড়িয়েছে। সুশ্রী ছিপছিপে দেহ। তার পূর্ণায়ত দেহ থেকে যৌবনশ্রী যেন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে—সেদিকে তাকাতেই যেন নেশা ধরল ইন্দ্রকান্তের। হঠাৎ যেন রাগটা তার জল হয়ে গেল।
মেয়েটি নেমে এল, ইন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন তার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, একটু নেমে সে কাছে এসে বলল, "আমরা এখানে নোঙর ফেললে কি ক্ষতি হবে তোমাদের?"
ইন্দ্রকান্ত মাথা নাড়ল, "না"—
"তবে", মেয়েটি সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল, যেন ইন্দ্রকান্তের মর্মস্থল পর্যন্ত দেখে নিল সে।
ইন্দ্রকান্ত বুঝল যে সে নিজের মানটি খোয়াবে, তাড়াতাড়ি সে বলল, "তবে অনুমতিটা নিলেই তো হত।"
মেয়েটি হাসল, "ট্যাংরাটা একটা জানোয়ার—ও অতশত জানলে তো মানুষই

হয়ে যেত। থাক যা হবার হয়েছে, আমি তো অনুমতি চাইলাম—এবার ?”

হাসিমুখে মেয়েটি তাকাল উত্তরের প্রত্যাশায়।

ইন্দ্রকান্ত মাথা নাড়ল, “এবার আর কি ফেলো নোঙর—থাকো—মিষ্টি মুখে মত চাইলে না বলার মতো চাঁড়াল আমি নই”—

মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে বলল “আর সে মিষ্টি মুখ যদি আমার মতো মিষ্টি মুখ হয়, তাই না ?”

গলুইয়ের কাছে যে বুড়োটা হুঁকো টানছিল, সে এতক্ষণ নিঃশব্দ ও নির্বিকার হয়ে ছিল, এইবার সে মেয়েটির কথায় খনখনে গলায় হেসে উঠল।

ইন্দ্রকান্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলল, “তোমার তো খুব অহংকার দেখছি।”

মেয়েটি মাথা নাড়ল, “ঠিক, তা কি করব বলো, অহংকার আমার সাজে। সত্যি করে বলো তো আমি ঠিক বলছি কিনা”—

“দুত্তোর”—হঠাৎ ইন্দ্রকান্ত ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠল। একটা প্রগল্‌ভা, জংলী মেয়ের কথার চোটে সে কুপোকাত হতে চলেছে, দূর ছাই। আর কিছু না বলে সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, হন্‌ হন্‌ করে ফিরে গেল নিজের কারখানায়।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। তার সঙ্গে শোনা গেল সেই নিঃশব্দ ও নির্বিকার বুড়োটারও হাসি। বকের পালকের মতো সাদা দাঁড়ি গোঁফে ঢাকা বুড়োর মুখের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ ও খন্‌খন্‌ একটা হাসি বেরিয়ে এল। ওদের দুজনের হাসি শুনে ইন্দ্রকান্ত নিজের মনে বিড় বিড়্ করে বলল, “দুত্তোর ছাই—যত সব জংলী ইয়ে”—কিন্তু তবু মেয়েটি যে ভারী সুন্দরী এ কথাটা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারল না।

ঘনশ্যাম দাসকে সব কথা বলতেই সে মাথা নাড়ল। তালপাতার পাখাটাকে দ্রুত নাড়তে নাড়তে সে বলল, “তোর মাথা খারাপ ইন্দির যে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছলি। আরে ওরা সাংঘাতিক লোক, চুরি ডাকাতি করে, সাপ ধরে, এর ওর ছাগলটা, মুরগীটার ওপর দিয়ে হাত সাফাই করে, কথায় কথায় ছোরা মারে আর সাপ লেলিয়ে দেয়—উঁহু কিচ্ছুটি বলিস্‌নি—ওদের আর ঘ্যাঁপাসনি। ওদের দেখে পুলিসেরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, তা জানিস্ ?”

ইন্দ্রকান্ত অবশ্য প্রশ্নটার জবাব দিল না, শুধু বিরক্তির রেখাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তার ললাটদেশে। হুঃ—যত সব। ঘনশ্যাম দাস দেখতে যতটা মনের দিক থেকে ততটা ভারী নয়।

একটা নৌকো তৈরি করছিল সে। সাত-আট দিনের মধ্যেই সেটা খরিদ্দারকে দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিল ইন্দ্রকান্ত, প্রায় বারো আনা কাজ শেষ করে ফেলেছে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল ঘাটের বেদেদের কোলাহল। তাদের কাচ্চাবাচ্চাদের চেঁচামেচি।
তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্তগুলো একের পর এক ঝিরঝিরে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। ঘুঘু আর শালিকের ডাক ভেসে আসছিল থেকে থেকে। এমনি মুহূর্তে হঠাৎ চমক ভাঙল ইন্দ্রকান্তের। পেছনকার ঘাটের রাস্তা দিয়ে কারা সব আসছে। সে ফিরে তাকাল। কারা?
ঝুলি আর ঝাঁপি নিয়ে সেই বেদের দল আসছে। সাত-আটজন পুরুষ, গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর চারজন স্ত্রীলোক। আর সবার আগে আছে সেই মেয়েটি।
ইন্দ্রকান্ত মুখ তুলল, মেয়েটিকে দেখে একটু রাগ হল সকালবেলার কথা ভেবে কিন্তু আবার আকর্ষণও বোধ করল তার চেহারার লালিত্য দেখে। মেয়েটির মধ্যে সহজাত এমন একটা কিছু আছে যা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। তার চোখের কটাক্ষ, নাক, ঠোঁটের ভঙ্গি আর চলার ভঙ্গি দেখে ইন্দ্রকান্তের চেতনায় ঝড় উঠল।
হঠাৎ সে নিজেকে কথা বলতে শুনে অবাক হয়ে গেল। আরে, তার রাগ যে কর্পূরের মতো উড়ে যাচ্ছে।
"শোনো"—
মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, মৃদু হাসল।
"কোথায় চললে তোমরা?" ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল।
"সাপ ধরতে—দেখতে যাবে?"
"না"—মাথা নাড়ল ইন্দ্রকান্ত, "ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।"
"কেন?"
"কাজ, দেখছো না নৌকো তৈরি করছি।"
"ওঃ—তুমি তাহলে মালিক নও, কর্মচারী?" হাসল মেয়েটি, "অথচ এমন

মেজাজ দেখিয়েছিলে সকালে—বাপ।"

ইন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে একটু মৃদু হাসল।

মেয়েটি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি একা থাকো নাকি ?"

"হুঁ—আর কে আছে যে সঙ্গে থাকবে ?"

"কেন বাপ-মা, ভাই-বোন ?"

"সবাইকে খেয়ে হজম করেছি বহুদিন আগে।"

ইন্দ্রকান্ত তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে। বেশ ভালো লাগছে তার কথা বলতে। মেয়েটির মুখে চোখে, সারা দেহে কেমন যেন একটা বন্য, উগ্র সৌন্দর্য। ওপারের আকাশ, পেছনের নদী আর চারিদিকের গাছপালার মাঝে তাকে যেন আশ্চর্য মানিয়েছে, প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে সে যেন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মেয়েটির সঙ্গীরা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, "ময়না—এই ময়না শিগগির আয়"—

"যাই"—মেয়েটি সাড়া দিল। ইন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একজনের নৌকো তৈরি করা দেখলে কি আমার পেট ভরবে নাকি ?"

ইন্দ্রকান্ত অপমান বোধ করল। কে বলেছে মেয়েটাকে তার নৌকো বানানো দেখতে, সে কি হাতে পায়ে ধরে সেধেছে! কি বলে এই অচেনা জংলী মেয়েটা!

সে কঠিনস্বরে বললে, "যা করলে পেট ভরে তাই করতে যাও না তবে, কে তোমায় দিব্যি দিয়ে আটকে রেখেছে ?"

মেয়েটির চোখের তারায় বাড়বানলের দীপ্তি দেখা দিল, তার দু-চোখের কালো অরণ্যে যেন একটা শ্বাপদের চোখকে ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। পরে সে হেসে বলল, "না, সত্যি যাই"—

দ্রুতপদে সে চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে ঘনশ্যাম পাখা চালাতে চালাতে হাঁক পাড়ল, "হ্যাঁরে ইন্দির—ব্যাপার কিরে হারামজাদা ?"

ইন্দ্রকান্ত গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "ব্যাপার সুবিধের নয়।"

সমস্ত আকাশটা যেমন দেখা যায় না, যেমন বোঝা যায় না তার কোন্ প্রান্তে

মেঘ সঞ্চিত হচ্ছে, ঝড় ঘনিয়ে আসছে, তেমনি ইন্দ্রকান্তও প্রথমে বুঝতে পারেনি তার হৃদয়টাকে। তারপরে এক সময়ে আলো ম্লান হলে, দিগন্তে ধুলো ওড়ার সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ শুনলে যেমন আসন্ন বিপর্যয়টাকে টের পাওয়া যায় তেমনিভাবে ইন্দ্রকান্ত একসময় টের পেল যে তার রক্তমাংসের ভেতরে একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। একটা বিচিত্র রস আর একটা অনুভূত পিপাসা তার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কাজ করতে করতে সে ভাবল যে সাপ ধরা দেখতে গেলে বেশ হত। কিন্তু—

অনেকক্ষণ পর। বেলা তখন পড়ে এসেছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আর দেরি নেই।

ওদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ইন্দ্রকান্ত তাকাল।

একটা আম গাছের পাশে এসে আবার দাঁড়াল ময়না।

তাকে দেখে ইন্দ্রকান্তের মনে হল যে এর আগে তার রাগত ভাবের জন্য সাক্ষাৎটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। তাই একটু গম্ভীর হয়েই রইল সে।

"এখনো কাজ হচ্ছে?"

"হুঁ—"

"অনেক সাপ ধরেছি আমরা—গোটা ছয়েক।" ময়না তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল।

"বেশ তো!" যেন কত নির্লিপ্ত ইন্দ্রকান্ত!

"এখনো নৌকো করছো?" ময়না একটু মুচকি হাসল, "তোমার তৈরি নৌকোতে চড়তে আমার একটু লোভ হচ্ছে।"

"চড়ো—একটা ফুটো নৌকো তৈরি করে দেব মাঝদরিয়ায় ডুবে মরবে।"

"ইস্—তোমার তো খুব রাগ!"

"হুঁ"—

কি ভেবে ময়না হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা তোমার নাম?"

"ইন্দ্রকান্ত পাল।"

"ই-ন্দ্র-কা-ন্ত। উহুঁ—তোমার নামটা 'প্রাণকান্ত' হলে আরো ভালো হত।"

"মানে?" চমকে মুখ তুলল ইন্দ্রকান্ত।

"মানে ঐ"—বলেই খিল খিল করে হেসে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল ময়না।

মানে? বিমূঢ়ের মতো হয়ে গেল ইন্দ্র। নিজের রক্তের মধ্যে যে তোলপাড় আরম্ভ হল তা টের পেল সে। তার হঠাৎ আপসোস হল কেন সে অমন আঁকাবাঁকা জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু এ কি ব্যাপার! বেদের মেয়ে—নীতিধর্মের বালাই নেই, সভ্যতার প্রলেপ নেই, জলচর যাযাবর জীব—তাকে দেখে তার এমন চিত্ত-দৌর্বল্য কেন হবে? না, এ ভালো নয়। না, নিজেকে সংযত করতে হবে। দু-দিনের জন্য এই মেয়েটা এসেছে তাদের নদীর ঘাটে, তার জীবনে, আবার হয়তো কালই চলে যাবে কোথায়—তাকে নিয়ে এমন মাতামাতি করার চেয়ে তার গলায় দড়ি দেওয়াই ভালো! ঠিক—ঘাড় নাড়ল ইন্দ্রকান্ত। দুত্তোর ছাই—যত সব ইয়ে—

কিন্তু ইন্দ্রকান্ত সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে কি হবে? ময়নাই আসে যখন তখন। মেয়েটার লজ্জা নেই।

যখন তখন আসে ময়না। কারণে অকারণে।

হয়তো বাজারে যাচ্ছে সে, থমকে দাঁড়ায় ইন্দ্রকান্তকে দেখে, হেসে বলে, "কেমন আছো গো প্রাণকান্ত পাল? এ্যাঁ?"

ইন্দ্রকান্ত রেগে বলে "ইয়ার্কি হচ্ছে? তোমার সাহস তো কম নয়!"

ময়না হেসে পালায় আর চিড় খায় ইন্দ্রনাথের গাম্ভীর্যে, তার সংযমে।

সেদিন বিকেলে ইন্দ্রকান্ত একা কাজ করছিল। দু-একজন মিস্ত্রী ছাড়া আর কেউ আসেনি। হঠাৎ সে একটা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল। ঠিক কারখানাটার পেছন দিকেই যেখানে নানা আগাছায় জায়গাটা নিবিড় হয়ে আছে।

সাপুড়েদের বাঁশি। বুঝতে পারল ইন্দ্রকান্ত। কেউ সাপ ধরছে। একটানা মাদকতাময় সুর, সাপের গমনভঙ্গির মতোই এঁকে-বেঁকে চলেছে, চেতনার ওপর যাদুর প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে একটা কালো পর্দা এসে মাঝে মাঝে কাঁপে, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, কানের কাছে কে যেন মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে ডাকে।

ইন্দ্রকান্ত কারখানার পেছন দিকে গেল।

ময়না! এক জায়গায় উঁচু হয়ে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। তার পেছনে একটা বাঁশের ঝাঁপি।

ইন্দ্রকান্তকে দেখেই একটা হাত দিয়ে তাকে সরে যেতে ইঙ্গিত করল ময়না।

তার চোখে সতর্কতাসূচক একটা দীপ্তি দেখা গেল। ইঙ্গিতটাকে বুঝে লাফ দিয়ে একটা পরিষ্কার মাটির ঢিপির ওপর উঠতেই ইন্দ্রকান্ত একটা হিস হিস শব্দ শুনল। সে তাকাল। যেখানটায় সে খানিক আগে দাঁড়িয়েছিল, সেখানটাতে একটা সাপ ফণা মেলে দুলছে বাঁশির সুরের তালে তালে। গোখরো সাপ। ময়নার চোখ এবার যেন সাপের মাথার মণির মতো জ্বলতে লাগল। সে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এল। সাপটাও একটু এগোল, মাটিতে দু-তিনবার একটা অদৃশ্য শত্রুকে ছোবল মারার চেষ্টা করে আবার ক্লান্তভাবে ফণা দোলাতে লাগল। হঠাৎ শেকড়ের মতো কোমর থেকে কি একটা বের করল ময়না, সেটা এগিয়ে ধরল সাপটার দিকে। সাপটা ফণা গুটিয়ে নিল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, নির্জীবের মতো মাটিতে নড়তে লাগল। হঠাৎ ডান হাত দিয়ে আশ্চর্যভাবে সাপটার মাথা চেপে ধরল ময়না, আর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলল। বাঁশি থামল।

ইন্দ্রকান্তের মুখে কথা নেই, সে এগিয়ে এল ময়নার কাছে। বলল, "তুমি কি ?"

"আমি ? যাদুকরী গো।"—হাসল ময়না।

"সাপ ধরতে ভয় লাগে না তোমার ?"

"না।. এ আর কি কালকেউটে, শঙ্খচূড় পর্যন্ত ধরা পড়ে আমার হাতে—এ তো কিছুই নয়।"

"বটে! তুমি যাদুকরী!"

"হ্যাঁ" মাথা নাড়ল ময়না, "বনের সাপ কি, সবাইকেই এমনি বশ করতে পারি আমি"—

এই বলে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ময়না চেয়ে রইল। অদ্ভুত ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর সে দৃষ্টি। দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় ইন্দ্রকান্তের, কেমন যেন ভয় করে।

"কি দেখছো অমন হাঁ করে ?" সে প্রশ্ন করল।

"তোমায়।"

"কেন ?"

"দেখতে বেশ লাগে।" হঠাৎ হাসতে লাগল ময়না।

তার হাসি দেখতে দেখতে কেমন যেন ভয় হল ইন্দ্রকান্তের। যে অবলীলাক্রমে বিষধর সাপকে বশ করে তাকে কেমন যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না সে।

"দুত্তোর ছাই—যত সব—"

সে পা বাড়াল।

"চললে ?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল ময়না।

"হ্যাঁ।" ঝাঁঝালো স্বরে জবাবটা দিয়ে প্রায় দৌড়েই পালাল ইন্দ্রকান্ত।

কিন্তু ময়না যেন নাছোড়বান্দা। সে যেন ইন্দ্রকান্তের গুহাবাসী মনটাকে দেখতে পেয়েছে, সে যেন শুনতে পেয়েছে তার রক্তের ঘোষণা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন।

অন্ধকারে হু হু হাওয়া বইছে। মহানন্দার জল আছড়ে পড়ছে ঘাটের গায়ে, নৌকোর গায়ে। গাছপালার মর্মরধ্বনি আর নিজের রক্তের গর্জনধ্বনি শুনতে পেল ইন্দ্রকান্ত। হঠাৎ একটা দুর্নিবার শখ হল তার—ময়নাকে দেখবে। একটা দুর্নিবার পিপাসা।

পেছন দিকের সংকীর্ণ পথ ধরে সে এগোল।

এগোতেই একজনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

"কে ? ময়না !"

"হাঁ"—ময়না হাসল, "তোমায় দেখতে যাচ্ছিলাম।"

"কেন ?"

"এমনি"—

হঠাৎ কি যেন হল, এগিয়ে ময়নার একটা হাত চেপে ধরল ইন্দ্রকান্ত, "কেন কেন তুমি ক্ষেপাবার চেষ্টা করছ বলো তো ? আমি সাপ নই যে, আমায় বশ করবে তুমি, বুঝলে ?"

"বুঝলাম। কিন্তু যদি করি বশই—তবে ?" ময়নার গলা একটুও কাঁপল না।

"পাগল"—বিকৃতকণ্ঠে বলল ইন্দ্রকান্ত।

ইন্দ্রকান্তের হাতের মুঠোয় ময়নার উত্তপ্ত হাতটা, তার সর্প-নির্মোকের মতো মসৃণ ও কোমল স্পর্শ তাকে যেন অসাড় করে ফেলল ধীরে ধীরে। হঠাৎ ময়না দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "আমাদের নৌকোয় আসবে ?"

"কেন ?"

"কত রকমের সাপ আছে দেখবে—দেখবে সাপের খেলা ? আসবে ?"

"এখুনি ?"

"না, আধঘণ্টা পর।"

"যাব।"

হাতটা টেনে নিল ময়না, লঘুকণ্ঠে বলল, "এসো কিন্তু, এমন খেলা তুমি জন্মেও দেখোনি—একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

"যাব।"

ময়না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রকান্ত। অনুভব করল যে সে ঘেমে উঠেছে। আর ময়নার হাতের স্পর্শ স্মরণ করে হাতটা তার তখনো থরথর করে কাঁপছে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল।

অবশেষে ইন্দ্রকান্ত গিয়ে নৌকোর সামনে দাঁড়াল।

নৌকোর গলুইয়ের কাছে সেই বুড়োটা বসে সেদিনকার মতোই হুঁকো টানছে। অন্যান্য নৌকোর লোকেরা হঠাৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকাল তার দিকে। নৌকোর ছইয়ের কাছে ময়না দাঁড়িয়ে। সে এখন শাড়ি বদলেছে। মাথার তৈলহীন চুলগুলোকে এলিয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর, হাতের আর গলার রূপো আর পাথরের গয়নাগুলো ঝকমক করছে অস্পষ্টভাবে। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে নৌকোর ভেতরে। তারি আলোতে অদ্ভুত দেখাল ময়নাকে, রোমাঞ্চকর মনে হল তার রূপকে।

"এসো" ময়না অভ্যর্থনা জানাল।

ভেতরে গেল ইন্দ্রকান্ত।

"বোসো"—একটা মাদুর বিছিয়ে দিল ময়না। ছইয়ের গায়ের সঙ্গে কতকগুলো হাঁড়ি আর ঝাঁপি ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা গেলাস রাখল ময়না ইন্দ্রকান্তের সামনে, মিষ্টি হেসে বলল, "খাও"—

"কি?" গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রকান্তের।

"সরবত—খাও। আমাদের এই নিয়ম, অতিথিকে কিছু খেতে দিতে হয়।"

"আচ্ছা" একটু হেসে গেলাসটা নিঃশেষ করল ইন্দ্রকান্ত। মিষ্টি অথচ কষায় একটা স্বাদ, খুব ভালো লাগল না।

হ্যারিকেনের আলোর সামনে বসল ময়না।

"খেলা দেখাও—" —ইন্দ্রকান্ত বলল।

"দেখাচ্ছি—কিন্তু একটা কথা বলবে প্রাণকান্ত—"

"আমি প্রাণকান্ত নই, ইন্দ্রকান্ত।"

"আমার কাছে প্রাণকান্তই ভালো লাগে" ময়না হাসল। হঠাৎ নিচের

ঠোঁটটাকে একবার কামড়ে ধরে সে বলল, "আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন লাগে ?"

নৌকোটা কি দুলে উঠল ? মাথাটা একটু ঘুরে গেল ইন্দ্রকান্তের ময়নার এই কথায়। সে তাকাল। অদ্ভুত একটা বন্য সৌন্দর্য এই মেয়েটার। সহ্য করা যায় না।

সে চাপা গলায় বলে, "ভালো—খুব ভালো লাগে।"

ময়না উঠে দাঁড়াল, "তবে খেলা দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে সাপ দেখো।"

একটা হাঁড়ি নিয়ে এল সে। একপাশ থেকে বাঁশিটা তুলে ফুঁ দিল, তারপর হাঁড়ির মুখটা খুলে দিল।

হঠাৎ কি যেন হল ইন্দ্রকান্তের। তার চেতনা অবশ হয়ে এল, ঘুম পেল তার, চোখের পাতা বুজে এল। তবু জোর করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল সে। সাপ। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, ফণা, বাঁশির শব্দ, ময়নার দুটো কালো চোখ। বাইরের সেই বুড়ো সর্দার আদেশসূচক কি একটা কথা বলল। তারপর আর কিছু মনে রইল না, কিছুই দেখতে পেল না ইন্দ্রকান্ত—সব কিছুই অন্ধকার ও বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ কাটল মনে নেই। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পর সে যেন কোনো মহা-সমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে এল। চোখ মেলল সে, সব মনে পড়ল তার, তাকাল সে। দেখল তার মুখের কাছেই ময়নার মুখ, অদ্ভুত একটা শানিত দীপ্তি তার চোখে। বাইরে তুমুল ঝড-বৃষ্টির শব্দ, আর বোঝা গেল যে নৌকোটা দুলে দুলে চলেছে তারই মাঝে। সে জানে না কখন নৌকো চলতে শুরু করেছে, কখন ঝড় উঠেছে আর বৃষ্টি নেমেছে।

কঠিন কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, "এর মানে ? ব্যাপার কি ?"

ময়না মুখটা আরো এগিয়ে নিয়ে এল, দৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রকান্তের সর্বাঙ্গ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সে বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়, বেদেনীদের ভালবাসার এ একটা ধরন—"

"আমায় কি খাইয়েছিলে ?"

"সেঁকো—কিন্তু তাতে মরতে না।"

"আমি যাই"—ইন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়াল। নৌকোটা বেজায় দুলছে।

"যাবেই ?" ম্লানভাবে হাসল ময়না, কিন্তু চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল; সে বলল, "সেঁকো বিষ দিয়ে চিরকাল কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারে না—

তা আমি জানি—তবু—। যাক সে কথা, যাও তো নৌকো থামাই। কিন্তু বাইরে যে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে! যেতে পারবে?”

তাই বটে। বাইরে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। রূপকথার রাক্ষসীরা যেন রসাতলের কোনো অন্ধকার ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অতিকায় নাগিনীর মতো মহানন্দা গরজাচ্ছে, পাক খাচ্ছে! কোথায় যাবে ইন্দ্রকান্ত? কে আছে তার? জাতি, ধর্ম, সভ্যতা—কী তার দাম? তার চেয়ে এ মন্দ কি? ভালবাসার উষ্ণ আশ্রয়!

সে তাকাল ময়নার দিকে, বসল তার পাশে, হাসল। ময়নাকে হঠাৎ কাছে টেনে নিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, “না, নৌকো থামানোর দরকার নেই—চলুক—ভেসে চলুক।”

সঙ্গে সঙ্গে নাগিনীদের মতো দুটো হাত হঠাৎ ইন্দ্রকান্তের কণ্ঠদেশকে সজোরে বেষ্টন করে ধরল, কামনা-জর্জর একটা উত্তপ্ত বুকের মধ্যে তাকে উন্মত্ত আবেগে পিষে মারতে চাইল।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬—) ॥ গোধূলির রঙ

দাওয়ায় বঁটি পেতে মায়া আনাজ কুটছিলেন। মুখ তুলে শুধু একবার চাইলেন। চাওয়া দেখেই বেশ বুঝতে পারল সরোজ যে কথাটা তাঁর কানেই যায়নি।

খবরের কাগজটা পাকিয়ে হাতে করে সরোজ এক পা এক পা করে দাওয়ার কাছ বরাবর এসে দাঁড়াল। গলার আওয়াজ আর একটু চড়া করে বলল, 'রাজীব মামা, মারা গেছেন মা!'

এবার মায়া পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। আয়ত দুটি চোখ। চামড়া কুঁচকে কুঁচকে এসেছে। সেদিনের তপ্ত কাঞ্চন আভা আজ শুধু ম্লান গৌর। তবু শেষ সূর্যের রশ্মিলাগা উঁচু গাছের ডালপালার ঝকমকানির মতন সারা দেহে সোনালী আভাস।

'রাজীব মামা'-খুব অস্ফুট গলা, মনে মনে উচ্চারণ করার মতো আস্তে আস্তে মায়া বললেন।

'রাজীবলোচন বসাক। দিল্লী কলেজের প্রফেসর' সরোজ দম নিয়ে বলল।

খুব সাবধানে বঁটিটা কাত করে রেখে, আনাজের ঝুড়ি সরিয়ে মায়া উঠে পড়লেন। বয়স হয়েছে কিন্তু বয়সের ভার নামেনি। জরা গ্রাস করতে পারেনি শরীর, এখানে ওখানে সামান্য ছোঁয়াচ দিতে পেরেছে শুধু। খুব সামান্য। রান্নাঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'বৌমা।' ঘোমটা ঢাকা ছোটখাটো একটি বৌ এসে দাঁড়াল। 'বাকি কুটনোটা তুমি কুটে নাও তো মা, আমি একবার ঠাকুর ঘরে যাচ্ছি।'

মায়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বৌটির বিস্ময়ের ঘোর কাটল না। আস্তে আস্তে এগিয়ে দাওয়ায় বঁটির কাছে পা মুড়ে বসে সরোজের দিকে চেয়ে বলল, 'এমন অসময়ে মা ঠাকুর ঘরে গেলেন যে?'

সরোজ হাসল, 'ঠাকুর ঘরে যাবার আবার সময় অসময় আছে নাকি ?'
'না, তা নেই, কিন্তু এই একটু আগে তো মা পুজো সেরে নামলেন।' বৌটি আনাজ কুটতে কুটতে বলল।
'রাজীব মামা মারা গেছেন' সরোজ হাতের কাগজটা খুলে সামনে প্রসারিত করল।
'রাজীব মামা!' মাথাটা তুলতেই ঘোমটা খসে পড়ল পিঠের ওপর। তুলে দেবার কোনো চেষ্টা করল না। কী দরকার। মার পুজোর ঘরে ঢোকা মানে কম করেও ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার। আর কোনো গুরুজনের বালাই নেই। আনাচে কানাচে ঘোমটা খুলে নিজের মনের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগে। চারদিকে একটু নজর রাখতে হয়, খুট করে শব্দ হলেই ঘোমটা টেনে দিতে হয় মাথায়। তবু ভালো লাগে, চুরি করে চাওয়ার মতন, ঘোমটা খুলে বেহায়াপনা করাতেও যেন সুখ আছে। কিন্তু রাজীব মামা আবার কে ?
'রাজীব মামা, কে গো ?' আনাজ কোটা থামিয়ে বৌটি আবার চাইল সরোজের দিকে।
'তুমি চিনবে না, আমাদের আলাপী লোক একজন।' সরোজ হাঁটতে হাঁটতে উঠোনের ও-পাশে চলে গেল। কথাটা না পাড়লেই হত। হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে এখন, অসংখ্য ওজর। মেয়েমানুষের মন তো। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন। সামান্য ক্ষতকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কার্বাঙ্কলে দাঁড় করাবে তবে শান্তি।
'কই, দেখিনি তো কোনোদিন ? আমাদের বিয়ের পরে এ বাড়িতে আসেননি বুঝি ?' কৌতূহলে চিক চিক করে উঠল দুটো চোখ। আঙুলের ফাঁকে ধরা পেঁপেটা আর বঁটির মুখে এগোল না। আনাজ কোটা তো রোজই আছে, কিন্তু এমন ব্যাপার সচরাচর ঘটে না কখনও। অন্তত ঘটেছে বলে ওর তো মনে পড়ে না। নিজের সংসারের হাজার শোকে তাপে যাঁর চোখের পাতা একটু ভেজেনি, আজ একটা উটকো লোকের মরার খবর শুনে তিনি এমন বিচলিত হয়ে পড়লেন।
সরোজ উত্তর দিতে গিয়েই থেমে গেল।
মায়া নিঃশব্দে সিঁড়ির চাতালে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছোট করে কাঁধ অবধি ছেঁটে ফেলা রুক্ষ চুলের গোছা বাতাসে দুলছে। দাঁত দিয়ে আলতো চেপে ধরেছেন নিচের ঠোঁট। বড্ড বুঝি কাঁপছিল তাই, না কি উদ্গত নিশ্বাসটা চাপতেই চাইছিলেন।

'তুই কোথায় খবর পেলি সরোজ ?' মায়ার আচমকা গলার আওয়াজে বৌটি থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে গিয়ে হাত থেকে পেঁপেটা গড়িয়ে উঠোনে পড়ল। সরোজ নিচু হয়ে পেপেটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'আজকের কাগজে বেরিয়েছে মা।'

'কবে হয়েছে এ ব্যাপারটা ?'

'পরশু' সরোজ কাগজটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'মঙ্গলবার, তার মানে পরশুই তো।'

'কি লিখেছে পড় তো' মায়া এগিয়ে এসে বৌয়ের পাশাপাশি বসলেন। বৌটি সরে এল মায়ার কাছাকাছি। হাঁটুতে হাত রেখে তরল গলায় বলল, 'উনি আমাদের কে হতেন, মা ?'

পুরোপুরি নয়, আড়চোখে মায়া বৌয়ের দিকে একবার চাইলেন। সস্নেহে একটা হাত রাখলেন তার পিঠের ওপর, আস্তে বললেন, 'আমাদের কেউ হতেন না মা, কিন্তু মস্ত বড়লোক ছিলেন, নামকরা লোক। খুব পণ্ডিত। দু-হাতে জঞ্জাল সরিয়ে এদেশের সত্যি ইতিহাসকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বিদেশীদের ছিটোনো কালি তুলতে গিয়ে নিজে সারা গায়ে কালি মেখেছিলেন।' শেষ দিকে মায়ার গলাটা বেশ কেঁপে উঠল। শক্ত হয়ে ফুলে উঠল গলার নীল শিরাগুলো। অনেক দিনের অনেক জমানো কথা যেন ঠেলে আসতে চায় বাইরে—বয়সের বাধা না মেনে, সময়কেও পেরিয়ে।

সরোজ থামে.হেলান দিয়ে গুছিয়ে বসল। হাঁটুর ওপর মেলে ধরল কাগজটা। মায়া থামলেই শুরু করবে এমনি একটা ভাব।

'কই পড় সরোজ।' মায়া ঘুরে বসলেন। ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে।

> বিখ্যাত শিক্ষাব্রতীর মৃত্যু। গত মঙ্গলবার যশস্বী ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক ডক্টর রাজীবলোচন বসাক ক্লাসে অধ্যাপনাকালে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার সজীমণ্ডীর বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি সন্ধ্যা সাতটার সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার শবদেহ মাল্যভূষিত করিয়া বিভিন্ন রাজপথে—

'থাক' মায়া একটা হাত তুলে বাধা দিলেন, 'আর পড়তে হবে না। কাগজখানা দেখি।'

মায়ার প্রসারিত হাতের ওপর সরোজ রাখল কাগজটা। নিশ্বাস ফেলল

সরোজ, তৃপ্তির নিশ্বাস। একটু একটু করে মৃত্যু-সংবাদ পড়া যেন তিল তিল করে চোখের সামনে মৃত্যু দেখারই সামিল।
হাত বাড়িয়ে মায়া কাগজটা নিলেন বটে, কিন্তু ওইটুকুই। কোলের ওপর বিছিয়ে রাখলেন। এক সময়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'চশমা ছাড়া তো পড়তেও পারব না। থাক, দুপুরের দিকে চোখ বুলিয়ে নেব।'

মল্লিকদের বাড়ির তেতলা দেওয়ালের গা পিছলে যেটুকু রোদের ছিটে এ বাড়ির বারান্দায় এসে পড়ে, সেখানেই মাদুর বিছিয়ে মায়া শুলেন। সোনার ফ্রেমের চশমাটা বের করে চোখে লাগালেন। কিন্তু ওই লাগানোই সার। চোখের জলে বার বার ঝাপসা হয়ে গেল কাঁচ দুটো। সামনের সব কিছু ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। কিন্তু সামনেটুকুই, অতীতের ঔজ্জ্বল্য একটুও ম্লান হল না। বিচিত্র রেখায় আরো জীবন্ত হয়ে উঠলো, আরও স্পষ্ট।
পঁচিশটা বছর কিন্তু মনে হয় এই সেদিন। বোনের বিয়ে। বরানগরের পুরনো বাড়ি। উনি বেঁচে। সরোজের বয়স বোধহয় বছর ছয়-সাত। কাজের আর অন্ত নেই। সব চেয়ে ছোট বোন। ভাই ভাজদের চোখের মণি।
বাসরঘরের ভিড়ের পিছনে এসে দাদা ডাকলেন 'মায়া।' সামনে এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'রাজীব এসেছে।'
'কে রাজীব' জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই মায়া থেমে গিয়েছিলেন। রাজীবের পরিচয় দাদার চোখমুখের ভাবেই তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে। এ বাড়ির রাজীব ওই একটি। দাদার সতীর্থ। দিল্লীর কোন্ এক কলেজের বুঝি প্রফেসর। কিন্তু এ তো শুধু বাইরের খোলস, নেমপ্লেটে লেখা মানুষের নামের অক্ষর। আসল পরিচয়ের রূপ আরো গভীর, এ পরিবারের শিকড়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্য তার বাঁধন। অন্তত কমপক্ষে রোজ দশবার করে এ বাড়িতে রাজীবের নাম উচ্চারিত হত। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, অতলস্পর্শী পাণ্ডিত্য, দেবোপম চরিত্র বাড়ির লোকদের আদর্শ। প্রাতঃস্মরণীয় শুধু নয়, সর্বদা স্মরণীয়, সর্বথা।
কোণের দিকে গোল টেবিলে রাখা নটরাজের ব্রোঞ্জের চমৎকার একটি মূর্তি ছিল। বাবার কোন্ এক মক্কেলের দেওয়া। মায়া ঘরে ঢুকে দেখলেন একটি ভদ্রলোক পিছন ফিরে নিবিষ্ট মনে মূর্তিটি নিরীক্ষণ করছেন। ঘর ভর্তি লোক। আত্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশীতে ঠাস বোঝাই। মায়া পর্দানশীন ছিলেন না। বাপের

বাড়িতে তো নয়ই, শ্বশুর বাড়িতেও অবাধ দাক্ষিণ্য। সেখানে যে পর্দাটুকু ছিল সেটুকু আবরুর নয়, ফ্যাশনের।

'রাজীব'! দাদার ডাকে ভদ্রলোকটি ফিরে দাঁড়ালেন। এত বছর পরে সংসারের হাজার ঝড়-ঝাপটায় সে ছবি কিন্তু একটু মলিন হয়নি। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। মুখে চোখে অপূর্ব কমনীয় ভাব। পৌরুষব্যঞ্জক দেহের সঙ্গে শান্ত কোমল মুখের কোনো মিল নেই। এ যেন অন্য মানুষের মুখ। কলেজ ছাড়ো-ছাড়ো কোনো পূর্ণ যুবকের।

পরিচয়ের প্রাথমিকতা শেষ হতেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন মায়ার খুব কাছাকাছি, শুধু দেহেরই, অন্তত সেদিন পর্যন্ত। ঠোঁট মুচকে হেসে বললেন, 'আপনি এবার এম এ দিয়েছেন না?'

পরীক্ষা দিয়েছিলেন, ফল বেরোয়নি তখনও, সেজন্য লজ্জা মায়ার ততটা ছিল না, যতটা ছিল বুড়ো বয়সে ছেলে কোলে করে প্রায় ছেড়ে দেওয়া লেখা-পড়াটা আবার ঝালিয়ে নেওয়ার মধ্যে। তার মূলেও কিন্তু ঐ রাজীবদা! আলাপের আগেই ভদ্রলোক নিজের দীর্ঘ ছায়াটা কেমন করে মায়ার ওপর ফেলেছিলেন। বিয়ের আগে সানাইয়ের সুরের মতন কিংবা দীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ব্যাপার।

দুখানা বই। একখানা বোধ হয় 'মৌর্যবংশের ইতিহাস' আর একখানা 'গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়'। দুখানাই রাজীবদার লেখা। কতবার যে মায়া পড়েছিলেন বই দুটো তার হিসেব-নিকেশ নেই। পড়তে পড়তে খেয়াল হয়েছিল ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিতে এম এ দেবার। দাদার মারফত রাজীবদার নির্দেশ আসতে থাকল। দরকারী বিষয় পড়বার ইঙ্গিত, আর অদরকারী ছেঁটে ফেলবার।

স্বামীর দিক থেকে কোনো আপত্তি ওঠেনি। তাঁর কাঠের ব্যবসায় ব্যাঘাত ঘটায় না, এমন যে কোনো কাজে তাঁর পূর্ণ সম্মতি।

আশ্চর্য, এতদিন রাজীবদার সঙ্গে মায়ার দেখাও হয়নি। অথচ প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই রাজীববাবু নেমে এসেছেন কলকাতায়, মায়াও ফাঁকে ফাঁকে বাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। যোগাযোগ হয়নি। মানুষটির মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ-সুবিধাও ঘটেনি।

দিন পাঁচেক পরেই আবার রাজীববাবু এসেছিলেন। বিয়ের হাঙ্গামা কেটেছে, কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের ভিড় কমেনি। বাইরে জুতো খুলে নিঃশব্দে সোফার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

'কি করছেন ?'

গলার আওয়াজে মায়া ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন। একটা হাত দিয়ে মাথার কাপড়টা তুলে দিতে গিয়েও কি ভেবে দেননি। মুখে বলেছিলেন, 'আসুন। হঠাৎ ?'

বেশ মনে আছে মায়ার; রাজীববাবু একেবারে মায়ার গা ঘেঁষে বসে পড়েছিলেন। একঘর আত্মীয়দের চোখ বড়ো করে চেয়ে থাকা সত্ত্বেও।

'তাড়াতাড়ি সেজেগুজে নিন।' দু-হাত দিয়ে রাজীববাবু চশমাটা ঠিক করে নিয়েছিলেন, 'সময় একেবারে নেই। ছটায় আরম্ভ।'

দাদাও বাড়িতে নেই। মায়ার সারা মুখে আবিরের ছোপ। বিব্রত ভাবটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। আচ্ছা গায়ে পড়া লোক তো। কোথায় যেতে হবে সেজেগুজে।

কথাটি জিজ্ঞাসা করতেই রাজীববাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'সে কি আজ সকালের কাগজটা পড়েননি! প্রফেসর সেনগুপ্তর বক্তৃতা আছে ইউনিভার্সিটিতে। উনি আমার প্রফেসর ছিলেন। বিষয়টাও খুব চমৎকার, —প্রাচীন তাম্রলিপ্ত। চলুন, হাতে সময় নেই বেশি।'

সময় হয়তো বেশি নেই, কিন্তু বাধাও যে অনেক। পর্দানশীন না হলেও স্বল্পপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এভাবে হুট করে বেরিয়ে যাওয়া যায় কখনও। আত্মীয়দের এতগুলো বিস্ফারিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে।

'আমি আর কি বুঝব ও-সব', খুব ক্ষীণ গলায় মায়া প্রতিবাদ করেছিলেন। জোর গলায় না বলবার মতো সাহস কিছুতেই যেন সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি।

'কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার দাদার মারফত পাঠানো আপনার অনেক নোটস্ আমি পড়েছি। ইতিহাস বোঝবার জন্য যে তৃতীয় চোখের দরকার তা আপনার আছে। নিন, উঠে পড়ুন।'

মুখ তুলেই মায়া হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উজ্জ্বল দুটি চোখে দুর্বার মিনতি, ঠোঁটের ভাঁজে শিশুর সারল্য। মায়ার মনে হয়েছিল, কিছু বলা যায় না। এত লোকের সামনে হয়তো তাঁর দুটি হাতই চেপে ধরবেন। এ মানুষ সব পারেন।

সমস্ত সংকোচ আর কুণ্ঠা কাটিয়ে মায়া সেদিন গিয়েছিলেন রাজীববাবুর সঙ্গে। বাসে দু-একটা কথাবার্তা হয়েছিল। ছুটকো আলাপ। কিন্তু মিটিং শুরু হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে রাজীববাবু দু-হাতের তালুতে মুখটা রেখে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ছিল না।

বক্তৃতা থামার পর মায়ার দিকে ঘুরে বলেছিলেন, 'আপনি একলা যেতে পারবেন না বাড়িতে?'

যেতে অবশ্য মায়ার কোনোই অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু আপনি?'

'আমি প্রফেসর সেনগুপ্তর সঙ্গে একটু দেখা করব। গোটা-দুই ব্যাপারে আমার একটু খটকা লেগেছে। বিশেষ করে প্রাচীন তাম্রলিপ্তে বাণিজ্যিক বিস্তারের বিষয়ে।'

আশ্চর্য মানুষ, ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, মায়ার দিকে পিছন ফিরে একবার চেয়েও দেখেননি।

বেশ মনে আছে, সেদিন মায়ার আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছিল রাজীববাবুর ব্যবহারে। এই বুঝি শিক্ষার পরিচয়, রুচির ছাপ। সাধারণ ভদ্রতাবোধও নেই একটু।

রাগের মাত্রাটা বেশিই হয়ে গিয়েছিল, তাই দাদার সামনেও কথাটা বলতে বাধেনি, 'যাই বলো দাদা, ইউনিভার্সিটির একগাদা ডিগ্রিই আছে শুধু তোমাদের রাজীববাবুর, ভদ্রতার বর্ণপরিচয়ও জানা নেই।'

'কেন কি হল?' দাদা খেতে খেতে মুখ তুলে চাইলেন।

গুছিয়ে ব্যাপারটা বলেছিলেন মায়া, ঠিক সহজ সরলভাবে নয়, রীতিমতো মনের ঝাল মিশিয়ে। কুমারী মেয়ে নয় বউ, অভ্যাস আছে বলেই একলা পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে এ কেমন কথা!

দাদা কিন্তু হেসেছিলেন; সব কিছু ঝেড়ে ফেলা হাসি। তারপর মায়ার চোখ-মুখের চেহারা দেখে আচমকা হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, 'ওটা একটা বদ্ধ পাগল। ওর কথায় রাগ করতে আছে!'

কোনো উত্তর দেননি মায়া। তার পরের দিনই জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে এসেছিলেন।

সেখানেও কি নিস্তার ছিল। দিন তিন-চার পরে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছিলেন রাজীববাবু।

ভোরের দিকে মায়া আর তাঁর স্বামী ভাগাভাগি করে সেদিনের খবরের কাগজটা পড়ছিলেন। অবশ্য মায়ার স্বামীর শুধু শেয়ার মার্কেটের পাতাটা

হলেই চলত। দেশ বিদেশের খবর জানবার কোনো আগ্রহই ছিল না। কন্টিনেন্টে কোনো রাজনৈতিক দল হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেটা জানার চেয়ে কানাডার তুলোর দর হঠাৎ ডিগবাজি খেতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিল অনেক বেশি। শনিবার হলে তো ঘোড়ার কুলুজি ছাড়া আর কোনোদিকে চোখই ফেরাতেন না।

দরজা বোধ হয় ভেজানোই ছিল, আস্তে ঠেলে রাজীববাবু একেবারে বাইরের ঘরে এসে ঢুকেছিলেন।

হঠাৎ কাপড়ে আরশুলা ঢুকে যাওয়ার মতন রাজীববাবুর উপস্থিতি সেদিন ভারী অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল মায়ার। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই রাজীববাবু একগাল হেসেছিলেন, 'বা, বেশ লোক, কাউকে কিছু না জানিয়ে দিব্যি শ্বশুরবাড়ি পালিয়ে এসে বসে আছেন।'

স্বামীর সামনে বলেই বোধ হয় সেদিন মায়া নিজেকে আর সামলাতে পারেন নি। হাতের কাগজটা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে স্পষ্ট গলায় বলেছিলেন. 'আপনি কি আশা করেছিলেন, আপনার অনুমতি নিয়ে আমাকে যাওয়া আসা করতে হবে ?'

বেশ রূঢ় হয়েছিল আঘাতটা। মায়ার স্বামী পর্যন্ত চমকে সোজা হয়ে বসেছিলেন। রাজীববাবুর সারা মুখ পলকের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। নিষ্প্রভ দুটি চোখ। ঠোঁট দুটো কাগজের মতন সাদা, মনে হয়েছিল মানুষটি বুঝি টলেই পড়ে যাবেন আঘাতের আকস্মিকতায়।

মায়ার স্বামী মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, 'আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য। আপনার মতন লোকের পায়ের ধুলো এ বাড়িতে।'

পরে অবশ্য মায়াও বুঝিয়েছিলেন নিজেকে। হাজার হোক বাড়ি বয়ে এসেছে লোকটা। অতিথি তো। এভাবে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করাটা কি উচিত।

চা-জলখাবারের মাধ্যমে আবহাওয়া ক্রমে অনেক লঘু হয়ে এসেছিল। সেদিন মায়ার স্বামীর সঙ্গেই রাজীববাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন। নিছক ভদ্রতার জন্যই মায়া দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন, হেসে বলেছিলেন, 'আসবেন একদিন রাজীবদা।'

এই প্রথম। এই ক-দিনের আলাপে রাজীবদা বলে মায়া আর ডাকেননি।

বলে ফেলেই কেমন মনে হয়েছিল মায়ার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়েও ছিলেন নিজেকে। দাদার বন্ধুকে এভাবে ছাড়া কিভাবেই বা ডাকা যেতে পারে। রাজীববাবু ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। নাতিদীর্ঘ স্বামীর পাশে তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত চেহারাটা কেমন বেমানান মনে হয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিলেন, 'কালই আসব। দুপুরের দিকে। আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারও রয়েছে।'

দরজার পাল্লায় হাত রেখে মায়া চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত শরীর অবশ মনে হয়েছিল আর কপালের দু-পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। আশ্চর্য, কথা বলতেও কি শেখেননি ভদ্রলোক। একটা বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে দেখা করার উপযুক্ত অবসর বুঝি দুপুরবেলায়? কঠিন একটা গালাগাল মায়ার মনে এসেছিল। এই শেষ। এই অভদ্র লোকটার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

পরের দিন খাওয়াদাওয়া ছুটকো কাজ-কর্ম সেরে বোনা নিয়ে মায়া জানলার ধারে বসেছিলেন। গেটের মধ্যে ঢোকার আগেই স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিতে হবে ভদ্রলোককে। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করার পক্ষে মধ্যাহ্নের অবসর যে উপযুক্ত সময় নয় এ বোধটা যার নেই, সে কোন্ সাহসে সমাজে মেলামেশা করতে আসে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসা কেমন সৌজন্য। হাতে বোনা থাকলেও চোখ রইল রাস্তার দিকে। এখান থেকে একেবারে মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। অজস্র ফুলে ভেঙে পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা। পথের ওপর ইতস্তত পড়ে থাকা ফুলগুলোকে চাপ চাপ রক্তের ফোঁটা বলে মনে হয়েছিল। যেই আসুক ওই ফুল মাড়িয়ে আসতে হবে।

অনেকক্ষণ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হবে। হঠাৎ মায়ার খেয়াল হয়েছিল মানুষটা তো আসেইনি, হাতের বোনাও ঠিক তেমনি ধরা আছে। একটি ঘরও এগোয় নি। মায়া উঠে পড়লেন। তিনটে দশ। একটু পরেই জল আসবে কলে। ঝি চাকর আসবে। কর্মব্যস্ততায় সারা ঘর ভরে উঠবে। বোনাটা টেবিলের ওপর রেখে মায়া আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফেরিওয়ালা, স্কুল ফেরত ছেলেমেয়ে দু-একটা, পথ চলতি উটকো লোক। লোকের কিন্তু কামাই নেই। অদ্ভুত মানুষ। কথা দিয়ে যে আসতে হয় সেটুকু খেয়ালও নেই। অবশ্য এলে আর কি এমন অসুবিধা হত। টেবিলের দু-ধারে বসতেন

দুজনে, কিংবা মায়া বসতেন খাটের ওপাশে। ইতিহাসের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করা যেতো, ওই ইতিহাস নিয়েই ছুটকো আলাপ।
রাজীববাবু নন, মায়ার দাদা এসেছিলেন দিন দুয়েক পরে। একেবারে সন্ধ্যের কোল ঘেঁষে। একথা সে কথার পর রাজীববাবুর কথা উঠেছিল, ওঁর দাদাই উঠিয়েছিলেন।
ভদ্রলোক জ্বরে পড়েছেন। দিন তিনেকেরও বেশি।
'জ্বর বুঝি?' আচমকা মায়ার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। চা আনবার নাম করে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ বেরোননি!
অল্প আঁচ। লালচে আভা রান্নাঘরের দেয়ালে, চায়ের কেতলিটাও কেমন অদ্ভুত শব্দ করে চলেছিল। অনেকটা চাপা কান্নার মতন। মায়া দু-চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সেই আগুনের দিকে চেয়ে বসেছিলেন।
চায়ের কাপ হাতে দাদার সামনে আসতে তিনি আবার পুরনো কথারই জের টেনেছিলেন।
'মায়া, যাবি নাকি দেখতে? যাস তো আমার সঙ্গে চল্।'
খুব সাবধানে মায়া চায়ের কাপগুলো টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখেছিলেন। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'না, আমি আর গিয়ে কি করবো। তুমি বরং কাল একবার কাউকে দিয়ে কেমন থাকেন খবর দিও।'
বেশ মনে আছে মায়ার সে রাতে কিছুতেই ঘুম আসেনি। কেবল এ পাশ ও পাশ করেছিলেন।
'কী, গরম লাগছে?' মায়ার স্বামীও মাঝ রাতে জেগে উঠেছিলেন 'পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দাও না।' ঘুম জড়ানো অস্পষ্ট গলার আওয়াজ।
মায়া বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। গরম নয়, বরং ফুরফুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ। বন্ধ করে দিলেই হয় পাখাটা। গরম একটুও লাগেনি। কেবল চোখের পাতা বুজতেই কার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল কানে। শুধু কান্নার আওয়াজই নয়, খুব জ্বরের ঘোরে কার অস্পষ্ট গোঙানি। বিদেশ বিভুঁইয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন একটা মানুষ ছটফট করছে জ্বরের যন্ত্রণায়।
তারপরের দিনের খবরে মায়া আর সরে থাকতে পারেননি। দাদা আসেননি, এসেছিল ওঁদের বাড়ির চাকর, দাদার চিরকুট নিয়ে। অবস্থা ভালো নয়। জ্বরের

গন্তিটা মোটেই সোজা সড়কে নয়, আঁকাবাঁকা পথ ধরেছে। বেশ কিছুদিন ভোগাবে। কি জানি কেন চিঠির বাঁ দিকের কোণ ঘেঁষে মায়ার দাদা রাজীববাবুর ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলেন। হয়তো আশা করেছিলেন, যদি মায়া কাউকে নিয়ে অন্তত একটুখানির জন্যেও ঘুরে আসে একবার।

তা কি হয়। বাড়ির বৌ পুরুষদের বোর্ডিঙে গিয়ে উঠবে। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ? বলবে কি আশেপাশের সবাই। সে মায়া পারবেন না। প্রাণ থাকতেও নয়।

কিন্তু স্বামী কাজে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

স্নান সেরে চুল শুকোবার জন্য ছাদে ওঠেছিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নামতেই ভুলে গিয়েছিলেন। কার্নিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন চুপচাপ। যত রাজ্যের এলোমেলো চিন্তা, ঝির ডাকে হুঁশ হয়েছিল। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মায়া আর অপেক্ষা করেননি। চটিটা পায়ে গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন।

গলিটা চিনতেনই। বোর্ডিংটা চিনতেও মোটে দেরি হয়নি। মোড়ের পানের দোকানের ওপরে মস্ত বড়ো সাইনবোর্ড লটকানো। মায়াকে একটুও খুঁজতে হয়নি। কিন্তু হন হন করে বোর্ডিঙের গেট বরাবর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। থমথমে নির্জন দুপুর। কারুর সাড়া শব্দ নেই। পথের কুকুর-গুলো পর্যন্ত ঝিমোচ্ছে ছায়ায় শুয়ে। উচিত হবে অনাত্মীয় পুরুষের ঘরে এভাবে এই সময়ে গিয়ে ঢোকা! ক-দিনেরই বা আলাপ। কিন্তু বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষটা। দেখবার শোনবার কেউ বিশেষ নেই। কথাটা মনে হতেই মায়া আর দাঁড়াননি। সাবধানে গেট খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

নিচের তলার ঘর। ছোকরা চাকর একটা ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করতেই হদিস মিলল। পর্দাটা সরিয়ে মায়া ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্তূপাকার বই। টেবিলে, চেয়ারে, খাটের নিচে, ইতস্তত মেঝেয় ছড়ানো। প্রথমে ঢুকে অন্য কিছুই নজরে আসে না।

রাজীববাবু খাটের একপাশে শুয়ে আছেন চোখ বন্ধ করে। পাতলা একটা কম্বলে বুক পর্যন্ত ঢাকা। বইগুলো সন্তর্পণে সরিয়ে চেয়ারে বসতে যেতেই রাজীববাবু চমকে চোখ খুলেছিলেন, 'কে ?'

আমি, মায়া।' সেদিন নিজের নামটা বলতেও মায়াকে দু-তিনবার থামতে হয়েছিল।

রাজীববাবু এ পাশে কাত হয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেছিলেন 'মায়া, মায়া।'

মায়া লজ্জায় মুখ তুলতে পারেননি। মনে হয়েছিল রাজীবদার এত আস্তে উচ্চারিত শব্দটা ইথারে ইথারে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গাছের পাতার শিরশিরানিতে, দুপুরের এলোমেলো বাতাসেও এই শব্দের প্রতিধ্বনি।

'কেমন আছেন?' ভিজে গলা মায়ার।

রাজীববাবু চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন। একটা হাত তুলে কপালের ওপর রেখে বলেছিলেন, 'বড্ড ব্যথা মাথার দু-পাশে। কথা বলতে পারছি না।'

মায়া এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়েছিলেন। ধারে কাছে নেই কেউ। ছোকরা চাকরটাও সরে গিয়েছে। সন্তর্পণে মাথার কাছে সরে এসে নিজের হাতটা রেখেছিলেন রাজীববাবুর কপালের ওপর। অসহ্য উত্তাপ। ধান দিলে বুঝি খই হয়ে যায়।

মিনিট দশেক। তারপরেই রাজীববাবু চোখ খুলে চেয়েছিলেন মায়ার দিকে। 'কলেজ খোলার সময় এসে গেল, কি হবে?'

'কি আর হবে। কামাই হবে না হয়, তা বলে জ্বর নিয়ে তো আর মানুষ কলেজ করতে পারে না।' মায়া ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ ধরে রাজীববাবু মায়ার দিকে চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। কি বুঝি খুঁজছিলেন দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে। তারপর ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলেন।

জানালার কাঁচের ওপর রোদের ঝলক এসে পড়াতে মায়ার খেয়াল হয়েছিল। বেলা গড়িয়ে পড়েছে। উঠতে হবে এবার। আস্তে এগিয়ে পর্দা সরিয়ে ছোকরা চাকরটিকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকেছিলেন, 'আমি চললাম। তোমার বাবু উঠলে ওষুধটা দিও ঠিকমতো বুঝলে?'

মায়া গেটের কাছ বরাবর এসে টের পেয়েছিলেন ছোকরা চাকরটা সঙ্গ ছাড়েনি।

'কি ব্যাপার' একটা হাত গেটে রেখে মায়া দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

ছোকরা দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে বলেছিল, 'কাল আবার আসবেন তো মা?'

এক মিনিটের ইতস্তত ভাব। তারপরই মায়া বলেছিলেন, 'নিজের সংসার ফেলে রোজ রোজ কি এতদূর আসা সম্ভব। মাঝে মাঝে আসার চেষ্টা করব।'

মায়া আর দাঁড়াননি। একটু জোর পায়েই গলিটা পার হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু সে রাতটা নয়, পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে রাজীববাবুর জ্বরতপ্ত ছল ছল দুটি চোখের আভাস, ক্ষীণ কাতর কণ্ঠের আওয়াজ স্পষ্টতর কানের কাছে। অনেকবার মায়া চমকে উঠেছিলেন। অকারণ উতলা হওয়ার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কারও করেছিলেন। কিন্তু এ কী দুর্বার মোহ। রক্তের সম্পর্ক নয়, তবু রক্তে এ কী উন্মাদনা!

খাওয়া-দাওয়া সেরে মায়া পাশের বাড়ির তাসের আসরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক বড়ো জোর। উল্টো পাল্টা তাস ফেলে আর অজস্র ভুল খেলে মায়া পালিয়ে আসার পথ পাননি। তারপর সারাটা দুপুর পায়চারি করেছিলেন ওপর থেকে নিচে আর নিচে থেকে ওপরে। এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে একটা হালকা ধরনের বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পরে ওঁর দাদা এসেছিলেন। চায়ের টেবিলে স্বামীর পাশে চুপচাপ মায়া বসেছিলেন। দু-একটা ঘরোয়া কথাবার্তা। কাজ আর অ-কাজ মিশিয়ে। দাদা ঘরে ঢুকতেই মায়া একটু বিব্রত বোধ করেছিলেন। কি জানি, মায়ার রাজীববাবুকে দেখতে যাওয়ার কথাটা বুঝি বলেই ফেলেন প্রথমে। অবশ্য বলে ফেললেও অন্যায় কিছু হবে না। মায়ার নিজের হাত পা কামড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল। কী দরকার ছিল এ খবরটা স্বামীর কাছে চেপে যাওয়ার। দাদার এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাওয়ার মধ্যে লুকোচুরির কি আছে।

আধ ঘণ্টার ওপর দাদা ছিলেন, কিন্তু মায়ার রাজীববাবুর বোর্ডিঙে যাওয়া সম্বন্ধে একটি কথাও তোলেননি। কেবল রাজীববাবু সেই রকমই আছেন আর ডাক্তার বদলি করা হয়েছে এই খবরটুকুই বলে গিয়েছিলেন।

দাদা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মায়া টেবিলের ওপর কনুই রেখে চুপ করে বসেছিলেন। স্বামী পোশাক ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু মায়া চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি একবারের জন্যও। ঘুরে ফিরে কেবল এক চিন্তা। যাওয়ার কথা বোধ হয় রাজীববাবু দাদাকে ঘুণাক্ষরেও বলেননি কিছু। কিন্তু কেন? রাজীববাবু নিশ্চয় তাহলে মনে করেছেন যে, স্বামী আর সংসারকে

লুকিয়েই তাঁর সঙ্গে মায়া দেখা করতে গিয়েছিলেন। গোপন অভিসারের মতন এই যাওয়ার কথাটা তাই বুঝি রাজীববাবু চেপেই গিয়েছিলেন সকলের কাছে। ছি, ছি, লজ্জা নয়, ঘৃণা। মায়ার মনে হয়েছিল একি খেলা শুরু করেছেন। সাজানো সংসারের পাশ কাটিয়ে কিসের আকর্ষণে ছুটে চলেছেন সর্বনাশের পথে। হাজার মানুষ আত্মীয় পরিজনহীন হয়ে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে, তাদের দুঃখ মোচনের দায়িত্ব তো ওঁর নয়।

অনেকদিন পরে সরোজকে ডেকে বই নিয়ে পড়াতে বসেছিলেন। পুরনো পড়া, কিন্তু সবই ভুলে বসেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন প্রত্যেকদিন দু-ঘণ্টা করে অন্তত ছেলেকে নিয়ে বসবেন।

প্রস্তাবটা করেছিলেন তারপরের দিন।

'এই শোনো' খুব তরল গলায় মায়া স্বামীকে ডেকেছিলেন।

'কি ব্যাপার ?'

'আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ক-দিন ধরে। ভারী দুর্বল মনে হচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়াতে গেলেই মাথাটা কেমন ঘুরে যায়।' মায়া চোখে মুখে দুর্বলতার ছাপ আনার চেষ্টা করেছিলেন।

মায়ার স্বামী কিন্তু কথাটা অন্যভাবে নিয়েছিলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে অল্প হেসে বলেছিলেন, 'বলো কি ? এর মধ্যে ! বেশ আপিসে গিয়ে মিসেস পালিতকে একবার দেখে যাবার জন্য ফোন করে দেব না হয়।'

মায়া জ্বলে উঠেছিলেন। চেয়ারের হাতল ধরে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'না, না, সেসব কিছু নয়। কেমন হাল্‌কা মনে হচ্ছে নিজেকে। মনে হচ্ছে বাইরে কিছুদিন ঘুরে আসলে ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি বলো তো রাঁচীতে দিদির কাছে একটা চিঠি লিখে দিই আজই।'

দু-এক মিনিট মায়ার স্বামী মায়ার দিকে চেয়ে কি ভেবেছিলেন তারপর বলেছিলেন, 'বেশ তো, শরীর যদি খারাপই হয়ে থাকে তো ঘুরেই না হয় এসো দিন কতকের জন্য।'

শীতের শুরুতে জায়গাটা মায়ার ভালোই লেগেছিল। আজ যাই কাল যাই করে মাসখানেকের ওপর কাটিয়ে দিলেন দিদির কাছে। মধ্যে বাড়ির চিঠি পেয়েছিলেন, দাদারও। রাজীববাবু সেরে উঠে পথ্য করেছেন তারপর দিল্লী রওনা হয়ে গিয়েছেন সে খবরও পেয়েছিলেন দাদার চিঠির মারফত।

ব্যস, আর ভালো লাগেনি রাঁচী। কলকাতায় ফিরে যেতে অসুবিধা নেই

কোনো। আচমকা দরজা ঠেলে ওঁর দাম্পত্য জীবনের শুচিতা নষ্ট করতে কেউ আসবে না এগিয়ে। এলোমেলো কথা বলে মনের শান্তি নষ্ট করবে না; একলা কাছে পেয়ে ওঁর নাম ধরেও কেউ ডাকবে না। পরম নিশ্চিন্তা নিয়ে মায়া ফিরে এসেছিলেন।

দিন চারেক। দুপুরের দিকে কড়ানাড়ার শব্দে নিচে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক পিয়নের হাতে প্রকাণ্ড এক প্যাকেট। মোড়কে ওঁরই নাম লেখা। সই করে প্যাকেট খুলেছিলেন। ঝকঝকে আনকোরা তিনখানা বই। 'লিচ্ছবি বংশের ইতিকথা'—তিন খণ্ড। মলাট খুলেই মায়া আরো অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উৎসর্গপত্রে পরিষ্কার ছাপানো অক্ষরে ওঁরই নাম লেখা। একি করেছেন রাজীববাবু। মাত্র ক-দিনের পরিচয়ে এমন করে কেন ঋণী করলেন ওঁকে। হয়তো অর্ধেক জীবনের পরিশ্রমের ফল। ওঁর মতো একটা নগণ্য মেয়েকে উৎসর্গ করে কী লাভ! সঙ্গে ছোট একটি চিরকুট। খুব ছোট। মায়া এম এ পাস করাতে রাজীবদার নগণ্য উপহার।

বই তিনটে সামনে ছড়িয়ে মায়া অনেকক্ষণ বসেছিলেন। সত্যি কী ভুলই তিনি করেছিলেন। এমন একটা মধুর সম্পর্কের ওপর নিজের মনের কুৎসিত ছায়া ফেলে সব কিছু আবিল করে তুলেছিলেন। আত্মভোলা শিবতুল্য এমন একটা লোকের সম্বন্ধে কী অবিচারই করেছেন। সাবধানে আঁচল দিয়ে মুছে বইগুলো মায়া নিজের আলমারির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন, কেবল রাজীবদার হাতে লেখা ছোট্ট চিঠিটা সামনে নিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। চিঠিটা মাত্র কয়েক ছত্র। সম্বোধন নেই, কুশলবার্তা নেই, সম্ভাষণও নেই। এমন বিদঘুটে খাপছাড়া চিঠি লেখে মানুষে! কেন কি ক্ষতি ছিল, আরেকটু বড়ো চিঠি লিখতে। অনেকবার করে বেশ পড়া যেত। দু-তিন দিন ধরে মায়া ভেবেছিলেন পরিবর্তে রাজীবদাকেও কিছু একটা দেওয়া উচিত। কিন্তু কি যে দেওয়া উচিত ভেবে কূল কিনারা করে উঠতে পারেননি। অনেক ভেবে চিন্তে আধ ডজন রুমাল কিনে দিয়েছিলেন। কোণে কোণে রঙীন সুতোর কারুকার্য, একেবারে তলায় রাজীবদার নামের আদ্যক্ষর।

রুমাল পাঠাবার দিন দশেক পরেই মায়া কাগজে দেখেছিলেন রাজীববাবুর ডক্টরেট পাবার খবর।

তারপর মাস ছয়েক বোধ হয় রাজীববাবুর আর কোনো খোঁজ খবর পাননি। বর্মায় গোলমাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের কারবারে মন্দা শুরু হয়েছিল। জমানো সেগুন শেষ হতেই হাত পড়েছিল আসাম আর রায়পুরের জঙ্গলে। কিন্তু কাঁচ আর সোনা। খদ্দের ভোলে না এ জিনিসে। মায়ার স্বামীকে নিমতলার বড়ো গুদাম দুটোই বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। টাল সামলাতে মায়া সরোজকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছিলেন। ডুবন্ত মানুষের ওপর আর ভার চাপিয়ে লাভ কি। তবু যদি একলা মানুষ হাত-পা ছুঁড়ে কোনো রকমে ভেসে থাকতে পারেন জলের ওপর। দুর্দিন কেটে গেলে আবার মাটির নাগাল পাওয়া যাবে। ভেবে লাভ কি অনর্থক।

বিকেলের দিকে রাজীবদা এসে হাজির হয়েছিলেন। সবে চুল বাঁধা আর গা ধোয়া সেরে মায়া চায়ের আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন এমন সময় পিছন থেকে আচমকা রাজীবদার গলা, 'যাক ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।'

মুখ ফিরিয়েই মায়া অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আরো যেন সুন্দর হয়েছেন রাজীবদা, আরো রক্তিম।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হয়েছিল। মায়ার দাদাও ছিলেন দলে। কথায় কথায় তিনিই বলেছিলেন, 'সব তো হল, এবার একটা বিয়ে-থা কর রাজীব। আর কতদিন বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবি।'

রাজীববাবু সশব্দে হেসে উঠেছিলেন, 'এই বুড়োকে মেয়ে দিচ্ছে কে ?'

'বাজী ফেল তুই। শুধু একবার কথা দে, আজ রাত্তিরের মধ্যে আমি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তোর।'

'সে কি পাত্রী তৈরি নাকি ?' ঠিক এই সময়ে এক লহমার জন্য রাজীববাবু চোখ তুলে মায়ার দিকে চেয়েছিলেন। কি জানি কি ছিল সে দৃষ্টিতে, মায়ার সমস্ত শরীর শিউরে উঠেছিল। ক্লান্ত অবসাদ প্রতি গ্রন্থিতে। চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে মায়া টাল সামলেছিলেন।

কিন্তু তারপরই রাজীববাবু গলার স্বর পালটে ফেলেছিলেন, 'ওটা আর এ জন্মে হল না ভাই। পরের জন্মে মানুষ হয়ে আবার জন্মাই তো দেখা যাবে।'

সেদিন রাজীববাবু চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত এই নিয়ে ভাই আর বোনে আলোচনা চলেছিল। মায়ার দাদা বলেছিলেন, 'চিরকাল রাজীব নারীবিদ্বেষী। তবু তো তোর সঙ্গে কথাবার্তা একটু বলে, নয়তো কোনো মেয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ও সরে পড়ে। এক মিনিট আর থাকে না সেখানে।'

কিন্তু তাই কি। সে রাতে মনে মনে মায়া অনেকক্ষণ ভেবেছিলেন। জ্বর তপ্ত সেদিনের দু-চোখের দৃষ্টি কি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। আজকের এ সর্বনেশে চাউনির পিছনে কি মনের বালাই নেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি মায়ার।

দিন দুয়েক পরে আবার এসেছিলেন রাজীববাবু। দাদা বাড়ি ছিলেন না। লন পার হয়ে আসবার সময়ই মায়ার নজরে পড়েছিল। মায়াই এগিয়ে এসেছিলেন সেদিন, 'কি ব্যাপার হঠাৎ দিল্লী থেকে কলকাতায় যে? কলেজ পালিয়ে বুঝি।'

কিছুক্ষণ রাজীববাবু কোনো উত্তর দেননি। মুখ টিপে টিপে হেসেছিলেন তারপর বলেছিলেন, 'কলেজ পালাতে পারলে তো বাঁচতাম। আপনার স্বামীকে বলে আমার একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিন না। আপনার ছেলেকে না হয় পড়াব। সত্যি অপর্যাপ্ত সময় হাতে পেলে মন দিয়ে কিছু লেখাপড়া করি।'

গলার স্বর আর কথার ভঙ্গিতে মনে হয়েছিল, বানানো নয়, এগুলো যেন সত্যিই রাজীবদার মনের কথা।

কথার মাঝখানেই দাদা ফিরেছিলেন আপিস থেকে, রাজীববাবুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'যাক মেঘ না চাইতেই জল। কিন্তু কি ঠিক করলি? ডক্টর মজুমদার আজকেও এসেছিলেন আমার কাছে।'

'এসেছিলেন বুঝি!' রাজীববাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে স্বল্প হেসেছিলেন, 'তারপর কি বললি?'

'বলবার মালিক তো তুই। আমি আর কি বলব।' দাদা পোশাক ছাড়তে ছাড়তে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোর আপত্তির কারণটা কি তা তো বুঝতে পাচ্ছি না।'

রাজীববাবু চুপ করে গিয়েছিলেন। টিপয়ের ওপর রাখা সেই পুরনো নটরাজের মূর্তির ওপর হাত বোলাতে বোলাতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

সেবার রাজীববাবু কলকাতায় এসেছিলেন কলেজেরই দরকারী কাজে। সামনের ছুটিতে এখানে বুঝি ঐতিহাসিকদের বৈঠক বসবে তারই আয়োজন করতে। দিন দশেকের ব্যাপার। যাবার আগের দিন মায়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

গেটের কাছেই মায়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেজে গুজে মায়া বাইরে যাচ্ছিলেন। রাজীববাবুকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, 'আসুন আসুন। কালই তো চলে যাচ্ছেন।'

'হুঁ কিন্তু কোথাও বেরোচ্ছেন নাকি ?'

'কাপড়ের দোকানে যাব একবার। ছেলেটার জন্য পুজোর সময়ে কিছু কেনাকেটা করতে হবে। যাক, সে আর একদিন হবে। আসুন ভেতরে গিয়ে বসি।'

'না, না,' রাজীববাবু বাধা দিয়েছিলেন, 'তার চেয়ে চলুন আমিই যাই আপনার সঙ্গে।'

মায়া আর কথা বাড়াননি। দুজনে রাস্তা পার হয়ে ট্রামে এসে উঠে-ছিলেন।

বেশ মনে আছে ছেলের জামা পছন্দ করতে অনেকটা সময় নিয়েছিলেন মায়া। আধ ঘণ্টার একটুও কম নয়। ততক্ষণ রাজীববাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশে। ভুরুর সামান্য কুঞ্চন নয়, একদৃষ্টে কেনাবেচা দেখছিলেন। মায়ার স্বামী সঙ্গে থাকলে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন, ইতিমধ্যে দশবার তাগিদ দিতেন মায়াকে. শেষকালে পা ঠুকে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে চুরুট টানতেন।

সওদা শেষ করে দুজনে বেরিয়ে এসেছিলেন। ফিরতি ট্রামে পাশাপাশি বসেছিলেন। রাজীববাবুর অবিন্যস্ত চুলের রাশ কপালে, চোখে উড়ে উড়ে পড়ছিল। উজ্জ্বল দুটি চোখ বুদ্ধিদীপ্ত, অদ্ভুত ভঙ্গি দুটি ঠোঁটের।

বাড়ির স্টপেজের কাছে আসতেই রাজীববাবু হেসে পড়েছিলেন মায়ার দিকে। ফিস ফিস করে বলেছিলেন, 'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে কি হবে, চলুন একটু ঘুরে আসি।'

মায়া শুধু চোখ তুলে চেয়েছিলেন। রাজীববাবু একদৃষ্টে চেয়েছিলেন তাঁর দিকে। অনেকদিন আগের সেই মোহভরা দৃষ্টি। এ দৃষ্টি শরীরেই নয়, মনের গোপন তন্ত্রীতেও নাড়া দেয়। উপেক্ষা করা যায় না, অবহেলা তো নয়ই, এমন কি ঘাড় নেড়ে না বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে অপহরণ করে।

সেই সর্বনেশে রাতটার কথা মায়া কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তারার ঝকমকানি। অনেক দূরে মাঝ গঙ্গায় দাঁড়ানো জাহাজের বিরাট কাঠামো, ময়াল সাপের মতন মসৃণ রাস্তাটা মোচড় খেয়ে খেয়ে চলে গেছে কোন্ দুরান্তে। জলে নুড়িতে পক্কা খাওয়া মৃদু কলরোল।

'আচ্ছা রাজীবদা' মায়াই শুরু করেছিলেন, 'আপনি আজো বিয়ে করেননি কেন বলুন তো ?' কথাটা জিজ্ঞাসা করেই মায়া কিন্তু রাজীববাবুর দিকে মুখ তুলে আর চাইতে পারেননি। সে মদির দৃষ্টির সামনে নিজেকে তুলে ধরতে আর সাহস হয়নি।

খুব আস্তে আস্তে রাজীববাবু বলেছিলেন, 'কি জানি আজকালকার মেয়েদের আমার ভালো লাগে না। বর্তমান পরিবেশও মনে লাগে না আমার। এ দেশের হারানো ঐতিহ্য যদি ফিরিয়ে আনা যেত। সে যুগের কোশল আর কাঞ্চি, ইন্দ্রপ্রস্থ আর অনুরাধাপুর। শুধু সেকালের শহরই নয়, সে যুগের মানুষও। কি জানি কেন, এ যুগের মেয়েদের ভারী ভয় করে আমার। মনে হয় এরা প্রয়োজনকেই বড়ো করে তোলে, মানুষটা কোথায় তলিয়ে যায়।'

একটু চুপ করেছিলেন রাজীববাবু। গঙ্গার কলধ্বনির সঙ্গে রাজীববাবুর কথা-গুলোর কোথায় যেন মিল ছিল। বাধা দেননি মায়া।

'ঘর বাঁধতে আমারও কম ইচ্ছে হয় না' রাজীববাবু নিশ্বাস ফেলেছিলেন, 'কিন্তু জানি এরা কেউ আমায় শান্তি দিতে পারবে না।'

কোথা থেকে কি হয়ে গিয়েছিল। রাজীবদার উষ্ণ নিশ্বাসেই বুঝি মায়ার স্বামী আর সংসার, বিবাহিত জীবনটাই সেদিন মুছে গিয়েছিল।

মায়া মৃদু গলায় বলেছিলেন, 'রাজীবদা!'

রাজীববাবু চমকে ঘুরে বসেছিলেন। সেই সর্বনাশা দৃষ্টি দিয়ে মায়াকে আরতি করেছিলেন .আপাদমস্তক তারপর বলেছিলেন, 'আপনি বোধ হয় পারতেন আমায় শান্তি দিতে। আপনাকে পেলে বোধ হয় সুখী হতাম জীবনে।' কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজীববাবু নিচু হয়ে মায়ার একটা হাত আঁকড়ে ধরেছিলেন।

এক সেকেণ্ডেরও কম। মায়া সবেগে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন।

'আমায় মাপ করুন' রাজীববাবু অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছিলেন।

'মাপ করতে পারি, এক শর্তে' মায়া বীর্যশুল্কা পাঞ্চালীর মতন ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন।

'শর্ত বলুন।'

'আপনি প্রতিজ্ঞা করুন জীবনে আর আমার সামনে আসবেন না। আমি যে শহরে থাকব, সে শহরের ছায়া মাড়াবেন না আপনি।'

'কথা দিলাম' রাজীববাবু মাথা তোলেননি।

সে রাতে বাড়ি ফিরে বালিশে মুখ চেপে মায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ

কেঁদেছিলেন। রাজীববাবুর ধরা হাতটা নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছিলেন। রাজীববাবুকে সামনে আসতে মানা করা সে কি শুধু রাজীববাবুর জন্যই। উনি সামনে থাকলে যে সংসার করতে পারবেন না মায়া। ওঁর দুর্বার আকর্ষণে পায়ের তলার মাটি সরে যাবে একটু একটু করে। তারপর ভরাডুবি মায়া কি করে এড়াবেন? কিসের জোরে? শুধু যাঁর সামান্য ছোঁয়ায় সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল, নিজেকে উজাড় করে দিতে সাধ হয়েছিল, বুকের আগল বেঁধে সে মানুষকে যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এটা মায়ার চেয়ে বেশি করে আর কে বুঝতে পারবে!

একবার, দু-বার, তিনবার। শেষ ডাকে মায়া কাগজ ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে পড়েছিলেন। বেলা গড়িয়ে পড়েছে। সংসারের হাজার কাজ বাকি। আঁচল গুছিয়ে মায়া উঠে পড়লেন, 'আমায় ডাকছ বৌমা?'
বৌটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল, 'হাঁ মা, ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা দরকার।' আঁচল থেকে চাবিটা খুলে মায়া এগিয়ে দিলেন। সাবধানে খবরের কাগজটা মুড়ে উঠে বসলেন।
সত্যিই প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন রাজীবদা। মায়ার মুখোমুখি আর এসে দাঁড়াননি। অথচ যখন তাঁর যে বই বেরিয়েছে, মায়া ঠিক পেয়েছিলেন এক কপি করে। সরোজও দিল্লী বেড়াতে গিয়ে থেকেছে তাঁর কাছে। যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি।
মায়া সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

অনেক রাতে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার সময় মায়া কাগজটা আবার বের করলেন। শেষের কয়েক লাইনে তাঁর কেমন খটকা লাগল কাগজের মন্তব্যটুকুতে।

> অধ্যাপক রাজীবলোচনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নারী জাতির প্রতি গভীর ঔদাসীন্য। তিনি অকৃতদার ছিলেন এবং কোনো মেনকা এই বিশ্বামিত্রের তপস্যায় মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নসাধন করিতে পারে নাই।

মায়া বালিশের তলা থেকে চশমার খাপটা বের করে সোনার চশমাটা আবার সন্তর্পণে চোখে লাগালেন। মোটা লাল পেন্সিল দিয়ে জোরে জোরে দাগ দিয়ে কেটে দিলেন কথাগুলো। মৃতের নামে এ অসত্য থাকা উচিত নয়।

ছাপার অক্ষরে তো নয়ই। আঁচলের নিচে থেকে নিজের হাতটা মায়া টেনে বের করলেন। রাজীবদার স্পর্শ হয়তো আর বোঝার উপায় নেই, কিন্তু মায়ার নিজের দাঁতের ক্ষত এখনও পরিষ্কার ফুটে রয়েছে। এতদিনেও এ দাগ একটু মেলায়নি।

কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে আলো যেতেই সরোজ বিছানার ওপর উঠে বসল। মার ঘর থেকেই আসছে আলোটা। বাতি জ্বেলেই বুঝি মা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'মা! মা!'

মায়া জেগেই ছিলেন। আস্তে বললেন, 'কি রে, ডাকছিস কেন সরোজ?'

'তুমি জেগে আছো এখনও?'

'হ্যাঁ, শাস্তি পর্বটা শেষ করে শুতে যাব, আর একটুখানি আছে।' খবরের কাগজের দিকে মায়া চোখ ফিরিয়ে দেখলেন। সত্যিই আর একটুখানি আছে। আর দু-একবার লাল পেন্সিল দিয়ে আঁচড় কাটলে লেখাগুলো নিঃশেষে ঢাকা পড়ে যাবে।

সারা কাগজে লাল আঁচড়। সেদিনের অ্যাশফাল্ট ঢাকা রাস্তার ওপরে কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতনই। কিন্তু সেদিন সে ফুল মাড়িয়ে যিনি আসেননি, আজ এতদিন পরে এই লাল আঁচড় পার হয়ে তিনি কি আসতে পারেন না! না, বোধ হয় মায়ার হাজার আহ্বানেও নয়।

মায়া হাত বাড়িয়ে বেড স্যুইচটা টিপে দিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮—) ॥ বনতুলসী
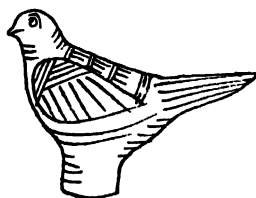
টেলিগ্রাম এল—বিমলেন্দুর তৃতীয় কন্যা নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠা হয়েছে। পত্নী এবং নন্দিনী দুজনেই সম্পূর্ণ কুশলে আছে, সুতরাং বাবাজীবনের উৎকণ্ঠিত হওয়ার হেতু নেই।

টেলিগ্রাম করেছেন পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়—আশা করেছেন কন্যালাভের সংবাদে জামাতা বাবাজী একেবারে চতুর্ভুজ হয়ে উঠবে। কিন্তু বিমলেন্দুকে আসলে দেখাচ্ছিল একটা চতুষ্পদের মতো। অদ্ভুত রকমের বোকা হয়ে গেছে মুখের চোহারাটা, ঘোলা চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘানির জোয়াল ঘুরিয়ে সের তিনেক খাঁটি সরষের তেল বের করে এল। খুব সম্ভব আসন্ন কন্যাদায়ের সম্ভাবনাটাই বেচারার মানস-চক্ষে এসে দেখা দিচ্ছিল।

পুরো পাঁচ মিনিট পরে এঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ফোঁস করে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিমলেন্দু। বললে, গেল।

আমি বললাম, কী গেল ?

—যৌবন। প্রেম।—কর্তিত-পকেট অসহায় পথচারীর গলায় বিমলেন্দু বলে যেতে লাগল : রোমান্স। ফ্রম এ ম্যান উইথ ফিউচার টু এ ম্যান উইথ পাস্ট।

আমি বললাম, যাওয়াই ভালো।—বোকামির পালাটা চটপট মিটে গেলেই ভদ্রলোক হয়ে উঠতে পারবে।

হয় কথাটা বিমলেন্দুর কানে গেল না, অথবা কান দিলে না। নাটকীয়ভাবে বলে যেতে লাগল, এখন দেখতে পাচ্ছি প্রেমটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকাই ভালো। প্রিয়া গৃহিণী হলেই জীবন-স্বপ্নে বারোটা বেজে গেল। তার চাইতে কবিদের অশরীরী প্রেম, অতীন্দ্রিয় মিলন—

আমি মন্তব্য করলাম, ক্লীবের সান্ত্বনা।

বিমলেন্দু ক্ষেপে উঠল। নাটক ক্রমশ মেলোড্রামার রূপ নিতে লাগল: বৌ, ছেলেমেয়ে, বাঁধা রুটিনের চাকরি, যক্ষ্মার মতো জীবন। তার চাইতে অনেক ভালো একটা খোলা আকাশ, একটা অবার দিগন্ত, মিষ্টি মহুয়ার ফল, কালো সাঁওতালের মেয়ে।

হাসি চাপাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। কলকাতার বাইরে জীবনে বিমলেন্দু কখনো পা বাড়িয়েছে কিনা জানি না। হয়তো বড়ো জোর মধুপুর দেওঘর অথবা পুরী, কিংবা শ্রীশ্রীবারাণসীধাম। সুতরাং অবারিত দিগন্ত আর মহুয়া ফলের স্বপ্ন দেখাটা তারই স্বাভাবিক অধিকার।

বললাম, ভুল করলে। মহুয়ার ফল অত মিষ্টি নয়, একটু তেতো। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, সে কথা থাক। আসলে প্রেমের পরিণতিই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস —ওর একমাত্র উপমা ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। সোপেনহাওয়ের পড়লে অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কিন্তু শুধু মানুষের প্রেম নয়—প্রকৃতির প্রেমও ওই রকম সর্বগ্রাসা।

—আফ্রিকার জঙ্গলের কথা বলছ?

—না। বাংলাদেশের মাঠঘাট, তার অবারিত দিগন্ত, তার ধানের ক্ষেত, তার বনতুলসীর ঝাড়—তার শরতের সোনা ঝরানো আকাশ—

—কথাটা বিশদ করো।

আমি বলতে শুরু করলাম:

কৈশোরের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছে বাংলাদেশের এক টুকরো পাড়াগাঁয়ে।

মনে রেখো, কৈশোরের কথা বলছি। যে বয়সে মানুষের জীবনে প্রথম নেশার মতো প্রথম প্রেম আবির্ভূত হয়, যখন চোখের সামনে পৃথিবীটাকে আরব্য উপন্যাসের মতো বলে মনে হতে থাকে। যখন জ্যোৎস্না রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে, জলের ঝাপটায় চোখমুখ ভিজে গেলেও ভালো লাগে বৃষ্টি পড়া দেখতে। ঘাসের ছোট ছোট ফুলগুলোর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় থাকে, সদ্য ফোটা আকন্দের বুনো গন্ধ পর্যন্ত রক্তে রক্তে কথা কইতে চায়।

সেই বয়সে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে অনেকগুলো দিন আমি কাটিয়েছিলাম। জায়গাটা কোনো এক অখ্যাত ব্রাঞ্চ লাইনের অখ্যাততর একটি স্টেশন। ঝিমিয়ে চলা প্যাসেঞ্জার গাড়িগুলো পর্যন্ত সেখানে এক মিনিটের বেশি

দাঁড়াত না। তিন-চার মাইল দূরের গ্রামগুলো থেকে যে সব যাত্রী আসত বা যে দু-চারজন নামত, সারাদিন-রাত্রে সবসুদ্ধ ঘণ্টা দেড়েকের বেশি তারা স্টেশনের নির্জনতায় বিঘ্ন ঘটাত না।

তা ছাড়া বিপুলব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবী। রাঙা মাটির টিলার তাল-বীথির মর্মর। বহু দূরে ধুলোর কুয়াশা বুনে চলা গোরুর গাড়ি। মাঝে মাঝে ভুট্টার ক্ষেত, বোরো ধানের নিচু জমি। আকাশে উড়ে যাওয়া বুনো হাঁস আর এক ফালি মরা নদী। দুপুরের রোদে ঝকঝকে নুড়ির ওপর বিছানো চকচকে একটা মিটার গেজের লাইন, ভুট্টা ক্ষেতের পাশে বাঁক নিয়ে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গিয়েছে; তার একপ্রান্তে একটা জংশন স্টেশন, আর এক প্রান্ত কোথায় গেছে জানা ছিল না, কল্পনা করা যেত দিল্লী, বোম্বাই, কাশ্মীর, কারাকোরাম ছাড়িয়ে হয়তো তুষার মেরুর পেঙ্গুইনদের দেশে গিয়ে ওর যাত্রা শেষ হয়েছে।

মেজ মামা ছিলেন স্টেশন মাস্টার। অকৃতদার লোক, একটা পয়েণ্টসম্যানকে নিয়ে তাঁর সংসার-যাত্রা চলত। স্টেশনের কাজ শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে বিবেকানন্দের বই আর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ মুখে নিয়ে বসে যেতেন। রাশভারী মানুষ, নিতান্ত দরকার না হলে কথাবার্তার বড়ো বালাই ছিল না।

আমার দিন কাটে কী করে? পৃথিবী ডাক দিলে। ভুট্টার ক্ষেত, রেলের লাইন আর মরা নদীর ধারে নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম আমি। টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশফুলের বনে নানা রঙের প্রজাপতি। খোলা আকাশের সোনালী রোদ রক্তের মধ্যে যেন মদের মতো ক্রিয়া করত, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। আর তৈরি করে নিয়েছিলাম একগাছা ছোট ছিপ, মাঝে মাঝে মৎস্যশিকারের আশায় নদীর ধারে গিয়ে বসতাম। কাদা আর নুড়ির ভেতর দিয়ে তির তির করে রুপালি জল বয়ে যেত, নেচে উঠত ছোট ছোট মাছ, তাদেরই দুটো একটাকে ধরবার প্রত্যাশায় অসীম ধৈর্য ধরে ছিপ ফেলে বসে থাকতাম।

সেখানকার আকাশ বাতাসের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সুর মিলিয়েছিল নদীটা। মাঝে মাঝে কাশ, মাঝে মাঝে এক গুচ্ছ বনতুলসী। কেন জানি না, এই বনতুলসীগুলোকে ভয়ানক ভাবে ভালবেসে ফেলেছিলাম আমি। লাল রঙের বড়ো বড়ো ডাঁটায় রুক্ষ চেহারার ছোট ছোট পাতা—ভঙ্গুর নমনীয়। মেঠো বাতাসে সহজেই নেচে উঠত, দুলে উঠত, একটা মৃদু মর্মরে ডাঁটা-পাতাগুলো

আকুল হয়ে উঠত একসঙ্গে। তার মঞ্জরী থেকে ছড়িয়ে পড়ত জংলা কষায় গন্ধ—ওই গন্ধটার ভেতর দিয়ে চারিদিকের প্রসারিত পৃথিবীটার একটা অভিনব আস্বাদ আমাকে ব্যাকুল করে দিত।

ওই বনতুলসীর ঝাড়ের ভেতর মাছ ধরবার জন্যে ছোট একটু জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেখানে বসেই চলত শিকারপর্ব। শিকার তো ছাই—ছিপ ফেলে হয় রেল লাইনটার অথবা আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকা। আর নয় তো ছোট ছোট মঞ্জরী ছিঁড়ে নিয়ে ডলে ডলে দু-হাতে তার আরণ্য গন্ধটা মাখিয়ে নেওয়া। এই গন্ধবিলাসের পেছনে হয়তো খানিকটা ফ্রয়েডিক মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, কিন্তু সত্য সত্যিই যে সেদিন আমি বনতুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম সে কথাটা অস্বীকার করবার জো নেই।

এমন সময় সেই বনতুলসীর পটভূমিতে মানবিক প্রেমের আবির্ভাব হল।

ঘটনাটা চাঞ্চল্যকর নয়। জায়গাটা ছিল নির্জন, লোকজনের যাতায়াত ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে একদিন দেখলাম একটি ছোট মেয়ে কেমন করে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

বোধ হয় তুরীদের মেয়ে। বছর বারো-তেরো বয়স হবে—হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা থান ধুতি পরনে। হাতে একটা ছোট ঝুড়ি, নদী থেকে বালি নিতে এসেছে। সারা গা অপরিচ্ছন্ন, গালে মুখে কাদার দাগ। আমাকে বোকার মতো তার দিকে তাকাতে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল।

মনে আছে, ভারী মিষ্টি লেগেছিল হাসিটা। হয়তো তার অন্য কারণ আছে। আকাশে তখন শরতের রোদ সোনা ঝরাচ্ছিল, তার ছোঁয়ায় ছোট নদীর জল চিকচিক করছিল, বাতাসে বনতুলসীর ঝাড় নুয়ে নুয়ে পড়ছিল—আর আমার রক্তে ছিল বনতুলসীর গন্ধ। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেয়েটি বললে, কী মাছ পেলি বাবু?

আমি বললাম, কিছু পাইনি।

মেয়েটি বললে, তুই মাছ পাবি না, ব্যাঙ পাবি।

পূর্বরাগের প্রথম পর্যায়ে নায়িকার ভাষাটা ভদ্রতার নয়। আমি রূঢ়ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটা মিষ্টি করে মুখ ভেংচে বনতুলসীর ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছিপ হাতে তারপর আরো অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে। শরতের রোদ আর বনতুলসীর গন্ধ স্নায়ুর ভেতরে ঝিমঝিম করছিল—বহুক্ষণ অকারণে

ভেবেছিলাম মেয়েটার কথা। না, অনুরাগে বিহ্বল হয়ে পড়িনি। মুখ ভ্যাংচানির কথাটা যখনি মনে পড়ছিল, তখনি ইচ্ছে করছিল একবার হাতের কাছে পেলে ফাজিল মেয়েটাকে গোটা দুই চড় বসিয়ে দেব।

তারপরে আরো অনেকদিন ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেছি ওখানে। প্রায়ই মনে হত ওই বাচ্চা মেয়েটা ভারী জব্দ করে দিয়েছে আমাকে, বোকা বানিয়ে দিয়েছে। আর একদিন ধরতে পারলে এর শোধ তুলব।

কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়ে গেল, তারপর আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি। ভালোই হয়েছে। আর একবার এলে নির্ঘাত ঠ্যাঙানি খেত, তার পরিণতি কী হত জানি না। প্রতিশোধের ইচ্ছাটা চরিতার্থ হয়নি বলেই তাকে ভুলতে পারিনি, অচেতন মনের ভেতরে সে আমার প্রথম নায়িকা হয়ে বেঁচে রইল—বেঁচে রইল বন-তুলসীর পৃথিবীতে।

আমার নায়িকা হারিয়ে গেল ; তারপরে হারিয়ে গেল সেই ছোট স্টেশন, সেই মকাই ক্ষেত, টিলার ওপরে তালের সারি, সেই রূপালি ছোট নদী আর সেই বনতুলসী। চলে এলাম শহরে। নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ। ইস্কুল, কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি, সাহিত্য।

হাতের থেকে সেই উদ্ভিদ-রসের কষায় গন্ধটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু রক্তের থেকে নয়। বহুদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সরু সরু লাল রঙের ডাঁটাগুলো বাতাসে ঢেউয়ের মতো দুলছে ; অনেক নিঃসঙ্গ ভাবনার অবকাশে শুনতে পেয়েছি ছোট ছোট রুক্ষ পাতাগুলোর দীর্ঘশ্বাসের মতো শিরশিরানি শব্দ। রোমান্টিক মনের মুহূর্ত বিলাস আমন্থর হয়ে উঠেছে—কটু-কষায় একটা গন্ধের উল্লাসে।

এ পর্যন্ত ছিল ভালো। আমি বনতুলসীর প্রেমে পড়েছিলাম বনতুলসীও যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছে তাকি বুঝতে পেরেছিলাম কোনোদিন। তোমাকে বলেছি, প্রেমের ধর্মই হচ্ছে পূর্ণগ্রাস। মানুষের পক্ষে কথাটার প্রমাণ দরকার নেই—ওটা স্বতঃপ্রমাণিত। কিন্তু বাংলাদের নিরীহ পল্লী-প্রান্তরও যে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ভালবাসতে পারে সেটা আমার জানা ছিল না।

বছর পাঁচেক আগেকার কথা, সবে এম-এ পাস করে বসে আছি। স্টেটস্‌ম্যান আর অমৃতবাজারের পাতা খুলে মাস্টারি, প্রোফেসারি যারই বিজ্ঞাপন দেখছি দু-হাতে দরখাস্ত করে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য তাতে ডাক-বিভাগের পক্ষেই

নিঃস্বার্থ পরোপকার সাধিত হচ্ছে মাত্র। নিরাশ হয়ে গীতা পাঠে মনোনিবেশ করব কিনা চিন্তা করছি এমন সময় ডাক এল বন্ধুর কাছ থেকে।

শিকারের নিমন্ত্রণ। ওদের বাড়ি উত্তর বাংলার জংলা বিলের দেশে, বুনো-হাঁস শিকারের অপূর্ব জায়গা। বিপ্লবী যুগে আমবাগানে টার্গেট প্র্যাকটিস করে বন্দুক পিস্তলের হাত খানিকটা রপ্ত করেছিলাম—এবার সেটা কাজে লাগাবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাবে। তাছাড়া মনের দিক থেকেও খানিকটা আউটিঙের দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়লাম।

সত্যই দেশটাকে ভালো লাগল। এতবড়ো একটা আকাশ যে কোথাও আছে বহুদিন সে কথাটা মনেই ছিল না। মাঠ আর বিল। বিলে অজস্র বুনো হাঁস, হাড়গিলা, দুটো একটা ফ্লোরিক্যান, কাগ, চীনে কাগ, বক, ছোট বড়ো স্নাইপ, এমন কি চখা-চখী পর্যন্ত। ছররা মারা শিকারীর স্বর্গ-বিশেষ।

বন্ধু সুধীররা গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, বাড়িতে দু-দুটো বন্দুক। পাড়াগাঁয়ের স্বভাবসিদ্ধ আতিথেয়তার সঙ্গে শিকারপর্ব পরমোৎসাহে চলতে লাগল। শাপলা কলমী আর পদ্মপাতার জগতে বালিহাঁসদের নিশ্চিন্ত সংসারে আমরা হাহাকার সৃষ্টি করে দিলাম। সকালের দিকে বেরিয়ে দিনান্তে যখন রক্তমাখা পাখির ঝাঁক নিয়ে আমরা ফিরে আসতাম, তখন মনে হত যেন দিগ্বিজয় করে আসছি। অদ্ভুত একটা হিংস্র আনন্দ—শিকারের নেশা—আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুলি খেয়ে ক্ষীণপ্রাণ পাখি যখন ছটফট করত, তার রক্তে রাঙা হয়ে যেত বিলের কালো জল, তখন অমানুষিক বিকট জয়ধ্বনিতে আমরা পরস্পরকে অভিনন্দিত করতাম। আবার আমাদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে হাঁসের দল যখন বন্দুকের পাল্লার বাইরে উড়ে পালিয়ে যেত, তখন একটা চাপা আক্রোশে সমস্ত মনটাই যেন কালো হয়ে যেত। এক কথায় আমাদের মনের প্রচ্ছন্ন জল্লাদ-বৃত্তিটা তখন আত্মপ্রকাশের বেশ একটা ন্যায়সঙ্গত এবং নির্দোষ উপায় খুঁজে পেয়েছিল।

এমন সময় একদিন সুধীর বললে, রঞ্জন, একটু হাঁটতে পারবি ?

—কেনরে ?

—ছোট হাঁস মেরে আর সুখ নেই, বড়ো গেমের সন্ধান পেয়েছি।

—বড়ো গেম! বাঘ ভালুক নাকি ?

—দূর, বাঘ ভালুক কেন। রাজহাঁস।

—রাজহাঁস!

—হাঁ, 'ইটালিয়ান ডাক'। কাল রাত্রে একটা খুব বড়ো ঝাঁক উড়ে গেছে, ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। এ বছর এই প্রথম এল। কোথায় নেমেছে জানবার জন্যে সকালে লোক পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজ নিয়ে এসেছে ঝাঁকটা পড়েছে মাইল পাঁচেক দূরের কমলার বিলে। মস্ত ঝাঁক, প্রায় হাজারখানেক পাখি আছে।

—এর মধ্যে পালায়নি তো?

—না, না। কমলার বিল খুব ভালো জায়গা—মাইল তিনেকের মধ্যে লোকজন নেই, ডিস্টার্বড হবে না। তা ছাড়া রাজহাঁসগুলো এমনিতেই একটু বেপরোয়া, সুবিধেমতো জায়গা পেলে সহজে নড়তে চায় না। যাবি কাল?

—বেশ, চল।

—কিন্তু মাইল পাঁচেক রাস্তা—হাঁটতে হবে। গোরুর গাড়িতেও অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অনেকটা ঘুরতে হবে, পাক্কা দশ মাইলের ধাক্কা। দিনটা কাবার হয়ে যাবে।

—তা হলে হেঁটেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু তোর অভ্যেস নেই, হাঁটতে তো কষ্ট হবে—

মনের জল্লাদটা নেচে উঠেছিল। সোল্লাসে বললাম, না, না, কিছু কষ্ট হবে না। আরে রোমে এসে রোমান না হতে পারলে কি চলে?

পরদিন ভোরের আবছায়া অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মাথায় হ্যাট, কাঁধে ফ্লাস্ক, চাকরের হাতে টিফিন বাস্কেট আর বন্দুক। যাত্রা করলাম আমরা পাঁচজন।

কোমর সমান বিন্নার বন আর ধানক্ষেতের আল্ ভেঙে মাইল খানেক এগোতেই আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল। গ্রীষ্মকালে পুরী গিয়েছিলাম। তাই সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিনি, তার বর্ণনাই শুনেছি; দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে দু-তিন দিন টাইগার হিলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু মেঘ আর কুয়াশা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। শুনেছি পাহাড় আর সমুদ্রের সূর্যোদয়ের তুলনা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের বিশাল মাঠের ওপরে সূর্য ওঠা দেখেছ কখনো? যদি না দেখে থাকো, জীবনে একটা অত্যন্ত দামী জিনিস হারিয়েছ।

মাঠের পারে সূর্য উঠল। আকাশে ছড়িয়ে গেল সাতরঙের বিচিত্র কিরণলেখা, হাঁসের ডিমের মতো চ্যাপ্টা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সে সূর্যোদয় আমি কখনো ভুলতে পারব না —সেই সূর্যের আলোয় বনতুলসীর গন্ধ ছিল।

আমি ছিলাম সকলের পিছনে। পায়ের জুতোয় কাঁকর ঢুকেছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখি ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। তা যাক—সে জন্যে আমার চিন্তা ছিল না। মাঠের পথ হারাবো বলে ভাবিনি। বিন্নার জঙ্গল ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, তার আড়ালে দূরে ওদের হ্যাট আর বন্দুকের নল দেখতে পাচ্ছিলাম।

আস্তে আস্তে চলেছি। শরতের রোদ তখন সমস্ত মাঠ-ঘাটের ওপরে পাতলা একটা সিল্কের ওড়নার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছোট খালের পাশে চলে এলাম। তার ওপরে একটা বাঁশের পুল, সেইটে পেরিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু পুলে পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

চোখে পড়ল কালো পাথরের তৈরি ভেনাস। পূর্ণ-যৌবনা সাঁওতালের মেয়ে। বিন্নাবনের আড়ালে নির্জন খালের ধারে দাঁড়িয়ে সযত্নে গাত্রমার্জন করছে। চারিদিকের পৃথিবীর মতোই নিঃসংকোচ এবং একান্ত নিরাবরণ। কনকচাঁপা রঙের রৌদ্রে উদঘাটিত অপূর্ব দেহশ্রী।

কোনো বিবসনা মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকানো ভদ্ররুচির পক্ষে শুধু ধিক্কারজনক নয়, কল্পনাতীত। কিন্তু সেই মাঠ আর সেই সূর্যোদয় সেদিন যে পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, আমার চির-পরিচিত শিক্ষা সংস্কৃতির পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। লোভের বিকৃত দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে আমি তাকাইনি--সে প্রশ্ন সেখানে সম্পূর্ণই অবান্তর ছিল। শুধু চেতনার মধ্যে মর্মরিত হয়ে উঠেছিল: এ আশ্চর্য, এ অপরূপ! মনে হয়েছিল, খালের জল, সূর্যের আলো, গাছপালার গন্ধ, সবাই মিলে যেন কণা কণা সৌন্দর্য দিয়ে ওকে তিলোত্তমা করে গড়ে তুলেছে—গড়ে তুলেছে একটা স্বপ্নের মূর্তি। যে কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তিটা মিলে গিয়ে গলে গিয়ে জলে আলোয় আকাশে হারিয়ে যেতে পারে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। তারপর দেখলাম একপাশ থেকে একখানা ময়লা কাপড় মেয়েটি কুড়িয়ে নিলে। সযত্নে আবৃত করলে দেহ, ওপাশের আলের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলে। খানিক দূর এগিয়েই—হ্যাঁ বনতুলসী, আমার কৈশোরের সেই বনতুলসী, তারই নিবিড় বনের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল।

আমার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যেন রণিত হয়ে উঠল কৈশোরের সেই গান, সেই

মিড় মূর্ছনা। আমার দু-হাতের ভেতরে যেন ফিরে এসেছে একটা কটু কষায় উদ্ভিদ গন্ধ। আমার পথ ভুল হয়ে গেল, আমার মাথার মধ্যে সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। কেন যেন মনে হল সেই হারিয়ে যাওয়া নায়িকা আজ পরিপূর্ণ যৌবনে ওই বনতুলসীর কুঞ্জে আমারি জন্যে অপেক্ষা করছে।

দিবাস্বপ্ন? সস্তা রোমান্টিসিজম? তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি সেই সূর্যোদয়ের কথা, বলেছি আমার মগ্ন চৈতন্যের ভেতরে সেই বন-তুলসীর বিচিত্র আস্বাদ। হয়তো তখন আমার মনের ভেতরে সব ওলোট পালোট হয়ে গিয়েছিল, চেতন সত্তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিয়েছিল অবচেতনার আকস্মিক উৎক্ষেপ; আমি বনতুলসীর জঙ্গলের দিকে নেমে এলাম।

বহুদিন পরে শরতের রৌদ্র আর বাতাসের ঐকতান মিলল, বহুকাল পরে আমাকে আলিঙ্গন করলে সেই লাল নরম ডাঁটাগুলি, সেই খস্‌খসে পাতাগুলো আমার গালে মুখে ভালবাসার ছোঁয়া বুলিয়ে দিলে। বন ভেঙে আমি এগোতে লাগলাম। কোথায় চলেছি জানি না। আমার নায়িকার সন্ধানে কি? বোধ হয় তাও নয়। ডাঁটা-পাতার সেই স্পর্শ দলিত মথিত গাছগুলোর সেই অপরূপ আদিম গন্ধ আর বাতাসের শিরশির শব্দই আমার কাছে একান্ত হয়ে উঠেছিল, সত্য হয়ে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানেক বনের মধ্য দিয়ে চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। নিচে মাটি নেই, এত ঘন হয়ে উঠেছে যে ওদেরই একরাশকে চেপে বসতে হল আমাকে। চারিদিকে বনতুলসী আমাকে ঘিরে ধরেছে—আমার মাথা থেকে প্রায় দু-হাত উঁচুতে উঠে ওরা আমাকে আড়াল করে রেখেছে। কোনোদিকে কিছু দেখবার নেই—শুধু ওপরে নীল নিবিড় আকাশ আর তার কোলে শ্বেত-পদ্মের উড়ন্ত পাপড়ির মতো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো।

অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেখানে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে নিয়েছিলাম, অবগাহন করে নিয়েছিলাম বনতুলসীর নিবিড় স্পর্শ সান্নিধ্যে। পর পর যখন গোটা পাঁচেক সিগারেট শেষ করেছি তখন খেয়াল হল। তখন আমার মগ্ন চৈতন্যের ওপরে বাস্তব চেতনার আলো পড়ল। মনে পড়ে গেল, আমি সুধীরদের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম। ওরা হয়তো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, হয়তো ভাবছে—

হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি। সর্বনাশ,

বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দু-পকেট ভরে বনতুলসীর পাতা আমি ছিঁড়ে নিলাম, তারপর উঠে পড়লাম বেরিয়ে আসবার জন্যে।

কিন্তু আমার মতোই বনতুলসীও বহুদিন বাদে আমাকে ফিরে পেয়েছিল। আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমাকে ছাড়তে রাজী হল না, ঘন নিবিড় আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরল।

বেরুতে চাই, আর বেরুতে পারি না। মোহভঙ্গের পরে বুঝতে পারলাম কত বড়ো বোকামি করে ফেলেছি আমি। একটু আগেই তুমি বলছিলে প্রেমের প্লেটনিক রূপটাই নিরাপদ। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষেও, প্রকৃতির পক্ষেও।

এ বনের যেন শেষ নেই। মনে হতে লাগল এই বনতুলসীর ঝাড় আদি অন্তহীন, —যেন কার একটা বিচিত্র যাদুমন্ত্রে এত বড়ো পৃথিবীটার পাহাড় সমুদ্র নগর গ্রাম সব বনতুলসীর জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমার অতীত জীবন, আমার সভ্যতা, আমার আত্মীয়-স্বজন, সব মায়া, সব মিথ্যে। এ জঙ্গল থেকে আমি আর কোনোদিন বেরুতে পারব না, কোনোদিন বেরুতে পারব না! ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। আমার প্রেম এখন কোটিভুজ একটা রক্তশোষী জানোয়ার হয়ে আমাকে ঘিরে ধরেছে, তার লাল-লাল ডাঁটাগুলিতে রক্তের তৃষ্ণা, তার শিরশিরে পাতাগুলোর স্পর্শে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ওপরে শরতের রোদ তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে আমার মাথার ভেতরে বিঁধতে লাগল, আমার চোখের দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে। দু-হাতে জঙ্গল ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম কিন্তু বৃথা। এ বনের শেষ নেই—এর ভেতর থেকে কোনোদিন লোকালয়ে যাবার পথ খুঁজে পাব না আমি। মাথা উঁচু করে জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু চারপাশের উঁচু-নিচু অসমতল জমির ওপরে আমার অভিশপ্ত প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই, কোনো কিছুর চিহ্নই নেই!

প্রাণপণে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি—কিন্তু জঙ্গল ভেঙে ভেঙে আমার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সামনে এগোবার চেষ্টা করে বার কয়েক হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এক পায়ের জুতো কোথায় ছিটকে চলে গেল, টের পেলাম পকেট থেকে পড়ে গেল মনিব্যাগটা। কিন্তু সেগুলো খোঁজবার অবস্থা নয়, বেরুতে হবে। মনে হতে লাগল কোথায় কতদূরে আমার কলকাতা, তার বাড়িঘর, তার ট্রাম বাস, তার সুন্দর স্বাভাবিক জীবন! আজ এই বন-

তুলসীর জঙ্গলের ভেতরে আমি মরে যাচ্ছি—কেউ আর কোনোদিন আমায় খুঁজে পাবে না।

অসহায় গলায় বার কয়েক চেঁচিয়ে উঠলাম, কিন্তু কে সাড়া দেবে? সেই আদিগন্ত মাঠের ভেতরে আমার অবরুদ্ধ আর্তনাদ শুনবে কে? কোনো আশা নেই, কোনো উপায় নেই। হয় এখানে দম আটকে মরে যাবো, নইলে সাপে কামড়াবে—আশে পাশে বাঘ থাকা অসম্ভব নয়!

আর একবার শেষ শক্তিতে এগোবার চেষ্টা করেই একরাশ গাছের সঙ্গে পা জড়িয়ে আমি পড়ে গেলাম। বনতুলসীরা সাপের মতো কিলবিল করে আমাকে আঁকড়ে ধরল। জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল এইখানেই মরে যাবো আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্ঠুর, আরো একরাশ বনতুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে—

কিন্তু জঙ্গলের বাইরে আমার টুপিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল বলেই অজ্ঞান অবস্থায় সে-যাত্রা আমাকে উদ্ধার করতে পেরেছিল সুধীর। রক্ষা করতে পেরেছিল আমার নায়িকার সেই ঊর্ণনাভ-প্রেম থেকে।

তাই তোমাকে বলছিলাম, তবু আমাদের কলকাতাই ভালো। আর ভালো মানুষের প্রেম, যেখানে তুমি না থাকো, সৃষ্টির স্বাক্ষর সন্তানের মধ্য দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে—প্রকৃতির মতো মানুষের পৃথিবী যেখানে নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে নিজের ভেতরে তোমাকে একেবারে অবলুপ্ত করে নেবে না।

বাণী রায় (১৯১৮—) ॥ নার্সিসাস্
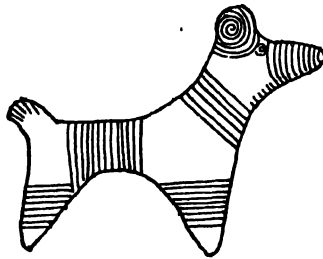
তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছিল। ভালবাসা কাহাকে বলে জানি না, কাজেই এ ভালো-লাগা ভালবাসা কিনা বলিতে পারিলাম না।

আমার জীবন-পথে বহু পুরুষ আসিয়াছে। তাহারা সকলেই আমাকে ভালবাসিয়াছিল, আমি কাহাকেও বাসি নাই। এই আমার পরিচয়।

তবু নিদ্রাবিহীন রাত্রে আকুল বাতাসের ক্রন্দনে তাহাকে মনে পড়ে। বর্ষামুখর অপরাহ্নে তাহার কথা আমাকে বিমনা করে। উজ্জ্বল বসন্ত দিনে অকারণে তাহার হাসি কানে ভাসিয়া আসে। সহস্র যোজন দূর পথ হইতে সে আমাকে ডাকে—"নার্সিসাস্!"

এ ডাক ভালবাসার নহে, ঘৃণার। নারীর প্রতি পুরুষের যত ঘৃণা থাকিতে পারে, শেষদিনে সে আমাকে তাহাই দিয়াছে। তারপর—আমাদের মধ্যে আসিয়াছে ব্যবধান। সে ব্যবধান সাগর সমান। হয়তো কখনো সে ফিরিবে না, কারণ সে আমাকে ঘৃণা করে। আর আমিও ডাকিব না, আমি তাহাকে তো ভালবাসি না। কিন্তু সে এতদূরে যাইয়া আমাকে এত বিমনা করে কেন?

সহশিক্ষার কলেজে সে ছিল আমার সহপাঠী। দীর্ঘ দেহ তাহার উন্মুক্ত তরবারির মতো। বিশাল নেত্রে তাহার সহাস্য কোমলতা। আর সে ললাট প্রতিভার লীলাভূমি। রবীন্দ্রনাথের "সন্ন্যাসী উপগুপ্তের" সহিত তাহার মিল খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

"সৌম্য সহাস তরুণ বয়ানি, করুণা কিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

প্রশান্ত গুহ ছিল নারীচিত্তদহনকারী অগ্নি। তাহার নির্লিপ্ত সৌন্দর্য দূর হইতে আকর্ষণ করিত, তাহার প্রতিভা মুগ্ধ করিত। সে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, সে ছিল কবি এবং শিল্পী।

আমি কলেজ যাইতে ভালবাসিতাম না। পড়াশুনা কখনও আমার ভালো লাগে নাই। মেয়েদের সাহচর্যও তেমন লোভনীয় নয়। বেশি পড়াশোনা করিলে অনেক বাঙালী মেয়ের যেমন অনুর্বর মরুভূমির মতো মূর্তি হয়, আমার অধিকাংশ সহপাঠিনীর ছিল তাহাই। ছেলেদের দিকে তাকাইবার আমার অবসর ছিল না বাড়িতে স্তাবকদলের প্রাচুর্যে। এই কারণে সহপাঠিগণ আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া বিরক্তিভাজন হইয়াছিল।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর কলেজে যাইয়া দেখি সহপাঠিনীরা তুমুল আন্দোলন করিতেছে। তাহারা প্রশান্ত গুহের কাছে ইংরেজি নোট চাহিয়াছিল। প্রশান্ত ধীরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে বই পড়াই যথেষ্ট। মণিকার আক্রোশ দেখিলাম বেশি। তাহার ভ্রাতা পরিচালিত একখানা মাসিকপত্রে লেখা দিবার অনুরোধে সে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা চিঠি দিয়াছিল.; প্রশান্ত উত্তর দেয় নাই।

শুনিতে শুনিতে আমার অধরে কৌতুকহাস্য দেখা দিল। একজন সামান্য পুরুষ! তাহার জন্য এতগুলি নারীর ব্যাকুলতা! যাহারা রমণীর পদপ্রান্তে ভিখারী হইয়া প্রেম ভিক্ষা করে তাহাদের একজনের এত স্পর্ধা ?

সহসা মণিকা আমাকে অনুরোধ করিল, “আচ্ছা ইরা, ছেলেরা তোর জন্যে পাগল। তুই তো ফিরেও দেখিস না। দে না প্রশান্ত গুহকে একটা শিক্ষা। তাহলে বুঝতাম তোর ক্ষমতা।”

অলসভাবে মণিকার জামার কাজটা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলাম, “কি শিক্ষা দিতে হবে ?”

উত্তেজিত স্বরে মণিকা বলিল, “ওকে নাচাবি। ও তোর জন্যে যখন পাগল হবে তখন দূর করে তাড়িয়ে দিবি।” সকলে সমস্বরে সায় দিল।

চাহিয়া দেখি সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিপাশে অনুরোধের ব্যাকুল স্বর। মনে হইল দেখা যাক্ সময় কাটানোর সঙ্গে এতগুলি নারীকে প্রতিশোধের সুযোগ দেওয়া মন্দ কি ? নিশ্চেষ্ট মনে ক্রূর প্রবৃত্তি এবং উদ্যম দেখা দিল। মনের আবেগ দমন করিয়া বাহিরে উদাস কণ্ঠে বলিলাম, “দেখি কি হয়।”

তারপর চলিল আমার হৃদয় জয়ের নিষ্ঠুর অভিযান। রূপ চিরদিনই প্রচুর, তাহাকে সজ্জিত করিবার নব প্রচেষ্টায় আরো লোভনীয় করিয়া তুলিলাম। পড়াশোনার আগ্রহে প্রতিদিন নিয়মিত ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলাম। মিটিং,

সাহিত্য-সভা সমস্ত কিছুতেই আমাকে দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না, আমার পূর্বেকার নির্লিপ্ত ঔদাস্য প্রশান্তেরও ঔদাস্যকে জয় করিয়াছিল। তাহার স্থির, প্রদীপ্ত দৃষ্টি আমার দেহ বন্দনা করিয়া ফিরিতে লাগিল। তারপর উভয়পক্ষের আগ্রহে আলাপ-পরিচয় গাঢ় হইতে লাগিল।

প্রশান্তকে আমি অধীর উন্মাদ কামনায় নিকটে টানিলাম। কটাক্ষে, হাস্যে, ভঙ্গিমায় যাহা বাকি ছিল, আমার ভালবাসাহীন বন্ধুত্বে তাহা সম্পূর্ণ হইল। নারীচিত্তবিজয়ী প্রশান্ত গুহ আমাকে ভালবাসিল। সে ভালবাসা! যৌবনের আকুল পিপাসা, বন্ধুত্বের স্নেহপ্রীতি, ভক্তের পূজাবন্দনায় প্রশান্ত আমাকে কাছে পাইতে চায়। একবার মনে হইল তাহাকে মুক্তি দিই। ভালো যাহাকে বাসি নাই, তাহাকে দগ্ধ করিব না ; কিন্তু সহপাঠিনীদের কথা মনে পড়ে, মনে হয় নারীর অবমাননায় পুরুষের উপর প্রতিশোধ লইবার ভার আমার। তাহার উপর চিরদিনের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি আমার, হাতের কাছে সুন্দর ক্রীড়নকটি ত্যাগ করিতে চাহিল না। আমার তাহাকে ভালো লাগে, তাহার প্রেম ভালো লাগে,—তাহাকে আরো চাই।

মেয়ের দল আমাকে স্তুতিগানে চঞ্চল করিয়া তুলিল। প্রশান্ত আমাকে চায়, এইবার আমার প্রত্যাখ্যান হইলেই নরমেধযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু প্রশান্তকে আমার মতো লঘুচিত্তারও ভালো লাগিল, কমনীয় তাহার মূর্তি, মধুর তাহার ব্যবহার। জ্বলন্ত বহ্নির মতো তাহার প্রেম, উদ্দীপ্ত তাহার প্রতিভা। অন্য অসংখ্য পুরুষের মতো হতভাগ্য সে আমাকে ভালবাসিয়া ভুল করিয়াছিল। আমি পুরুষের দেহের মূল্য বুঝি, অন্তর আমার কাছে অজানা। নারীকে পুরুষ ভালবাসে তাহার যৌবনের জন্য, তাহার রূপের জন্য। যতদিন নারীর সে সম্পত্তি আছে, ততদিন পুরুষ তাহাকে কেবল ভালোই বাসিয়া যাইবে আমার বিশ্বাস ছিল। তাই নিজের মনের দিকেও চাহিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার ছায়া মদির তন্দ্রার মতো নামিয়া আসিয়াছে। খোলা জানালার সামনে ইলেক্‌ট্রিকের পিলসুজে সাদা কলাই-করা পরীমূর্তি হস্তে আলো লইয়া দণ্ডায়মান। আমার হাতে একখানা বই ছিল।

নিঃশব্দে কে যেন টেব্‌ল ল্যাম্পটির আলো নিবাইয়া দিল, সারা ঘরে অন্ধকারের

বন্যা। ক্যালিফোর্নিয়া পপির মিষ্ট গন্ধে বুঝিলাম প্রশান্ত আসিয়াছে। আলো জ্বালাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতক্ষণ এসেছ?"
সামনের চেয়ারে বসিয়া প্রশান্ত বলিল, "অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পাঠরতা মূর্তি দেখছিলাম। এত মন দিয়ে কী পড়া হচ্ছে?"
"ওঃ, তোমাদের Elliotএর কাব্য সঞ্চয় ও 'waste land', কি এত যে ভালো দেখো তুমি! আমার তো এর কবিতা বিশ্রী লাগে।"
প্রশান্তর পদ্মপলাশ নেত্রে আগ্রহ ও কৌতুক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রিয় কবিকে অবজ্ঞা করিবার জন্য সে আমারও সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল, "ভালো লাগে না কেন?"
জানি প্রশান্তর সহিত তর্কে জয়ী হইবার ক্ষমতা আমার নাই; অসীম তাহার জ্ঞান, তীক্ষ্ণ তাহার বুদ্ধি। তাই এলোমেলো উত্তর দিয়া অবহেলা দেখাইলাম, "যত সব ন্যাকামির ছড়া। প্রেমের কবিতা পড়তে আমার ঘেন্না হয়। প্রেম বলেই কিছু নেই, তার আবার কবিতা!" অট্টহাস্যে টেবিলের উপর মোহন ভঙ্গিতে এলাইয়া পড়িলাম।
"এই ধরো তোমার সেই প্রিয় কবিতাটি—" আবার বলিতে আরম্ভ করিলাম, "Portrait of a Lady, অমন কি আর সত্যি হয়? এতদিন ধরে একজনকে মনে থাকে কখনও? তার ওপর মেয়েটি কোনোও প্রতিদান দেয়নি।"
প্রশান্তর দৃষ্টি ম্লান হইয়া গিয়াছিল, "কেন অমন হবে না? ও রকম মেয়েও আছে, অত ভালবাসাও দুর্লভ নয়। অতদিন? সারা জীবন মনে থাকে। তুমি ভালবাসাকে বাজে সেন্টিমেণ্টালিটি বলে ভাবো, তোমার তো এ মনে হবেই।"
হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "কিন্তু ছেলেটি আচ্ছা জব্দ হল। যখন সে মনে মনে আকাশ-কুসুম তৈরি করছে, স্বাভাবিক বন্ধু ভাবে দেখছে। ইস কী মজার! I shall go on serving tea to friends—মুখের ওপর বলে যাচ্ছে—।"
প্রশান্তর মুখে ব্যথার ছায়া, আমার দিকে চাহিয়া অনেকটা নিজের মনে, অস্পষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "এত সুন্দর অথচ এত নিষ্ঠুর!"
পরিণামরমণীয় বর্ষার বিকালে মণিকার বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে গেলাম। অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও আসিয়াছিল। আমার রক্তকোকনদ, হাল্কা বেনারসী শাড়িখানির কারুকার্যখচিত পাড় প্রশংসা করিতে করিতে সিপ্রা বলিল, "যত দিন যাচ্ছে ততই ইরা যেন আরো সুন্দর হচ্ছে।"

নিজের রূপ বর্ণনা আমার চিরকাল ভালো লাগে। নিপুণ প্রসাধন ও অপরিসীম যত্নে এ-রূপকে আরও উজ্জ্বল করিবার প্রয়াসে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। সৌন্দর্যের বন্দনা শুনিবার জন্য উৎসুক কান পাতিয়া রহিলাম।
বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া কেক্ কাটিতে কাটিতে মণিকা মন্তব্য প্রকাশ করিল, "রূপ থাক্‌লে আর কি বলো? সাধারণ একটা ছেলেকেও জব্দ করতে পাচ্ছে না, এটা কি কম দুঃখের কথা?"
ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সিপ্রা বলিল, "তার মানে?"
"মানে আর কি? শ্রীমতী প্রশান্তকে খেলাতে গিয়ে নিজেই ধরা পড়ে গেছেন। প্রশান্ত তো বন্ধুদের কাছে এ নিয়ে গল্প করে, বিদ্রূপ করে বেড়াচ্ছে।"
ভুলিয়া গেলাম প্রশান্তর কোনোও বন্ধু নাই, নির্লিপ্ত ঔদাস্যে সে চিরদিন সুদূর। ভুলিয়া গেলাম হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া আন্দোলন সে কখনও করে না। দিশাহারা ক্রোধে বলিলাম, "বলতে চাও তার মতো ছেলেকে আমি গ্রাহ্য করি?"
"আমি বল্‌ব কেন, সবাই বল্‌ছে। তা নইলে, আমাদের যে কথা ছিল সে-সব ভুলে তুমি প্রশান্তকে নিয়ে মেতেই রয়েছ।" তিক্ত হাসি গোপন করিতে মণিকা অধরের কাছে চায়ের চিত্রিত পেয়ালা তুলিয়া ধরিল।
অপমানে, রোষে আমার সর্বদেহ জ্বলিয়া উঠিল। নমিতার উদ্যত স্যাণ্ডউইচ্ প্রত্যাখ্যান করিয়া উঠিতে উঠিতে কোনোমতে আহতা সর্পীর গর্জনে বলিলাম, "আচ্ছা!"

চায়ের আসর হইতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম কাউচের উপর অন্ধকারে সে শুইয়া আছে। ব্যগ্র বাহুপ্রসারণ এড়াইয়া বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "কে?"
বিনীত কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল, "আমি।"
মনে মনে হাসিলাম। প্রশান্ত গুহ, আজ এখনই তোমার দুরদৃষ্ট তোমাকে ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর গহ্বরে টানিয়া আনিয়াছে। আমাকে লোকের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিবার, বন্ধুদের কাছে গল্পের খোরাক করিবার জন্য শিক্ষা আজই তোমাকে দিব। খেলার শেষ এখনি হইবে। কিন্তু, রাগ নয়, তর্জন নয়; অবহেলা ও বিদ্রূপে তোমার হৃদয় ভাঙিতে হইবে।
রূঢ়স্বরে বলিলাম, "আমিটা কে?"

"গলা শুনেও চিনতে পারছ না?"
পরম তাচ্ছিল্যে উত্তর দিলাম, "চিনে রাখার দরকার মনে করিনি।"
আগের মতোই উত্তাপবিহীন স্বরে উত্তর হইল, "আচ্ছা। আমি প্রশান্ত।"
আলো জ্বালাইলাম। লাল আলো সে ভালবাসে বলিয়া নিজের হাতে আমার বসিবার ঘরের আলো লাল আবরণী দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল। প্রলয়ের সূচনায় রক্তমেঘের মতো সেই লাল আলো হাসিয়া উঠিল।
"ওঃ, প্রশান্ত। তুমি না হলে কার এমন অজস্র সময় শুয়ে-বসে নষ্ট করার আছে।" আয়নায় কেশবেশ ঠিক করিয়া সোফায় অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসিলাম।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত বলিল, "একটা বিশেষ দরকারী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"
"বলে ফেলো তাহলে। কিন্তু দোহাই তোমার, বাজে কবিত্ব করে সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাজ না থাকতে পারে, আমার আছে।"
প্রশান্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার কাজ নষ্ট হবে না। ভাবছি যুদ্ধে নাম লেখাব। তুমি কি বলো?" একান্ত আগ্রহে ও প্রত্যাশায় সে আমার মুখের দিকে চাহিল।
আমার মন বুঝিবার জন্য এ প্রস্তাব বুঝিলাম। ইহার মধ্যে কতবড়ো আশা, আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু, আজ তাহাকে আঘাত দিতে দ্বিধা হইল না। অতিশয় অনাগ্রহ, উদাসীনভাবে বলিলাম, "সে আমি কি বলব? তোমার আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বলে মত নাও। আর হায় হায় শেষে তুমিও করবে যুদ্ধ! মেয়েদের স্তবগাথায় কলম-ধরা হাতে তলোয়ার কি মানায়? বন্দুকের শব্দ শুনে শেষে মূর্ছা না যাও! কবি-কবি ভাব নিয়ে প্রেম করা চলে! যুদ্ধে যেতে দরকার হয় পৌরুষের।"
প্রশান্ত উঠিয়া বসিল, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। "আমাকে তুমি শেষে এই মনে করো?"
"শেষে আগে কি প্রশান্ত? চিরকাল তুমি যা, তাই তোমাকে মনে করি। ন্যাকা, মেয়েলি ঢঙের কবি বা পণ্ডিত আমার দু-চোখের বিষ। আমি চাই বজ্রের মতো শক্ত পুরুষ।" একটু হাসিয়া পুনরায় বলিলাম, "যুদ্ধে যাবে, এই কথা? আমি ভাবলাম অন্য কিছু!" তাহার নত মুখের দিকে কটাক্ষ করিয়া ছুরির মতো শানিত হাস্যে বলিলাম, "ভাবলাম—বুঝি বা বিবাহ প্রস্তাব!"

তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে সে বলিল, "ধরো তাই যদি হত ?"

কোনোও দিন প্রশান্ত এভাবে কথা বলে নাই। অপ্রতিভ-ভাব মুহূর্তে দমন করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, "তুমি! তোমাকে আমি বিয়ে করব ? আশ্চর্য, কোনোও দিন কি বোঝোনি তোমার ওপর আমার সামান্য করুণা ভিন্ন কিছুই নেই ? কী বোকা তুমি ?"

প্রশান্ত উঠিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল, "ইরা, তোমাকে ভালবাসার বোকামি ভিন্ন জীবনে কখনো ভুল করিনি। বোকা আমি নই, একথা তুমিও জানো। আমি তোমাকে বড়ো বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমাকে নিয়ে খেলাবার কি দরকার ছিল ? প্রেমের অভিনয় কেন করেছ তুমি ?"

তাহার রক্তলেশশূন্য সাদা মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন মায়া হইতে লাগিল। ভাবিলাম, না, আর কেন ? কিন্তু তাহার মুখের তীব্র ভর্ৎসনা আমাকে নিষ্করুণ করিল। উত্তর দিলাম, "শোনো প্রশান্ত, প্রেমের অভিনয় আমি স্বেচ্ছায় করিনি। মণিকা এবং ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাদের সঙ্গে আমার কথা ছিল তোমাকে আমার কাছে হার স্বীকার করাবো। তুমি আমাকে ভালবাসবে, তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করবো। তাই, তোমার পেছনে এত সময় নষ্ট করেছি, নইলে খেলাবারও যোগ্য তুমি নও।"

প্রশান্ত আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইল। কমনীয় মুখে তাহার কী অসহ ঘৃণা! যে চোখে আমার জন্য আদর-জড়ানো, পুষ্প-কোমল দৃষ্টি সঞ্চিত ছিল আজ তাহা অশনি বর্ষণ করিল—

"তুমি এই ? ছিঃ। অথচ আমি তোমাকে এত ভালবেসেছিলাম। আজ কিন্তু ঘৃণা ছাড়া আমার মনে আর কিছুই নেই।" হাতের জ্বলন্ত সিগারেট প্রশান্ত জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। কনিষ্ঠার হীরার আংটি দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইতস্তত অসংলগ্ন পদচারণ করিয়া আমার সম্মুখে আবার সে দাঁড়াইয়াছে। ক্রোধে ঘৃণায় প্রদীপ্ত এই প্রশান্তকে আমি চিনি না। আমার সমবয়স্ক, ফুলের মতো কোমল তরুণ এত ঘৃণা করিবার শক্তি কোথা হইতে পাইল ?

"জীবনে কিছুই তুমি ভালবাসনি নিজেকে ছাড়া। মেয়েরা চিরকাল 'একো' রূপেই দেখা দিয়েছে, আর পুরুষ 'নার্সিসাস্' রূপে। একো ভালবাসে নার্সিসাস্‌কে, নার্সিসাস্ জলের মধ্যে নিজের মুখের ছায়ার প্রেমে মত্ত। একোর

দিকে সে ফিরেও চায়নি। মেয়েরাও যে নার্সিসাস্ হতে পারে তার প্রমাণ তুমি। নিজের রূপকেই ভালবেসেছ, তাই তুমি নার্সিসাস্। নার্সিসাসের অভিশাপ্ই তোমার ওপর রইল নার্সিসাস্।" শেষ কথাটির ওপর সমস্ত বিষ ঢালিয়া বিদ্যুৎগতিতে সে বাহির হইয়া গেল।

সেই তাহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পরেই সে যুদ্ধের বিমান-বহরে যোগ দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

আজ নিরালা রাত্রে তাহাকে মনে পড়িতেছে। আমার চারিপাশে তাহার অন্তরাত্মা যেন খুঁজিয়া মরিতেছে, যদি সভ্যতার জয়পতাকা এই দেহে কিছুমাত্র হৃদয় অবশিষ্ট থাকে। সে দূরে গিয়াছে, কিন্তু আজিকার ক্ষীণ-চন্দ্রালোকিত যামিনী তাহার আভাস-স্বপ্নে এখনো বিভোর। আজও বাতাসের দ্রুত স্পর্শে অকারণে তাহাকে কেন মনে পড়ে!

মনে হয়, তাহার ভুল হইয়াছে, আমি নার্সিসাস্ নই। কেন সে আর একটু অপেক্ষা করিল না? জীবনে একমাত্র তাহাকেই ভালবাসিতে পারিতাম।

সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০—) ॥ স্বয়ংবরা

০ ০ এক ০ ০

জিওগ্রাফির বইএর পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল ভাঁজ-করা এক টুকরো নীল কাগজ, যার শিরোনামায় লীলার নাম। সারা শরীর জ্বলে গেল, কান দুটো গরম হয়ে উঠলো লীলার। অনুপমের চিঠি, সন্দেহ নেই। এই নিয়ে বুঝি তিনবার হল। লোকটার স্পর্ধাও তো কম নয়।

আড়-চোখে লীলা একবার তাকিয়ে দেখল, রুবি দেখেছে কি না। রুবি তখন ভূগোলের অঙ্কে ডুবে গেছে। গ্রীনউইচ শূন্য আর কলকাতা প্রায় নব্বুই। গ্রীনউইচে যখন সকাল সাতটা, কলকাতায় তখন কটা, লীলাদি?

কেন তুমি বার করতে পারছ না। লীলা অঙ্কটা ছাত্রীকে আরেকবার বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু বোঝাতে গিয়েও ভুল হয়ে যায়, একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনে বিঁধে আছে। চিঠিটা বাঁ হাতের মুঠোতেই রইল। ব্যাগ খুলে রাখবে সে উপায়ও নেই। রুবি ড্যাবডেবে বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। চিঠিটা অবশ্য না পড়েও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। লীলা জানে ওতে কি লেখা আছে। দু-চার ছত্র কবিতা, তাও আবার ভুল কোটেশন। একটা-দুটো বানান ভুল। আর, "তুমি-আমার-ঘুম-কেড়ে-নিয়েছ" জাতীয় খানিকটা অজ-বিলাপ। অবশ্য অজ শব্দটার অভিধানগত অর্থে। এসব ন্যাকামি তো লীলা কম দেখল না—প্রথম প্রথম মজা পেত, এখন শুধু গা জ্বলে।

দরজার বাইরে পর্দার নিচে দুখানি পা তখন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। খুক-খুক কাশি—ঠিক শ্লেষ্মাজনিত নয়—শোনা যাচ্ছে। লোকটা কী ভীরু। মেরুদণ্ড বলে কিছু ওর নেই না কি! সাহস থাকে তো আসুক না। এসে বসুক। এটা তো ওর দিদির বাড়ি। ভাগ্নীকে পড়ানোয় লীলা ফাঁকি দিচ্ছে কি না সেটা লক্ষ্য করবার অধিকার তো ওর আছেই।

আর যেমন চরিত্র তেমনি চেহারা। রোগা টিঙ্‌টিঙ্‌ করছে, ধাক্কা দিলে বুঝি পড়ে যাবে। নির্ঘাত ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটির নির্বুদ্ধিতা উঁচু পাওয়ারের লেনস্‌ দিয়েও ঢাকতে পারে না। কথা বলতে এলেই কুঁজো হয়ে যায়, যেন কুর্নিশ করছে; কপালের রগটা মাঝে মাঝে চেপে ধরে, যেন স্বাস্থ্যহীনতাই বাহাদুরি। এই মূঢ়কে কে বোঝাবে দুর্বলতার অভিনয় করে বড়ো জোর অনুকম্পাই কুড়োনো চলে, কিন্তু ভালবাসা কেড়ে নিতে হলে চাই সাহস আর বলিষ্ঠতা, শরীরের এবং চরিত্রের। আধো-আধো বুলি শুনলে মনে একমাত্র মাতৃভাব আসে, তার বেশি কিছু নয়।

পড়ানো শেষ হল। ব্যাগটা গুছিয়ে লীলা উঠে দাঁড়াল। নিচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে শাড়ির ড্রেসটা ঠিক আছে কি না। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল। এদিক-ওদিক একবার তাকালে কৌতূহল বশেই, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে। শেষ ধাপ অবধি পৌঁচেছে, এমন সময় পিছনে খুক-খুক কাশির শব্দ শোনা গেল।

ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল, এবার মিহি-মার্জিত গলা কানে এল, 'শুনছেন'—

ঘুরে দাঁড়াল লীলা। 'কী বলুন।'

বেশি দূর নামতে সাহস করেনি অনুপম, গোটা পাঁচেক ধাপ ওপরে, সিঁড়িটা যেখানে ঠেকেছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী রোগা আর হলদে! এক ফোঁটা মাংস নেই, এক ফোঁটা নেই রক্ত। একটু কাঁপছেও বুঝি নার্ভাস হয়ে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—'আমার ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছেন?'

—'পেয়েছি।' লীলা হেসে ফেলল রকম-সকম দেখে, মাস্টারনী মুখোশটা আর বজায় রইল না।—'কিন্তু জিওগ্রাফির বই তো ডাকবাক্স নয়।'

প্রশ্রয় পাওয়া জীব-বিশেষের মতো অনুপম কোঁচা দোলাতে দোলাতে নেমে এল আরো তিন-চার ধাপ। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মিঠি-মিঠি হেসে বললে, 'সব ডাকই কি ডাকবাক্সের মারফত পৌঁছয়, না পাঠানো চলে?'

লীলার মুখে একটা কঠিন কথা এসেছিল: 'প্রেমের শখ আছে অথচ হাতে চিঠি দেবার সাহস নেই?'—বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কথাটাকে একটু কোমল করে বললে, 'হাতে দিতে পারেন না?'

অনুপম হয়তো ভাবলে এও প্রশ্রয়। লীলা ওকে তবে উৎসাহ দিচ্ছে। যে

দু-ধাপ বাকি ছিল, সে দু-ধাপও নেমে এল। চকচকে গাল দুটো। একটু আগেই কামিয়েছে বুঝি। বেহিসেবী স্নো মেখেছে। নির্মূল শ্মশ্রু চোয়াল এখন আরো যেন তোবড়ানো। লীলাকে ছুঁতে সাহস করলে না অনুপম, ধরা-ধরা গলায় শুধু বললে, 'অভয় দিচ্ছেন ?'

লীলা ধমক দিলে, 'সোজা হয়ে দাঁড়ান, অনুপমবাবু। আপনার আগের চিঠি দুটোও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে কোনো হৈচৈ করিনি এই জন্যে যে, তাহলে এ টিউশনিটা ছাড়তে হত। আজও করতাম না। কিন্তু আপনি ডাকাডাকি করেই সমস্ত অনর্থ ঘটালেন। গোটা কতক শক্ত কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না। আপনার গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে, অনুপমবাবু।' —একটু থেমে, শান্ত ঠাণ্ডা গলায় লীলা ফের বলতে শুরু করল, 'আপনি দিদির বাসায় পরম সুখে আছেন, খেয়ে, গড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাঁশি বাজিয়েও হাতে বাড়তি যে সময়টুকু থাকে সেটুকু প্রেম করে কাটাতে চান। ভুলে যান যে আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গরিবের মেয়ে, কোনো রকমে পাস করেছি, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপরেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি বাড়ি পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়। সংসারে উপরি কটা টাকা আনতে। আমার ওপর কতজনের ভার জানেন ? মা, বাবা, ছোট তিন বোন, নাবালক দু-ভাই। আমাকে ভালবাসেন বলছেন। পারবেন এদের ভার নিতে ?'

অনুপমের গলা ক্ষীণতর হয়ে এল, 'একটা চাকরির কথা চলেছে, সেটা ঠিক হলেই—'

চিঠিখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লীলা বললে, 'আগে ঠিক হোক, তারপর এ-সব দেবেন। আরো একটা কথা আপনাকে বলি, এ-সব চিঠি-ফিটি দেবেন না। কিছু বলার থাকে সোজাসুজি এসে বলার সাহস অর্জন করুন! এইসব আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করা, শুনিয়ে-শুনিয়ে গুনগুন করে গান গাওয়া, ন্যাকামি-ভর্তি কবিতা কোট করে চিঠি পাঠানো, এ-সব ছাড়ুন। এতে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। পড়েননি, বলহীনের কাছে কিছুই লভ্য নয় ?'

অনুপমের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লীলা বুঝি ঈষৎ করুণা বোধ করল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল এই অপ্রিয় সত্য ভাষণের। দুঃখ যদি পায় পাক্। একটা দুঃখের ভিতর দিয়েও শিক্ষা হোক। এমন ভুল যেন আর না করে, পুরুষ না হয়েও স্ত্রীলোকের প্রণয়-প্রার্থনার মতো ভুল।

রাস্তায় এসে লীলা দেখল এরি মধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। যখন পড়াতে এসেছিল তখন সকালের চোর-রোদ পা টিপে-টিপে পাশের উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে এ বাড়ির ছাদে সবে লাফিয়ে পড়েছে। তারপর এতক্ষণ ধরে কেবল গড়িয়ে নেমেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার পর্দায়, কম্পাউণ্ডের করবী আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের শীষে শীষে। কব্জির ক্ষুদ্রাকৃতি ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে আটটা। ইস্কুলের সময় প্রায় হয়ে এল। বাসায় ফিরে সবে পোশাকী জামা-কাপড় বদলাবার উপক্রম করছিল, মা বললেন, 'বাইরের ঘরে তোর জন্যে কে বসে আছে।'

আমার জন্যে? লীলা বিস্মিত হল। কে আবার এসেছে এত সকালে। অনুতপ্ত অনুপমই আবার আসেনি তো! কিন্তু এত শিগ্‌গির পৌঁছবেই বা কী করে? তেল মাখবে বলে খোঁপাটা খুলে ফেলেছিল, আবার আলাদা করে চুলগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে হল। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই চিরুনি বুলিয়ে নিলে কপালে আর কানের কাছে।

বাইরের ঘরে এসে যাকে দেখল, তাতে মনে হল এত সবের প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই একজন ক্যানভাসার। এর আগেও দু-একবার এসেছে লীলার কাছে। নিব, কলম, পেনসিল, চক, ব্লটিং আর কাগজের ব্যবসা করে লোকটা। তাছাড়া ওর বুঝি নিজেরই কী একটা কালি আছে। লীলাদের ইস্কুলের কনট্রাক্টটা নেবে বলে ওকে এসে ধরেছে। লীলারই এক সহপাঠিনীর কি রকম আত্মীয় হয় বুঝি। প্রথম দিন তার কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছিল।

ডান হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর, বাঁ হাতটা নিচে ঝোলানো, লোকটাকে কুণ্ঠিত জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে লীলার মায়া হল।

'নমস্কার।' লীলাকে ঢুকতে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

'নমস্কার।' গম্ভীর কণ্ঠে লীলা বললে মাস্টারনী মানান গলায়, যেন চিনতে পারেনি এমন ভাব করলে।

'আমি মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেণ্ট করছি। স্মরজিৎ মিত্র।' ব্যাগ খুলে কার্ড বার করে দিলে লীলাকে। 'এর আগেও তো আমি এসেছি!'

কথা বলছে না তো খই ভাজছে, এই ক্যানভাসার জাতীয় লোকগুলো এমন চালিয়াত হয়। করিস তো বাবা পেনসিল-কাঁচি-ছুরি ফিরি, অথচ পোশাকের ঘটা দেখে মনে হবে একটা প্রিন্স কিংবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগ্‌নেট হবে বুঝি।

টুপি-ট্রাউজার-শার্ট-কোট-কলারের ষোড়শোপচার আয়োজন আছে ঠিক। লীলার অনুমতি নিয়ে লোকটা সিগারেট ধরালে একটা ; আগুনটা ধরালে, এক আশ্চর্য কৌশলে, শুধু মাত্র ডান হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'নাউ টু বিজনেস। আমি ফেয়ার ফিল্ড চাই, ফেভার নয়। আমাদের স্টেশনারি জিনিসগুলোর স্যাম্পল আপনার কাছে দিয়ে যাই, বাজারের আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জানেন মিস্ সোম, আমি ডিজ-অনেস্টিতে বিশ্বাস করি না। এই যে ফার্মটা গড়ে তুলেছি,—মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স—এটা আমারই এণ্টারপ্রাইজে তৈরি। ক্যাপিটাল সামান্য যা-কিছু তাও আমার।'

একবার কইতে শুরু করলে থামতে চায় না। গলার স্বরও কী আশ্চর্য ভারী লোকটার, অল্প-অল্প ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। কথা বলতে বলতে টেবিলে একটা চাপড় মেরেছিল, আস্তেই অবশ্য, তবু টেবিলটা যেন এখনও থরথর করে কাঁপছে। কী মোটা-মোটা আঙুল,—বাহুমূল, কব্জি আর কনুইয়ের বেড়-এ বোধ হয় কোনো তফাত নেই।

বেলা হয়ে যাচ্ছিল। লীলা বললে, 'আমার বাসায় এসে তো সুবিধে হবে না। এ-সব ব্যাপার হেড-মিস্ট্রেসের হাতে। ইস্কুলে আসবেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

'আশা দিচ্ছেন ?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' লীলা সংক্ষেপে বললে।

স্মরজিত মিত্র উঠে দাঁড়াল—কড়কড়ে ইস্ত্রি, পুরো হাতা শার্ট, বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। চকচকে নতুন পয়সার মতো তামাটে মুখ। স্বাস্থ্য এতটা উজ্জ্বল না হলে কালোই বলা যেত।

'একদিন তবে আপনার স্কুলে যাচ্ছি।' শেষবারের মতো মাথাটা নুইয়ে নমস্কার করে স্মরজিৎ চলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে নামল রাস্তায়। তারপর ফিরে একবার বাড়িটাকে দেখে নিয়ে আবার সোজা এগিয়ে গেল। লোকটা পা ফেলছে জোরে জোরে, দূরে দূরে। ওর চলায়-ফেরায়-কথায়, এমন কি উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, সিগারেট ধরানোয়, কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা আছে, চোখে সেটা বেঁধে, কিন্তু বোঝা যায় না কেন ?

পরদিন সকালে যখন ছাত্রী পড়াতে গেল, তখন লীলা ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করছিল। কালকের সকালের বিশ্রী ঘটনাটা ভুলতে পারেনি। অনুপম আজ আর চিঠি দিতে সাহস করবে না ঠিক, কিন্তু কে জানে হয়তো ওর দিদিকে কিছু বলে থাকবে। ও-সব প্যানপেনে ছেলেদের অসাধ্য কিছু নেই। নিজের কীর্তি-কাহিনী চেপে গিয়ে হয়তো দিদিকে বলেছে, মাস্টারনী ওকে অবোধ মেষশিশু পেয়ে ঘাড় মটকানোর মতলবে ছিল ইত্যাদি। ছাত্রীর মাও কি ভাইএর কথা অবিশ্বাস করতে পারবেন, লীলাকে হয়তো ছাড়িয়ে দেবেন। নতুন টিচার আসবে রুবির জন্যে। আবার দিনকতক তাকেও চিঠি লেখালিখি করবে অনুপম (পুরনো চিঠিগুলোর নকল রেখে দিয়ে থাকে যদি, তাহলে তো কোনো মেহনতই নেই)। তারপর? হয়তো বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নতুন টিচারটা পটেও যেতে পারে বা। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বুকটা একবার কেঁপে গেল লীলার, আজ আবার কি হয় কে জানে। কিন্তু অনুপম ওকে দেখে গম্ভীর মুখে একপাশে সরে দাঁড়াল, কোনো কথা বললো না। লীলা খানিকটা স্বস্তি পেল।

এর পরে রুবিও যখন রোজকার মতো খাতা-পেন্‌সিল নিয়ে ঘরে ঢুকল, এমন কি রুবির মাও একবার ঘরে এসে স্মিত মুখে কুশল প্রশ্ন করে গেলেন, তখন আর সংশয়মাত্র রইল না যে অনুপম কিছু বলেনি।

এর পরে আরো দু-তিন দিন অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আরো যেন হলদে হয়ে যাচ্ছে অনুপম, এ ক-দিনে চোয়াল যেন আরও চুপসে গেছে। ভেবেছিল, অনুপম ওকে কিছু বলবে; কিন্তু লক্ষ্য করল, ওকে দেখলেই অনুপম গম্ভীর মুখে সরে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায়, এড়াতে চায়।

ক-দিন পরে অনুপমকে আর দেখতেই পেল না। একদিন দু-দিন তিন দিন কেটে গেল। শেষে লীলাই একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার মামাকে যে দেখছিনে?'

রুবি বললে, 'ওমা, জানেন না বুঝি। মামা এখান থেকে চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'কানপুরে। আমার এক মাসিমার কাছে। সেখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, শুনেছি।'

লীলা বললে, 'ও!'

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কও হয়ে গেল। নিছক চাকরির জন্যেই লোকটা কানপুরে গেছে একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না।

আঘাতটা ভুলতেই গেছে। কেবলমাত্র তার জন্তেই একটা লোক দেশান্তরী হয়েছে, কথাটা ভেবে লীলার মন খারাপ হয়ে গেল।

০০ দুই ০০

বিজনেস করছে অথচ লোকটার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই। এসেছে যখন শেষ ঘণ্টাটিও বেজে গেছে। চক-মাখা হাত ধুয়ে লীলা ছাতা আর বই হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ি যাবে বলে, এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এল ভিজিটিং কার্ড। এ কার্ড লীলার ব্যাগের মধ্যে আরও খান-দুই আছে। 'মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স, রিপ্রেজেণ্টেড বাই এস, মিত্র।' পরিষ্কার স্বাক্ষর করেছে: এম-আই-টি-আর-এ। ইঙ্গবঙ্গীয় মিটার হয়নি এই ঢের।

নিচে নেমে এসে লীলা ধমকের স্বরে বললে, 'আচ্ছা, এই বুদ্ধি দিয়ে আপনি ব্যবসা কববেন? আপনাকে কি এখন আসতে বলেছি? চারটে বেজে গেছে, হেডমিস্ট্রেস চলে গেছেন কখন—'

'তাতে কি হয়েছে?' ঈষৎ স্মিত, কতকটা অপ্রতিভ, মুখে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়াল। 'আরেক দিন না হয় আসব।'

পাশাপাশি গেট অবধি এল ওরা। লীলা বললে, 'বিবেচনার অভাবে আজ আপনার শুধু পরিশ্রমই সার হল।'

'শুধু পরিশ্রমই নয়।' স্মরজিৎ একটু হেসে বললে, 'পারিশ্রমিকও কিছু তো পেলাম, পাইনি?'

লীলা সামান্য চমকে উঠল। সহজ, স্বাভাবিক গলায় একেবারে সোজাসুজি কথা বলছে লোকটা। বাঁকা গলি-ঘুঁজি চেনে না। ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাত রেখে পাশাপাশি একেবারে সটান হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও কুণ্ঠা নেই। সেদিনও মনে হয়েছিল, আজও মনে হল লোকটার সপ্রতিভতা আছে, কিন্তু সেটা যেন অতিপ্রকট।

'আপনি কোন্‌দিকে যাবেন?' জিজ্ঞাসা করল স্মরজিৎ।

'বাসায়। আপনি?'

'ঠিক নেই।'

লীলা বললে, 'আচ্ছা তাহলে চলি।'

'চলবেন?' লোকটা এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করল, তারপর বললে, 'চলুন তবে। আমিও এদিকেই যাব।'

কিছু বলাও যায় না। রাস্তা তার একার নয়। তবু পাশাপাশি হেঁটে যেতে লীলা সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। ট্রামে-বাসেও এ সময় বড়ো ভিড়। একটা রিক্শা দেখে লীলা এক মুহূর্ত দাঁড়াল। কিন্তু স্মরজিৎও দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।
'রিক্শা করবেন? উঠুন না। অনেকখানি তো পথ।'
'না, না।' কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল লীলা, প্রায় চিৎকারের মতো শোনাল, এক রিক্শায় ওঠার চেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া ভালো।
খানিকটা গিয়ে স্মরজিৎ প্রস্তাব করল, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্, কি বলেন? সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।'
একবার রিক্শায় ওঠার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে, চা খেতে অস্বীকার করবার শক্তি লীলার ছিল না। এই লোকটার না-বুঝ আবদারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা দুর্নিবার দাবি আছে, প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় নেই। নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, পাশাপাশি চলেছে, একে ফেরাতে হলেও কিছু দিয়ে তবে ফেরাতে হয়।

চা খেতে-খেতে স্মরজিৎ ওর জীবনের কাহিনী শোনালে। চমকপ্রদ কিছু নয়। প্রায় সবটাই মামুলী। লেখা-পড়া বেশিদূর হয়নি। মা-বাবাকে ছোটবেলাই হারিয়েছে। মামা-বাড়ি থেকে কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। আর বেশিদূর পড়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু কলকাতায় পালিয়ে এসেছিল, এক বস্ত্রে, ছ-আনা সম্বল করে। পড়া-শুনার কিছু সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়েছিল। আর সে কত রকমের চাকরি। মুদি দোকানে,—শুধু খোরাকি আর দু-টাকা পেত। সেই থেকে এক দপ্তরীখানায়, দপ্তরীখানা থেকে বইএর দোকানে, বইএর দোকান থেকে—
লীলার মুখের দিকে চেয়ে স্মরজিৎ বললে, 'থাক, এত কথা শোনবার আপনার ধৈর্য থাকবে না।' পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে ধরাল, এবং লীলা লক্ষ্য করল, সেই আশ্চর্য উপায়ে, ডান হাতে।
স্মরজিৎ ফের বলতে শুরু করলে, 'এটুকু শুধু জেনে রাখুন, দিন কতক এক রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংএর গুমটি-ঘরেও কাজ করেছি—সেখানেই বাঁ হাতটা কাটা যায়।'
'কাটা যায়?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল লীলা।
'কাটা যায়।' স্মরজিৎ কথাটার পুনরুক্তি করল। 'দেখছেন না, আমার

বাঁ হাত নেই!' প্যাণ্টের পকেট থেকে হাতটা বার করে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে টেবিলের ওপর রাখল স্মরজিৎ। কনুই থেকে কব্জি অবধি একখানা কাঠ শুধু, তারপর ইস্পাতের পাঁচটা আঙুল তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে এসে যেন দৃষ্টি বিদ্ধ করছে।

লীলা শিউরে উঠল একবার, এবং সেটা স্মরজিতের কাছে গোপন রইল না।

'ভয় পেলেন?' আস্তিনটা আবার টেনে দিয়ে হাতটা পকেটে পুরে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করলে।

লীলা অপ্রতিভ ভাবে বললে, 'না। তারপর বলুন।'

এতক্ষণে বুঝি বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। এর একটা অঙ্গ নেই, সেইটে ঢাকতেই একটা স্মার্টনেসের অভিনয় করতে হয়, চটপটে ভাব দেখাতে হয়। এমন যে স্বাস্থ্য, শার্টের নিচে স্ফুরিত পেশীর ইঙ্গিত, সব কেমন মেকী মনে হল লীলার। ওর চোখ দুটির তীব্র ঔজ্জ্বল্যের নিচেও একটা দৈন্য লুকানো, যা মুগ্ধ করে, করুণাও আনে।

রাস্তায় নেমে স্মরজিৎ বললে, 'এখনো আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি। ভালো করে দাঁড়াতেই পারছি না। বাজার খারাপ। আমার স্টক কম, খুচরো কারবার, আমার কোটেশনও একটু চড়াই হয়, বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের মতো তো কম মার্জিনে ছাড়তে পারি না। আর আমাদের দেশে দেশ-প্রীতি সব মুখে-মুখে, বিলিতি জিনিস পেলে কেউ দেশী জিনিস ছোঁয় না। তবে হাল ছাড়িনি। দমদমের ওদিকে একটা ছোট বাসা নিয়ে আছি। কালিটা আমার নিজের, তা ছাড়া ছোটখাট দু-একটা টয়লেটের উপচারের ফরমূলা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। এ থেকে বড়ো একটা পারফিউমারি আমি গড়ে তুলবই। আপনারা রইলেন, দেখবেন একটু-আধটু।'

লীলা প্রতিশ্রুতি দিলে, দেখবে।

ওরা বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। স্মরজিৎ বললে, 'চলি তাহলে, নমস্কার। শিগগিরই একদিন আপনার ইস্কুলে যাব।'

'নমস্কার', বললে লীলা। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পিছন ফিরে। সেই উদ্ধত চলার ভঙ্গি। পকেটে একটা হাত ঢোকানো। কিন্তু সেরকম বিসদৃশ বোধ হল না। একটা হাত নিয়েই অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝছে লোকটা ভাবতেও ভালো লাগল। আঘাত আছে, কিন্তু পরাজয় নেই। ভিক্ষা নেই, তবু প্রাপ্য আদায়ের প্রতিশ্রুতি আছে। আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে শুধু দৃঢ়তাই নেই, একটু

কাঁপা কাঁপা অসহায়তাও আছে যেন। হয় লোকটাকে ভালো লাগবে না, ওর আলাপচারিতাকে যেচে এসে ভাব করার মতো মনে হবে। নয় তো ওর সবটুকু ভালো লাগবে, চলা-ফেরা-আলাপ, এমন কি প্যাণ্টের পকেটে লুকানো হাত নিয়ে অখণ্ড যে মানুষ, তাকে।

হেড মিসট্রেসকে আগেই বলে রেখেছিল, স্মরজিৎ নিজেও এর পরে এসে আলাপ করে গেল। কিছু কিছু জিনিস হেড মিস্‌ট্রেস সেদিনই নিলেন, প্রায় কুড়ি টাকার মতো। এ ছাড়া মাসে প্রায় টাকা পঞ্চাশের মতো জিনিস নিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনেই টার্মিনাল পরীক্ষা। সে জন্যে খাতার কাগজও চাই।

সেদিন খুব খুশি-খুশি দেখাল স্মরজিৎকে। রাস্তায় এসে লীলাকে বললে, 'আমার সত্যি খুব উপকার করেছেন !'

কুণ্ঠিত হয়ে লীলা বললে, 'এ আর কি। এতে আপনার কতই বা থাকবে।'

স্মরজিৎ বললে, 'দশ পার্সেণ্টের ওপর ; তাছাড়া কালিটা আমার, ওটাতে তো ফিফটি পার্সেণ্ট। অবশ্য টাকার অঙ্কই শুধু নয়—'

আবার উচ্ছ্বাসের মুখে কী বলে বসে ঠিক নেই, লীলা তাড়াতাড়ি বললে, 'আর বেশিদূর যাব না, টিফিনের পর আমার আবার ক্লাস আছে।'

'এই পার্কটায় তবে একটু বসি চলুন।'

দুপুরের দিকে পার্কটা এমনিই নির্জন। এক কোণে কতকগুলো লোক তাস খেলছে। চীনেবাদামওয়ালা ঝিমোচ্ছে এক কোণে, চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান হয়ে দু-চারজন ছায়ার নিচে বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে। যত্ন করে লাগানো সীজন ফ্লাওয়ারগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, সকালে রোদ্দুর ওদের ফুটিয়েছিল রোদ্দুরই এখন সব রস টেনে নিচ্ছে।

ঘাসের ওপর বসলে দুজনে। খানিকক্ষণ কোনো কথা হল না। স্মরজিৎ একটু পরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বাক্স বার করে বললে, 'হাত পাতুন।'

কঠিন হয়ে উঠেছিল লীলার মুখ। বললে, 'এ আবার কী ?'

'খুলেই দেখুন না।'

স্পর্ধার সীমা নেই। কী উপহার এনেছে দেখো। ছোট্ট শিশিতে এসেন্স, একটা কৌটোয় স্নো কিংবা ক্রীম হবে বুঝি। যেমন রুচি তেমনি সাহস।

'কিনে এনেছেন তো ?'

স্মরজিৎ বললে, 'কিনে আনিনি। আমার নিজের হাতের তৈরি ; সেদিন

আপনাকে বলেছিলাম না ফরমুলার কথা ? তাই থেকে এই হয়েছে। প্রথম তৈরি জিনিস, আপনাকেই দিলাম দুটো। কিছু অন্যায় হয়েছে ?'

'অন্যায় ?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লীলার মুখ।—'আপনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন, সত্যি ?' কৌটো খুলে নাকের কাছে এনে প্রাণ ভরে টেনে নিলে গন্ধ।—'তবে এবার আপনার ফার্ম পুরোদস্তুর পারফিউমারি হয়ে গেল।'

'হলই তো।' উৎসাহ পেয়ে স্মরজিতের মুখ খুলে গেল; 'অবিশ্যি বাজারে চালাতে এখনো কিছু বেগ পেতে হবে, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচাও কম নয়। আপনি অবিশ্যি আপনার চেনা-শোনা মেয়ে-মহলে বলে দিতে পারেন—'

'পারবই তো।' বললে লীলা।

'আমার আরো ইচ্ছে আছে,' স্মরজিৎ বলে গেল, 'একটা সুগন্ধি তেলের ফরমূলাও পেয়েছি। এ ছাড়া পাউডার, আলতা, এমন কি সাবান পর্যন্ত··· আমার স্বপ্নের কূল-কিনারা নেই লীলা দেবী।'

তারপর লীলার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'যাবেন একদিন আমার বাসায়, নিজে চোখে দেখে আসতে পারতেন সব; আমার ল্যাবরেটরি। সামান্যই আয়োজন কিন্তু একটা বৃহৎ পরিণতির সূচনা দেখতে পেতেন।'

'আপনার বাসায়' বিস্মিত, ভীরু-ভীরু গলায় লীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আর কে আছেন ?' প্রশ্নটা নিজের কানেই অর্থহীন, অতি সাবধানী, বোকা-বোকা শোনাল।

'আমার এক পিসিমা আছেন।' বললে স্মরজিৎ। তারপর লীলার মুখের দিকে চেয়ে ওর প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললে,—'ভয় নেই, স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করব, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন এখনও হইনি।'

লজ্জিত হয়ে লীলা বললে, 'সেজন্যে নয়, সে কথা ভেবে বলিনি। আমার আবার রবিবার ছাড়া ছুটি নেই কিনা,—অন্যদিন টিউশনি, দুপুরে স্কুল—'

'বেশ তবে রবিবারেই যাবেন।' বললে স্মরজিৎ।

লীলা সম্মতি দিল, কিন্তু রবিবার মানে যে একেবারে পরের রবিবার, তখন বুঝতে পারেনি।

খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল, ঠিক এমন সময় স্মরজিৎ এসে হাজির।

'চলুন।'
'বাঃ রে কোথায় ?'
'মনে নেই ? আজ আমার ওখানে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।'
'দিয়েছিলাম বুঝি ? কী আশ্চর্য দেখুন,' লীলা বললে, 'একেবারে মনে নেই। যেতেই হবে ?'
জিজ্ঞাসা করে স্মরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এ প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক, যেতে হবেই, এসেছে যখন।
'একটু বসুন, তৈরি হয়ে নিই।'
তৈরি হতে সেদিন সময় লীলার কিছু বেশিই লাগল। ঘণ্টাখানেক আগেই স্নান করেছে তবু আর একবার সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হল। পোশাকে বাহুল্য কোনোদিনই ছিল না, না ছিল শখ, না ছিল সামর্থ্য। আজ মনে হল, বাইরে বেরুবার উপযোগী জামা-কাপড় আর দু-একটা বেশি থাকলে কিছু ক্ষতি হত না।
শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হল। পেরিয়ে গেল বেলগেছিয়ার পুল, তারপর যশোর রোড। মসৃণ পথ। শহরতলীর এদিকটাতে লীলা কখনো আসেনি। কয়েকটা বড়ো বড়ো কারখানা পেরিয়ে এরোড্রোম, তারপর থেকেই গ্রামের ছোপ লাগল। রাস্তার দু-পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু, শিরীষ, বট, অশথ। ক্বচিৎ কৃষ্ণচূড়া। ঝাউ আর দেবদারু। ঝাঁকড়া-চুল গ্রামীণের মতো পলাশ। লাল আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে পথ, গির্জার খিলানের মতো। দু-ধারের মাঠের মাঝে মাঝে অসম্পূর্ণ ইঁটের পাঁজা।
'এসে গেছি। আসুন নামি।'
স্মরজিতের কথায় চমক ভাঙল।
'এখানেই ?'
'আবার কত দূরে, বারাসাত যেতে চান নাকি ?'
যশোর রোড থেকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে মাঠের রাস্তা।
'আপনার হয়তো চলতে অসুবিধে হবে,' স্মরজিৎ বলল।
'কিছুমাত্র না। আমার বেশ ভালোই লাগছে।'
কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ হাওয়া। প্রান্তরের একটা নিজস্ব স্বর আছে, লীলা ভাবলে। এটা বুঝি নিয়ত প্রবহমান হাওয়া, যা কখনো ফুরোয় না। দূরের গাছগুলোর একটি পাতাও নড়ছে না, তবু কানের কাছে এই গুন্-গুন্

আসে কোথা থেকে।

খানিকটা এগোতেই আবার লোকালয় পড়ল। শহরের সঙ্গে এর তফাত সহজেই চোখে পড়ে। শহরের বাড়িগুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠছে, কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর এখানে এক-একটি জায়গায় কতকগুলো কুঁড়ে ঘর একসঙ্গে জড়োসড়ো হয়ে আছে, একে অপরের ওপর ভর করে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার। নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই চমক লাগে। আম, জাম, আমলকী, কামরাঙা আর জামরুল। পাতায় পাতায় পাখির কলস্বর।

'আমার বাসা। একটু দেখে আসবেন, বাঁশের মাচাটা বড়ো দোলে।'

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল, এবার লীলা ফিরে এল বাস্তবে। খান-তিনেক ছোট-বড়ো ঘর। একটার দাওয়া পাকা, বাকি দুটোই কাঁচা। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা স্যাঁতসেঁতে লাগছিল, স্মরজিৎ খুলে দিল। তারপর ডাকল, 'পিসিমা, পিসিমা।'

পিসিমা আসতেই লীলা খানিকটা ইতস্তত করে প্রণামই করল।

স্মরজিৎ বললে, 'আপনারা গল্প করুন বসে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

পিসিমা বললেন, 'তোমার কথা আমি ওর কাছে অনেকবার শুনেছি। তুমি ওর জন্য অনেক করেছ।'

লীলা কুণ্ঠিত হয়ে প্রতিবাদ করলে। স্মরজিৎ ফিরে এসে বললে, 'আসুন আমার ল্যাবরেটরি দেখবেন।'

গোটা কতক কাঁচের নল, খালি শিশি আর ছোট বড়ো বোতল মিলিয়ে ডজন কয়েক, এরই নাম স্মরজিৎ দিয়েছে ল্যাবরেটরি? মুহূর্তে লীলার সব উৎসাহ নিভে গেল। একে ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দুরাশা ছাড়া কী। চেয়ে দেখল, আশা-দীপ্ত চোখে স্মরজিৎ তার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জিত হয়ে পড়ল লীলা। বললে, 'বাঃ বেশ তো।'

আর অমনি খুশি হয়ে উঠল স্মরজিৎ। 'আপনি এনকারেজ করছেন।' অনর্গল কথা বলে গেল। দু-একটা প্রেপারেশনের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলে সংক্ষেপে। 'আপনার মনে হয় না এর পসিবিলিটি প্রচুর? আরো যখন বড়ো হবে, তখন একটা কারখানা করব। সামনের এই জমি এবং জলাটা কিনে নেব।'

ভিজে মাটির গন্ধ লাগছে নাকে। শীতের বেলা গড়িয়ে এল। ঘরখানা অন্ধকার প্রায়। একটা হাত ঘুরিয়ে স্মরজিৎ বিশদ ব্যাখ্যা করছে, কাটা হাতটা অসতর্কভাবে ঝুলছে এখন। আর স্মরজিতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা চোখ

দুটো চুরুটের আগুনের মতো জ্বলছে।
হঠাৎ কেমন শিউরে উঠল লীলা। শরীরটা ছমছম করে উঠল, বললে, 'চলুন যাই।'
'এখুনি যাবেন?' স্মরজিৎ একটু যেন দমে গেল। 'চলুন তবে।'
পিসিমা ইতিমধ্যে চা তৈরি করেছিলেন। খেয়ে আর লীলা বসল না।—
'এসো মাঝে মাঝে।' পিসিমা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন. তাঁর কণ্ঠে অনুনয়ের সঙ্গে কাতরতা শোনা গেল, অন্তত তাই মনে হল লীলার।
'আসব,' লীলা বললে। যদিও সে ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল, আর কোনো দিন আসবে না। পিসিমার কণ্ঠের ব্যাকুল কাতরতা থেকে সহজেই অনুমান হয় স্মরজিতের আত্মীয়-বন্ধু বেশি নেই। নির্বান্ধব পুরীতে পিসিমা আছেন একলাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। লীলাই হয়তো এ-বাড়িতে প্রথম অতিথি।

০০ তিন ০০

সেদিন বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাতে বদলাতে লীলা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, তার এই আকস্মিক আশাভঙ্গের হেতুটা কী। কী দেখবে বলে আশা করে গিয়েছিল, কী দেখতে পায়নি। সন্দেহ নেই, দূর থেকে স্মরজিতের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ওর মনে সামান্য একটু রঙীন অনুভূতি এনে দিয়েছিল, এই লোকটি অদৃষ্টের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কষছে—চিত্রটি সম্ভ্রম এনেছিল মনে, সেই সম্ভ্রম থেকে এসেছে কৌতূহল, যাকে খেয়ালও বলা যায়। কিন্তু কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, ফিকে রঙীন, কাছে গিয়ে দেখল রক্তের মতো গাঢ় লাল। সভয়ে পিছিয়ে এসেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। খসে-খসে পড়া মাটির দেওয়াল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস-মুরগী-পায়রার যদৃচ্ছ বিচরণ। দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার হওয়া চলে না।
চা ঢালতে ঢালতে পিসিমা গল্প করেছিলেন, ওঁকেও বেরুতে হয় স্মরজিতের তৈরি জিনিস নিয়ে। 'বুড়ো মানুষ, পেরে উঠিনে। একটুকুতে হাঁপিয়ে পড়ি। আমার কাছ থেকে কেউ জিনিস কিনতে চায় না—' আক্ষেপ করে বলেছিলেন।
শুনতে শুনতে ঠোঁটের কাছে চায়ের বাটি বিষিয়ে উঠেছিল। পিসিমা বুড়ো

মানুষ, ক্যানভেসার হিসেবে অযোগ্য, তাই কি স্মরজিৎ ওকে এখানে এনেছে? ওকেও তার বণিক-বৃত্তির জোয়ালে জুতে দিতে চায় বুঝি, সন্দেহ এসেছিল মনে।

চলে আসবার সময় স্মরজিৎ বলেছে, 'এখুনি যাবেন? বাড়ির পেছনে একটা পোলট্রি করেছি, দেখে যাবেন না?'

'না।'

'আর ছোট একটা বাগানও করেছি, এ থেকে পরে হয়তো নার্সারি চলতে পারে একটা। তবে একলা মানুষ,' স্মরজিৎ হেসে বলেছিল, 'তাতে আবার একটা মোটে হাত, সব পেরে উঠিনে।'

'তাই বুঝি আমাকে এনেছেন,' রূঢ় এই প্রশ্নটা এসেছিল জিহ্বাগ্রে, কিন্তু লীলা নিজেকে সংবরণ করেছে।

মনে মনে স্থির করলে লীলা, আর কখনো দমদমে যাবে না। কী কাজ স্মরজিতের সঙ্গে এত মাখামাখির, কত দিনেরই বা চেনা! কালি, নিব, পেনসিল বিক্রি করতে এসেছিল, লীলার সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য তো লীলা যথাসাধ্য করেছে। এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মারাত্মক হবে। প্রথমত লীলা কাউকে বিয়েই করবে না—মা-বাবা-ভাই-বোনেরা এই গোটা সংসারটার বোঝা তার ঘাড়ে। বিয়ে যদি কখনো করতেই হয়, তবে এমন কাউকে করবে যে সঙ্গতিপন্ন, অন্তত এই সংসারটার দায়িত্বও নিতে পারবে। স্মরজিৎ নিজেই টলমল করছে—

চিন্তার রাশ টেনে দিলে লীলা। এ-সব কথা ভাবছে কেন। স্মরজিৎ তো কখনো আভাসও দেয়নি। লীলার কাছে সহানুভূতি পেয়েছিল, হয়তো জীবনের প্রথম সহানুভূতি, তাই উৎসাহ নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় গেছে, হয়তো আর কোনো কথা স্মরজিৎ নিজেই ভাবেনি। আর এমন পাগলের দুরাশা কি স্মরজিতের হবে।

ঠিক দু-দিন পরে স্কুলে ঢোকবার সময় গেটের সমুখে স্মরজিৎকে পায়চারি করতে দেখে লীলা জ্বলে উঠল। বাঁ হাতটা পকেটে, ডান হাতে ব্যাগ, ঠোঁটে সিগারেট, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরছে দেখো। মেয়ে স্কুলের সামনে, কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। নিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি আছে।

'আজ আবার এসেছেন কেন?' সামনে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠেই লীলা জিজ্ঞাসা করল,—'আপনাকে তো হেড মিসট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আর

কী চাই ?

বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে সাদা হয়ে গেল স্মরজিতের মুখ। 'আর ?' অস্ফুট, নীরস কণ্ঠে বললে, 'আর কিছুই চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিনকার পেমেণ্টটা এখনও কিছু বাকি আছে—'

আরো কি কি কঠিন কথা বলবে বলে লীলা স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু পেমেণ্টের কথা শুনে যেন একটু চমকে গেল। পেমেণ্ট ? শুধু টাকা চাইতেই লোকটা এসেছে নাকি। 'আসুন' বলে স্মরজিৎকে নিয়ে গেল অ্যাকাউণ্টেণ্টের কাছে। লিখিয়ে দিল চেক।

চেকটা নিয়ে স্মরজিৎ আর দাঁড়াল না। শুষ্ক একটা নমস্কার মাত্র করে রাস্তায় গিয়ে নামল। একটু এগিয়ে স্টপেজের ধারে ট্রামের অপেক্ষা করতে লাগল। ট্রাম এল প্রায় বোঝাই হয়ে। স্টপেজে দাঁড়াল কি দাঁড়াল না, ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল স্মরজিৎ, লীলার মনে হল পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে কোনোরকমে সামলে নিল। আহা, একখানা মোটে হাত!

একটু আগেই অভদ্র ব্যবহার করেছে, সে জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হল লীলা। হয়তো সত্যিই ওর টাকার দরকার, পেমেণ্টের জন্যেই এসেছিল, শুধু পেমেণ্টের জন্যেই।

পরের রবিবার যখন দমদমের বাসে নিজে থেকেই চড়ে বসল, তখন লীলাও কম বিস্মিত হয়নি। নিজেকে বোঝালে, গত সপ্তাহে যে অপমান করেছি তার জন্যে মার্জনা চাইতে যাচ্ছি। এ শুধু ভদ্রতাবোধের তাগিদ। কর্তব্য।

দু-একবার ভুল করে রাস্তা সে চিনে বার করলও ঠিক। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে স্মরজিৎ একটা বই পড়ছিল, লীলাকে দেখে ওর মুখে যে দীপ্তি দেখা গেল সেটুকু গোপন করতে চেষ্টাও করল না।

বইখানা মুড়ে রাখল চেয়ারের হাতলে। চেঁচিয়ে ডাকল, 'পিসিমা, ও পিসিমা, দেখে যাও কে এসেছে।'

স্মিতমুখে পিসিমাও এসে দাঁড়ালেন দরজায়। 'এসো মা এসো।'

লীলা লক্ষ্য করল, সে এলেই এরা দুজনেই কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মৃতকল্প আবহাওয়ায় যেন স্পন্দন লাগে। বাইরে থেকে কেউ যে এতদূরে কষ্ট করে এসেছে, ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এই জন্যেই বুঝি পিসিমা কৃতজ্ঞ বোধ করেন। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত দুটি প্রাণী যেন দিগন্তে সাদা পালের চিহ্নটুকু দেখা গেলেও উদ্বেল হয়ে ওঠে।

নিজের কাছে নিজেই কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল লীলার। এরা তো কই জিজ্ঞাসা করল না, কেন এসেছে। কোনো কৈফিয়ত চাওয়া নেই, অভিযোগ নেই, এসেছে যে এতেই খুশি।

পিসিমা বুঝি কালির বড়িতে স্ট্যাম্প দিচ্ছিলেন, অল্প অল্প কালি লেগেছে তাঁর কাপড়ে, ঘাম মুছতে গিয়ে কপালেও। সেখানে গিয়ে লীলা বসে পড়ল।—'আমিও স্ট্যাম্প লাগাব পিসিমা।'

'পিসিমা' সম্বোধনে নতুন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটা ধরা পড়ল লীলার কানেও। চোখে মুখে অকারণেই রক্ত ছড়িয়ে গেল।

'এ তো সহজ কাজ।'

'তোমাদের কাছে সহজ বাছা, কিন্তু আমরা এই পেরে উঠিনে।'

ঘুরে ঘুরে সেদিন স্মরজিতের বাগান দেখলে লীলা। পোলট্রিও। আপাতত হাঁস-মুরগী সব ডজন খানেক করে আছে, স্মরজিৎ বললে। শেয়ালে নিয়ে যায়, ঠিকমতো দেখা-শোনা হয় না তো। তবু যখন ডিম দেবে—রোজ যদি ছ-ডজন করে পাওয়া যায়, তবে বাজারে ডিম এখন দু-আনা করে—

'থাক, অত হিসেব করতে হবে না।' লীলা হেসে বললে। 'কেবল লাভের কথা ভাবলে চলবে না, লোকসানের জন্যেও তৈরি থাকতে হয়।'

'সে তো আছিই।' অন্যদিকে চেয়ে স্মরজিৎ আস্তে আস্তে বললে।

কিছুক্ষণ থেকে লীলা মৃদু ও মধুর একটা সৌরভ পাচ্ছিল—'কিসের গন্ধ বলুন তো?'

পেছন দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎ বললে, 'লেবু ফুলের।'

'এমন চমৎকার?'

স্মরজিৎ একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুলে অল্প একটু চটকে লীলার নাকের সমুখে ধরল, 'দেখুন দিকি। এতদিন লেবু খেয়েছেন, লেবু গাছ চেনেন না বুঝি?'

ঘুরে ঘুরে স্মরজিৎ ওর বাগান দেখালে। গোটাকতক ফুল তুলে বেঁধে দিলে তোড়া করে। রোদ এরই মধ্যে কখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সীমানার বাইরের ক্ষেত থেকে অর্ধপক্ব রবিশস্যের ঘ্রাণ ভাসছে হাওয়ায়। সে হাওয়ায় ঠাণ্ডার অবসাদময় আমেজ। পায়ের নিচে নরম মখমলের মতো ঘাসের ওপর খইএর মতো ফুল ছড়ানো। মাথার উপর কখন থেকে একঘেয়ে গুন্ গুন্। কী? না মৌমাছি চাক বাঁধছে।

বাসে তেমন ভিড় নেই, তবু স্মরজিৎ যখন প্রথম দুটো বাস ছেড়ে দিতে

বললে, লীলা আপত্তি করলে না। শীতের পড়ন্ত বেলার আলস্যটুকুর ছোঁয়া লেগেছে মনেও।

দমদমে গেল পরের রবিবারেও। তার পরের রবিবারও বাদ গেল না। ক্রমশ ফি রবিবারেই। ছুটির দিন এলেই কী এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। প্রথমটা অস্বস্তি, ক্রমশ অস্থিরতা, অথচ কারণ বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত প্রতি রবিবারেই দেখা যায় দমদমের বাসে লীলা উঠে বসেছে।
গিয়ে খুব ভালো লাগে তাও নয়। কিন্তু খারাপ তো লাগে না। কী যেন একটা যাদু আছে, বন্ধুর অসমতল মাঠের, রবিশস্যের আঘ্রাণের, নিঃসঙ্গ ঘুঘু-কণ্ঠের, লেবু পাতার মিষ্টি-মধুর সৌরভের। একখানা হাত শুধু দূরেই ঠেলে দেয় না, একটা রহস্যময় পদ্ধতিতে কাছেও টানে। সেই ছমছমে ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ঢুকলে শরীরটা শিউরে ওঠে, রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু রোমাঞ্চ তো শুধু ভয়েই হয় না।
নিজেকে ক্রমশ একটা জালে জড়িয়ে ফেলছে লীলা, স্পষ্ট বুঝতে পারে। এদের দ্বৈত সংগ্রামের সঙ্গে অলক্ষ্যে কবে যেন নিজেও যুক্ত হয়ে গেছে। অথচ এ তো সে চায়নি। স্মরজিতের তৈরি প্রসাধন উপচার নিয়ে নিজের পরিচিত মহলে ইতিপূর্বেই দু-চার বার গেছে; সাফল্যও আশানুরূপ না হোক, পেয়েছে। পাঁচ টাকার জিনিসও যেদিন চালাতে পেরেছে সেদিন আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে পড়েছে। আবার কখনো কখনো স্মরজিতের প্রতি অকারণেই সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে গেছে। কঠিন আঘাত করতে চেয়েছে এই মানুষটিকে। আবার পরক্ষণেই হয়তো নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে। দোষ তো স্মরজিতের নয়। এ দ্বন্দ্ব লীলার মনের। নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।
আবার নেশাও। জানে না ভবিষ্যৎ কী, জানে পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু তবু রাশ টানতে পারে না। অস্বস্তিকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি লীলা সে সপ্তাহে খুব প্রাণপণ খাটলে। যখনি অবসর পেয়েছে, মিত্র কোম্পানির মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত। পিসিমা যা পারেন না, এমন কি স্মরজিৎও নয়, তা লীলাকে দিয়ে যেন অনায়াসেই হয়। তার কাছ থেকে জিনিস রাখতে দোকানদারদের বিশেষ আপত্তি নেই। কথাবার্তায় লীলা স্মার্ট, আর লোকে তো বলে চেহারাটা এখন

পর্যন্ত ভালোই। রবিবার গিয়ে স্মরজিৎকে হিসাব দিতেই স্মরজিৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—'বলেন কি? হাজার টাকা? হাজার-টাকার অর্ডার এক সপ্তায়? বুঝেছি, আর বেশি বাকি নেই, আমার সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।' 'আমি জানি, মা যখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আর কোনো ভাবনা নেই। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' পিসিমা পাশের ঘরে চা করতে চলে গেলেন।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ওরা কারবারের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ-পরিকল্পনা করলে। ল্যাবরেটরি ঘরটাকে আর একটু বড়ো করতে হবে। খবরের কাগজের মারফত প্রচার-ব্যবস্থারও সময় এসেছে। দুজনে মিলে ওরা বিজ্ঞাপনের কপিও মুসাবিদা করলে একটা। আর,—আর দরকার হয় তো লোক রাখতে হবে আরো দু-একটা।

'একজন লোক তো রেখেইছি,' স্মরজিৎ ঈষৎ হেসে বললে, 'তবে পার্ট টাইম এই যা। আসে আর চলে যায়। তাকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি যেত। কি বলেন মিস্ সোম?'

লীলার মুখের সমস্ত রক্ত মুছে গেছে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন স্তব্ধ। কিছুদিন থেকেই এই কঠিন মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছে, ভয় করেছে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেই মুহূর্ত এল আজ, শীতের এই দ্রুত ক্ষীয়মাণ দিনান্তে। কী উত্তর দেবে। ওর নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়াই যে এখনো শেষ হয়নি।

এগিয়ে এসে স্মরজিৎ ওর কাঁধে ওর শক্ত ডান হাতখানা রাখলে।—'আমি জানি লীলা, এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সময় দিলুম। সব দিক ভেবে তুমি একদিন, দু-দিন,—সাত দিন পরেই না হয় জবাব দিয়ো। আমার সবই তুমি জানো। আমার দিক থেকে তো জানাবার কিছু নেই—'

শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। কঠিন একটা প্রয়াসে নিজের সমস্ত সত্তাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লীলা। 'আমি পরে আবার আসব' ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারল শুধু।

পরে? কিন্তু কত পরে লীলা? সাগ্রহে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু জবাব পায়নি। লীলা দ্রুত পায়ে চলে এসেছে গেট খুলে সদর রাস্তায়, তারপর মসুরি কলাইয়ের ক্ষেত আর পাখির কাকলি পিছনে ফেলে শ্যামবাজারের বাসে।

○○ চার ○○

দিন দুই বাদে একদিন সকালে পড়াতে গিয়ে দেখল, বাইরের ঘরের সোফায় বসে কে খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা মনে হল চেনে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না। পড়াতে পড়াতে একসময় রুবিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাইরের ঘরে নতুন একজন লোক দেখলাম রুবি, কে বলো তো?'

'নতুন লোক?' ভ্রূ কুঁচকে বললে রুবি, 'নতুন আবার কোথায়! ওঃ, আপনি মামাবাবুর কথা বলছেন? জানেন লীলাদি, মামাবাবু আবার এসেছে।'

মামাবাবু? এক মুহূর্ত ভাবল লীলা। অনুপম এসেছে তাহলে, চিনতে তবে পেরেছিল ঠিক। কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য এত ভালো হল কবে থেকে। ওর পায়ের শব্দে কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়েছিল। টকটকে ফর্সা মুখ, গাল দুটি বেশ ভরা-ভরা। গেঞ্জিতে ঢাকা চওড়া বুক। এই যদি অনুপম হয় তবে আশ্চর্য রূপান্তর তো!

লীলার একবার জানতে সাধ হল। অনুপমের সে সব পাগলামি এখনো আছে কি না। কিন্তু রুবিকে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। ভুল বানান আর কোটেশনে ভর্তি চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেল।

রুবি বললে, 'জানেন লীলাদি, মামা অনেক টাকা করেছে। এখান থেকে কানপুর গিয়েছিল সেখান থেকে হোসিয়ারপুর। সেখানে কন্‌ট্রাকটারি করে না-কি বড়োলোক হয়েছে।'

পড়াতে পড়াতে লীলা দু-চার বার দরজার দিকে তাকিয়েছিল। চটি-পরা দুটি পা পর্দার নিচে ঘুর-ঘুর করছে দেখতে পাবে আশা করেছিল কি না বলা যায় না। কিন্তু অনুপমের আর কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়তো, এখনো ওর মনে লজ্জা আছে। হয়তো, হয়তো ভুলেই গেছে। লীলা আবার পড়ানোয় মন দিলে।

লন পেরিয়ে গেট খুলেছে, ছাতাটাও খুলতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কানে এল 'শুনুন।'

লীলা ফিরে তাকাল। অনুপম।

হাফ শার্ট আর ট্রাউজার্স। মুখে ফাল্গুনের সকালের নাতি-উষ্ণ রোদ। অনুপম নমস্কার করলে, 'চিনতে পারছেন না?'

লীলা যন্ত্রচালিতের মতো প্রতি-নমস্কার করল। কিন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। যাকে মাস-কয়েক আগে ধমক দিয়েছিল, বেত্রাহত কুকুরের মতো

যে সমূখ থেকে চলে গিয়েছিল মাথা নিচু করে, এ যেন সে নয়।
অনুপম দু-পা এগিয়ে এল। 'আপনি সে সব কথা ভুলতে পারেননি দেখছি। এক সময় যে সব ছেলেমানুষি করেছি, তার জন্ত আন্তরিক মার্জনা চাইছি লীলা দেবী!' একটু হেসে অনুপম আবার বললে, 'তাছাড়া সে সময় আপনি আমায় শাসন করে ভালোই করেছিলেন। নইলে হয়তো আমার চৈতন্ত হত না। জীবনে মানুষ হয়ে ওঠবার সময়ই পেতাম না।'
লীলা তাকিয়ে দেখল, অনুপম মানুষ হয়েছে সত্যি। স্বাস্থ্য তো আশ্চর্যরকম ফিরিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ঋজুতা। কণ্ঠস্বরে সেদিনকার সেই ভিখারী আকৃতির স্পর্শমাত্র নেই। পরিচ্ছদেও বেশ রুচির পরিচয় আছে অনুপমের। শার্টের হাতা থেমেছে কনুই অবধি, তার নিচে বাঁ হাতটার সুপুষ্ট মণিবন্ধে সুদৃশ্য হাতঘড়িটির ব্যাণ্ড ভারী সুন্দর মানিয়েছে। সেদিকে চেয়ে লীলার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।
ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপম একবার নিজের বাঁ হাতটার দিকে তাকাল, তারপর হাতঘড়িটার দিকে। কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেখছেন বলুন তো ঘড়িটায়? সময় ভুল আছে?'
লীলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না।' দৃষ্টি সরিয়ে নিলে। সে তো হাতঘড়িটা দেখছিল না, ওর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওর বাঁ হাতটার দিকে, দুটো হাত বুকের কাছে নিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়েছে অনুপম।
দু-দুটো হাত।
অনুপম বললে, 'আপনাকে আমার আর মোটে একটি অনুরোধ করতেই বাকি আছে, লীলা দেবী! সেদিনকার সব দোষ ত্রুটি ভুলে যান। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি?'
এবারও কোনো জবাব দিতে পারল না লীলা। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে কিছু দেরি হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেছলি, দমদম বুঝি?' লীলা কোনো জবাব দিলে না. মা আপন-মনেই বলে চললেন, 'কি-যে শুরু করেছিস তুই-ই জানিস। ওই হাত-কাটা অমরজিতের সঙ্গে কিসের এত মেলা-মেশা। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। ও ছোঁড়ার নিজেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। ওকে ব্যবসায় সাহায্য করছিস, ইস্কুলে ওর জিনিস নিচ্ছিস, ভালো কথা। এর পরেও আসে কেন?

ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালে তুই তো সুখী হবিই নে, এ দারিদ্র্যও ঘুচবে না, মাঝখান থেকে আমরাও না খেয়ে মরব। তোর ওপরেই তো সর্ব নির্ভর করছে মা!'
মা আরো সন্নিহিত হয়ে এলেন। নিচু গলায় বললেন, 'একটা কথা বলব লিলি ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি। তুই যে বাড়ি পড়াস না, সে বাড়ির গিন্নী আজ দুপুরে এসেছিলেন। ভারী আলাপী মানুষ। এত বড়লোক অথচ অহংকার নেই। কথায় কথায় বললেন, ওর এক ভাই আছে। দেখতে শুনতে ভালো, পয়সাও আছে। কথার ভাবে বুঝলাম, তোকে ওদের খুব পছন্দ। এখন তুই যদি মত করিস—'
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মা বললেন, 'কি, জবাব দিচ্ছিস না যে?'
ক্লান্ত গলায় লীলা বললে, 'আমি আবার কী দেখব মা? তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।'
মা কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই তো লক্ষ্মী! তোর ভালোর জন্যেই বলা। বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে, তোকে দেখলে আমার দুঃখু হয় না ভাবছিস? এ বিয়ে হলে দেখবি কত সুখী হবি। আমাদের সংসারটাও একটা আশ্রয় পেয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর যদি ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর জীবন জড়াস্'—
কিন্তু মা-র কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন ছিল না। লীলা স্থির করে ফেলেছে। স্মরজিতের সঙ্গে ওর জীবন জড়াবে না। স্মরজিতের প্রশ্নের জবাব স্থির হয়ে গেছে। সংসারের কথা ভেবেছে লীলা, নিজের কথাও ভেবেছে, আর সংশয় নেই।

তবু যখন পরদিন শেষ জবাব দিতে গেল, পা দুটো বার বার কাঁপল লীলার। বেলা শেষের ম্রিয়মাণ রোদে রবিশস্যের ক্ষেতের সবুজও আজ কেমন স্তিমিত। ওর পায়ের শব্দে একটা কাঠবিড়ালী পালিয়ে গেল আমলকী গাছের ডালে। হেলে পড়া খেজুর গাছের সূক্ষ্মশীর্ষ পাতাগুলো বিঁধে গেছে পদ্মপাতায়। বাঁশ ঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্যে একক ঘুঘুর একঘেয়ে কণ্ঠ।
স্মরজিৎ বাইরে বসে নেই। শোবার ঘরেও তাকে দেখা গেল না। কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে লীলা একটু বসল। অন্যমনস্কভাবে টুল থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিতেই মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। ত্রস্ত হয়ে

নিচের দিকে তাকাতেই লীলার দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেল। নুয়ে পড়ে সেটাকে তুলে যথাস্থানে রাখবে এমন শক্তিও নেই।
স্মরজিতের কাঠের বাঁ হাতটা। স্যাঁতসেঁতে স্বল্পালোক ঘরের ভিজে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েছে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সে আর নিস্পন্দ একখানি কাঠের হাত, ভাবতেই আর একবার কেঁপে উঠল লীলা। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করতে লাগল, অথচ উঠবে যে, ছুটে যে পালাবে, সে সামর্থ্যও নেই, পক্ষাহত প্রত্যঙ্গগুলোকে এই ঘরের মৃত আবেষ্টনীর সঙ্গে কে যেন কঠিন, নির্মম হাতে বেঁধে রেখেছে।
স্মরজিৎ ঘরে ঢুকল একটু পরেই। খালি গা, চুলগুলো ভিজে, কাঁধে গামছা। স্নান করে এল।
ওকে দেখে স্মরজিৎ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। 'কতক্ষণ থেকে বসে আছ… আছেন। আজ ফিরতে দেরি হয়েছিল তাই অবেলায়।—পিসিমা আবার গেছেন দক্ষিণেশ্বরে।'
ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর কি যেন খুঁজল স্মরজিৎ, তারপর এদিক ওদিক তাকাতেই মেঝেয় চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিল কাঠের হাতখানা, গামছা দিয়ে যেন কতকটা স্নেহে মুছে ফেলল মাটি।
লীলা কাঠ হয়ে বসে বসে সব দেখল।
'একটু বসুন, এখুনি আসছি' বলে, স্মরজিৎ আড়ালে চলে গেল। ফিরে যখন এল, তখন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, বাঁ হাতটা অভ্যস্ত রীতিতে পকেটে।
তক্তপোশের ওপর লীলার কাছ ঘেঁষেই বসল স্মরজিৎ।—'তারপর লীলা, আমার সেদিনকার প্রশ্নের আবার ঠিক করে এসেছ?'
লীলার ঠোঁটদুটো একবার কেঁপে উঠল, কোনো কথা ফুটল না। আরো কাছে এসে ওর কাঁধের ওপর ডান হাতটা রাখল স্মরজিৎ।—'জানি তোমার লজ্জা করছে। থাক, তোমাকে মুখ ফুটে আর বলতে হবে না। ফিরে যখন এসেছ, তখনই তোমার উত্তর আমি অনুমান করে নিয়েছি।'
লীলার একখানা হিম হাত স্মরজিৎ ওর হাতের মধ্যে টেনে নিলে। লীলার সারা শরীর আরেকবার কেঁপে উঠলো। আর অপেক্ষা করা চলে না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমস্ত শক্তিকে অধরোষ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে লীলা ধীরে উচ্চারণ করলে, 'ফিরে আসিনি, ফিরে যেতে এসেছি।'

নির্বোধ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত লীলার দিকে চেয়ে রইল স্মরজিৎ। ওর হাত থেকে লীলার হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। লীলার কথার যেন মানে বুঝতে পারেনি এমন ভাবে রক্তহীন মুখে শুধু বললে, 'ফিরে যেতে এসেছ!'

উঠে দাঁড়াল লীলা। 'হ্যাঁ। ভেবে দেখলুম, হয় না। পারব না, আমি পারব না।'

অস্ফুট গলায় স্মরজিৎ বললে, 'পারবে না?'

'না।' লীলা চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে দরজা অবধি। 'পারবে না? কিন্তু কেন। কেন।.কেন?'

যে হাতটা ক্ষণকাল আগে কোমল হয়ে লীলার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, সেই হাতটাই অকস্মাৎ কঠিন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে; প্রচণ্ডবেগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লীলাকে, আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে 'কেন, কেন, কেন। কেন তবে এসেছিলেন? একদিন নয়, দু-দিন নয়, একবার নয়, দু-বার নয়, বার বার? কেন। কেন দিনের পর দিন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কাজের সহায়তা করেছেন। কোনো মমতা যদি ছিল না, তবে কেন আমায় ভুল বোঝবার সুযোগ দিলেন। একি শুধু কৌতূহল? শুধু দয়া?'

লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। অস্ফুট গলায় বলল, 'কৌতূহল, দয়া?'

ধীরে ধীরে লীলা এগিয়ে গেল। চাক থেকে উড়ে আসা দু-একটা মৌমাছি উড়ছে ইতস্তত। বাতাসে মৃদু গন্ধ, কে জানে হয়তো লেবু ফুলের। আকাশে সূর্যের শেষ আলোয় দু-একটি চিল ডানা-না-কাঁপানো সাঁতার দিচ্ছে। পথের ধারের পুকুরের পানায় চুপ করে বসে আছে দু-একটি বক। আর সরু সাদা সিঁথির মতো পথ। ফসল-ধোয়া মাঠ পাড়ি দিয়ে দূরের অশ্বথ-বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার পরেই ঝাপসা, তারপরেই অন্ধকার।

এই দীর্ঘ পথ ওকে একলা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই লীলার পা দুটো অবশ হয়ে এল। হাঁটতে যেন জোর নেই। চলতে গেলে লাউয়ের লতায় পা জড়িয়ে যায়, ফণি-মনসার কাঁটা আঁচল আঁকড়ে ধরে। এই নিরালোক নিরানন্দ পরিবেশ তাকে কঠিন মায়ায় ঘিরেছে, বেঁধেছে দুশ্ছেদ্য মোহে। এই তমসা থেকে কেউ যদি তাকে হাত ধরে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, দিক। কিন্তু একা ওই ক্লান্ত পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই লীলা ভয় পেল! অন্যদিন ওর সঙ্গে থাকত স্মরজিৎ। আর আজ—পেছন ফিরে তাকাল।

চৌকাঠে হাত রেখে স্মরজিৎ কাঠের পুতুলের মতো তখনো দাঁড়িয়ে। অবসন্ন ভঙ্গিতে দরজাটা ধরে আছে, পাংশু মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর।

হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিত হয়ে তাকাল স্মরজিৎ।

লীলা ফিরে আসছে।

প্রায় ছুটে এসে লীলা ওর পায়ের কাছে মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল। শিথিল আঁচল পড়ল লুটিয়ে। ওকে আস্তে আস্তে তুলল স্মরজিৎ, গভীর মমতায় কাছে টেনে নিলে। মোমের মতো সাদা দুখানি আকুল হাত কখন জড়িয়ে গেছে গলায়। বুকের ওপর সিক্তপক্ষ্ম দুটি চোখের স্পর্শ। কান পাতলে শোনা যায় একটি দ্রুতশ্বাস, স্পন্দিত হৃদয়ের ওঠা-নামা। আর পরম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে খোঁপা-খোলা শ্রান্ত একটি মাথা এলানো। ধীরে ধীরে সেই মুখখানি স্মরজিৎ তুলে ধরল। ফিরে যেতে পারেনি। ফিরে এসেছে।

ননী ভৌমিক (১৯২১—) ॥ পূর্বক্ষণ

দরজাটা খোলা আছে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে চোখে পড়ে না। কিন্তু জানি খোলা আছে। খোলা দরজা দিয়ে আমি এসেছি। দরজা খুলে দিয়ে ও আস্তে করে বলেছে :

শোনো !

বলো। আস্তে করে বলি আমি। তারপর চুপ করে থাকি আমরা। ও কি একটা বলতে চেয়েছে, কি একটা শুনতে। আমি কি একটা শুনতে চেয়েছি, কি একটা বলতে। কিন্তু কিছু না বলে একটুখানি চুপ করে থাকি আমরা। চুপ করে একালের ম্লান একখানা ঘরে।

ও জানে আমাকে। আমি জানি ওকে। নানা পথ ঘুরে আমি এসেছি। নানা লোক, নানা কাজ, নানা হিসেব। নানা পথ ঘুরে ও এসেছে। নানা লোক, নানা মোড়, নানা দায়। একটা জগৎ আছে বাইরে। সেই বাইরের রাস্তায় ও একদিন আমার মুখের দিকে চেয়ে থামল একটু। ও রূপসী নয়। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থামলাম। আমি বীর নই। আর আমি জানি ও অনেক সয়েছে। ও জানে আমি অনেক দেখেছি। তারপর দরজা খোলা রেখে একটু বসি আমরা। আমরা একালের একটা ঘরে।

একটু ইতস্তত করেছে ও। আর কিছু বলেনি। সমস্ত ঘরখানা ভরে উঠেছে না-বলায়, চুপ করায়। সমস্ত ঘরে না-বলা না-শোনা মিড়ের একটা গুনগুন। দুর্বাঘাসের কানে ফাল্গুন হাওয়ার একটা বেহালা। ও রূপসী নয়। তবু ওকে চোখ মেলে দেখতে চাই আমি। তাকাই। ও কি করছে দেখি, নাকি আমার কি হচ্ছে শুনি। ও রূপসী নয়, কিন্তু সহসা মনে হয় আমার, ও অপর্ণা। কি একটা বলতে চাইছিল ও, না বলে চুপ করে আছে। আমি কিছু একটা বলতে চাই। আমি জানাতে চাই ও সুন্দর। ও জানে না ও

কী আশ্চর্য সুন্দর। তাই ও যখন চুপ করে আছে, তখন আমি আস্তে করে বলি : শোনো!

আর তখন ঘরের মধ্যে একটা ভ্রমর আসে গুনগুনিয়ে। কী মায়া লাগল চোখে। আহা, মায়া লাগুক, মোহ। সুর লাগুক ততখানি যতখানি ও নিজে সুন্দর। ও রূপসী নয় তবু অপরূপ এই কথা জানাতে চেয়েছি আমি। ও শোভা নয়, সুরভি। আস্তে করে বলেছি : শোনো! কি বলছি সেটা কিছু নয়, কি সুর লাগছে।

আর অপেক্ষা করি আমি নিজে। কান পাতি নিজের গলার স্বর শোনার জন্যে। চমকে উঠি : যা শোনাতে চাই তা শুনছি না। একটা ভ্রমর এসেছে ঘরে। না, ভ্রমর না মাছি। না, মাছি না, কিছু না। কিছুই না।

কিছুই না, কোনো কথাই আর বলি না আমি। কোনো কথা না বলে ও চুপ করে আছে অন্যদিকে চেয়ে। আমি জানি এই চুপ করাটা বানানো। ও জানে না ও সেটাকে বানিয়েছে কিনা। আমি জানি না আমি সেটা বানিয়ে তুলতে চাই কিনা।

তবু আমি জানি এর মানে কি। এ শুধু মোহ। এ শুধু বানানো। আমরা যা নই, তাই আমরা বানাতে চাই নিজেদের। এ শুধু ছায়া। একালের ম্লান এই ঘরখানায় আমাদের বানিয়ে নেওয়া ছায়ার আলপনা। আর সব জানা। জানা।

[illegible] জানা ছিল না অনেক। জানা ছিল না কিসের পর কি। কিসের মধ্যে কি। তাই সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ ট্রাজেডি, মহৎ মাধুর্য। পৃথিবীতে রূপসী নেমে এসেছে। জেগেছে বীর। আবেগ বেজেছে সপ্তমে। আমাদের সপ্তম নেই, এ শুধু এক মামুলী সপ্তক। একক নয়, মিশেল। আর মামুলী। আর জানা কিসের মধ্যে কি, কিসের পর কি। ওকে জানি আমি। ও আমাকে।

ও জানা। আমি জানি নানা পথ ঘুরে এসেছে ও। নানা লোক, নানা মোড়, নানা দায়। বাইরের একটা অস্থির জঙ্গমতা বিপুল চিৎকার তুলে যান্ত্রিক বাধ্যতায় বেগার খেটে চলেছে দিনরাত। সেই বাইরের রাস্তায় ওর সঙ্গে আমার দেখা। সেই জঙ্গম জগৎটার একটা অংশ আমরাও। একটা টুকরোই। আমাদের জায়গা কোথায় তা জানা। কোন্ মেশিনের সামনে দিনে ক-[illegible] করে দিতে হবে জানি। কি করে বদলাতে হবে, কি করে অপেক্ষা করতে হবে। আর তাই নানা লোক, নানা দায়, নানা মোড় পেরিয়ে চলেছে ও।

আমি। বিনা উত্তেজনায়, বিনা রোমাঞ্চে। তাই ভিড়ের মধ্যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় ও। রুজি রোজগারের মেহনত করার পর দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে। কখনো সিনেমায় যায় কখনো মিছিলে। কাউকে দেখে হাসে, কারো সঙ্গে ত্নটো মিষ্টি কথা বলে, কারো জন্যে প্রতীক্ষা করে হঠাৎ। যা সত্যি নয় তাই বলতে চায়। যা বলে তা সত্যি হয় না। কাউকে ঠকায়, কাউকে ফেরায়, কাউকে ভুল বোঝায়। তারপর রুজি রোজগারের জন্যে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায় আবার। আর জীর্ণ হয়, আর জীর্ণ হয়, জীর্ণ। একটা নির্ভুল জঙ্গমতা বদলে যাবার আগে জীর্ণ করে চলেছে দিনরাত। বাইরের সেই রাস্তায় ও চোখ তুলে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমি বলেছি, শোনো!

তারপরেই অনুভব করেছি এটা কি। মায়া নয়, মতিভ্রম নয়, এ শুধু অনুকম্পা। হ্যাঁ, অনুকম্পা। চোখ মেলে ওকে দেখি। একালের ম্লান একটি ঘরে ক্লান্ত একটি মেয়ে। অন্য দিকে তাকিয়ে আছে ও। ওর সারা চেহারায় রূপ নয় ক্ষয়। শোভা নয় শ্রান্তি। ওর গালের ওপর অসহ্য ম্লান নীল একটা শিরা ফুটে উঠেছে। ওর গ্রীবার ভঙ্গি পাখির মতো ভীরু। কাউকে ঠকিয়েছে ও, কাউকে ফিরিয়েছে, কাউকে ভুল বুঝিয়েছে। আর সব মিলিয়ে ও অনেক সয়েছে, অনেক। বাইরেটা অনেক বড়ো, আমরা অনেক ছোট, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে আমাদের এক মুহূর্তের আত্মরক্ষা করুণায়। আমাদের শুরু ও শেষ করুণায়। ও অনেক সয়েছে।

আর অসহ্য লাগে ওর গালের ওপরকার ম্লান শিরাটা। আমি জানি আমি কি চাইছি। ওকে করুণা করতে চাই আমি, আর কিছু নয়। ও অনেক সয়েছে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমাদের জীবন কষ্টের। কাউকে ঠকিয়েছি, কাউকে ফিরিয়েছি, আর সব মিলিয়ে অনেক সয়েছি আমিও। নিজের জন্য করুণা চাই আমি। তাই করুণা করি ওকে। যা বলতে চাইছিলাম তা বানানো। তাই অন্য একটা স্বর আনতে চাই গলায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তাই আবার বলি, শোনো!

চোখ না ফিরিয়েই ও বলে, বলো।

ঘোর ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে একটা স্বর। স্বরটা করুণার। ও কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে, বলো। আর ছলছল করে উঠেছে একটা স্বর। ও করুণা করে আমাকে। আমি অনেক সয়েছি, আমরা অনেক সয়েছি।

বাইরের নিষ্করুণ জঙ্গমতা থেকে এক একটা মুহূর্ত আমাদের চাই। করুণায় ভেজা। করুণায় বাঁচা। মৃদু, শান্ত, ম্লান। করুণা নিয়ে আমি ওর দিকে তাকাই চোখ মেলে। ওর দেহের দিকে। একটা ম্লান ছায়া পড়েছে ওর শরীরে। গ্রীবার ভঙ্গিতে একটা কারুণ্য। কপালের ঢালুতে চূর্ণ অলক। শাড়ি ব্লাউজ। একটু বেঁকে বসেছে ও, আমার দিকে না তাকিয়ে। একটা বাহু নেমে এসেছে বেঁকে। ম্লান আভার গুঁড়ো লেপে আলো-আলো হয়ে উঠেছে হাতের রোঁয়াগুলো। শাড়ি ব্লাউজ। ওর একপাশের বুকখানা দেখতে পাচ্ছি আমি। ব্লাউজে ঢাকা ব্লাউজে বাঁকা। ভরা। নিশ্বাসের তালে তালে একটু উঠছে, নামছে, উঠছে। একটা সেপ্‌টিপিনের মাথা চোখে পড়ে আমার। বোতাম ছেঁড়া ব্লাউজটাকে ও বিঁধে রেখেছে সেপ্‌টিপিন দিয়ে। ঠিকমতো লাগাতে পারেনি। আমার ইচ্ছে হয়, ঠিক করে লাগিয়ে দিই সেপ্‌টিপিনটা।

আমি জানি ও শুধু করুণা। ও অনেক সয়েছে। করুণায় নীল ওর গালের ম্লান শিরাটা দেখতে চাই আমি। কিন্তু দেখি না। তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তাকিয়ে থাকতে চাই না। একালের একটা ঘর, কিন্তু একালকে খুঁজে পাই না আমি, খুজে পাই না কিছুতেই আর ঘরের ম্লান ছায়াটা মনে হয় অন্ধকারের মতো মাতাল। আর বাইরের নিষ্প্রাণ নির্ভুল জঙ্গমটাকে মনে হয় মত্ত মদালস শেকলে-বাঁধা একটা আদিম বৃষ হরপ্পার অন্ধকার থেকে মুখ তুলে ভাঙা ফাটা আহ্বানে ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। কুটির প্রান্তের গণ্ডির বাইরে কোনো এক কামার্ত রাবণের মহাকাব্যিক পদচারণা। ওর নীল শিরাটার দিকে তাকাতে চাই আমি। বলতে চাই, শোনো! কিন্তু কিছুই বলি না আমি, কিছুই ভাবি না। শুধু ঘন, ভারী, আর্দ্র নিশ্বাস টানি আমি। ও বলে, কই বলো। আর কিছু না ভেবে না দেখে তাকিয়ে থাকি আমি। ও অনেক দেখেছে, অনেক সয়েছে। আর তাই একটা আশ্চর্য পরিণতি ও জমিয়ে তুলেছে পরতে পরতে ওর মনে, ওর দেহে। একটা ফুল ফুটে উঠেছে তার সবগুলো দল মেলে—একটা মাংসের ফুল। কিছুই বলি না আমি। শুধু তাকিয়ে দেখি। ও শোভা নয়, সুরভি নয়, স্বেদ। ওর ব্লাউজের বাহুমূলের গোল জায়গাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, ঘ্রাণে। ওর শাড়ি তেমনি অলস, তেমনি বাঁকা, ভরা ব্লাউজ। সেপ্‌টিপিন। উঠছে, নামছে, উঠছে। ভারী আর্দ্র নিশ্বাস টানি আমি। ডাকি, শোনো—আর হরপ্পার বৃষের মতো একটি ভাঙা আওয়াজ বেরুতে চায়

আমার গলা দিয়ে। কিন্তু না, বেরোয় না। কোনো শব্দই বেরোয় না আমার গলা দিয়ে। শুধু নিশ্বাস টানি আমি, ভারী, ভেজা, অন্ধকার।
আর সেই মুহূর্তে ও আস্তে করে বলে, শোনো।
আমি জানি ও গলার স্বর কার। ওর। একালের একটি মেয়ের। কান পাতি! একটা সুর গুনগুনিয়ে উঠছে আর কেটে কেটে যাচ্ছে কয়েকটি সাংসারিক আলোচনায়। একটি মামুলী গলার স্বর। যা শুধু কয়েকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় জানায়, কয়েকটা প্রাসঙ্গিক বিষয় জানে। আর বানিয়ে তোলে একটা অপ্রাসঙ্গিক সত্যকে। যাদুকর অন্ধকার ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে হারিয়ে যায় ঘরের ম্লান আলোয়। আমি জানি এই আলোটাই ছিল। এই আলোটাই আছে। ম্লান। মামুলী। প্রাসঙ্গিক।
আমি বলি, বলো।
তারপর ওর দিকে তাকাই। বাইরের দিকে। একটা নির্ভুল জঙ্গমতা বেগার খেটে চলেছে দিনরাত। তার চিৎকার নেই, মত্ততা নেই, বিভ্রম নেই। মসৃণ, নিষ্করুণ, বৃহৎ। বাইরেটা অনেক অনেক বড়ো আমাদের চেয়ে। আমরা ছোট, তুচ্ছ, টুকরো। কোন্ মেশিনের সামনে ক-ঘণ্টা দিতে হবে আমাদের জানা। জঙ্গমটা বদলে যাওয়ার আগে কি করে ক্ষয়ে যেতে হবে আমাদের জানি। ওর দিকে তাকাই। নানা পথ, নানা দায়, নানা মোড় ও ঘুরে এসেছে। কাউকে ভুলিয়েছে, কাউকে ঠকিয়েছে, কাউকে ফিরিয়েছে। অনেক সয়েছে ও। অনেক। কিন্তু কেন? অনেক সয়েছি আমি, কেন? অনেক সয়েছি আমরা তবু অপ্রাসঙ্গিক, তুচ্ছ, টুকরো, নিষ্ফল, শূন্য।
আমি বলি, বলো। আর কি বলছি সেটা কিছু নয়। কি সুর বাজছে। সুরটা নিষ্ফলতার, শূন্যতার। আর করুণা করতে চাই নিজেকে। না, করুণা করতে চাই না। একটা কষ্ট আছে আমাদের সকলকে ঘিরে। সেই কষ্টের নাম জীবন। কষ্টটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার নাম জীবন। কিন্তু কেন? ঋষিপত্নী বলেছিল, কি করে মৃত্যুকে অতিক্রম করবো? তার চেয়ে ভালো বুদ্ধের ধ্যান, কি করে জীবন অতিক্রম করে পৌছব শূন্যে, কিছুই না এমন একটা কিছুতে। কিছুই না, কোনো কথাই বলি না আর। ও আমার দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকেই চেয়ে আছে এখনো। ও অনেক সয়েছে। কিন্তু কী এসে যায় যদি একটা মেয়ে দৈনিক বরাদ্দ মেহনতের পর দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে। কাউকে ঠকায়,

কাউকে ফেরায়, কাউকে ভোলায়। তারপর আবার হেঁটে যায় ভিড়ের মধ্যে দিয়ে, অনেক পথ অনেক মোড় অনেক দায়ের মাঝখানে। কী এসে যায় যদি কেউ বলে, শোনো, অথবা না বলে। কী এসে যায় যদি আমি বলি বলো, অথবা না বলি। বাইরেটা নিষ্করুণ, মসৃণ। এক মুহূর্তের আত্মরক্ষা আমাদের সাংসারিকতায়, না সাংসারিকতা নয় করুণায়। না করুণায় নয়, কামে। না কামে নয় নিষ্করুণ শূন্যতায়। বৃহৎ জঙ্গমটাকে আমরা উত্তীর্ণ হব শূন্যতায়। কিছু একটা শুনতে চাই ওর কাছ থেকে। আমাদের মাঝখানে একটা নিষ্পাপ, নিপ্রেম শূন্যতা। শূন্যতার ওপার থেকে ও ডেকেছে, শোনো। আমি ওকে ডাকি, বলো। কাছে আসতে চাই আমরা। কিন্তু কাছে আসার মূর্তিটা ফিরে যাওয়ার মতো। শূন্যতার ওপার থেকে ওকে ডাকি। সে ডাকটা ফিরে চলার মতো। শূন্যতার ওপার থেকে আরো ওপারে ওর ফিরে চলা। শূন্যতার এপার থেকে আরো এপারে আমার নিষ্ক্রমণ, এক নিষ্পাপ, নিপ্রেম বিশ্বের শূন্যতায় দুই গাণিতিক নক্ষত্র। গাণিতিক সেই শূন্যতায় কাছে আসাটা দূরে চলে যাওয়ার মতো। সীমাটা অনন্তের মতো।

নির্দিষ্ট অনন্তের ওপার থেকে আমি ওকে কিছু একটা বলতে চাই। ডাকি, শোনো। আর চমকে উঠি। কি বলছি সেটা কিছু নয়, কি স্বর লাগছে। আর নিপ্রেম, নিষ্প্রাণ শূন্যের এপার থেকে চমকে চমকে উঠি আমি। এ কী! এ কোন্ কান্নার স্বর! নিপ্রেম, নিষ্প্রাণ এ কার অসহ্য কান্না। আর্তনাদের মতো করে আমি ডাকতে চাই, শোনো!

কিন্তু কিছুই বলি না আমি। কোনো শব্দই বেরোয় না আমার গলা দিয়ে। শুধু ওর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি। একালের ম্লান একটা মেয়ে। অনেক সয়েছে ও, অনেক দেখেছে। অনেক পথ, অনেক মোড়, অনেক লোক। তাই কাঁদতে চাই আমি। কিন্তু কাঁদতে পারি না। শিউরে শিউরে উঠি আশঙ্কায়। পরতে পরতে পরিণতি জানিয়ে ফুটে ওঠা ঐ একটা মাংসের ফুল—কিন্তু অন্য কেউ নেবে ওকে। কেননা অনেক পথ, অনেক মোড়, অনেক লোক পেরিয়ে আসছে ও। অনেক মোড় অনেক লোক পেরিয়ে ও যাবে। দৈনিক বরাদ্দ রুজি রোজগারের মেহনতের পর কিছু কেনাকাটা করবে দোকান থেকে। কাউকে ফেরাবে, কাউকে ভোলাবে। তারপর আবার হেঁটে যাবে ও অনেক অনেক ভিড়ের মধ্যে।

ম্লান ঘরের বাইরে একটা অন্তহীন উদ্ভট জঙ্গম শেকল-বাঁধা এক সার মধ্যযুগীয়

কয়েদীর মতো বেগার খেটে চলেছে ঝম্ ঝম্ শেকল বাজিয়ে। তাদের কদাকার কানা নিষ্ঠুর চোখের কোণে কোণে ধূর্ত হাসি। আর ঝম্ ঝম্ করে পায়ের বেড়ি বাজছে দিনরাত। আমি জানি, অন্য কেউ ওকে পাবে। অনেক মোড়, অনেক ভিড়, অনেক দায়ের মধ্যে অন্য কেউ। ভিড়ের মধ্যে একদিন ও চোখ তুলে আমার দিকে চেয়েছে। দরজা খুলে দিয়ে বলেছে, শোনো। কিন্তু আর কিছু বলিনি আমরা। আর কিছু বলা হবে না আমাদের। আমি চোখ মেলে ওকে দেখতে চাই। ওর যা দেখেছি, সেটা নয়। যা দেখিনি সেইটে। ও যা বলেছে তা শুনতে চাই না আমি, ও যা বলেনি সেইটে। আর অসহ্য ঈর্ষায় অস্থির হয়ে উঠি। অন্য কেউ ওকে পাবে, কে, কে? অনেক ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ও এসেছে। ভিড়ের মধ্যে কে সে, যে ওকে নেবে? কে? তাহলে আমাকেও নিক অন্য কেউ। ভিড়ের মধ্যেকার অন্য কেউ। কিন্তু তবু ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠি আমি। আর আমি জানি, আমিও অনেক ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এসেছি। অনেক মোড়, অনেক দায়, অনেক পরিচিতা। ঈর্ষায় জ্বলি আমি আর ইচ্ছে করে ওকে বলি, শোনো সেদিন যাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলাম। কিন্তু না, কিছুই বলি না আমি। আর একালের এই ঘরখানার ম্লান আলো অন্ধকার হয়ে ওঠে ক্রমে। অন্ধকার নয়, কালো। অসহ্য একটা কান্না গলা ঠেলে আসে আমার, আর কান্নাকে পায়ে মাড়িয়ে প্রেতের মতো স্তব্ধ হয়ে উঠি আমি। কালো একটা ষড়যন্ত্র নিশ্বাস চেপে ঘিরে দাঁড়ায় আমাদের চারদিকে। নিপ্প্রেম নিষ্প্রাণ শূন্যতার চারপাশে ফিস্ ফিস্ সংকেত। বাক্যহীন, দৃষ্টিহীন একপাল কদাকার কয়েদীর মতো বেগার খাটছে বাইরের ঊর্ধ্বভ্রান্ত জঙ্গম। আমি জানি না। আমি জানি। আমি যা জানি তা জানতে চাই না। যা জানি না, সেইটে। আর বিকৃত গলায় চিৎকার করে বলি. শোনো! কিন্তু কিছুই বলি না আমি। কিছুই বলতে পারি না। একটা অসহ্য কান্না, না কান্না নয় ঈর্ষায় গলা বন্ধ হয়ে আসে আমার! গলা চেপে ধরে আমার! একটা ঈর্ষা আমাকে অস্থির করে তোলে!

ও ইতস্তত করে আবার বলে, শোনো।

আর কান পাতি আমি। ও কি বলছে সেটা কিছু নয়। কি সুর বাজছে। সুরটা বানানো, মিথ্যে। ও বলে, শোনো। আর সমস্ত ঘরখানা কালো হয়ে ওঠে পাপে। মিথ্যের প্রতারণায়। কালো হয়ে ওঠে চারদিক, আর থেকে থেকে লাল। থেকে থেকে রক্ত। পাপ আর রক্ত। আর ক্ষেপে উঠি আমি

এক আদিম অস্থির বৃষের মতো। ওকে ঘৃণা করি আমি। অনেক সয়েছে ও, অনেক দেখেছে। রুজি রোজগারের মেহনত করার পর ও কিছু কেনাকাটা করেছে। কাউকে ঠকিয়েছে ও, কাউকে ফিরিয়েছে, কাউকে ভুলিয়েছে। তাই ঘৃণা করি ওকে। বাইরের ক্ষ্যাপা জঙ্গমটা পাপে আর রক্তে বীভৎস হয়ে উন্মত্ত চিৎকার করে ছুটে চলেছে দিনরাত। আমিও ক্ষেপে উঠতে চাই এক প্রচণ্ড 'মূর' রাঁজার মতো প্রতিহিংসায়। ওর দিকে তাকাই আমি। শাড়ি ব্লাউজ। হাতখানা তেমনি নেমে এসেছে বাঁকা হয়ে। একটা মাংসের ফুল। ফুলটাকে দুই হাতে ছিঁড়ে ওর হৃৎপিণ্ডটাকে দেখতে চাই আমি—পাপে ভরা, পাপে ভীরু একটা হৃৎপিণ্ড। অন্ধকারে রক্তের ঝিলিক দেখতে চাই আমি। পাগল হয়ে উঠতে চাই! আর বীভৎস বিকৃত আর্তনাদে চিৎকার করে উঠি, 'বলো'! কি বলো! বলো।'

এতক্ষণে, এতক্ষণে চমকে ফিরে তাকায় ও। আমার দিকে। আমার চোখের দিকে। আর ক্ষ্যাপার মতো আমি তাকাই ওর চোখের দিকে। ওর চোখের অতলে যে পাপ আছে সেই পাপের দিকে। আর কিছু না বলে, কিছু না জেনে, সব বলে সব জেনেও কেবলি তাকিয়ে থাকি আমরা। কেবলি তাকিয়ে থাকি। আর কখন মনে হয় সব কিছু গলে যেতে থাকে আমাদের পায়ের তল থেকে। সব কিছু উত্তীর্ণ হয়ে যেতে থাকি আমরা। জীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাই আমরা, মৃত্যুকে। আর বড়ো হয়ে উঠি আমরা। ক্রমাগত বড়ো বাইরের যে জঙ্গমটাকে আমরা বদলাবো—তার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো! আমাদের চোখ তাকিয়ে থাকে চোখের দিকে।

একালের সমস্ত শূন্য তখন গুঞ্জন করে চলেছে: ভালবাসি।

বলি: তুমি বলো।

সমরেশ বসু (১৯২১—) ॥ অকাল বসন্ত

অবশেষে একটা ঠাই পাওয়া গেল। বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। যাই যাই করে তবু বর্ষা এখনো যেতে পারেনি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লাল ছোপ ধরে গেছে সেই মেঘে। উড়ে চলেছে দিক হতে দিগন্তরে এই মফস্বল শহরের কারখানা ইমারত ও অসংখ্য বস্তির ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো অর্থাৎ ভালোরাম আর একটা রুদ্ধশ্বাস কানা গলির মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার অভয়পদ। প্রৌঢ় ভেলো এখানকার স্থানীয় লোক। কাজ করে একটা সামরিক যানবাহনের কারখানায়। অভয় তার কারখানার কর্মী, ভারী ট্রাকের ড্রাইভার। কিন্তু বিদেশী। ভেলো তাকে একটা ঘরের সন্ধান দিয়েছে তাই সে চলেছে তার নতুন বাসায়। সামগ্রী বলতে হাতে তার একটা টিনের স্যুটকেশ ও ছোট বিছানার বাণ্ডিল। গলিটাতে দিনের বেলাও অন্ধকার। দু-পাশে ঘন টালি ও খোলার চালা গলির মাথায় আর একটা দীর্ঘ চালার সৃষ্টি করেছে। আকাশ দেখা যায় না, এক ফালি রুপোলী পাতের ঝিলিকের মতো মাঝে মাঝে দেখা দেয়। গলি পথটাকে পথ বলার চেয়ে নর্দমা বলাই ভালো। দু-পাশের বস্তির যত ক্লেদ এসে জমেছে সেখানে। নর্দমা থাকলে ময়লা বেরুবার একটা পথ থাকত। কিন্তু তা নেই। সারা গলিটার মধ্যে একটা মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে মেয়ে পুরুষ ও শিশুর ভিড় ও পাতি হাঁসের প্যাঁক প্যাঁকানির মতো পাম্পের শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গেই ঝগড়ার চিৎকার ও হট্টগোল। গলিটার ঢোকবার মুখে একটা বাতি আছে, ইলেকট্রিক বাতি। সেটা এখনো জলছে। সব সময়েই জলে। গলিটা যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে, ওই

বাস্তিটাই তার প্রমাণ।

ভেলোর সঙ্গে অভয়কে দেখে গলির লোকগুলি সবাই একবার করে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোনো আপদ এসে জুটেছে তাদের পাড়ায়।

অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানী খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যাণ্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মতো দীর্ঘবেড় টুপি। পায়ে ভারী বুট। চেহারাটা তার সাধারণ বাঙালীর তুলনায় অনেক লম্বা। মাথাটা চালার গায়ে ঠেকে যাওয়ার ভয়ে ঘাড় গুঁজে চলেছে সে। যেন কোনো দলছাড়া সৈনিক চলেছে ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মুখে তার এখনো কোমলতার আভাস। চোখে এখনো স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ তাকে খানিকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে, নয় তো দুর্বোধ্য।

সে আর না ডেকে পারল না, 'ভেলো খুড়ো।'

ভেলোকে ওই নামেই সবাই ডাকে কারখানায়। বলল, 'ভাবছ কেন। তুমি বামুনের ছেলে, ভালোরাম কি তোমাকে মিছে কথা বলবে। পাকা বাড়ি, যাকে বলে ইটের গাঁথনি, খুঁটে খুঁটে দেখে নিও, বুঝেছ?'

বুঝেছে, কিন্তু এই বস্তির ভিড়ে পাকা বাড়ির কোনো ইশারাও যে চোখে পড়ে না। ভেলো গোঁফের ফাঁকে হেসে আবার বলল, 'কিন্তু যা বলেছিলুম, একটু সাবধানে থেকো বুঝলে দাদা। মানে আইবুড়ো ছেলে তুমি। আলোর আর কি বলো, মরে তো শালার বাদলা পোকাগুলান।'

'তার মানে, আমিও মরব?' অভয়ের গলায় যেন বিরক্তির ঝাঁঝ।

ভেলো বলল, 'ওই চটলে তো? ওটা একটা কথার কথা। সেখেনে কি পেত্নী আছে যে ঘাড় মটকাবে। মানুষ খুব ভালো জানলে। তবে মানুষের প্রাণ...'

'মানুষের প্রাণ!' ভেলোর কথার বেশ টেনে বলল, অভয় 'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ওসব বালাই নেই।' বলতে বলতেই দাঁড়াল দুজনে। সামনেই একটা চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্যরকম একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। বড়ো বড়ো শালপাতার মতো অজস্র কালচে কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবটি লতার আবেষ্টনীতে ঝুপসি ঝাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। তলা ঘেঁষে স্তূপাকার হয়ে আছে আধলা ইটের রাশি। তার আড়ালে একটা ভাঙা বাড়ির ইশারা জেগে

রয়েছে। তারও পেছনে যেন ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি, মাঠ ও রেল লাইনের উঁচু জমি।

ভেলো বলল, 'ওই যে তোমার বাড়ি।'

বাড়ি? বাড়ি কোথায়? বস্তির গায়েই এই হঠাৎ অবাধ উন্মুক্ত জায়গাটা নির্বাক বিষণ্ণতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। লোকজন দেখা যায় না একটাও। এ নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যেন একটা নিরাকার অস্থিরতা অদৃশ্যে ছটফট করে মরছে। এর মধ্যে বাড়ি কোথায়!

ভেলো বললে, 'এসো।'

বলে সে মুচকুন্দ গাছটার তলা দিয়ে একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এগুলো। পুকুরটায় কচুরিপানার ঘন বিস্তার। পুষ্ট লকলকে ডগাগুলি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাল কেউটের ফণার মতো। তার মধ্যেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ভাঙা ইট বসিয়ে ঘাট করা হয়েছে। ঘাটের কোলে কালো জল গভীর ও নিস্তরঙ্গ।

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা ভাঙা বাড়ি। পোড়ো বাড়ির মতো। বাড়িটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটে বেড়ার আড়াল রয়েছে। দেয়ালের ইট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর চাপটির দাগ। বোঝা যায়, এক সময়ে দোতলা ছিল, এখন ভেঙে গিয়েছে। বট অশ্বথের চারা আর বনকলমির লতা নিচে থেকে উপরে অবাধে জড়িয়ে ধরেছে সর্বাঙ্গ। সামনের ঘরটার জানলায় গরাদ নেই। পোকা খাওয়া পাল্লা দুটো আছে। ফাটল ধরা ভাঙা বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে ছাগলনাদি। বারান্দার নিচেই কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে কালকাসুন্দের বন। বন সেজেছে। অন্ধকার রাত্রের আকাশে খই ফোটা নক্ষত্রের মতো ফুটেছে কালকাসুন্দের ফুল, হলদে আর লাল কৃষ্ণকলি।

ভেলো বলল, 'কি গো, পছন্দ হয় কি না হয়? ফুলবাগান, পুকুর····.'

অভয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পাকা বাড়ি। খুঁটে আর দেখব কি, এ তো খাসা ইটের বাড়ি। তবে পোষাবে না,ভেলো খুড়ো, চ:লা কেটে পড়ি। ও আমার ঘিঞ্জি বস্তিই ভালো, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে পারব না।'

ভেলো হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'সাপ কোথায়, এখানে মানুষ বাস করে। কলকারখানার বাজারে একটু হাঁফ ছাড়তে পারবে। আর······'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ছিটে বেড়ার আড়াল থেকে একটা মুখ বেরিয়ে এল

একটি মেয়ের মুখ। রঙটা মাজা মাজা, হঠাৎ ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের কম নয়, কিন্তু সিঁদুর নেই কপালে। আঁট করে বাঁধা চুল। মুখে হাসি। কিন্তু সামনে মানুষ দেখে হাসিটা মিলিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় বেঁকে উঠল ভ্রূলতা। অভয়পদের টুপি পরা বিদঘুটে চেহারার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ, ভেলো খুড়ো?'

বোঝা গেল, ভেলো এ সারা অঞ্চলের সকলের খুড়ো। বলল, 'কে বিনি ভাইঝি! বলছি তোর মাকে একবারটি ডেকে দে, সেই লোকটি এসেছে ঘরের জন্যে।'

বিনি একবার আড়চোখে অভয়কে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

অভয় বলে উঠল, 'খুড়ো এ যে একেবারে বিয়ের যুগ্যি।'

ভেলো বলল, 'বে-র কেন, হলে অ্যাদ্দিনে ক-গণ্ডা হত, তাই বলো। তা হলে বোঝো, এর উপরে একজন, নিচে আর একজন। তা বে কে দেবে বলো। বাপ থাকতেই তো খেতে জোটেনি, এখন তো বেধবা মা। আর জাতেও যদি শালা বামুন কায়েত হত একটা কথা ছিল, জাত যে তোমার ভেলো খুড়োর, মানে সৎচাষা। আর মা ষষ্টি দিলে দিলে, তিনটেই মেয়ে দিলে। একে বলে কপাল।'

অভয়পদের নিজেরই বুকে যেন উৎকণ্ঠার কাঁটা ফুটল। বোধহয় তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়েছে। নিজের অবিবাহিতা বোনটির কথা। কিন্তু সে হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু খুড়ো এখেনে তো আমি থাকতে পারব না।'

ভেঁলো অবাক হয়ে বলল, 'ওই লাও, তোমার তাতে কি? দেখে শুনে একটা বামুনের ছেলে নিয়ে এলুম বলে, যাকে তাকে তো আর এনে তুলতে পারি নে, আর মেয়েমানুষগুলো একলা থাকে, একটা সাহসও তো পাবে। তারপরে তুমি তোমার, ওরা ওদের।'

অভয়ের আপত্তি ওঠার আগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির মালিক বিধবা বুড়ী। দু-হাতে গোবর মাখা। গায়ে কোনোরকমে কাপড়টা জড়িয়ে দেওয়া। এল হাঁ করে দাঁতশূন্য মাড়ি বের করে। মুখে অজস্র রেখা পড়েছে যেন জট পাকানো সুতোর দলার মতো। গলার চামড়া গলকম্বলের মতো ঝুলে পড়েছে। কাঁপছে থর থর করে। বেঁকে পড়েছে খানিক শরীরটা। চোখে বোধ হয় ভালো ঠাওর পায় না। কয়েক মুহূর্ত অভয়কে দেখে বলল, 'ভেলো, লোকটা বাঙালী তো?'

ভেলো হেসে ফেলল, 'তবে কি পাঞ্জাবী। তোমাকে তো বলেছিলুম সব।'
বুড়ী আর দ্বিরুক্তি না করে অমনি আবার ফিরল, 'না, তা বলছিনে। চেহারাটা যেন কেমন ঠেকল। চোখের মাথা তো খেয়েছি। তা এসো, থাকো। ঘর আমার বেশ বড়োসড়ো। একটু পুরনো. তা—' হঠাৎ চোপসানো ঠোঁট কেঁপে উঠে গলাটা বন্ধ হয়ে এল বুড়ীর। চোখের কোলে জল এসে পড়ল। বলল ফিস্ ফিস্ করে, 'আমি যে জন্মো পাপিষ্ঠা। আমার গলায় বুকে শুধু কাঁটা। সে মানুষটা যদ্দিন ছিল ভাড়া দিইনি, এখন কেউ নিতেও চায় না। তা থাকো।'
চোখ মুছে ডাকল, 'অ নিমি, ঘরটা খুলে দে।'
অভয় তাকাল ভেলোর দিকে। ভেলো ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়ো। দুনিয়ার সব জায়গাই সমান, থাকা নিয়ে কথা।'
বলে বুড়ীর পেছন পেছন অভয়কে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে। বাড়ি মানে, বেড়াটার আড়ালে একটা গলি। গলির দু-পাশে দুটি ঘর। ভেতরে দেখা যায় একটা উঠোন। উঠোনের উত্তরে একটা পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ। ওপারে সেই মুচকুন্দ গাছ ও ইটের স্তূপ। নজরে পড়ে বস্তির খোলার চালা আর মোড়ের সেই লাইট পোস্টটা। বাতিটা জ্বলছে তেমনি। অভয়ের ভারী বুটের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠল গলিটার মধ্যে। নিমি এসে বাঁ দিকের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। নিমি বিনিরও বড়ো। সে বোধকরি বিনির চেয়েও ফর্সা। কেননা, অন্ধকার গলিটাতে তার মুখটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তারও চুল আঁট করে বাঁধা। দোহারা গড়ন। চোখে তার শান্ত বিষণ্ণতা। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।
দরজাটা খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। তার পিছনেই দাঁড়িয়েছে টুনি, সকলের ছোট। বিনির মতোই একহারা ছিপছিপে গড়ন তার। চোখের কালো তারায় খর চাউনি, বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। অভয়ের চেহারা দেখেই বোধ হয় তার ঠোঁটের হাসিটুকু ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার চুল খোলা। হয়তো বেঁধে ওঠার অবসর হয়নি।
ভেলোর পেছনে ঘরে ঢুকে স্যুটকেশ ও বিছানা নামিয়ে অভয় একবার ভালো করে ঘরটার চারদিক দেখে নিল। মেঝেটার অবস্থা মুখে বসন্তের দাগের মতো। সিমেণ্ট ওঠে গিয়েছে এখানে সেখানে। দেওয়ালের অবস্থাও তাই। পলস্তরার 'প' নেই ; সর্বত্রই নোনা ইট বেরিয়ে পড়েছে। তবে ঘরটার

আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা বোঝা যায়। ঘরটার কোলেই সেই বারান্দা, কৃষ্ণকলি ও কালকাসুন্দের ঝাড়, তারপরে পুকুর।

ভেলো বলল, 'নাও, ঘরদোর সাজিয়ে বসো, এবার আমি চললুম। ভাড়ার কথা বলাই আছে।'

বলে ভেলো লোম-ওঠা ভ্রূ-সংকেতে ইশারা করল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চললুম গো বৌঠান, এবার তোমরা বুঝে পড়ে নিও।'

বলে সে চলে গেল। একে একে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, নিমি, বিনি, টুনি। বুড়ী বলল, 'ওই পুকুরে নাইবে; খাবে তো তুমি হোটেলে। না যদি খাও, বাড়িতে আলাদা উনুন নিয়ে এসো, রেঁধে বেড়ে খেও। আর···'

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি যেন তীরের মতো এসে বিঁধল এ ঘরের দুটো মানুষের বুকে। একজনের জিভ আড়ষ্ট; চোখে শঙ্কা, কুঞ্চিত লোল চামড়া আবৃত জড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর একজনের ঠিক ভয় নয়, তবু যেন ভয়। আর একটা নাম-না-জানা তীব্র অনুভূতিতে নিশ্বাস আটকে রইল বুকের মধ্যে।

তারপর হাসিটা নিশ্বাসের দমকে দমকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল, নিঃশব্দ জলের বুকে বুদবুদের শব্দের মতো। ঈষৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কৃষ্ণকলির ঝাড়।

লাল মেঘের বুকে পড়েছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। এ নৈঃশব্দ্যের ফাঁকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধ গলিটার হট্টগোল।

বুড়ী হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বুকের দু-পাশ ও গলাটা দেখিয়ে ফিস-ফিস্ করে বলল, 'এই বুকে আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি যেদিন আমি থাকব না—' বলেই সে যেন আগুনের হল্‌কার জ্বালায় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। ঝোল-ঝাব্বা পরা অভয় একটা অতিকায় ভূতের মতো নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় এনে তুলল আমাকে ভেলো খুড়ো। যে নিশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরতে লাগল।

বোধ করি, সেই নিশ্বাসটা ফেলবার জন্যেই অভয় সেই ভোর বেলা বেরিয়ে

যায়, ফেরে সেই রাত্রে। আসবার সময় রোজই শুনতে পায় পাশের ঘরটায় খস্ খস্ কাগজের শব্দ। যে মুহূর্তে গলিটাতে তার বুটের শব্দ হয়, তখন থেকে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে বেলোয়ারী চুড়ির রিনিঠিনি। একটু বা ফিস্‌ফিস্, কিংবা চাপা হাসির সঙ্গে কোনো গলার একটা মৃদু শব্দ।

অভয় শুনেছে ভেলো খুড়োর মুখে, ওরা তিন বোন কাগজের ঠোঙা আর পিসবোর্ডের বাক্স তৈরি করে। ওটাই ওদের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু অভয়ের শরীরটা তখন অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। সারাদিন ভারী ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি আর বিরাট হাতীর মতো বডিটার ঝাঁকুনি গায়ের মাংসপেশীতে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। নাকের মধ্যে ভারী শ্লেষ্মার মতো ধুলো জমা হয়ে থাকে।

কোনো রকমে লম্ফটা জ্বালিয়ে বিছানা পেতে বিড়ি ধরিয়ে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়া। খাওয়া হয়ে যায় সন্ধ্যার একটু পরেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় হয়তো নিমি ডাকছে বিনিকে কিংবা বিনি টুনিকে। ওদের খাওয়ার সময় হল। খাওয়ার পর গলিটার বুকে ওদের পায়ের টিপটিপ শব্দ শোনা যায়, ভীত চকিত মানুষের বুকের দুরু দুরু যেন। আবার সেই চুড়ির রিনি-ঠিনি। রাত্রির নৈঃশব্দ্যে আবার সেই চাপা চাপা গলার আভাস। পুকুর ঘাটে শোনা যায় বাসন ধোয়ার আওয়াজ।

তিন বোনের গলা আলাদা করতে পারে না অভয়। শুধু শোনে; কেউ বলে, 'উঃ পায়ে কী ব্যথা হয়েছে রে।' কেউ বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে।' কেউ বা, 'সেই মুখপোড়া সাউটা সাত সকালেই মাল নিতে আসবে, বাক্সের গায়ে তো এখনও লেবেল আঁটা হল না।'

অন্ধকারে যতই ঝিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কানদুটো যেন হাঁ করে থাকে। তারপর হঠাৎ কি কারণে তীব্র মিষ্টি গলায় খিলখিল হাসিতে শিউরে ওঠে রাত্রি। যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে। কিন্তু হাসিটা শেষ হয়ে আবার সেই অস্থিরতা দলা পাকিয়ে ওঠে।

অভয় অশরীরী সাক্ষীর মতো উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় মুচকুন্দ গাছে ঝুপসি আর মোড়ের সেই বাতিটা। তার এক চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিটা যেন বিদ্রূপ করে বলতে থাকে অভয়কে, আমি জেগে

আছি বহুদিন, এবার তুইও জাগছিস্।
পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে, তার গায়ে। সে ছেলেমানুষের মতো মটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি ফুটছে তার গায়ের মধ্যে।
তারপর আবার নিঃশব্দ অন্ধকার। শুধু দূরের কারখানায় বয়লারের ধিকিয়ে চলার একটানা ঘুস ঘুস শব্দ। সেদিন রাত্রে ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকলির বনে থমকে দাঁড়াল অভয়। কে যেন কাঁদছে। এখনো বস্তিতে হট্টগোল, টিউব-ওয়েলের প্যাঁকপ্যাঁকানি। তার মধ্যে এখানকার নিরালায় কান্নার শব্দ।
অভয় কান পাতল। ভুল হয়েছে। কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলার মিলিত সরু গলার গান। গাইছে দুই বোন।—

বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।

সে গানের টানা সুরের লহরীতে রাত্রি দুলছে না, আড়ষ্ট ব্যথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। শরতের আকাশে আধখানা চাঁদ, অসংখ্য অপলক চোখের মতো তারা। নিচেও তারার মতোই রাত্রির নিরালায় ঘোমটাখোলা কৃষ্ণকলি।
কিন্তু হাসি সেই, সুপ্তির আরাম নেই। চাপা আগুনের পোড়ানিতে যেন এ বিশ্বসংসার দিশেহারা, তবুও নির্বাক নিরেট।
ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে যেন অভয়ের বুকেও। ভাবে পেছুবে। কিন্তু পেছিয়েও সামনেই এগোয়। গানটা থেমে গেছে। তবুও আবার থামতে হয়। শোনা যায়, একজন বলছে, 'না এখনো আসেনি।'
আর একজন, 'কে সেই মিলিটারি তো?'
'মিলিটারি নয়রে, ভেলোখুড়ো বলছিল মোটরের মিস্তিরি।'
অভয় নিজের অজান্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শোনে 'মাইরি, লোকটা যেন কি। আমাদের বোধ হয় ভয় পায়।'
আর একজনের তীব্র বিদ্রূপাত্মক গলা শোনা যায় 'ভয় নয়, ঘেন্না করে। ভাবে, ধুমসি পেত্নীগুলো কোন্‌দিন দেবে ঘাড় মটকে।'
তারপর একটা হাসির উচ্ছ্বাস উঠতে গিয়েও মাঝ পথেই ট্রাকের অ্যাক্সিলেটর চাপার মতো সেটা থেমে যায়। শব্দ ওঠে কাগজের খস্ খস্।

অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞেস করে জবাব না পাওয়ায় বোকার মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খট খট শব্দ তুলে ঝনাৎ করে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু পরদিন শরৎ আকাশের রঙ-বাহারী পড়ন্ত বেলায় অবিশ্বাস্য রকমে অভয়ের বুটের শব্দ শোনা যায় গলিতে। শব্দটা অভয়ের নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়, কী একটা মহাপাপ করে ফেলেছে সে।

ওদিকে তিন বোনের কি একটা গুলতানি চলছিল। ওরাও একেবারে চুপ হয়ে গেল।

ওদের বুড়ী মাও আশেপাশেই আছে কোথাও। বুড়ী সারাদিন ওই মুচকুন্দ গাছের মোটা গোড়া থেকে শুরু করে এখানে সেখানে ঘুঁটে দিয়ে ও গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে, না-বিষ না-মধু সেই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি তার নিয়ত সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা ঘুরছে।

অভয় এই মুহূর্তের সংকোচ ও আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তোলার জন্যই যেন দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে, খাকি ঝাল-ঝোব্বা খোলে। গামছা কাঁধে নিয়ে হুস হুস করে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে এসে বসে। অনেক দিন পরে বিকেলের দিকে শরীরটা ক্লেদমুক্ত হয়ে একটু আরাম পায়। কিন্তু মনের মধ্যে থাকে একটা বিষের খচখচানি।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির বনে তিন বোনের মূর্তি ভেসে ওঠে। খালি গায়ের ওপর কাপড় জড়ানো। তিনজনই সদ্য বাঁধা মস্ত খোঁপায় দিয়েছে চন্দনের বিচির মতো লাল মটর দেওয়া সস্তা কাঁটা। সেগুলি যেন কুণ্ডলীপাকানো কাল-সাপিনীর চোখের মতো জ্বল জ্বল করে।

আর আশ্চর্য। এতখানি বয়সেও ঘোচেনি কারো লালিত্য। যৌবনের জোয়ারে ধরেনি ভাঁটার টান। জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত সুউচ্চ রেখায়।

তবু যেন মনে হয় একটা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে তাদের। নিমি যেন এক ছেলে-মরা মা, বিনি মন-গোমরানো বৌ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।

তিন বোন যেন তিন সই। মিটি মিটি হাসে, আড়ে আড়ে চায়। তবু চাইতে পারে না। তিনজনে গায়ে গায়ে গিয়ে নামে পুকুরের জলে। ঢেউয়ে দোলে কচুরিপানা ফণা-তোলা কালনাগিনীর মতো।

অভয় চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারে না। জানলা থেকে সরে আসব-আসব

করেও সময় বয়ে যায়। না দেখতে চেয়েও দেখে ছপছপ শব্দে গা ধুয়ে ফিরে চলেছে তিনজনা। না হাসি না হাসি করেও ফিক করে হেসে উঠে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে যায় সমস্ত জায়গাটা।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে চমকে ওঠে অভয়। পেছনে দেখে বুড়ীমা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের আকাশের দিকে। থরথর করে কাঁপছে অতিকায় গিরগিটির মতো গলার চামড়া। অভয় ফিরে তাকাতে ফিসফিস করে বলে, 'বুকের মধ্যে ধুকধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা রাখি, যাই কোথা। খালি তরাশে তরাশে মরি।' বলেই বুড়ী বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। অভয়ের মনে হয় সে পাথর হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বস্তির গণ্ডগোল হাসি ও হল্লা। ঢোলক অথবা খঞ্জনির বাজনা।

এমনি চলে কয়েক দিন। রোজই অভয় ফিরে আসে বিকালের ছুটির পর। আসব না করেও আসে।

কয়েক দিন পর, বিকেলে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকে অভয় থমকে দাড়াল। চোখের সামনে যেন এক অবিশ্বাস্য বস্তু দেখে চমকে উঠল। দেখল অ্যালুমিনি-য়ামের গেলাসে খয়েরী রঙের ধূমায়িত চা। চা? চা-ই তো, হ্যাঁ। মনে হল গেলাসটা সাগ্রহ চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখে।

অভয় একবার ভাবল, পেছন ফিরে দেখে। কিন্তু দেখে না। যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে ধীরে সুস্থে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চুমুক দেয়। ঢোঁকে ঢোঁকে উষ্ণতাতে বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। মনটা ভোর হয়ে আসে।

তারপর শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেলাস নিয়ে গলিটা পেরিয়ে একেবারে ভেতরের উঠোনে এসে পড়ে। শূন্য উঠোন। কেউ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল তিন বোন মাথা নিচু করে কাজে ভারী ব্যস্ত। অভয় বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে করেও কথা আসে না মুখে। কয়েক মুহূর্ত এমনি চুপচাপ।

হঠাৎ টুনিই বলে, 'তুই দিয়ে এসেছিলি বুঝি?'

নিমি বলে, 'আমি কেন, বিনি তো।'

বিনি বলে, 'ওমা, কী মিথ্যুক। আমি কেন বামুনের ছেলেকে চা দিতে যাব।'

অভয় দেখে কালো চোখের চোরা চাউনিতে হাসির চকমকানি। হাসিটা তারও মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'না হয় গেলাসটা হেঁটে হেঁটেই গেল, তাতে বামুনের জাত যাবে না। বামুন আর কোথায় একেবারে জাত ড্রাইভার। সারা দিনের খাটুনির পর বিকেলে এরকম, মানে একটু চা পেলে……আচ্ছা আমি না হয় চা চিনিটা……।' বলে সে হেসে ফেলে।

ততক্ষণে তারা তিন বোন উচ্চ হাসিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। টুনি বলে, 'বিনি, তু-ই না হয় চা-টা দিস্।'

বিনি বলে, 'নিমি, তুই তা হলে তুধটা দিস্।'

নিমিও বলে, 'চিনিটা তাহলে টুনির।'

তারপরে আবার হাসি। এবার অভয়ও না হেসে পারে না। এই ভাঙা বাড়ির বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধ হয় এই প্রথম। যেন এখানকার চাপা-পড়া তুঃসহ অস্থিরতা একটা মুক্ত-দ্বার দিয়ে অবাধে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই হাসিটা থেমে এল বুকে ফিক ব্যথা লাগার মতো। ফিরে এল সেই রুদ্ধ অস্থিরতা।

নিমি বলে, 'বিনি, মা কোথায় ?'

বিনি বলে, 'মাঠের ধারে গোবর কুড়োতে গেছে। পালের গোরু ফিরবে এবার।'

তবুও কেউ চাপতে পারে না একটা ছোট্ট নিশ্বাস। তিনজনের মধ্যে মূর্তি ধরে ওঠে হতাশা।

পথের মাঝে বেগড়ানো গাড়ির বেয়াকুব ড্রাইভারের মতো অবাক ও মুগ্ধ হয়ে ওঠে অভয়।

কিন্তু এমনি করেই আড় ভেঙে যায়। খুলে যায় সেই রুদ্ধ দ্বার। বাধা-মুক্ত জোয়ার এগোয়। কখনো সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে, কখনো এড়াবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

প্রথমেই তিন বোনের অসীম কৌতূহল, কোথায় বাড়ি, কে কে আছে।

অভয় বলে, 'কে আবার থাকবে। ছোট ছোট ভাই-বোন আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকে সবাই আমার পোষ্য।'

'আর বিয়ে ?'

'বিয়ে কে দেবে আর কে করবে ? কথায় বলে, নিজের জোটে না, আবার শঙ্করাকে ডাকে।'

তারপর এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে, 'তোমাদের রোজগার কি রকম ?'

নিমি বলে, 'ছাই ! খেতে জোটে না।'

বিনি বলে, 'তিনজনের খাটনিতে রোজ কুল্লে দু-টাকার বেশি নয়।'

টুনি বলে, 'আর মা ঘুঁটের পয়সা জমিয়ে রাখে।'

'কেন ?'

'কেন ? আমাদের বিয়ে দেবে বলে।' বলে তারা তিনজনেই তীব্র বিদ্রূপ ভরে হেসে ওঠে। হাসিটা অভয়ের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে বলে, যেন খানিকটা আপন মনে 'হবে না কেন, হবে।'

হবে ! যেন এমনি বিচিত্র কথা তারা কোনোদিন শোনেনি ; এমনি উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিন বোন তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে।

একটু পরেই টুনিই বলে, 'আমরা তো শঙ্করী ! নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে ?'

অভয়ের জিভ আড়ষ্ট, বুকে পাথর চাপা। সত্যি, কে ডাকবে, কেমন করে ডাকবে। এ বিশ্ব সংসারে সকলের গলা চেপে রেখেছে যেন কোন্ অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

ফোটে না, তবু ফোটে। রাত্রির নিরালা অন্ধকারে ফুল ফোটার মতো সে নিঃশব্দে ফোটে ! এখানে গড়ে ওঠে আর এক নতুন সংসার। তিন মেয়ে আর এক ছেলের বিচিত্র সংসার।

যাকে বলে ডেয়ো ঢাকনা, তাই একে একে জড়ো হয় অভয়ের ঘরে। আলগা উনুন আসে, কিনে আনে হাতা, খুন্তি, হাঁড়ি, থালা, গেলাস।

আর দশটা বাড়িতে যা সম্ভব হয়ে ওঠে না এখানে তাই হয়। সকাল বেলাই ভাত খেয়ে কাজে যায় অভয়। ভোর রাত্রে উনুন ধরে। মোটর মিস্তিরি কেন এ-সব পারবে। পালা করে আসে তিন বোন। আসে ভোর রাত্রের আবছায়ায়, বাসী খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে। আবার আসে সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। এসে অভয়কে সরিয়ে নিজেরা বসে রান্না করতে। এক সঙ্গে নয়, পালা করে আসে।

ঘরে নিজেদের কাজ আছে, তা ছাড়া সেই সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির খবরদারিও আছে। তবু আজ আর বাঁধ মানে না। অভয়কে ঘিরে এ তিনজনের আর এক নতুন চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবারিত হয়ে খুলে যায় চাপা প্রাণের দরজা। অভয়ের রান্না খাওয়া, আর জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিজেরা কেচে দেয়। সবটুকু করেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না। এত আছে যে, দিয়েও প্রাণ ভরে না। জাত-বেজাতের বাধা ডিঙিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে বসে খাওয়ায় তারা অভয়কে।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গ আঁতিপাঁতি করে দেখে। চোখে তার মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি।

অভয় বলে, 'কী দেখছ ?'

নিমি বলে, 'দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরি, তবু তোমার শরীরটা ভালো করে তুলতে পারছি না।'

অভয় হেসে বলে, 'তোমার খালি ঐ ভাবনা। আর কত হবে। ড্রাইভার কি দুধ-গোলা পুরুষ হবে।'

নিমিও হাসে। মন বলে, হ্যাঁ, দুধ-গোলা পুরুষই হবে। ঢলঢল কান্তি, গোরাচাঁদ হবে অভয়। আর নিমি সবই ফেলে দেবে সেই গোরাচাঁদের পায়ে।

ভাবতে গিয়ে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে ওঠে।

অভয় সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। বলে, 'কি হয়েছে নিমি ?'

নিমি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

এমনি বিনিও আসে। সে যেন একটু রহস্যময়ী। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে খালি অভয়কে বলে, এটা দাও, সেটা দাও, তারপরে, 'আজকে বাজার থেকে এই এনো, সেই এনো।' খেতে গিয়ে, অভয়ের আপত্তি থাকলেও যা প্রাণ চাইবে, তাই দেবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে আর নিঃশব্দে কেবলি কাছে বসেও আড়ে আড়ে চেয়ে টিপে টিপে হাসবে। যেন মনের তলার গুরু কথা তার ঠোঁটের কোণে ঝিকিমিকি করে।

তা দেখে এই হাসিটার মতোই অভয়ের বুকটা ধিকি ধিকি জ্বলে। জ্বলুনিটা লাগে এসে রক্তস্রোতে। ডাকে 'বিনি।'

বিনি তাকায়, তার অপলক হাসি চোখে বিচিত্র ইশারা। সুগঠিত ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপা। চাপা গলায় বলে, 'বলো।'

'কিছু বলছ?'

তেমনি তাকিয়ে বিনি বলে, 'কি আবার।' একটু থেমে আবার বলে, 'তুমি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।'

বল্‌তে পারে না, তাদের মন খাঁ খাঁ করে। সেটুকু কান পেতে শোনে বিনি। শোনে, বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোলে পাড়চাপা গুমরানি। তাকিয়ে দেখে অভয়ের বুকটা।

অভয় বলে, 'আমার কাজে মন বসে না। মনটা যে কোথায় থাকে।'

যেন না জানার জন্যেই দুজনে চোখে চোখে তাকিয়ে হাসে।

আর টুনি যেন এক দজ্জাল কিশোরী বৌ। তার ক্ষণে হাসি, ক্ষণে রাগ। তার হাসি অবাধ, আবার রাগও করবে। ছুটে ছুটে কাজ করবে। কাজের কি হল না হল তা দেখবে না। দিশেহারা কাজের মধ্যে সার হয় অভয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা। মনের মতোটি না হলে ধমকাবে।

অভয় তার কাছটিতে বসে বলে, 'এই তবে রইলুম বসে, থাকল মিলিটারি কারখানা আর চাকরি।' টুনি অমনি খিলখিল করে হাসে। কখনো এলো চুলে, কখনো খোঁপা নেড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। দেখবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর থর থর কাঁপবে বাঁধভাঙা শরীর।

অভয়ও মেতে ওঠে তার সঙ্গে। হাসে, রাগ করে। হয়তো আল্‌গোছে টুনির ঘাড়ের কাপড় মাথায় তুলে ঘোমটা করে দেয়।

টুনি অমনি যেন সত্যি তীব্র অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকিয়ে চায়। চোখের কোণে বকুনি ও কান্নার ঝিলিমিলি খেলে।

অভয় বলে, 'কি হল টুনি?'

কি হল তাই ভাববার চেষ্টা করে টুনি। কিছু টের পায় না, শুধু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে, অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর; নিজেকে দেখে, সে যেন অভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য লজ্জায় বিচিত্ররূপে রূপবতী হয়ে ওঠে টুনি। বলে, 'কি জানি কি হয়, জানিনে ছাই!'

তারা কেউ জানে না তাদের কি হয়েছে। চারজনে ডুবে আছে আকণ্ঠ। নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা চারজন মানুষ।

অভয় না থাকলে সত্যি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। সময় যেতে চায় না। তিনজনের বুকে একই তাল। চোখে একই জিজ্ঞাসা। তিনজনেই সারাদিন কান পেতে শোনে পদশব্দ। এই সুযোগে তাদের চাপাপড়া প্রাণের অস্থিরতাটা যেন ফিরে আসতে চায়। টুনি হয়তো গুন্ গুন্ করে ওঠে—

আর রইতে নারি হয়ে নারী,
তোমার বাঁশি শুনে গো।
আর চলতে নারি হয়ে নারী
এ কী বিষম দায় গো।

বিনি তাতে গলা দেয়, নিমি সব ভুলে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বেজে ওঠে সেই পদশব্দ। বাজে যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

অভয় তিনজনকে আলাদা করে ভাবতে পারে না।

একজনকে ভাবতে গেলে আর একজন আসে। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। এর মমতা, ওর হাসি, তার অভিমান। তিনে মিলে যেন একটাই।

তবু একটা নয়। এ সংসারের বিচিত্র নিয়মের মতো তিন বোনের আলাদা সত্তা যেন তলে তলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তাদের প্রাণের আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। অভয়কে তারা তিনজনে তিন রকমে টানে।

এমনি সময়ে একদিন বেলা দশটায় অসময়ে গলিতে বেজে উঠল বুটের শব্দ। অসময়ে কেন? একে একে সব ফেলে ছুটে এল তিন বোন। দেখল শিকল-দেওয়া বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে। কি হয়েছে, অসুখ? বাড়ির দুঃসংবাদ?

অভয় তাকায় তিনজনের দিকে, ফিক ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যায় বুক। বলতে গিয়ে কথা ফোটে না মুখে। চোখের দৃষ্টি নেমে আসে। ভাবে, যাক বলব না। সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাইবোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ। ওদের যে আর কেউ নেই। সে বলে, যেন চেপে আসা গলায় কোনো রকমে বলে, 'ট্রান্সফার, মানে বদলি করে দিলে, পানাগড় ডিপোতে!'

বদলি! সামনে তিন মেয়ের মুখ নয়, তিনটি প্রাণহীন মৃত মুখ। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ, চলৎশক্তিহীন। যেন বুঝেও বোঝেনি সমস্ত ব্যাপারটা।

হু হু করে হাওয়া এল গলিটার অন্ধ সুড়ঙ্গে। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া। কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতেই মেঘলাভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুক্ষতায়।

অভয় বলল, 'যেতে হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। কালকেই জয়েন করতে হবে।'

যেতে হলে নয়, যেতে হবে। দুরন্ত হাওয়ায় সেই কথাটি যেন মর্মে মর্মে এসে বলে দিয়ে যায়।

নিমি, বিনি, টুনি—তিন বোন। ওদের চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমকে রয়েছে চোখে। বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলে আসছে।

অভয় আর তাকাতে পারে না। বুকটা মুচড়ে তারও গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। কোনো রকমে দরজাটা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফিরে আসে সেই অস্থিরতা। অদৃশ্যে সে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে ঘরে বাইরে। ছটফট করে মরে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে।

সব গোছগাছ হয়ে যায়। সেই স্যুটকেস আর বিছানা।

তিন বোন বুক চেপে দেখে উনুন, কড়া, খুন্তি, হাঁড়ি। সেগুলিও যেন তাদেরই মতো রুদ্ধ যন্ত্রণায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের গড়া ঘর। খেলা-ঘর। যাকে ঘিরে এই খেলাঘর সে চলে যায়, এ-গুলি পড়ে থাকে তাদেরই মতো।

তারপর অভয় আবার দাঁড়ায় তিন বোনের মুখোমুখি। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, ঠোঁট কেঁপে ওঠে। খালি শোনা যায়—

'যাচ্ছি, যাচ্ছি তবে।'

এই তিনজনের বুকের মধ্যেও হাহাকার করে উঠল বিদায় দেওয়ার জন্যে। ঠোঁট কাপল, বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল। পারল না। হাত বাড়িয়ে বুঝি ছুঁতে চাইল, পারল না।

হাওয়া এল। শূন্য ঘর! ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির মতো শীর্ণ পতাকাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কালকাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাশুটে

কচুরিপানা।

একদিন যেমন এসেছিল, আজ তেমনি পোশাকে, তেমনি ঠেকে ঠেকে হাতে আর ঘাড়ে বোঝা, চলেছে অভয়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবই ঝাপসা।

মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবার তাকাল। সেখানে এসেছে তিন বোন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে। কিন্তু চোখ অন্ধ হয়ে এসেছে। সামনে অন্ধকার।

অন্ধকার কানা গলিটাতে ঢুকে পড়ল অভয়। মোড়ের বাতিটা তাকিয়ে আছে এই দিকেই এক চোখে।

তারপর হঠাৎ একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখল, দেওয়ালের নোনা ইঁটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ী মা। কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

বিমল কর (১৯২১—) ॥ পালকের পা

সেই দুঃসহ দিনে, মধ্য বৈশাখে, যখন আকাশ গলানো-তামার মতন উজ্জ্বল, গাছ লতাপাতা ঝলসে যাচ্ছে, ফুল নেই, পাখিও ডাকে না তখন সে এল। একটি সারস পাখি যেন। তেমনি দুগ্ধধবল, নরম, উষ্ণ এবং আশ্চর্য সুন্দর। কেউ ভালো করে দেখেনি, কেউ বলতে পারছিল না, মহিলা বাঙালী অথবা বোম্বাইবাসিনী, পাঞ্জাবী, পারসী বা আর কিছু, অন্য কিছু। শুধু একটা গুঞ্জন উঠেছিল। পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায়, এই জঙ্গলে শাল পলাশ উপড়ে রেসকিউ আপিসের আর একটা ব্লক, আর একটা কোয়া-র্টারের পত্তনই এখানে সম্ভব ছিল এবং সেই অজুহাতে চুন, সুরকি, সিমেণ্টের গুঁড়ো উড়বে, উড়তে শুরু করবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। অথচ ও সব আদপেই কিছু না হয়ে এই মধ্য বৈশাখে বসন্তের হাওয়া বইবে আচমকা মন-আনমনা গন্ধ নিয়ে কে ভেবেছিল, কি করেই বা আশা করা যেতে পারত।

কানাকানি করছিল এরা, রেসকিউ আপিসের ক-জন ছোকরা নিজেদের মধ্যে এবং তিনজন প্রৌঢ় তাদের মধ্যে। আট-দশটা বেয়ারা চাপরাশীও আড়ালে আড়ালে। শুধু দুই অফিসারের মধ্যে কোনো চঞ্চলতা লক্ষ্য করা গেল না। তাঁদের মধ্যে একজনের এখন বিচলিত হবার মতন তাপ রক্তে নেই, এবং কোনো বিশেষ ঋতুর বাতাস কি পাখি কি ফুলের ওপর স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করার অনুভূতিও লোপ পেয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইনি। আপিসের আরাম কেদারায় বসে অবসর সময়ে মৃত্যুর পর আত্মার গতিবিধি পাঠ করেন।

আর অপর জন সেই সারস পাখির আত্মাকে আত্মসাৎ করে বসে আছেন। আছেন অতএব তাঁর কোনো চঞ্চলতা নেই, বিচলিত হবার কারণ ঘটছে না।

ইনি বাঙালী, উপাধি মিত্র। নৃপেন্দ্র মিত্র। আপিসে মিত্র সাহেব। এখনো যুবক। আটত্রিশের ওপারে বয়স যায়নি। মাংসল পুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ নন। রঙ কালো, মুখটা গোল, চওড়া কাঁধ, চোখ দুটো বন্য পশুর মতন। অবশ্য সে-চোখ ভয়ংকর বা ভীতিজনক নয়, দুরন্ত, তীক্ষ্ণ, চঞ্চল। যেন সব সময় উন্মাদনা খুঁজছে! মিত্র সাহেব কাজের লোক। অধ্যবসায়ী পুরুষ। শোনা যায়, লেখাপড়া ভালো শেখেননি। শুধুই দক্ষতা, চেষ্টা, উৎসাহ সম্বল ছিল। বিত্তহীন হয়েও সাগরপারের হাওয়ায় ক-বছর কাটিয়ে আসতে তাই বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এবং এখন একটি উচ্চপদে জাঁকিয়ে বসেছেন। অনলস কর্মঠ এই ব্যক্তিটির জন্যে ভবিষ্যতে আরো রাজকীয় সৌভাগ্য কিছু অপেক্ষা করছে, একথা বোঝা যেত। কথাটা বিশ্বাস করত রেসকিউ আপিসের ছোকরারা, বলাবলি করত। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি, মিত্র সাহেবের অমন স্ত্রী আছে, অমন সুন্দরী স্ত্রী, এবং সেই স্ত্রী এখানে আসবে এই জঙ্গলে, এই দুঃসহ দিনে, মধ্য বৈশাখে যখন সব ঝলসে যাচ্ছে, ফুল নেই, পাখিও না।

কিন্তু এল। কখন এল কেউ জানলে না। যাওয়া আসা, ঘোরা-ফেরার পথে ওয়াটার ট্যাঙ্কের উঁচু টিলার কাছে মিত্র সাহেবের ছোট বাংলোটায় কেউ কেউ তাকে দেখল আচমকা দূর থেকে এবং বর্ণনা দিলে এক সারসী উড়ে এসেছে।

সেই সারসীকে প্রথম ভালো করে দেখল মৃণাল, মিত্র সাহেবের স্টেনো টাইপিস্ট। আর দেখে দারুণ এক বিস্ময় এবং অভূতপূর্ব কেমন এক উত্তেজনা নিয়ে নিজের মধ্যে ছটফট করতে লাগল।

বুধবারের এক বিকেলে আপিস শেষ করে উঠব উঠব করছে মৃণাল, হঠাৎ জরুরী তলব এল মিত্র সাহেবের। চল্লিশ মাইল দূরে বসে হেডকোয়ার্টার থেকে তলব করেছে সেক্রেটারী। ক-টা ফাইল চাপরাশীকে আপিসের গাড়িতে তুলতে বলে মিত্র সাহেব শুধু একটা সিগার ধরিয়ে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন যেন। তারপর উঠে পড়লেন। ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রায়, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন মৃণালকে, আঙুল দিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা ছোট্ট একটা বেতের টুকরি দেখিয়ে, 'ওটা আমার বাংলোয় পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা কোরো তো চ্যাটার্জি।' কি ভেবে একটু থেমে আবার, 'বেটার হয় তুমি যদি নিজেই যেতে পারো। মিসেস মিত্রকে দুটো খবর দেবার আছে। ঐ ফলের টুকরিটা ওঁর বান্ধবী পাঠিয়েছেন।

কলকাতা থেকে, আর আমি হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।'

ফলের টুকরিটা ছোটই। গড়নটাও বাহারী। মৃণাল বেরিয়ে পড়ল হাতে ঝুলিয়ে। আর যেতে যেতে খুশি হচ্ছিল এই ভেবে, একটা সুযোগ তার ঘটে গেছে। পরে হয়তো এ-সুযোগ সকলেরই ঘটবে, কিন্তু উপস্থিত সে প্রথম যে আর খানিক পরে সেই সারসীকে দেখতে পাবে সামনা-সামনি। যাকে নিয়ে এত কানাকানি, ফিসফাস, রূপকথা।

বনতুলসী আর ঝোপঝাপ পাশ কাটিয়ে মন্থর পায়েই হাঁটছিল মৃণাল। হাঁটার তালে তালে টুকরিটাও দুলছে। বেতের বুনোনির ফাঁকে কমলালেবু আর নাশপাতি উঁকি দিচ্ছিল। কলকাতা থেকে আসছে। মিসেস মিত্রের নিশ্চয়ই খাবার টেবিলে কমলালেবু দরকার হয়। দামটাও নেহাত কম হবে না, এই গরমে কমলালেবুও কলকাতার বাজারে ঝুড়ি ঝুড়ি আসে না নিশ্চয়ই। কিন্তু দামে কি যায় আসে। কমলালেবু খেতে তিনি ভালবাসেন। তাঁকেই মানায় তাঁর মতন অবস্থায়।

এসব কথা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে সাজিয়ে বড়ো একটা ভাবছিল না মৃণাল। মনের মধ্যে আসছিল, যাচ্ছিল। এবং বেশ হালকা মনেই ভাবতে পারছিল। যদিও আড়ালে একটা তুলনা যে একেবারেই না ছিল এমন নয়। আর সে রকম তুলনা আশি টাকা মাইনের টাইপিস্ট কি কেরানী হামেশাই করে থাকে।

কিন্তু ওসব আর ভাবতে ভালো লাগছিল না। বরং কি দেখবে, কেমন করে কথাগুলো বলবে এবং প্রথমে হাত তুলে নমস্কার করবে কিনা, মৃণাল তাই ভাববার চেষ্টা করল। পাছে হাস্যকর কিছু করে বসে তাই মনে মনে এ-মহড়া।

গেটের কাছে এসে থামল মৃণাল। একবার চোখ তুলল আকাশে। পশ্চিম কোণে এক জায়গায় কুমকুমের রঙ লেগেছে। শিশুগাছের ডালে কিচির মিচির করছে ক-টা পাখি। একটু হাওয়া দিয়েছে।

বুকটা অযথাই একবার ধুক ধুক করে উঠল। তাকাল মৃণাল। কেউ কোথাও নেই। বাংলোর বারান্দায় দুটো চেয়ার মুখোমুখি করে সাজানো, একটা নিচু গোল টেবিল। ঘরের দরজা খোলা, শার্সি গুটোনো, পর্দা ঝুলছে। কোথাও একটা বাতি জলছে না। কেউ নেই।

বারান্দার নিচে এসে এদিক-ওদিক চাইল, খুঁজল মৃণাল। একটা চাকর

কারুরও চোখে পড়ছে না। কাকে ডাকবে, কি নাম ধরে ডাকবে ঠিক করতে না পেরে বারান্দায় উঠে এল।

একটু দাঁড়িয়ে এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছিল, সিমেন্টের বারান্দায় ভারী জুতোর শব্দ তুলে এবং আশা করছিল এই শব্দে ঘরের ভেতর যদি কেউ থাকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে।

হলও তাই। দক্ষিণের ঘরে টুক করে বাতি জ্বলে উঠল, পর্দার তলা দিয়ে, পাশ দিয়ে একটু আলো এসে পড়ল বারান্দায়। আর মৃণাল সেই ঘরের সামনে, পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে শুনল অত্যন্ত মিহি, মিষ্টি একটা গলা গুন গুন করে উঠছে।

সেই গুন গুন একটু থেমেছে কি খুক্ করে একবার কাশল মৃণাল। আরো একটু সরে এল; পর্দাটা তখন গা ছুঁয়েছে। ওপাশ থেকে সেই মিহি গলা একটা হাসির ঢেউ তুলল এবার এবং হাসির ফাঁকে বলতে বলতে আসছিল কি একটা কথা যেন, যা মৃণাল শুনেও যেন শুনতে, বুঝতে পারছিল না। আর কথা শেষ হল যখন, তখন পর্দা সরে গেছে এবং পলকের মতো প্রচণ্ড একটা বিস্ময় থমকে দাঁড়িয়ে আবার মিলিয়ে গেছে। পর্দাটা দুলছে একটু।

কিন্তু ততক্ষণে চোখ আর মনের ক্যামেরায় সেই ক-টি পলক ধরা হয়ে গেছে। স্বপ্নেও এমন ছবি দুর্লভ। সেই সারসী এসেছিল এবং ঘরের আলোয় দাঁড়িয়ে সরিয়ে নিয়েছিল পর্দা। ধক্ করে একটা গন্ধ লেগেছে নাকে, মিষ্টি গন্ধ, কোনো দামী সাবানের, সুগন্ধী স্নানবারিরও হতে পারে। আর দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবায় তখনো জলের ফোঁটা লেগে রয়েছে এবং বুকে। মাঝ-বুক থেকে গোড়ালির নিচু পর্যন্ত সাদা টার্কিশ টাওয়েলটা ওর মুঠোয় ধরা ছিল। চকিতে সেই শ্বেত-স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। অথচ মনে হয় যে যায়নি, লুকোনো হাওয়া থেকে আবার কখন খসে পড়বে। এখনো গন্ধ আছে ভুর ভুর, এখনো একটা তুলো শরীর যেন পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে হাসছে।

বিমূঢ় ভাবটা কাটতে সময় লাগল মৃণালের তারপর ভয়ংকর অস্বস্তি। সংকোচ এবং কেমন একটা ভয়। ঘটনাটা আকস্মিক। অপ্রত্যাশিত। মৃণাল কি করে জানবে উনি সবে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। আর স্পষ্টই বোঝা গেল, উনি ভাবতেই পারেননি, এ-সময় বারান্দায় মিস্টার মিত্র ছাড়া আর কেউ আসতে পারে, থাকতে পারে। যদিও এভাবে স্বামী-অভ্যর্থনা

অস্বাভাবিক। এবং হতে পারে যেতে যেতে নিজেকে আধো আড়াল দিয়ে স্বামীকে কিছু রহস্য করে বলতে এসেছিলেন। আবার এ-ও হতে পারে, এই সারসীর রকম আলাদা।

কিছুই স্থির করতে পারছিল না মৃণাল। ভাবনাগুলো ধোঁয়ার মতন ভেসে উঠে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। আর আড়ষ্ট হয়েই বসেছিল এবার চেয়ারে। কারণ ইতিমধ্যে একটি চাকর এসে বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। বসতে বলেছে। বসার ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা সাহস হচ্ছিল না। এরপর মুখোমুখি হতে বাধছিল। কিন্তু উপায় কি!

অথচ মহিলাটি এলে দেখা গেল তার মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই। কিছুই যেন ঘটেনি। ঘটলেও তা ভুলে গেছে।

প্রথমে মৃণালের সামনা-সামনি চেয়ারটায় হাত দিয়ে দাঁড়াল, মৃণাল ভালো করে চোখ তুলতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। কোনো রকমে খবর দুটো বলল। এক নিশ্বাসে। গলা কাঁপছিল এবং বুকটা ধক ধক করছিল। মৃণালের কথা শেষ হয়ে এলে এবার অন্য পক্ষ বললে, বলার মধ্যে একটু হাসি ছিল, অবাক করে দেবার রহস্য, 'কে, মৃণাল না!'

নাম শুনে একটু চমকে উঠল মৃণাল। অবাক চোখে তাকাল। এবং চিনতে দেরি হল না। 'তুষার!' অস্ফুট কণ্ঠে বললে ও।

ততক্ষণে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে তুষারকণা—'কী আশ্চর্য তুমি এখানে!' তুষারকণা বললে হাতের বালাটা মণিবন্ধের দিকে আরো একটু ঠেলে দিয়ে মৃণালের মুখে চোখ রেখে।

ঠিক এই প্রাথমিক প্রশ্নটা মৃণালও করতে পারত। কিন্তু করলে না। মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ।'

'চাকরি করছো তাহলে।'

'করছি। তোমার স্বামী—।' বলতে গিয়ে কথাটা আটকে গেল, জিভটা হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল মৃণালের। একটু থেমে বাক্য-বিন্যাসটাকে পালটে নিয়ে বললে 'মিস্টার মিত্রের আমি স্টেনো টাইপিস্ট।'

কেমন মেয়ে তুষার, এ-কথা শুনে মৃণালের অবস্থাটা একটুও বুঝল না, বোঝার চেষ্টা করলে না। উল্টে কলহাস্যে এই ফাঁকা বারান্দা ভরিয়ে দিলে।

'নৃপেন তোমার বস্।' স্বামীর নাম ধরল তুষার। কানে একটু লাগল মৃণালের। পরক্ষণেই মনে হল, এটা আজকাল চলতি হচ্ছে। ভালোই লাগে

শুনতে। তুষার থামেনি বলে যাচ্ছিল, 'তাতে কি, আমি তোমার বসের বৌ হয়েছি পরে, তার অনেক আগেই আমরা ক্লাসমেট ছিলাম। সেই পুরনো সম্পর্কটাই তো ভালো। তুমি অত সংকোচ করছ কেন?'

তাহলে মৃণাল যা ভাবছিল তা নয়। তুষার তার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে এবং বুঝেছে বলেই সহজ করতে চাইছে।

'তুমি এখানে আছ জানলে আগেই খবর দিয়ে পাঠাতাম।' তুষার বললে, 'সারাদিন একা আছি। কথা বলার লোক নেই।'

'কেন মিস্টার মিত্র।'

'তিনি কথার চেয়ে কাজ বেশি পছন্দ করেন।' বলে কেমন এক রহস্যপূর্ণ হাসি হাসল তুষার ঠোঁট টিপে।

'আর তোমাকে!' অত্যন্ত অসতর্কভাবেই এই পরিহাসটুকু করে ফেলল মৃণাল।

'বললাম তো।' এবার তুষার ঊর্ধ্ব অঙ্গে বিচিত্র এক হাসির ঢেউ তুলে উঠে দাঁড়াল, 'বোসো, চা খেয়ে যাও। আসছি।'

চা খেতে খেতে এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক চোখে তুষারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মৃণাল। আরো সুন্দর হয়েছে তুষার। আগে দীর্ঘাঙ্গী হলেও একটু কৃশ ছিল, এখন যেন তার শুক্লপক্ষের পূর্ণতা এসে গেছে। গালে, গলায়, কণ্ঠায়, বুকে, বাহুতে মসৃণ রেখা এঁকে বেঁকে মাখন-কোমল মেদ লেগেছে। রঙটা যেন আরো ধবধব করছে, সারসীর ডানার মতোই। তেমনি দীর্ঘ গ্রীবা। আর কালো চোখ, কালো চুল। দুটি লালচে ঠোঁট, সাদা ঝকঝকে দাঁত।

তুষারের গায়ে যে শাড়িটা রয়েছে এখন, তার রঙ বেলফুলের মতন। আর ব্লাউজের রঙ পাতা-সবুজ। গলায় চিকচিক করছে হার। হাতে বালা। একটি আংটিও। অপরূপ একটি ছবি হয়ে সামনে বসে আছে তুষার। তার অঙ্গের ছন্দে পঁচিশ বছরের যৌবন স্রোত নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আর কখনো কখনো উচ্চকিত হাসিতে সেই স্রোত যেন আছড়ে পড়ছে তটে। একটি নিটোল বুক তখন থর থর করে কেঁপে যাচ্ছে।

সব দেখেছে মৃণাল। কখনো সরাসরি তাকিয়ে, কখনো আড়চোখে।

'আমি যাই।' বললে মৃণাল। চা-খাওয়া শেষ হলে।

'যাবে?' এত তাড়াতাড়ি কেন? বোসো না, আরো খানিকটা গল্প করি। না-হয় চলো একটু বেড়াই।'

অসম্মত হবার কারণ ছিল না। ওরা বেড়াল দুটিতে উঁচু টিলার উপর খানিকক্ষণ।
নিমফুলের গন্ধ তখন ভেসে আসছিল। আর উষ্ণ হাওয়া বইছিল।
যাবার সময় তুষার বললে, 'যখনি তোমার ইচ্ছে হবে এসো।' একটু থেমে আবার, 'আর এসে নাম ধরে ডাকবে, বুঝলে বোকা।' সেই অন্ধকারে ঠোঁট টিপে হেসে মৃণালের হাতে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল তুষার।

ফেরার পথে আর যেন পা উঠছিল না। কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করছিল মৃণাল। ক-বারই দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। অদ্ভুত এক বেদনাও আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছিল।
আর মৃণাল ভাবছিল ওরা কী সুখী! ওরা দুজনে—তুষার এবং তার স্বামী। জীবনটাকে খুব সহজে স্বপ্নের মতন করে নিতে পেরেছে। ফুলের বিছানায় শুয়ে জোড় বেঁধে যেন চাঁদ দেখছে আর ঘ্রাণ নিচ্ছে পরস্পরের।
কেন নেবে না? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিচ্ছিল মৃণাল, হ্যাঁ, নেবে। নেওয়াই উচিত। কেননা ওরা এর উপযুক্ত। মিত্র সাহেবের চেয়েও যোগ্যতাটা যে তুষারের বেশি, মৃণাল সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছিল তুষারের যোগ্যতা। আর বার বার স্বীকার করছিল তার যোগ্যতা অসাধারণ।
হ্যাঁ, সারসীর শুভ্র কোমল দেহ নিয়ে তুষার চুপ করে নেই। তার শরীরের তাপ দিয়ে আরেকজনকে নিত্য উষ্ণ করছে। বুঝে ফেলেছে তুষার মিত্র সাহেবের বন্য দৃষ্টির উজ্জ্বলতা কোথায় স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর উন্মাদনা কেমন করে শান্ত হয়ে আসে।
তুষারের কয়েকটা কথাই বার বার মনে পড়ছিল মৃণালের। এবং তার অর্থ যেন একটু একটু করে বুঝতে পারছিল ও। তুষার বলেছে, তার স্বামী কাজের মানুষ, কথা নয় কাজ ভালবাসে। কথাটা বলে তুষার হেসেছিল। মৃণাল বুঝতে পারছে এতক্ষণে এই কাজ কি, কেমন ধরনের কাজ! অর্থাৎ এ-কাজ অন্য ধরনের। প্রজাপতি তার পাখায় রঙ চড়াবে। বসন্ত গাছে গাছে ফুল ফোটাবে এই তার সত্যিকারের কাজ। আর তুষার তার পঁচিশ বছরের প্রতিটি অঙ্গকে যৌবনের রসে সিক্ত করে জ্বলবে প্রখর হয়ে, জ্বালাবে স্বামীকে—এই কাজ তার। মিত্রসাহেব, অনুমান করা চলে, এমনটাই চান। চেয়েছেন। চাইছেন। আর তুষার তাই দিচ্ছে। অনেক ঘাম ফেলে,

ক্লান্ত ফুসফুস নিয়ে স্বামী ফিরে এলে তুষার হয়তো তাই অমন নিরাবরণ হয়েই আসে, সাবানের গন্ধ তুলে এবং গ্রীবায় মুক্তার মতো জলবিন্দু মেখে। প্রতি দিনে সে বিচিত্র, সে বর্ণময়ী। মোহিনী। মিত্র সাহেব এ মোহ ভালবাসেন। কোন্ পুরুষই না ভালবাসে? মৃণাল নিজেও কি? প্রশ্নটা মনে হতেই কেমন যেন চমকে ওঠে মৃণাল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর চোখ তুলতেই দেখে তার কোয়ার্টার সামনে। অন্ধকারে ডুবে আছে।

বাইরে উঠোনে মাদুরে বসে কি যেন একটা সেলাই করছিল কমলা। টিমটিমে আলোয় একতাল ছায়ার মতনই দেখাচ্ছিল তাকে। পা ছড়িয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে বসে। মৃণালের পায়ের শব্দ তার কানে গেলেও চোখ তুলল না। উঠোনের ফালিটুকু এগিয়ে ঢাকা বারান্দায় জুতো জোড়া খুলতে খুলতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকাল মৃণাল। অসহ্য লাগছিল সমস্ত দৃশ্যটা। একটা পঙ্গু গোরু কি ছাগল যেন আস্তাকুঁড়ের পাশে বসে জাবর কাটছে।
ঘৃণাই হচ্ছিল মৃণালের। বারান্দায় বা উঠোনে থাকলে কমলার ওই কদাকার ভঙ্গিটা পাছে চোখে দেখতে হয় তাই অসীম বিরক্তি চেপেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। যদিও ঘরে অসহ্য গরম।
অন্যদিন আপিসের জামাকাপড় ছাড়বার সময় ডাক দেয় কমলাকে। আজ আর ডাকল না। আলনা থেকে ভু-পাট করা ধুতিটা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল।
এতক্ষণে কমলা এল। এসেই দেখল স্বামীকে। ওর হাতে খয়েরী রঙের একটা লুঙ্গি। বললে, 'ওমা কাপড় ছেড়ে নিয়েছ। আমি আবার এটা সেলাই করছিলাম; তোমার আকখুটে ধোপায় বাপু কি করে যে এত কাপড় ছেঁড়ে বুঝি না।'
মৃণাল চুপ। সস্তা দামের একটা সিগারেট পড়েছিল দেড়হাতের টেবিলটার ওপরে। ধরাল সেটা।
আলনায় লুঙ্গি রেখে কমলা এবার একটু কাছে এল।
'আজ এত দেরি যে! সামন্তবাবুদের সঙ্গে তাস খেলায় মেতেছিলে বুঝি!'
ঘুরতে ফিরতে ততক্ষণে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়েছে কমলা। স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরেছে, 'তাসে মত্ত হয়ে বাবুদের ঘরের কথা মনেই থাকে না! আম পুড়িয়ে শরবত করে রেখেছিলুম। বিকেল বিকেল এলে দিতাম। রাত

হচ্ছে দেখে খেয়ে ফেললুম নিজেই।'

জলের গ্লাসটা নিল না মৃণাল। কমলার কথার উত্তরে মনে হল বলে, ঘরে ফিরবে কোন্ টানে! কী রূপের ধুনুচি জ্বালিয়ে রেখেছ তুমি!

মৃণালকে এত চুপচাপ দেখে কমলা খানিকটা অবাক হল।

'জল খাবে না?'

মাথা নাড়ল মৃণাল। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল কমলা।

'হল কি তোমার?' কমলা শুধোল।

'কিছু না।'

'তবে এত চুপচাপ গম্ভীর যে!' স্বামীর আরো একটু কাছ ঘেঁষে এল কমলা।

ঘামে ঘামাচিতে গলা কণ্ঠা সব ভরে গেছে কমলার। চুলকে চুলকে লাল করে ফেলেছে। একটা ঘায়ের মতোই দগদগ করছিল। এবং চিট কাপড়ের গন্ধ আসছিল নাকে। স্ত্রীকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে দিতে বললে মৃণাল, 'যাও তো, ঘ্যান ঘ্যান কোরো না কানের কাছে। যাও আর একটা কিছু ছেঁড়া-খোঁড়া টেনে নিয়ে সেলাই করতে বসো গে।'

হয়তো আহত হল কমলা। কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সত্যিই ও ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।

'শোনো।' রুক্ষ গলায় হঠাৎ ডাকল মৃণাল।

ঘুরে দাঁড়াল কমলা।

'তোমার আর কি অন্য শাড়ি নেই; ঐ চিট ছেঁড়াটা গায়ে জড়িয়ে রয়েছ?'

স্বামীর মুখে চোখ তুলে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কমলা। বললে, 'কেন কি হয়েছে এতে?'

'হবে আবার কি, বলছি, তুমি যে ময়না-ঝি নও বাড়ির বৌ সেটা বোঝা দায় হয়ে উঠেছে।' মৃণাল কেমন এক হিংস্র স্বরে বলে।

কমলার সহ্যসীমা এতক্ষণে ভেঙে পড়েছে। তিক্ত স্বরে জবাব কাটল, 'এনে দিও দশ-বিশখানা শাড়ি, বিবিয়ানা করব।'

কথাটা কানে যেতে রাগে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে মৃণাল। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের স্বরে বললে, 'কী চেহারা বা তোমার যে, শাড়ি এনে দিলেই অপ্সরী হয়ে উঠবে।'

এবার কলহটা আরো একটু গড়াল। যা মুখে এল মৃণালের বলে ফেলল। কমলাও জবাব কাটলে। শেষ পর্যন্ত কাঁদল।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়েও কেউ কারুর সঙ্গে কথা বললে না। কমলা বালিশের পাশে মুখ বুঁজে কয়েকবার ফুঁপিয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আর মৃণাল একটা রক্তহীন, বিস্বাদ শরীরের পাশে শুয়ে শুয়ে বিরাগে, ঘৃণায়, জ্বালায় ছটফট করতে লাগল।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছে মৃণাল: কোথা থেকে একটা পালক উড়ে এসেছে হাওয়ায়। তার গায়ে এসে পড়েছে। হাতে করে সেই পালকটা 'তুলতে যাচ্ছিল, ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। পালক কোথায়! মৃণালের হাত কমলার বুকের ওপর। হাতটা সরিয়ে নিয়েছে ও এবং চোখ বুঁজেছে আবার, যদি পালকের স্বপ্নটা আবার জোড়া লাগে এই ভেবে।

পুরো একটা দিন নিজের মধ্যেই তার চিন্তাগুলো চেপে রেখেছিল মৃণাল। কিন্তু আর পারল না। সামন্তকে বললে। বললে কথায় কথা টেনে এনে, তুষারের উল্লেখ না করেই।

'দেখো সামন্ত,' মৃণাল অনেক যুক্তিটুক্তি দেখিয়ে বললে, 'এই যুগটা অন্যরকম। ওসব হৃদয়, আত্মা, স্বর্গশান্তি—এসবের পুঁজিটুঁজি কাবার হয়ে গিয়েছে। এখন, এ সময় দুটো জিনিস আমরা বুঝি স্পষ্ট, এক সুখ আর অন্য যা তাকে বলা যায় উন্মাদনা। এ দুটোর অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তোমার আমার আশি কি একশো টাকার মাইনেতে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের মুখ দেখার উপায় নেই এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে আমরা জানি না, অল্পের মধ্যেও কত রকমে সুখ পাওয়া যায়। না, না বাইরে নয়, ঘরের মধ্যেই এসব ছোট খাট সুখ, উৎসাহ পাওয়া যায়। তোমার আমার স্ত্রী ইচ্ছে করলে, তাদের স্বামীদের কি আর তা দিতে পারে না। পারে।'

সামন্ত কিছু বলছিল না। শুধু অবাক হয়ে বন্ধুকে দেখছিল।

বন্ধু মৃণাল বলছিল, 'ওসব সূক্ষ্ম প্রেম-টেম বাদ দাও। আমি ভদ্রসন্তান, বিবাহিত পুরুষ। আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাসান্তে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে হয়। আমার ফুর্তি পাবার জগৎটা খুব ছোট্ট। এবং আমাকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে, টু চার্জ মাই এনার্জি কি আছে, কে আছে? হ্যাঁ, এক শুধু আমাদের স্ত্রীরা আছে। তোমরা খুব বলো, মেয়েরা পুরুষকে শক্তি যোগাবে, উৎসাহ দেবে। কিন্তু আমাদের মেয়েরা কী দেয়। কয়লা, ঘুঁটের ধোঁয়া, হলুদের ছোপ, পানের পিচে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের হাসি। অ্যাণ্ড ছাটস্ অল।'

'কি করাতে চাও আমাদের বৌদের দিয়ে?' সামন্তর মজা লাগছিল। একটা কাঁচি সিগারেট বন্ধুকে দিয়ে নিজেও ধরাল।

'কি চাই!' মৃণাল যেন অভূতপূর্ব কিছু লুকিয়ে রেখেছে এমন মুখভঙ্গি করে একটু রহস্যর হাসি হাসল। তারপর বললে চুপিচুপি তুষারদের কথা।

সামন্ত বিস্ফারিত চোখে চুপ করে বসে থাকল। মৃণাল তার কথার উপসংহার টানল, 'তুমি যাই বলো, আমি বিশ্বাস করি মিত্র সাহেব জীবনের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ অনুভব করেছেন স্ত্রীর মধ্যে। তুষার তার স্বামীকে ক্লান্ত হতে দিচ্ছে না। প্রতিদিন তার স্বামীর মধ্যে নতুন দিনের কাজ শুরুর আগুন জালিয়ে দিচ্ছে। লোকটা তাই আজও অত খাটে, খাটতে পারে। আমরা পারি না। আমাদের জীবনে কোনো আকর্ষণ নেই, সুখের রকমফের নেই। উৎসাহ পাব কোথায়? কার মুখ চেয়ে করব এই রুক্ষ সংগ্রাম।'

সামন্ত খানিকটা চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল। বেশ জোরেই।

'হাসলে যে!' মৃণাল প্রশ্ন করলে।

'সারসী তোমায় বড়ো বিচলিত করেছে হে।'

'তা করেছে। সে ক্ষমতা তার আছে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তার অক্ষমতাও তো কিছু থাকতে পারে।'

'না থাকতে পারে না। নেভার।' মৃণাল মাথা ঝাঁকাল কঠিন প্রত্যয়ে।

তুষারের কাছে মাঝে মাঝে যাচ্ছিল মৃণাল। আর তুষার হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করছিল ওকে।

প্রথম প্রথম সংকোচ ছিল মৃণালের। মিত্র সাহেব হয়তো তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরই অধস্তন আশি টাকা মাইনের এক টাইপিস্টের মেলামেশা পছন্দ করবেন না। কিন্তু মিত্র সাহেব অন্য ধরনের লোক। নিজেও যে এককালে বিত্তহীন ছিলেন একথা ভুলে যাননি। তাই মনে হয়। এবং মানুষ সম্পর্কে টাকার বিচারটা তিনি যে বড়ো করে দেখেন না তাও বোঝা গেল।

চায়ের টেবিলে বসে মিত্র সাহেব গল্প করেছেন। বিদেশের গল্প, শিকারের গল্প নিজের জীবনের নানা দুঃসাহসিকতার গল্প। ওরা শুনেছে। তুষার কখনো চোখ বড়ো বড়ো করেছে, কখনো হেসেছে, কখনো বা ভীত গলায় একটা উদ্বেগের স্বর প্রকাশ করেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মিশিয়ে চায়ের টেবিলটা বেশ জমে গেছে। সুন্দর হয়ে উঠেছে সেই আবহাওয়া।

এরপর কোনোদিন হয়তো মৃণাল উঠে এসেছে, কখনো মিত্র সাহেব কাজের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ঘরে চলে গেছেন, তুষার আর মৃণাল মুখোমুখি বসে থেকেছে। বেড়াতে বেরিয়েছে কোনোদিন।

বেশ কাটছিল বিকেলগুলো। চমৎকার।

মিত্র সাহেবকে মাঝে মাঝে আপিসের কাজে ছুটতে হত বাইরে। তেমন দিনে অনেকক্ষণ, প্রায় রাত পর্যন্ত মৃণাল থেকে যেত তুষারের কাছে। অর্গান বাজিয়ে গান গাইত তুষার, টিয়াপাখি রঙের শাড়ি পরে, টুকটুকে নখের ডগা রিডে চেপে ধরে মিহি গলায়। সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে স্পন্দহীন হয়ে শুনত মৃণাল সেই গান, সেই গলা। আর দেখত তুষারকে।

এমনই একদিন মিত্র সাহেব যখন অন্যত্র, মৃণাল এল আর কাল বৈশাখীও ছুটে আসছিল তখন আকাশ ডিঙিয়ে। গাছপালা লুটোপুটি খাচ্ছিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে বসেছিল তুষার। হাতে একটা বই। ফুলের ছবি।

লাল টকটকে শাড়ি পরেছে সেদিন তুষার। সেই রঙেরই ব্লাউজ। হাতে জরির পাড় বসানো। মনে হচ্ছিল এই ঘরের মধ্যে একটা আগুন বঙ্কিম শিখায় জ্বলছে।

মৃণাল এল, বসল।

'বাইরে ঝড় কি উঠেছে?' প্রশ্ন করল তুষার।

'বোধহয় এতক্ষণে এসে গেছে। শব্দ তো শুনছি।'

হ্যাঁ, বাইরে তখন ঝড় উঠেছিল। সোঁ সোঁ হাওয়া বইছে, গোঁ গোঁ করছে গাছপালা। মেঘ ডাকছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আকাশে।

'বসে বসে ছবি দেখছ?' হেসে বললে মৃণাল।

মাথা নাড়ল তুষার। ঠোঁটের আগায় বিচিত্র হাসি টানল, বললে, 'বাইরে যখন ঝড় তখন আমি ফুলের ছবি দেখছি।' একটু থেমে, 'আর এই ফুলটার নাম কি জানো, ব্লীডিং হার্ট। বিলিতি ফুল।' বইটা এগিয়ে দিল তুষার। হাতে নিয়ে দেখল মৃণাল। হাসল। বললে, 'বেশ নাম। তা তোমার হৃদয় তো রক্তাক্ত নয়, তবে ও ফুল কেন, অন্য ফুলে চোখ দাও।'

'আমার হৃদয় কি তুমি দেখেছ?' তুষার সরাসরি চোখ রাখল মৃণালের চোখে।

'না দেখলেও বুঝতে পারি।'

'পারো! আশ্চর্য তো! তুষার তার আপেলের মতন গালে হাসির একটি ছুটি কুঞ্চনও গুটিয়ে নিল।

'না পারার কি আছে!' মৃণাল বান্ধবীর সঙ্গে পরিহাস করছিল, 'ঈশ্বর তোমার হৃদয়টাকে ফুল দিয়ে গড়েছেন, দুঃখের বিষয় সেখানে রক্ত নেই, রঙ আছে।'

তুষার হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে, দেওয়ালে। একটা ছবিই যেন দেখছিল ও। নিজের ছবি।

মৃণাল চুপ করে গেছে। বাইরের ঝড়ের দাপট ঘরের দরজাকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বাজ পড়েছে কাছাকাছি কোথাও। শব্দে চমকে উঠল মৃণাল।

সে চমক ভাঙতেই দ্বিতীয়বার চমকে উঠল মৃণাল যখন তুষার তার পাশে এসে হাতটা টেনে নিয়েছে আচমকা।

'তুমি কিছুই জানো না মৃণাল। কিছুই বুঝতে পারো না।' তুষারের গলা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, নিশ্বাস উষ্ণ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

ধক ধক করছে মৃণালের হৃৎপিণ্ড। এবং জ্বালা করতে শুরু করেছিল চোখ, নাক।

'আমার বুকের মধ্যেও রক্ত ঝরছে। আর তোমাদের মিত্র সাহেব ঐ ঝড়ের মতন কালো কুশ্রী ভয়ংকর চেহারা আর আক্রোশ নিয়ে দাপাদাপি করছে। বীস্ট, বীস্ট। ও একটা বীস্ট।'

শুরু করছিল মৃণালের। ঘাম জমছিল কপালে। তুষারের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে চাপা গলায়, ভয় ভয় স্বরে ও বললে, 'কি বলছ যা-তা!'

'বলব। একশো বার বলব। সে অধিকার আমার আছে। তুমিই বলো, এত করলাম, তবু ও পারল না, পারছে না কেন!'

তুষারের চোখ দিয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছিল। গাল বেয়ে নামছিল।

কিন্তু চমকে উঠেছে মৃণাল। ভীষণভাবে চমকে উঠেছে। ধক করে একটা সন্দেহ বুকের ওপর উঠে এসেছে।

মৃণালকে কিছু বলতে হল না। তুষার বলল নিজে থেকেই। যদিও বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তবু ভাঙা গলায় থেমে থেমে বললে, 'ও দাম দিতে পারবে না, দেবার ক্ষমতা নেই। সহজ কথাটা বুঝবে না। ভাবে আমার চামড়া

আর মাংসগুলো আরো, আরো সুন্দর হলে ও পারবে। কিন্তু যা লোহা নয়, লোহার ছিটে ফোঁটাও যাতে নেই, চুম্বক তাকে টানবে কি করে।'
তুষার একটি বৃহৎ লাল প্রজাপতির মতন মৃণালের বুকে কোলে পড়ে ধড়ফড় করলে যেন কয়েকবার।
তারপর এই ঘর এবং যেন অন্যান্য ঘর, জানলা পর্দা সব কেউ দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে। বাতি নিভল। আবার জ্বলল অন্য কোথাও। সোনালী সাপের মতন একটা দেহ সেখানে ঢেউ খেলে খেলে যাচ্ছিল, স্ফুলিঙ্গের মতন জ্বলছিল দুটো চোখ। পাতা, গাছ, ছায়া কোথাও কি একটু আচ্ছাদন ছিল, একটু স্নিগ্ধতা বা লুকোচুরির রহস্য, আলো-আঁধারের ঝিলিমিলি! না। অসহ্য রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মৃণাল। অদ্ভুত একটা অসাড়তায় তার সর্বাঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল। মিত্র সাহেবের মতনই হয়তো।
যেন ছোবল খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল মৃণাল। একেবারে পথে।

ঝড় থেমেছে। মেঘ কেটে গেছে। মাটি ভিজে। জোনাকি উড়ছিল। পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল হাওয়ায়। কেমন এক গন্ধ। আর ক্ষীণ আলো চাঁদের। আমলকী ডালে একটা ঝড়ো কাক পাখা ঝাড়ছিল।
মৃণালের হুঁশ ফিরে এল নিজের কোয়ার্টারে পা দিয়ে। দরজাটা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়ল।
হ্যাঁ, কমলাই দরজা খুলে দিয়েছে। কিন্তু মৃণাল বিশ্বাস করতে পারছিল না। ঘরে ঢুকে মৃণাল আলোয় আর একবার দেখল কমলাকে। ফিনফিনে এক শাড়ি পরেছে ফিরোজা রঙের। গায়ে যেন জামাটা থেকেও নেই। চোখে কাজল। পাউডারে ধবধব করছে গাল দুটো। আর খোঁপা ভেঙে বিনুনি দুলছে। অত্যন্ত কুৎসিত একটা উপমা মনে পড়ছিল সেদিকে তাকিয়ে।—'বাঈজী সেজে বসে আছ কেন?' অসম্ভব তিক্ত রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠল মৃণাল।
কিন্তু আজ আর কমলা কাঁদল না। গলার পর্দা চড়াল না। অত্যন্ত কঠিন কিন্তু মৃদু গলায় বললে, 'তোমার জন্যে। এতেও যদি না হয়, আরো পারি।'
কমলা আঁচলটা খুলে ফেলল গা থেকে।
হাত ধরে ফেলল মৃণাল খপ করে। আশ্চর্য এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠেছে ওর গা। গলা দিয়ে স্বর ফুটছিল না। তবু বললে, 'না না। লক্ষ্মীটি না।'

* * * *

স্বপ্নটা আবার দেখল মৃণাল। মনে হচ্ছিল একটা পাখি উড়ছে মাথার উপর। ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। হঠাৎ পাখি থামল। একটা পালক খসে পড়ল। একটা নয়—এক, দুই, তিন। অনেক পালক। আর সেই পালক যেন দমকা হাওয়ায় একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে আটকে গেল। পরক্ষণেই স্পষ্ট হল দৃশ্যটা, গাছের গুঁড়ি নয়। পালকের পা—পায়ের মতোই। আর সেই পা-র ঊর্ধ্বে একটি মানুষী অবয়বের নাভি, উদর, বুক পাথরের মূর্তির মতন। স্পন্দনহীন লালিত্যহীন। হ্যাঁ পাথরই। মৃণাল হাত দিয়ে ধরতে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল।

ভোরের আবছা আলোয় মৃণাল দেখে ওর হাতটা কমলার গলার পাশে মুঠো দিয়ে ক-টি চুল জড়িয়ে নিয়েছে।

একবার এপাশ-ওপাশ তাকাল মৃণাল। হয়তো পালকই খুঁজছিল। কিন্তু খুঁজল না। কমলার গলা সোহাগে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। এবং এই ভেবে খুশি হচ্ছিল যে, এখানে সে বা তারা ব্যর্থ নয়, একটা আবরণ থাকলেও এখন ওর পাশে পাতায় ঢাকা পদ্মকুঁড়ির মতন একটি হৃৎপিণ্ড ধুক-ধুক করছে।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২—) ॥ বনবাতাস
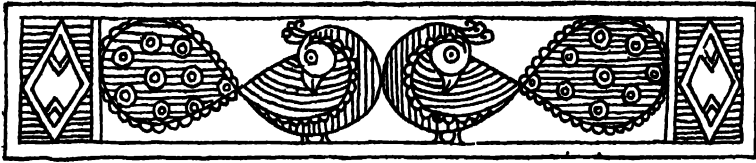
একটা লম্বা পাহাড়ের রেঞ্জ চলে গেছে রাঁচী থেকে রামগড়। জমাট বাঁধা কালো কালো পাহাড়। আর তারই সানুদেশ ঘিরে ঘন বনানীর বন্যা। এক পাহাড় আর আরেক পাহাড়ের মাঝে ছোট ছোট উপত্যকা। দেশী বিদেশী মানুষের বসতি সেখানে। দেহাতী গাঁও। ডেরা আর ডিহি। রেলপথের রাস্তাটা নয়। রাঁচী থেকে পালামৌ হয়ে ঘুরে এসেছে সড়কটা। মহুয়ামিলন, লাপরা, রায় হয়ে। পাহাড় ডিঙিয়ে, পাহাড় কেটে, পাহাড়ের গায়ে চক্র দিয়ে।

মহুয়ামিলনের ভেতর দিয়েও গেছে এই সড়ক। সড়কের গায়ে হেলানো ভগ্নশৃঙ্গ অনুপর্বত। মহুয়া-মাদার আর আমলকী-ইউকেলিপটাসের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় বাংলো টাইপের বাড়ি। উঁচু প্লিনথের ওপর সিমেণ্টের রোয়াক আর টালির ছাদ।

এরই মধ্যে সবচেয়ে জাঁকালো বাংলোটির বারান্দায় প্রতি সন্ধ্যায় যে ভদ্রমহিলা বসে থাকেন, তিনিই আরতি দেবী। আজও ক্যানভাসের কেদারায় বসে জাফরি কাটা রেলিঙের ফাঁক দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিলেন তিনি। এ সময়টা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। বেশ নিরুপদ্রব শান্তিতে কাটানো যায় এটুকু অবসর।

আজ কিন্তু বিরক্তি বোধ করছেন আরতি দেবী। ঠিক বিরক্তি নয়। এক বিরাট শূন্যতা যেন জেঁকে বসেছে তাঁর মনে। ক্রমশ তাঁর কাছে দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস যেন নিরর্থক হয়ে উঠছে। স্বামীকে ভালবাসতে পারেন নি বলে দুঃখ ছিল না তাঁর। বরং গর্ব ছিল। সামাজিক প্রয়োজনের অঙ্গ ভেবে মেনে নিয়েছিলেন তাকে। অথচ আজ আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের মন। একটা লোকের অভাব, বিশেষ করে যে

স্বামীকে ভালবাসেননি কোনোদিন, সেই স্বামীর অভাব গভীর ভাবে অনুভব করতে হচ্ছে। মন্নতোষের মৃত্যুতে এমন ভাবে নিঃস্ব হয়ে যাবেন তিনি—আশঙ্কারও অতীত ছিল।

বাতাস নীলচে হয়ে আসছে। আর একটু পরেই চাঁদ উঠবে, অজস্র তারাও। নীলাভ রেশমী শাড়িতে জ্বলবে অগণিত রূপালী চুমকি। দূরের পাহাড়ী বনটায় হয়তো ছুটে আসবে মৃগমাতৃকার দল। চিত্রিতা হরিণীর সারি সরল সারঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে আকাশ আলোর বন্যা। ছলছলিয়ে উঠবে টুংরী নদীর জল।

গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন আরতি দেবী। বহুক্ষণ থেকে একটা করুণ সুর কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। অবিরাম গতিতে ছন্দিত হচ্ছে বাঁশের বাঁশির মিঠে মেঠো সুর। ক্লান্ত নটীর নূপুর নিক্কণের মতো সে সুর ককিয়ে ককিয়ে ভেঙে পড়ছে।

হঠাৎ ভেঁপু আর ঢোলক বেজে উঠলো উদ্দাম হয়ে। আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বালিয়ে জলসা জমাচ্ছে ওঁরাও আর মুণ্ডার দল। ওরা নাচবে, গাইবে। মনমাতালের দল মহুয়া রসের দেহাতী হাঁড়িয়া খেয়ে নেশায় চুর হয়ে থাকবে। মাতলামি করবে।

কালো মেঘের বোরখা তুলে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঘষামাজা রেকাবিখানা। জ্যোৎস্নার প্লাবন নামছে। জোয়ার উথলে পড়ে আলোয় পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে এখনি। অনতিপ্রস্থ টুংরী নদীর ওপর কংক্রিটের সাঁকোটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক জোড়া তরুণতরুণীর ঝাপসা চেহারা চোখে পড়লো আরতি দেবীর। অনু আর স্নিগ্ধা। অবাধ আনন্দে মশগুল হয়ে বিশ্রম্ভালাপে মেতে রয়েছে ওরা। সাঁকোর শেষে বেদীটার ওপর বসে আছে দুজনে। স্নিগ্ধার বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছে অনু। সিল্যুয়েটের ছবির মতো ঝাপসা হলেও বুঝতে পারলেন আরতি দেবী।

কথার ফাঁকে ফাঁকে খিলখিল করে হেসে উঠছে স্নিগ্ধা। দু-এক টুকরো হাসির রেশ ছিটকে কানে আসছে। সশব্দ হাসি। খুব তীক্ষ্ণ আর খুব গভীর। মাঝরাতে কাঁচ ভাঙার মতো ধারালো আওয়াজ। ভালো লাগে না আরতি দেবীর। এ হাসি কোনোদিনই ভালো লাগেনি তাঁর।

মনে পড়ে। তাঁর কুমারী জীবনেও এ হাসি শুনেছেন তিনি। আজকের মতো অসুখী ছিলেন না সেদিন। তবু ভালো লাগেনি এ হাসি। বিবাহপূর্ব প্রতিবেশী নবদম্পতির ঠিক এমনি ধরনের উচ্চকিত হাসি সহ্য করতে পারতেন না তিনি। আজও পারেন না।

অন্থকে আর আপন ভাবতে পারেন না আরতি দেবী। আর সুস্মিতা— সুস্মি অসহ্য। যেন জাতবৈরী। ওদের উল্লাস, আমুদে-আহ্লাদ অপমানের বিষ ঢুকিয়ে দেয় তাঁর মনে। মন বিষিয়ে তোলে। অথচ এই অন্থকে নিজের হাতে মানুষ করেছেন তিনি। না। অনেক ভেবেছেন, অনেক জাগর রাতের চিন্তাক্রান্ত চোখে ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। না। এভাবে এদের সৌভাগ্যের মাঝে টিকতে পারবেন না। পাগল হয়ে যাবেন কোনোদিন। এই সুখাতিশয্যের পরিপার্শ্ব শোককাতর করে তুলছে তাঁকে। অসহ্য। রাত বেড়ে চলেছে, এখনো ফেরবার নাম নেই ওদের।

যাক্। যখন হোক ফিরবে ওরা। আর অপেক্ষা করতে পারেন না।

কেদারা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেয়ালের বড়ো আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে নিজের প্রতিচ্ছবিটা দেখলেন আরতি দেবী! যৌবন এতটুকুও ক্ষয় হয়নি এখনো। সমাপ্তি ঘটেনি সৌন্দর্যের। নিজেকে, নিজের দেহকে বড়ো বেশি ভালবাসেন আরতি দেবী। মনোতোষ মারা গেছে। বিধবা হয়েছেন। বেশ কয়েকমাস কেটেও গেল। কিন্তু থান কাপড়ের কাপট্য দিয়ে নিজের মনকে ছদ্মবেশ পরাতে পারেন না তিনি। না, সৌন্দর্য নষ্ট করা চলবে না। এমনি সাদাসিধে কালোপাড় শাড়ি অন্তত পরবেন জীবনভোর। ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুর জন্য নিজের সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছার মৃত্যু ঘটানো চলবে না।

তৃপ্তি নেই। শান্তি পান না আরতি দেবী। মনোতোষকে তো কোনোদিনই ভালবাসতে পারেননি। তবু, কেন জানি নিজেকে বড়ো বেশি ব্যর্থ মনে হয় আজ। নিঃস্ব মনে হয়। চারিদিক ফাঁকা। পৃথিবী ফাঁকা। সমগ্র বিশ্ব যেন ফাঁকা।

বিছানার উপর শুয়ে পড়েছিলেন আরতি দেবী। সাটিনের কালো চাদরটা আঁকড়ে গুটিয়ে ধরলেন দু-হাতে। দু-হাত এলিয়ে দিয়ে বিছানার স্পর্শ নিলেন। বড়ো ঠাণ্ডা আর বড়ো নরম। বাঁহাতের ঝাঁকানি দিয়ে শিয়রের

জানালাটা খুললেন। এক দমকা জ্যোৎস্না ঢুকলো ঘরে। সারা দেহে তাঁর রূপালী রঙ মাখিয়ে দিল। চোখ বুজলেন। মুদিত চোখেই দু-পাশে হাত বাড়িয়ে কি যেন খুঁজলেন।

একান্ত একা। প্রেম, ভালবাসা? ভালো নাই বা বাসলেন মনোতোষকে। অভ্যাসের অভিসারে নিজের ব্যথিত জীবনকে রসিয়ে তুলতে তো পেরেছিলেন। তাছাড়া আনন্দও ছিল। একটা অদ্ভুত আনন্দ। আত্মগর্বের জয়-সংকেত। ভালো না বাসার গর্ব ছিল নিজের মনে। ভালবাসা পাওয়ার ছদ্মবেশ দেখাতে পারতেন বাইরের জগতকে। অকল্পেয় সুখের মুখোশ ছিল মুখে। আশ্চর্য খুশির আমেজ, হোক্ ভান।

উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা যেন উন্মুখ আগ্রহে বিদ্রোহের পল গোণে। তৃপ্তিকামী উন্মাদ শিহরণ। ভয়, আশঙ্কা। হয়তো অপবাদ কুড়োতে হবে সেই ভয়।

নিজের মনেই হাসলেন আরতি দেবী। আজ অপবাদের ভয় হয় অথচ একদিন নিঃশঙ্ক চিত্তে স্ব-ইচ্ছায় অনুসরণ করেছিলেন।

তখন বয়স ছিল কম। কিন্তু বয়সের অনুপাতে দুর্নাম জমেছিল অনেক বেশি। অবশ্য কারণ ছিল তার পিছনে। কারণ—তাঁর রূপের ঝিলিক, তাঁর চোখের ঝলসানি! চোখের তারায় তারায় আশ্চর্য এক জলুস—ভাঙা বিদ্যুতের মতো এক চাঞ্চল্যে ঝিকিয়ে ওঠে। পদ্মপল্লবের মতো চোখের পাপড়ি নয়, নয় মৃগনয়নতুল্য টানা টানা চোখ। আসলে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা ছিল সে বয়সে বড়ো চপল। নীল নয়, নিকষ কালো। পুরুষের চোখে চমকে উঠতো লোভের ইশারা। হয়তো আজো ওঠে।

ষোলো বছর পূর্ণ হতেই অঙ্গবৈভব ষোলোকলায় পূর্ণ হয়েছিল। চমৎকার গলা ছিল তাঁর গানে। পুরুষের মনে ব্যথা দিত তাঁর গানের মিঠে সুর। চোখের আবিষ্ট চাউনি আর গানের অপূর্ব রেশ যেন সমান তালে চমকে দিতো মানুষকে। আত্মদানের ভঙ্গিমা প্রতিটি ব্যবহারে। বিলুপ্তির নিশ্চিত নিশানা। মনে হত, পুরুষকে বাধা দেবার মতো শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই বোধ হয় ছিল না তাঁর।

এ হেন আরতি দেবীর বিয়ে হল মনোতোষের সঙ্গে। রাঁচীতে মস্ত কারবার। চেহারা বাঙালী পুরুষের মধ্যে সুলভ নয়। বিয়ে সে এর আগেও একবার করেছিল। বছর আটেক আগে একটি পুত্রসন্তান রেখে

স্ত্রী মারা যায় মনোতোষের। তারপর থেকে মনের গহনে স্বর্গীয়া স্ত্রীর স্মৃতি পুষে দিন কাটাচ্ছিল মনোতোষ। অন্থকে মানুষ করার ব্রত নিয়ে আটটা বছর কাটিয়ে এসে হঠাৎ একদিন মর্জি বদলে গেল তার। আরতি দেবীর বিয়ে হল এ হেন মনোতোষের সঙ্গে।

প্রথম যেদিন এখানে আসেন আরতি দেবী—আজও মনে পড়ে তাঁর।

আজ অতিপরিচয়ে নিরস হয়ে উঠলেও মহুয়া-মিলনের ঐ ছোট প্ল্যাটফর্ম অপরিচয়ের চোখে অনেক অনেক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছিল।

পুবে পশ্চিমে চলে গেছে এক জোড়া রেললাইন। কে যেন বিছিয়ে রেখেছে একখানা শাড়ি, আর দিনের আলোয় ঝকমকিয়ে উঠেছে দু-পাশের রূপালী জরির জমাট পাড়।

মহুয়ামিলন। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন আরতি দেবী। নাম সার্থক করে নব উন্মেষিত উপনিবেশের গায়ে গজিয়ে উঠেছে অঢেল অফুরন্ত মহুয়ার বন। ধূসর বাতাস তখন সাঁঝের ঘোমটা টেনে দিচ্ছে পশ্চিমের রক্ত মেঘে। আর লাল কাঁকরের সর্পিল রাস্তা বেয়ে ছুটে চলেছে মনোতোষের গাড়ি। আরতি দেবীর পাশে মনোতোষ। অদ্ভুত এক শিহরণ জাগছে নববধূর মনে। নতুন এক অভিজ্ঞতা।

বনে বনান্তে শ্যাওলার ছাউনি ফেলেছে অজস্রপল্লব মহুয়ার ভিড়। চারপাশের আবহাওয়ায় ভেসে আসছে উচ্ছ্বাসের স্রোত। চাঁপা রঙের মহুয়া জমেছে গাছে গাছে। নেশার আমেজ, মিঠে সুগন্ধ। রসালাপে আনন্দ-বিভোর মত্তমধুপের গুঞ্জন। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষয়িষ্ণু স্রোতে নুড়িতে নুড়িতে লাগে স্পর্শ। জলোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে স্তিমিত সঙ্গীত। টুংরীর বুকে কংক্রিটের সাঁকো। মাদলমৃদঙ্গের তালে তালে ওঁরাও মুণ্ডাদের নাচ আর গান।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

বাড়ির সামনে লাল সিমেণ্টের উঠোনে পাশাপাশি দুখানা বেতের কেদারায় বসেছিলেন তাঁরা। মোহমুগ্ধ চোখে নবপরিণীতা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল মনোতোষ। আর আরতি দেবীর ঠোঁটে কৌতুকের হাসি। অনভ্যাসের কৌতুক। হাসি পেয়েছিল আরতি দেবীর। মনোতোষের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ইঙ্গিত দেখে। সবেতেই যেন আরতি দেবীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা। ভালবাসা, প্রেম—কত কি স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছিল হয়তো। অথচ আরতি দেবী সেদিনও জানতেন, এই মনোতোষই আট বছর ধরে প্রথম পক্ষের মৃত

সহধর্মিণীর স্মৃতি পুষে কাটিয়েছে। হাসি পেয়েছিল তাঁর, তবু চোখের দৃষ্টিতে মোহমুগ্ধ স্বস্তির প্রলেপ এঁটে রেখেছিলেন।

আজো মনে পড়ে আরতি দেবীর।

আয়ার সঙ্গে বেরিয়ে ফিরলো অনু। আট বছরের ছেলে অনু।

আয়া পুরনো কর্তা ও নতুন কর্ত্রীঠাকরুণকে সেলাম জানিয়ে অনুকে তাদের সামনে রেখে চলে গেল। ছেলেকে কাছে টেনে আনলে মনোতোষ। লজ্জার হাসি হেসে বললে, এই অনু।

উল্লসিত আনন্দে তাকে কোলে টেনে আনলেন আরতি দেবী। বললেন, এসো অনু, তুমি আমার কাছে এসো।

উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন অনুকে। আট বছরের কিশোর অনু নেহাত ছেলেমানুষ নয়। অনভ্যস্ত আদরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো সে। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই আরতি দেবী বিপর্যস্ত করে তুললেন তাকে। কোলে বসিয়ে, অনুকে বুকের কাছে চেপে ধরে, তার রেশমের মতো পাতলা চুলের ভেতর ধীরে ধীরে আঙুল চালিয়ে, তার গাল টিপে অস্থির করে তুললেন তাকে। আট বছরের অনু লজ্জায় মাথা নিচু করে সব অত্যাচার সহ্য করে গেল।

আরতি দেবী হেসে উঠে বললেন, লজ্জা করছে, না অনু? এর পর কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না। কেমন?

অনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। চোখ তুলতে পারলে না।

—আমি তোমার কে জানো তো?

অনু উত্তর দিলে না। এত আদর পাওয়ার পর আন্দাজে বলতে গিয়ে একটা ভুল সম্বন্ধ বলে ফেলার আশঙ্কাতেই হয়তো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—কে বলো, আমি তোমার কে?

পায়ের নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে অতিষ্ঠ হয়ে অনু বললে, খুব আস্তে আস্তে বললে, মাসিমা।

সশব্দে হেসে উঠলেন আরতি দেবী। অনুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার চুলে চুমু খেয়ে বললেন, দূর বোকা ছেলে। আমি তোমার মা, নতুন মা। বুঝলে?

চমকে চোখ তুলে তাকালে অনু।

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন আরতি দেবী। মনোতোষের কাছে

অভিনয়টা হয়তো অভিনয় বলেই মনে হবে। তাঁর ব্যবহার, তাঁর স্নেহাতিশয্য, তাঁর কথা হয়তো বিসদৃশ ঠেকবে মনোতোষের চোখে। অপরিচিত অন্নুর সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা যে নেহাত মায়ের উপদেশ মানার ফল তা হয়তো বুঝতে পারবে সে।

আরতি দেবীর আজো মনে পড়ে।

আশ্চর্য। সেদিন মোটেই মনে হয়নি যে পরবর্তী জীবনের নির্জন মধ্যাহ্নগুলো একমাত্র অন্নুই তাঁর কাছে সজীব করে তুলবে। আর মনোতোষ? ভালবাসতে পারেনি সত্যি, কিন্তু অভ্যাসের আওতায় পরের পরের দিনগুলোতে মনোতোষকে ভালো লেগেছিল তাঁর নিঃসন্দেহে।

একটা দিন।

খাটের ওপর নরম বিছানায় শুয়েছিলেন আরতি দেবী। মনোতোষ হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। আরতি দেবীর বুকে আলগোছে পিঠ রেখে কি যেন বলছিল মনোতোষ। সেই শায়িতা অবস্থাতেই আঁচল টেনে মুখ ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছিলেন আরতি দেবী।

—ভারী লাজুক তুমি। মনোতোষ বলেছিল। মুখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তাকাও তুমি, আমার মুখের দিকে তাকাও।

মনোতোষের চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করে অপূর্ব এক হাসি হেসেছিলেন আরতি দেবী। লজ্জা-রঙীন হাসি। চোখের ওপর হাত আড়াল রেখে ঠোঁট টিপে টিপে হেসেছিলেন।

মনোতোষ তাঁকে কতখানি অধিকার করেছিল, আজ তার মৃত্যুর পর বুঝতে পারেন আরতি দেবী।

সে ছিল কাজের মানুষ। বেশির ভাগ সময় থাকতো বাড়ির বাইরে। সে নির্জনতা সহ্য করতে পারতেন না আরতি দেবী। ক্রমে অন্নুর ওপর তাঁর স্নেহের পরিমাণ বাড়তে শুরু করলো। শেষে একদিন দেখলেন অন্নুর প্রতি তাঁর মায়ামমতা সম্পূর্ণ নিখাদ। নিজের ছেলেকে মানুষ যতখানি ভালবাসতে পারে অন্নুকেও তিনি ততখানি ভালবাসতে পেরেছিলেন। শুধু তাঁরই তত্ত্বাবধানে আট বছরের অন্নু আজ বাইশ বছরের পূর্ণযৌবন অন্নুতে পরিণত হয়েছে। চোদ্দ বছরের সেবা আর যত্ন মাখিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে, তারপর সুস্মিতাকে খুঁজে বের করেছেন নিজে। অন্নুর বিয়ে দিয়েছেন। দিনগুলো তখন সুখে টইটম্বুর। জীবনের চারিধার থেকে সমস্ত

আনন্দকণিকাগুলো যেন জমাট বেঁধে পেয়ালা ভরিয়ে তুলেছে। খুশিতে উথলে পড়ছে পেয়ালা।

এমন সময় মনোতোষ মারা গেল।

একটা সজোর ধাক্কা লাগলো আরতি দেবীর নরম বুকে। এতদিন নিজেকে অসন্তুষ্ট আর অসুখী মনে করে এসেছেন, সত্যিকারের দুঃখকষ্টের স্বাদ পেতে শুরু করলেন এবার। সরলরেখার মতো জীর্ণ দিনের গতিশীল অভ্যাস যেন অকস্মাৎ মোড় ঘুরিয়ে দিল জীবনের। সমস্ত পৃথিবীর আলো আর হাওয়া টেনে নিংড়ে বের করে নিয়ে গেছে মনোতোষ। তাই আরতি দেবীর চোখে বিশ্বসংসার হয়ে উঠেছে বোবা আর ফাঁকা। একটা সান্ত্বনা ছিল এতদিন। আরতি দেবী যে অসুখী তা জানতে পারেনি কেউ। আজ যেন নিজের কাছেই ধরা পড়ে গেছেন তিনি। আজ যে শুধু খুশি হবার উপায় নেই তাই নয়, খুশির ছদ্মবেশ আঁটবারও উপায় নেই।

মাঝে মাঝে বিগত দিনের ইচ্ছাটা জেগে ওঠে। জেগে ওঠে বিবাহ পূর্বের সেই তরুণী। উচ্ছৃঙ্খলতার আগুন তাতানি লাগায় সমগ্র স্তিমিত চেতনার স্তরে স্তরে।

অনুভব করেন। অথচ কেমন যেন অবোধ্য।

চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে একদিনও তো কই যৌবন এমন ভাবে তাঁর শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেয়নি। বোধ হয় যৌবন নির্বাসিত হতে চলেছে তাঁর দেহ থেকে। গ্রহণপূর্ব রাতের চাঁদের ঔজ্জ্বল্য হয়তো এটা। কে জানে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিতে চলেছেন কিনা। কে জানে।

রক্তে দোলা লাগে, রক্ত নেচে ওঠে, মাতিয়ে তোলে দেহ আর মন। বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা করে—বাঁধা ধরা নিয়মের বিরুদ্ধে, রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আর আহ্লাদি স্নিগ্ধর সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে।

কিন্তু বিশেষ একটা সংস্কার ক্রমাগত আঘাত করছে তাঁর ইচ্ছার দেয়ালে। মাসানুমাসিক অভ্যাস বাসা বেঁধেছে তাঁর মজ্জায়। নিস্তার নেই।

যৌবনারম্ভের বিপ্লবী রক্ত সামাজিক বন্ধনের মধ্যে এতদিন কাটিয়ে এসে আজ সম্পূর্ণ ঢিলে দিয়েছে। তাই স্নিগ্ধর আনন্দ দেখে বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার বিষিয়ে ওঠে মগজের প্রতিটি তন্ত্রী, মনের প্রতিটি রন্ধ্র।

সবে তখন সকালী রোদের তেজ বাড়ছে।

ঘরে নির্জনে বসে বসে আরতি দেবী কয়েকখানা ফাইল ঘাঁটছিলেন। ম্যানেজার সগু দিয়ে গেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্তর তেমন ভালো বোঝেন না। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা ছুটকো প্রশ্ন আর লম্বা সই টেনে ভড়ং রাখতে হয় মস্ত বড়ো বাণিজ্যচুম্বকের। ম্যানেজার অন্তত জানুক যে তার কাজের ওপর দৃষ্টি আছে আরতি দেবীর। চুরির পরিমাণটা হয়তো কমাবে তা হলে।

লাইম ফ্যাক্টরিটার একমাত্র সত্বাধিকারী ছিল মনোতোষ। তাই আজ সব কাজই দেখতে হয় আরতি দেবীকে।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবার।

ভিতরের উঠোনে ঢুকলেন আস্তে আস্তে। স্নান করতে হবে। ভোর বেলায় স্নান করা এ বাড়ির রীতি।

ক্লান্ত বোধ করছিলেন আরতি দেবী। আজকাল সামান্য কাজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

মোজায়েক করা চৌবাচ্চা থেকে সদ্য স্নান সেরে উঠেছে অনু। উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেন আরতি দেবী। জলে ভাসছে সুগন্ধি সাবানের সাদা ফেনা। তোয়ালে বুলিয়ে গায়ের জল মুছছিল অনু। আরতি দেবী দাঁড়িয়ে দেখলেন। আপনা থেকেই তাঁর ঠোঁটের কোণে দুলে উঠলো এক ফালি মিষ্টি হাসি। সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন। অনুর সুন্দর সুঠাম দেহ। পেশীবহুল হাত। কাঁধের কাছটা কী মসৃণ! চওড়া বুক আর বিস্তৃত কপালে খুদকুঁড়োর মতো বিন্দু বিন্দু জল। শীকরশিক্ত পুরুষদেহের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলেন আরতি দেবী। মোহময় দৃষ্টি তাঁর চোখে। গর্বের ফল্গু বইছিল তাঁর মনের অন্তস্তলে।

হঠাৎ চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল সুস্মির সঙ্গে। সুস্মিও দেখছিল অনুকে। তার লোভাতুর ঈষৎ অবনত তির্যক চাহনিতে লজ্জিত হাসি। চোরা চাউনিতে দেখতে গিয়ে আরতি দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। লজ্জায় গাল রাঙিয়ে ছুটে পালালো সে।

সুস্মির ওপর মনটা বিষিয়ে উঠলো আরতি দেবীর। বিদ্বেষের বাষ্প ঠেলে উঠলো পাঁজরে পাঁজরে। ঈর্ষা? নিজের মনেই হেসে ফেললেন আরতি দেবী। অনু তাঁরই হাতে গড়া মানুষ, চোদ্দ বছর অক্লান্ত সেবায় মানুষ করেছেন অনুকে। রতিপরিমাণ স্নেহ ভালবাসাও পুঁজি

রাখেননি বুকের কোণে লুকিয়ে। সেই অনুর নবপরিণীতা স্ত্রী স্নিগ্ধ।
অথচ—
এ ভাবে দিনরাত অনু আর স্নিগ্ধকে আমোদে মশগুল হয়ে থাকতে দেখলে গা জ্বলে যায় তাঁর। এদের মধ্যে সামান্য একটু ব্যবধান আনতে পারলেও যেন মনে মনে খুশি হয়ে উঠতে পারেন।
অন্যদিন স্নিগ্ধই কাছে বসে স্বামীর খাওয়ার সময়। পরিবেশনের ভার থাকে তারই ওপর। আজ তাকে অন্য কাজ বাতলে দিয়ে পাখা হাতে কাছে এসে বসলেন আরতি দেবী।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন অনু দেখলে আরতি দেবী ওঠবার নাম করছেন না, তখন অতিষ্ঠ হয়ে বললে, কেন কষ্ট করছো মা, ওকে ডেকে দাও। দুপুর বেলাতেও তুমি যদি একটু বিশ্রাম না নাও—
আরতি দেবী বুঝতে পারলেন। বুকটা ব্যথিয়ে উঠলো। যে অনুকে চোখের সামনে তিল তিল করে গজিয়ে উঠতে দেখেছেন, সেই অনুর কাছে আজ আর তাঁর স্নেহ সেবা যত্নের কোনো মূল্যই নেই। আট বছরের অনু বদলে গেছে।
উঠে এলেন আরতি দেবী।
আহার সেরে অনু ঘরে ঢুকতেই ঈষৎ গম্ভীর গলায় বললেন, শোনো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।
বেশ রূঢ় ভাষাতেই কিছু একটা বলবার ইচ্ছা ছিল, তবু কী এক অসামান্য দুর্বলতা তাঁর অনুর প্রতি, কিছুতেই কঠিন হতে পারেন না। অনুকে পাশে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে ধীরে ধীরে কয়েকটা উপদেশ দিলেন। হাসি মুখে।
বললেন, তোমার তো আর এভাবে হৈ হৈ করলে চলবে না বাবা। প্রায় চার মাস হয়ে গেল উনি মারা গেছেন। এবার তোমাকেই সব দেখতে শুনতে হবে, ম্যানেজারের ওপর বিশ্বাস করে বেশিদিন আর ফেলে রাখা কি উচিত?
অনু হাল্কা হয়ে বললে, বেশ তো মা, কি করতে হবে বলো না।
আদরের স্বরে আরতি দেবী বললেন, কারখানায় বেরুতে হবে তোমাকে। খাতাপত্তর দেখা, কাজকর্ম দেখা—
—বেশ তো। কিন্তু খাতাপত্তর দেখার কাজ তোমাকে শিখিয়ে দিতে

হবে। কর্মচারীদের কাছে শিখতে পারবো না আমি। অমু বললে।

হেসে ফেললেন আরতি দেবী।—কেন, লজ্জা করে বুঝি?

আব্দারে গলে পড়ে মাথা হেঁট করলে অমু।

আরতি দেবী সান্ত্বনা দিলেন।—বেশ, আমিই শেখাবো যতটা পারি। কিন্তু সব তো আমিও বুঝি না ভালো। বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, ম্যানেজারের কাছে একটু দেখেশুনে নিলেই সব শিখে যাবে।

সম্মতি জানালে অমু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে ধীরে ধীরে।

মনে মনে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেলেন আরতি দেবী। মুখে চোখে ফুটলো জয়ের অভিব্যক্তি। নাঃ, আজও স্নিগ্ধর মিষ্টি মধুর হাসি অমুর কাছে তাঁর অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিতে পারেনি।

উত্তরের জানালাটা খুলে দিগন্তের দিকে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। বকের পালকের মতো সুশুভ্র আকাশ। খানিকটা ঠাণ্ডা রোদ্দুর পড়েছে বারান্দায়। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়, লম্বা চলে গেছে লাইম রেঞ্জ। দিকচক্রবালে মিশে গেছে। মহুয়ার কাঁচা পাতা, সবুজ ছোপ লেগেছে পৃথিবীতে। মাঝে মাঝে অনুর্বর উলঙ্গ পাহাড়ের অঙ্গ। নীলগাইয়ের মসৃণ দেহের মতো দেখায়। নীলচে রঙ—চাপা বেগুনি আভা ঐ নীলাভ পাথরের গায়ে। চুনের পাহাড়।

লাল পাথুরে জমিতে আমলকীর বন। শিরশিরে বাতাসে পাতা নড়ে। প্রজাপতির মতো। রোদে চিকচিক করে সুপুষ্ট সুগোল আমলকী।

দুপুরের ভোঁ বেজে গেছে।

ক্যাঙারুর মতো পা ফেলে ফেলে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যত দেহাতী কুলিকামিন, রেজা আর রোজমজুরের দল। ওরা মধ্যাহ্নে আহার সেরে আবার কাজে চলেছে। একটু পরেই কারখানার সাবধানী-ঘণ্টা বেজে উঠবে। ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথরের চাঙড় খসাবে। ভাঁটায় পুড়িয়ে সাদা করে দেবে নীল পাথর, মেশিনে ফেলে গুঁড়ো করে দেবে। তারপর ঘণ্টায় সাতটা ওয়াগন ভর্তি হলে সরে পড়বে এদিকে ওদিকে।

দূরে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী।

মনোতোষের সৃষ্টি। মৃত স্বামীর বুকের সুর দিয়ে গাঁথা এক টুকরো অপূর্ব গীতিকা। নিপুণ শিল্পীর হাতে যুগসুন্দর চিত্রনিদর্শন। প্রাণ ভরে তাকিয়ে দেখেন আরতি দেবী। বহু নির্জন মধ্যাহ্নে বেদনাব্যথিত চোখ

মেলে দেখেছেন। আর প্রতিদিনই মনে হয়েছে এ দৃশ্য যেন চিরনূতন।
মনোতোষকে ভালবাসতে পারেননি আরতি দেবী। মনোতোষের সৃষ্টিকে ভালবেসেছেন।

নিয়মিত কারখানায় যাতায়াত শুরু করে দেয় অমু।
সত্যিই। নিষ্কর্ম মধ্যাহ্নগুলো চুপ করে শুয়ে বসে সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে কাটাতে রুচিতে বাধতো তার। কাজ পেয়ে বেঁচে গেল। সকাল আটটা থেকে বারোটা অবধি, মাঝে দু-ঘণ্টা বিশ্রাম। দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি আবার কারখানা। কাজ করার মধ্যে ডুবে গেল অমু।
তা বলে আনন্দালাপে পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি।
অনেক রাত অবধি নানাদিকে দুজনে ঘুরে বেড়ায় বনবাদাড়ে, নদীর তীর ধরে ধরে। দিনের অপ্রাপ্তিটা পুষিয়ে নেয়। কস্তুরী-মাতাল হরিণীর মতো লাল মেঘের দিকে, সাদা চাঁদের দিকে ছুটে বেড়ায় সুস্মিতা। অমুর পিছনে পিছনে।
একটা ছোট ক্যামেরা কিনেছে অমু। বিকেলে দুজনে যখন বেড়াতে বেরুলো, একখানা পুরনো খবরের কাগজে সেটা মুড়ে মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিয়ে এল অমু। পর পর অনেকগুলো ছবি তুললো সুস্মির, নানারকম ভঙ্গির। কখনও দাঁড় করিয়ে, কখনও বসিয়ে, কখনও সুস্মি যখন ছুটোছুটি লাফালাফি করছে তখন।
তারপর যখন ক্লান্ত বোধ করলে তখন সবুজ দুর্বা ঘাসের জাজিমে দেহ এলিয়ে দিলে ওরা।
রাত হয়ে আসে। আকাশে দেখা দেয় সোহাগী চাঁদ। ক্ষীণতটা টুংরীর ক্ষীণ সুরতরঙ্গ ভেসে আসে। সোঁ সোঁ করে খানিকটা ঝোড়ো হাওয়া ঘূর্ণীর মতো পাক দিয়ে আকাশে উঠে শুকনো পাতা ছড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। ক্রমশ দমকা বাতাসের বেগ বেড়ে চলে। ধুলোয় ধুলোয় চারিদিক কুয়াশা-ভরা-ভোরের মতো ঝাপসা হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নার গায়ে ময়লা ধরে। কপট শঙ্কার ছাপ পড়ে সুস্মির মুখে। কাছে সরে আসে সে, অমুর গায়ে গা ঘেঁষে।
—ভয় করছে? সবল হাতটা সুস্মির পিঠের ওপর রেখে অমু প্রশ্ন করে।

উত্তর দেয় না স্নিগ্ধা। কান পেতে ঝড়ের শব্দ শোনে। বিভ্রান্ত চোখ চেয়ে দেখে ঝড়ের প্রলাপ।
—কি, ভয় করছে? আবার প্রশ্ন করে অন্নু।
—হ্যাঁ। অন্নুর চোখের ওপর ছুটি গভীর শান্ত চোখ মেলে মাথা নাড়ে স্নিগ্ধা।
—তবে চলো বাড়ি ফিরি।
—না।
দুজনেই হেসে ফেলে। সশব্দে।
ঝড়ের মত্ততা আসে কমে। এক ফালি রাতের ছায়া এসে পড়ে ওদের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কালো-কাজল মেঘে ঢেকে গেছে চাঁদের মুখ। সাদা আকাশের গায়ে আরো অনেক অনেক কালো মেঘ জমে ওঠে। সুরতাশ্রিত হস্তিনীর মতো যেন গড়িয়ে নেমে আসছে মাটিতে।
বৃষ্টি নাববে হয়তো এখুনি। জলো বাতাসের শীতলস্পর্শে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। স্নিগ্ধাকে কোলের কাছে টেনে নেয় অন্নু।
প্রতিদিনের মতো আজও লাইমরেঞ্জের সার্চলাইটটা ক্রমশ ঘুরে চলেছে অবিরত। দূরে বৃষ্টি নেমেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলের ফোঁটা। ঝকঝকে বরফের কুচির মতো। কৃত্রিম ফোয়ারার শীকরবিন্দুর মতো ঝিরঝিরে জলের ফোঁটা চমক দেয়। সার্চলাইটের বিদ্যুৎ-আলোর ঝিলিক মেখে অজস্র জোনাকির মতো দেখায়। আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।
বৃষ্টি আসছে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।
পালাবার সময় পেল না ওরা। ইচ্ছাও ছিল না হয়তো। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল দুজনকে। ভিজে সপসপে শাড়ি লেপটে গেল স্নিগ্ধার দেহে। মোহমদির দেহরেখা হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট।
ক্যামেরার কেসটা ভিজে গেল। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে হাত দিয়ে বাড়ির পথ ধরলে দুজনে। এ ভাবে পাশাপাশি ভিজতে পায়নি তারা কোনোদিন। আজ তাই চমৎকার লেগেছিল ওদের। এক অপূর্ব অনুভূতি।
এদিকে, মনে মনে স্নিগ্ধার ওপর চটছিলেন আরতি দেবী।
ইদানীং অন্নুর চেহারা খারাপ হয়ে আসছে, লক্ষ্য করেছেন তিনি। চোখদুটো বসে গেছে। মুখখানা যেন রোগে ভুগে শুকিয়ে গেছে। তাঁর

চোখের অনুবীক্ষণ দৃষ্টিতে মনে হয়েছে, কি যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া লুকিয়ে থাকে অনুর চেষ্টাকৃত ম্লান হাসির আড়ালে। জীবনের মাধুর্যে টলমল করতো যে পেয়ালা তাকে নিঃস্ব করে ছাড়বে স্নিগ্ধ।

একবার দুর্গা পুজোয় দরিদ্র ভোজন দেখেছিলেন আরতি দেবী। ছোটবেলায়। একটা কাঙালীকে খেতে দেখেছিলেন দু-বার করে, গোগ্রাসে। তা বলে স্নিগ্ধতা কি এতদিন কাঙাল ছিল নাকি? নিজেকে খুব ভালো করে চেনেন বলেই নিজের জাতকে বিশ্বাস করেন না তিনি।

শব্দ শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন আরতি দেবী। তাঁরই চোখের সামনে দিয়ে ভিজতে ভিজতে ফিরলো অনু আর স্নিগ্ধ। মসৃণ ঘাড়টা চিকচিক করছে স্নিগ্ধর। বুকের ভাঁজে সাপটে লেগে আছে ভিজে শাড়ি। না, স্নিগ্ধতা সুন্দরী নিঃসন্দেহ। সুঠাম সুডৌল নারীদেহ। এমন রূপসী পুত্রবধূকে তিনি নিজে খুঁজে বের করেছেন। মনে মনে গর্ব অনুভব করেন আরতি দেবী। এ সৌন্দর্যের বিনিময়ে একজনকে ধ্বংস করে কি আত্মতৃপ্তি পাবে স্নিগ্ধতা! স্নিগ্ধর বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা চাগিয়ে ওঠে তাঁর মনে।

ডাকলেন তিনি স্নিগ্ধকে।

বললেন, আচ্ছা বৌমা, তোমাদের কি এতটুকু ভয়ডর নেই? বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় এত রাত অবধি?

হাসবার চেষ্টা করে স্নিগ্ধ বললে, ভয় কেন হবে মা? অপাঙ্গে একবার সে তাকিয়ে নিলে অনুর দিকে। হয়তো বোঝাতে চাইলে যে অনুর মতো একজন সুপুরুষ ব্যক্তি যখন তার দেহরক্ষী, তখন আর ভয় কিসের।

—গাছে গাছে মহুয়া পাকতে শুরু হয়েছে। দিনরাত মৌমাছি ভনভন করছে তা দেখেছো?

—বাঃ রে, মৌমাছিকেও ভয় করতে হবে! নাকি সুরে আব্দারে গলে পড়লো স্নিগ্ধ।

ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হলেন আরতি দেবী।—তোমার যেমন বুদ্ধি। মৌমাছি নয়, গাছে গাছে মৌচাক বাঁধছে এখন। মহুয়া থাকলেই গাছে গাছে মৌচাক বাঁধে। আর এইবার দেখবে সন্ধ্যে হলেই বনজঙ্গল থেকে ভালুক আসবে দলে দলে। মধু খেতে।

—ওঃ ভালুক। তা আমরা তো অতদূর যাই না, মা!

ধৈর্য হারালেন আরতি দেবী। বললেন, দূর অদূর বুঝি না আমি, তোমার

খুশি হয় যেও, অমুকে যেতে দেব না আমি কাল থেকে। এই তো আজ ভিজে এল, এরপর ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করুক একটা। দিনকে দিন কি চেহারা হচ্ছে।

মাথা নিচু করে সুস্মি বললে, বলছিল আজকাল নাকি কাজ বেড়েছে—

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না আরতি দেবী। অমুই আজ প্রথম কাজে বেরুচ্ছে না বৌমা। উনি অনেক বেশি খাটতেন, দিনরাত ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। রাতে ঘুমোননি তবু একদিন একটু শরীর খারাপ হতেও তো দেখিনি।

সুস্মি মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তারপর ধীরে ধীরে সরে গেল তাঁর সামনে থেকে।

ঘরে আলো জ্বালালেও যে জানালাটা অন্ধকারে ঢেকে থাকে, তারই পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। নির্জনে একটু ভাবতে চান।

জানালার পাল্লাটা ঈষৎ খুলে দিয়ে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। মুখে চোখে এসে লাগলো রেতো-বর্ষার ছাট। শীকরসিঞ্চনে উত্তপ্ত মুখটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। গরাদের ফাঁকে গাল দুটো চেপে আরো একটু বৃষ্টির জল মাখতে ইচ্ছা হল। আঃ সুস্মির মতো আজো তিনি যদি হৈ হৈ করে ছুটে বেড়াতে পারতেন। সুস্মির মতো যদি বনে বনান্তরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ভেতর দিয়ে কত স্বপ্নভ্রমণের প্রহর কাটিয়েছেন একদিন। হাউইয়ের মতো ছুটতে চেয়েছিলেন, তারার পিছনে তারার মতো। অথচ। অনেক ঝাপসা মুখ মনে পড়ে। বিয়ের পরেও হয়তো তার কল্পরাজ্য সার্থক হতে পারতো। কিন্তু। মনোতোষ ছিল রীতিমতো কাজের মানুষ।

তারপর। মনোতোষও মুছে গেছে। বড়ো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন আরতি দেবী। অমু, সুস্মি! আঃ, তার দুঃখের এতটুকু যদি এরা বুঝতো। তা হলে, তা হলে, এতখানি নির্দয় হয়তো হত না। অভিমানে চোখ ঠেলে জল আসে। কাঁদতে ভালো লাগে আরতি দেবীর। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। নিস্তব্ধ কান্না গড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখ বেয়ে। মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠেন আরতি দেবী।

হাতের মুঠোর মধ্যে, গালের দু-পাশে ঠাণ্ডা গরাদের স্পর্শটা বেশ লাগে।

এদের কাছে থেকে যদি এতটুকু সহানুভূতি পেতেন। এত তীব্র ভাবে তাঁর চোখের সামনে নাইবা প্রকট করে তুললো ওদের সুখের উল্লাস! আজ যদি মনোতোষ বেঁচে থাকত—সুখ না হোক, সুখের ছদ্মবেশ তো রাখতে পারতেন সারা দেহে।

মনটা হাল্‌কা হয়ে এল। আঁচলে চোখমুখ মুছে ঘুরে দাঁড়ালেন এবার। না, কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। তাঁর দুর্বল মুহূর্তগুলো ধরা পড়েনি। শুকনো হাসি হাসলেন আরতি দেবী। তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় আছে নাকি ওদের।

উঁকি মেরে দেখলেন, বারান্দার ডেকচেয়ারটায় বসে কি একটা পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে অনু।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ঢুকলেন আরতি দেবী।

বেশ পরিবর্তন করছিল স্নিগ্ধ। এখনো ভিজে সাড়িটা জড়িয়ে রয়েছে তার দেহে। চোখের নিচে দুটি সজল রেখা—সেও বোধ হয় কাঁদছিল এতক্ষণ।

আরতি দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। আয়নার মধ্যবর্তিতায় চোখাচোখি হতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো স্নিগ্ধ, পালাবার পথ খুঁজলে।

—শোনো।

ফিরে দাঁড়াতে হল।

—ছোটঘরের খাটখানা কাল আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিতে বোলো বেয়ারাকে। কাল থেকে তুমি আমার কাছে ও ঘরে শোবে। কথা শেষ করে এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না আরতি দেবী। খাবার হয়েছে কিনা খোঁজ নিতে গেলেন।

অনেকক্ষণ অবধি ঘুম আসেনি তাঁর। অনেক দুশ্চিন্তা ঘুরছে মাথায়। আয়নায় দেখেছেন নিজের চেহারা। দেখে নিজেই আঁতকে উঠেছেন। এ কি! দুটো গহ্বরের মধ্যে কাঁচের মার্বেলের মতো ঝাপসা চোখ। তাঁর সেই পুরুষমনোহারী চোখজোড়া আজ এমন হয়ে গেছে? যেন তেজ নেই, আনন্দ নেই, জীবন নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কখন।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আরতি দেবীর।

বিছানায় উঠে বসলেন। কেমন যেন একটা নিঃস্ব বাতাস থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বুকে। বুকের ব্যথা ফেনিয়ে উঠতে চায়। কিছু একটা ভাবতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছুই যেন মনে পড়ে না। ছটফট করতে ইচ্ছা হয়। ছুটে বেড়াতে চান উন্মাদের মতো। সমস্ত বুকটা যেন ফাঁপা হয়ে গেছে। বুকের ভেতর থেকে কে যেন এক মুঠো মাংস তুলে নিয়েছে। অসহায়, নিঃস্ব, নিঃশেষিত। বালিশের ওপর মুখ গুঁজে ঠাণ্ডা উপাধানের পরশ নেন। এপাশ ওপাশ করেন। ঘুম আসছে না আর, ঘুম আসছে না।

চোখ বুজে কল্পনা করেন, পাশেই মনোতোষ শুয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে একটা বালিশ চেপে ধরেন। কল্পনা করেন, পাশে শুয়ে আছে মনোতোষ। ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে পাতলা কণ্ঠে কানে কানে কি যেন বলছে। ভালবাসা, প্রেম—আরো কত কি। বুঝলে, স্বর্গেও সুখ পাচ্ছি না আমি, তোমাকে ছেড়ে এসে। সত্যি, ভালবাসা? আচ্ছা, তোমার খুব কষ্ট হয় না! চলে এসো, চলে এসো লক্ষ্মীটি। আরো কাছে, আমার বুকের মধ্যে। অদ্ভুত আনন্দে শিউরে উঠলেন।

চোখ চেয়ে উঠে বসলেন আবার। খাঁ খাঁ করে উঠলো বুকটা। নাঃ, স্বপ্ন রোমন্থন করে লাভ নেই। যা হারিয়েই গেছে তা ফিরে পাবার উপায় নেই।

বিছানা ছেড়ে ওঠে এলেন আরতি দেবী।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। বৃষ্টি শেষ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আকাশে জ্বলছে কোটি কোটি তারা। ভাঙা চাঁদ চমক দিচ্ছে। কল্লোলিনী টুংরীর মিহি আওয়াজ আসছে ভেসে। কবরস্থানের মতো নিশ্চুপ পড়ে আছে সারা বিশ্ব, কোথাও নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। শুধু টুংরী নদীর টুং টুং আওয়াজ। সম্মার্জনীর মতো অন্ধকার মুচছে সার্চলাইটটা। অবিরত ঘুরছে।

আস্তে আস্তে বিছানায় এসে বসলেন আরতি দেবী। নিজের মনেই পা দোলাতে লাগলেন।

মনোতোষ। ভালবাসেননি কোনোদিন, তবু এত বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছে কেন আজ? অভ্যাসের তাগিদে? কে জানে।

কালো সাটিনের চাদরে হাতের উল্টো পিঠটা ঘষতে থাকেন আরতি দেবী। একটা ঠাণ্ডা কিছু স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। একটা শিশির-শীতল আবরণী যদি তাঁর দেহের উষ্ণতা ঢেকে দিতে পারতো! একটা সুমিষ্ট সুরের বাঁশি যদি এমনি সময় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিত।
আবার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। ঔৎসুক্য আর আগ্রহ জেগে উঠেছে।
পা টিপে টিপে এগিয়ে এলেন। খুব আস্তে। নিঃশব্দে।
অমুর ঘরের জানালাটার কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে জানালার ফাঁকে উঁকি মারলেন একবার। পরমুহূর্তেই লজ্জায় কানের কাছটা ছমছম করে উঠলো। চট্ করে সরে এলেন।
উষ্ণতায় জ্বালা করে উঠলো চোখের কোণ দুটো। আরতি দেবীর কালো কুরঙ্গনয়নে এক লোভার্ত আনন্দের আধিক্য চকচক করে উঠলো। ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লেন আরতি দেবী।

পরের দিন আরতি দেবী যখন ঘুম থেকে উঠলেন বেলা তখন অনেক। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন রোদ বেড়ে উঠেছে। পুবের পথ অনেক খানি অতিক্রম করে এসেছে সজীব সূর্য।
তাড়াতাড়ি উঠে এসে মুখ হাত ধুলেন আরতি দেবী। তারপর বাইরের বারান্দায় ডেকচেয়ারটা খুলে বসলেন। ছোট্ট টুলের ওপর 'দৈনিক' দুখানা পড়ে ছিল। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন। শহর কলকাতা নয় এটা; খবরের কাগজ আসে এখানে অনেক বেলায়। আরতি দেবী নিজেই বিস্মিত হলেন। লোকাল ট্রেনটা কখন চলে গেছে, ঘুমের ঘোরে টের পাননি।
বাংলা কাগজখানা টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করলেন। বাচ্চা চাকরটা চায়ের ট্রে নিয়ে এসে রাখলো। রেখে, ভেতরে চলে গেল সে। পরক্ষণেই অমু আর স্নিগ্ধ এল। সামনের কেদারাটায় বসলো অমু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পরিবেশন করলে স্নিগ্ধ।
কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন আরতি দেবী।—তোমরা চা খাওনি এখনো?
অমু ইংরেজি সংবাদপত্রটি তুলে নিতে নিতে বললে, তুমি ঘুমুচ্ছিলে যে।

আরতি দেবী হাসলেন।—চোখ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও খুব বেশি আগে ওঠোনি।

স্নিগ্ধ ভিজে চুলের রাশিটা মুঠো করে সামনে তুলে ধরে বললে, আমার কিন্তু অনেকক্ষণ স্নান হয়ে গেছে।

—তাহলে আর চা খাওয়ার প্রয়োজন নেই, বলো।

স্নিগ্ধ বললে, বাঃ রে স্নান করে বুঝি চা খেতে নেই।

আরতি দেবী সহাস্যে বললেন, বেলা এগারটার সময় খায় না। আমরা এখনই উঠলাম তাই।

স্নিগ্ধ বাংলা কাগজটার একটা বিজ্ঞাপনের দিকে আঙুল দেখালে।—দেখুন না, বলছে বেলা এগারটায় এক কাপ চা হলে—

মৃদু হাসলেন আরতি দেবী। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে অন্থকে প্রশ্ন করলেন, কাজে যাবে না আজ?

যাবো, উঠতে যে দেরি হয়ে গেল।

ওরা তিনজনে বসে কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বকে গেল। তারপর এক সময় অন্থ উঠে গেল, স্নিগ্ধরও সংসারের কাজে ডাক পড়লো। ভাঁড়ারের চাবি নিয়ে চলে গেল সেও।

খানিক পরেই আরতি দেবী দেখলেন, অন্থ বেরিয়ে গেল। অপস্যমান তৈলযানটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আস্তে আস্তে, এবার কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আরতি দেবী। স্নান সেরে নিতে হবে।

অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে থাকার দরুন কেমন যেন অসুস্থ বোধ করছিলেন আরতি দেবী। তাই বহুক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলেন। তারপর কাপড় বদলে ঘরে ঢুকলেন ধীরে ধীরে।

মুহূর্তে প্রতিটি শিরা যেন জ্বলে উঠলো। ছুঁচ ফুটলো মগজের ভেতর।

দেয়ালে টাঙানো অন্থর সুন্দর আবছা ফোটোগ্রাফটার দিকে অনিমেষ নয়নে স্নিগ্ধ তাকিয়ে রয়েছে। হতচেতন তন্ময় ভাব তার চোখে মুখে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

গা জ্বালা করে উঠলো আরতী দেবীর। প্রেম তিনিও করেছেন, ভালোও বেসেছেন। তাঁরও স্বামী ছিল একদিন। আর সে স্বামীর ভালবাসাও পেয়েছিলেন। কিন্তু কোনোদিন ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে বিরহযাপন তো

অসহ্য হয়ে ওঠেনি। স্মিির এই স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্ত হওয়াটা স্ত্রৈণ পুরুষের ব্যবহারের মতো ক্লেদপঙ্কিল মনে হয় তাঁর। সহ্য করতে পারেন না।

গতসন্ধ্যার আদেশটা তাই আবার মনে পড়ে গেল তাঁর।

বেয়ারাকে ডেকে স্মিির সামনেই বাড়তি সিংগেল-বেড খাটখানা তাঁর নিজের ঘরে আনালেন। স্মিিকে বললেন, এখন থেকে তোমার বিছানাপত্তর আনিয়ে ব্যবস্থা করে রাখো।

আর কিছু বলতে হল না। স্মিি বুঝতে পারলে।

দুপুরে অনু যখন আহারে বসলো অনেক চেষ্টা করেও লজ্জায় নবব্যবস্থার কথাটা বলতে পারলো না সে। সন্ধ্যার সময়ও সুযোগ পেয়েছিল, অনুর সঙ্গে নিরালা সঙ্গ পেয়েছিল, তবু বলতে পারেনি। রাত্রিতে স্মিি যখন আরতি দেবীর ঘরে শুতে এল, তখন আরতি দেবী দেখলেন স্মিি গোপনে আঁচল চাপা দিচ্ছে চোখে।

আনন্দ পেলেন, শাস্তি অনুভব করলেন আরতি দেবী। জয়ের অভিব্যক্তি ফুটলো তাঁর মুখে চোখে।

খানিক পরে স্মিি টের পেল আরতি দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওর ইচ্ছে হল নিঃশব্দে এ ঘর থেকে পালিয়ে যেতে। অনুর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু সাহস হল না। চুপ করে বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে লাগলো। ঘুমোবার চেষ্টা করলে। অন্ধকারে চোখ চেয়ে পড়ে রইলো।

অনুরও ঘুম আসছিল না। পাশের ঘরে একাকী শুয়ে শুয়ে ছটফট করছিল সে। ঘুম আসে না, বিছানায় ছটফট করে আর ভাবে তার নিরস ভাগ্যের কথা। নিয়তির চাকা ঘুরতে ঘুরতে যেন দুঃখের ত্রিশূলফলাটা অনুরই বুকে এসে খোঁচা দিচ্ছে। এ যেন ঝড়ের আবেগে কালো মেঘ গুটিয়ে আসছে ক্রমশ।

নির্বিষ অভিমানের কুয়াশা আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমগ্র চেতনা। পাঁজরে পাঁজরে গুমরে মরে বৈপ্লবিক আক্রোশের নিষ্ফলতা। অভিশাপের ছোঁয়াচ লেগে নিঃস্ব হয়ে আসে টলমল সুখের পেয়ালা। নিঃশেষিত হয়ে আসছে তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের উৎসস্রোত।

স্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে বালিশে মুখ চেপে বহুক্ষণ ভাবলে অনু।

ক্রমশ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে স্নিগ্ধা।

আজ অনেক রাত অবধি আশায় আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে সে। শেষে আন্দাজে এবং অনুভবে টের পেয়েছে, পাশের ঘরে আরতী দেবীর কাছে শয্যা নিয়েছে স্নিগ্ধা। অভিমানে চোখ চেপে জল আসছে তার। মার আদেশ? কিন্তু স্নিগ্ধা জানায়নি কেন তাকে।

তারপর। বহু চেষ্টা করেছে অনু। ঘুম আসেনি। শুধু অপেক্ষা করেছে। হয়তো স্নিগ্ধা আসবে। রাতের অন্ধকারে হয়তো লুকিয়ে চলে আসবে স্নিগ্ধা। অধীর আক্ষেপে প্রতীক্ষা করেছে সে।

কপাটের খিলটা খুলে রেখে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রহর অতিক্রম করে চলে অনু।

অনেক রাত অবধি জেগে কাটিয়েছে স্নিগ্ধা। আর চোখ তাকিয়ে দেখেছে সে আরতী দেবীর নিদ্রিত মুখের দিকে। নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে ছুটে চলে আসতে, তবু পারেনি, সাহস হয়নি। ভয়, আশঙ্কা! শঙ্কিত বুকের স্পন্দন গুণে গুণে রাত কাটিয়েছে সে, কিন্তু আসতে পারেনি অনুর কাছে। ভয় হয়েছে। যদি জেগে ওঠেন আরতি দেবী। আরতি দেবী! আর লজ্জা। তার অযাচিত অভিসার দেখে অনু কি মনে করবে। সারা রাত্রি অপেক্ষা করেছে অনুর দিক থেকে কোনো শব্দের ইঙ্গিত ইশারা পাবার আশায়। রাত জেগেছে। কিন্তু অনু নিশ্চুপ, অনু নিঃশব্দ। জাগররাত্রি তার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যথিত চিন্তায় কোন্ ফাঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ভোর হয়ে এসেছে। কাচের শার্সি ভেদ করে ঢুকেছে এক ঝলক রূপালী আলো।

কিসের একটা শব্দে চমকে জেগে উঠলো স্নিগ্ধা। ঘুম টুটে গেল।

একটা তীক্ষ্ণ হাসির আওয়াজ। সকাল বেলাকার নিঃশব্দতা ভেঙে গমকে উঠছে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। বাতাস চিরে চিরে একটা উন্মাদ হাসির ঝলক।

চকিতে ফিরে তাকালে স্নিগ্ধা। পরমুহূর্তেই বালিশে মুখ ঢেকে পড়ে রইলো সে। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। চোখ বুজে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে রইল স্নিগ্ধা।

ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কেঁপে কেঁপে। আর সাদা

আকাশ। শিশির ভেজা শ্বেতকমলের মতো সাদা আকাশ। সমুদ্রের ফেনার মতো ফুটফুটে ফর্সা আকাশ। গলানো সোনার মতো এক মুঠো রাঙা মেঘ পুবের নিচু নভদিগন্তে। আঁকা বাঁকা টুংরী নদীর জল। চমক দিচ্ছে সূর্যের কিরণ লেগে। যেন এক ফালি রাঙা বিদ্যুৎ। পাকা মহুয়ার মিঠে সুগন্ধ আনছে নেশার আমেজ। আমলকীর শাখায় শাখায় কচি সবুজ পাতার ঝালর। লাইমরেঞ্জে কুয়াশার ফাটা ফাটা চাদর ঝুলছে। রসপিপাসু অনু তাকিয়ে থাকুক সেদিকে।
রতিবিলাসাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণসারিনীর মতো তন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরতি দেবী। দেয়ালের বড়ো আয়নাটায় নিজের বিস্রস্ত রূপ দেখছেন। আর হাসছেন। হাসির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে নেচে নেচে। মাতালের হাসি। উন্মাদের হাসি।